ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস ঃ প্রথম খণ্ড

মহানবী

[কোরআনের আলোকে হযরত
মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনী]

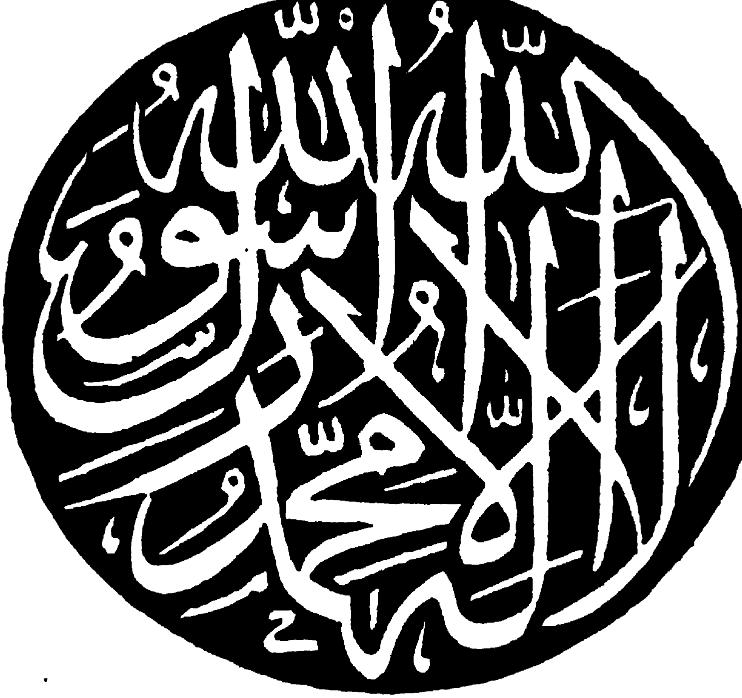
ডক্টর ওসমান গনী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট.

মল্লিক ব্রাদার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫৫, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশনায় ঃ আল্‌হাজ্ব আবুল কালাম মল্লিক
মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

তৃতীয় সংস্করণ-১৯৬২

মুদ্রণে ঃ
ইউনিক কালার প্রিন্টার্স
২০এ, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯



লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই,

হযরত মহম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসুল (দূত)।

উৎসর্গ

॥ পিতামাতা ॥

মৌলবী মহম্মদ ইউনুস্
মোসাম্মৎ কোব্‌রা ইউনুস্
মহম্মদ আব্দুল গনী
মোসাম্মৎ সাহেরা গনী
ও
সকল পিতামাতাকে
বলি, "আল্লাহ্ কর তাঁদের রহ্‌মতে লালন
যেমন করেছে মোদের শিশুতে পালন।"
কোরআন—১৭ ঃ ২৪, ৪৬ ঃ ১৫

এ জগতে জন্ম নিল যে কোন সন্তান
গরীয়ান মহীয়ান যতই মহান
একদিনে যা করেছে সব ক'টি দিন
শোধিতে পারে না কোন পিতৃমাতৃ ঋণ।

কোরআন শরীফে মহম্মদ (দঃ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ • ١٤٤ ال عمران

১) মহম্মদ রসুল ব্যতীত নয়। সূরা আল্-ইমরান্ ৩ ঃ ১৪৪।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ •

١٢٩ - ١٢٨ - التوبة

২) তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রসুল (দূত) এসেছে। তোমরা বিপদাপন্ন হও, এ তার নিকট অসহ্য। সে তোমাদের সবার জন্য হিতাকাঙ্খী! বিশ্বাসীদের জন্য পরম স্নেহশীল দয়াময়। সূরা তওবা ৯ ঃ ১২৮-১২৯।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ •

٢١ - الاحزاب

৩) নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ। সূরা আহ্‌যাব্ ৩৩ ঃ ২১।

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ • ٤ - القلم

৪) নিশ্চয় তুমি সুমহান্ চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সূরা কলম ৬৮ ঃ ৪।

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا •

١٥٨ - الاعراف

৫) তুমি বলো, হে মানব মণ্ডলী, আমি তোমাদের সকলের জন্যই আল্লাহর প্রেরিত রসুল। সূরা আরফ্ ৭ ঃ ১৫৮।

وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۝

٢٨ - السبا

৬) আমি তোমাকে সমগ্র মানব-মণ্ডলীর জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে ব্যতীত পাঠাই নি। সূরা সাবা ৩৪ ঃ ২৮।

وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ ١٠٧ - الانبياء

৭) আমি তোমাকে বিশ্বজগতের করুণা স্বরূপ ব্যতীত প্রেরণ করি নি। সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ১০৭।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

٥٦ - الاحزاب

৮) হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা তাঁর (নবীর) প্রতি দরুদ পড়ো, এবং তাঁকে উত্তম রূপে অভিবাদন করো। সূরা আহ্‌যাব্ ৩৩ ঃ ৫৬।

মহান রসুল তুমি মহান খোদার
তোমাতে বর্ষিত হোক রহ্‌মত্ তাঁহার।

وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

٣٧ - الصفت

৯) শান্তি বর্ষিত হোক রসুলদের প্রতি। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা। সূরা সাফ্‌ফাত্ ৩৭ ঃ ১৮১-১৮২।

সকল রসুল 'পরে দরুদ ও সালাম
সমস্ত প্রশংসা 'পরে আছে আল্লাহ্ নাম।

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পথিকৃৎ ও
ইসলামি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের জনক
আচার্য সুকুমার সেন

ডঃ ওসমান গনী আমার ভূতপূর্ব অন্যতম কৃতী ছাত্র। আমার তত্ত্বাবধানে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য গবেষণা করেছিলেন। তাঁর গবেষণা সার্থক হয়েছে। তারপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডি. লিট্ ডিগ্রিও লাভ করেছেন। তাঁর অমূল্য গবেষণা গ্রন্থ "ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ" প্রকাশিত হলে সুধী পাঠক ডঃ গনীর কাজের মাহাত্ম্য বুঝতে পারবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ও পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদক ডঃ ওসমান গনীর ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড "মহানবী" গ্রন্থটি একটি সার্থক সৃষ্টি। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বিদগ্ধ পাঠকের পাঠযোগ্য জীবনীর অভাব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং ইতিহাসের ধারায় বহুদিন হতেই ছিল। একদা ছোটখাটো বই ছিল, যাতে এ অভাবের খানিকটা পূরণ হত। যেমন রামপ্রাণ গুপ্তের হযরত মহম্মদ (দঃ) বইটি। ছোট হলেও বইটি জীবনী হিসাবে অনেকটাই সম্পূর্ণ ছিল। লেখক ছিলেন ঐতিহাসিক ও সুলেখক। এ বই আমি ছোটবেলায় গল্পের বইয়ের মতো অনেকবার পড়েছি। এখন মহানবীর জীবনী বাংলা পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যত্র নিতান্ত শিশুপাঠ্য বই ছাড়া লভ্য নয়। বাংলা ভাষায় আমাদের দেশে ইসলামের ভাল ধারাবাহিক ইতিহাস আজও নেই। ডঃ গনীর এই প্রচেষ্টা সর্বদা সমর্থনযোগ্য, যার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ডঃ গনীর এই বই শুধু বিদগ্ধ সাহিত্যরসিকের পাঠ্য নয়, এটি ইসলামি (সংস্কৃতির) ইতিহাসের শিক্ষার্থীদের অবশ্যপাঠ্য। গ্রন্থকার মহানবীকে মানুষ হিসাবে বিচার করেছেন সবদিক দিয়েই। তাঁর ধর্মনেতা রূপে মহত্ত্ব যে তাঁর ব্যক্তি হিসাবে মাহাত্ম্যে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত তাই দেখিয়েছেন ডঃ গনী। মানুষের অবলম্বিত ধর্মে সব দেশে নবী এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ব্যক্তিত্ব যেমন সুব্যক্ত এবং পরিস্ফুট তেমন আর কারও দেখা যায় না।

হযরত মহম্মদ (দঃ) খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর বিবদমান আরব জাতিদের ধর্মের বাহুতে দৃঢ়ভাবে বেঁধে দিয়ে মানবসভ্যতার এক অসাধ্য সাধন করে গেছেন। শুধু ধর্মের বাঁধনে থেকে ঐহিক সুবিধার জন্য নয়, আরবী ভাষা যা আগে থেকেই সমৃদ্ধ ভাষা ছিল, যার অবলম্বনে মানব-মনের প্রগতির গতিও বহুদূর বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন।

একযোগে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং পবিত্র কোরআন ও হাদিসে অসাধারণ দখল না থাকলে কারও পক্ষেই এরূপ অপূর্ব সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। "মহানবী" ডঃ গনীর সেই অপূর্ব সৃষ্টি। এই বিশাল গ্রন্থটি পড়লেই বোঝা যায়, কিভাবে ডঃ গনী ইসলামের মূল উৎস বিরাট কোরআন শরীফ ও 'সিয়া সাত্তাকে' (ছয়টি বড় হাদিস গ্রন্থ) মহানবীর মহান জীবন-

ব্রতের সঠিক মূল্যায়নে সর্বত্র অতি সহজেই চিন্তার মুক্তিতে মুক্তমনে ব্যবহার করতে পেরেছেন। কোথাও কোন দুর্বলতার চিহ্ন নেই। তাই গ্রন্থ মধ্যেও কোন জটিলতা নেই। চিন্তার নদীতে লেখার গতিধারা যেমন বেগবান, তেমনি স্বাভাবিক, সাবলীল ও প্রাঞ্জল। পুস্তকটির পাতায় পাতায় ইসলামের মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরআন ও হাদিসের মূল্যবান অসংখ্য উক্তি বাগানে বিকশিত ফুলের ন্যায় বইটির যথার্থ মূল্য ও শোভা বর্ধন করেছে। এবং এই নির্ভেজাল উক্তিগুলোতে কারও কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই।

গ্রন্থ সূচনাতে সুললিত ছন্দে 'মহানবীর জীবন দর্পণ' অধ্যায়কে এককথায় 'বিন্দুতে বিরাট বা এক নজরে মহানবী' বলা যেতে পারে। এই ছোট্ট অধ্যায়টি যেন লেখকের জ্ঞানমার্গকে ছাড়িয়ে ভক্তিমার্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্বর্গীয় জ্ঞানের আলোতে মানুষের জাগতিক জ্ঞানগরিমা, যুক্তিতর্ক, পাণ্ডিত্য সবকিছু যেখানে নীরব হয়ে যায়, সেখানে দেখি ভক্তের ভগবান। এখানে লেখক অকৃত্রিম আবেগ, অনুভূতি ও চরম আন্তরিকতার সঙ্গে মহানবীর অবদান আবেদন ও বুকভরা মহৎ বেদনাকে অবলীলাক্রমে অতীব সংক্ষেপে সুন্দরভাবে সবার সম্মুখে তুলে ধরতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছেন, যা পাঠকমাত্রকেই ভক্তিতে, ভালবাসায় ও প্রাণের স্পর্শমাখা ললিত ছন্দে মুগ্ধ করে।

বইটির পঞ্চম পর্বে জীবনীকার ডঃ গনী কঠোর শ্রম স্বীকার করে মহানবীর জীবনধারাকে তার মহান কর্মময় জীবনের দৃষ্টান্ত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রায় শতকের মতো সংখ্যা ও সংজ্ঞায় চমৎকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—মহানবী কত বড় সমাজ-সংস্কারক, কত বড় চিন্তানায়ক ও কত বড় কর্মবীর। গ্রন্থটির এই পর্বটিতে মানবজাতির উত্থানে, মানবতার বিকাশে ও সমাজ-সংস্কারে মহানবীর যে জীবন-চিত্র শাসনে, সংস্কারে ও সভ্যতায় গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন, তা যে কোন গ্রন্থকারের জন্য সহজসাধ্য কাজ নয়। এ বড়ই কঠোর সাধনা কঠিন পথ। পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন ডঃ গনীর কাজের মাহাত্ম্য কত।

ডঃ ওসমান গনীর বহুদিনের গবেষণাজাত এই উচ্চাঙ্গের বই সাধারণ পাঠক ও উচ্চ-ক্রমের শিক্ষার্থীদের পরিতৃপ্তি দেবে ও জ্ঞান বৃদ্ধি করবে সন্দেহ নেই। বাংলার সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, ইতিহাসে এরূপ গবেষণালব্ধ প্রাঞ্জল ঐতিহাসিক জীবনী গ্রন্থের সার্থক সংযোজন সত্যিই বিরল।

ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামধর্মের শাশ্বত সত্যকে যদি কেউ চিনতে ও জানতে চান ও তার স্বাদ পেতে চান, তাহলে ডঃ গনী রচিত "মহানবী" পড়া একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীসুকুমার সেন

মুখবন্ধ

বঙ্গবিখ্যাত বর্ষীয়ান আলেমকুল শিরোমণি
আল্লাহ্‌র অলি-কামেল পুরুষ
মাওলানা মহঃ ইলিয়াস সাহেব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্নেহভাজন ডঃ ওসমান গনী, এম. এ., পি-এইচ. ডি, ডি.লিট. রচিত মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনীর পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ পেয়ে প্রথমেই আল্লাহ্ রাব্বিল আ'লামিনকে জানাই হাজারও শুকোর, যিনি আমাকে বহুত হায়াৎ দিলেন। আজ আমি প্রায় ৮৭ বছর শেষ করতে যাচ্ছি। আমার মনে হয়, তখন আমি ৭ বছরেও পা দিইনি। যখন আমার জান্নাৎবাসী আব্বাজান মরহুম আব্দুল হামিদ সাহেব আমাকে ইসলামি শিক্ষা দেওয়ার জন্য মক্তবে পাঠান। এরপর দীর্ঘদিন অবিভক্ত ভারতের বহু স্থানে বিচরণ করি—সর্বত্র কোরআন হাদিসের চর্চায়। যখন বাড়ি ফিরি-- মা হারা, মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা হয়নি। এখন আবার সংশয় জাগছে মনে—এই কেতাবের ছাপা-হরফের সঙ্গে আমার শেষ দেখা কি হবে!

জীবনে বহু কেতাব পড়েছি, কিছু কেতাব লিখেছি। বহু ওয়াজ নসিহত (ধর্মীয় বক্তৃতা) করেছি। বহু আলেম উলামা বিদগ্ধজনের সঙ্গে মোলাকাত করেছি। স্নেহভাজন ডঃ গনীর কলকাতার বাসাতে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক প্রয়াত আচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়। তিনি আমাকে দেখা মাত্র বলে ফেললেন, "আমি আপনার নিকট কিছু শিখতে চাই।" আমি উত্তর দিলাম, "আমিও আপনার নিকট কিছু জানতে চাই।" ইসলামের ওপর কয়েক ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা হলো। তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন, আমি খুব আনন্দ পেলাম। যে দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি খুশি হলেন, আমিও আনন্দ পেলাম; তারই এক উজ্জ্বল প্রকাশ দেখছি ডঃ গনী রচিত 'মহানবী'-তে'।

স্নেহভাজন ডঃ গনীর প্রথম ছাপা কেতাব পবিত্র কোরআন ভিত্তিক "কাব্যকানন"। আমার মনে হয় এই বইটি ডঃ গনীর সমস্ত বইয়ের বীজতলা। বইটি আকারে ছোট হলেও গুণে খুব বড়। তাই সুনীতিবাবু ও আচার্য ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ও এই গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। ইসলামের প্রকৃত রূপকে চিনতে ও জানতে বইটি বড় চমৎকার। তাঁর দ্বিতীয় ছাপা গ্রন্থ কোরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ। এই পবিত্র কোরআন ও হাদিসকে নিয়েই আমার জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। বহু ভাষায় পবিত্র কোরআনের বহু অনুবাদ পড়েছি, বাংলা ভাষায় যত অনুবাদ দেখলাম তার মধ্যে ডঃ গনীর অনুবাদ তুলনাহীন। এত সাবলীল ভাষায় কোন অনুবাদ দেখিনি। ডঃ গনীর জীবনে এ এক অমরকৃতি।

তাঁর বর্তমান মহাগ্রন্থ—'মহানবী'। এই বিরাট মহানবী গ্রন্থ রচনাকালে তিনি আমার সঙ্গে একদিন নয়, দু'দিন নয়, মাসের পর মাস, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা দিক থেকে আলোচনা করেন। আমি মুগ্ধ হয়েছি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও কঠোর সাধনাতে। এই মহানবীতে তিনি হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনীকে পঞ্চম পর্বে অতি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। প্রথম হতে

চতুর্থ পর্ব মহানবী, পঞ্চম পর্ব চরিত্রে মহানবী। একদিকে জীবন কাহিনী, অন্যদিকে সেই কাহিনীর গুণগত রূপ ও চরিত্র বিশ্লেষণ। জীবনীতে এই চরিত্র বিশ্লেষণ নজিরবিহীন বিরাট কাজ, কেননা এটা করা বড়ই শক্ত। ডঃ গনীর কঠোর সাধনায় এই কঠিন জিনিসের স্বাদ আমরা পেলাম।

এই মহানবী গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বড় মাহাত্ম্য, তিনি মহানবী (সাঃ)-কে মানুষের আদর্শ রূপে দেখিয়েছেন, ফেরেশ্‌তা রূপে নয়। তিনি দেখিয়েছেন—সত্যবাদী মহানবীকে, সংগ্রামী মহানবীকে, সাধক মহানবীকে, বিশ্বসংস্কারক মহানবীকে, ব্যক্তি-সমস্যা হতে বিশ্ব-সমস্যার সমাধানকারী মহানবীকে। সবের উর্ধ্বে দেখিয়েছেন—একটি মানুষ কি করে কোন গুণে পূর্ণতা লাভ করতে পারে, কি করে এই সংসারের খেটে-খাওয়া মানুষ সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে শান্তির জীবন গড়ে তুলতে পারে। কি করে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধনের, দুর্বল ও সবলের শান্তিময় সমন্বয় জীবন গড়ে উঠতে পারে।

মহানবীর অপূর্ব জীবন, মহাজীবন কি করে শ্রেষ্ঠত্বের সকল ধারাকে সঙ্গে নিয়ে আজীবন আমরণ সংসারের মাটিতে দাঁড়িয়েছিলেন, কি করে কোন্ গুণে তিনি মনুষ্যত্বের মানবতার চরম পর্যায়ে উন্নীত হলেন, যেখানে আজ পর্যন্ত মনুষ্যজগৎ পৌঁছাতে পারেনি। এই সমস্ত কথাগুলো ডঃ গনী রচিত মহানবীতে অতি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তাই এই বইটি সকল মানুষের জন্যই জীবনকে গড়তে এক উজ্জ্বল জীবন-দিশারী ও জীবনের দিক নির্দেশিকা যন্ত্র-স্বরূপ প্রতিভাত হয়েছে।

রাসূলে-আক্রম (সাঃ)-এর বহু জীবনীই জীবনে পড়লাম। কিন্তু খুবই কম জীবনীতে তাঁর জীবনের মহান উদ্দেশ্যগুলোকে এত স্বচ্ছভাবে দেখেছি বলে মনে হয়। ডঃ গনী এই মহাগ্রন্থটির প্রথমেই শ্রদ্ধাঞ্জলি ও মহানবী (সাঃ)-এর 'জন্মরহস্য', 'জীবনধারা', 'জীবন ব্রত', 'জীবনদর্শন' ও 'জীবন-বাসনা'কে প্রাণের ভাষায়, প্রাণভরা অতীব মর্মস্পর্শী সরল ও সহজ ছন্দে এত সুন্দরভাবে বলেছেন, যা বর্ণনার অতীত। না পড়লে তার মাহাত্ম্য বোঝা যাবে না। আমার মনে হয়, এগুলো যেমন মহানবীর জীবনী, তেমনি 'মহাদরুদ'। আমি তন্ময় হয়ে পড়েছি, পড়তে পড়তে অভিভূত হয়েছি। প্রতিটি অক্ষরে যেন ডঃ গনীর মূল্যবান কলমের উর্ধ্বেও তাঁর অন্তরের ও প্রাণের সাড়া পেয়েছি। তাই আমার মনে হয়েছে এগুলো পড়লে একদিকে যেমন মহানবীর পবিত্র জীবনকে জানা যাবে, অন্যদিকে মোমিন-মুসলমানের 'তেলায়াত'-এরও কাজ হবে এবং পাঠক-পাঠিকার মনের বাসনাও পূর্ণ হবে। গ্রন্থ সূচনার এই কবিতা কয়েকটি ও গ্রন্থ শেষের 'দরুদ' ও 'দোয়া' মহাকবি সাদী (রঃ)-এর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ডঃ গনী লেখক হিসাবে শুধু মহানবীর জীবনী প্রণয়ন করেননি, সাধক হিসাবেও তাঁর মহাজীবনের স্বাদ পেতে চেষ্টা করেছেন।

আমার সমগ্র জীবন এই অধ্যায়ে অতিবাহিত—'কোরআন আর হাদিস'। আজ আমি বার্ধক্যের বেলাভূমিতে, জীবন-সায়াহ্নে বহু কিছুর সাক্ষী। সেই বহু সাক্ষীর একটি সাক্ষী রেখে গেলাম—মহানবীর পাণ্ডুলিপি পড়ে আশাতীত আনন্দ পেলাম। 'মহানবী' ডঃ গনীর জীবনের এক মহাকাজ, মহৎকাজ। মহৎ বেদনা নিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাই হয়েছে এক অনবদ্য অমর সৃষ্টি, অমূল্য ধন।

আমি আশা করি, সাধারণ-অসাধারণ, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী সকলেই আনন্দ পাবেন ও উপকৃত হবেন এই পবিত্র গ্রন্থটি পড়ে। অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর লেখক অধ্যাপক গনীর সাধনা সফল হোক। দীন দুনিয়ার মালিক আল্লাহ্ তাঁকে পুরস্কৃত করুন।

"সালামুন্ আলাল্ মুরসালিন্ ওয়াল্ হামদ্ লিল্লাহে রাব্বিল্ আ-লামিন্।"

"শান্তি বর্ষিত হোক রসুলদের প্রতি। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা"। কোরআন—৩৭ ঃ ১৮১, ১৮২

আমিন, সুম্মা আমিন

স্বাঃ মহম্মদ ইলিয়াস

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

হে অযাচিত অসীম দয়ালু, পরম দয়াময় অন্তর্যামী আল্লাহ্, তোমার অফুরন্ত করুণাবলে নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই 'মহানবী' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। তিন বছরের জন্য ছাপা বই দু বছরেই শেষ হবে, একথা সত্যিই জানতাম না, জানতেন না হাজীসাহেবও। এই না জানাটা আজকে আমাদের নিকট কতই আনন্দের। সর্বপ্রথম হে অন্তর্যামী আল্লাহ্! তোমার প্রশংসায় তোমাকেই জানাই অন্তরের গহীন দেশে শতবার শত শুক্‌রিয়া।

এবারের সংস্করণে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভীষণ ভয় থাকলেও কিছু কিছু করতেই হয়েছে। অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ধরার জন্য চেষ্টার পর চেষ্টা করেছি। নিজের সূক্ষ্ম ভুল নিজে ধরাও মুশকিল, এ কাজে হাজীসাহেবও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এই সংস্করণেও চারটি জিনিস (আল্লাহ্-রসূল-কোরআন ও হাদিস) চোখের সামনে চিন্তাজগতের পরিধিতে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় ধীর ও স্থিরভাবে ধরে রেখেছিলাম। যাতে বিচার-বিবেচনায় ও সিদ্ধান্তে দিকভ্রান্তি না ঘটে। এবারেও ইসলামের (গোঁড়ামি বর্জিত) শাশ্বত সুন্দর ও সত্যের ওপর সম্পাদনা এগিয়ে গেছে। যা আশা করি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিকট হবে আকর্ষণীয় ও আদরণীয় ; যা মানব মাত্রেরই নিকট মানুষের কল্যাণে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী মঙ্গল ও মর্যাদার দাবি রাখে, যা মহাকালের মহা ঘূর্ণিপাকেও সততা, শান্তি ও সাম্যের মহাবাহক, যেটি ইসলামের ঈমান, ইন্‌সাফ্ ও ইনসানিয়াত্, অর্থাৎ একত্রে বিশ্বাস ন্যায়বিচার ও মনুষ্যত্ব।

যে কোন বই লিখতে ভাষাগত একটা সমস্যা দেখা দেয়। ছাত্রজীবনে মক্তব-মাদ্রাসার দেউড়ি পেরিয়ে ইসলামিক স্টাডিজে অনার্স ও আরবী সাহিত্যে এম. এ. অধ্যয়নকালে ইসলাম ধর্মের এবং আরবী সাহিত্যের শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কিছুটা সুযোগ ঘটে, এবং পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পর পর দু'বার গবেষণাকালেও (পি-এইচ. ডি ও ডি. লিট্) বাংলা ভাষা নিবিড়ভাবে জানার সুযোগ ঘটে ; এই গ্রন্থের শব্দ চয়নে অতীতের ওই ফেলে আসা দিনগুলোর কিছুটা সদ্ব্যবহার করার চেষ্টাও করেছি।

ভাবের জন্যই ভাষা, তাই ভাষাকে কোন সময়ই ভাবের ঘাড়ে বোঝার ওপর শাকের আঁটি করিনি। যদিও ভাষাকে দেখেই তার ভাবরাজ্যকে অনুধাবন করতে হয়, যেমন আল্লাহ্ যদি ভাব, সৃষ্টি-জগৎ তাঁর ভাষা, এই ভাষারূপী মহিমাকে দেখেই ভাবময় মঙ্গলময় প্রকৃত আলোচনায় প্রকৃত আল্লাহ্‌কে চিনতে ও জানতে হয়। কিন্তু ভাবই মূল লক্ষ্য। তবে ভাব ও ভাষার দুই দুরন্ত-ঘোড়াকে এক সঙ্গে বেগবান গতিতে ধাবমান করাই লেখকের মূল কাজ ও কৃতিত্ব। তাই গ্রন্থ যাতে ভাষা সর্বস্ব শব্দের প্রাণহীন তাণ্ডবলীলা-ক্ষেত্রে পরিণত না হয়ে ওঠে, পাঠক-পাঠিকা যেন পড়ার স্বাভাবিক প্রেরণা ও সহজাত প্রবণতা না হারান, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। কেননা যে ভাষাই হোক, তাকে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে স্থানীয় বা গ্রন্থের মূল ভাষার সাথে কিছুটা আপস রফা করতেই হয়। নচেৎ গ্রন্থ হবে গতিহীন, পড়ার সময় পাঠক চিত্তে প্রাণের সাড়া জাগবে না। তাই পুস্তককে প্রাণবন্ত করতেই কিছু কিছু স্থানে ভাষাকে আপস-রফা করতেই হয়েছে। মানুষের দেহ ও প্রাণ যেমন, একটি গ্রন্থের ভাষা ও ভাব তেমনি, একে অন্যের পরিপূরক। ভাব যদি প্রাণ, ভাষা তার প্রাণাধার। দুয়েরই

মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেছি এবং সকলের উর্ধ্বে সবসময় মনে রেখেছি—ভাষা ভাবের বাহন, বোঝা নয়। ভাষার প্রধান কীর্তি ভাবকে তুলে ধরা।

বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের ভাষা একবার লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়—এই জগতের পরিবর্তনশীল সমাজের ভাষাও কত পরিবর্তনশীল। মনে রাখার প্রয়োজন আছে আরবের জাহেলি জমানার আরবী শব্দগুলো ইসলাম নয়, ইসলামের বক্তব্য ও ভাবই ইসলাম। কোরআন—১৪ ঃ ৪, ৩০ ঃ ২২, ৪৪ ঃ ৫৮

একমাত্র পবিত্র কোরআনকে বাদ দিয়ে আধুনিক ভাষা-জগতের আবর্তনে ও বিবর্তনে আরবী শব্দের কোথায় কোন্ 'জবর' সরে গেল, 'জের' নড়ে গেল, 'পেশ' পড়ে গেল, এতে কি আসে যায়, এরই নাম গতি, অপরটা গতিহীন। যার নাম বকলমে ধ্বংস বা মৃত্যু। কোরআন তো নিজেই বলেছে—"তোমরা স্বীয় ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।" ৪ ঃ ১৭১। মহানবী বলেন—"তোমরা কি জান, কোন্ জিনিস ইসলামকে ধ্বংস করবে? আলেমদের ভুল ও জেদাজেদি এবং তর্কবিতর্ক ; এবং পথভ্রান্ত নেতাদের নির্দেশ। তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ করাতে ধ্বংস হয়েছিল।" —মোস্‌লেম।

যাঁদের কথা আজ বারবার শ্রদ্ধা ও স্নেহের সঙ্গে স্মরণ করি—মরহুম আব্বাজান, চাচাজান, ভাইজান, (আল্লাহ্ তাঁদের জান্নাতে দাখেল করুন) শিক্ষকমণ্ডলী, বন্ধুবান্ধব ও ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং দিন-রাত সহায়ক মোহঃ ইয়াসীন (মন্টু) ও মোহঃ পিয়ার আলি।

প্রকাশক আলহাজ্ব জনাব আবুল কালাম মল্লিক সাহেব নিছক একজন বড় প্রকাশকই নন, দ্বীনদার-রুচিবান ও নিষ্ঠাবান মানুষ, তাঁর পুত্র স্নেহভাজন আব্দুর রহমান মল্লিক ও জামাতা জনাব ওসমান গনী, প্রুফ রিডার দিলীপ সুর ও বন্ধু সংশ্লিষ্ট সকলকেই জানাই একান্ত ও আন্তরিক ধন্যবাদ।

সর্বশেষ আমার রাতদিন লেখা-জোখার ব্যাপারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা মনে জাগে। সংসারের নানা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভাধর পুরুষদের পশ্চাতেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে নিরাভরণ মা-বোন ও সাধ্বী জীবন-সঙ্গিনীদের শতদিকেব শত দান, নীরব অবদান। সমরে পুরুষের তরবারিকে শক্তি দিয়েছে, সাহস দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী; সমভাবেই কালজয়ী পুরুষের কলমেও জুগিয়েছে মহাকালের কালি, প্রাণে এনেছে তৃপ্তি, প্রতিভাকে দিয়েছে দীপ্তি। দিন শেষে সান্ধ্যদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে ক্লান্ত শরীরের শিরায় শিরায় এনেছে সঞ্জীবনী সুধা, নিশীথরাতের প্রহর শেষে প্রভাতে দিয়েছে প্রদীপ্ত-প্রাণ। এই ভাবেই জগতের শাশ্বত ধারার স্বাভাবিক গতিতেই আমার মতো অতিসাধারণ জীবনেও তারা—(শওকৎ আরা গনী-সেতারা, কাশ্‌ফী গনী-চুনি, কাশ্‌শাফ গনী-মনী)—

অ'কুল দরিয়া বুকে দিনে হয় দ্বীপ
নিশীথে রওশন্ হয় রাতের প্রদীপ।

বিনীত—

ওসমান গনী

প্রকাশকের কথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ওসমান গনী তাঁর লিখিত "মহানবী" পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের ভার আমাদের ওপর অর্পণ করেছেন। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বইটিকে নির্ভুল ও মনোরমভাবে প্রকাশ করতে। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপাখানার ভূতের হাত থেকে রেহাই পাইনি। ফলে, গ্রন্থটিতে কিছু মুদ্রণ ত্রুটি রয়ে গেছে। আশা করি, সহৃদয় পাঠকগণ আমাদের এই ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। পূর্ববর্তী সংস্করণ অপেক্ষা বর্তমান সংস্করণটি কতটুকু রুচিশীল ও মনোরম হয়েছে, সে বিচারের ভার পাঠকবৃন্দের ওপর ন্যস্ত হল।

আলোচ্য "মহানবী" গ্রন্থের বিষয়বস্তুর গুণাগুণ ও ভালমন্দ সম্পূর্ণ লেখকের। পৃথিবীর সব ভাষাতেই হযরত মহম্মদ (সঃ)-এর জীবনী লেখা হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও রসুলুল্লাহর (দঃ) জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। তবুও আমাদের মতে, কোরআনের আলোকে রসুলুল্লাহর (দঃ) প্রামাণ্য জীবনীর অভাব রয়েছে। গ্রন্থটি পাঁচটি পর্বে সমাপ্ত। গ্রন্থের পঞ্চম পর্বে 'চরিত্রে মহানবী' অধ্যায়ে তাঁর বিশিষ্ট দিকগুলির কথা আলোচিত হয়েছে। সৃষ্টিজগতে রসুলুল্লাহ্র (দঃ) জীবন সর্বোত্তম আদর্শ।

মহানবীর জীবনের মধ্যে নিহিত আছে জীবন-গঠনের উপাদান। মহানবীর জীবনী পাঠ করে যাতে ন্যায়, ত্যাগ, মহত্ত্ব ও বীরত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের ও জাতীয় জীবনকে আলোর দিকে চালিত করতে পারে—এই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখেই ডঃ গনী 'মহানবী' রচনায় হাত দিয়েছেন। গ্রন্থটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত হলেও সাধারণ পাঠকেরও প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। বইটির অঙ্গসৌষ্ঠব আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে, ভাষা সাবলীল, প্রকাশভঙ্গিও অভিনব। তথ্যও যথাসাধ্য নির্ভুল। আশা করি, মহানবীর জীবনী পাঠ করে পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ তাঁদের জীবনকে আলোকিত ও প্রাণশক্তিকে নব বলে বলীয়ান ও দুর্বার করে তুলতে সক্ষম হবেন। সহৃদয় সাধারণ পাঠক মহলে বইটি সমাদৃত হলে গ্রন্থকার ও প্রকাশকের শ্রম ও স্বপ্ন সার্থক হবে।

"খোদা হাফেজ"

আল্‌হাজ্ব আবুল কালাম মল্লিক

সূচীপত্র

❑ প্রথম পর্ব ❑

অবতরণিকা

নবীর প্রতি—সালাম—দরুদ—রেসালাৎ—কোরআনে মহম্মদ (দঃ)—মানবসমাজে কোরআনের লক্ষ্য ঃ সৎ ও সমুন্নত জীবন—হাদিসের লক্ষ্য ঃ সৎ ও সমাজদরদী মন—ইসলামের ইতিহাস—ইসলামে মুসলমান—ইসলাম ধর্মেব পটভূমিকায় বিশ্ব ধর্ম—ধর্মকথার মর্মবাণী—জান্নাত। ৩৭—৪৫

পূর্বাভাস

সমাজ সংস্কারের পটভূমিকায় মহানবী

মহানবীর জন্ম রহস্য ও জীবন দর্পণ—দরুদ শরীফ—মহানবীর জীবনধারা—মহানবীর জীবন সাধনা। ৪৬—৫৩

ইসলাম জগৎ ও বাস্তব-সমাজ

মুসলমানের দৃষ্টিতে ইসলাম—প্রকৃত মুসলমান কারা—ইসলামের দৃষ্টিতে সংসার জীবন—ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্—ইসলামের আল্লাহ্—ইসলামে কোরআন ও হাদিস—আনুষ্ঠানিক বিধানে ইসলাম—ইসলামের মুসলমান—অভিধানগত মুসলমান—জন্মগত বা বংশগত মুসলমান—সংস্কারগত মুসলমান—প্রকৃত মুসলমান—মুসলমান—মৌলিক আবেদন ও মূল অবদানে ইসলাম—সাম্যের বাণী ইসলাম—প্রচেষ্টা ও শ্রম সাধনায় ইসলাম—সমুন্নত জীবন ব্যবস্থায় ইসলাম—সকল সমস্যার সমাধানসূত্র ইসলাম—গরিবদের রক্ষাকবচ ইসলাম—ইসলামে নারীর মর্যাদা—মানব শিশুর সহজাত ধর্ম ইসলাম—সর্বমানবের দিশারী ইসলাম—মানুষের মিলনায়তনের মুক্ত প্রাঙ্গণ ইসলাম—অসাম্প্রদায়িক ও চরম উদারতায় ইসলাম—ইসলামে অনাবিল শান্তির যুগ—ইসলামের অক্ষত ও অবিকৃত যুগ। ৫৪—৬৯

ইসলামকে জানার প্রধানত পাঁচটা উৎস

প্রথম উৎস ঃ আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ—দ্বিতীয় উৎস ঃ পবিত্র কোরআন—তৃতীয় উৎস ঃ পবিত্র হাদিস—চতুর্থ উৎস ঃ চার খলিফা—পঞ্চম উৎস ঃ সৃষ্টির সেবা। ৭০—৭৩

মহানবীর জীবন-চরিত রচনার ঐতিহাসিক উৎস

কোরআন—হাদিস—আরবীয় জীবনী-লেখকগণ ঃ ইমাম জুহরি মূসা ইবনে ওকবা—ইবনে ইসহাক—ওয়াকেদি—ইবনে সায়াদ—ইমাম বোখারি—ইবনে জরির তাবারি—ইমাম ইবনে কাইয়ুম—অনারব জীবনী লেখকগণ ঃ স্যার সৈয়দ আহম্মদ—কাজী মোহাম্মদ সোলায়মান—আল্লামা শিবলী—মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ—কবি গোলাম মোস্তফা—

রামপ্রাণ গুপ্ত—মুসলমান লেখকগণের মহানবীর ইংরেজি জীবনী—পাশ্চাত্য লেখকগণ—শূকর মাংস—মৃগী বা মূর্ছা রোগ—মহানবীর বিবাহ সম্পর্কে —জ্ঞানপাপী মুরের ধৃষ্টতা—জ্ঞানপাপী মার্গোলিয়থের বিদ্বেষ—এ যুগের জ্ঞানপাপী—জ্ঞানপাপীদের পুস্তক তালিকা—দ্বিতীয় যুগের সত্যনিষ্ঠ পাশ্চাত্য লেখকগণ—নবী ও রসুল—মহানবীর পুত্র-কন্যা ও বংশ তালিকা। ৭৪—৯১

❑ দ্বিতীয় পর্ব ❑

ইসলামের পটভূমি ও প্রাক্ ইসলামি যুগ

সূরা ফাতেহার ভাবানুবাদ

প্রথম অধ্যায়

আরব দেশ

ভৌগোলিক বিবরণ—আরব প্রদেশ বা মরুভূমি—জলবায়ু ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—আরবের ভাষা। ৯৫—৯৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবের পূর্বপুরুষগণ

আরব বাইদা—আরব আরিবা—আরব মুসতারিবা—আরবে ইব্রাহিম (আঃ)—হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বপুরুষগণ ঃ কুশাই, দার উন্-নাদওয়া, আব্দুদ্দার, হাশিম, উমাইয়া, আব্দুল মোত্তালিব হারব-যমযম-আবদুল মুত্তালিবের প্রতিজ্ঞা ও ব্রতপালন—আব্দুল্লাহ—আবরাহা—আবরাহার পরিণতি—আব্দুল্লাহ ও আমিনার বিবাহ—কুরাইশ বংশের উৎপত্তি। ৯৭—১০৮

তৃতীয় অধ্যায়

অজ্ঞতার যুগ

ইসলামের পূর্বে আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা (ষষ্ঠ খ্রীঃ)—ধর্মীয় অবস্থা—নূহ (আঃ)-এর যুগের ধর্মীয় অবস্থা—ইসলামের পূর্বে আরবের নৈতিক অধঃপতন ঃ কন্যাহত্যা, বিধবা—ব্যভিচার, বিবাহ, জুয়া ও মদ্যপান, সুদ, গোত্রযুদ্ধ, আরব নিষ্ঠুরতা, নানা দেবদেবীতে বিশ্বাস, গণক ও জ্যোতিষী, কবি ও কবিতা, আরবের জাতীয় গুণ ঃ সত্যবাদিতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সাহসিকতা, বাণিজ্য, শিকার, স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা, আতিথেয়তা ও বদান্যতা, উদারতা, সরলতা—তদানীন্তন পৃথিবীর নৈতিক ও ধর্মীয় চিত্র ঃ ইহুদী, খ্রীস্টান, পূর্ব রোম সাম্রাজ্য, পারস্য, ভারত ও চীন। ১০৯—১২০

❑ তৃতীয় পর্ব ❑

কোরআনের আলোকে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর
পূর্ণাঙ্গ জীবনী

এক পলকে মহানবী (দঃ), এক ঝলকে মহানবী (দঃ),
এক নজরে মহানবী (সাঃ) ১২১—১২৫

চতুর্থ অধ্যায়

অন্ধকার ও ঊষা

অন্ধকার—ঊষা—আব্দুল্লাহর সঙ্গে আমিনার বিবাহ—হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জন্ম—শৈশব—আব্দুল মোত্তালিবেব উৎসব আয়োজন—মহানবীর সিনাচাক বা বক্ষ বিদারণ—পরলোকে মা আমিনা—পরলোকে আব্দুল মোত্তালিব—আবু সুফিয়ান—অভিভাবক আবু তালিব—সিরিয়া ভ্রমণ—মক্কার জীবন—ফিজর যুদ্ধ—যুদ্ধের কারণ—মেষপালক রূপে বালক মহম্মদ (দঃ)—ফজল সংঘ—হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর স্বাধীন চিন্তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ—বাণিজ্যযাত্রায় মহম্মদ (দঃ)—কাবার প্রস্তুতি। ১২৬—১৪০

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম বিবাহ ও প্রথম ঐশী প্রত্যাদেশ

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বিবাহ—কথোপকথন—হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর দেহগত পরিচয়—চরিত্রগত পরিচয়—পুতুল পূজোর বিরোধী চারজন—হযরত মহম্মদ (দঃ) ও বিবি খাদিজার এবং বিবি মরিয়মের ছেলে ও মেয়ে—মেয়েদের বিবাহিত জীবন—হিরা গুহায় মহম্মদ (দঃ)—প্রথম ওহী—প্রথম ওহীর রহস্য পর্যালোচনা। ১৪১—১৫২

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ব্রত ঃ প্রথম ছয় বছর

মহানবীর মক্কার জীবনে নবুয়তের পর হিযরত পর্যন্ত প্রধান ঘটনারাশি—হযরত আলি (কঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ—যায়েদের ইসলাম গ্রহণ—হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ—প্রথম যুগে গোপনে ইসলামে দীক্ষাগ্রহণ—কুরাইশ ও ইসলাম—ইসলাম প্রকাশ্যে প্রচার—সাফা পাহাড়ের ঘোষণা—হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বিরুদ্ধে কুরাইশগণ—কুরাইশদের আক্রমণের প্রথম অস্ত্র ঃ নিন্দাজনক কবিতা—দ্বিতীয় অস্ত্র ঃ অলৌকিকতা দাবি—আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে উত্তর—প্রকৃত অলৌকিকতা—ইসলাম কি—পবিত্র কোরআন নিজেই অলৌকিক—কুরাইশ কর্তৃক আক্রমণে তৃতীয় ধারা ঃ ভয়, প্রলোভন, নিগ্রহ, উৎপীড়ন—আবু তালিবকে হযরতের উত্তর এবং কুরাইশদের পুনঃ শাসানি—উৎপীড়ন-

নিগ্রহ চরম মাত্রায়—হযরত বেলাল (রাঃ)-এর বিশ্বাস ও অত্যাচার—আবু জেহেলের অকথ্য গালাগালি ও হামজার ইসলাম গ্রহণ—হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে আপন পথে আনতে আরবদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা—মুসলমানদের প্রথম আবিসিনিয়ায় হিযরত—এই হিযরতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ—হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ—আবিসিনিয়া হতে প্রত্যাবর্তন কেন—অসহযোগ—কোরআন ও কুরাইশ—কোরআন হযরতকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে ঃ অভিযোগ, আরবের বিখ্যাত কবি তোফায়েলের ইসলাম গ্রহণ—কুড়িজন খ্রীস্টানের ইসলাম গ্রহণ—আরবের কয়েকজন নিন্দাকারীর গোপনে ইসলামের মাহাত্ম্য স্বীকার—পবিত্র কোরআন প্রচারে হযরতের কঠোর সাধনা—অন্ধমানব আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাকতুম—কোরআন প্রচারে বাধার নতুন পদ্ধতি—বাধার শেষ পন্থা নাদের বিন হারিস। ১৫৩—১৮১

সপ্তম অধ্যায়

কুরাইশদের বয়কট, হযরত সমাজচ্যুত, একঘরে ও অন্তরীণ
নবুয়তের সপ্তম হতে দশম বছর

অবরোধমুক্ত মহম্মদ (দঃ)—দুঃখ-শোকের বছর ঃ আবু তালিব ও বিবি খাদিজার জীবনাবসান—স্বজন বিয়োগে হযবতের বিরহবেদনা—অসহ্য শোকযন্ত্রণার পরও হযরত আবার ইসলাম প্রচারে—মহানবী ও হযরত আবু বকর প্রহৃত—হযরত আবু বকরের দেশত্যাগের ইচ্ছা—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তায়েফেব পথে হযরত মহম্মদ (দঃ)—তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের পথে মহম্মদ (দঃ)—বিভিন্ন গোত্রে মহম্মদ (দঃ)-এব বার্তা বা প্রস্তাব—বিবি আয়েশার সাথে হযরতের আকদ এবং বিবি সাওদার সঙ্গে বিবাহ। ১৮২—১৯০

অষ্টম অধ্যায়

মেরাজ—হযরতের স্বর্গে আরোহণ

হযরত মুসার আল্লাহ্ দর্শন—হযরতের আল্লাহ্ দর্শন। ১৯১—২০০

নবম অধ্যায়

মক্কার শেষ তিন বছর ঃ আকাবার শপথ এবং মক্কাতে
সমাজ-সংস্কারক বা নবীরূপে হযরত
নবয়ুতের দশম বছরের শেষ হতে ত্রয়োদশ বছর

ধর্মান্তরকরণ—আব্দুর—আইয়াস বিন মাদা—দামাদ—বুয়াসের যুদ্ধ—আকাবার প্রথম শপথ—উসাইদ এবং সায়াদ বিন মাদ—আব্দুল আশ হাল গোত্রের ধর্মান্তরকরণ—আকাবার দ্বিতীয় শপথ এবং মহানবীকে মদিনায় আমন্ত্রণ—আস সম্প্রদায়ের তিনজন। ২০১—২০৫

দশম অধ্যায়

মহানবীর মদিনায় (ইয়াসরিবে) হিযরতের কারণসমূহ

হযরতের হিযরতের অন্তরালে কি ছিল—নবীজীবনের সঙ্কটময় সময়—মুসলমানদের মদিনায় গমন—নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র—সুরাকার কাহিনী—হযরত মহম্মদ (দঃ) কুবাতে—ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ—উপসংহার—প্রথম কারণ ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক—দ্বিতীয় ঈর্ষাগত কারণ—তৃতীয় কারণ ধর্মযাজক পুরোহিত সমাজ—চতুর্থ কারণ আস ও খাজরাজ গোত্রের আমন্ত্রণ—পঞ্চম কারণ ইহুদীদের আগ্রহ—হিযরতের গুরুত্ব। ২০৬-২১৫

একাদশ অধ্যায়

হিজরীর প্রথম দু' বছর

মদিনাতে ধর্মীয় শিক্ষক ও রাজনীতিবিদ্ রূপে মহানবী

মদিনায় ধর্মীয় শিক্ষক ও ধর্মের বিধানদাতা রূপে মহানবী ঃ গোসল, ওজু, তায়াম্মুম, আযান, নামায, নামায সম্পর্কে কোরআনের বিভিন্ন নির্দেশ—প্রতিদিনের পাঁচবার নামাযের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—অন্যান্য নামায—নামাযের মূল বক্তব্য—নামায কি ও কেন—আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় নামাযের স্থান সর্বোচ্চ, রোযা, যাকাত, হজ—মদিনাতে হযরত (দঃ)-এর সমস্যা—মদিনার বুকে গণতন্ত্রের জনক মহানবী—ভ্রাতৃত্ববোধ—ইসলামের ইতিহাসে মিতে—হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে ইহুদীদের সন্ধিপত্র—মহানবী ও অন্যান্যদের মধ্যে সন্ধিপত্র—হযরতের আদর্শ জীবন—সতর্কতা—হযরতের প্রথম পরিদর্শক দল মক্কার পথে (১ম হিঃ, ৬২২ খ্রীঃ)—যাটজন অশ্বারোহীর দ্বিতীয় দল—পরিদর্শকের দ্বিতীয় অভিযান (২য় হিঃ, ৬২৩ খ্রীঃ)—স্বয়ং হযরতের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পরিদর্শক (২য় হিঃ, ৬২৩ খ্রীঃ)—ওমর বিন হাজরামির মৃত্যু (২য় হিঃ, ৬২৩ খ্রীঃ)—নাখালা যাত্রাকালে হযরত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন—হিজরীর দ্বিতীয় সনের সপ্তম মাস রজব পর্যন্ত মদিনার ঘটনাবলী—স্ত্রীরূপে আয়েশা (রাঃ)—মহম্মদ (দঃ) এবং আব্দুল্লাহ বিন উবাই—পারস্যের আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও সালমানের ইসলাম গ্রহণ—ইসলাম গ্রহণে বাধা—কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ-প্রস্তুতি—কুরাইশদের বিভ্রান্ত করতে হযরতের কৌশল।
২১৬—২৩৭

দ্বাদশ অধ্যায়

বদরের যুদ্ধ

হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে ধ্বংস করতে কুরাইশদের প্রস্তুতি (২য় হিঃ)—বদরের যুদ্ধে কুরাইশ সৈন্য—মহম্মদ (দঃ) ও তাঁর ৩১৩ জনের ক্ষুদ্র বাহিনী—হযরতের মদিনায় প্রত্যাবর্তন—বদর অভিমুখে হযরতের অভিযান (রমজান, ২য় হিঃ)—আবু সুফিয়ানের

পলায়ন—বদরের যুদ্ধ, তার পরিণতি এবং ২য় হিজরীর অন্যান্য ঘটনাবলী—বদরে মুসলিম তাঁবু—বদরে মহম্মদ (দঃ)-এর প্রতি মুসলমানদের অপত্য ভালবাসা—বদর যুদ্ধের বর্ণনা—(২য় হিঃ, ৬২৪ খ্রীঃ) বদর যুদ্ধে বন্দীদের প্রতি মহানবীর নজিরবিহীন ব্যবহার—হযরত যয়নাব ও আবুল আস—সায়িকের অভিযান—বদর যুদ্ধের পরিণতি ও ওমাইর—দ্বিতীয় হিজরীতে অন্যান্য ঘটনা—আবু লাহাবের মৃত্যু ও হিন্দার শপথ। ২৩৮—২৫২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইহুদীদের গভীর ষড়যন্ত্র—তৃতীয় হিজরী

মদিনাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের গভীর ষড়যন্ত্র—বদর যুদ্ধের পর ইহুদীদের নতুন কৌশল—ইহুদীদের প্রতারণা ও জালিয়াতি সম্পর্কে কোরআন—রাজদ্রোহী, আল্লাহ্‌র নিন্দা—বানু কাইনুকা গোত্রের ইহুদীগণের প্রকাশ্য বিদ্রোহ—আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও বানু কাইনুকার নির্বাসনদণ্ড—বদরের পর সতর্কতা—প্রতিশোধ। ২৫৩—২৫৬

চতুর্দশ অধ্যায়

ওহোদের যুদ্ধ—তৃতীয় হিজরী

মদিনাতে আক্রমণের সংবাদ—ওহোদ যুদ্ধ সম্পর্কে দুটি মত—অন্য মত—আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের প্রতারণা ও স্বপক্ষ ত্যাগ—ওহোদের যুদ্ধ বিবরণ—ওহোদ যুদ্ধে কুরাইশ সৈনিকদের ব্যবস্থাপনা—ওহোদ যুদ্ধে হযরতের তরবারি ও আবু দুজান্নাহ—ওহোদ যুদ্ধ আরম্ভ—মহাবীর হামজার মৃত্যু বা শাহাদত বরণ—মুসলিম তীরন্দাজদের মহাভুল—আল্লাহ্‌র মহাপরীক্ষা ঃ বিজয় বিভ্রান্তিতে পরিণত—বিপদাপন্ন অবস্থায় নবীজীবন—হযরত নিজেই যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু—শহীদের অঙ্গহানি—দয়ার নবী—ওহোদের মুসলমানদের নৈতিক জয়—পশ্চাদ্ধাবন—ওহোদ যুদ্ধ সম্পর্কে কোরআন—ওহোদ যুদ্ধের শিক্ষা—কুরাইশদের অমানুষিক আনন্দ—৩য় হিজরীর অন্য ঘটনা। ২৫৭—২৬৮

পঞ্চদশ অধ্যায়

চতুর্থ হিজরী—ইহুদীদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা

আবু সালমার অভিযান—৫ই মহরম ৪র্থ হিজরী ; ১৭ই এপ্রিল, ৬২৫ খ্রীস্টাব্দ—ছয়জন মুসলিম ধর্মপ্রচারক বধ—সত্তরজন মুসলিম ধর্মপ্রচারক বধ—অতীব সঙ্কটজনক অবস্থায় মহম্মদ (দঃ)—বিশ্বাসঘাতক ইহুদী—ইবনে উবাই—বানু নাজিরের নির্বাসন—যায়েদের বিদেশী ভাষা শিক্ষা—হযরতের প্রস্তুতি—বদরে হযরত মহম্মদ (দঃ) ঃ আবু সুফিয়ান অনুপস্থিত—দ্বিতীয় বদর যুদ্ধের সঙ্গীদের সম্পর্কে কোরআন—বদরের অন্যান্য ঘটনা। ২৬৯—২৭৬

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

পঞ্চম হিজরী—বানু মুস্তালিকের অভিযান ঃ পরিখার যুদ্ধ

বানু মুস্তালিকের অভিযান—হারিসের কন্যা জারিয়ার সঙ্গে হযরতের বিবাহ—একটি বিশেষ ঘটনা ও হযরত আয়েশার সতীত্ব সম্পর্কে কোরআন—খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধ—মদিনাতে মুসলমানদের করুণ দৃশ্য—পরিখার যুদ্ধ আবু সুফিয়ানের নিকট এক বিস্ময়—মদিনা অবরোধ—শত্রুগণ বানু কুরাইজার সঙ্গে—হযরতের বিরুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে বানু কুরাইজা—কুটনীতিবিদ মহম্মদ—পরিখার যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য—বিশ্বাসীদের প্রতি প্রতিশ্রুতি—বানু কুরাইজার ভাগ্য—ন্যায়সঙ্গত শাস্তি—হযরত মহম্মদ (দঃ) সর্ব দোষমুক্ত, ৫ম হিজরীর অন্যান্য ঘটনা, জিলহজ মাস। ২৭৭—২৯০

সপ্তদশ অধ্যায়

ষষ্ঠ হিজরী—হোদাইবিয়ার সন্ধি

জুলকারাদের আক্রমণ—ফিদাক অভিযান—আসবাগ বিন আমর কালবীর ইসলাম গ্রহণ—মহানবীর মূল লক্ষ্য—মানব আত্মার পবিত্রতা—জন্মভূমি মক্কার জন্য হযরতের আকাঙ্ক্ষা—মহম্মদ (দঃ)-এর হজযাত্রা—মক্কায় হযরতের প্রবেশ ও কুরাইশগণের শপথ—হযরত উভয় সঙ্কটে—কুরাইশদের একগুঁয়েমি—কুরাইশদের নিকট হযরত ওসমান বিন আফফান—বৃক্ষতলে শপথ—হোদাইবিয়ার সামরিক শান্তি বা যুদ্ধবিরতি—ইতিহাস বিখ্যাত হোদাইবিয়ার সন্ধি—হোদাইবিয়ার সন্ধির পরবর্তীকাল—আবু বাসিরের কাহিনী—কোরআনের মতে হোদাইবিয়ার সন্ধি বিরাট জয়—মহিলা মুহাজেরাত—মুসলমান নরনারীর মধ্যে শপথ। ২৯১—৩০৫

অষ্টাদশ অধ্যায়

সপ্তম ও অষ্টম হিজরী—খাইবার বিজয়, ইসলামের আমন্ত্রণ, হজ সমাপন

খাইবারের পথে হযরত মহম্মদ (দঃ)—জল্পনা-কল্পনা—ইহুদীদের পণ জয় অথবা মৃত্যু—খাইবারে হযরতের ওপর বিষ প্রয়োগ—ইসলাম প্রচার—বিভিন্ন শাসনকর্তার প্রতি ইসলামের আমন্ত্রণ—হারকিউলিসকে পত্র—পারস্যের কেসরা রাজের প্রতি পত্র—নাজ্জাশীর প্রতি পত্র—মিশরের মুকাউকিসের উত্তর—অন্যান্য প্রধানদের উত্তর—জাতুত তালার মিশন—মুতা অভিযান—মুতা যুদ্ধের প্রথম দিন, যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন, জাত আস্ সালাসাল অভিযান—মুতা যুদ্ধের পরিণতি—আবিসিনিয়া হতে মোহাজেরিনদের প্রত্যাবর্তন—মহম্মদ (দঃ)-এর সুন্নত বা জীবনধারা—মক্কার পথে হজযাত্রায় হযরত—মুসলমানদের আনন্দ ও উৎসাহ—হযরতের সতর্কতা—আনন্দপূর্ণ—কুরাইশদের মক্কা ত্যাগ—কাবা প্রদক্ষিণ—হজের দ্বিতীয় দিন—কুরাইশদেরকে দলে আনার প্রচেষ্টা—খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর বিন আস এবং অন্যদের ইসলাম গ্রহণ। ৩০৬—৩২৫

উনবিংশ অধ্যায়

অষ্টম হিজরী—মক্কা বিজয়

হোদাইবিয়ার সন্ধিভঙ্গ—হোদাইবিয়ার সন্ধিভঙ্গের ফলশ্রুতি ঃ মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি—আবি বালতার প্রচেষ্টা সংবাদ প্রেরণে—বিস্মিত কুরাইশগণ—হযরত আব্বাসের কৌশল—আবু সুফিয়ান ধৃত—কুরাইশদের সঙ্গে শান্তি ও বন্ধুত্বের জন্য হযরতের আগ্রহ—মক্কা প্রবেশে হযরতের সতর্কতা—মুসলমান সেনাবাহিনীকে মক্কা প্রবেশের নির্দেশ—ইকরামা কর্তৃক খালেদ আক্রান্ত—মহম্মদ (দঃ) মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রভু—বংশগত গর্ব হযরত রহিত করলেন—মহম্মদ (দঃ)-এর ঐতিহাসিক নজিরবিহীন ক্ষমা—কাবার পবিত্রকরণ—আনসারগণের ভয়—প্রথম আযান কাবাতে—হযরতের ঘোষণা ঃ মক্কা পবিত্র—মক্কাতে হযরতের ১৫ দিন। ৩২৬—৩৩৭

বিংশ অধ্যায়

অষ্টম হিজরী—হুনাইনের যুদ্ধ ও তায়েফ জয়

হাওয়াজিন ও সাকিফ—হাওয়াজিন ও সাকিফের পথে হযরত—হুনাইন যুদ্ধ—মোকাবিলা—হুনাইন ও ওহোদ যুদ্ধ—গতানুগতিক মিল—গরমিল—কোরআন শরীফে হুনাইন যুদ্ধের কথা—তায়েফ অবরোধ—হযরতের তায়েফ হতে জিরানায় প্রত্যাবর্তন, যুদ্ধলব্ধ ধন বিতরণ—মালেক বিন আওফের ইসলাম গ্রহণ—হযরতের বদান্যতা—আনসারগণ অসন্তুষ্ট—মহম্মদ (দঃ)-এর কথার অন্তর্নিহিত ভাব—মক্কা জয় ও হুনাইনের বিজয়ের ফল—মক্কা বিজয়ের ফল সম্পর্কে পণ্ডিতগণ—ইব্রাহিমের জন্ম—আজ পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম প্রচার। ৩৩৮—৩৪৭

একবিংশ অধ্যায়

নবম হিজরী—তাবুক অভিযান

মহানবীর পারিবারিক জীবন ঃ মরিয়মের প্রতি হযরতের অন্যান্য স্ত্রীদের ঈর্ষা—তাবুক অভিযান—যাকাত ও অন্যান্য কর—দুর্ভিক্ষ বছরে গ্রীষ্মকালে সিরিয়া যাত্রা বড়ই কষ্টকর—মোনাফেকগণ মুসলমানদের নিরুৎসাহিত করল—সর্বাপেক্ষা বড় সৈন্যবাহিনী—অলৌকিকতা নয় ওটা মেঘখণ্ড—মুসলিম সৈন্য তাবুক পৌছাল এবং রোমানগণ সিরিয়া ত্যাগ করল—হযরতের পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যু—অলৌকিকতা নয় সূর্যগ্রহণ—হযরতের প্রতিনিধি রূপে আবুবকর। ৩৪৮—৩৬১

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দশম হিজরী—তায়েফ জয়, প্রতিনিধি যুগ

উরা বিন মাসুদের ইসলাম গ্রহণ ও শাহাদত বরণ—তায়েফের ইসলাম গ্রহণ—মাজিনা—প্রতিনিধি—বানু তামিম প্রতিনিধি—আশরাইন প্রতিনিধি—দায়ুস প্রতিনিধি—কাব গোত্রের

প্রতিনিধি—তাই ও আদির প্রতিনিধি—নাজরান প্রতিনিধি—বানু আসাদ প্রতিনিধি—বানু ফাহজারা প্রতিনিধি—কিন্দার প্রতিনিধি—বাহরাইন হতে আব্দুল কায়িসের প্রতিনিধিত্ব—প্রতারক বানু আমিরের প্রতিনিধি—হামির প্রতিনিধি—আরবের শাসক হযরত মহম্মদ (দঃ)—সর্বশেষ চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ। ৩৬২—৩৬৭

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

দশম হিজরী—বিদায় হজ

নাজরানে খালিদ ও ইয়ামনে আলি—বিদায হজ—মহানবীর ঐতিহাসিক বিদায় ভাষণ—একতা সম্পর্কে—ঘুষ—হিংসা—পরিশ্রমী ও ভিক্ষুক—আমলনামা—জ্ঞান সম্পর্কে—ব্যবহার—পিতামাতা সম্পর্কে—শ্রেষ্ঠ মানুষ সম্পর্কে—ইসলামের পূর্ণতা লাভ—মহানবীর বিদায়ী ভাষণের সামাজিক মূল্যায়ন—মহানবীর আগমন ও অন্তর্ধান রহস্য। ৩৬৮—৩৭৭

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার, মহানবীর জীবনসন্ধ্যা ও ওফাৎ

একাদশ হিজরী, ৬৩২ খ্রীঃ

ভবিষ্যতের চিন্তায় হযরত মহম্মদ (দঃ), নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার—রোমানদের মোকাবিলার জন্য হযরতের প্রস্তুতি—অন্তিম শয্যায় মহম্মদ (দঃ)—সামান্য আরোগ্য লাভ—মুসলমানদের আনন্দ অনুভব—শেষদিন সোমবার—হযরত আলিকে সম্বোধন করে সকলের প্রতি মহানবীর শেষ সতর্কবাণী—আয়েশার কোলে মহানবীর শেষ বাণী—শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে—মহানবীর যানাজা নামায। ৩৭৮—৩৮৪

❑ চতুর্থ পর্ব ❑

পরিশিষ্ট

মহানবীর ওফাতে শোক-বিহ্বল আরব

মদিনায় হাহাকার—আয়েশার বিলাপ—হযরত আবুবকরের শোকাবেগ—হযরত ওমর জ্ঞানহারা। ৩৮৭—৩৮৮

মহানবীর বিবাহ সম্পর্কে

হযরতের বিবাহ, মহানবী যাঁদের বিবাহ করেছিলেন—প্রথম বিবাহ খাদিজার সঙ্গে—দ্বিতীয় বিবাহ সওদা বিনতে জামার সঙ্গে—তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহ আয়েশা ও হাফসার সঙ্গে—পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিবাহ জয়নাব বিনতে খোজাইমা ও উম্মে সালমার সঙ্গে—সপ্তম বিবাহ যয়নাব বিনতে জাহাসের সঙ্গে—অষ্টম বিবাহ জারিয়ার সঙ্গে—নবম স্ত্রী উম্মে হাবিবাহ্—

দশম বিবাহ ময়মুনার সঙ্গে—একাদশ বিবাহ সাফিয়ার সঙ্গে—দ্বাদশ স্ত্রী বিধবা খ্রীস্টান মারিয়া, ত্রয়োদশ স্ত্রী ইহুদিনী রায়হানা। ৩৮৯—৩৯৬

নারী জাতির ঐতিহাসিক উত্থানে মহানবীর অবদান

গ্রীক—চীন—বৌদ্ধ—ইহুদী—খ্রীস্ট—হিন্দু—ইসলাম ধর্ম—ইসলামে বিবাহ—মানবীয় অধিকার—সামাজিক অধিকার—একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার—পারিবারিক অধিকার—শাস্তি নির্ধারণে উভয়ই সমান—উপসংহার। ৩৯৭—৪০৪

মহানবীর অচিন্তনীয় কৃতকার্যতার অন্তরালে কি ছিল?

সত্যবাদিতা—বিরল সাহসিকতা—অসীম উদ্যম—প্রতিশ্রুতি রক্ষা—দয়ার সাগর দরদীমন—বিব্রতহীনতা—নির্লোভ ইচ্ছা। ৪০৫—৪১০

কাব্যে মহানবী

দূত মহম্মদ—বিশ্ব-করুণায় মহম্মদ—মানুষ মহম্মদ—নীতিতে মহম্মদ—আদর্শে মহম্মদ—প্রভু-ভৃত্যে মহম্মদ—মহত্বে মহম্মদ—আচার-ব্যবহারে মহম্মদ—মানব-সূর্য মহম্মদ—গণতন্ত্রে মহম্মদ—কামনায় মহম্মদ—মানুষ আবার। ৪১১—৪১৬

❑ পঞ্চম পর্ব ❑

চরিত্রে মহানবী

কর্মে, ধর্মে, চরিত্রে, বৈচিত্র্যে, শাসনে, সংস্কারে ও সভ্যতায় হযরত মহম্মদ (সাঃ)

পূর্বাভাস—চরিত্রে মহানবী (দঃ)—হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক ঃ নিখুঁত জীবনছবি, শ্রেষ্ঠতম মোজাহিদ, মানবতার শেষ উত্তরণ, মহানবীর মানবতা, মানব-সূর্য মহানবী—আদর্শ মহানবী, মহান ব্রতে, মহানবীর ব্রত, মানব মহানবী (সাঃ), মানুষ মহানবী, মহাপুরুষ মহানবী, সাধক মহানবী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহানবী, মক্কার মাটিতে সমাজ-সংস্কারক সিদ্ধপুরুষ ও জাতির জনক মহানবী—কেন মহানবী শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক—রাজনীতি—ধর্ম—জাতীয় অর্থনীতি—সামাজিক অসমতা দূরীকরণ—দাসত্ব মোচন—নারী জাতির অবস্থার উন্নতিকরণ—বিশ্ব-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক মহানবী—আরবদের একত্রকারী মহানবী—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী—আল্লাহ্ প্রেরিত অন্যান্য দূত সম্পর্কে কোরআন—অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআন—জগতের অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে কোরআন—মক্কার বুকে নবীরূপে ও মদিনার বুকে রাজনীতিবিদ রূপে মহানবী—ইহুদীদের সঙ্গে শান্তি ও সন্ধি চুক্তি—রাজ্যশাসনে—গণতন্ত্রে—বিচারক হিসাবে—আইনদাতা মুকুটবিহীন সম্রাট—শান্তির প্রবর্তক—অসাম্প্রদায়িক ও জগৎপ্রেমিক—নেতা—সত্যসেবক—সেনাপতি—যুদ্ধ-বিগ্রহে সমরনীতি—কর্মবীর—কর্মযোগী—

বিদ্যানুরাগী—আদর্শ ব্যবসায়ী—অন্যায় মজুতকারী সম্পর্কে—গরিবের বন্ধু—আদর্শদাতা—চিকিৎসক—রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সেবা-শুশ্রূষায়—মহানবী কর্তৃক কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ওষুধ—দৈহিক গঠনে—স্বাস্থ্যরক্ষায়—খাদ্য ভক্ষণে—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়—শারীরিক-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তাঁর নির্দেশাবলী—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গোসল, মল-মূত্র ত্যাগ, ঋতু ও সন্তান প্রসব, দাঁত পরিষ্কার, মুষ্ক ছেদন, পোশাক-পরিচ্ছদ, গোঁফ, দাড়ি ও নখ—পোশাক-পরিচ্ছদে—বেশভূষা ও সাজসজ্জায়—পছন্দে—আচারে ও আদব কায়দায়—মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্যে—সন্তানগণের প্রতি—বিবাহে—অসবর্ণ বিবাহে—পাত্রী দেখায়—স্ত্রী-প্রেম সম্পর্কে—জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে—আদর্শ স্বামীরূপে—স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য—স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য—আত্মীয়-স্বজনের প্রতি—ছোট ও বড়র প্রতি—দাসদাসীদের প্রতি—প্রতিবেশী সম্পর্কে—সৎ স্বভাব সম্পর্কে—সৎ ব্যবহার সম্পর্কে—নম্রতায়—দয়ার সাগর—ক্ষমায়—প্রতিশ্রুতি রক্ষা সম্পর্কে—সরল জীবন যাপনে—অতিথিপরায়ণতায়—প্রতাবণা সম্পর্কে—লোক দেখানোয়—সহিষ্ণুতায়—রসনায়—পরনিন্দায়—অধ্যবসায় সম্পর্কে—মধ্যপন্থায়—ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে—উপহার গ্রহণে—তোষামোদ সম্পর্কে—ক্রোধ সম্পর্কে—গর্ব, অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘা সম্বন্ধে—বংশ, জাতি বা দেশ সম্পর্কে—লজ্জায়—ভীরুতায়—হিংসা সম্বন্ধে—আশা সম্বন্ধে ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে—কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে—উৎকোচ গ্রহণ সম্পর্কে—প্রতারণা সম্পর্কে—অভিসম্পাতে—ব্যভিচার, কাম-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে—স্বপ্ন সম্পর্কে—সৎ চিন্তায়—বিবাদ-বিসংবাদে—কৃতকার্যতায়—শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানে—কালেমা, নামায, রোযা, যাকাত, হজ, ধর্ম সম্পর্কে—ওয়াকফ সম্পর্কে—তকদির সম্পর্কে—মধ্যপন্থায়—পবিত্র কোরআনে—আল্লাহ্‌ বিশ্বাসে—মৃত্যুর দুয়ারে—সমগ্র মানবজাতির মহানবী—প্রার্থনায়—বিশ্বকরুণায়—বিভিন্ন ধর্মমতে ইসলাম—হিন্দুধর্ম মতে, পারসীতে, বৌদ্ধ ধর্মে, শিখ ধর্মে, খ্রীস্টান ধর্মে—জগৎ মনীষার চোখে বিশ্ব-মনীষা—পূর্ণ মানব—অসম্পূর্ণ বিশ্বে মহানবী—আলোকের মহান বার্তাবহ—আমাদের মহান শিক্ষক রূপে—চিরবন্দিত, চিরনন্দিত মহানবী—ইসলাম যোগ সূত্র এবং যোগ সূত্রে মহানবী—দরুদ—দোয়া। ৪২০—৪৯২

পুস্তকে ব্যবহৃত ইসলামি শব্দাবলী ও তার অর্থ এবং সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলির বিবরণ ৪৯৩—৪৯৬

মহানবী

❑ প্রথম পর্ব

বিজয়

আল্লাহ্‌কে বাসিতে ভাল সাধ যদি জাগে–
নবীজীর অনুসরণ কর তবে আগে।
নবীকে বাসিতে ভাল সাধ যদি হয়—
কোরআনের অনুধাবন করিও নিশ্চয়।

উত্তম চরিত্র গঠন সাধ যদি মনে
অত্যুত্তম নবী চরিত্র রাখিও স্মরণে।
নবীকে বাসিলে ভাল জানিও কি হলো—
বাসিবে মহান খোদা তোমাকে ভাল।

হেন শক্তি নাহি কোন তোমাকে রুখে—
রাখ যদি নবীজীরে সদাই সম্মুখে
ধরো যদি নবীজীরে স্থলে ও জলে
তোমার হৃদয় দুর্গে তব মনোবলে
আসিবে বিজয় জেন মহা কলরোলে.
তোমার হাতেতে নয় তব পদতলে।

কোরআন—৩ ঃ ৩১

অবতরণিকা

সালাম

হে নবী!
পেয়েছি তোমার হাতে আল্লাহর ফরমান
তুমি ছিলে জগতের জীবন্ত কোরআন।
বিধাতার দূত তুমি হে সম্রাট নবী
কোরআন তোমারই প্রাণের পূর্ণ ছবি।
প্রাণ দিয়ে পেশ করি প্রাণের মিনতি
তোমাতে বর্ষিত হোক অপার শান্তি।
ত্রিধরা ধন্য হল যাঁহারে বরি
সহস্র সালাম সহ সূচনা করি।

কোরআন—৩৩ ঃ ৫৬, ৩৬ ঃ ১-৩

দরুদ

দয়ার সাগর তুমি দ্বীন দুনিয়ার
বহন করিয়া তুমি বিশ্ব-গুরুভার।
বেগবান নদী তুমি বিশ্ব-দরিয়ার
ধূলি বালি ময়লা যত টানিয়া ধরার।
জীবন করিলে পাত দূত রূপে যাঁর
তোমাতে তোমার বংশে রহমত তাঁহার।

কোরআন—৩ ঃ ১৫৯, ৪ ঃ ৭৯, ১৬৫, ৯ ঃ ১২৮, ১৫ ঃ ১০, ১৬ ঃ ৩৬, ২১ ঃ ১০৭, ৩৩ ঃ ২১, ৪৬, ৪৫ ঃ ২০, ৪৮ ঃ ৮, ৫৪ ঃ ২২, ৩২, ৪০, ৬৮ ঃ ৫২

রেসালাৎ

রেসালতের গুরুদায়িত্বে নবুয়তের ভার
সফলতায় রেখে গেছো সবুজ স্বাক্ষর।
সম্মোহন গুরুদায়িত্বে বিশ্ব-গুরুভার
সার্থক সম্পন্নকারী বিশ্ব-বিধাতার।
সৃষ্টিকুলের কৃপাসিন্ধু বিশ্ব-করুণার
সমাধানের চির-সূত্র বিশ্ব-সমস্যার।
তোমার কাজের শ্রেষ্ঠ যে কাজ সমাজ-সংস্কার
তোমার কাছে সবাই ঋণী এ বিশ্ব-সংসার।

কোরআন—৫ ঃ ৩, ২১ ঃ ১০৭, ৩৩ ঃ ৫৬, ৩৪ ঃ ২৮

কোরআনে মহম্মদ (দঃ)

বলেন স্বয়ং আল্লাহ্ অন্য কেহ না—

মহম্মদ আল্লাহ্‌র দূত বিশ্বকরুণা।

কোরআন—৩ ঃ ১৫৯, ৪ ঃ ৭৯, ১৬৫, ৯ ঃ ১২৮, ১৫ ঃ ১০, ১৬ ঃ ৩৬, ২১ ঃ ১০৭, ৩৩ ঃ ২১, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৫৬, ৩৭ ঃ ১৮১, ৪৮ ঃ ৮

১। তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসুলের মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ। মহম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল (দূত)। এবং সকল নবীর শেষ নবী (সংবাদবাহক)। কোরআন—৩৩ ঃ ২১, ৪০

২। হে নবী, আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি। কোরআন—৩৩ ঃ ৪৫

৩। তুমি তাঁরই আদেশে (মানবমণ্ডলীকে) আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী ও (অন্ধকারে পথের সন্ধানে) জ্যোতির্ময় সূর্য স্বরূপ। কোরআন—৩৩ ঃ ৪৬, ৪৩ ঃ ৪৩

৪। তোমাকে সকল মানুষের জন্য রসুল (দূত) রূপে পাঠিয়েছি। কোরআন—৪ ঃ ৭৯

৫। তুমি বল, হে মানববৃন্দ! আমি তোমাদের সকলেরই জন্য আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসুল কোরআন—৭ ঃ ১৫৮

৬। আমি তোমাকে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। কোরআন—৩৪ ঃ ২৮

৭। আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য করুণা স্বরূপ ব্যতীত প্রেরণ করিনি। কোরআন—২১ ঃ ১০৭

৮। তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র অসীম করুণা আছে। কোরআন—৪ ঃ ১১৩

আল্লাহ্ কেবল মুসলমানদের আল্লাহ্ নন, সারা দুনিয়ার আল্লাহ্। হযরত মহম্মদ (দঃ) কেবল মুসলমানদের নবী নন, তিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের নবী। নবী আগমনের মূল উদ্দেশ্য—স্রষ্টার বন্দনা ও সৃষ্টির মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা।

তুমি যে অখণ্ডময়ের অখণ্ডিত দূত
তোমাকে খণ্ডিত করে কেটে করি খুঁত।
সীমিত সম্মানে বেঁধে আপন গোত্রের
অসম্মান করা হয় জগৎ দূতের।
আঁধারে পেয়েছে আলো জগৎ ভূমি
মানবসমাজে নবী সূর্য তুমি।

মানবসমাজে কোরআনের লক্ষ্য
সৎ ও সমুন্নত জীবন

১। মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। কোরআন—২ ঃ ২১৩

২। আমি মানুষকে উত্তম চরিত্রে সৃষ্টি করেছি। কোরআন—৯৫ ঃ ৪

৩। নিশ্চয় সাফল্যলাভ করবে সে, যে পবিত্র (নির্মল চরিত্র)।

কোরআন—৮৭ ঃ ১৪

৪। যে নিজেকে পবিত্র করেছে, সে কৃতকার্য হয়েছে। কোরআন—৯১ ঃ ৯

৫। যে নিজেকে কলুষিত করেছে, সে অকৃতকার্য হয়েছে। কোরআন—৯১ ঃ ১০

৬। সেদিন মিথ্যাবাদীদের (অসৎশীলদের) জন্য পরিতাপ (বা ধ্বংস)।

কোরআন—৭৭ ঃ ১৫

৭। এইভাবে সৎশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। কোরআন—৭৭ ঃ ৪৪

৮। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের পুরস্কার নিরবচ্ছিন্ন।

কোরআন—৮৪ ঃ ২৫

৯। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের সুসংবাদ দাও। তাদের জন্যই স্বর্গ।

কোরআন—২ ঃ ২৫

যখনই নিবিড় প্রাণে নিখিলেরে ছুঁই
দেখি না মানবশিশু এক ভিন্ন দুই।
ইসলামের মূলমন্ত্র করিলে মন্থন
একই পিতার পুণ্যে মোরা ভাই-বোন।
কোরআন হাদিস মূলে শিক্ষা যেটি পাই
একই মায়ের কোলে মোরা ভাই ভাই।
কোরআন ধর্মেতে নয় কর্মেতে কর্ষিত
যার সুধা শুধু এক সজ্জনে বর্ষিত।
শ্রেণী গোত্র বংশ মিছে সকলই সমান
সৎশীল মানবের নাহি ব্যবধান।
ইসলামের মূলমন্ত্রে কৃতকার্য তিনি
স্রষ্টায় বিশ্বাস রেখে সৎশীল যিনি।
কোন্ বলে ইসলামের স্বর্গ পেল কারা
স্রষ্টায় বিশ্বাস রেখে সৎশীল যারা। **—কাব্যকানন**

কোরআন—২ ঃ ২১৩, ৩ ঃ ১১০, ৪ ঃ ১, ৭ ঃ ১৮৯, ১১ ঃ ১১৮, ২১ ঃ ৯২, ২২ ঃ ৩৪, ৬৭, ৭ ঃ ৪২, ৯ ঃ ৭২, ১০ ঃ ৪, ৯, ৬৩, ১১ ঃ ১১, ২৩, ১৩ ঃ ২৯, ১৪ ঃ ২৩, ১৬ ঃ ৯০, ১৭ ঃ ৯, ১৮ ঃ ২৯, ৩০, ৩১, ১০৭, ১৯ ঃ ৬০, ৯৬, ২০ ঃ ৭৫, ৭৬, ৮২, ১১২, ২১ ঃ ৯৪, ১০৫, ২২ ঃ ১৪, ২৩, ৫০, ৫৪, ৬৭, ২৩ ঃ ৫১, ২৪ ঃ ৫৫, ২৫ ঃ ৬৯, ৭১, ২৬ ঃ ৮৩, ১২৭, ২৭ ঃ ১৯, ২৮ ঃ ৬৭, ৮০, ২৯ ঃ ৭, ৯, ৫৮, ৩০ ঃ ১৫, ৪১, ৪৫, ৩২ ঃ ১৮-২০, ৩৩ ঃ ৩১. ৬৫, ৩৪ ঃ ৪, ১১, ৩৭, ৩৫ ঃ ৭, ৩৭ ঃ ৮০, ১০৫. ১১০, ১২১, ১৩১. ৩৮ ঃ ২৪, ৩৯ ঃ ১০, ৪০ ঃ ৫৮, ৪১ ঃ ৮, ৪৬, ৪২ ঃ ২১. ২২, ২৩, ২৬, ৩০, ৩৬, ৪৫, ৪৭ ঃ ২, ১২, ৪৮ ঃ ২৯, ৫১ ঃ ১৫, ১৬, ৫৭ ঃ ১৮, ১৯, ৬৪ ঃ ৯, ৬৫ ঃ ১১, ৬৬ ঃ ৮, ৬৮ ঃ ৮, ৩৪, ৫০, ৭০ ঃ ২২-৩৫, ৭৭ ঃ ১৫. ১৯, ২৪, ২৮. ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৪৫, ৪৭. ৪৯, ৮৩ ঃ ১০, ৩৪. ৮৪ ঃ ২৫. ৮৫ ঃ ১১, ৮৭ ঃ ১৪, ৯১ ঃ ৯. ১০, ৯৫ ঃ ৬, ৯৮ ঃ ৭-৯, ১০৩ ঃ ২, ৩

মানবসমাজে হাদিসের লক্ষ্য
সৎ ও সমাজদরদী মন

১। ওই ব্যক্তি মুসলমান নয়, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ঠ হতে নিরাপদ নয়।

২। ওই ব্যক্তি মুসলমান নয়, যে তৃপ্তির সঙ্গে আহার করে। এবং তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।

৩। ওই ব্যক্তি মুসলমান নয়, যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা অপরের জন্য করে না।

৪। অপরের নিকট হতে তুমি যে ব্যবহার পেতে চাও, পাওয়ার পূর্বেই তুমি অপরকে ওই (ভাল) ব্যবহার পেতে দাও।

৫। সতী নারী এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তোমার মায়ের পায়ের তলে তোমার স্বর্গ। পিতার সন্তুষ্টিই বিধাতার সন্তুষ্টি।

৬। কর্মহীন প্রার্থনার এবং ধৈর্যহীন কর্মের (কোন) মূল্য নেই।

৭। অবৈধ নারী ও অবৈধ অর্থের প্রতি যার মোহ আছে, তার দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।

৮। শহীদের রক্ত অপেক্ষা লেখকের কলমের কালি অধিকতর মূল্যবান।

৯। তুমি যা খাও, বাড়ির চাকর-বাকরকে তাই খেতে দাও। তুমি যা পর, ওদের তাই পরতে দাও। তুমি গরিবকে দান কর, আল্লাহ্ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। তুমি ওদের ক্ষমা কর, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন। তুমি ওদের ভালবাস, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন। গরিবকে ভালবাসা স্বর্গের চাবি।—হাদিস

বলেন মানব শ্রেষ্ঠ মহম্মদ ধরার—
"এই বিশ্ব এক আল্লাহ্‌র একটি পরিবার।
তিনিই উত্তম এক বিধির দরবারে
যে-জন উত্তম এই বিশ্ব-পরিবারে।
আপন আচারে তুমি হও হে তেমন
অন্য হতে পেতে চাও নিজেরে যেমন।
হোক তব ব্যবহার মানবসমাজে
যেরূপ পাইলে তুমি খুশি হও নিজে।
খেতে দাও ভৃত্যগণে যা ভোজন কর
পরতে দাও চাকরেরে যে কাপড় পর।
যে করেছে তারে তোরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বল
মানুষের সেবা আর মানব মঙ্গল!"—হাদিস
বলি "আল্লাহ্ কর তাঁদের রহমতে লালন
যেমন করেছে মোদের শিশুতে পালন। ১৭ ঃ ২৪
মাগিছি কাতর প্রাণে করুণা তোমার
বৃদ্ধি কর বিদ্যাবল হে প্রভু আমার।" ২০ ঃ ১১৪
আচারে পেয়েছি আলো জগৎভূমি
মানবসমাজে নবী সূর্য তুমি। ২৫ ঃ ৬১, ৩৩ ঃ ৪৬

ইসলামের ইতিহাস

দেখিয়া কোন মুসলিম হাতে জুয়ার আসরে তাস্
ভাবিও না তা কোরআন হাদিস ইসলামের ইতিহাস।
দেখিয়া কোন মুসলিম হাতে সতীর সর্বনাশ
ভাবিও না তা আল্লাহর বাণী নবীজীর ইতিহাস।
মুসলিম নয় নরপশু সে, পশু-প্রবৃত্তির দাস
মহাপাপীরে ধিক্কার দেয় ইসলামের ইতিহাস।
বলে না কোরআন বলে না হাদিস সাম্যের ইতিহাস
মর্ত্যের বুকে করিবে মানুষ খুনোখুনি বারোমাস।
বলেছে কোরআন বলেছে হাদিস শান্তির ইতিহাস
বিশ্বমানব করিবে হেথা শান্তিতে বসবাস।
চার খলিফার প্রাণের ছবি ইসলামের ইতিহাস
মোরা শুধু তার বিকৃতিকরণ করেছি সর্বনাশ।

কোরআন—২ ঃ ১২৪, ২৭৯, ৪ ঃ ৩, ৩৪, ১১৯, ৯ ঃ ৭০, ২৩ ঃ ৯৪, ২৮ ঃ ৩৭

ইসলামের মুসলমান

যে জন আপন মনে শান্তিপ্রিয় নয়
যে জন সত্যেরে করে সদা নয় ছয়
যে জন রিপুর হাতে দাস রূপে রহে
রাত্রি-দিন অর্থ আর রমণী মোহে
যে জন অবৈধ পথে জীবিকা জুটায়
যে জন মিথ্যার দ্বারে সদাই লুটায়
যে জন চায় না কভু অপরের ইষ্ট
যে জন অযথা দেয় অন্যজনে কষ্ট
কোরআন হাদিস মূলে একথা নিশ্চয়
সে জন যাহাই হোক মুসলমান নয়।
ইসলামের মূলমন্ত্রে মুসলমান তিনি
স্রষ্টায় বিশ্বাস রেখে সৎশীল যিনি।

কোরআন—২ ঃ ১২৪, ১৩১, ২৭৯, ৩ ঃ ১৫৯, ৪ ঃ ৩, ৩৪, ১১৯, ৬ ঃ ১৬২, ৯ ঃ ৭০, ২৩ ঃ ১-৬, ৯৪, ২৪ ঃ ২৭, ২৮, ৩২, ৩৩, ২৮ ঃ ৩৭

ইসলামধর্মের পটভূমিকায় বিশ্বধর্ম

ধর্মকথার মর্মবাণী

তুমি [মহম্মদ (দঃ)] একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুকরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্‌র প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নেই, এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

কোরআন—৩০ ঃ ৩০

সারা বিশ্বের বুকে অশান্তিকে এড়ানোর জন্য, শান্তিকে সুরক্ষিত এবং সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য এবং মানুষের নৈতিক চরিত্র ও বোধকে সমুন্নত করার জন্য মানুষের হাতে যতগুলো উপায় ও অমোঘ হাতিয়ার আছে, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার ও অনন্যসাধারণ উপায় ধর্ম। অতীতের ইতিহাসে এর প্রভূত প্রমাণ বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দেশে যত বড় মহানই জন্মগ্রহণ করুন, মহাকালের বিচারে সেই দেশের ধর্মীয় পুরুষকে মহত্ত্বের দিক থেকে কেউই অতিক্রম করতে পারেননি, যেমন ভারতে গৌতম বুদ্ধ, যাঁকে আজও ভারতের শ্রেষ্ঠতম সন্তান বলা হয়ে থাকে। প্রতিটি দেশেই তাঁরা এইভাবে তুলনাহীন চির সম্মান লাভ করেছেন। তাঁরা ছিলেন শান্তির দূত, প্রত্যেকেই হিংসা-দ্বেষ জর্জরিত সমাজে আনতে চেয়েছিলেন অনাবিল শান্তি, যার বাহন ছিল ধর্ম সুতরাং এই সংসারে ধর্ম যেখানে নিঃসন্দেহে নিখিল বিশ্বের শান্তির শ্রেষ্ঠতম সোপান ব' বাহন, সেখানে এই বাহনটি যাতে কোন রূপে বিকল হয়ে না যায়, সেদিকে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষেরই সক্রিয় ও সজ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ বিশ্বশান্তি একদিন চরমভাবে ব্যাহত ও বিঘ্নিত হবে। এমনকি সর্বনাশা পরিণামে পৃথিবী বিলুপ্তও হতে পারে। মানুষের এই সর্বনাশা পরিণামকে ঠেকাতে পারে বিবেকের বাহন শান্তির সোপান—ধর্ম।

নাবালক মানব সন্তানের অভিভাবক তাদের পিতা-মাতা বা নিকট আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু মানুষ সাবালক হওয়ার পর বৃদ্ধকাল পর্যন্ত তাদের মাথার উপর আর কোন তেমন অভিভাবক থাকে না। তখন ভুলে ভরা এই মানবজীবনের অভিভাবক হয় তাদের ধর্ম বা ধর্মজ্ঞান সঞ্জাত আল্লাহ্ বা ঈশ্বর-বিশ্বাস। এইজন্য ধর্মকে মানব সন্তানের সাবালকত্ব হতে আমৃত্যুকাল অদৃশ্য অভিভাবক বলা হয়। মানুষের চলার পথে কখনো বিবেকের বিপর্যয়ে, কখনও বিচার-বিবেচনার বধ্যভূমিতে, কখনও ষড়রিপুর তাড়নায়, কখনও শয়তানের দুরভিসন্ধিতে, কখনও কুচিন্তার করাল গ্রাসে, কখনও কামিনী-কাঞ্চনে, কখনও স্থূল ও সূক্ষ্ম পদস্খলনের মহা মুহূর্তে ধর্ম ঘরে-বাইরে তন্দ্রা ও নিদ্রাহীন চির জাগ্রত প্রহরী রূপে পালন করে অকৃত্রিম অভিভাবকের ভূমিকা।

অনেকে বলে থাকেন বিবেকই যথেষ্ট। ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর ইতিহাস ওইরূপ বহু নামকরা মর্যাদাশীল বিশ্ববিখ্যাত বিবেকবানদের দেখেছে। যাঁরা কামে-ক্রোধে ও লোভে বনের পশুকেও বহুবার হার মানিয়েছেন। সুতরাং মানুষকে সুন্দরের পথে ধরে রাখতে ধর্মই তার আমৃত্যু অভিভাবক।

তুমি আছ চিরদিন চির বিরাজিত
তন্দ্রা ও নিদ্রাহীন সদা জাগরিত।
এমনই প্রহরী তুমি মানব অন্তরে
দিবা নাই রাত্রি নাই তোমার প্রহরে। কোরআন—২ ঃ ২৫৫

মানুষের এই ধর্মকে মানুষের খাদ্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বিবেকবান নরনারীর সহানুভূতির চোখে মনে রাখা দরকার যে, অনেক সময় এই বিশ্বের এক দেশের খাদ্য অন্য দেশের নিকট অখাদ্য, একটি সমাজের প্রিয় খাদ্য অন্য সমাজের নিকট অপ্রিয় খাদ্য। খাদ্যের মূলত মূল উদ্দেশ্য দুটি, একটি ক্ষুধার নিবৃত্তি এবং অপরটি প্রাণের বা দেহের পুষ্টি। যদি কোন খাদ্যের দ্বারা মানুষের এই দুটো দাবি পূরণ না হয়, তাহলে সেটিকে যত বড়ই ভাল খাদ্য মনে করা হোক, মানুষ বেশিদিন তাকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করবে না। অনুরূপ ভাবে, ধর্মেরও স্বরূপ খাদ্যের মতোই। এক দেশের ধর্মবিধি অন্য দেশের সঙ্গে একই হবে, এমন কোন কথা নেই। এক সমাজের ধর্মাচরণ অন্য সমাজের সঙ্গে একই হবে, এই আশা করাটাও ঠিক না। তাই বলে একেঁ অপরের ধর্মবিধিকে গালাগালি করতে হবে, অশ্রদ্ধা দেখাতে হবে, এটা কোন ধার্মিকের পরিচয় নয়। খাদ্যের যেমন আমরা মূলত দুটো উদ্দেশ্য দেখলাম, ধর্মেরও প্রধানত দুটো উদ্দেশ্য। একটি সেই অদৃশ্য পরমস্রষ্টাকে পাওয়া (অর্থাৎ জীবনের পূর্ণতাকে পাওয়া), অন্যটি মনের শান্তিকে পাওয়া (সৃষ্টকে ভালবেসে)। কোন ধার্মিকের ধর্ম বলে যদি এই দুটো তাঁর মাঝে সক্রিয় হয়ে না ওঠে, এই দুটোর প্রাপ্তিযোগ না ঘটে, তাহলে তিনি যত বড়ই ধার্মিক হন, তাঁকে বুঝতেই হবে খাদ্য যেমন ঠিকমত পরিপাক না হলে শরীরে অপকার ব্যতীত কোন উপকার করছে না, ধর্মও ঠিক তেমনিভাবে তাঁর মাঝে বদ্‌হজম হয়ে পরে অপকার ব্যতীত কোন উপকার করছে না, এবং যা সমাজের পক্ষেও হচ্ছে নিদারুণ ক্ষতিকর। তাই পবিত্র কোরআনের শিক্ষানুযায়ী সমগ্র বিশ্ব-মানব একটিমাত্র জাতিরূপেই ধরা দিয়েছে ; তা মানবজাতি।

কোরআন—২ ঃ ২১৩, ১০ ঃ ১৯, ১১ ঃ ১১৮, ১৬ ঃ ১৬, ২১ ঃ ৯২, ২৩ ঃ ৫২

এখানে বোঝা যাচ্ছে ধর্মের বিধি বা বাহন যাই হোক, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য যেন ধার্মিকের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তাই আমাদের মানবসমাজে প্রয়োজন ফলপ্রাপ্ত ধার্মিকের। এটাই ধর্মের মূল কথা। এটাই হবে ধর্মের মূল অবদান। সেখানে জোর-জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ করা বা বিদ্রূপ করা ও বিরূপ সমালোচনা করা কোন ধার্মিকের কাজ তো নয়ই, বরং অধার্মিক ও অমানুষেরই কাজ। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন বলে—"ধর্মে বল প্রয়োগ নেই।" ২ ঃ ২৫৬। "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম। আমার জন্য আমার ধর্ম।" ১০৯ ঃ ৬। ধর্ম সম্পর্কে কোরআন আরও বলে—"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে।" ১১ ঃ ১১৮। "যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তাহলে নিশ্চয় পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সকলেই একযোগে বিশ্বাস স্থাপন করত।" ১০ ঃ ৯৯। কিন্তু তা তিনি করেননি। "আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করেছি, যা তারা পালন করে। সুতরাং ওরা যেন তোমার সঙ্গে এই ব্যাপারে বিতর্ক না করে ; তুমি ওদের তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো। তুমি

তো সরল পথেই আছ।" ২২ ঃ ৬৭। "হে মহম্মদ, তুমি বলে দাও—প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকা বা স্বাভাবিক প্রবণতায় প্রণোদিত হয়ে কাজ করে থাকে এবং তোমার প্রতিপালক তোমার সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত আছেন, যে সুপথে পরিচালিত।" ১৭ ঃ ৮৪। ধর্মীয় দূত সম্পর্কেও কোরআন বলে—"এমন কোন জাতি নেই, যাদের মাঝে কোন সতর্ককারীর আগমন হয়নি।" ৩৫ ঃ ৪, ৩৭ ঃ ১৮১। "প্রত্যেক জাতির জন্য রসুল (দূত) প্রেরিত হয়েছেন।" ১০ ঃ ৪৭। "নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির জন্য রসুল প্রেরণ করেছি।" ১৬ ঃ ৩৬, ১৭ ঃ ১৫। জগতের বিভিন্ন জাতি ও গোত্র সম্পর্কে কোরআন বলে—"হে মানববৃন্দ আমি তোমাদের একই পুরুষ ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি।" ৪৯ ঃ ১৩। "অতঃপর তারা তাদের কার্যসমূহ খণ্ডাকারে বিভক্ত করে নিয়েছে, প্রত্যেক দলের নিকট যা আছে, তাতেই তার পরিতৃপ্তি।" ২৩ ঃ ৫৩, ৩০ ঃ ৩২। সুতরাং "হে বিশ্বাসিগণ, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস বিদ্রূপ করো না।" ৪৯ ঃ ১১। "তারা যাদের বর্ণনা করে, তুমি তাদের সম্বন্ধে কোন দুর্বাক্য বলো না।" ৬ ঃ ১০৮। তাই কোরআন ধর্মের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব মানবমণ্ডলীকে সতর্ক করেছে এই বলে—"নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে, কিন্তু ওরা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করে।" ১০৩ ঃ ২-৩

ধর্মের তিনটি স্তর—(১) অনুশীলন স্তর, (২) অনুভূতি স্তর, (৩) প্রয়োগ স্তর। দেহ ও মনের আনুষ্ঠানিক অনুশীলন অন্তরের অনুভূতি-স্তরে উন্নীত হয়ে জীবনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে ও পদক্ষেপে প্রকাশ পেলে, তাই-ই প্রকৃত ধর্ম এবং তাঁরাই প্রকৃত ধার্মিক।

শ্রেণী গোত্র বংশ মিছে সকলই সমান
সৎশীল মানবের নাহি ব্যবধান।

পরিবর্তনশীল জগতে স্বয়ং স্রষ্টাই যুগে যুগে মানুষের প্রয়োজনে ও কল্যাণে ধর্মের নব নব বিধান পাঠিয়েছেন তাঁর প্রেরিত পুরুষদের মাধ্যমে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কালের বিবর্তনে ধর্মশাস্ত্রের মৌলিক কথা বা মূল আবেদনগুলোকে যথাযথভাবে রেখে তাদের ভাবাদর্শকে মানুষের কল্যাণে ঠিকমত প্রয়োগের জন্যই শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের প্রয়োগেরও কিছুটা পূর্ণ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ ধর্মশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যটাই একদিন ব্যাহত ও বিঘ্নিত হয়। ফলে চলমান গতি তথা অগ্রগতির পথ ও চিন্তার ক্রমবিকাশও রুদ্ধ হয়। তখন ধর্ম একদিন যুগের চাহিদায় আধুনিক সমাজে অন্ধ কতকগুলো কুসংস্কারের পুঞ্জীভূত স্তূপে পরিণত হয়। তখন সমাজ-নদী কূপ রূপ ধারণ করে। স্বয়ং মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ধর্ম সম্পর্কে খুব একটা বাড়াবাড়ি মোটেই পছন্দ করতেন না। বিশ্বদূত মহম্মদ (দঃ) বিশ্বমানবকে গ্রহণ করেছিলেন বিশাল বুকে। কোরআন বলে—"তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।" ৪ ঃ ১৭১। "পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে তোমাদের কোন পুণ্য নেই।" ১ ঃ ১৭৭। "পুণ্য শুধু এক অদৃশ্য শক্তি (আল্লাহ্)-তে বিশ্বাস এবং সৎকাজ। এটাই হল ধর্মকথার মর্মবাণী।" ২ ঃ ৩, ২৫, ৬২, ৮২, ১১২, ১৫৯।

ইসলামের জান্নাত বা স্বর্গ কোন ধর্মের ধর্মশালা, বা কোন রাজনৈতিক পার্টির পার্টি অফিস নয়। এটা সমগ্র বিশ্বের তামাম সৎ-মানুষের জন্য। ২৯ ঃ ২২, ৩৫, ৫১ ঃ ১৫-১৯, ৭০ ঃ ২২-৩৫।

জান্নাত

সৃষ্টির সেরা মানুষের লাগি মহা স্রষ্টার উক্তি—
মহানের কাছে মানুষের শুধু সংশীলতায় মুক্তি।
ঐশী কোরআন কাহারে দিয়েছে স্বর্গলাভের খত্‌টি
ধর শুধু সেই স্বর্গগামী মহাজীবনের পথটি।
মানুষে মানুষে নাহি ভেদাভেদ দেখ কোরআনের যুক্তি—
বিশ্বজোড়া সৎ মানুষের সবারে দিয়েছে মুক্তি।
নাহি জাতপাত নাহি দেশকাল ইসলামের যেটি গর্ব—
বিশ্বমানব সংশীলতায় পেয়েছে তাহার স্বর্গ।
সংশীল হওয়ার মূল কথাটি ভালবাসা আর ভক্তি
নাহি যেথা কোন দেশের সীমা জাতবিচারের যুক্তি।
সৃষ্টির সেরা করিয়া যাদের গড়িলে মানবসমাজ
মানুষের দ্বারে দুটি দাবি তব বিশ্ব রাজাধিরাজ—
আল্লাহর দাবি করিলে পূরণ বান্দার আছে মুক্তি—
সৃষ্টির লাগি ভালবাসা আর স্রষ্টার তরে ভক্তি।
উত্থান দিনে হাশরের মাঠে পাবে যারা তাঁর সাক্ষাৎ
কোরআনের কথায় ঘোষণা শুধু সৎ মানবের জান্নাত।

—কাব্যকানন

পূর্বাভাস

মহানবীর মূল লক্ষ্য

আমার কোরআন শরীফের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় "ঐশী অনুধাবনে" মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে কিছুটা আলোকপাত করতে হয়েছে যা পাঠক-পাঠিকাদের দ্বারা উচ্ছ্বসিতভাবে প্রসংশিত হয়। সেই সূত্র ধরেই বহু পাঠক-পাঠিকা, বহু বন্ধু-বান্ধব এবং অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী আমাকে অনুরোধ করতে থাকেন—আমি যেন মহানবীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রণয়ন করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ও মহানবীর জীবনী প্রণয়নের আবশ্যকতা বারবার অনুভব করেছি আপন মনে ও স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক তাগিদে। তাই কয়েক খণ্ডে ইসলামের ইতিহাস লেখার মানসিকতা নিয়ে প্রথম খণ্ডরূপে মহানবীর জীবনী প্রণয়নে প্রয়াসী হয়েছি। এ ব্যাপারে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই আচার্য সুকুমার সেনও উৎসাহিত করেছেন।

আমি মনে করি, এই পবিত্র জীবনী-গ্রন্থ রচনা দ্বারা কাউকে খুশি বা অখুশি করা আমার কর্তব্য নয়। এখানে আমার একমাত্র কর্তব্য—কোন দিক দিয়েই প্রভাবান্বিত না হয়ে এবং পবিত্র কোরআনকে ভিত্তি করে এক পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে মহানবীর জীবন বর্ণনা করা। যদিও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তিনি আপন কাজের দ্বারাই যুগ যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ইতিহাসে সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রিয়জন হয়ে থাকবেন, কারও বর্ণনা দ্বারা নয়।

একথা বলতেও গর্ব বোধ করি যে, সাবালকত্ব প্রাপ্তির আগে থেকেই পবিত্র কোরআন ও হাদিস আমার জীবনে এক অবর্ণনীয় উচ্চস্থান অধিকার করে আছে। আল্লাহ্‌র পবিত্র "কোরআনই মহানবীর চরিত্র"। সুতরাং মহানবীর জীবনী পবিত্র কোরআন ভিত্তিক হওয়াটা যে একান্ত প্রয়োজন, এতে আমার এতটুকুও দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই। তাই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি পবিত্র কোরআনের নিকট প্রাথমিকভাবে ঋণী ও কোরআন শরীফই আমার শেষ পন্থা ও পথের আলো। এছাড়াও মহানবীর বাণী পবিত্র হাদিসও যথেষ্টরূপে ব্যবহার করেছি। তার সঙ্গে বহু লেখকের লেখাও পড়েছি, সবার কাছে ঋণ স্বীকার করি।

আলোচ্য গ্রন্থে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের পরস্পর-বিরোধী জটিল কচকচানি আমি সম্পূর্ণ পরিহার করার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি, তা এখানে অবান্তর। এই গ্রন্থ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্য—তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভরশীল ইতিহাসমূলক একটি জীবনীগ্রন্থ। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, যে কেউ এই গ্রন্থ পড়তে পারবেন, যে কোন রকমের অস্বস্তিকর মানসিকতা মুক্ত হয়ে। কেননা, আমি এমন এক মহানবীর জীবনী লিখছি, যিনি জীবনে কাউকেই ঘৃণা করেননি, কোন প্রত্যাদিষ্ট ধর্মকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেননি, কোন জাতিকেই হীন মনে করেননি। মহানবীর এই উদার জীবন-দর্শন প্রতিটি ভারতীয় ও বিশ্ববাসী মুসলমানের এবং সমগ্র মানবসমাজের অবশ্য অনুসরণীয় বলে মনে করি, যাতে তাঁরা আপন ধর্মকে যথাযথভাবে পালন করেও সকলের সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে পারেন।

আলোচ্য গ্রন্থে তাই মহানবীর জীবন, চরিত্রকে যেমন ছোট করাও হয়নি, তেমনি তাঁর

চরিত্র নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করাও হয়নি। কেননা বাড়াবাড়ি, তোষামোদি, মনোরঞ্জন ও অতিরঞ্জনকে মহানবী জীবনে একদিনও পছন্দ করেননি। তাই এগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করা হয়েছে। মহানবী (দঃ)-কে সবসময় মানুষ রূপেই দেখা হয়েছে, যেরূপে দেখতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যেভাবে দেখতে নির্দেশ দিয়েছে পবিত্র কোরআন—"আমি তোমাদের মতোই একজন মানুয, তবে আমার প্রতি (আল্লাহ্‌র ওহি নাজেল) প্রত্যাদেশ হয়েছে।" —১৮ ঃ ১১০।

স্বয়ং স্রষ্টা পরম করুণাবশত তাঁর সৃষ্টিজগৎকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গতিহীন বদ্ধ সমাজজীবনকে গতিময় করার নিমিত্ত পথ দেখানোর জন্য মাঝে মাঝে এক একজন পথপ্রদর্শক পাঠিয়েছেন, যাঁরা নবী বা রসুল (দূত) নামে অভিহিত। তাঁদের পথ ও মতকে কেন্দ্র করে এক-একটি ধর্মের আবির্ভাব। এইভাবে স্রষ্টারই আপন কথায় হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে সর্বশেষ নবী বা রসুল রূপে পাঠিয়েছেন। কেননা তিনি খাতেমুন নাবিয়িন, অর্থাৎ সমস্ত নবীগণের শেষনবী বা সিলমোহর যুক্ত নবী। কোরআন—৩৩ ঃ ৪০। এবং তিনি সাইয়েদুল মোরসালিন, অর্থাৎ সকল প্রেরিত পুরুষগণের সর্দার বা নেতা। তাই মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) স্রষ্টার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দূত।

ইসলাম জগতের মহান কাণ্ডারী হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন অখণ্ড মানবসমাজের দরিদ্র মানুষ ও অভাগা রমণীকুলের ত্রাণকারী ও দরদী বন্ধু, দুর্গত মানবতার উদ্ধারকারী চিরমহান দূত, মরুর কল্যাণে মরু দুলাল, দুর্লভ মানব জন্মে মহাপুরুষ, মানুষের চিন্তায় মহামানব, জন্মের ক্ষণে ক্ষণজন্মা, শান্তি ও সাম্যে মহাসেনা, সমাজ-সংস্কারে শ্রেষ্ঠ সংস্কারক, দুর্জয় সাধনায় সিদ্ধ সাধক, ক্ষমার দরবারে দয়ার সাগর, প্রেম ও ভালবাসায় পরমপুরুষ।

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রধান ব্রত ও লক্ষ্য ছিল—এই বিশ্ব চরাচরে সকল মানুষের মাঝে বিশ্ব-স্রষ্টার বন্দনা হোক, এবং সেই এক বিশ্ব-স্রষ্টার অধীনে তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে উঠুক। যার জন্য অনুভব করেছিলেন—সকল জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষ রচিত কৃত্রিম ব্যবধানগুলোর মূলোচ্ছেদ করা এবং স্থাপন করা সর্বজনগ্রাহ্য একটি ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক আদর্শ জীবনধারা।

ইসলামধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ শেষ দূত ও প্রচারক হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর চিন্তাধারাকে তদানীন্তন বিশ্ব-সমাজের যে দুটো জিনিস সর্বাপেক্ষা বেশি আলোড়িত করেছিল এবং যে দুটো জিনিসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ও লক্ষ্য সবচেয়ে বেশি নিবদ্ধ হয়েছিল, ওই দুটো ছিল—সমাজের দরিদ্র মানুষ ও অবহেলিত নারী-সমাজ। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে ও তার বিধিব্যবস্থা করতে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ ও অতিবাহিত করেছিলেন। এইভাবে সমগ্র মানবসমাজকে সৎ ও সুন্দরের সঙ্গে পরিচালনা করতে তার বিধিব্যবস্থায় এসেছিল ধর্মের নানাবিধ বিধান, আদেশ ও নিষেধ। কিন্তু মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র আল্লাহ্‌র আরাধনা-সহ সমুন্নত সমাজ ব্যবস্থা।

এই গ্রন্থের পঞ্চম পর্বে মহানবীর চরিত্রে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ওই সময়ের কুখ্যাত আরবের সমাজ-জীবনে কিভাবে নানা কাজের মাধ্যমে গোলাপের পাপড়ি ছাড়ার মতো একটির পর একটি ফুটে উঠেছে, তা প্রায় শতকের মতো দৃষ্টান্তের সাহায্যে

দেখার চেষ্টা করেছি। পঞ্চম পর্ব লেখার জন্য আমার প্রতি দু'জনের নির্দেশ ছিল। একজন আমার জান্নাতবাসী পিতা, অন্যজন আমার প্রয়াত শিক্ষক ভারতের জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের বলতে শুনেছি—"অনেকেই মহানবীর জীবনী পড়েন, কিন্তু তাঁর জীবনকে বোঝেন না।" মহানবীর জীবনকে বোঝানোর জন্যই তাই এই পঞ্চম পর্বের অবতারণা। তাঁদের নির্দেশ পালনের চেষ্টা করেছি। সক্ষম হয়েছি কিনা, সে বিচারের ভার রইল পাঠকদের ওপর।

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ইসলামধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও প্রধান প্রচারক। তিনি যে ইসলামধর্মের শেষ নবী, সেই ইসলামধর্ম এবং তাঁর জীবনদর্পণ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মূল তথ্য ও তত্ত্ব জানা থাকলে মহানবীর মহাজীবনকে সহজে উপলব্ধি করা যায়। কেননা অধিকাংশ সময় মহাপুরুষগণ যে ধর্মের প্রচার করেন পরবর্তীকালে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এবং যুগের হাওয়ায় তার বিকৃতি ঘটতে দেখা যায়। তাই মহানবীর মহান আদর্শকে যথাযথভাবে অনুভব করার জন্য প্রথমেই তাঁর ব্রত ও ব্রতের অর্থাৎ ইসলামের মূল লক্ষ্য বা মৌলিক আবেদন ও মূল অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে পূর্বাভাসে 'সমাজ সংস্কারের পটভূমিকায় মহানবী' এবং 'ইসলাম জগৎ ও বাস্তব সমাজ' নামে কিছুটা আলোচনা রাখলাম।

সমাজ সংস্কারের পটভূমিকায় মহানবী

সুবিশাল ইসলাম-জগৎ দেহগতভাবে বা শাস্ত্রীয় বিধিবিধান অনুসারে প্রধানত পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা—(১) কালেমা, (২) নামায, (৩) রোযা, (৪) যাকাত ও (৫) হজ্জ। আমি আমার "কাব্যকানন" গ্রন্থে ও গ্রন্থ ভূমিকায় ইসলামের দেহাতীত চির প্রবাহিত প্রাণশক্তিকে পৃথক পাঁচটি ভাগে দেখার চেষ্টা করেছি।

ইসলামের শেষ নবী ও প্রচারক মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর কামনা ও বাসনার আত্মতীরে অমোঘ ইচ্ছার ও মহান ব্রতের যে বেগবান নদী বিশ্বযোজনার পথে চির প্রবাহিত, সেই সুদূরপ্রসারী কালজয়ী সুবিশাল সুবিস্তীর্ণ গতিধারাকে অতি সংক্ষেপে সহজে বোঝার বাহন রূপে এখানেও অনুরূপ চেষ্টা করেছি।

বিশ্বজোড়া মানবতার তরী যখন পঙ্কিল জলরাশিতে ডুবন্ত-প্রায়, মনুষ্যত্বের প্রদীপ যখন প্রবল ঝঞ্ঝা-ঝটিকায় নিভন্ত-প্রায়, ঠিক এ হেন কালে সত্য ও সুন্দরের পথে, শান্তি ও সাম্যের সঙ্গে দিব্যজ্ঞানের আলোকবর্তিকা হস্তে নিয়ে যাতনাময় আঘাতকারী সংসারের সকল যন্ত্রণা আঘাতকে অবলীলায় অগ্রাহ্য করে ও সহ্য করে সৃষ্টির কল্যাণে স্রষ্টার কল্যাণ দূত মহানবী যে আপসহীন আমরণ অভিযান শুরু করেছিলেন, এখানে 'মহানবীর জীবন দর্পণ' নামক ক্ষুদ্র অধ্যায়ে সারা বিশ্বের সেই মহাবিস্ময় বিপ্লবী মহানবীর পূত পবিত্র জীবনাকাশের অতি উজ্জ্বলতম অক্ষয় অবিচল চিরদীপ্তমান নক্ষত্র স্বরূপ মহাজীবনের মহান ব্রতের চিরধীর চিরস্থির লক্ষ্যগুলোকে শাস্ত্রীয় কচকচানির ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবের মুক্তিতে বিবদমান অধমান অখণ্ড মনুষ্যজাতির শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধিতে বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ সমাজ-সংস্কারের পটভূমিকায় প্রধানত পাঁচ ভাগে দেখার চেষ্টা করলাম—(১) মহানবীর জন্ম-রহস্য, (২) জীবন ধারা, (৩) জীবন ব্রত, (৪) জীবন দর্শন, (৫) জীবন বাসনা।

মহানবীর জন্ম-রহস্য ও জীবন দর্পণ

॥ দরুদ শরীফ ॥

জন্ম যখন মরুজগতে ধরার মাটি ধন্য
পথহারা এক হরিণী তখন বিশ্ব তোমার জন্য।
তোমার কথা বলতে গিয়ে বলেন আল্লাহ্ ফেরেশ্‌তাগণ
মহান খোদার নূর যে তুমি তোমার নূরে বিশ্ব-সৃজন।
অপূর্ব এক সৃষ্টি যোগে বিশ্ব সৃষ্টি পূর্ণ হয়
মানবাকাশে তোমার উদয় চন্দ্রও যেথা মলিন রয়।
জীবনসূর্চার সূচনা হতে তোমার শুভ সকল কাজ
শুচির বাগে সুন্দরেতে গোলাপে যেন দিতেছে লাজ।
জ্ঞানের আলোয় জ্ঞানজগতে বিশ্বাকাশে সূর্যোদয়
শান্তি দানে সংসারেতে মানবাকাশে চন্দ্রোদয়।

বিশ্বজোড়া মানবতার রুখে দিয়ে মৃত্যুবাণ
মরণমুখী মনুষ্যত্বে সঞ্চারিলে বীরের প্রাণ।
তোমার কথা বলতে গিয়ে জাগে প্রাণে শিহরণ
তোমার জনম জন্ম দিল মানবতার জাগরণ।
ভাবাতীত তুমি ভুবনের মাঝে তোমারে করিয়া গণ্য
অন্তরে মোর দরুদ্ ও সালাম্ অর্জন করি পুণ্য।
নির্জন মনে স্মরিয়া তোমায় নিজেরে করি হে ধন্য
জন্ম তোমার এই ধরাতে মানব-মুক্তির জন্য।
তোমার কথা বলতে গিয়ে বলছে ধরার মহৎ জন—
চরিত্রে তুমি সাধনায় তুমি সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ ধন।
বিশ্বস্রষ্টা পথ দিয়েছেন বিশ্ববাসীর জন্য
সব সমস্যার শেষ সমাধান পথ নাই তুমি ভিন্ন।
'আখেরী নবী' আল্লাহর দূত আসিবে না আর অন্য
জন্ম তোমার এই জগতে জগৎ-মুক্তির জন্য।

কোরআন—৩ ঃ ১৪৪, ৪ ঃ ১৬৫, ৫ ঃ ১৫, ৭ ঃ ১৫৮, ১৭ ঃ ১০৫, ২১ ঃ ১০৭, ২৫ ঃ ৫৬, ২৬ ঃ ৮, ৩৩ ঃ ৪০, ৫৬, ৩৪ ঃ ২৮, ৪১ ঃ ৬, ৪৮ ঃ ২৯, ৬১ ঃ ৬, ৬৮ ঃ ৪

বিঃ দ্রঃ—বিনীত চিত্তে কায়মনোবাক্যে কয়েকবার দরুদ শরীফ পাঠ করে প্রার্থনা করলে প্রার্থনা সত্বর মঞ্জুর হয়।

॥ মহানবীর জীবনধারা ॥

১—৪০ বছর বয়ঃক্রম ঃ

মক্কার সাধারণ জীবন ঃ

মহম্মদ মানুষ তবে নিজ সাধনায়
সমগ্র জীবনে যাঁর মিথ্যা কথা নাই।
জীবন গোধূলিলগ্নে নহ আল্লাহ্‌ময়
দেব নও দূত নও তুমি সত্যময়।

৪০—৫৩ বছর বয়ঃক্রম ঃ

মক্কার নবী-জীবন ঃ

মহম্মদ মানুষ তবে যাঁর পর নাই
মিথ্যার অধিক শত্রু দীনদুনিয়ায়।
জীবন বিপন্নময় অন্ধকার রাতে
সন্ধি কভু কর নাই অজ্ঞতার সাথে।

মহম্মদ মানুষ তবে এক অপরূপ
সত্যেরে করেছ তুমি আপন স্বরূপ।
সত্য ছাড়া সংসারের মানবসেবায়
সমগ্র জীবনে তব তিল ঠাঁই নাই।

৫৩—৬৩ বছর বয়ঃক্রম ঃ

মদিনার নবী-জীবন ঃ

সত্যেরে দিয়েছ প্রাণ হেন অপরূপ
অরূপ সত্যের তুমি ধরেছ স্বরূপ।
সত্যের সন্ধানে শিশু চির দীপ্তময়
নবী ও রসুল হয়ে পরে আল্লাহ্‌ময়।
মহম্মদ মানুষ তঁবে জগৎ সেবায়
মানব জীবনে যাঁর মিথ্যা কিছু নাই
সত্যের মহান রূপ মহামহিমায়।

কোরআন—২৬ ঃ ১০৭, ১২৫ ১৫৩, ১৬২, ১৭৮

॥ মহানবীর জীবনব্রত ॥

পরকালের পুণ্যালোকে
বিশ্বস্রষ্টার মহানবী
বিশ্ব-সমাজ সংস্কারের
শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী,
ইহকালের অন্ধকারে
সন্ধিবিহীন সংগ্রামে
জ্বালিয়ে দিলে আলোর শিখা
বিশ্বস্রষ্টার পুণ্য নামে।
পরলোকের পাথেয় দিলে
পুণ্যশ্লোক মহানবী
ইহলোকের বিধান দিলে
বিশ্বসমাজ বিপ্লবী।
মনের কোণে দেখেছি তোমার
দুইটি ছিল আরাধনা—
সাম্যের বুকে সমাজ গড়া
প্রতিপালকের বন্দনা

ধরার বুকে কোরআন প্রচার
পবিত্র তোমার পেশা
মানবজাতির উত্থান ছিল
একটি তোমার নেশা।
বিশ্ববুকে তোমার ব্রত
বিশ্বপিতার বন্দনা
সেই পিতারই সন্তান সবে
এক অভিন্ন ভাই জানা।

কোরআন—১ ঃ ১-৭, ২ ঃ ১১৮, ২৮৪, ৩ ঃ ১১০, ১৪৪, ৮৮ ঃ ২১, ২২

॥ মহানবীর জীবন দর্শন ॥

ব্যক্তি-জীবনে ঃ নিখিল-মানবে সাবধান বাণী
মহানবীর হুঁশিয়ার
কোন মানুষের কিছু নাই কারো
চেষ্টা ব্যতীত তার।
তোমার ভাগ্য তোমারই হাতে
বিধাতা সাধে না বাদ
সাধনার শ্রমে সুপ্ত আছে
বিধাতার আশীর্বাদ।

কোরআন—৫৩ ঃ ৩৯-৪১, ৬৭ ঃ ১-২

সমাজ-জীবনে ঃ পুরুষ-রমণী সমাজ পাখি
ইসলামের হুঁশিয়ার
একটি ডানায় নাহি থাকে বল
আকাশেতে উড়িবার।
যুবক যুবতী ভেদাভেদ নাই
উন্নত পরিবার
উভয়েরই শ্রম সাধনার দ্বারা
গড়িবে এ সংসার
এক যদি মহীয়ান তবে
অন্য সে মহীয়সী
এক যদি গরীয়ান তবে
অন্য সে গরীয়সী।

কোরআন—৪ ঃ ৩৪

জাতীয় জীবনে ঃ জাতীয় জীবনেও কারো কিছু নাই
কোরআনের হুঁশিয়ার
চেষ্টা ব্যতীত, সততা ব্যতীত
সাধনা ব্যতীত তার।
নিঃসংকোচে নিখিলের বুকে
ঘোষণা করেছে কোরআন
জাতির ভাগ্য জাতিরই হাতে
জাতি আনে উত্থান।
হাদিস, কোরআন—১৩ ঃ ১১, ৫৩ ঃ ৩, ৮৯ ঃ ৫৩

বিশ্ব-জীবনে ঃ ইসলামের মূলমন্ত্র করিলে মন্থন
এক-ই পিতার পুণ্যে মোরা ভাই বোন
কোরআন হাদিস মূলে শিক্ষা যেটি পাই
এক-ই মায়ের কোলে মোরা ভাই ভাই।
কোরআন—৪ ঃ ১, ৭ ঃ ১৮৯

॥ মহানবীর জীবন সাধনা ॥

এ ধরার মালিকানা জগৎ-পিতার
সকল সম্পদ হতে সবকিছু তাঁর।
শিখাইলে মানুষেরে স্রষ্টা সবাকার
সৃষ্টিকুলে সকলের সম অধিকার।
এ জগতে আছে যদি রাজ-সিংহাসন
সর্বহারা মানুষের হৃদয় আসন।
বলে নাই জোর নাই জাতির জনক
মানুষই করিবে ঠিক মানব সেবক।
শিখাইলে মানুষেরে মান-মানবতার
জগতের গণতন্ত্র সাম্য অধিকার।
যে-করেছে তারে তোরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বল্
মানুষের সেবা আর মানব মঙ্গল।
যে জন করেন তিনি মানব মহান
মানুষের সেবা আর মানব কল্যাণ।
সর্বশেষ উচ্চারিত যে সতর্কবাণী
অন্তিম শয়নে
'সাবধান, অসহায় গরিব মানুষ,
নামায স্মরণে।
হাদিস, কোরআন—২, ঃ ২৮৪, ৩ ঃ ১১০, ১০৭ ঃ ১-৭

ইসলাম জগৎ ও বাস্তব সমাজ

অর্থনৈতিক সমাজ-সংস্কারের পটভূমিকায় ইসলামে মহানবীর আবেদন

ইসলামের মূলমন্ত্রে কৃতকার্য তিনি,
স্রষ্টায় বিশ্বাস রেখে সৎশীল যিনি।
কোন্ বলে ইসলামের স্বর্গ পেল কারা,
স্রষ্টায় বিশ্বাস রেখে সৎশীল যারা।

কোরআন—২ ঃ ২৫, ২১ ঃ ৯২-৯৪, ২২ ঃ ১৪, ২৩, ৫০, ৫৬, ২৩ ঃ ৫৭-৬১,
২৪ ঃ ৫৫, ২৭ ঃ ৮৯, ২৮ ঃ ৮০, ২৯ ঃ ৭, ৯, ৩০ ঃ ১৫, ৩১ ঃ ৮,
৩২ ঃ ১৯, ৩৪ ঃ ৪, ৭, ৩৫ ঃ ৭, ৪০ ঃ ৪০, ৪১ ঃ ৮ ৪২ ঃ ২২, ২৩,
৪৪ ঃ ২১, ৪৭ ঃ ১২, ৪৮ ঃ ২৯, ৬৪ ঃ ৯, ৮৭ ঃ ১৪, ১০৩ ঃ ৩

ইসলাম কি?

(১) অরূপ সত্য যখন কোন কিছুকে কেন্দ্র করে রূপের মধ্যে স্বরূপ হয়, তখন তা বাস্তব। ইসলাম এই বাস্তবের জন্মদাতা। সেখানে কোন কল্পনার অবকাশ নেই, যেখানে সংসার-জীবনে, সংসার ধর্মে, জীবনের স্বাভাবিক চাহিদাগুলোতে কোন স্ববিরোধ নেই। তাই ইসলাম বাস্তব সমাজের মানব জীবনের সহজাত ধর্ম।

(২) ইসলাম একটি চরম ভারসাম্য রক্ষাকারী ধর্ম। সে জীবে দয়া করতে বলে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উৎসব অনুষ্ঠানে তাকে জবাই করতেও অনুমতি দেয়। সে মানুষকে সংযমী হতে বলে, কিন্তু বিবাহ করে রমণী-সংসর্গ লাভ করতেও উৎসাহিত করে। ইসলামে সন্ন্যাস নেই। সে ধনী হতে বলে, কিন্তু ধনকুবের হতে নিষেধ করে। তাই ইসলাম মানব সমাজে, মানব জীবনে চরম ভারসাম্য রক্ষাকারী ধর্ম।

(৩) ইসলামের দর্শন মূলত তিনটি। (ক) তার আপসহীন ঘোষণাতে আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় উপাস্য। (খ) মানব জাতি এক ও অভিন্ন, সেখানে কোন ভেদাভেদ নেই। (গ) তার ধর্ম মূলত ইন্‌সানিয়াত ও ইখ্‌ওয়ানিয়াত অর্থাৎ মনুষ্যত্ব ও ভ্রাতৃত্ব।

মুসলমান কে?

সত্য ও সুন্দরের বুকে দাঁড়িয়ে, দিন-রাত সহজ ও সরল পথে চলতে চলতে গোপনে ও প্রকাশ্যে বিনীত চিত্তে আল্লাহ্‌র দরবারে চরম আন্তরিকতার সঙ্গে আত্মসমর্পণকারীই মুসলমান। আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণকারী যেমন মুসলমান এবং রিপুর নিকট তেমনি আত্মসমর্পণকারী শয়তান। সে যে জাতেরই হোক।

মুসলমানের দৃষ্টিতে ইসলাম ঃ প্রাণের শান্তি, শুদ্ধি এবং সাধক প্রাণের আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ ও আল্লাহ্‌র বিধানে অবিচল আনুগত্য প্রকাশ, এরই নাম ইসলাম। একদিকে সে (ইসলাম) আল্লাহ্‌তে পবিত্র প্রাণের অটল নির্ভরতা, আবার অন্যদিকে শুদ্ধ সংগ্রামী জীবনের কঠিন হতেও কঠোরতম সাধনা। সুতরাং ইসলামকে পেতে হলে, ইসলামের আল্লাহ্‌কে চিনতে হলে, জানতে হলে, ধরতে হলে বা জয় করতে হলে চাই পবিত্র প্রাণের নির্ভরতা ও শুদ্ধ প্রাণের সাধনা, চাই চরিত্র বল, কর্ম বল, চাই মনোবল। ইসলাম জগতের তথা পবিত্র কোরআনের সর্বাপেক্ষা বড় দর্শন পরিলক্ষিত হয় তার একটি মাত্র বাক্যেই, বিশাল গ্রন্থ মন্থন করতে হয় না। পবিত্র কোরআন বলে—"যে নিজেকে পবিত্র করেছে,

সে-ই সফলকাম হয়েছে, এবং যে নিজেকে কলুষিত করেছে, সে-ই অকৃতকার্য হয়েছে।" ৯১ ঃ ৯-১০। এখানে কোন জাতি, বর্ণ বা ধর্ম, কারো কথা বলা হয়নি। এখানে সে সম্বোধন করেছে মানবমাত্রকেই।

ইসলামের আল্লাহ্‌কে পাওয়ার অর্থই হল—জীবনের পূর্ণতাকে পাওয়া, জীবনকে পূর্ণ করা। অতএব ইসলামের আল্লাহ্‌প্রাপ্ত মানুষ মানেই এ জগতের পূর্ণ মানুষ, এ সংসারের সিদ্ধপুরুষ শুদ্ধ মানব, সাধ্বী রমণী। এই কারণেই ইসলাম মানুষকে পূর্ণ মানুষ করার নিমিত্তই তাকে আল্লাহ্‌প্রাপ্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। এটা আল্লাহ্‌র জন্য নয়, মানুষের কল্যাণের জন্যই। তাই মানুষের আল্লাহ্‌প্রাপ্তি হল মানবাত্মার বিকাশপ্রাপ্তি, মানুষেরই কল্যাণপ্রাপ্তি।

কোরআন—১০ ঃ ১০৮, ১৭ ঃ ৭, ৫৩ ঃ ৩৯, ৮৭ ঃ ১৪, ৯১ ঃ ৯-১০

প্রকৃত মুসলমান কারা? ঃ ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ শান্তি বা সমর্পণ, পরিভাষাগত অর্থ একটি ধর্মের নাম। ইসলামধর্ম সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট উক্তি—"নিশ্চয় ইসলাম (শান্তি) আল্লাহ্‌র নিকট মনোনীত ধর্ম।" ৩ ঃ ১১। তাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ—"হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা পূর্ণভাবে ইসলামে (শান্তিতে) প্রবিষ্ট হও।" ২ ঃ ২০৮। মানুষের সমাজজীবনে যে কোন প্রকার অশান্তির আশঙ্কায় ইসলাম তথা কোরআন ঘোষণা করেছে—"ধর্মে বল প্রয়োগ নেই।" ২ ঃ ২৫৬। অধিকন্তু শুধু শান্তি রক্ষার জন্যই কোরআন আবার ঘোষণা করেছে—"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।" ১০৯ ঃ ৬। এখানে দেখা যাচ্ছে ইসলামের শান্তিই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র বাঞ্ছিত ধর্ম। বাকি শান্তিহীন সবকিছুই তাঁর নিকট অবাঞ্ছিত। সুতরাং ইসলামই আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম যেখানে আছে অনাবিল শান্তি। অতএব অশান্ত পরিবেশে, শান্তিহীন পরিজনে ইসলামকে পাওয়া বা লাভ করা প্রায় অসম্ভব।

ইসলামের দৃষ্টিতে সংসার-জীবন ঃ ইসলাম একটি নিরপেক্ষ ধর্ম, শান্তির ধর্ম। ধর্ম বলতে আমরা আজকাল সাধারণত যা বুঝি—পারলৌকিক কল্যাণের জন্য কতকগুলো নীতির বাঁধন, আড়ম্বর-অনাড়ম্বর কতকগুলো অনুশাসন। জগতের প্রতি কথায় অনীহা প্রদর্শন, সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ভাবদর্শন। এ জীবন মিছে, এ জগৎ অসার। দুদিনের খেলাঘর মাত্র। কিন্তু ইসলামধর্ম তা নয়, জগতের এমন কোন দিক নেই, যে দিকে তার সজাগ দৃষ্টি পড়েনি—যে দিককে সে অস্বীকার করেছে। শিশুকাল হতে বার্ধক্য পর্যন্ত মানুষের জীবনে এমন কোন অধ্যায় নেই যেখানে সে মানব-সন্তানকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সফল করার আহ্বান জানায়নি। সংসার-জীবন ও সংসার গঠনে কঠিন পৌরুষপ্রাণ ও কোমল নারী হৃদয়কে দিয়েছে সম্মান ও সমান মর্যাদা। ধর্মের কোন বাহানা যোগে প্রীতির বন্ধনে, নরনারীর বিবাহে দেয়নি কোন বাধা, মিলনে দেয়নি বিপত্তি। পুরুষকে যেমন দিয়েছে পিপাসা, নারীকে তেমনি দিয়েছে নিবারণ সুধা। ব্যভিচারে দেয় প্রাণদণ্ড, বিবাহতে দেয় উৎসাহ, কি অপূর্ব বিধান।

সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণে ইসলামধর্মের যে শাশ্বত নীতি, তা ধর্মের বাহ্যিক আচরণ অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরকে কেন্দ্র করে যতটা, তা অপেক্ষা বহুগুণে বেশি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক আচরণ ও সদ্‌গুণাবলীকে কেন্দ্র করে। বরং অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়—প্রাণহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠানের অকারণ ও অন্ধ ব্যাখ্যায় ইসলামের প্রাণপ্রদীপ প্রায় শ্বাসরুদ্ধ। ইসলামের যে বাস্তব চাহিদা, যে জীবন-ক্ষুধা, যে অভিষ্ট কামনা, মোটেই তা নয়। বরং তার যে ব্রত, যে লক্ষ্য তা স্রষ্টাকে স্মরণ করা। সৃষ্টির সেবা করা। দুর্লভ মানবজীবনকে

সত্যময় করা, সুন্দর করা, সফল করা, অর্থাৎ জীবনকে পূর্ণ মর্যাদা দান করা। ইসলাম তার দুবাহু দুদিকে মেলেছে। এক হাত তার প্রসারিত হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে, অন্য হাত তার বিশ্ব-মানবের ওপর। তাই ইসলাম এক হাতে যেমন প্রকৃতির ধর্ম, অন্য হাতে ঠিক তেমনি মানুষের ধর্ম, তার প্রাকৃতিক বর্ণনায় প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম বস্তুটিও অবহেলিত হয়নি, অপরদিকে সে মানবতার বাণী বহন করে এনেছে। যেখানে মানবসমাজের নিকৃষ্টতম পাপী-তাপীও তাঁর দয়ার দৃষ্টি এড়ায়নি, এমনি তার উদার মতবাদ ও মানবতাবাদ। এই দিক দিয়ে ইসলাম নিছক একটি গোত্রের শুধুমাত্র পারলৌকিক কল্যাণের পথ ও পন্থাই নয়। তার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা—অদৃশ্যে বিশ্বাস ও সৎকাজ, জীবনব্যবস্থা ও জীবন চেতনা যা মানব মাত্রকেই দেয় সত্য ও সুন্দরের পথে এক উন্নত জীবন প্রণালী।

ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ ঃ ইসলামের আল্লাহ্‌র আভিধানিক অর্থ বিশেষ উপাস্য। এটা কোন বিশেষ কিছুর নাম নয়, আল্ + এলাহ = আল্লাহ্। আরবী 'আল' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'টি' 'টা', ইংরেজিতে 'দি' এবং 'এলাহ' শব্দের অর্থ উপাস্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র অর্থ বিশেষ উপাস্য বা এক উপাস্য।

ইসলামের আল্লাহ্ = নূর অর্থাৎ আলো, কেননা আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের আলো স্বরূপ। আবার আলো হচ্ছে 'ইল্‌ম' অর্থাৎ জ্ঞান ; কেননা মহানবী বলেন—জ্ঞানই আলো।

জ্ঞান হচ্ছে 'কদর' অর্থাৎ শক্তি, যেহেতু আল্লাহ্ যাকে জ্ঞান দান করেন, তাকে মহাসম্পদ দান করেন। 'কদর' হচ্ছে আল্লাহ্, কেননা আল্লাহ্ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান। মানুষ তাঁর খলিফা প্রতিনিধি মাত্র, কাজের অসিলা (নিমিত্ত) মাত্র।

ইসলামের আল্লাহ্ শুধু মুসলমানদের নয়, শুধু মানুষের নয়, বরং সারা বিশ্বের প্রতিপালক। "বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা।" ১ ঃ ১। "যিনি পরম দয়ালু দয়াময়, বিচার দিনের মালিক।" ১ ঃ ২-৩

ইসলামে আল্লাহ্‌র আসন দুটি। কিন্তু তার কোন আসনটিই মক্কা, মদিনা বা বাগদাদে নেই। যেমন অনেকেই ধারণা করেন ঈশ্বর আছেন কাশী, বৃন্দাবন বা মথুরাতে। তাঁর একটি আসন সসীম, অন্যটি অসীম। সসীম আসনটি বিশ্বাসী মানব অন্তরে বিরাজিত। স্বয়ং মহানবী (দঃ) বলেন—"বিশ্বাসীদের অন্তর আল্লাহ্‌র আরশ বা আসন।" ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য জগতেও কথাটি সুন্দরভাবে স্থান পেয়েছে ঃ

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর। —গীতাঞ্জলি ঃ ১২০

তোমার মিলন শয্যা হে মোর রাজন
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন। —নৈবেদ্য ঃ ২৭

তাঁর অসীম আসনটি সর্বত্র বিরাজিত। পবিত্র কোরআন বলে—"তাঁর আসন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।" ২ ঃ ২৫৫। ভারতীয় বেদান্তেও ওই একই সুর ধ্বনিত—"অনন্তং ব্রহ্মা অদ্বৈতম্" ; ঈশ্বরের আসন অনন্ত জোড়া সর্বময়। এই সসীম ও অসীম আসনে ইসলামের আল্লাহ্ উপবিষ্ট আছেন। "অনন্তর তিনি আরশের ওপর উপবিষ্ট হলেন"—৭ ঃ ৫৪। সুতরাং ইসলামের আল্লাহ্—এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, সর্বময়, সর্বজোড়া, সর্বস্থানে, সর্বক্ষণে বিরাজিত। "যিনি চির জীবিত ও নিত্য বিরাজমান, তন্দ্রা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।" ২ ঃ ২৫৫। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে যে জ্ঞান লাভ করেছে, সে আলো লাভ করেছে, এবং যে আলো লাভ করেছে, সে যেন আল্লাহ্‌কে লাভ করল।

ইসলামের আল্লাহ্

দেখি না তোমারে বিনা কোথাও ভূমি
আকাশ পাতাল মর্ত্য সবই যে তুমি।
ধরিব তোমারে ছেড়ে কাহার দুয়ার
আকাশ পাতাল মর্ত্য সবই যে তোমার।
কোথাও কাহারে যদি ধরিতেই হয়
ধরিব তোমারে আমি এ মোর প্রত্যয়।
দেহ ও প্রাণের লীলা মানুষে যেমন
জগৎ প্রভুর কাছে জগৎ তেমন।
মোর দেহ মোর প্রাণ মোর পরমায়ু
তোমারই শরীর মাঝে তোমারই স্নায়ু।
তুমি যে একক শুধু অদ্বিতীয় নয়
সকল খণ্ডকে নিয়ে অখণ্ডময়।
তোমাকে খণ্ডিত করে যে করে আপন
তোমাকে সম্মান দিতে সে বড় কৃপণ।
মনের বিকার শুধু মনীষা বিজ্ঞান
তোমারে চিনিতে চায় তব দেওয়া জ্ঞান।
নহে মোর মানবিক যুক্তি তর্ক জ্ঞান
যেখানে দিয়েছ ধরা সে তো শুধু ধ্যান।
তোমারে করেছে জয় মনের ক্ষুদ্রতা নয়
বিবেকের সাথে যুক্ত বিশাল হৃদয়।

কোরআন—২ ঃ ২৫৫, ৩ ঃ ১৪৫, ১৮ ঃ ৬৫, ৫৮ ঃ ৭

ইসলামে কোরআন ও হাদিস ঃ কোরআন—পবিত্র কোরআন আল্লাহর বাণী, ফেরেশ্তা (স্বর্গীয় দূত) জীবরাইল (আঃ) কর্তৃক মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে (৬১০—৬৩২খ্রীঃ) প্রেরিত। এটা ইসলামের মূলগ্রন্থ, মহাগ্রন্থ। একদিন কতিপয় মরুবাসী মানুষ এই মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ মাথায় নিয়ে আজকের দুনিয়ার সভ্যতার কাণ্ডারী সমগ্র ইউরোপকে জ্ঞানের আলো দান করেছিলেন। আজও সেই জ্ঞানভাণ্ডার পবিত্র কোরআন বর্তমান। "এটা মানবজাতির জন্য প্রত্যক্ষ দলিল এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ।" ৪৫ ঃ ২০। "এটা বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত নয়।" ৬৮ ঃ ৫২। "নিশ্চয় আমি এই কোরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি। অতঃপর কে এই উপদেশ গ্রহণ করবে।" ৫৪ ঃ ২২, ৩২, ৪০

সুতরাং পবিত্র কোরআন শুধু একটি মাত্র গোত্রের মামুলি একটি ধর্মগ্রন্থই নয়। এটা স্রষ্টার বাণী বিশ্বধর্মের শেষ সংস্করণ, যা বিশ্ব-মানবের জন্য জীবন-নির্দেশক, অখণ্ড জীবন পথের পথপ্রদর্শক। যুগধর্মী পবিত্র কোরআন মানবজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাপক। যে ব্যবস্থাপনায় আধ্যাত্মিকতা মানবজীবনের বহু অধ্যায়ের একটি অধ্যায় মাত্র, তথাকথিত ধর্ম সেখানে বহু ধারার একটি ধারা মাত্র। বহু শাখার একটি শাখা মাত্র। কিন্তু পবিত্র কোরআন সমস্ত শাখা সমন্বিত বিশাল জ্ঞানবৃক্ষ।

মোদের কামনা হোক বলেছে কোরআন---
"হে বিশ্বপালক মম বৃদ্ধি কর জ্ঞান।" কোরআন—২০ ঃ ১১৪
মাগিছি কাতর প্রাণে করুণা তোমার
বৃদ্ধি কর বিদ্যা বল হে প্রভু আমার।
তোমার মহিমা আর তুমি যে মহান
বুঝিতে বোধন দাও বিশাল কোরআন।

হাদিস ঃ মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর কথা, কাজ এবং তাঁর মৌন সমর্থনমূলক কথা ও কাজকেও 'হাদিস' বলা হয়। ইসলাম জগতে মোট ছয়টি হাদিস গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন,—১। বোখারি শরীফ। ২। মুসলিম শরীফ, ৩। তিরমিজী শরীফ, ৪। নাসায়ী, ৫। আবু দায়ুদ, ৬। ইবনে মাজা। এদের মধ্যে প্রথম দুটো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে সকলেরই আস্থাভাজন হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক বিধানে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইসলাম ঃ ইসলাম শরীয়ৎ বা তার নীতি শাস্ত্রানুযায়ী পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দণ্ডায়মান। এদের মধ্যে নামায ও রোযা প্রতিটি মুসলিম নরনারীর জন্য অতি অবশ্যই পালনীয় (ফরজ)। বাকি দুটো—যাকাত ও হজ, যাঁদের সামর্থ্য আছে, তাঁদের জন্য মাত্র। 'কালেমা' স্বীকৃতি বাক্য সবার জন্য।

(১) কালেমা, (২) নামায, (৩) রোযা, (৪) যাকাত, (৫) হজ।

কালেমা নামায, রোযা, হজ ও যাকাত
সব কিছু পড়ে থাকে মন দেখে নাথ। কোরআন—২ ঃ ১৭৭
দেহ ও প্রাণের লীলা জগৎ প্রান্তরে
শরীয়ৎ বহিরাবরণ ঈমান অন্তরে।
মনের ফসল নয় মানসিক ক্ষেত
দেখিবে মহান প্রভু তোমার নিয়েৎ —হাদিস

ইসলাম ও ঈমান কেবলমাত্র কতকগুলো নিষ্প্রাণ নির্জীব নেহাত গতানুগতিক আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র নয়, এটা আত্ম-চেতনা, ধর্ম-চেতনা, জীবন-চেতনা, বিশ্বকল্যাণ-চেতনা, আত্মার সংযম ও উন্নয়ন, বিবেকের প্রয়োগ ও বোধোদয়। এ সবেরই সমষ্টিগত নাম ইসলাম ও ঈমান।

(ক) স্মরণ ও সেবায় ইসলাম ঃ স্রষ্টার স্মরণ ও সৃষ্টির সেবা—এরই নাম ইসলাম।

(খ) ওপরে বিশ্বাস ও নিচে সৎকাজ ইসলাম ঃ ওপরে অর্থাৎ এক অদৃশ্য আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস ও নিচে অর্থাৎ নিখিলের বুকে সৎকাজ এরই নাম ইসলাম।

(গ) সমুন্নত জীবন-বিধান ইসলাম ঃ সত্য ও সুন্দরের পথে সমুন্নত জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম।

(ঘ) পক্ষ ও বিপক্ষ পদক্ষেপ ইসলাম ঃ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং মিথ্যা ও অন্যায়ের বিপক্ষে পূর্ণ পদক্ষেপ—-এরই নাম ইসলাম।

(ঙ) অত্যাচার না করা, অত্যাচারিত না হওয়া ইসলাম ঃ অত্যাচার করো না, অত্যাচার সহ্য করো না। এরই নাম ইসলাম। ২ ঃ ২৭৯

ইসলামের মুসলমান ঃ মুসলমান শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণকারী, পরিভাষাগত অর্থ—ইসলামধর্মের বিধিবিধান অনুযায়ী আল্লাহ্‌র দরবারে আত্মসমর্পণকারী। "যখন তার

[হযরত ইব্রাহিম (আঃ)] প্রতিপালক তাকে বলেছিলেন—অনুগত হও। সে বলেছিল—আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।" ২ ঃ ১৩১, ২২ ঃ ৭৮

বর্তমান যুগে প্রধানত চার শ্রেণীর মুসলমান লক্ষ্য করা যায়—(১) অভিধানগত মুসলমান, (২) জন্মগত বা বংশগত মুসলমান, (৩) সংস্কারগত মুসলমান, (৪) ইসলামগত বা ঈমান সম্মত প্রকৃত মুসলমান।

অভিধানগত মুসলমান ঃ আভিধানিক অর্থে দেখতে গেলে জগতের সকল আস্তিকই মুসলমান। কেননা বিশ্বাসী নর-নারী মাত্রেই প্রতিপালকের দ্বারে আত্মসমর্পণকারী।

সমর্পণেই পূর্ণ যদি ইসলামের যে সংজ্ঞাগান
হে প্রভু তোমার চরণতলে নয় কে মুসলমান।

জন্মগত বা বংশগত মুসলমান ঃ জন্মগত বা বংশগত মুসলমান বলতে প্রায় সকলেই। কেননা ইসলামের অতি অবশ্যই পালনীয় দৈনন্দিন পাঁচবারের নামায, যা মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নবয়্যতের জীবনের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক সাধনা, সেটাকে জীবনে একবারও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন না করে যদি কেউ খানদানী সাচ্চা ও শরীফ বা সৈয়দ মুসলমান হতে পারেন, এবং তা অনেকেই, তাহলে তাদের জন্মগত বা বংশগত মুসলমান ব্যতীত আর কি বলা যাবে। কিন্তু ইসলামধর্ম জন্মগত ধর্ম নয়, সাধকের সাধনার ধন। যেহেতু ইসলামধর্মে সাধনার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্র বা বংশ গোত্রের কোন মূল্যই নেই। "সেদিনের ভয় কর, যেদিন এক ব্যক্তি হতে অন্য ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হবে না। এবং তা হতে কোন অনুরোধও গৃহীত হবে না, এবং তা হতে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না।" ২ ঃ ৪৮

তোমার গীতি তোমার গজল গাইলে তোমার গান
আমিই শুধু নই মুসলমান, জগৎ মুসলমান।

"আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে।" ৪০ ঃ ১৭। সুতরাং এখানে ব্যক্তিগত সাধনার ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে। ব্যক্তি-সাধনাই তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট। সেখানে বংশ বা গোত্র একেবারেই মূল্যহীন। অতএব ইসলামধর্মের অবশ্য পালনীয় বিধিবিধান বর্জিত মুসলমানদের সংজ্ঞা তাই জন্মগত বা বংশগত মুসলমান।

সংস্কারগত মুসলমান ঃ আপন সংস্কারগত মুসলমান আমাদের দেশে বহু লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় অনেক ওলি-আউলিয়া, সূফী-দরবেশ প্রভৃতির সংস্পর্শে দলে দলে অনেকেই শুধু হাতে হাত মিলিয়েই মুসলমান হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে আপন আপন কৃষ্টিতে পূর্বতন রয়েই গেছে। যেমন বেদে মুসলমান, চুড়িওয়ালা মুসলমান, খাঁ, মাল, ধওয়া, বাওরি মুসলমান ইত্যাদি। এই সমস্ত মুসলমানদের সঙ্গে বর্তমান মুসলমান সমাজের কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। তবুও তারা মুসলমান। জন্মে মুসলমান, মৃত্যুতে মুসলমান অর্থাৎ সন্তান জন্মালে মুসলমানী নাম রাখে ও মারা গেলে কবর দেয়। বাকি সমগ্র জীবনে আপন আপন সংস্কারমত চলে থাকে। তাই এরা সংস্কারগত মুসলমান।

প্রকৃত মুসলমান ঃ ইসলামের প্রতিটি বিধানকে মেনে নিয়ে, ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রয়োগ করে যিনি জীবনযাপন করেন, তিনিই প্রকৃত মুসলমান। এই মুসলমানের সংখ্যা অতি বিরল। কেননা নিষ্ঠা বা অকৃত্রিমতার অভাব। যাঁরা একহাতে মুসলমান, অন্য হাতে ইসলামের পূর্ণ ধ্বজাধারী। যাঁরা এক হাতে মুসলমান ও অন্য হাতে মহানবীর নিষ্ঠাবান উম্মত। যাঁদের গৌরবে সমগ্র মুসলিমজাহান গরীয়ান, যাঁদের মহানুভবতায় মানবতার শুধু মুসলমানই নয়,

অখণ্ড মানবজাতিই মহীয়ান। কিন্তু সেই মুসলমান আজ গোরে, ইসলাম আজ কেতাবে। সুতরাং প্রকৃত মুসলমান তিনিই যিনি ইসলামের গুণগত দিক থেকে মুসলমান। যিনি নিজেকে শান্তি ও শুদ্ধির পথে পরিচালিত করে আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ করেন ও আল্লাহ্‌র বিধানে আনুগত্য রাখেন, তিনি প্রকৃত মুসলমান।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী প্রত্যেকে একটি সৈনিক, ধর্ম তার অস্ত্র, সংসার তার সমরক্ষেত্র, শত্রু তার মানবিক ও সামাজিক অজ্ঞতা, অন্যায় ও অবিচার। কিন্তু আজকের দিনে ইসলাম-জগতে সৈনিক আপন অস্ত্রেই যেন আহত, ব্যাহত, ভারাক্রান্ত বা আত্মতৃপ্ত। সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তথাকথিত 'সৈনিকে'র অস্ত্র ধারণই যেন মূল উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু ইসলাম একটি মানবিক ও সামাজিক স্থির লক্ষ্য ; সংসারের যাবতীয় পাপ এবং সকল অন্যায় ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে আপসহীন আমরণ যে সক্রিয় সংগ্রাম, তারই নাম ইসলাম। যিনি পালন করেন নির্লোভ মনে ও নির্ভীক চিত্তে, তিনিই ইসলামের প্রকৃত মুসলমান।

যে জন আপন মনে শান্তিপ্রিয় নয়
যে জন সত্যেরে করে সদা নয় ছয়
যে জন অবৈধ পথে জীবিকা জোটায়
যে জন মিথ্যার দ্বারে সদাই লোটায়
যে জন চলার পথে জানে না আচার
যে জন গোপন পথে করে ব্যভিচার
যে জন চায় না কভু অপরের ইষ্ট
যে জন অযথা দেয় অন্যজনে কষ্ট
যে জন না দেখে দিব্য ইসলামের জ্যোতি
পশুত্বকে হার মানায় যার মতিগতি
যে জন মানুষে মারে দুই পায়ে লাথি
বিদ্বেষ ঘৃণার চোখে দেখে অন্য জাতি
কোরআন হাদিস মূল একথা নিশ্চয়—
সে জন যাহাই হোক মুসলমান নয়।

কোরআন—২ ঃ ২৫, ২১ ঃ ৯২-৯৪, ২২ ঃ ১৪, ২৩, ৫০ ৫৬, ২৩ ঃ ৫৭-৬১, ২৭ ঃ ৮৯, ২৮ ঃ ৮০, ২৯ ঃ ৭, ৯, ৩০ ঃ ১৫, ৪২ ঃ ২২, ৪৪ ঃ ২১, ৪৭ ঃ ১২, ৪৮ ঃ ২৯

মুসলমান ঃ ইসলাম একটি সামাজিক স্থির লক্ষ্য ; সংসারের যাবতীয় পাপ এবং সকল অন্যায় ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে আপসহীন আমরণ যে সংগ্রাম, তারই নাম ইসলাম, যিনি পালন করেন, তিনিই মুসলমান।

সঁপিয়া মোরে সৃজন ভোরে—
মানিয়া তোমার সব কলাম
বলেছি আমি 'আসলাম্‌তো'—
মুসলিম তাই আমার নাম।
'আস্‌লাম্‌তো'—আস্তিকতা—
অর্থ যাহার সমর্পণ
সমর্পণেই সর্বজীবন
মুসলিম তাই সর্বজন। কোরআন—২ ঃ ১৩১, ২২ ঃ ৭৮

ইতিহাসের প্রয়োজনে ইসলামের আগমন

ইতিহাসের প্রয়োজন পড়েছিল প্রধানত তিনটি স্তরে—অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক সুবিচার ও মানবিক চেতনা।

সজীব নির্জীব কোন একটি আকারের নিকট আত্মসমর্পণ চলে। নিরাকার বা শূন্যে কার নিকট কোথায় আত্মসমর্পণ করবে। ইসলামের আল্লাহ্ তো নিরাকার। তাহলে মহানবীজীর যুগে মুসলমানগণ কোন্ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যে আল্লাহ্কে আমরা পাই আচারে আল্লাহ্, বিচারে আল্লাহ্। এবং বিপরীত মেরুতে পাই অনাচারে ও অবিচারে শয়তান। (তাসাউফে নিরাকার আল্লাহ্র ব্যাখ্যা আছে অতি চমৎকার)

'আচার অর্থাৎ—সত্য-সুন্দর-সুবিচার, শান্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা-সহনশীলতা-সহাবস্থান, দয়া-মায়া-ক্ষমা প্রভৃতি গুণরাশিতে আত্মার যে আত্মসমর্পণ, প্রতিশ্রুতি ও ওইগুলোর পালনে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মন ; এরই নাম আল্লাহ্র গুণে বা আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণ। মহানবীজীর যুগে এই স্বচ্ছ সমর্পণেই জেগে উঠেছিল—সাচ্চা মুসলমান। এবং এই আত্মসচেতনমুখী আত্মসমর্পণকারী সাচ্চা অল্পসংখ্যক মুসলমানগণই একদিন বিশ্বজয় করেছিলেন। সে জয় ছিল আচারের ও আদবের এবং ইনসানিয়াতের ও ইখ্ওয়ানিয়াতের।

মৌলিক আবেদন ও মূল অবদানে ইসলাম ঃ ইসলামের মূল আবেদন বলতে একদিকে যেমন তৌহিদের বাণী, শাস্ত্রবিহিত শৃঙ্খলাবিধান, অর্থাৎ সকল মানুষের মাঝে এক আল্লাহ্র একত্ব ও মহত্ত্ব প্রচার, অপরদিকে তেমনি সেই এক বিশ্বস্রষ্টার অধীনে সকল মানুষের মধ্যে এক স্থায়ী বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলা। এককথায় আল্লাহ্র একত্বে ও মানব চরিত্রের মহত্ত্বে বিশ্বাস এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধই ইসলামের মৌলিক আবেদন ও মূল অবদান।

সাম্যের বাণী ইসলাম ঃ ইসলাম একদিকে যেমন তৌহিদের বাণী, শাস্ত্রবিহিত শৃঙ্খলাবিধান ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বিশ্বাস, সঙ্গে সঙ্গে সমসূত্রে অপরদিকে তা চরম আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতার সঙ্গেই ওই বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মূল উপাদান—সাম্যের বাণী, জ্ঞানচর্চার বিপ্লবী অভিযান, মানবতার গান। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই, সকলেই সমান, সকলেই সেই এক আদমসন্তান—মানব সন্তান। সুতরাং ইসলামের নিঃশর্ত বক্তব্য সবার মাঝে সমদৃষ্টিতে সকলের জন্য এক আদর্শ জীবনধারা স্থাপন।

যখনই নিবিড় প্রাণে নিখিলেরে ছুঁই
দেখি না মানব শিশু এক ভিন্ন দুই।
ইসলামের মূল মন্ত্র করিলে মন্থন
এক-ই পিতার পুণ্যে মোরা ভাইবোন।
কোরআন হাদিস মূলে শিক্ষা যেটি পাই
এক-ই মায়ের কোলে মোরা ভাই ভাই।

শ্রেণী-গোত্র-বংশ মিছে সকলই সমান
সৎশীল মানবের নাহি ব্যবধান।

কোরআন—২ ঃ ২৫, ৬২, ১৭৭, ৪ ঃ ১, ৭ ঃ ১৮৯, ১১ ঃ ১১৮, ১৬ ঃ ৯৩, ১৮ ঃ ১০৭, ২১ ঃ ৯২-৯৪

প্রচেষ্টা ও শ্রম-সাধনায় ইসলাম ঃ ইসলামে সাধনা ও শ্রম বর্জিত কোন কিছুরই (তেমনি বিশেষ কোন) মূল্য নেই। যদিও স্থান-বিশেষে অলৌকিকতা বা ওলি-আউলিয়াগণের কারামত ও নবীগণের মোজেজাকে সসম্মানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই কারামত ও মোজেজারও পেছনে আছে স্বর্গীয় সাধনার এক অচিন্তনীয় অকৃত্রিম অনুশীলন ও অতি উচ্চাঙ্গের জীবন সাধনা। কোথাও লক্ষ্য করি যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত সাধনা, কোথাও বা সমগ্র জীবনের তিক্ত আরাধনা, কোথাও বা শতাব্দীর সম্মোহন-সাধনা মানুষকে নিয়ে গেছে উন্নতির ওই চরম শিখরে। সেখানে ভাবাতীত কল্পনাতীত সাধনা, চোখ জুড়ানো আরাধনা আল্লাহ্র উপলব্ধি এনে দিয়েছে বাণী আদমের অন্তরে, অসীমকে এনে দিয়েছে সসীমের ঘরে, মহানকে হাজির করেছে মানুষের হৃদয়ে। সুতরাং ইসলামে প্রচেষ্টা ও সাধনা জীবন গঠনের প্রথম কথা।

অনুরূপভাবে ইসলাম তকদিরকে (ভাগ্য) মেনে নিয়েছে, তবে সাধনা ব্যতিরেকে নয়। এখানেও ইসলাম প্রচেষ্টাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। মহানবী (দঃ)-এর কথায়—'আমার হাতে চেষ্টা আল্লাহ্র হাতে ফল', সুতবাং মানুষকে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ভাগ্য-বৃক্ষের ওই ফলটি পাড়তে গেলে প্রচেষ্টার ঢিল ছুঁড়তেই হবে। অতএব শ্রম ব্যতিরেকে ইসলামে কোন কিছুকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

মানুষ চেষ্টা করবে, সাধনা করবে, এবং তার যথাযথ ফল পাবে এতে কোন সন্দেহই নেই। ইসলামের মহানবী (দঃ) সাধকের সাধনাকে শুধু জাগতিক ফলপ্রাপ্তিতে সীমিত করেননি, তিনি সাধককে উৎসাহিত করেছেন দ্বিগুণ পুরস্কারে, অখণ্ড জীবনের আস্বাদে, মরণোত্তর জীবনের মহামন্ত্রে। তিনি বলেন—"পরিশ্রমী আল্লাহ্র বন্ধু।" 'পরিশ্রম কর, অতঃপর আল্লাহ্তে মনোনিবেশ কর।' ৯৪ ঃ ৭-৮। সুতরাং শ্রমিক তার পরিশ্রমের মূল্য এখানে তো পাবেনই, অধিকন্তু আল্লাহ্র সান্নিধ্যও লাভ করবেন। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে মানবজীবনে শ্রম খাদ্যে লবণ স্বরূপ। এখানে শ্রম ইসলামে ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হলো।

ইসলাম জগতের মহান কাণ্ডারী মহানবীর শ্রম সম্পর্কে চিন্তাধারা আমরা দেখলাম। এখন দেখা যাক ব্যক্তিজীবনের উন্নতি-অবনতির জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ কি বলেন। "মানুষের জন্য এছাড়া কিছুই নেই, যা সে চেষ্টা করে।" ৫৩ ঃ ৩৯। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন মানুষই তার চেষ্টা বা শ্রম ব্যতীত কিছুই আশা করতে পারে না। এমনকি দু'মুঠো অন্নও না। ইসলামের এই দর্শনে কারো সঞ্চিত ধনে অন্য কারো বসে খাওয়ার কোন অধিকার নেই—তিনি যিনিই হোন। সকলেই খেটে খাবে।

ব্যক্তিজীবন হতে সমাজ-জীবন ও জাতীয় জীবনের জন্যও পবিত্র কোরআন ঠিক অনুরূপ ঘোষণা করেছে—"আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ

না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।" ১৩ ঃ ১১। এখানেও দেখতে পাচ্ছি, কোন জাতির জীবনেও কোন পরিবর্তন আসতে পারে না তাঁদের আপন প্রচেষ্টা ও সাধনা ব্যতীত।

মহানবীর দৃষ্টিতে মানুষ তার জীবন-বৃক্ষের মালীস্বরূপ। জীবন-বৃক্ষের মালিক একমাত্র বিধাতা-পুরুষ। সুতরাং মালীর কর্তব্য বৃক্ষে জলসেচন করা। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি তার অক্লান্ত শ্রম ও সাধনা। তাকে ফুল ও ফলের জন্য লালায়িত হতে হবে না। তার সাধনাই তাকে সবকিছু পাইয়ে দেবে।

সাধনায়—সত্য দুটির সকল বাধা
সাধনার জন্য নাড়ীয় সফল বাঁধা।
আপনার হাতে ইহকাল গড়ে,
তোমার নিত্য কাজ।
প্রভুর স্মরণে পরকাল গড়ে,
তোমার নিত্য নামায।
তোমার ভাগ্য তোমারই হাতে,
বিধাতা সাধে না বাদ।
সাধনার শ্রমে সুপ্ত আছে
বিধাতার আশীর্বাদ।
নিঃসংকোচে নিখিলের বুকে
ঘোষণা করেছে কোরআন
জাতির ভাগ্য জাতিরই হাতে
জাতি আনে উত্থান ॥

কোরআন—১১ ঃ ১১৪, ১৩ ঃ ১১, ২০ ঃ ১৩০, ৫৩ ঃ ৩৯, ৬৭ ঃ ১-২।

সমুন্নত জীবন ব্যবস্থায় ইসলাম ঃ পরম করুণাময় কৃপানিধানের সর্বশেষ প্রেরিত গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের শাশ্বত অভিমত—ইসলাম একটি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম, শান্তির ধর্ম, কিন্তু যে কোন মতেই বৈরাগ্যের লীলাভূমি নয়। কেননা ইসলামধর্ম অল্পবিস্তর বহু সংখ্যক মানুষের ধর্ম। কিন্তু ইসলামধর্মের যে সহজাত গুণ, তাতে সংসারের সকল সমস্যার শান্তিময় সমাধান সম্ভব। এই সংসারই তার সাধনার ক্ষেত্র। এইখানেই তার কৃতকার্যতা নিহিত, সে বাস্তব জগৎকে অস্বীকার করা তো দূরের কথা, বরং তাকে সবসময় স্বীকার করেছে, মর্যাদা দিয়েছে। সমাজের কোন সমস্যাকেই এড়িয়ে যায়নি ইসলাম, বরং সমাধানের পদক্ষেপ রেখেছে সকল সমস্যাতেই। সে যেন ডাক্তার স্বরূপ। সমাজ তার রোগী। কোন ভাল ডাক্তারই রোগকে ভয় করে না। ইসলামের এই যে সমাজভিত্তিক শাশ্বত সুন্দর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, সেগুলো যতখানি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে, তা অপেক্ষা অনেক বেশি সমাজব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। বরং অনেক সময় বাহ্যিক আচরণের বাড়াবাড়িতে ইসলামের সত্যসূর্য শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাই স্বয়ং মহানবী (দঃ) সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন—"ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না।" ধর্ম বিশ্বনবীর নিকট মানব-সমাজকে সুপথে পরিচালিত করে ইহলোকে শান্তি হতে পরলোকের স্বর্গ পাওয়ার পরিপূরক হাতিয়ার স্বরূপ ছিল। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন "সমগ্র বিশ্ব আল্লাহ্‌র পরিবার, যে ব্যক্তি এই পরিবারের নিকট

ভাল লোক, সে-ই আল্লাহ্‌র নিকট ভাল লোক।" এই দিক দিয়ে ইসলাম এই সংসারের অখণ্ড মানুষের ধর্ম, প্রকৃতির ধর্ম। কেননা, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ বা প্রকৃতিজগৎ মানুষেরই জন্য। তাই ইসলাম প্রকৃতিজগতের সামান্য একবিন্দু বৃষ্টিজল হতে একটি গাছের পাতাকেও অস্বীকার করে না। মানুষের চির সহজাত প্রবৃত্তিকেও—প্রেমে হোক, প্রণয়ে হোক প্রাণের লীলাক্ষেত্রে শান্তির পথে স্বাদ আস্বাদনে কোনদিনই সে ধর্মের নামে ধামা চাপা দিতে চায় না। এই সমস্ত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ইসলামের আবেদন বা অবদান কোন একটি গোত্রের বা গোষ্ঠীর পরলোকের পাসপোর্ট নয়, বরং অখণ্ড মানব-সমাজের ব্যক্তিজীবন হতে ব্যষ্টি-জীবনের ইহলোক পরলোকের জন্য শান্তিময় সমাজব্যবস্থা।

বলেন—আল্লাহ্‌র নবী মহম্মদ ধরার—
এই বিশ্ব এক আল্লাহ্‌র একটি পরিবার।
তিনিই উত্তম এক আল্লাহ্‌র দরবারে—
যে জন উত্তম এই বিশ্ব-পরিবারে।

এ ধর্ম একদিকে যেমন ধার্মিকের জন্য ধর্মের বাহন, অন্যদিকে সংসারী কর্মীর জন্য কর্মের মহা অনুপ্রেরণা। একদিকে যেমন আল্লাহ্‌তে পূর্ণ নির্ভরতা, অন্যদিকে সংসারে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রচেষ্টার পূর্ণ প্রয়োগ। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ ইসলামের দৃষ্টিতে—"মানুষের জন্য তার চেষ্টা ব্যতীত কিছুই নেই।" সুতরাং এ সংসারের সকল ঘাত-প্রতিঘাতকে স্বীকার করে শ্রম ও সাধনার দ্বারা সত্য ও সুন্দরের পথে হযরত মহম্মদ (দঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এহেন সুষ্ঠু সমুন্নত জীবন-ব্যবস্থাই ইসলাম।

সকল সমস্যার সমাধান-সূত্র ইসলাম ঃ অশান্ত বিশ্বে মানুষের কল্যাণ ও শান্তির জন্য, ঘনঘোর অন্ধকার সমাজে এক ঝলক আলোর জন্য, ক্ষুধিত নর-নারীর ইহলোকে দু'মুঠো অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য, বিশ্বাসী সংশীল মানুষের পরলোকে আত্মার মুক্তির জন্য—নিরলস সংগ্রামী সাধক হযরত মহম্মদ (দঃ) ত্যাগ ও তিতিক্ষার তুঙ্গে বসে ধরণীর কোলে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম "ইসলাম" (শান্তি) প্রতিষ্ঠা করেন। এটা কোন এক কল্পলোকের কল্পনা মাত্র নয়, বাস্তব জগতের প্রাণ-চেতনার সহজ দোলায় দোল দেওয়া পুরুষ ও নারী হৃদয়ের দুই বৃন্তে বাঁধা দিবা ও রাত্রির দৈহিক-মানসিক সকল সহজাত ক্ষুধার এবং জাগতিক আধ্যাত্মিক সকল কামনা ও বাসনার সুন্দরের সঙ্গে সমাধান-সূত্র।

গরিবদের রক্ষাকবচ ইসলাম ঃ একদিকে ইসলামের ধর্মীয় বিধিবিধান বা আনুষ্ঠানিক অনুশাসন, যথা নামায, রোযা, হজ, যাকাত-ফেৎরা, সাদাকা ও ওযর ইত্যাদি দান-ধ্যান—এগুলোর আবেদন বা অবদান বলতে অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় আত্মকেন্দ্রিক মানবসত্তার শুদ্ধিকরণ ও স্বর্গলাভ। কিন্তু অপরদিকে পরোক্ষভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবে এইগুলোর গভীরে যে সহজ সত্য রহস্যাবৃত, যে মানবিক মৌলিক চিন্তাধারা, যে আন্তরিক আবেদন, যে আসল কথা অনেক সময় অনুশাসনের চাপে অদৃশ্যপ্রায়, সরল কথায় সেটি হচ্ছে—নিজে সৎ হওয়া ও গরিবকে সাহায্য করা। সুতরাং ইসলামেরই শিক্ষা—গরিবকে সাহায্য করে নিজেকে সৎ করতে হয়। কোন মানুষের মধ্যে সমাজকেন্দ্রিক এই দুটো মূল্যবোধ না থাকলে ইসলামের এই আনুষ্ঠানিক কাজের কোন অর্থই থাকে না। তাতে তিনি যত বড়ই ধার্মিক হোন না কেন। কোরআন—৮৭ ঃ ১৪, ৯১ ঃ ৯, ১০। সুতরাং দারিদ্র্য

দূরীকরণে বা গরিবের সাহায্যার্থে সমাজ-সংস্কার ও মানবসেবা ইসলামের অসামান্য অবদান ও শ্রেষ্ঠ আবেদন। এবার দেখা যাচ্ছে—ইসলামের তথাকথিত স্বর্গরাজ্য পেতে হলে মানুষই তার মূল কথা। কেননা, ইসলাম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে—"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে তোমাদের কোন পুণ্য নেই। বরং পুণ্য তারই যে ব্যক্তি.....আত্মীয়-স্বজন পিতৃহীন অভাবগ্রস্ত পথিক ও ভিক্ষুকদের এবং দাসত্ব-মোচনের জন্য ধন-সম্পদ দান করে।" কোরআন—২ ঃ ১৭৭। সুতরাং ইসলামের স্বর্গলাভে সমাজের এই সৎকাজ এবং গরিবের সহায়তা তার প্রথম সোপান। ইসলাম তার নানা বিধিবিধানের মাধ্যমে ধনীকে বাধ্য করেছে, জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছে গরিবকে সাহায্য করে আপন আপন স্বর্গের সোপান সৃষ্টি করতে। এই পথে ইসলাম গরিব মানুষকে রক্ষা করে ধনী-নির্ধনী সকলকে করে ভালমানুষ, এবং পরিশেষে এই সনদ সামনে পেলে ভাল মানুষকে করায় স্বর্গলাভ, তাই ইসলাম গরিবের রক্ষাকবচ। অতএব ইসলামের বিধিবিধানগুলো একদিকে যেমন স্বর্গলাভের সোপান স্বরূপ, অন্যদিকে ঠিক তেমনি গরিবকে রক্ষা করার প্রকৃষ্ট পন্থা, মানুষকে সৎ করার মৌলিক পদ্ধতি এবং সমাজকে শুদ্ধ ও উন্নত করার সহজ উপায় ও সাবলীল পথ। অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ইসলামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা- "তিনিই এই জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যিনি মানুষের উপকার করেন।" —হাদিস

যে করেছে তারে তোরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বল,
মানুষের সেবা আর মানব মঙ্গল।
যে জন করেন তিনিই মানব মহান
মানুষের সেবা আর মানব কল্যাণ ॥

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, এমনকি মৃত্যুর মহা মুহূর্তেও মহানবী (দঃ)-র চিন্তা ও পবিত্র মুখনিঃসৃত শেষ বাণী ছিল—এই গরিবের দল। "সাবধান! দাসদাসীদের প্রতি নির্মম হয়ো না, নামায, নামায- -সাবধান, দাসদাসীদের প্রতি—সাবধান।" তাই মহানবী (দঃ) ছিলেন গরিবের কাণ্ডারী, ইসলাম তার রক্ষাকবচ দুর্গস্বরূপ। ২ ঃ ১৭৭, ২২০, ৪ ঃ ২, ৩, ৬, ২৫, ৯২, ১২৭, ১৭ ঃ ৩৪, ২৩ ঃ ৬, ৭, ২৪ ঃ ৩২, ৫৮ ঃ ৩, ৭০ ঃ ২৯-৩১, ৯০ ঃ ১৩, ১০৭ ঃ ১-৭।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ঃ এ ধর্ম একদিকে যেমন এক আল্লাহ্ ও অদৃশ্যে বিশ্বাসী হওয়ার, এপার হতে ওপারের মরণোত্তর মহামন্ত্র, অন্যদিকে ঠিক তেমনি সংসারের মাটিতে দৃশ্যালোকে সৎশীল ও সংযমী হওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশ বা অমোঘ বিধান। সমাজ ব্যবস্থায় এ একদিকে গরিবকে রক্ষা করার জন্য দাতার নিকট অনুপ্রেরণায় মহামন্ত্র, আবার একই সঙ্গে পরমুখাপেক্ষী মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করার মহাতাগিদ মহামন্ত্র। এ দাতার নিকট আশীর্বাদ, অমিতব্যয়ীর ওপর অভিশাপ, তার নিরপেক্ষ বাস্তবমুখী সমাজ-বিধানে পুত্র-কন্যা, পুরুষ-রমণী, স্বামী-স্ত্রী, সধবা-বিধবা, পত্নীক-বিপত্নীক সকলেই সমান। শুধু তাই নয়, সমাজের প্রতিটি অধ্যায়ে বিপত্নীকের সমমর্যাদা পান বিধবা, আবার সমাজের শুচিরক্ষায় ব্যভিচারে দেয় প্রাণদণ্ড। শুভবিবাহে দেয় উৎসাহ দান। এ হল এমনি এক অপূর্ব বিধান। সমাজের এই অধ্যায়ে ইসলাম তার অকৃপণ দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদায় প্রাণ উজাড় করে দিয়েছে। মায়ের জাতি রমণীকুল সম্পর্কে বিশ্বের সকল সন্তানকে করেছে সাবধান। কেননা

ইসলামে স্বর্গ বলে যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে, সেটা ছলে বলে নেই, কৌশলে নেই, জলে নেই, স্থলে নেই, ধনে নেই, দৌলতে নেই, আছে শুধু তারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে জননী, যে গর্ভধারিণী মা, তাঁরই পায়ের তলে। এইভাবে নজিরবিহীন দৃষ্টান্তে সমগ্র পুরুষকুলের সমস্ত সৎকাজের মূলধনকে রমণীকুলের পায়ের নিচে এনেছে ইসলাম।

'বলেন দীনের নবী রসুল মোদের—
মায়ের পায়ের তলে জান্নাৎ তোদের।' —হাদিস

কোরআন—২ ঃ ১৮৭, ৪ ঃ ৩, ৩৪, ১২৯

মানবশিশুর সহজাত ধর্ম ইসলাম ঃ এ ধর্ম একদিকে মানবশিশুর সহজাত স্বাভাবিক গুণরাশির পূর্ণ পটভূমি, যে গুণরাশিতে গরীয়ান তার জন্মলগ্ন, মহীয়ান তার মানব-জীবন ; যে গুণগুলোর বিকাশ দ্বারা মানবশিশু মানব-সমাজ সৃষ্টির সেরা। অন্যদিকে ঠিক তেমনি মানবশিশুর ওই সহজাত স্বাভাবিক গুণগুলোর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের উপবন থেকে বার্ধক্যের বেলাভূমি পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলন দ্বারা বিকাশ ও সদ্ব্যবহার করাই ইসলামের প্রকৃত অনুশীলন—কর্মযোগ বা কর্মানুষ্ঠান। তাই মানবশিশুর জন্মলগ্নে জন্মগত যে ধর্ম, যে সত্য ও সুন্দর সহজাত প্রতিভা, প্রকৃতি বা জীবনপ্রবাহ এবং অখণ্ড মানব-সমাজের মানবতার ধীর ও স্থির উত্তরণে ও বিকাশ-পথে তার যে প্রতিভাজাত পটভূমিকা বা প্রাণের ধর্ম তাই "ইসলাম।" কোরআন—৯৫ ঃ ৪

সর্বমানবের দিশারী ইসলাম ঃ পবিত্র কোরআনের মতে—এই বিশ্বে বহু ধর্ম এসেছে, তবে ইসলাম সর্বশেষ ধর্ম। কেননা এরপর আর কোন নবী বা রসুল আসবেন না। কিন্তু ইসলাম অতীতের যে কোন নবী বা রসুলকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করেনি। বরং শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছে সকলকেই এবং সকল ধর্মের বিশেষ গুণগুলোর সমাবেশ ঘটেছে এই ধর্মে। এই বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও ইসলাম বিশ্বধর্মের শেষ সংস্করণ। তাই এ ধর্ম কোন একটি জাতি, দেশ বা কালের জন্য নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং এই শান্তি, এই করুণা, এই প্রেম, এই জীবনব্যবস্থা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সর্বকালের সর্বদেশের সর্বমানবের জন্য।

কোরআন—১০ ঃ ৪৭, ২২ ঃ ৬৭, ৩৫ ঃ ২৫, ৪৯ ঃ ১১

মানুষের মিলনায়তনের মুক্তপ্রাঙ্গণ ইসলাম ঃ বিশ্ব-সমাজের যে কোন মানুষ যে কোন নর-নারী বিনা পাসপোর্টে প্রবেশ করতে পারে ইসলামে। এইদিক দিয়ে ইসলাম মানুষ মাত্রেরই বা বিশ্বমানবের মিলনায়তন বা মুক্তপ্রাঙ্গণ। এবং প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সে সকলেরই সমান। সেখানে তার কোন ভেদ রইল না। ধরার বুকে মানুষের মাঝে ইসলামের অতুলনীয় মহিমা বলতে এই। ইসলাম মানুষকে শুধু একত্র করেনি, এক করেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, "ইসলামের সবচেয়ে বড় গুণ, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই।" অসংখ্য ভারতবাসীর ইসলামে আকৃষ্ট হওয়ার পেছনে কোন লৌহ তরবারি ছিল না, ছিল তার এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "হিন্দু সমাজের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার হাত থেকে নিস্তার লাভের আশায় ভারতের পতিতেরা দলে দলে সাম্যবাদী নবধর্ম গ্রহণ করল।" ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বলেন—"সামাজিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে উদারতা এবং সমান অধিকারের আদর্শই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।" ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন, "আমরা এটা অস্বীকার করতে পারি না যে ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব

সকল প্রকার সম্প্রদায়গত ও জাতিগত গণ্ডী অতিক্রম করে গেছে। এরূপ একটি বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায় না।" ভারতপথিক স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "ইসলাম জনতার বাণী নিয়ে এল.....প্রথম বাণী হল সাম্য। একটিই ধর্ম আছে প্রেম ধর্ম। জাতি, বর্ণ বা অন্য কোন ভেদের প্রশ্ন আর নয়। ওই বাস্তব গুণে সে জয়ী হল।.....সেই মহৎ বাণী অত্যন্ত সহজ ছিল।.....মুসলিম ধর্ম প্রভুর নামে জগৎ প্লাবিত করল। কি প্রচণ্ড জয়ের ক্ষমতা।"

অসাম্প্রদায়িক ও চরম উদারতায় ইসলাম ঃ সাম্প্রদায়িক তিনি, যিনি অন্য সম্প্রদায়কে সহ্য করতে পারেন না, বিদ্বেষ পোষণ করেন। অন্য জাতি, গোত্র, গোষ্ঠী, বর্ণ বা ভাষাকে যিনি সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃতি দিতে পারেন না, বরণ করার পরিবর্তে বর্জন করেন, তার ন্যায়সঙ্গত দাবি ও অধিকারকে অস্বীকার করেন, আজকের দিনে তিনি সাম্প্রদায়িক।

সমগ্র ইসলাম জগতের শাশ্বত ও সারবস্তু বহন করে যে গ্রন্থটি, যাকে কেন্দ্র করেই 'ইসলাম'। যার নাম পবিত্র 'কোরআন'। মহানবী তাঁর প্রাণের বিনিময়েও এই কোরআনকে আপসহীন ভাবে সবার ওপর স্থান দিয়েছেন। তাঁর অসংখ্য উম্মত বা শিষ্যগণও আর যাই করুন, এই কোরআনে বিরোধিতা করেন না, বরং প্রয়োজনে প্রাণের বিনিময়ে তাঁরাও পবিত্র কোরআনের সম্মান রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। এই পবিত্র কোরআন সমগ্র ইসলাম জগৎকে সমগ্র মুসলিম-বিশ্বকে বিশ্বের নানা জাতি, নানা বর্ণ, নানা ভাষা. নানা সম্প্রদায় সম্পর্কে কি শিক্ষা দিচ্ছে, একটু অনুধাবন করলে আমরা অতি সহজেই বোঝাতে পারবো—ইসলাম ও তার অনুসারী মুসলমানগণ কতটা অসাম্প্রদায়িক। মহানবীজী তাঁর সমগ্র জীবনে যদি কোন একটি পুরুষ ও একটি মহিলাকে সর্বাপেক্ষা সম্মান দান করেছিলেন, তারা উভয়েই ছিলেন অমুসলিম—আবু তালিব ও বিবি হালিমা। একজন আপন চাচা এবং অপরজন হলেন দুধমা।

পবিত্র কোরআনের ঐশী বাণী হতে মহানবীর আপন কথায় ইসলামের অকৃত্রিম উদারতা ও আন্তরিকতা জগৎ মানবকে ভাই বলে আলিঙ্গন করেছে, বিশ্বের সকল প্রত্যাদিষ্ট ছোট-বড় ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সম্মান প্রদর্শন করেছে। কেননা, ইসলামে গোঁড়ামি, ভাঁড়ামি ও গোঁয়ারতুমির কোন স্থানই নেই। একদিক দিয়ে সমগ্র মানবমণ্ডলী মানবজাতি সম্পর্কে এবং তাদের আপন আপন নবী রসুল, জাতি গোত্র, বর্ণ ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বীকৃতি ও উদারতা যে কোন সমাজের যে কোন মানুষের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সংকীর্ণতার পরীক্ষিত সত্যে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ। অখণ্ড মানবজাতি সম্পর্কে কোরআন—

"মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন।" ২ ঃ ২১৩, ১১ ঃ ১১৮, ১৩ ঃ ১৯, ১৬ ঃ ৯৩।

অন্যান্য নবী বা দূত সম্পর্কে কোরআন—

"এমন কোন জাতি নেই যাদের মাঝে কোন সতর্ককারীর (দূত) আগমন হয়নি, প্রত্যেক জাতির জন্য একজন রসুল (দূত) প্রেরিত হয়েছিলেন।"

"নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির জন্য রসুল প্রেরণ করেছিলাম।" ১০ ঃ ৪৭, ১৬ ঃ ৩৬, ৩৫ ঃ ২৫, ৪০ ঃ ৭৮।

অন্যান্য জাতি বা গোত্র সম্পর্কে কোরআন—"হে বিশ্বাসিগণ, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস বিদ্রূপ কবো না, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মপদ্ধতি নির্ধারিত করেছিলাম যা তারা পালন করতো।" ২ ঃ ১৫৬, ১৭ ঃ ৮৪, ২২ ঃ ৬৭, ৪৯ ঃ ১১, ১৩।

অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে কোরআন—"কোন রসুলকে তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষা ব্যতীত প্রেরণ করিনি, তিনি তোমাদের বিভিন্ন ভাষা ও তোমাদের বর্ণসমূহ সৃষ্টি করেছেন, এতে জ্ঞানিগণের জন্য নিদের্শনাবলী আছে।" ১৪ ঃ ৪, ৩০ ঃ ২২, ৪৪ ঃ ৫৮।

পূর্বের নবী ও রসুলগণকে বিভিন্ন দেশ ও জাতির প্রতি প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মহানবীকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রসুল রূপে পাঠিয়েছেন। আল কোরআনে তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অর্থাৎ হে রসুল "আপনি ঘোষণা করুন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রসুল রূপে প্রেরিত হয়েছি।"

কোরআন—৭ ঃ ১৫৮

কোরআন শরীফে আরও ঘোষণা হয়েছে—

অর্থাৎ "আমি আপনাকে রসুল রূপে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত বা করুণা স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" কোরআন—২১ ঃ ১০৭, ৩৪ ঃ ২৮

সুতরাং ইসলামের মহান শিক্ষা—যে মানুষ মানুষকে ভাই বলতে জানে না, সে জগতের শ্রেষ্ঠ ভাল কাজটিই কি তা জানে না।

এই প্রসঙ্গে রাসুল নিজে ঘোষণা করেছেন ঃ "আমি রাসুলদের নেতা, এতে আমার গর্ব করার কিছু নেই, আমি নবীদের শেষ নবী এতেও আমার গর্ব করার কিছু নেই।" তিনি আরও বলেছেন—"আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী নেই।" এর দ্বারা রেসালতের ধারা (সিলসিলা) পরিসমাপ্ত হয়েছে। আর ইসলাম পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। তাঁর প্রতি নাজিলকৃত সর্ব শেষ ও তাঁর শ্রেষ্ঠ আসমানী কেতাব কোরআনে মজিদ তাঁর শেষ নবুয়তের সাক্ষ্য হিসাবে চিরদিন স্থায়ী থাকবে।

ইসলামে অনাবিল শান্তির যুগ ঃ ইসলামের অক্ষত অনাবিল শান্তির যুগ বলতে ২০ বছর। কেননা মক্কা বিজয় হলো ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে, এর পূর্বে প্রচণ্ড অশান্তির মধ্যে মহানবীকে সদাই আরববাসীদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পরই সমগ্র আরব যেন মহানবীর শান্তি-পতাকাতলে শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেল। এই অনাবিল শান্তির ধারা চলতে থাকল ৬৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত। ৬৫১ থেকে ৬৫৬ পর্যন্ত খলিফা ওসমানের সময়ও খেলাফতে কোন অশান্তি ছিল না। যার জন্য এই ৬৫৬ খ্রীঃ ১৭ জুন ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান শাহাদাৎ (মৃত্যু) বরণ করলেন বিদ্রোহী মিশরীয় মুসলমানের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের অভ্যন্তরীণ শান্তি যেন চিরতরে বিঘ্নিত হলো। সেই অনাবিল সেই অক্ষত শান্তি আর ফিরল না। ইসলাম জগতে তখন থেকেই গৃহবিবাদের সূত্রপাত। যদিও ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-ও শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন, কিন্তু তা কোন আপন জাতি বা জ্ঞাতি মুসলমানদের হাতে নয়। একজন পারসী দাস—আবু লুলু তাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং তিনি মারা যান। তাই সেখানে গৃহবিবাদের কোনই অবকাশ ছিল না। সুতরাং ৬৩০ খ্রীঃ থেকে ৬৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত এই ২০ বছর ইসলামের একান্ত ও অনাবিল শান্তির যুগ।

ইসলামের অক্ষত ও অবিকৃত যুগ ঃ মহানবী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তাঁর লোকান্তরের পর ইসলাম ৩০ বছর অক্ষত থাকবে। পরবর্তীকালে তাই দেখা গেল। মহানবী ৬৩২ খ্রীঃ পরলোকগমন করলেন। এবং তাঁর ধর্মভীরু খলিফাদের শেষ খলিফা হযরত

আলি (কঃ) ৬৬১ খ্রীঃ ২৪ জানুয়ারি খারেজি সম্প্রদায়ের আবদুর রহমানের বিষাক্ত তরবারির অব্যর্থ আঘাতে প্রাণত্যাগ করলেন। এখানেই ইসলামের খোলাফায়ে রাশেদীনের চির পরিসমাপ্তি ঘটল। এবং এই ভাবেই মহানবী-প্রচারিত ইসলামের অক্ষত, অবিকৃত ও নিখুঁত যুগ চিরনির্বাণ লাভ করল। আরম্ভ হলো ইসলামের ক্ষত-বিক্ষত যুগ। অক্ষত নিখুঁত ইসলাম আর থাকল না। কেননা প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার হাতে মহানবী (দঃ) প্রচারিত ও ধর্মভীরু খলিফাদের দ্বারা পরিচালিত ইসলামের প্রায় সমস্ত সৎগুণই সমাধি লাভ করে। সমগ্র উমাইয়া খেলাফতের মধ্যে ৭১৭-৭২০ খ্রীঃ পর্যন্ত মহাপ্রাণ দ্বিতীয় ওমর বিন আব্দুল আজিজ খেলাফত লাভ করেন। একমাত্র তিনিই ছিলেন সৎ খলিফাদের প্রকৃত অনুসারী। তাই তাঁকে পঞ্চম সৎ খলিফা বলা হতো। কেননা, তাঁর খেলাফতকাল এতই সুন্দর ছিল যা অবর্ণনীয়, সুতরাং নিখুঁত ইসলামের যে পরমায়ু তা বড় জোর ৬৩২ খ্রীঃ হতে ৬৬১ খ্রীঃ পর্যন্ত। অতএব ইসলামের অক্ষত নিখুঁত যুগ ৩০ বছর। সুতরাং বর্তমান ইসলামের যে মডেল, তা যেমন নকল ইসলামও নয়, তেমনি নিখুঁত ইসলামও নয়।

❑ ইসলামের যুগ ঃ ইসলামের ইতিহাস

ইসলামের অবিকৃত ও আসল যুগ ঃ

১। মহানবীজীর যুগ ঃ ৫৭০—৬৩২ খ্রীঃ

২। নবুয়তের যুগ ঃ ৬১০—৬৩২ খ্রীঃ

৩। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ঃ ৬৩২—৬৬১ খ্রীঃ

৪। সাহাবাগণের যুগ ঃ ৬৬১—৭৩২ খ্রীঃ

৫। তাবেঈগণের যুগ ঃ ৭৩২—৮০২ খ্রীঃ

৬। তাবে তাবেঈগণের যুগ ঃ ৮০২—৮৮৪ খ্রীঃ

❑ ইসলামের বিকৃত যুগ ঃ মুসলমানদের ইতিহাস ঃ

৭। উমাইয়া খিলাফত (রাজতন্ত্র) ঃ ৬৬১—৭৫০ খ্রীঃ

৮। আব্বাসীয়া খেলাফত (রাজতন্ত্র) ঃ ৭৫০—১২৫৮ খ্রীঃ

বিঃ দ্রঃ—৬৬১ খ্রীঃ হতে ১২৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ইসলামে খেলাফতের নামে মুসলিম রাজা বাদশাহগণের 'রাজত্বকাল' প্রচলিত ছিল। বাদশাহগণ কোরআনের অমোঘ বাণী ভুলে গিয়ে যা করতেন না, তাই নিজেদের বলতেন, অর্থাৎ 'খলিফা'। "তোমরা যা করো না, তা তোমরা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা তোমাদের বলা—আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অপরাধ।" ৬১ ঃ ২-৩। মহানবীজীর প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের বিলোপ সাধন করে নিজেদের আত্মতুষ্টির জন্য নিজেদেরকে খলিফা নামে চালান, আপন আপন আত্ম-প্রবঞ্চনারই সামিল ছিল। নামায না পড়ে একটি মানুষ নামাযী হয় কি করে, রোযা না রেখে একটি মানুষ রোযাদার হয় কি করে? সুতরাং খেলাফত না রেখে বা না চালিয়ে মানুষ খলিফা হয় কি করে? তাই এটা একটি নির্জলা আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। সুতরাং ৬৬১ হতে ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালটিকে কোনক্রমেই নবীজী-প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামের খেলাফত' কাল বলা যাবে না। জোর করে বলতে গেলে বলতে হবে—ইসলামের খেলাফত নয়, বাদশাহগণের প্রবঞ্চনাময় খেলাফত। আসলে ওটা ছিল রাজাগণের রাজত্বকাল মাত্র।

ইসলামকে জানার প্রধানত পাঁচটা উৎস

প্রথম উৎস ঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগৎ বা প্রকৃতিজগৎ। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এই প্রকৃতি বা নেচারের মধ্যে আছে—জড়জগৎ, স্থাপত্যজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণিজগৎ, মনুষ্যজগৎ প্রভৃতি। পবিত্র কোরআনে দ্বীন বা ধর্মকে বারবার আল্লাহর কুদরৎ বা প্রকৃতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। এবং এই প্রকৃতি সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে, এতে তোমরা কোন ছন্দপতন বা পরিবর্তন লক্ষ্য করবে না। অনাদি কাল হতে চলছে। অনন্তকাল চলবে। একইভাবে চলবে। সূর্য আপন ধারাতে প্রতিদিন উঠবে ও ডুববে, চন্দ্রও তার আপন পথে একই নীতি অনুসরণ করে চলবে। গ্রহ নক্ষত্র সকলেই যেন একই চিরন্তন নীতিতে বাঁধা। অনন্ত আকাশের অপূর্ব কলা-কৌশলের কোনদিনই কোন মেরামতির প্রয়োজন হয় না। এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দীর ইতিহাসেও না। পবিত্র কোরআন বারবার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে—এই সবের গতিবিধিকে লক্ষ্য করে অনুধাবন করে চিনতে ও জানতে চেষ্টা কর। বুঝতে ও বোঝাতে চেষ্টা কর—সেই অনন্ত আল্লাহ্‌কে। তিনি যে স্থায়ী, তিনি যে চিরন্তন, তাঁর সৃষ্টিই তার চির-সাক্ষী। পাহাড়-পর্বত, সাগর-সমুদ্র, নদী-নালা চিরন্তন ধারায় প্রবাহিত। বন-জঙ্গল, বৃক্ষলতা-পাতা সমগ্র উদ্ভিদজগৎ যেন তাঁর অপূর্ব রহস্যের প্রকাশ্য জ্ঞানভাণ্ডার। মহাকালের আবর্তনে ও বিবর্তনে যেন তাদের কোনই পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নেই। জীবজন্তু, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, খেচর, ভূচর, উভচর প্রভৃতির সৃষ্টি রহস্যকে তুলে ধরেছে আল্লাহ্‌র প্রকৃতিজগৎ। এসবই মহান আল্লাহ্‌র অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলের সুমহান প্রকাশ্য ভূমিকা। পবিত্র কোরআন বারবার ঘোষণা করেছে—এ সবই মহান আল্লাহ্‌র কুদরৎ বা প্রকৃতি বা ধর্ম। যা চিরন্তন। এ সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ওই কথাটি খুবই মনে পড়ে—

'একি জ্যোতি, একি ব্যোম দীপ্তদীপ-জ্বালা
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা।
একি শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্বতে কঠিন, তরু-পল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। একি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয় যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।' —নৈবেদ্য ঃ ২৭

সুতরাং ইসলামধর্মকে জানার প্রথম উৎস **প্রকৃতিজগৎ।**

দ্বিতীয় উৎস ঃ পবিত্র কোরআন। আল্লাহ্ প্রকৃতিজগৎ দিয়েছেন, এবং তাকে বোঝবার জন্য দিয়েছেন পবিত্র কোরআন। কোরআন অতি সরল ভাষায়, অতি সহজ কথায় মানুষকে বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছে—তাঁর কুদরৎ বা দ্বীন কি। এমনকি একই কথার বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে মানুষের কোন অসুবিধা না হয়। অনেকে আবার এটারই সমালোচনা করে বসেন এই বলে যে—কোরআন একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছে। কিন্তু এই পুনরাবৃত্তি মহান আল্লাহ্‌র কোন প্রকার দুর্বলতার জন্য নয়, বরং বিজ্ঞতা বলি, আর

যাই বলি, ওটা শুধু মানুষের জন্য করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র ধর্ম বা প্রকৃতিকে বোঝাবার জন্য আল্লাহ্ বাণী পাঠিয়েছেন। কোন জিনিসকে মানুষ চোখে দেখে বুঝতে না পারলে, তাকে বুঝিয়ে দিতে হয়, সেই রূপ আল্লাহ্‌র কোরআন মানবমণ্ডলীকে বুঝিয়ে দেওয়ার, সংকেত করার, সুসংবাদ দেওয়ার অমোঘ বাণী। তাই ইসলামকে বুঝতে হলে প্রথমে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগৎ বা প্রকৃতিজগৎকে অবলোকন করতে হবে। তাঁর অসীম মহিমাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তাঁর সৃষ্টি রহস্যকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আপন সন্তানকে কোলে নিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

তোমাকে দেখিয়া নয়, দেখিতে শিখি
ক্ষীণ সৃষ্টি দেখে তব তোমারে দেখি।
কোরআনে পুরাণে নয় তোমাতে যুঝি
আকাশ পাতালে মর্ত্যে তোমাকে বুঝি।
সৃষ্টির আদিতে নাই আতর গোলায়
জীবন মরণ গড়া কাদায় ধূলায়।
ক্ষুদ্র জ্ঞানের সীমা চোখের আড়ালে
রেখেছ কত কি তুমি আকাশে পাতালে।
রেখেছ আপন রূপ লুকায়ে নিরাকারে
রেখেছ রহস্য কত আলোতে আঁধারে।
নিবিড় অরণ্য কত গভীর জঙ্গল
রেখেছ তাহারও মাঝে সবার মঙ্গল।
যেখানে যাহাই আছে সবইতো কল্যাণ
চিনেছে যে জন সেই মানব মহান।
অতি ক্ষুদ্র সৃষ্টি তব সকলই সফল
বুঝিতে মানব বুদ্ধি বিবেক বিকল।
তোমার সৃজিত জীব গুণ ছাড়া কই
দেখি না মানব সৃষ্টি দোষ ছাড়া বই।
তোমারে দেখিবে যেই আমার এ দৃষ্টি
সেই তো তোমারই দান তোমারই সৃষ্টি। —কাব্যকানন

কোরআন—২ ঃ ২২, ১৬৪, ৩০ ঃ ২২, ৩৫ ঃ ২৭, ২৮, ৭৭ ঃ ২০-২১, ৮৮ ঃ ১৭-২১, ৯১ ঃ ১-৭।

সুতরাং ইসলামকে বোঝার দ্বিতীয় উৎস **কোরআন**।

তৃতীয় উৎস ঃ পবিত্র হাদিস। ইসলামকে জানাব তৃতীয় উৎস স্বয়ং মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বাণী, কথা ও কাজ এবং কোথাও কোথাও তাঁর মৌন সম্মতি বা নীরব অনুমোদন, যাকে বলা হয় হাদিস। যখন কোরআনকে ঠিকমত বোঝা যাবে না তখন যেতে হবে স্বয়ং মহানবীর দরবারে। কেননা কোরআন তাঁরই প্রতি অবতীর্ণ। তিনিই একমাত্র কোরআনের আদি-অন্ত ঠিকমত বুঝেছিলেন। হযরত

আয়েশা (রাঃ) বলেন—'কোরআনই তাঁর চরিত্র।' তিনিই ছিলেন কোরআনের প্রতিটি বাণীর প্রয়োগভূমি।

সুতরাং কোরআন বুঝতে না পারা গেলে হাদিস শরীফের সাহায্য নিতে হবে। তবে কোরআন ও হাদিসের মধ্যে কোথাও কোন বিরোধ বা মতপার্থক্য দেখা গেলে হাদিসকে বাদ দিয়ে কোরআনকেই গ্রহণ করতে হবে। এটা মহানবীরই নির্দেশ। কেননা হাদিস ও কোরআনের মধ্যে কোথাও কোন ছন্দপতন বা মতভেদ হবে না। যদি কোথাও হয়, তখন জানতে হবে—হাদিসটি ভুল। যেমন প্রকৃতি ও কোরআনের মধ্যে কোন গরমিল হতে পারে না। তেমনি কোরআন ও হাদিসের মধ্যেও কোন মতভেদ হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে হাদিসকে পরিত্যক্ত ধরতে হবে এইজন্য যে, কোরআন চির অপরিবর্তনশীল গ্রন্থ। পৃথিবীতে এই একটিই ধর্মগ্রন্থ আছে যার অতীত হতে বর্তমানে ও বর্তমান হতে ভবিষ্যতেও কোন রূপই পরিবর্তন হবে না। একথা কোরআন নিজেই বহুবার ঘোষণা করেছে। অতএব ইসলামকে জানার তৃতীয় উৎস **হাদিস শরীফ**।

চতুর্থ উৎস ঃ চার খলিফা। ইসলামকে জানার চতুর্থ উৎস মহানবীর সৎ-খলিফা চতুষ্টয়—আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলি এবং উমাইয়া খেলাফতের (দ্বিতীয়) ওমর বিন আব্দুল আজিজ এবং কিছু মহান সাহাবী। স্বয়ং মহানবী বলেছিলেন, তাঁর ওফাতের পর ৩০ বছর ইসলামের খেলাফৎ বলবত থাকবে। এই ৩০ বছরের মধ্যে আমরা পাই চারজনকে। অর্থাৎ ৬৩২ হতে ৬৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মহানবীর পরও ইসলামের আসল রূপ বজায় ছিল। পরে উমাইয়া খেলাফতে দ্বিতীয় ওমর ৭১৭ হতে ৭২০ খ্রীঃ ব্যতিক্রম মাত্র। এই পাঁচজনের জীবন হতেও আমরা ইসলামকে জানতে বা চিনতে পারবো। এবং এই অধ্যায়ই ইসলামকে চেনার ও জানার শেষ অধ্যায়। এতদ্ব্যতীত মহানবীর কিছু মহান সাহাবী (সঙ্গী)-ও আছেন। যাঁদের জীবনধারা হতেও আমরা ইসলামকে চিনতে ও জানতে পারি।

সুতরাং ইসলামকে জানার আমরা চারটি সঠিক অধ্যায় পেলাম—প্রকৃতিজগৎ বা সৃষ্টিজগৎ। আল্লাহ্‌র বাণী কোরআন। আল্লাহর শেষ দূত, শ্রেষ্ঠ দূত মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বাণী হাদিস শরীফ এবং মহানবীর পাঁচজন খলিফা, যাঁরা তাঁর জীবনধারাকে অত্যন্ত নিখুতভাবে অনুসরণ করেছিলেন। ইসলামের এই চারটি অধ্যায়ের একটিরও সঙ্গে কোথাও কোনরূপই গরমিল বা ছন্দপতন নেই। যেখানেই ছন্দপতন বা গরমিল, মতভেদ ইত্যাদি লক্ষ্য করা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে—সীমিত জ্ঞানে বোঝার ভুল হচ্ছে। তখন আরও গভীর মনোনিবেশ সহকারে নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

না পেরে বুঝিতে তব বিচিত্র বিধান
মোরা শুধু বলে থাকি করনি সমান।
মনের বিকার শুধু মনীষা বিজ্ঞান
তোমারে চিনিতে চায় তব দেওয়া জ্ঞান।

নহে মোর মানবিক যুক্তি তর্ক জ্ঞান
যেখানে দিয়েছ ধরা সে তো শুধু ধ্যান।
তোমারে করেছে জয় মনের ক্ষুদ্রতা নয়—
বিবেকের সাথে বসা বিশাল হৃদয়।

পঞ্চম উৎস ঃ সৃষ্টির সেবা। ইসলাম প্রধানত দুটো জিনিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একটি তার—ঈমান বা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস; অন্যটি তার—আমল। আমল অর্থাৎ আপন ব্যক্তিগত জীবনে ভাল কাজের মাধ্যমে নিষ্ঠার সঙ্গে ওই বিশ্বাসের যথাযথ প্রয়োগ।

ইসলামের আরও কর্তব্য দুটো। একটি হচ্ছে—হক্‌কুল্লাহ অর্থাৎ স্রষ্টার প্রতি, অন্যটি 'হক্‌কুল এবাদ' অর্থাৎ স্রষ্টার সৃষ্টিজগতের প্রতি কর্তব্য। 'হক্‌কুল্লাহ' অর্থাৎ—কালেমা, নামায, রোযা, হজ, যাকাত এগুলোকে যথাযথভাবে পালন করলে 'হক্‌কুল্লাহ' পালন করা হয়। 'হক্‌কুল এবাদ' অর্থাৎ জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের অন্যান্য সকল জীবজগতের প্রতি তার একটা দায়িত্ব আছে। যাঁরা এই দায়িত্বটি পালন করেন, তাঁরা 'হক্‌কুল এবাদ' পালন করেন। এই দায়িত্বটি হচ্ছে—মানুষের প্রতি দয়া, মায়া, ক্ষমা, ভালবাসা, উপকার, পরোপকার, সহানুভূতি, সাহায্য ইত্যাদি। বর্তমান মুসলিম জগৎ 'হক্‌কুল্লাহ' পালন করছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একদিন আরব খেলাফত শূন্য হাতে সারা পৃথিবীতে ইসলামের শান্তিপতাকা তুলে ধরেছিলেন, যার মাধ্যমে সেটি কিন্তু 'হক্‌কুল এবাদ'। তখনকার দিনে সকল বিজাতি ও বিধর্মীগণ মুসলমানদের আচার, আচরণ, ব্যবহার, আদর্শ ইত্যাদি দেখেই মুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। স্পেন বিজয় ও অন্যান্য বড় বড় বিজয়ের মূলে ছিল মুসলমানদের অভূতপূর্ব আদর্শ। আজকের দিনে মুসলমানদের মধ্যে ওই 'হক্‌কুল এবাদ' জিনিসটা অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। মনে রাখা দরকার, ইসলাম বিশ্বকে জয় করেছিল তার বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের দ্বারা। অগণিত মানুষের মনকে জয় করেছিল তার—ভালবাসা ও আদর্শের দ্বারা।

ইসলাম তার দৃষ্টি সর্বদা সমানভাবে বিস্তারিত করেছে—ন্যায় ও অন্যায়ের ব্যবধান করতে, হারাম ও হালালের পার্থক্য রাখতে। ইসলামের জ্ঞানচক্ষু এই সংসারে একটি পূর্ণ জীবনব্যবস্থার বিধান দিয়েছে, সেটা আল্লাহ্‌তে নির্ভর করতে, কিন্তু নিজ চেষ্টা সহ। সে দান করতে বলে, কিন্তু ভিখারি হতে নিষেধ করে। সে বৈরাগ্যকে স্বীকৃতি দেয় না, কিন্তু সংসারকে মাথায় তুলতে না করে। সে ক্ষমা করতে বলে, কিন্তু ন্যায় বিচারে অটল থাকা তার মহান নীতি। মহানবী এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর কথা বলেছেন—'সবার হক সবাইকে দাও।' অর্থাৎ শিশুর হক শিশুকে দাও, তাকে খেলতে দাও। যৌবনের হক যৌবনকে দাও, অর্থাৎ বিয়ে করো। এইভাবে মানব-শরীরে যা কিছু প্রয়োজন, সমস্ত প্রয়োজনকে তিনি ন্যায়ের সাথে মেটাতে বলেছেন। তাই ইসলাম এ সংসারে একটি সার্থক জীবনব্যবস্থা। তাকে জানা যাবে ও পাওয়া যাবে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে।

মহানবীর জীবন-চরিত রচনার ঐতিহাসিক উৎস

মহানবীকে জানার ও চেনার জন্য প্রধানত পাঁচটা উৎস আছে—**পবিত্র কোরআন, পবিত্র হাদিস,** আরবীয় ও অন-আরবীয় জীবনী-লেখকগণ, পাশ্চাত্য (জ্ঞানপাপী) লেখকগণ।

কোরআন ঃ পবিত্র কোরআনই মহানবীর চরিত্র। একথা আমরা সবিস্তারে পূর্ব অধ্যায়ে এবং কোরআনে মহানবী প্রভৃতি স্থানে ব্যাখ্যা করেছি। মহানবীকে বুঝতে হলে কোরআনই তার প্রথম সোপান। শুধু তাই নয়, শ্রেষ্ঠ সোপান। সমগ্র কোরআনে মহানবী সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবীকে জানার জন্য, বোঝার জন্য, অন্য কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না, যদি কেউ পবিত্র কোরআনকে সঠিকভাবে আলোচনা করেন।

হাদিস ঃ পবিত্র হাদিস মহানবীর বাণী, তাঁর কাজ, মৌন সমর্থন ইত্যাদি। যদি কেউ কোরআনে মহানবীকে ঠিকমত বুঝতে না পারেন, তাহলে তাঁকে হাদিস শরীফের সাহায্য নিতে হবে।

মহানবীর জীবিতকালেই তাঁর সাহাবীগণ হাদিস মুখস্থ করে রাখতেন। মহানবীর ওফাতের পর প্রথম যুগে তাবেয়িনগণ (বর্ণনাকারী) এবং দ্বিতীয় যুগে তাবে-তাবেয়িনগণ পূর্ববর্তী হাদিসবিদ্‌দের নিকট হতে হাদিসগুলোকে মুখস্থ করতেন। হযরত ওমরের সময় কুফা সর্বপ্রথম একটি হাদিস চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কুফার তৎকালীন শাসনকর্তা আবু মুসা আল্ আশারি অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করে গেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ ও আমীর ইবনে সাবিকে কুফা স্কুলের মোহাদ্দেস নিযুক্ত করেন। তখনকার দিনে কুফা ছাড়াও মক্কা, মদিনা, বসরা প্রভৃতি স্থানগুলো হাদিস চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

মদিনা স্কুলের প্রধান ব্যক্তি বলতে ছিলেন—স্বয়ং হযরত আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এবং আবু হুরাইরা প্রমুখ। মক্কা স্কুলের প্রধান ছিলেন—ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে-যুবাইর। বসরার প্রধান ছিলেন—আনাস ইবনে মালিক। হিজরীর প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে (৬২২-৭২২) ইমাম জুহরীই সর্বপ্রথম হাদিস সংকলন করতে শুরু করেন। পরে হিজরীর তৃতীয় শতকে (৮২২-৯২২) আব্বাসীয় খেলাফতের সময় সর্বপ্রথম হাদিস সংকলিত হয়। যার ফলে ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ প্রণীত হয়। যাঁরা এই ছয়টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন—ইমাম বোখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি, ইমাম ইবনে মাজা, ইমাম আল্ নাসায়ী এবং ইমাম আবু দাউদ। ইসলাম জগতে এই ছয়টিকে সিহাহ সিত্তাহ (ছয়টি নির্ভুল) হাদিস গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে। এই হাদিস গ্রন্থগুলোর মাধ্যমেও মহানবীকে জানা যাবে।

সাহাবী—যিনি সোহবৎ বা সাহচর্য লাভ করেছেন মহানবীর, এর বহুবচন—সাহাবা। তাবেয়ী—যিনি সাহাবার সাহচর্য লাভ করেছেন। তাবে-তাবেয়িন—যিনি তাবেয়ীর সাহচর্য লাভ করেছেন। এই তিন শ্রেণীর মানুষ হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদিস সম্পর্কে সর্বশেষ কথা, কোরআনের সঙ্গে হাদিসের কোথাও কোন মতপার্থক্য দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে হাদিসটিকে বাদ দিতেই হবে। এটা স্বয়ং মহানবীরই নির্দেশ।

আরবীয় জীবনী লেখকগণ ঃ মহানবীকে জানার তৃতীয় স্তরে পড়ে প্রথম যুগের আরবীয় জীবনী-লেখকগণ। এটা ছিল ইসলামের সাধারণ ইতিহাস ও মহানবীর জীবন-বৃত্তান্ত কাহিনী। ইসলাম জগতের স্বনামধন্য খলিফা সমগ্র উমাইয়া খেলাফতের গৌরবরবি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের অনুরোধে আনসার বংশীয় আছেম নামক জনৈক দেশবিখ্যাত আলেম দামেস্কের জামে মসজিদে মহানবীর জীবনী ও তদানীন্তন কালের যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতেন।

ইমাম জুহরী ঃ দেশ-বিদেশের তথা আরব ইতিহাস হতে যতটুকু জানা যায়, ইমাম জুহরীর পূর্বে মহানবীর জীবনী গ্রন্থ পুস্তকাকারে কেউই সংকলন করেননি। ইমাম সাহেব সে যুগের শুধু ইসলামি নয়, সর্বশাস্ত্র বিশারদ মহাপণ্ডিতের সম্মান লাভ করেছিলেন। এককথায় তিনি ছিলেন সে যুগের যুগ-মানব। এই যুগ-মানবের চরম ভক্ত ছিলেন সেদিনের মহামানব খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ। খলিফা তাঁকে 'কেতাবুল মাগাজী' লিখবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি খলিফার অনুরোধ রক্ষা করে অক্লান্ত পরিশ্রমে 'কেতাবুল মাগাজী' প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে এই মহাগ্রন্থের অংশবিশেষ 'সিরাতে-মোস্তফা' অর্থাৎ মোস্তফা চরিত বা মহানবীর জীবন-চরিত ইসলামি শিক্ষায়তনগুলোতে বিশেষভাবে পড়ানো হতো। যার ফলে একদিন ক্ষণজন্মা পুরুষ ইমাম জুহরীর শিষ্য রূপে আবির্ভূত হলেন স্বনামধন্য ইমাম মুসা ইবনে ওকবা এবং মহম্মদ ইবনে ইসহাকের ন্যায় কালজয়ী (মহানবীর) জীবনী লেখক। ইসলাম জগতের এই চিরস্মরণীয় ব্যক্তি, মহানবীর জীবনীকারদের পথিকৃৎ ও প্রবাদপুরুষ ইমাম জুহরী হিজরীর ৫০ সনে জন্মগ্রহণ করেন, ১২৪ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

মুসা ইবনে ওকবা ঃ মুসা ইবনে ওকবা একজন স্বনামধন্য মোহাদ্দেস। তিনি ছিলেন ইমাম মালেকের শিক্ষাগুরু। তিনি যখন মহানবীব জীবনী লেখেন তখন অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তাই তাঁর জীবনী গ্রন্থটি ছিল অত্যন্ত তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক। বহু দিন যাবৎ তাঁর পুস্তকটি দেশে অতি মূল্যবান গ্রন্থরূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে মূল গ্রন্থটির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই জগদ্বিখ্যাত মনীষী ১৪১ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

ইবনে ইসহাক ঃ মহানবীর জীবন-চরিত রচনায় সময়ের দিক থেকে মুসা ইবনে ওকবার পর ইবনে ইসহাকের নাম আসে। ইবনে ইসহাক সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায়। তাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জগদ্বরেণ্য পণ্ডিতগণ একমত হতে পারেননি। ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ প্রভৃতি মনীষী ইবনে ইসহাকের নিকট হতে ধর্ম সংক্রান্ত তথ্যাদি নিতে নিষেধ করেছেন। তবে সকলেই তাঁর ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিতে কোন বাধা দেননি। তিনি ছিলেন কাদ্‌রিয়া মতাবলম্বী। জগতের সৃষ্টি তত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের কথাগুলো তিনি মুক্ত মনে খ্রীস্টান ও ইহুদীদের নিকট হতেও গ্রহণ করতেন। কথিত আছে, তিনি অনেক ধর্মীয় বিষয়ও বিনা দ্বিধায় তাঁদের নিকট হতে গ্রহণ করতেন। এখানেই মুসলিম-জাহানের পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে তাঁর দারুণ মত-বিরোধ দেখা দিয়েছিল। তিনি বলতেন স্বয়ং মহানবীও ইহুদী ও খ্রীস্টানদের পুরাতত্ত্বের কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন। সুতরাং তাঁর পক্ষেও

শুনতে বাধা কোথায়। এখানে মুসলিম পণ্ডিতগণও ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি শুনতে কোন বাধার সৃষ্টি করেননি। কিন্তু তাদের ধর্মের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাসে বাধা দিয়েছেন। অনেক সময় তিনি এমন অনেক রাবীর নাম করেছেন, যাঁরা ইহুদী। যেমন তিনি একজন রাবীর নাম করেন—যাঁর নাম ইয়াকুব। পরে দেখা যায়—ইয়াকুব একজন দাসবংশজাত বিধর্মী ইহুদী।

যাই হোক, আমরা তাঁর নিকট হতে যেটি পেলাম, সেটি হচ্ছে—আব্দুল মালেক ইবনে হিশাম নামক হিমইয়র রাজবংশের জনৈক পণ্ডিত মহম্মদ ইবনে ইসহাকের পুস্তকের কতকগুলো টীকা সংকলিত করে একটা পুস্তক সম্পাদন করেন। পরবর্তীকালে এটাই 'সিরাতে ইবনে হিশাম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ইবনে ইসহাকের ঐতিহাসিক তথ্যাদিগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি। কেননা ইমাম বোখারির মতো ব্যক্তিও তাঁর 'যুজ-উল-কোরয়াত' পুস্তকে ইবনে ইসহাকের বর্ণিত তথ্যাদি গ্রহণ করেছেন। এমনকি তাঁর তারিখ পুস্তকের অধিকাংশ তথ্যই ইবনে ইসহাক হতে নেওয়া। যদিও ইমাম বোখারী তাঁর বিখ্যাত বোখারী শরীফ হাদিসে ইবনে ইসহাকের বর্ণিত একটিও রিওয়ায়াত বা তথ্য গ্রহণ করেননি। ইবনে ইসহাক ১৫১ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

ওয়াকেদী ঃ ওয়াকেদীর আসল নাম মহম্মদ ইবনে ওমর। কিন্তু তিনি ইতিহাসে ওয়াকেদী নামেই খ্যাত। পূর্ববর্তীদের ন্যায় ওয়াকেদীও দাসবংশজাত সন্তান। ১৩০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও ২০৭ হিজরীতে পরলোকগমন করেন। ঐতিহাসিক পরম্পরায় ইবনে ইসহাকের পর ওয়াকেদীর নাম আসে মহানবীর জীবন-চরিত রচনার ক্ষেত্রে।

ইসলাম জগতের পণ্ডিত ও মোহাদ্দেসগণ এঁকে একবাক্যে অবিশ্বস্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমাদ এঁকে ঘোর মিথ্যাবাদী বলেছেন। কেননা তাঁর ধারণা ওয়াকেদী ইচ্ছাপূর্বক হাদিসগুলোর পরিবর্তন করেছেন। ইবনে-মুইন, দারকুৎনী, ইবনে আদী প্রমুখ মোহাদ্দেসগণ তাঁর কথাকে অপ্রামাণ্য বলেছেন। তাঁর সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ এনেছেন—ইমাম নাসায়ী, আবু হাতেম ও ইবনুল মাদিনীর ন্যায় মোহাদ্দেসগণ, তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন যে, ওয়াকেদী নিজেই মিথ্যা করে হাদিস জাল করতেন। এই সম্পর্কে ইমাম জাহাবী বলেন—ওয়াকেদীর দুর্বলতা সম্বন্ধে সমগ্র আলেমমণ্ডলী একমত পোষণ করেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন—ওয়াকেদী ৩০ হাজার অভিনব বা জাল হাদিস বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বলেন ওগুলো যইফ্ বা দুর্বল হাদিস।

ওয়াকেদী মহানবীর জীবনী সংক্রান্ত দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেন। একটি 'কেতাবুস্ সিরাৎ' এবং অন্যটি 'কেতাবুৎ-তারিখ আল্ মাগাজী আল্ মাবয়াছ'।

ইসলাম জগতের গৌরব, বিরল প্রতিভাধর ইমাম শাফী (রাঃ) বলেন—"ওয়াকেদীর পুস্তকগুলো মিথ্যার পুঞ্জীভূত পাহাড়।" সকলের ধারণা—পৌরাণিক কাহিনী ও ইতিহাস এবং জীবনী-সংক্রান্ত পুস্তকগুলোতে যে সকল আজগুবি ও জঘন্য বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়, ওয়াকেদীই তার অধিকাংশের গুরু মহাশয়। যার ফলে মুসলিম-জাহানে ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ওয়াকেদীর স্থান ও মান অতি নিম্নে। সকল মোহাদ্দেসগণ, সমূহ আলেমবর্গ চিরকালই তাঁকে চরম অবিশ্বস্ত বলে মত পোষণ করেছেন।

কিন্তু অতি মজার ব্যাপার খ্রীস্টান লেখকগণের প্রধান অবলম্বন এই ওয়াকেদীই। রেভারেণ্ড টি. পি হিউজেস তাঁর Dictionary of Islam গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন— A Celebrated Moslem Historian, much quoted by Muir in his "Life of Mahomet." অর্থাৎ ওয়াকেদী একজন অতি যশস্বী মুসলমান ঐতিহাসিক ও লেখক। মুইর সাহেব তাঁর 'মহম্মদ-চরিতে' তাঁর বহু উক্তি বহুলভাবে উদ্ধৃত করেছেন।

এখানে আমরা অতি সহজেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বুঝতে পারছি, কতিপয় ইংরেজ লেখক ব্যতীত অধিকাংশ ইংরেজ লেখকগণ ইসলাম সম্পর্কে কি বলতে ও বোঝাতে এবং লিখতে ভালবাসতেন। এককথায় আপন আপন পাণ্ডিত্যের আবরণে মহানবী ও ইসলাম সম্পর্কে অন্ধ-বিদ্বেষ ও মনগড়া জঘন্য বক্তব্য ছড়িয়ে গেছেন। এর উত্তরে শুধু বলা যায়—

মহানবী নবী হয়ে রবে বারোমাস
নিজেরই প্রকৃতি তারা করেছে প্রকাশ।

ইবনে সায়াদ ঃ মহানবীর জীবন-চরিত রচয়িতাদের মধ্যে এবার আসে ইবনে সায়াদের নাম। ইনি ছিলেন ওয়াকেদীর সমসাময়িক একজন ঐতিহাসিক। একে কেউ কেউ ওয়াকেদীর সচিব বলেও থাকেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে কাতেবুল ওয়াকেদী বলেও থাকেন। যাই হোক তিনি অতিস্বাধীন ভাবেই চিন্তা-ভাবনা করতেন। তিনি 'তাবাকাতুল-কবির' নামে একটি বিশাল জীবন-চরিত রচনা করেন। পরবর্তীকালে এটা তাবাকাতে সায়াদ নামে খ্যাতিলাভ করে। এই অমূল্য পুস্তকখানি কালগর্ভে বিলীন হতে বসেছিল। তখন জার্মানির কাইর নিজে এক লক্ষ টাকা দান করে এই অমূল্য সম্পদটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। যার জন্য বহু বিজ্ঞ মানুষের সমন্বয়ে একটি কমিটিও গঠিত হয়। গ্রন্থটি নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিল। ইউরোপের ১২ জন আরবী বিশারদ পণ্ডিত অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সেগুলোকে একত্রিত করেন। পরে এই কমিটির ওই ১১ জন সদস্য লুপ্তপ্রায় গ্রন্থখানি ১২ খণ্ডের যথাযথভাবে সংশোধনের কাজ সমাধা করেন। পরিশেষে পণ্ডিত প্রবর এড্‌ওয়ার্ড সাখোর সম্পাদনায় ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে হল্যাণ্ডের রাজধানী লিডেন নগর হতে ওটা প্রকাশিত হয়। এর প্রতিটি খণ্ডের সঙ্গে জার্মান ভাষায় অতি আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর ওপর খুব মূল্যবান বিস্তৃত ভূমিকাও দেওয়া হয়েছে।

ইবনে সায়াদ এই বিশাল গ্রন্থের প্রথম তিন খণ্ডে বিস্তারিত ভাবেই মহানবীর জীবনী আলোচনা করেছেন। অন্যান্য খণ্ডগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের জীবন-চরিত আলোচনা করেছেন। এই প্রথম তিন খণ্ড মহানবীর জীবন-চরিত রচনাতে অপরিমিত উপাদান দান করে।

ইবনে সায়াদ নিজে একজন মোহাদ্দেস ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তদানীন্তন মোহাদ্দেসগণ খুবই ভাল ধারণা পোষণ করেন। ইবনে সায়াদের গ্রন্থখানি ইবনে ইসহাকের গ্রন্থের মতই সুবিন্যস্ত।

ইমাম বোখারি ঃ ওপরের উল্লেখিত পুস্তকগুলো কেবলমাত্র মহানবীর জীবন-চরিত ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত। এতদ্ব্যতীত ওই সময় মুসলমান ইমাম ও আলেমগণ সাধারণভাবে ইসলামের যে সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম বোখারির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি দুটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। একটির

নাম—'তারিখে কবির' এবং অন্যটির নাম—'তারিখে সগির'। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ হেন ইমামের এ হেন বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারটিকে আজও ছাপা হলো না। অথচ মরহুম মওলানা শিবলী তাঁর তুরস্ক ভ্রমণের সময় আয়াসুফিয়ার স্বনামধন্য জামে মসজিদে ওর অনুলিপি দেখে এসেছেন। একথা তিনি তাঁর 'সিরৎ' গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখও করেছেন। ইমাম সাহেবের 'তারিখে সগির' গ্রন্থখানি ছাপা হয়েছে। কিন্তু ওই গ্রন্থটিতে মহানবীর জীবনী-সংক্রান্ত তেমন কিছু নেই। ইমাম সাহেব ১৯৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে শুক্রবারের পূর্ণিমা রজনীতে জন্মগ্রহণ করেন, ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল ঈদর-জনীতে ৬২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

ইবনে জরীর তাবারী ঃ মহানবীর জীবন-চরিত রচনার অধ্যায়ে ইমাম বোখারির পর আমরা যাঁর নাম করতে পারি তিনি একজন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও কোরআনের ব্যাখ্যাকার ইমাম আবু জাফর মহম্মদ ইবনে জরীর তাবারী। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারিখুল মূলক-আল ইমাম' অর্থাৎ রাজন্যবর্গ ও জাতি সমূহের ইতিহাস। এটা ১২ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ। এর প্রথম কয়েক খণ্ডে মহানবীর জীবনী বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ইতিহাসের মতো ইমাম সাহেবের কোরআনের তফসিরখানিও একটি মূল্যবান বিশাল গ্রন্থ। এটিও মহানবী সম্পর্কে একটি বিশাল গ্রন্থ। এখানেও মহানবী সম্পর্কে বহু বিষয় জানা যায়।

ইবনে জরীর তাবারী ছিলেন কিছুটা শিয়া মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। তাই অনেক কট্টর সুন্নীপন্থী আলেমগণ তাঁর কিছুটা বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ইমাম জাহাবী এই সম্পর্কে অতি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন—ইমাম জরীর শিয়া হতে পারেন, তাই বলে তিনি ভাল পণ্ডিত হবেন না, এটা কোন্ ধরনের কথা। তবে যদি তাঁর পাণ্ডিত্যের কোথাও ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকে, সেটা স্বতন্ত্র কথা। যাই হোক ইবনে জরীরের বিশাল গ্রন্থ হতে আমরা মহানবীর জীবন-চরিত রচনার বহু মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব পেয়ে থাকি। তাঁর মহান লেখনী নিঃসন্দেহে মহানবীর জীবন-চরিত রচনার এক অভ্রান্ত ঐতিহাসিক উৎস।

ইমাম ইবনে কাইয়ুম ঃ জীবনী ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও কিছু লেখক ছিলেন, যাঁরা ঐতিহাসিক বিবরণ উপস্থাপনেও কোরআন, হাদিস ও শরীয়ত সংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনা করেছেন। এরূপ লেখক খুব একটা বেশি নেই। এঁদের মধ্যে স্বনামধন্য ইবনে কাইয়ুম। তিনি তাঁর 'জাদুল মায়াদ' গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে আজও অমর।

অন-আরবীয় জীবনী লেখকগণ

স্যার সৈয়দ আহম্মদ ঃ পাশ্চাত্য লেখক সেল, মুইর, মার্গোলিয়াথ, স্প্রেঙ্গার প্রমুখ লেখকগণের বিদ্বেষপ্রসূত লেখার দ্বারা মুসলমানগণ যখন একেবারেই বিচলিত হয়ে উঠল তখন তাঁদের মুখের মতো জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হলেন কিছু ভারতীয় মুসলমান লেখক। এঁদের মধ্যে সবিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য স্যার সৈয়দ আহম্মদ। তিনি প্রথম উর্দুতে রচনা করলেন খোতবাতে আহমদিয়া। এই পুস্তকে তিনি আরবদেশ, আরবজাতি, কুরাইশ বংশ, মহানবীর বাল্যজীবন, কোরআন ও হাদিস সম্বন্ধে নানাবিধ বিষয়ে অতি মূল্যবান পুস্তক রচনা করে ইংরেজ লেখকদের লেখার অসারতা অকাট্য ভাবেই প্রমাণ করেন। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থটিই ইংরেজিতে Essay on the Life of Mohammad নামে প্রকাশিত হয়।

কাজী মোহম্মদ সোলায়মান ঃ লেখক মহানবীর সম্পূর্ণ জীবনী হিসাবে 'রাহ্‌মাতুল-আলামীন' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য—কোরআন ও হাদিসকে প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা।

আল্লামা শিবলী ঃ মরহুম আল্লামা শিবলী নোমানী ও তাঁর ছাত্র আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী উভয়েই বিখ্যাত লেখক। তাঁদের ছয় খণ্ডে রচিত 'সিরাতুন নবী' এক অমর সৃষ্টি। দীর্ঘ এক যুগ অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁরা এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যাকে ইসলামের বিশ্বকোষ বললেও অত্যুক্তি হবে না। আধুনিককালে মহানবীর যতগুলো উত্তম জীবনী-গ্রন্থ রচিত হয়েছে, এই গ্রন্থ তাদের অন্যতম। মওলানা ইব্রাহিম সিয়ালকোটি সাহেবের 'তারিখে নবী'-ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

মওলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ ঃ মওলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁ রচিত 'মোস্তফা চরিত' একটি কালজয়ী গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত যতগুলো মহানবীর জীবন-চরিত বের হয়েছে, তাদের মধ্যে 'মোস্তফা চরিত' নিঃসন্দেহে একটি অমূল্য গ্রন্থ। যদিও আমি গ্রন্থটির সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নই। আমার একথা শুনে তিনি কোনদিনই বিরক্ত হননি। বরং খুশি হয়েই জ্ঞানচর্চা করতে উৎসাহ দিতেন। মওলানা সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ও ছিল, আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ছাত্র। তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যেতাম। জ্ঞান-তাপস, কর্মবীর তখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। কিন্তু তখন তাঁর জ্ঞানের দীপ্তি চারদিককে যেন দীপ্তময় করে তুলেছে। তাঁর লেখা 'মোস্তফা চরিত' আমার খুবই ভাল লেগেছে। যে স্থানটিতে বা যে কারণে এত ভাল লেগেছে সে কথাটি মওলানা সাহেব নিজেই বলে গেছেন—"অন্যান্য (ইংরেজ) লেখকগণ হযরতের জীবনী সম্বন্ধে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় যেরূপ সত্যের অপলাপ করেছেন 'মোস্তফা চরিত' সাধারণত তারই সমষ্টিগত প্রতিবাদ।" স্বনামধন্য মওলানা আবুল কালাম আজাদও এই শ্রেণীর একজন বলিষ্ঠ লেখক।

কবি গোলাম মোস্তফা ঃ কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' বাংলা ভাষায় মহানবীর জনপ্রিয় জীবনীগ্রন্থ। কবির জীবিত অবস্থায় বহুবার তাঁর বাড়িতে গেছি, এবং বহু সভা-সমিতিতে তাঁকে আমি নিমন্ত্রণ করে আনতাম। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁরও বইয়ের অনেক ক্ষেত্রে আমি একমত হতে পারিনি। সে কথা তাঁকেও বলেছিলাম। তিনি আমার সঙ্গে একমতও হয়েছিলেন। আজ এঁরা কেউই আর জীবিত নেই। আমি তাঁদের বইগুলো থেকে বহু উপকার পেয়েছি। আল্লাহ্‌র নিকট তাদের রূহের শান্তির জন্য মাগফিরাত কামনা করছি।

রামপ্রাণ গুপ্ত ঃ রামপ্রাণ গুপ্তের 'মহম্মদ চরিত' একটি নামকরা বই। লেখক ভক্ত ও ভাবুক। তাঁর লেখা সম্পর্কে প্রথম আমাকে বলেছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই আচার্য সুকুমার সেন। 'মহম্মদ চরিত'-এ লেখক তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। মহানবীর জীবনের একটি দিক অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—সেটি তাঁর অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

জীবন বিপন্নময় অন্ধকার রাতে
সন্ধি কভু কর নাই অজ্ঞতার সাথে।

মুসলমান লেখকগণের মহানবীর ইংরেজি জীবনী

বহু মুসলিম লেখক ইংরেজিতে মহানবীর জীবন-চরিত রচনা করেছেন। আমরা তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করছি।

1. Sir Syed Ahmed : Essays on the Life of Mohammad. London, 1871
2. Sir Syed Amir Ali : Life of Mohammad. London, 1873
3. Moulavi Cherag Ali . A Critical Exposition of the Popular Gihad. Calcutta, 1885
4. Mizra Abul Fozal : Life of Mohammad. Calcutta
5. Salmin . Life of Mohammad. Paris
6. Abdul Hakim Khan : The Prophet and Islam. Patiala, 1916
7. Maulana Mohammad Ali : Mohammad the Prophet. Lahore, 1924.
8. Khwjha Kamal-uddin : The Ideal Prophet. Working Mosque London, 1925
9. Hafiz Gnulam Sarwar : Life of the Holy Prophet. Lahore, 1845

পাশ্চাত্য লেখকগণ ঃ মহানবীর চরিত্র নিরূপণে আমরা পাশ্চাত্য লেখকগণকে সময়ের দিক থেকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগ—একাদশ শতাব্দীর সূচনা হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগ—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হতে।

এই দুই যুগেরই লেখকগণ ইসলাম, কোরআন, হাদিস, আল্লাহ্, মহম্মদ ও মুসলমান সম্পর্কে সমগ্র ইউরোপে বিভিন্ন ভাষায় যে অমানুষিক মানসিকতা নিয়ে কলম ধরেছিলেন, তা ঠিকমত বর্ণনা করাই অসম্ভব। তাঁদের বর্ণনায় সত্যের অপলাপ এতখানি হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে তাঁদেরই বংশধরগণ ওই সমস্ত লেখাগুলোকে বহুলাংশে খণ্ডন করেন। তাঁদের মূলত উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র খ্রীস্টান জগৎকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরমভাবে উত্তেজিত করা। এইটাই ছিল তখনকার দিনে যুগ-চাহিদা।

তখনকার লেখকগণ মহানবীকে নানা বিকৃত নামে ডাকতেন। কেউ বলতেন—Mahaund (মাহাউণ্ড), কেউ বলতেন—Macon (মেকন), কেউ বলতেন—Mammet বা Mawment (মামেট)। এই সমস্ত শব্দগুলো হতে তাঁরা প্রতিমা বা প্রতিমালয় প্রভৃতি শব্দ সৃষ্টি করেন। এক শ্রেণীর লেখক প্রচার করেন—"মহম্মদ নিজেকে আল্লাহ্ বলে প্রচার করেন।" সুতরাং তাঁরা মহানবীকে যিশুর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে আরবজাতির আল্লাহ্ বা জাল আল্লাহ্ বলে অভিহিত করেন। তাঁরা আরও বলেন—"আরবগণ মহম্মদ নামে একটি পুতুলের পূজা করত, এবং মহম্মদ নিজ হাতে ওটা তৈরি করেন।" এবং তাঁরা আরো বলেন—"মুসলমান স্ত্রীলোকগণ মহম্মদকে ঈশ্বর-রূপে পুজো করত।"

শূকর মাংস ঃ মুসলমানদের নিকট শূকর মাংস একেবারেই নিষিদ্ধ, অথচ এটা খ্রীস্টানদের অতি প্রিয়। খ্রীস্টান লেখকগণ বলেন—'একদিন মহম্মদ নিজ বুজরুগি দেখাবার

জন্য কয়েকটি জলপাত্র ভূগর্ভে লুকিয়ে রাখেন। হঠাৎ একদল শূকর মাটি খুঁড়ে সেগুলো বের করে দিলে মহম্মদ রাগে অন্ধ হয়ে শূকর মাংস নিষিদ্ধ করে দেন।" মহানবী সম্পর্কে এরূপ অসংখ্য বানানো মনগড়া নির্জলা মিথ্যা কাহিনী পাওয়া যায় ওই যুগে। অথচ জ্ঞান-পাপীরা জানতেন শূকর মাংসকে মহানবী নিষিদ্ধ করেননি, স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কোরআনে ওটা নিষিদ্ধ করেছেন। কোরআন—২ ঃ ১৭৩। এইরূপ ধরনের কাহিনী ও ঘটনা বহু আছে, যার মূলে আছে কেবলমাত্র ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, মিথ্যা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, পরশ্রীকাতরতা, অজ্ঞতা, অসভ্যতা ইত্যাদি।

মৃগী বা মূর্ছা রোগ ঃ স্যার উইলিয়ম মুর একদিন এদেশের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ লাভ করেছিলেন। সেই সুযোগের তিনি সদ্ব্যবহারও করেছেন। তিনি তাঁর মুনিব খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের নির্দেশমত ন্যায় ও সত্যের মাথায় বেমালুম পদাঘাত করে একটি বই লিখলেন। যার নাম—Life of Mahomet. ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বইটির প্রথম সংস্করণ বের হয়। এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে। বইটির মধ্যে তিনি অকথ্য মিথ্যা কাহিনীর সমাবেশ করেন। এইরূপ বহু কাহিনীর মধ্যে একটি হচ্ছে মৃগী বা মূর্ছা রোগ। মূর সাহেব আবিষ্কার করলেন মহানবীর মধ্যে মৃগী বা মূর্ছা রোগের। এই রোগটিকে কেন্দ্র করে মূর সাহেব মহানবীকে নানা কষ্টকল্পিত ঘটনায় জড়িয়ে দেন। একটা উচ্চশিক্ষিত লোক সত্যের এ হেন অপলাপ করতে পারে, একথা চিন্তা করতেও অবাক লাগে। একজন অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষ এরূপ করলে, তাঁকে ক্ষমার চোখে দেখা যায়। কিন্তু যখন কোন উচ্চ-শিক্ষিত মানুষ নিজ জ্ঞানে এরূপ অন্যায় ও জঘন্যতম পাপ করেন, তখন তাঁর পাপ হয় সাধারণ মানুষের পাপ অপেক্ষা একশ গুণ বেশি। তাই সেটা হয় অমার্জনীয় পাপ। এই প্রসঙ্গে মহানবী শিক্ষিত মানুষদের সতর্ক করে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, "হাসআনাতুল্ আব্‌রার—সাইয়াতুল মোকাররেবীন।" এর আভিধানিক অর্থ—দূরস্থ ব্যক্তিদের জন্য যেটা পুণ্য, নিকটস্থ ব্যক্তিদের জন্য সেটা পাপ। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ হতে বহু দূরবর্তী মানুষ, বা অশিক্ষিত মানুষ, তারা সামান্যতম ভাল কাজ করলে, সেইটাই তাদের জন্য বড় পুণ্য। কিন্তু যারা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়, যাদের আল্লাহ্ বহু জ্ঞান দান করেছেন, যারা উচ্চশিক্ষিত, তারা সামান্যতম ভুল করলেই সেটা মহাপাপ। তাই অশিক্ষিত ব্যক্তি যে কাজ করে পুণ্য অর্জন করেন, একটা সুশিক্ষিত ব্যক্তি সে কাজ করলে, সেটা তার জন্য পাপ স্বরূপ। উচ্চ-শিক্ষিত মূর সাহেব সেই মহাপাপে পাপী ও চিরধিক্কৃত মানুষ।

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে স্বনামধন্য ক্ষণজন্মা পুরুষ স্যার সৈয়দ আহম্মদ Essays on the life of Mohammed নামক পুস্তক প্রণয়ন করে মূর সাহেবের লেখার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। তখন মূর সাহেব তাঁর সংবিৎ ফিরে পেয়ে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পুস্তকের সংশোধন করে নতুন সংস্করণ বের করতে বাধ্য হলেন। মূর সাহেব তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণগুলোতে যে অকথ্য মিথ্যা ও অসংখ্য ভুলের সমাবেশ করেছিলেন, সেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

মহানবীর বিবাহ সম্পর্কে ঃ কুরুচিসম্পন্ন ইসলাম-বিদ্বেষী মার্গোলিয়থ সাহেব মহানবীর বিবাহকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত গ্রন্থে মিথ্যার কম সমাবেশ করেননি। বিবি

খাদিজা ও মহানবীকে নিয়ে তিনি অতীব ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এককথায় তিনি মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন—বিবাহের পূর্বে মহানবী ও বিবি খাদিজা অবৈধ প্রেমে জড়িত ছিলেন। আবার কোথাও বলেছেন—তাঁরা তাঁদের পারিবারিক প্রথানুসারে রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এক দেবীর পূজা করতেন। এই সমস্ত সীমাহীন মিথ্যা রচনার জন্য মার্গোলিয়থ মহামূর্খ উপাধি পেলেন অনেকের কাছেই।

জ্ঞানপাপী মূরের ধৃষ্টতা ঃ যায়েদ ছিলেন মহানবীর পুত্রবৎ সেবক মাত্র। যায়েদ অতি বাল্যকালে ক্রীতদাস রূপে বিবি খাদিজার নিকট আসেন। বিবাহের পর খাদিজা বিবি যায়েদকে মহানবীর সেবা-যত্নের জন্য তাঁকে দান করেন। যায়েদ তখন নাবালক। যায়েদের পিতামাতা প্রাক্ ইসলামি যুগে খ্রীস্টান কিংবা ইহুদী ছিলেন। মূর সাহেবের উর্বর মস্তিষ্ক আবিষ্কার করল, মহানবী যায়েদের নিকট হতে ধর্মশিক্ষা করেন। এইরূপ ধৃষ্টতাকে মানুষ বিবেকের আত্মহত্যা ছাড়া আর কি বলতে পারে!

এই সমস্ত লেখকগণ বিনা দ্বিধায় নানা প্রকারের মিথ্যার অবতারণা করে মহানবীর চরিত্রকে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি তাঁরা পবিত্র কোরআন সম্পর্কেও কটূক্তি করতে দ্বিধাবোধ করেননি। অনেক সময় বলেছেন—শয়তান মাঝে মাঝে মহানবীর মুখে অসত্য বাণী পুরে দিত। এবং মহানবী ওইগুলোকে কোরআন বলে আবৃত্তি করলে কোরেশগণ হাসাহাসি করত। কখনও কখনও ফেরেশ্‌তা জীবরাইল এসে মহানবীকে ভীষণ ভর্ৎসনা করতেন। একজন মদ্যপ বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি বিশৃঙ্খল ও বেপরোয়া হয়ে অজ্ঞতাবশত যে ভাবে কথা বলে, পাশ্চাত্য লেখকের অনেকেই মহানবীর চরিত্র বর্ণনাতে সেই মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এমনি তাঁদের বাহাদুরি।

তায়েফের পথে মহানবীর যাত্রা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। সকলেই জানেন মহানবী তায়েফে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে। কিন্তু এখানে স্যার উইলিয়ম মূর ও ইসলাম-বিদ্বেষী মার্গোলিয়থ আবিষ্কার করলেন—মহানবী সেখানে গিয়েছিলেন তায়েফবাসীদের নিয়ে মক্কাবাসীদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে। এবং তায়েফবাসীগণ মহানবীর এই কুচক্র বুঝতে পেরে তাঁকে চরম লাঞ্ছনার সঙ্গেই তায়েফ হতে বিদায় দেন। পরবর্তীকালে বহু পাশ্চাত্য লেখকই এ সব মিথ্যা রচনা বর্জন করে তাঁদের লজ্জা দেন।

মদিনাতে মহানবীর চরম সাফল্য দেখে মূর সাহেব তাঁর গায়ের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন—'আর তিনটে বছর মহানবী অকৃতকার্য থাকলে ইসলামের দীপ চিরতরে নিভে যেত। মূর বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাঁর বিচক্ষণতাকে তিনি ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারেননি। তিনি যদি একবার কোরআন পড়তেন, তাহলে অতি সহজেই বুঝতে পারতেন, ইসলামের দীপশিখা নির্বাণ লাভ করার জন্য ধরণীতে আসেনি। তার শিখা চির অনির্বাণ। তাই কোরআন বলে—"তিনিই স্বীয় রসুলকে সুপথ ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি একে (ইসলামকে) সকল ধর্মের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, এবং যদিও অংশীবাদীরা (বা পাশ্চাত্য লেখকের) অনেকেই এটা অপছন্দ করে। কোরআন—৬১ ঃ ৯

জ্ঞানপাপী মার্গোলিয়থের বিদ্বেষ ঃ মহানবী যখন মক্কার মাটিতে নানা অবর্ণনীয় অত্যাচারে জর্জরিত তখন তাঁর কোমল হৃদয় সঙ্গী-সাথীদের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। আপন চোখের সামনে তাঁদের ওই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁদের অনুমতি দিলেন আবিসিনিয়া বা অন্য কোথাও নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য। ইসলাম-বিদ্বেষী মার্গোলিয়থ মহানবীর ওই প্রেম-ভরা ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয়কে লক্ষ্য না করে বহু কষ্টে চিন্তা করে ঠিক করলেন, মহানবীর প্রাণের ভয় ছিল ভীষণ। তাই তিনি কোথাও প্রথম যেতে চাননি। পাঠিয়েছিলেন আপন সঙ্গীদের। এইভাবে পাশ্চাত্য লেখকগণ প্রমাণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন—মহানবী ছিলেন একজন স্বার্থপর, সুযোগসন্ধানী, ভীরু ও কাপুরুষ। যদি কারও বিবেক বলে কিছু থাকে, তিনি মহানবীর চির শত্রু হলেও ওই অপবাদ তাঁকে দিতে পারেন না। ইসলাম-বিরোধী মার্গোলিয়থ মহানবী ও জুম্মার নামায সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন—মহানবী যখন ইহুদীদের বশে আনতে পারলেন না, যখন ইহুদীরা মহানবীকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন মহানবী তাঁর শনিবারের প্রার্থনা ত্যাগ করে শুক্রবারের জুম্মার নামাযের আদেশ দিলেন। ইহুদীদের রোযা বা উপবাস দিনগুলোকে ত্যাগ করে নিজে একমাস রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। ইহুদীদের কেবলা জেরুজালেমকে ত্যাগ করে মক্কার কাবাকে ইসলামের কেবলা বলে ঘোষণা করলেন। আমরা-মার্গোলিয়থের কথার অকাট্য জবাব দেব ; এই এগুলো সবই ছিল পবিত্র কোরআনের ঘোষণা। মহানবী কোনটিই নিজ হতে ঘোষণা করেননি। মার্গোলিয়থের কথা শুনে মনে হয় মহানবীর সঙ্গে ওহীর যেন কোন সম্পর্কই ছিল না। অথচ যে কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত মহানবী নিতেন, তা নিতেন ওহীর মাধ্যমে। জুম্মার নামায সম্পর্কে ওহী—কোরআন—৬২ ঃ ৯-১১ ; কেবলা নির্ধারণ, কোরআন—২ ঃ ১৪৪, রোযার নির্দেশ, কোরআন—২ ঃ ১৮৩-১৮৭।

এই সমস্ত জ্ঞানপাপী পাশ্চাত্য লেখকগণের জল্পনা-কল্পনা, মিথ্যাচার, দুরভিসন্ধি, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, নীচতা, হীনতা ইত্যাদিকে ক্ষণজন্মা পুরুষ, লৌহমানব, কর্মবীর ও জ্ঞানবীর মওলানা মহম্মদ আকরম খাঁ তাঁর রচিত সুবিশাল পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ 'মোস্তফা চরিত'-এ সব যুক্তি খণ্ডন করে উপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন। সারা গ্রন্থে জবাবের মতো জবাব দিয়েছেন। ভবিষ্যতে যাতে কোন ইসলামের ইতিহাসের পাঠক-পাঠিকা ও ছাত্র-ছাত্রীগণ ওই সমস্ত জ্ঞানপাপীদের রচিত পুস্তক পড়ে বিভ্রান্ত না হন, তার জন্য আমি জ্ঞানপাপীদের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাও দিলাম। একদিন যাঁরা সমাজে লর্ড, স্যার, মহাত্মা ও মহানুভব উপাধি লাভ করেছিলেন, তাঁরা আবার মহানবীর জীবনী রচনাকালে তাঁদের ওই সমস্ত পদবিগুলোকেও আপন আপন বিবেককে শয়তানের সিন্ধুকে বন্ধক রেখেছিলেন। মহাসত্যের প্রকাশ্য অবমাননায় ও অপলাপে এদেরকে শয়তান জ্ঞানপাপী ব্যতীত আর কি বলব!

এ যুগের জ্ঞানপাপী ঃ সলমন রুশদি—সে যুগের (১১০০—১৩০০ খ্রীঃ) ভণ্ড ওয়াকেদী প্রমুখ লেখকগণ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রাণভরে মিথ্যা রচনা করে গেছেন। (১৬০০—১৯০০ খ্রীঃ) জ্ঞানপাপী মূর ও মার্গোলিয়থ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ওই একই

ঘৃণ্য কাজ করে প্রাণের জ্বালা মিটিয়ে ওয়াকেদীর প্রিয় শিষ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ যুগের জ্ঞানপাপী ইহুদী কন্যার পাণিগ্রহণকারী 'স্যাটানিক ভার্সেস'-এর লেখক সলমন রুশদি নতুন কিছু না করেই নতুন মোড়কে ওই পুরানো উপাদান দিয়ে ওই গুরুদেরই অন্ধ অনুসরণ করে বাজিমাত করতে চান। কিন্তু ইসলামের প্রচারক মহানবী (দঃ) যে হিমালয়কে (কোরআন) মাথায় করে চিরদিন সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে ও তাঁর হিমালয় কোরআনকে ম্লান করে মুছে দেয়, সে শক্তি আজও সারা বিশ্ব ধরেনি, আর কোনদিনই ধরবে না।

কোরআন—৪ ঃ ১৬৫, ৭ ঃ ১৫৮, ১৫ ঃ ৯, ১০, ১৬ ঃ ৩৬, ১৮ ঃ ১১০, ৩৩ ঃ ২১, ৩৪ ঃ ২৮, ৪৮ ঃ ৮-৯, ৫১ ঃ ৬, ৭৫ ঃ ১৭।

জ্ঞানপাপীদের পুস্তক তালিকা (প্রথম যুগ) ঃ

1) Boyle's Critical Dictionary. art, 'Mahomet'.
2) Remarkable Prophecy. John Megee. 8th edition.
3) The accounts of Prophet in Lithgow's Travels.
4) Sandy's Travels to Turkey.
5) Complete History of the Turks. Vol. II. chap III. pp. 96. 100. 1701
6) Islamic Library.
7) History of Magic, Nandaeus, Ch. XIV, 1657.
8) Weber's Metrical Romances, Vol II., 1810.
9) History of the Crusades. T. Archer. Ch. V., P. 90.
10) Strange and Miraculaus News from Turkey sent to our English Ambassador.
11) Tare news from Turkey, The Downfall of Mahomets Religion.
12) Prophecies of Christopher Kellerus etc.
13) Great and Wonderful Prophecies.
14) The Prophecies of a Turk Concerning the Downfall of the Mahometanism.
15) A Great Vision seen in Turkey land.

এই বইগুলো ধর্ম-বিদ্বেষ ও জঘন্যতম মিথ্যার বিশ্বকোষ ব্যতীত কিছুই নয়।

দ্বিতীয় যুগের সত্যনিষ্ঠ পাশ্চাত্য লেখকগণ ঃ এই যুগের কতিপয় জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির লেখা পড়লে অতি অনায়াসেই বোঝা যায় যে, তাঁরা মহানবী সম্পর্কে সত্য বলতে, সত্য উদ্ধার করতে এবং অসত্যের প্রতিবাদ করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। এঁরাও কিন্তু পাশ্চাত্য লেখক যেমন—পি. কে. হিট্টিও, পিকথল প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এঁদের চেষ্টা হয়তো প্রথম দিকে সর্বত্র সফলতা অর্জন করতে পারেনি, তবুও বিশ্ব-মুসলমান চিরদিন এঁদের সাধু প্রচেষ্টার জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এই কতিপয় স্বনামধন্য লেখকের সত্যনিষ্ঠা ও সৎ সাহসের ফলেই ইসলাম ও মহানবী সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে শতাব্দীর পর শতাব্দীর মিথ্যা জালকে ছিন্ন করে রাজপথে দাঁড়াবার শক্তি ও সম্মান লাভ করল। বাদবাকি প্রথম যুগের কষ্ট-কল্পিত লেখকদের ন্যায় মিথ্যা জালে জড়িয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় যুগের জ্ঞানপাপীগণের পুস্তক তালিকা

1) Mohamedis Imposture. W. Bedwell. London. 1615
2) Mahomet Unmasked. W. Bedwell. London. 1642
3) Religion and Manners of Mohametans. Joseph Pitts. 1704
4) The True Nature of the Imposture. Dean Prideaux, London. 1718
5) Life of Mahomet Count Boulain Villiers. London. 1731
6) Sale's Translation of the Koran. 1731
7) Decline and Fall of the Roman Empire. E. Gibbon. London. 1771
8) The Rise of Mahomet Accounted for N. Alcock. London. 1976
9) History of Mahomedanism. C. Mills. London. 1817
10) Mahomedanism Unveiled. Rev. C. Forster. London. 1829
11) An Apology for the life of Mahomed. G. Higgins. London. 1829
12) History of Mahomedanism. W. C. Tylor. London. 1834
13) Hero As Prophet. Thomas Carlyle, London. 1840
14) Life of Mahammed Rev. George Bush. New York. 1844
15) Life of Mohammed. Abul Fada. Translated by Rev. W. Murry. No. date.
16) Life of Mohamed. A. Sprenger. Calcutta. 1851
17) Life of Mahomet. Washington Isring. London, 1850
18) Life of Mahomet, William Muir. London, 1858
19) Imposture Instanced in the Life of Mahomed. Rev. G. Akehurst. London. 1858
20) Apology for Mahomed and the Quran. John Davenport, London. 1869
21) Mahomed and Mahomedanism. R. Bosworth Smith, London. 1874
22) Notes on Mahomedanism. Rev. T. P. Hughes. London. 1877
23) Islam and its Founder. J. W. H. Stobart. London, 1878
24) Mahomed. Budha and Chirst. Marcus Dods. London. 1878
25) Mahomed D. S. Margoliuth. London. 1906
26) Rise and Progress of Mahomedanism. Dr. Henry Stubbe, London
27) Mahomedanism. Dr. G. W. Leitner. London

এছাড়াও আরও কিছু বই আছে, যেগুলো মিথ্যা ও অপবাদে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত বইগুলোর একটিই উদ্দেশ্য ছিল, ইসলাম ও মহানবীকে যে কোন প্রকারেই হোক ছোট করা। কিন্তু অতীব দুর্ভাগ্যের কথা, মহাকালের কবলে তাঁরাই আজ নীচ ও হীন প্রতিপন্ন হচ্ছেন। এই সমস্ত শয়তান-নামী লেখকদের জন্য বলতে চাই ঃ

তুমি চোর ভাব মনে মানুষ যত—
দুনিয়া তামাম বোধ হয় তোমার মত।
নবীজী নবীই হয়ে রবে বারোমাস
তোমারই কুকৃতি তুমি করেছ প্রকাশ।

নবী ও রসুল

কোরআন—২ ঃ ৬১, ৯১, ১৩৬, ১৭৭, ২১৩, ৩ ঃ ২১, ৫২, ৪ ঃ ১৬৩-১৬৪, ৫ ঃ ১১১, ১১২, ৬ ঃ ৮৩-৮৬, ৮৮, ১১৩, ১৯ ঃ ৫৩, ৫৬, ৩৩ ঃ ৭, ৩৭ ঃ ৭৫-১৮২। (নিশ্চয় আমি তোমার নিকট বহু রসুলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছি এবং বহু রসুলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিনি। ৪ ঃ ১৬৪)

আল্লাহ্‌র সকল প্রেরিত দূতই নবী নামে অভিহিত। কিন্তু এদের সকলকেই রসুল বলা যাবে না।

নবী ঃ আল্লাহ্‌র যে সমস্ত দূত কোন ধর্মগ্রন্থ পাননি, যিনি কোন নতুন শরীয়ত (ধর্মের নব বিধিবিধান) প্রচলন করেননি, যিনি জাগ্রত অবস্থায় কোন ওহী পাননি, যাঁরা শুধু পূর্বতন দূতগণের (রসুল) শরীয়তকে সজীব, সচল ও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই নবী নামে অভিহিত। —তফসিরে বয়জাবি, পৃঃ ৫৭।

রসুল ঃ আল্লাহ্‌র যে সমস্ত দূত পূর্বতন শরীয়তকে মন্‌সুখ বা বাতিল ঘোষণা করে নতুন ঐশী গ্রন্থ ও মোজেজা লাভ করেছেন, নিদ্রিত ও জাগ্রত, উভয় অবস্থাতেই ওহী লাভ করেছেন, তাঁরাই একমাত্র রসুল নামে অভিহিত। রসুল হওয়ার প্রধান শর্ত—১। ঐশী গ্রন্থ লাভ, ২। মোজেজা লাভ, ৩। জাগ্রত অবস্থায় ওহী পাওয়া, ৪। নব শরীয়াত প্রচারের অধিকার পাওয়া।

নবী ও রসুলগণের সংখ্যা ঃ

১। ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী, তন্মধ্যে ৩১৫ রসুল। তফসিরে রুহোল মায়ানি। মসনদে ইমাম আহমাদ সপ্তম খণ্ড।

২। ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী। তন্মধ্যে ৩১৩ রসুল। তফসিরে কবির, তফসিরে বজায়জবি।

৩। ২ লক্ষ ২৪ হাজার নবী। তন্মধ্যে ৩১৫ রসুল। আকায়েদে নাসাফি।

৪। উলুলআজম ঃ শ্রেষ্ঠতম রসুলদের 'উলুল আজম' বলা হয়। এঁদের সংখ্যা—মতান্তরে ৮, ৬ ও ৫।

এই সব সংখ্যা-তত্ত্ব নিয়ে কলহ করাটা মোটেই সমীচীন নয়। বরং কাজ করাটা বড়ই প্রশংসনীয়। কেননা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুল মতবাদ ও মতভেদ নিয়ে ঝগড়া করাটাকেই বড়ই অপছন্দ করতেন ও করেন। একমাত্র এক আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই কাউকেই নবী বা রসুল বলে ঘোষণা করতে পারে না। এবং স্বঘোষিত ব্যক্তিকেও নবী বা বসুল বলা যাবে না। নবী ও রসুল দাবি করলে আল্লাহ্‌র নিকট হতে অকাট্য প্রমাণ দেখাতেই হবে।

মহানবী (সাঃ) বলেন—"আমার পূর্ববর্তী নবীগণ (দৃষ্টান্ত-স্বরূপ) একটি সৌধ নির্মাণ করলেন, কিন্তু (ওই সৌধের) একটি ইঁটের স্থান খালি ছিল। মানুষ ওই সৌধের চারদিকে ঘুরত এবং তার সৌন্দর্য কারুকার্য দেখে আনন্দ পেত, বিস্ময়বোধ করত। কিন্তু প্রশ্ন করত—এই স্থানের এই ইঁটটা লাগানো হয়নি কেন? আমি জানি—"ওই ইঁটখানি আমিই, এবং আমিই সমস্ত নবীগণের শেষ নবী। আমার আগমনে নবুয়তের সৌধ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর কোন স্থান খালি নেই, এবং যা পূর্ণ করার জন্য আর নবী আসারও দরকার নেই।"

মুসলিম শরীফের ফাজায়েল বা-বু খাতামুন নবীয়ীন-এ এই গোত্রের চারটি হাদিস আছে। যার শেষ হাদিসটিতে আরও বলা হয়েছে—"অমি এসেছি। অতএব আমি নবী আগমনের ধারাকে পূর্ণ করে দিলাম।" আরও দ্রষ্টব্য ঃ তিরমিজী শরীফ ঃ—কেতাবুল মানবিক, বা-বু ফজলুন নবী ও কেতাবুল আদব, বা-বু আমসালেও অনুরূপ হাদিস পাওয়া যায়। এই হাদিসেও অনুরূপ শব্দ পাওয়া যায়—"নবীগণের ধারা আমার দ্বারা সম্পূর্ণ ও পরিসমাপ্ত করা হয়েছে।"

মুসনাদে আহম্মাদ গ্রন্থে ও হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) হযরত আবু সায়িদ খুদরী (রাঃ) হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) কর্তৃক এই হাদিস সামান্য ভাষান্তরে বর্ণনা করা হয়েছে।

মহানবী বলেন—ছয়টি দিক হতে আমাকে অন্যান্য নবীগণের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—১। আমাকে স্বল্পভাষী করে ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। ২। প্রতিপক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। ৩। আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। ৪। আমার (ও আমার উম্মতের) জন্য সারা পৃথিবীকে মসজিদ বানানো হয়েছে। (অর্থাৎ মসজিদ ছাড়াও যে কোন স্থান নামায পড়াকে বৈধ করা হয়েছে) পানি না পেলে পবিত্রতার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৫। আমাকে সারা পৃথিবীর জন্য ও সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য রসুল করা হয়েছে। ৬। আমার দ্বারা নবীগণের (বা নবুয়তের) ধারাকে পূর্ণ ও সমাপ্ত করা হয়েছে।

মহানবী বলেন—"রিসালত ও নবুয়তের ধারাবাহিকতা আমার দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে, সুতরাং আমার পর আর কোন নবী বা রসুল আসবেন না।"

মহানবী (দঃ) বলেন—"আমি মহম্মদ আমি আহম্মাদ। আমি নির্মূলকারী। আমার দ্বারা কুফরীকে নির্মূল করা হবে। আমি হাশারকারী, আমার পর মানুষ হাশরে একত্রিত হবে—আমি চূড়ান্ত পরিণতি, এর পর কেউই নবী হবেন না।"

মহানবী বলেন—"আল্লাহ্‌তায়ালা আমার পূর্বে এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি তাঁর উম্মতদের দাজ্জাল বের হওয়ার কথা বলে সাবধান করে গেছেন, কিন্তু দাজ্জাল তখন বের হয়নি। এখন আমি শেষ নবী, তোমরা শেষ উম্মত। অতএব এখন তাকে তোমাদের সামনেই বের হতে হবে।"

আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর বলেন—'আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস্‌কে বলতে শুনেছি—একদা রসুলে করিম (দঃ) তাঁর ঘর হতে এমনভাবে আমাদের মাঝে এলেন, যেন তিনি আমাদের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করছেন। অতঃপর তিনি আমাদের তিনবার বলেন—"আমি মহম্মদ উম্মি (নিরক্ষর) নবী।" পরে আবার বলেন—"এবং আমার পর আর কোন নবী নেই।"

মহানবী (দঃ) বলেন—"আমার পর কোন নবুয়ত নেই। শুধু আছে সুসংবাদদাতা (সংস্কারকগণ) সমুহ।" জিজ্ঞাসা করা হল—'হে রসুল! সুসংবাদদাতা সমুহ কি? তিনি বলেন—যাঁরা শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মেনে অক্লান্তভাবে সাধনা করেন আর মোরাকাবা মোশাহেদা দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করেন তাঁরাই সুসংবাদদাতা বা মোজাদ্দেদ। প্রতি একশ বছর পর পর একজন করে সংস্কারক আবির্ভূত হন। তাঁরা ধর্মের অসার কুসংস্কারগুলো দূর করতে চেষ্টা করেন। ওহী আর আসবে না, আল্লাহ্‌র নিকট হতে ভাল স্বপ্ন যোগে শুধু ইশারা পাওয়া যাবে মাত্র।"

মহানবী বলেন—"আমার পর কেউ নবী হলে, তিনি হতেন ওমর ইবনুল খাত্তাব। কিন্তু আমার পর কোন নবী নেই।" —তিরমিজী

তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার সময় মহানবী (সাঃ) হযরত আলি (কঃ)-কে মদিনার প্রতিরক্ষা ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে যান। মুনাফেকরা এই সম্পর্কে নানা কথা বলতে থাকায়, হযরত আলি তখন মহানবীকে বলেন—ইয়া রসুলুল্লাহ, আপনি কি আমাকে নারী ও শিশুদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন? তখন মহানবী (দঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেন—"আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক তাই-ই। যা হযরত মুসার সঙ্গে (তার ভাই) হারুণের ছিল। এর অর্থ—হযরত মুসা যে ভাবে তুর পাহাড়ে থাকার সময় হযরত হারুণকে বনী ইসরাইলের দেখাশোনার দায়িত্বে রেখে গিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে অনুরূপভাবে মদিনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেখে যাচ্ছি।" কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (দঃ) চিন্তা বা আশঙ্কা করলেন, হারুণের সঙ্গে আলির তুলনা পরবর্তীকালে নবী হওয়া সম্পর্কে কলহের বা দ্বিমতের সৃষ্টি করতে পারে। কেননা হযরত হারুণও নবী ছিলেন। তাই মহানবী অনতিবিলম্বে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন—"কিন্তু আমার পর কোন ব্যক্তিই নবী হতে পারবেন না।"—বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ।

মহানবী বলেন—"আমার উম্মতের মধ্যে তিরিশজন বড় মিথ্যাবাদী হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবি বলে দাবি করবে। অথচ আমিই খাতেমুন নাবীয়ীন। আমার পর কোন নবী নেই।" তিনি আরও বলেন—"প্রায় তিরিশজন বড় মিথ্যাবাদী মানুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর রসুল বলে মনে করতে থাকবে।"—তিরমিজী, আবু দাউদ।

সুতরাং মহানবী (সাঃ) সারা বিশ্বের (নবয়ুতের) সর্বশেষ নবী।

সৌজন্যে ঃ আমার শ্রদ্ধেয় হাদিস শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ প্রতিভাবান পণ্ডিত অধ্যাপক মওলানা মোঃ আব্দুর রহিম এবং মওলানা আব্দুল্লাহ নদভী। বঙ্গবিখ্যাত আলেম, সাধক পুরুষ, 'ক্লিদে জান্নাত,' 'নাসিমে জান্নাত' 'তামাচা' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থের লেখক বীরভূমের মওলানা মোঃ ইলিয়াস।

সকল নবীর শেষেতে এলেন মহম্মদ শেষ নবী
দরকার নাই কোন তারকার গগনে উঠেছে রবি।
সকল ঐশীর শেষেতে এল আল্লাহর শেষ বয়ান
আসবে না আর কোনদিন ওহী—বিশ্ব পেয়েছে কোরআন।
দেখেনি মানুষ এমন জিনিস দেখেনি এ সংসার
অদল বদল পরিবর্তন কোন কিছু নাই যার।
নবীজীর হাতে পেয়েছি মোরা আমাদের সেই কোরআন
ন্যায় অন্যায়ের ব্যবধান দিল—আল্লাহর ফোরকান।

কোরআন—৩ ঃ ৩, ৭৯, ৬ ঃ ৩৪, ১১৫, ১০ ঃ ৩৭, ৩৮, ৬৪, ১৮ ঃ ২৭, ২৫ ঃ ৬১, ৩৩ ঃ ৪০, ৪৬, ৪৫ ঃ ২০, ৬৮ ঃ ৫২।

মহম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন লোকের (যায়েদের) পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রসুল, এবং সকল নবীর শেষ নবী।" কোরআন—৩৩ : ৪০

"আমি সকল নবীর শেষ নবী। আমার পর কোন নবী নেই। এবং আমার মসজিদ সকল (নবীর) মসজিদের শেষ (নবীর) মসজিদ।" অর্থাৎ এই পৃথিবীতে আর কোনদিন কোথাও মসজিদে নববী (নবীর মসজিদ) গড়ে উঠবে না। বরং গড়ে উঠবে তাঁর উম্মত (শিষ্য)-দের মসজিদ। —হাদিস।

আর কোন মানুষ নবী হওয়ার, কোন মা নবীর মা হওয়ার, কোন পিতা নবীব পিতা হওয়ার, কোন রমণী নবীর স্ত্রী হওয়ার, কোন সন্তান নবীর সন্তান হওয়ার, কোন ভাই-বোন নবীর ভাই-বোন হওয়ার, কোন বন্ধু নবীর বন্ধু হওয়ার, কোন বালক-বালিকা বাল্যকালে নবীর খেলার সাথী হওয়ার আর কোনদিনই গর্ব বোধ করবে না।

পৃথিবীর মনুষ্যজগৎ, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও জড়জগৎ কোন নবীর পদস্পর্শে আর কোনদিনই ধন্য হবে না। চলে গেছেন সাইয়েদুল মোরসালীন অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষদের নেতা—হযরত মহম্মদ মোস্তফা (দঃ)। রেখে গেছেন চির অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ পথনির্দেশ—পবিত্র কোরআন। কোবআন—৬ : ৩৪, ১১৫, ১০ : ৬৪, ১৮ : ২৭

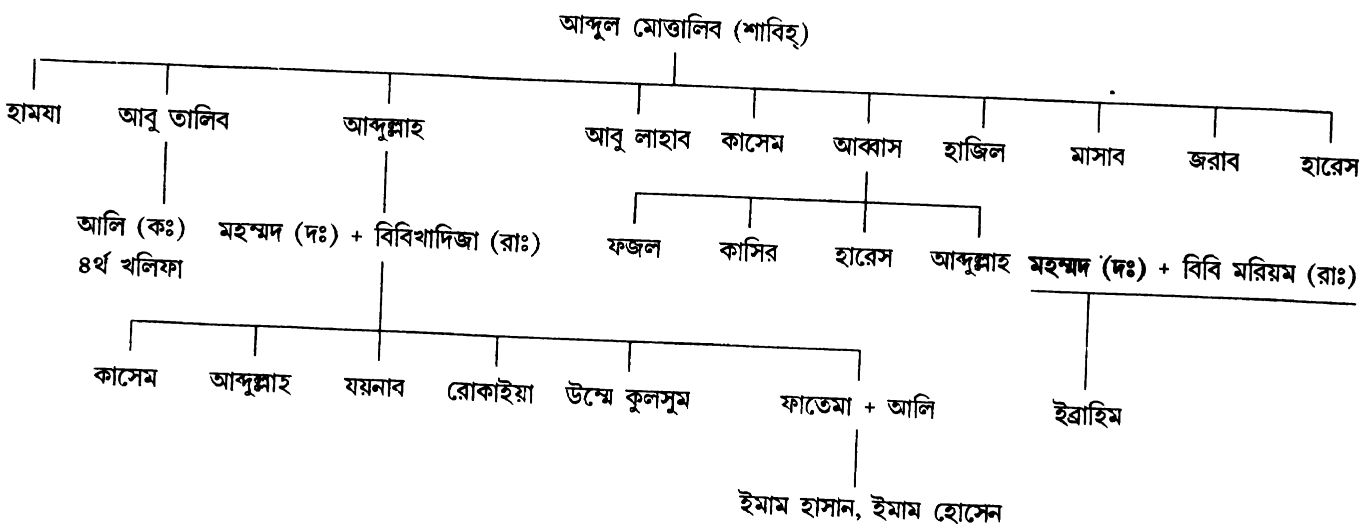
সন্ধ্যা সকালে বলি সকল উম্মত
তোমাতে বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র রহমত!

কোরআন—৩ : ১৫৯, ৪ : ৭৯, ১৬৫, ৯ : ১২৮, ১৫ : ১০, ১৬ : ৩৬, ২১ : ১০৭, ৩৩ : ২১, ৪৬, ৪৫ : ২০, ৪৮ : ৮, ৫৪ : ২২, ৩২, ৪০, ৬৮ : ৫২।

খোদার কালাম খোদ কোরআন ভিত্তিতে
সত্যের সোপানে রেখে ন্যায়ের নিক্তিতে
মানুষের কল্যাণে মানব-মুক্তিতে
সব কিছু করেছিলেন সবার যুক্তিতে।
কোরআন—৩ : ১৫৯, ৪০ : ৩৮

মহানবীর পুত্র-কন্যা ও বংশ তালিকা

তিন পুত্র ও চার কন্যা



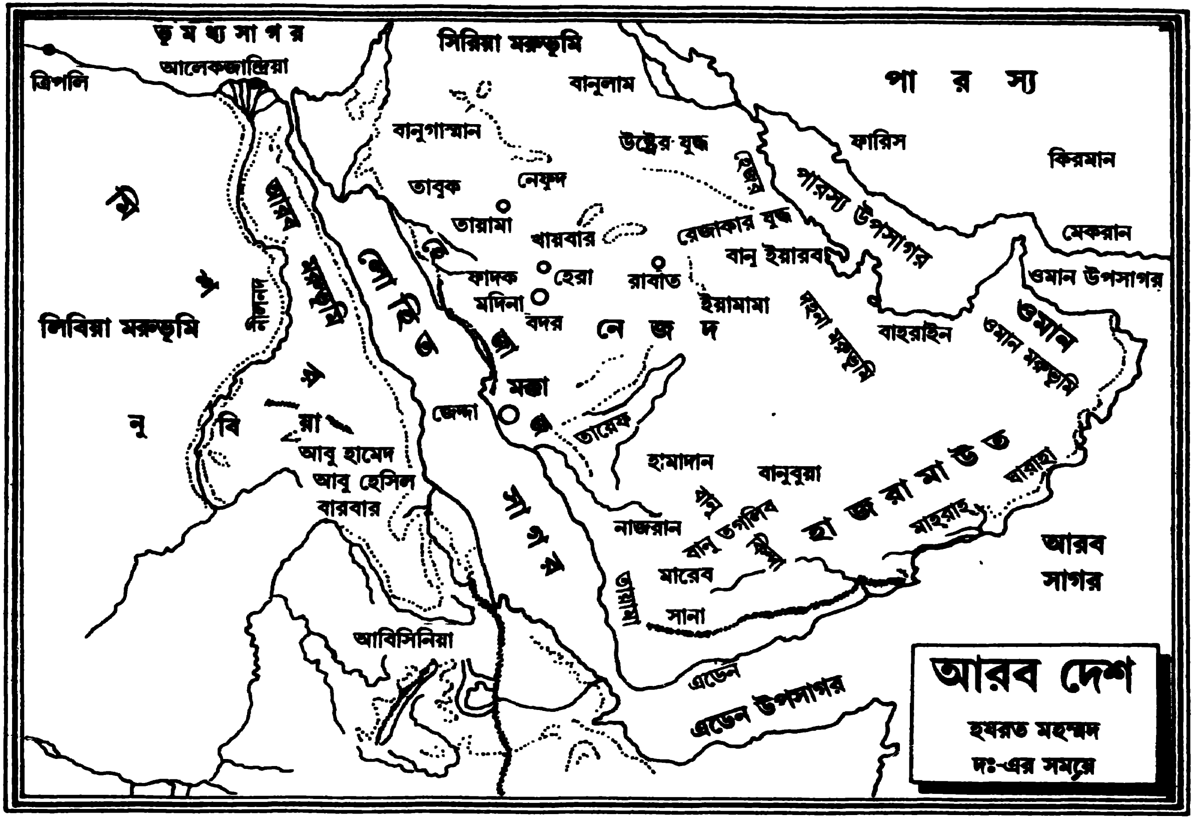
একমাত্র ইব্রাহিম বিবি মারিয়া (মরিয়ম) কিবতিয়ার গর্ভে ও বাকি অন্যান্য সকলেই বিবি খাদিজার গর্ভে জন্ম নেন। আব্দুল্লাহর দুটো ডাক নাম ছিল— তৈয়ব ও তাহের। অনেকে ভুল করে এই দুটো ডাক নামকে দুই পৃথক পুত্র সন্তান বলে মনে করে থাকেন। যেহেতু আব্দুল্লাহ নামটি ছিল হযরতের পিতার নাম ও মা আমিনার শ্বশুরের নাম ; তাই তাঁরা পুত্র আব্দুল্লাহর ডাক নাম তৈয়ব ও তাহের রেখেছিলেন। তখনকার দিনে আরবে পিতার নামে পুত্রের নাম রাখার প্রচলন ছিল।

❑ দ্বিতীয় পর্ব

● ইসলামের পটভূমি
ও
প্রাক্ ইসলামি যুগ ●

সূরা ফাতেহা
(ভাবানুবাদ)

প্রশংসা তোমারই, তুমি বিশ্বের পালক
সমস্ত দায়িত্ব সহ সৃষ্টির চালক।
রহমান রহিম তুমি দয়ার ধারক
বিচারের দিনে তুমি মহা বিচারক।
তোমারই মহিমা গাই
তোমারই সাহায্য চাই।
দেখাও সরল পথ কর সালেহীন
কখনও করো না মোদের বেহুদা বেদ্বীন।
বলাও যে কথা দেখি নবীজী বলেন
করাও যে কাজ দেখি নবীজী করেন,
চড়াও যে পথে দেখি মোমিন চড়ে
যে পথ তোমারই দিকে গড়িয়ে পড়ে।
যে পথে পড়েছে তব ক্ষীণ পরিতাপ
যে পথে পড়েছে তব হীন অভিশাপ
কখনও করো না মোদের সে পথগামী
সদাই করো গো মোদের সুপথগামী।
অনন্ত অসীম তুমি অন্তর্যামী ॥


আরব দেশ
হযরত মহম্মদ
দঃ-এর সময়ে
ভূ ম ধ্য সা গ র
ত্রিপলি
আলেকজান্দ্রিয়া
সিরিয়া মরুভূমি
বানুলাম
পা র স্য
ফারিস
কিরমান
মেকরান
ওমান উপসাগর
পারস্য উপসাগর
বানুগাস্সান
উষ্ট্রের যুদ্ধ
তাবুক
নেফুদ
তায়ামা
খায়বার
রেজাকার যুদ্ধ
বানু ইয়ারব
ফাদক
হেরা
রাবাত
মদিনা
ইয়ামামা
বদর
নে জ দ
বাহরাইন
ওমান
ওমান মরুভূমি
মক্কা
জেদ্দা
তায়েফ
হামাদান
বানুবুয়া
নাজরান
বানু তগলিব
হা দ্ব রা মা উ ত
মাহরাহ
আরব সাগর
মারেব
সানা
এডেন
এডেন উপসাগর
লিবিয়া মরুভূমি
নু বি য়া
আবু হামেদ
আবু হেসিল
বারবার
আবিসিনিয়া

প্রথম অধ্যায়

আরব দেশ

ভৌগোলিক বিবরণ ঃ বিশ্ব-মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের মধ্যে আরব দ্বীপপুঞ্জ একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ দেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। ক্ষুদ্রায়তন লোহিত সাগর একে আফ্রিকা হতে পৃথক রেখেছে। আবার অন্যদিকে সুয়েজ খাল পার হলেই ইউরোপ। এ ভাবে দেশটি তিনটি মহাদেশের মধ্যভূমির মর্যাদা অর্জন করে আছে। একমাত্র উত্তরদিক ব্যতীত এর সব দিকই পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরে সিরিয়া মরুভূমি, উত্তর-পূর্বে তাইগ্রিস নদী, পূর্বে পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর। এই দেশটিকে জাজিরাতুল আরব বলা হয়। যার আভিধানিক অর্থ আরব দ্বীপপুঞ্জ। এর আয়তন প্রায় বারো লক্ষ বর্গমাইলেরও কিছু বেশি। আশ্চর্য এই দেশের ভৌগোলিক বিবরণ। যদিও দেশটি পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত, তবুও যে দিকে চাওয়া যাক, যে দিকেই যাওয়া যাক—বালু আর বালু, শুষ্ক মরুভূমি, কোথাও বা এক-আধটি মরূদ্যান। এই কারণেই মনে হয়, যদিও প্রাচীন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা পারস্য, মিশর ও রোম পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল, তবুও তারা সমগ্র আরব অধিকার করেনি। কারণ শুধু এই-ই হতে পারে—একমাত্র ইয়ামেন ব্যতীত সবই সেখানকার ঊষর মরুভূমি, সুতরাং অনুর্বর আরবের প্রতি তাদের কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এই কারণেই এখানেই বোধ হয় আরব স্বাধীনতার বীজ নির্বিঘ্নে নিহিত ছিল। যে দেশের দিবাভাগে সূর্যকিরণের প্রখর উত্তাপ, রাত্রি বেলায় প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ, মাঝে মাঝে আবহাওয়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে—সীমুম নামক বায়ুর কবলে অনেকেই প্রাণ হারায়। সেখানে আকাশের বৃষ্টি ব্যতীত কোন উপায়ই নেই। তাই সেখানকার অধিবাসীগণ দলবদ্ধভাবে একস্থান হতে অন্যস্থানে গমন করে জীবিকা অর্জন করে। মরুভূমির এই যাত্রাপথে উটই মরুবাসীদের প্রধান বাহন।

যে দেশের আবহাওয়া এরূপ, যে দেশের মরুপ্রকৃতি এরূপ, যে দেশে মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডকে মাথায় নিয়ে মানুষ প্রাণ হারায়, যে দেশের শীতের প্রকোপে মানুষের শরীর বরফাকারে জমে ওঠে, সেই দেশকে বিধাতাপুরুষ ভালবাসলেন--বিশ্ববাসীর প্রাণকেন্দ্র রূপে ; স্থাপিত হলো আরবের মক্কা, নির্মিত হলো আল্লাহ্‌র কাবা—বিশ্বমানবের আত্মত্যাগের ঘর, আত্ম-উপলব্ধির ঘর, প্রীতির ঘর, এককথায় বিশ্বমানবের মিলনায়তন।

আরব প্রদেশ বা মরুভূমি ঃ আরব উপদ্বীপ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত। বিশেষ করে—হেজাজ, ইয়ামেন, নাজাদ, হাজরামাউত, উম্মান, নাজরান, আসির, ইয়ামামা, খাইবার, হিজর এবং আল আহকাফ্‌। মরুভূমির মধ্যে—দাহনা রুব্বুল খালি। আবার এককথায় বলতে গেলে সমগ্র দেশটাই মরুভূমি।

একদা মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়া আরবেরই অংশ বলে পরিগণিত ছিল। আজ তা নেই। অধিকাংশ প্রদেশেরই নামকরণ করা হয়েছে মূলত দেশের সঙ্গে একটা নাড়ির সম্পর্ক

রেখে। পারস্য উপসাগরের দক্ষিণদিক হতে আরম্ভ করলে প্রথমেই আমাদের নজর পড়ে বাহ্‌রাইন। কুয়েত ঠিক তার উত্তরে। তারপর মাসকাতের প্রসিদ্ধ শহর বা রাজধানী উম্মান। পরবর্তী ধাপে হাজরামাউত ও তার বন্দর মাক্কালা। হাজরামাউতের উত্তর-পশ্চিমে আহকাফ—যা একদা ছিল আদ সম্প্রদায়ের দেশ। পরবর্তী ধাপে আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমে ইয়ামেনের উর্বর ভূমি, যেখানে আদন, হুদাইদা, সানা ও মক্কা প্রভৃতি অবস্থিত। পরবর্তী উত্তরে লোহিত সাগরের তীরে হেজাজ, মক্কা, মদিনা, জেদ্দা, তায়েফ প্রভৃতি প্রধান শহরগুলো অবস্থিত।

ইয়ামেন ও হেজাজের মধ্যে ছোট প্রদেশ আল আসির। মদিনার উত্তর-পূর্বে খাইবার। শ্যাম ও সিরিয়ার পথে মদিনার উত্তরে হযরত সালেহ (আঃ)-এর এবং তাঁর শিষ্য সামুদগণের হেজর শহর অবস্থিত। তারও উত্তরে তাবুক। হেজরের পশ্চিমে—হযরত শুয়াইব (আঃ)-এর মাদায়েন শহর। দক্ষিণ আরবের মধ্যভাগে মরুভূমি আদ্‌দাহ্‌না, যার উত্তরে নজদ্ এবং তার রাজধানী রিয়াধ। হেজাজের বর্তমান শাসক ইবনে সউদ রিয়াধ হতে আসেন।

আরবের জলবায়ু ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ কতকগুলো সমুদ্র তীরবর্তী শহর ও জলমগ্ন উপত্যকা ব্যতীত সমগ্র আরবের জলবায়ু ভীষণ শুষ্ক। খেজুর সেখানকার প্রধান ফসল এবং উপজীবিকা; তায়েফ এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে কিছু কিছু অন্য ফসলও জন্মায়। সেখানকার জনগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী, আত্মকেন্দ্রিক, স্বাধীনচেতা; কোনও বাধা-বন্ধনের বালাই তাদের নেই।

আরবের ভাষা ঃ আরবী ভাষা সমগ্র আরব দুনিয়াকে বাকি বিশ্ব থেকে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য দান করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ভাষার সঙ্গে আরবীর কোন তুলনা হয় না। সন্দেহ নেই ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত সম্পদশালী ভাষা। তবুও সমস্ত দিক বিবেচনা করে দেখলে ভাষা হিসাবে আরবীর স্থান বহু উর্ধ্বে। আরবী ভাষায় একটি শব্দ যতগুলো ভাব প্রকাশ করতে পারে, পৃথিবীর কোন ভাষার পক্ষেই তা সম্ভব নয়। অধিকন্তু প্রাচীন ভাষাসমূহের অধিকাংশই আজ পুস্তকের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই। কিন্তু আরবী ভাষা আজও আরবের মাতৃভাষার চরম মর্যাদা ও পরম গৌরব লাভ করে আছে। ভাষাজ্ঞান, ভাষাশক্তি ও আরবকে দিয়েছে এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবের পূর্বপুরুষগণ

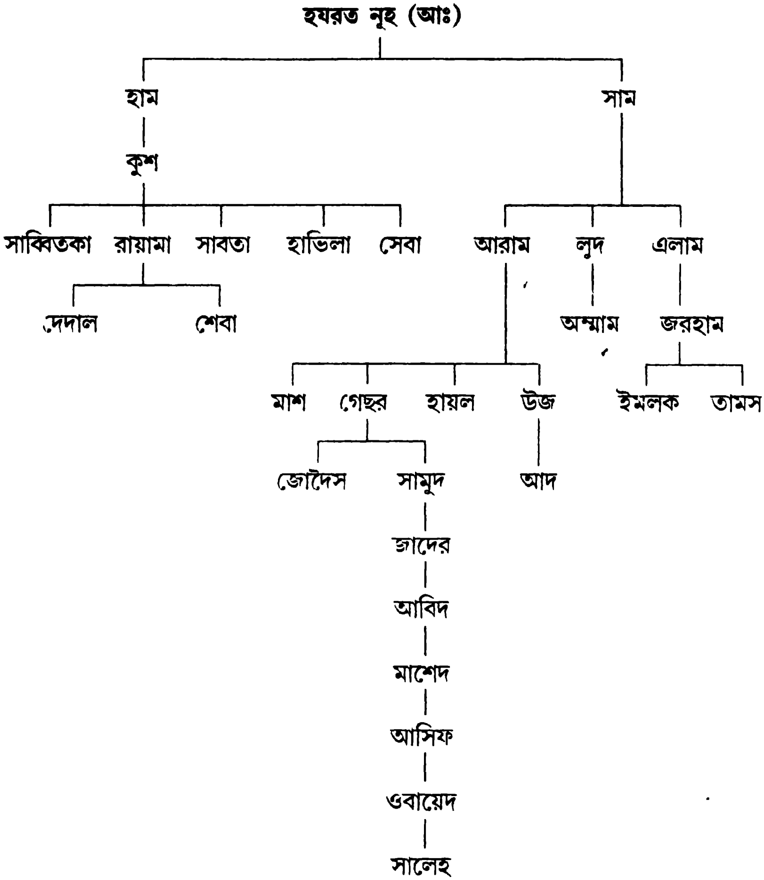
আরববাসীগণ হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধর। ঐতিহাসিকগণ এঁদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (১) আরব বাইদা—আদি আরবগণ, (২) আরব আরিবা—যারা আরবকে আপন ভূমিতে এবং আরবী ভাষাকে আপন ভাষাতে রূপান্তরিত করেছে, (৩) আরব মুসতারিবা—যারা আরবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আরব বাইদা ঃ আরব বাইদাগণ হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র সাম এবং সামের পুত্র লাজের বংশধর। তারা কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত—(১) আদ, (২) সামুদ, (৩) আবেল, (৪) আমালাকা, (৫) তাসাম, (৬) জুদাইস, (৭) উমাইম, (৮) জুরহাম, (৯) হাজরা-মাউত, (১০) হজুব, (১১) আবদ জাখম ইত্যাদি। এইগুলোব মধ্যে যাদের কথা কোরআন শরীফে বারবার বলা হযেছে তারা আদ ও সামুদ। হযরত হুদ (আঃ) আদ গোত্রে এবং হযরত সালেহ (আঃ) সামুদ গোত্রে প্রেবিত হয়েছিলেন।

পবিত্র কোরআনে আদ ও সামুদ গোত্র সম্পর্কে বহু কথা বর্ণিত হযেছে। আমরা তার কিছু উল্লেখ করছি ঃ

আদ সম্প্রদায় রসুলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল যখন তাদের ভ্রাতা হুদ তাদের বলেন, "তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমাব পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আছে। তোমরা তো অযথা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করছ। তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ—এ মনে করে যে তোমরা চিরস্থায়ী হবে। আর যখন তোমরা আঘাত হান তখন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হেনে থাক। তোমবা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" ২৬ ঃ ১২৩-১৩১। "তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি—যারা সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ছিল, যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি। ৮৯ ঃ ৬-৮। এবং "সামুদের প্রতি যারা কুরা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল।" ৮৯ ঃ ৯-১০।

সামুদ সম্প্রদায় রসুলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের ভ্রাতা সালেহ ওদের বলল—"তোমরা কি সাবধান হবে না। নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।" ২৬ ঃ ১৪১-১৪৪। সালেহ বলল—"ওই যে উষ্ট্র, এর জন্য এবং তোমাদের জন্য নির্ধারিত এক একদিন পানি পানের স্বতন্ত্র পালা আছে এবং ওকে ক্লেশ দিও না, দিলে মহাদিনের শাস্তি তোমাদের ওপর পতিত হবে। কিন্তু ওরা ওকে বধ করল। পরিণামে ওরা অনুতপ্ত হলো।" ১৬ ঃ ১৫৫-১৫৭।



আরব আরিবা ঃ এরাও আদিতে নূহের বংশধর, সামের পুত্র। এরা পরবর্তীকালে নূহ বংশের অন্য শাখা অর্থাৎ আরবের আদি আরব বাইদাগণকে জয় করে এবং তাদের বংশধরগণকে ধ্বংস করে তাদের আরবভূমিতে নিজেরাই বসতি স্থাপন করে। তারা আপন ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষাকেই আপন ভাষারূপে গ্রহণ করে। এই সম্প্রদায় কুহতান নামে পরিচিত। এই গোত্র হতেই হযরত মহম্মদ (সঃ)-এর অভ্যুদয়।

আরবের একমাত্র অংশ ইয়ামেন যথেষ্ট বারিবর্ষণের আধার ভূমি, এবং যথেষ্ট ফল-শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রভূমি। সাবা ছিল রানী সিবার রাজধানী। এই বংশেরই একটি গোত্র ইয়ামেন ও হাজরামাউত শাসন করত। আজদ নামে অন্য গোত্র মদিনা জয় করে এবং সেখানে বসবাস স্থাপন করে। খুজা নামে এক গোত্র জোরহাম গোত্রকে পরাজিত করে মক্কা জয় করে। আজদের পুত্র নসর ইমামা জয় করে এবং খুজার পুত্র উমরান উমামা জয় করে।

পরবর্তীকালে আরবের সমস্ত প্রদেশের নামকরণগুলো বিজেতাগণের নামানুসারেই হয়। এমনকি হযরত মহম্মদ (সঃ)-এর জন্মকালেও এই কুহতান গোত্রই সমগ্র আরবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্প্রদায় ছিল। বর্তমান আরবের অধিকাংশই ওই গোত্রের বংশধর। এইভাবে নবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্বপুরুষগণ আরব আরিবার সঙ্গে সংযুক্ত।

আরব মুসতারিবা ঃ প্রায় চার হাজার বছর আগে আজকের দুনিয়ার মেসোপটেমিয়া নামক স্থানে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। সেখানকার ভাষা তখন আরবী ছিল না। বরং প্রাচীন পারস্য ভাষার কাছাকাছি ভাষা সেখানে প্রচলিত ছিল। সেখানকার মানুষ তখন পুতুল ও নানা দেব-দেবীর পুজো করত। সেই সময় ওই দেশে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। যাঁর নাম পরবর্তীকালে জগদ্বিখ্যাত নবী ইব্রাহিম (আঃ), তিনিও হযরত নুহ (আঃ)-এর বংশধর। তাঁর পিতার নাম ছিল আজর। তিনি ছিলেন সে যুগের প্রসিদ্ধ পুতুল প্রস্তুতকারী বা ভাস্কর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুবক ইব্রাহিমের মনে দেব-দেবীদের পুজো-অর্চনা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ দেখা দিল। তাঁর মন মহাসত্যের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠল। তিনি চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র-পুতুল ইত্যাদি কোন কিছুর পুজো করতেন না। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন তাঁকে বলে উঠল, যে কথা বলতে পারে না, যে অস্থায়ী, যে নিজেকে নিজে সাহায্য করতে পারে না, তার পুজো করা অন্যায় ও নির্বোধের পরিচয়। মহান আল্লাহ্ তাঁকে একমাত্র সত্যধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করলেন। যে সত্যধর্ম পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে কোথাও জুডাইজম, কোথাও বা খ্রীস্টানিটি, কোথাও বা মহম্মদনিজম ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত। আসলে হযরত ইব্রাহিমের যে সত্যধর্ম যে বিশ্বাস তা "শাশ্বত ইসলাম"—অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌র প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য স্বীকার ও সমগ্র মনুষ্যজগতের জন্য শান্তি। পবিত্র কোরআন আজও সেই হযরত ইব্রাহিমের একত্ববাদের বিশ্বাসকেই প্রচার করছে। আসলে হযরত মহম্মদ কোন নতুন ধর্ম প্রচার করতে অবতীর্ণ হননি, তিনি সেই ইব্রাহিমের একত্ববাদের ধর্মকেই প্রচার করে গেছেন। পবিত্র কোরআনই তার স্পষ্ট সাক্ষী ঃ

'যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইব্রাহিমের ধর্মাদেশ হতে আর কে বিমুখ হবে। আমি তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছি, পরকালেও সে সৎকর্মশীলগণের অন্যতম।'

কোরআন—২ ঃ ১৩০

তারা বলে, ইহুদী বা খ্রীস্টান হও ঠিক পথ পাবে। বল, বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব। এবং সে (ইব্রাহিম) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ২ ঃ ১৩৫। সুতরাং হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবন ছিল নতুন। কিন্তু তাঁর আদর্শ বা ধর্মমত নতুন ছিল না। বরং সেটা ছিল—হযরত ইব্রাহিমের আদর্শের বা মতের ধারাবাহিকতা।

—২২ ঃ ৭৮

আরবে ইব্রাহিম (আঃ) ঃ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) যখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আপন মতবাদে সজাগ হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর পিতা ও আত্মীয়-স্বজন তাঁকে দেশ হতে বহিষ্কার করেন।

"এই গ্রন্থে উল্লেখিত ইব্রাহিমের কথা বর্ণনা করে; সে সত্যবাদী ও নবী ছিল। যখন সে তার পিতাকে বলল—হে আমার পিতা, যে শোনে না দেখে না এবং তোমার কোন

কাজে আসে না, তুমি তার উপাসনা কর কেন? হে আমার পিতা, শয়তানের উপাসনা কর না, নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা, আমি আশঙ্কা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, এবং তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে। পিতা বলল—হে ইব্রাহিম, তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ হচ্ছো? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবই। তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। ইব্রাহিম বললেন, তোমার নিকট হতে বিদায়।" কোরআন—১৯ ঃ ৪১-৪৭

ইব্রাহিম স্বদেশ ও স্বজনকে ত্যাগ করলেন, কিন্তু ত্যাগ করার পূর্বে এমন কিছু একটা স্মৃতি সেখানে রেখে গেলেন যা তাঁর স্বদেশবাসীকে উপযুক্ত একটা শিক্ষা দিল। একদিন যখন সকলে কোন একটা মেলা উপলক্ষে অন্যত্র গিয়েছিল, তখন ইব্রাহিম তাদের মন্দিরে প্রবেশ করে একমাত্র বড় বিগ্রহটিকে বাদ দিয়ে বাকি সকল বিগ্রহকে ভেঙে কুড়াল-খানিকে বড় বিগ্রহের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে সরে পড়লেন। সকলেই ফিরে এসে দেখে এই অবাক কাণ্ড।

"শপথ আল্লাহ্‌র তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব। অতঃপর তিনি ওদের প্রধানটি ছাড়া অন্যান্য মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন, যাতে ওরা তাঁর শরণাগত হয়। ওরা বলল, "আমাদের দেবতাদের প্রতি এরূপ করল কে? নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘনকারী। কেউ কেউ বলল, 'এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে বলা হয় ইব্রাহিম।' ওরা বলল—তাকে লোক-সম্মুখে হাজির কর। যাতে ওরা সাক্ষ্য দিতে পারে। ওরা বলল—হে ইব্রাহিম, তুমিই কি আমাদের দেবতাদের এরূপ করেছ? তিনি বললেন, এদের জিজ্ঞাসা করে দেখ না, যদি এরা কথা বলতে পারে? তখন ওরা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, তোমরাই সীমালঙ্ঘনকারী। অতঃপর ওদের মাথা নত হল এবং ওরা বলল, তুমি তো ভালই জান যে এরা কথা বলে না। ইব্রাহিম বললেন—তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। ধিক তোমাদের, এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের উপাসনা কর তাদের। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?" কোরআন—২১ ঃ ৫৭-৬৭

ওরা ঠিক করল ইব্রাহিমকে পুড়িয়ে ফেলবে। ওরা এক ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের আয়োজন করল। আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করলেন।

"ওরা বলল তবে ওকে (ইব্রাহিমকে) পুড়িয়ে দাও। তোমাদের দেবতাগুলিকে সাহায্য কর। তোমরা যদি কিছু করতে চাও। আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহিমের প্রতি শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।" কোরআন—২১ ঃ ৬৮-৬৯

নবী হযরত ইব্রাহিম (আঃ) প্যালেস্তাইনের পথে আপন সহচরবৃন্দসহ যাত্রা করলেন। সেখানে বহুদিন কাটালেন। তাঁর জীবন সমৃদ্ধিতে ভরে উঠল। কিন্তু তাঁর মহান ব্রত তাঁকে মিশরের পথে নিয়ে যায়। যেখানে তিনি তাঁর স্ত্রী সারাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত ইব্রাহিম মিশরের রাজ-দরবারে সাদরে গৃহীত হলেন। বাদশাহ তাঁকে কিছু উপঢৌকন ও একটি পরমাসুন্দরী বালিকা উপহার দিলেন। এই বালিকাই পরবর্তীকালের

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হাজেরা বিবি। নবী মিশর হতে প্যালেস্তাইনে আবার ফিরে গেলেন। বহুদিন বিবি সারার সঙ্গে ঘর-সংসার করার পরও কোন সন্তানাদি না হওয়ায় হাজেরা বিবিকে তিনি পত্নীত্বে বরণ করেন।

পরে হাজেরার গর্ভে জন্ম হয় হযরত ইসমাইলের। হযরত ইসমাইল যখন কৈশোরে পদার্পণ করেন—তখন হযরত ইব্রাহিম একদা স্বপ্ন দেখেন, তিনি তাঁর প্রাণাধিক পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহ্‌র নামে কোরবানি (উৎসর্গ) করছেন। জাগ্রত অবস্থায় তিনি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রস্তুত হলেন। মহাক্ষণে আল্লাহ্ তাঁর মন পরীক্ষা করে পুত্রের কোরবানিকে দুম্বায় গ্রহণ করলেন। ওই দিনটির ওই মহাত্যাগকে অনুসরণ করে সমগ্র মুসলিম-জাহান হিজরী সনের দ্বাদশ মাসের দশম তারিখে আপন আপন সাধ্যানুযায়ী কোরবানি করে থাকেন। পশু বলি নয়, প্রাণের বলি। প্রাণের এ ত্যাগই কোরবানির মূল কথা।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে মীনাতে, মতান্তরে প্যালেস্তাইনের মাটিতে। এর কিছুদিন পর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হযরত ইব্রাহিম তাঁর পুত্র ইসমাইল এবং বিবি হাজেরাকে নিয়ে মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। ইসমাইলের বয়স তখন প্রায় পনেরো বছর। স্ত্রী ও পুত্রকে রেখে হযবত ইব্রাহিম পুনরায় প্যালেস্তাইনে ফিরে যান। ইসমাইল জোরহাম গোত্রেব নিকট হতে আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। কিছুদিনের মধ্যে আমালাকা গোত্রের আকিলের পুত্র আসামা এবং আসামার পুত্র সাইদের কন্যা উমারাকে বিবাহসূত্রে গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁর মা পরলোকগমন করেন।

এই বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই হযরত ইব্রাহিম পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। দুঃখের বিষয়, ইসমাইলের দাম্পত্য-জীবন সুখের না হওয়ায় তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ করেন এবং জোরহাম গোত্রের আমরের পুত্র মাজাদের কন্যা সাইদার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। হযরত ইব্রাহিম (সাঃ) এই ঐতিহাসিক বিবাহে উপস্থিত ছিলেন এবং এই বিবাহে তিনি তাঁর পূর্ণ সম্মতি দিয়েছিলেন। এই যুগল জীবনের রক্তধারা হতেই পরবর্তীকালে মরুজগতের শ্রেষ্ঠ মানব, সৃষ্টির সেরা নবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব। তাই হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে তিন ধারার মিলিত রূপ দেখতে পাই। হযরত ইব্রাহিমের পক্ষ হতে পারস্য ধারা, বিবি হাজেরার পক্ষ হতে মিশরীয় ধারা, ইসমাইলের দ্বিতীয়া স্ত্রী সাইদার পক্ষ হতে খাঁটি আরবীয় ধারা।

এই বিবাহের কিছুদিন পরে আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে মক্কাতে কাবা গৃহের পুনর্নির্মাণের জন্য নির্দেশ দেন। সেই সময় থেকে মক্কার কাবা গৃহ সমগ্র মুসলিম-জাহানের তীর্থক্ষেত্র রূপে পরিগণিত। সমগ্র বিশ্বের মুসলিম-জাহান আজও তাঁদের পবিত্র হজ উদ্‌যাপনের জন্য আপন আপন সাধ্যমত পবিত্র কাবায় উপস্থিত হচ্ছেন।

"এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন কাবা গৃহকে মানবজাতির তীর্থক্ষেত্র ও নিরাপত্তা স্থান করেছিলাম, (এবং বলেছিলাম) তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর স্থানকেই নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর। এবং যখন আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করি যে তোমরা আমার ঘরকে তাদের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, যারা এর চারদিকে তওয়াফ করবে অর্থাৎ ঘুরবে, এতে বসে ধ্যান করবে, এতে রুকু ও সেজদা করবে। স্মরণ কর, যখন ইব্রাহিম

বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, একে নিরাপদ শহর কর, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করবে তাদের উপজীবিকার জন্য ফল-শস্য দান কর।' তিনি বলেন—যে কেউ অবিশ্বাস করে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ দান করি, অতঃপর তাকে নরকের শাস্তিভোগ করতে বাধ্য করব। এবং তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম। যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল কাবা গৃহের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের হতে এটি গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।' কোরআন—২ ঃ ১২৫-১২৭

একদিক দিয়ে মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) হযরত ইব্রাহিমের মোনাজাতের ফলশ্রুতিও বটেন, যখন হযরত ইব্রাহিম প্রার্থনা করলেন ঃ

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত কর, এবং আমাদের বংশধর হতে একদলকে তোমার অনুগত কর এবং আমাদের প্রার্থনা-প্রণালী প্রদর্শন কর ও আমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হও ; নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল করুণাময়। হে আমাদের প্রতিপালক, আর তাদের হতে তাদের মধ্যে একজন রসুল প্রেরণ কর, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করবে এবং তাদেব গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।" কোরআন—২ ঃ ১২৮-১২৯

এই প্রার্থনার ফলশ্রুতি হযরত মহম্মদ (দঃ) সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ঃ "আমি তোমাদের মধ্য হতে একজন রসুল প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের নিকট আমাব আয়াত পাঠ করবে ও তোমাদের পবিত্র করবে এবং গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবে।"

কোবআন—২ ঃ ১৫১

আজকের যে পবিত্র হজ অনুষ্ঠান, এরও প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সাঃ) নন, তাঁরই পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম (আঃ)। 'স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য কাবা গৃহের স্থান স্থির করে দিয়েছিলাম, তখন বলেছিলাম—আমার সঙ্গে কোন অংশী স্থির করো না।' এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য, যারা তওয়াফ করে এবং যারা নামাযে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সেজদা করে।" কোরআন—২২ ঃ ২৬

এরপর হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি হজ ঘোষণা হওয়ায় ওই ধারা অবিকল রয়ে যায়।—"এবং মানুষের নিকট হজ ঘোষণা করে দাও। ওরা তোমার নিকট পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উটের পিঠে (অথবা যানবাহনে) চেপে আসবে। ওরা আসবে দূর-দুরান্ত পথ অতিক্রম করে।" কোরআন—২২ ঃ ২৭

হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বপুরুষগণ ঃ হযরত ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইল। হযরত ইসমাইলের বংশ ধরের একজনের নাম কাইজার। কাইজারের বংশধরের একজনের নাম আদনান। আদনান বংশ হতে মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব।

হযরত মহম্মদ (সাঃ), তাঁর পিতা আবদুল্লাহ, তাঁর পিতা আবদুল মোত্তালিব (শায়বা), তাঁর পিতা হাসিম, তাঁর পিতা আবদ মন্নাফ, তাঁর পিতা কুশাই, তাঁব পিতা কিলাব, তাঁর পিতা মারুফ, তাঁর পিতা কাব, তাঁর পিতা লুয়াই, তাঁর পিতা গালিব, তাঁর পিতা ফিহর কুরাইশ, তাঁর পিতা মালিক, তাঁর পিতা নদব, তাঁর পিতা খোজাইমা, তাঁর পিতা মুদারিকা,

তাঁর পিতা ইয়াস, তাঁর পিতা মুজর, তাঁর পিতা নিজর, তাঁর পিতা মুয়িদ, তাঁর পিতা আদনান। মালিকের পুত্র ফিহরকে কুরাইশ বলা হত। সেই থেকে ওই গোত্রকে কুরাইশ বলা হয়।

কুশাই ঃ হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর পঞ্চম পিতৃপুরুষ কুশাই গোত্র কুরাইশ গোত্রের সঙ্গে একত্রিত হয় এবং হেজাজের শাসনভার ও কাবার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

দার-উন-নাদওয়া ঃ কুশাই কাবা গৃহের পুনর্নির্মাণ করেন। এবং তার পাশে অন্য একটি প্রাসাদও নির্মাণ করেন, যার নাম রাখা হয় দার-উননাদওয়া। এই প্রাসাদেই কুশাই-এর নেতৃত্বে কুরাইশ প্রধানগণ মিলিত হতেন এবং হেজাজের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

আবদুদ্ দার ঃ কুশাই-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুদ্ দার শাসনকর্তা হিসাবে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর পৌত্র এবং তাঁর ভ্রাতা আবদ মানাফের পুত্রদের মধ্যে হেজাজের শাসনভার নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। পরে কুরাইশ প্রধানদের মধ্যস্থতায় আবদ মানাফের পুত্র আবদ শামস্ হজযাত্রীদের পানি সরবরাহ, আহারাদির ব্যবস্থা এবং খাজনা আদায়ের ভার পান। আবদুদ্ দারের পৌত্রগণ কাবা গৃহ ও দার-উন-নাদওয়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামরিক বিভাগের ভার পান। এইভাবে হেজাজের শাসনব্যবস্থা মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—রাজস্ব ও সামরিক। রাজস্ব—আবদ শামস্ এবং সামরিক—আবদুদ দারের পৌত্রগণের দায়িত্বে থাকে।

হাশিম ঃ কিছুদিনের মধ্যেই আবদ শামস্ তাঁর গুরুদায়িত্ব তাঁর ছোট ভাই হাশিমের ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি পরবর্তীকালে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পরদাদার গৌরব অর্জন করেন। তখনকার দিনে আরবের মধ্যে হাশিমের জ্ঞান-গরিমা ও বদান্যতার কথা সকলের মধ্যে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর সাহসিকতা ও বুদ্ধি কুরাইশদের ধন্য করেছিল। কেননা, তাঁরই জ্ঞানবুদ্ধি বলে কুরাইশগণ একদা ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করে। প্রতি বছর তাঁর বাণিজ্যবাহিনী দক্ষিণ ইয়ামেন, সিরিয়া, শ্যাম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আরবের আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা-বাণিজ্য করে কুরাইশ সম্প্রদায়কে একটি সমৃদ্ধশালী গোত্রে পরিণত করে। নাজদ ও মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত তাঁর এই বাণিজ্য বিস্তারলাভ করেছিল। এইভাবে মক্কা শহর একদিন আরবের বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। এমনকি হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্বেও কাবার চতুর্দিকে বহু তীর্থযাত্রীর ভিড় হত। তারা আসত তাদের দেবদেবীর পুজো-আরাধনার জন্য। এই উপলক্ষে মিনাতে একটা বিরাট মেলার আয়োজন হত। এইভাবে হাশিমের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় মক্কা সমগ্র আরবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়। এইসব কারণে হাশিম সমগ্র আরববাসীর অটুট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন।

উমাইয়া ঃ সমগ্র আরব জুড়ে হাশিমের এই খ্যাতি-প্রতাপ-যশ-মান আবদ শামসের পুত্র উমাইয়ার আর সহ্য হল না। তিনি তাঁর পিতার রাজস্ব বিভাগ ফিরিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হলেন। যদিও একদা শামস্ স্বেচ্ছায় আপন ভ্রাতা হাশিমকে এই ভার অর্পণ করেছিলেন এবং হাশিমও আপন যোগ্যতাবলে এই কার্যভার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন উভয়ের দ্বন্দ্ব তুঙ্গে উঠল তখন একটা সাধারণসভা আহ্বান করা হল। ওই সাধারণসভায় কয়েকজন আরব বিচারপতি নির্বাচিত হলেন এবং এতে ঠিক হল যে যিনি হেরে যাবেন তাঁকে পঞ্চাশটি উট

শাস্তিস্বরূপ দিতে হবে এবং দশ বছরের জন্য তাঁকে আরব দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হবে। বিচারপতিগণ উভয় প্রার্থীকে জনসাধারণের সম্মুখে আপন আপন বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিলেন। বিচারসভায় তাঁরা আপন আপন বক্তব্য পেশ করলেন। বিচারপতিগণের রায় হাশিমের অনুকূলে গেল। উমাইয়া বাধ্য হয়ে জরিমানা স্বরূপ পঞ্চাশটি উট দিয়ে দেশত্যাগ করলেন। এদিকে হাশিম বিরাট এক রাজকীয় ভোজসভার আয়োজন করলেন। পরাজিত উমাইয়া গ্লানিভরা মন নিয়ে শ্যাম বা সিরিয়ার পথে যাত্রা করলেন। এই গ্লানির জের বোধহয় একদিন পবিত্র ইসলামের ইতিহাসকেও কলঙ্কিত করে তোলে।

আবদুল মোত্তালিব ঃ ইসলামের ইতিহাসে প্রখ্যাত ব্যক্তি, কিন্তু নামটি রহস্যাবৃত। আবদুল মোত্তালিব-এর সঠিক পরিচয় সম্বন্ধে সদুত্তর পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে ইসলামের অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটেও। সকলেই জানে, হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর দাদা আবদুল মোত্তালিব।

আবদ মানাফের তিন পুত্র—আবদ শামস্, হাশিম, মোত্তালিব। হাশিম বসবাস করেন মদিনায়, মোত্তালিব বাস করেন মক্কায়। হাশিম মদিনার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ্ করেন এবং এক পুত্রলাভ করেন। নাম রাখেন শাইবা বা শাবিহ্। যখন হাশিম মারা যান তখন মোত্তালিব তাঁর ভ্রাতার কিশোর পুত্র শাইবাকে মক্কায় নিয়ে আসেন। মক্কাবাসীগণ শাইবার আসল নামের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাননি। তখন আবার পুরোপুরি দাসপ্রথার প্রচলন চলেছে। তাই মক্কাবাসীগণ শাইবাকে মোত্তালিবের একজন ক্রীতদাস ভেবে 'আবদুল মোত্তালিব' অর্থাৎ মোত্তালিবের দাস নামে ডাকতে আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে এই আবদুল মোত্তালিব পিতা হাশিমের ন্যায় খ্যাতনামা যশস্বী ব্যক্তিতে পরিণত হন। কিন্তু নামটি সেই আবদুল মোত্তালিবই রয়ে গেল। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর আসল দাদা ছিলেন হাশিমের পুত্র শাইবা বা শাবিহ্। যাঁর পরবর্তী নাম আবদুল মোত্তালিব।

হারব ঃ উমাইয়া বা হাশিমের যুগ কেটে গেল। এবার পালা পড়ল উমাইয়ার পুত্র হারব এবং হাশিমের পুত্র আবদুল মোত্তালিবের। হারব প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবদুল মোত্তালিবকে আহ্বান জানিয়ে আবার তিক্ততার সৃষ্টি করলেন। আবার পূর্বমত আরব বিচারপতিগণ আবদুল মোত্তালিবের পক্ষেই রায় দিলেন। এই রায় পরবর্তীকালে হাশিম ও উমাইয়া বংশের মধ্যে এক সুদূরপ্রসারী ভীষণ তিক্ততা সৃষ্টি করে। তবে এর সঙ্গে ইসলামধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। অনেকেই এ ব্যাপারে এক বিভ্রান্তিকর মত পোষণ করে থাকেন—হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ওফাতের অল্পদিনের মধ্যেই ইসলামধর্মে ভীষণ কলহ-বিবাদ দেখা দেয়। একথা আদৌ সত্য নয়। বরং হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জন্মের বহু পূর্বেই এই কলহের বীজ আরবভূমিতে প্রোথিত হয়েছিল, এ যেন নিছক রাজা বাদশাহদের ইতিহাস, রাজ্যের ইতিহাস, সিংহাসনের মোহ, এর সঙ্গে ইসলামধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই। বস্তুত হযরত মহম্মদ্ (দঃ)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কিছুকালের জন্য ওই সমস্ত গ্লানিকে অপসারিত করেছিল।

যমযম ঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত ইব্রাহিম তাঁর পত্নী বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইলকে যখন মক্কার নির্জন মরুপ্রান্তরে কিছু খাদ্য ও পানীয় সহ রেখে গেলেন, তখন

বিবি হাজেরা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি আমাদের নির্জন মরুপ্রান্তরে ত্যাগ করে যাচ্ছেন? না আল্লাহ্‌র আদেশে রেখে যাচ্ছেন? তখন তিনি শেষের কথাটিতেই সম্মতি জানালেন। কয়েক দিনের মধ্যে খাদ্য ও পানীয় শেষ হলো, তখন বিবি হাজেরা ও তাঁর সদ্যোজাত শিশুপুত্রের পিপাসা নিবারণের জন্যে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে পানির অনুসন্ধানে ছোটাছুটি করছিলেন। অবশেষে হতাশ হয়ে দেখলেন শিশুর পায়ের আঘাতে আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় পানির ফোয়ারা সৃষ্টি হয়েছে। মা হাজেরা তাড়াতাড়ি ফোয়ারার চারপাশে বাঁধ বেঁধে দেন। এটাই ইতিহাসবিখ্যাত যমযম কূপ নামে খ্যাত। পরে ওই কূপকে কেন্দ্র করে মক্কাগামী বাণিজ্যিক কাফেলা নতুন করে জনপদ ও বসতি গড়ে তোলে। তাই আজও এই বেদনাঘন স্মৃতি মা হাজেরার স্মারক হিসাবে হাজিদের সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে সাতবার সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি করা হজ পালনের জন্য অপরিহার্য। কালক্রমে এই ঝরনাটির অস্তিত্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। বহুদিন পর্যন্ত এই স্থানটির কোন হদিস কেউ করতে পারেননি। আবদুল মোত্তালিব যখন মক্কার তীর্থযাত্রীদের পানি সরবরাহ করতেন, তখন তিনি ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হারিস ওই ঝরনাটি আবিষ্কার করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন।

একদা রাত্রে আবদুল মোত্তালিব স্বপ্নে জানতে পারেন যমযম 'আসক্ ও নাইলা' নামক দুই পুতুলের নিচে অবস্থিত, তখন তাঁরা সেই স্থান খনন করতে আরম্ভ করেন। মক্কাবাসীগণ তাঁদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। কিন্তু পরিশেষে খোদার অফুরন্ত করুণাধারায় যমযম আবিষ্কৃত হল।

আবদুল মোত্তালিবের প্রতিজ্ঞা ও ব্রতপালন ঃ আবদুল মোত্তালিব নিজেকে খুবই একাকী অনুভব করতেন। তাই তাঁর মনে হত যদি আল্লাহ্ তাঁকে দশটি পুত্র ও যমযম আবিষ্কারের ক্ষমতা দান করেন, তাহলে তিনি তাঁর একটি ছেলেকে আল্লাহ্‌র নামে কোরবানি দেবেন। যথাসময়ে আল্লাহ্ তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তখন তিনি তাঁর ব্রত বা প্রতিজ্ঞা পালনে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর দশটি ছেলেকেই কাবার নিকট হাজির করলেন। এবং কোরবানির জন্যে লটারি করে একটি ছেলের নাম পেতে চেষ্টা করেন। লটারিতে যে নামটি উঠল সেটি তাঁর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান—আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাস। আবদুল্লাহ ছিলেন তাঁর সমস্ত সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে সুপুরুষ এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট সত্য পালনার্থে তিনি আবদুল্লাহকে কাবার সম্মুখে হাজির করলেন আল্লাহ্‌র নামে কোরবানি দেওয়ার জন্যে। একদিন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁর প্রাণাধিক পুত্র হযরত ইসমাইলকে এইভাবে আল্লাহ্‌র নামে কোরবানি দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ ঃ আরবের জনগণও আবদুল্লাহকে এতই ভালবাসতেন যে তাঁরা তাঁকে কোরবানি দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হতে পারলেন না। সমগ্র আরববাসী এই কোরবানির বিরোধিতা করে বসল। কিন্তু আবদুল মোত্তালিব ছিলেন কঠিন পুরুষ, আপন প্রতিজ্ঞায় অটল। সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর রূপ ধারণ করলে সিদ্ধান্ত হলো একজন জ্যোতিষী বা জাদুকর যা বলে দেবেন, তাই মেনে নেওয়া হবে। শিয়া নামক এক জ্যোতিষীর ওপর এই সমস্যার সমাধানের ভার পড়ল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন—একজন লোকের জন্য দশটি উট কোরবানি।

আবদুল মোত্তালিব একদিকে দশটি উট ও অন্যদিকে আবদুল্লাহর নাম রাখলেন। শর্ত থাকল—যতক্ষণ লটারিতে উটের নাম না এসে আবদুল্লাহর নাম আসবে ততক্ষণ ততবার অর্থাৎ প্রতিবারে দশটি করে উট সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে যখন উটের নাম লটারিতে আসবে তখন সমস্ত উট এক আল্লাহর নামে কোরবানি দেওয়া হবে।

এইভাবে লটারি আরম্ভ করা হলো। উটের সংখ্যা একশতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত উটের নাম লটারিতে এলো না। যখন এলো তখন উটের সংখ্যা দাঁড়াল একশ। এভাবে ওই একশ উট আবদুল্লাহর পরিবর্তে আল্লাহ্‌র নামে কোরবানি দেওয়া হলো। তখন থেকে একটি মনুষ্য জীবনের মুক্তিপণ হিসাবে একশটি উট নির্ধারিত হলো। আবদুল মোত্তালিবের সর্বমোট তেরোটি পুত্র ও দুটি কন্যাসন্তান ছিল।

এই ঘটনাটি লক্ষ্য করলে মনে হয়—এ যেন মহান আল্লাহ্‌রই অদৃশ্য সংকেত বা ধারা। যে ধারাপথে অনেক সময় অনেক মহামানবই এসেছেন, যেমন একদিন হযরত ইমরান (আঃ) মনস্থ করছিলেন—তাঁর পত্নীর গর্ভে যে সন্তান হবে তাকে তিনি আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করবেন। পরে দেখা গেল কন্যা মরিয়মের জন্ম। তবুও তিনি সেই কন্যা সন্তানকেই আল্লাহর পথে উৎসর্গ নয়, আল্লাহর পথে সমর্পণ করলেন। পরে এই মরিয়মের গর্ভে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম। এইভাবে আল্লাহ্‌র নামে নিবেদিতপ্রাণ হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ঔরসজাত সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ)। এইভাবে আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত আবদুল্লার ঔরসে মহানবীর জন্ম।

আবরাহা ঃ মক্কার পবিত্র কাবার গুরুদায়িত্ব যখন আবদুল মোত্তালিবের ওপর ন্যস্ত, তখন ইয়ামেনে খ্রীস্টান রাজা আবরাহার রাজত্বকাল। আবরাহা ইয়ামেনের সানা নামক স্থানে একটি মন্দির তৈরি করলেন—উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র আরববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্থানটিকে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ও তীর্থক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা। কিন্তু মক্কাতে কাবার অস্তিত্ব থাকলে এ কাজ সম্ভব নয়, এটাও বুঝতে তাঁর কোন কষ্ট হলো না। তাই তিনি হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জন্ম-বছরে এক বিশাল বাহিনী-সহ মক্কা আক্রমণ করেন। কথিত আছে, তাঁর বিশাল বাহিনীর সঙ্গে পথিমধ্যে আবদুল মোত্তালিবের সাক্ষাৎ হয়, মোত্তালিব তখন তাঁর কতিপয় উট-সহ আপন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আবরাহা রাজার সেনাগণ তাঁর উটগুলোকে জোরপূর্বক অধিকার করলে আবদুল মোত্তালিব সেখানে হাজির হয়ে তাঁর উটগুলোকে ফেরত দিতে অনুরোধ জানান। এতে রাজা উত্তর দেন—কয়েকটা উট নিয়ে আর কি করবে? তোমার কাবাই তো আমি এখনই দখল করব বা ধ্বংস করব। উত্তরে মোত্তালিব বলেন—উটগুলো আমার, আমাকে ফেরত দিন এবং কাবা যাঁর তিনি যদি তাকে রক্ষা করেন করবেন, না করেন আপনি ধ্বংস করবেন, সেখানে আমার কিছু বলার নেই। মোত্তালিব দৃঢ়ভাবে জানতেন কাবার একমাত্র মালিক এক আল্লাহ। তাঁকে ধ্বংস করার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই—যতক্ষণ তাঁর মালিক সেরূপ কোন ইচ্ছা না করেন। এ কথা শুনে রাজা তাঁর উটগুলো ফেরত দিলেন।

আবরাহার পরিণতি ঃ "তুমি লক্ষ্য করোনি যে, তোমার প্রতিপালক হস্তির মালিকদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? এবং তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল প্রেরণ করেছিলেন। ওরা তাদের ওপর কাঁকর জাতীয়

প্রস্তরপুঞ্জ নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদের ভক্ষিত তৃণতুল্য করে দিয়েছিলেন।" কোরআন—১০৫ ঃ ১-৫

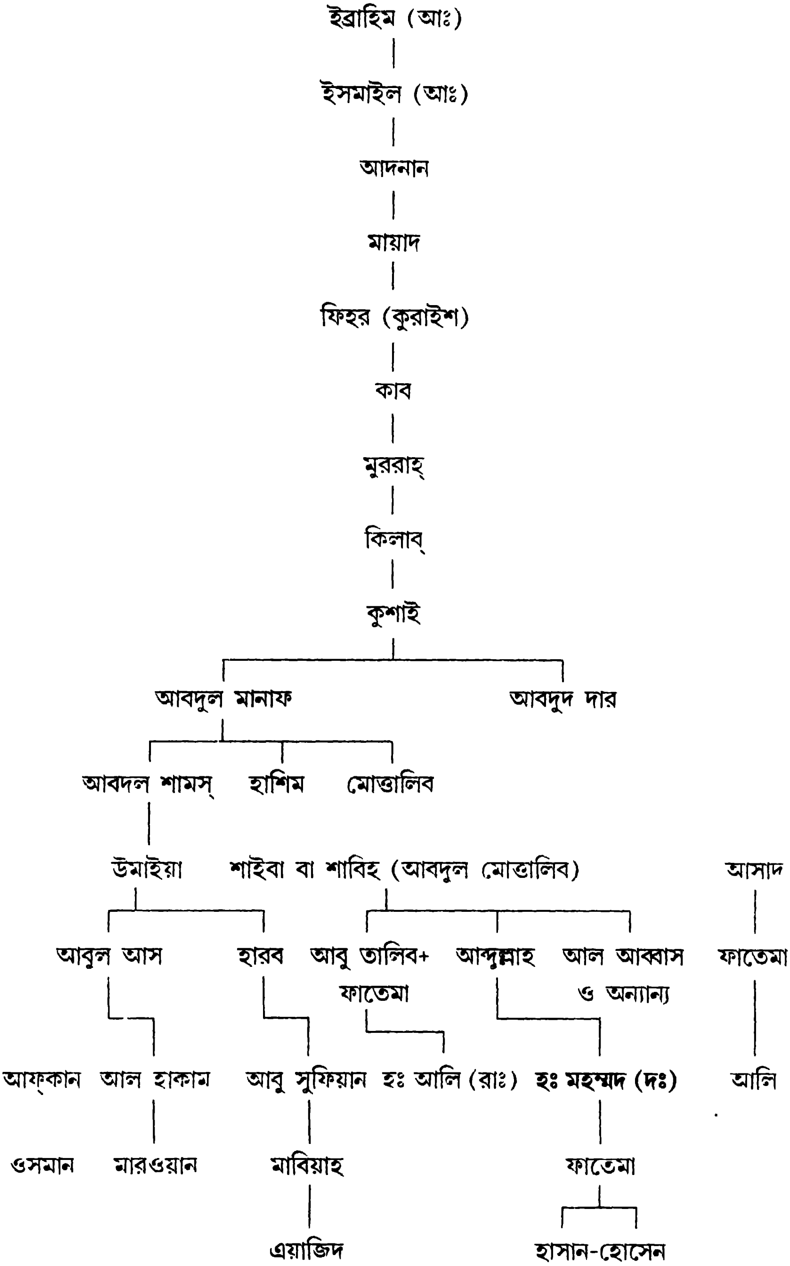
এই বছরটি ছিল পারস্যের নওশিরওয়ার কিসরা রাজত্বের চল্লিশতম বছর। এবং একে হস্তি বছর বলেও গণনা করা হতো। সবের উর্ধ্বে এই বছরে দ্বীনের নবী **হযরত মহম্মদ** (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন ৫৭০ খ্রীঃ।

আবদুল্লাহ ও আমিনার বিবাহ ঃ আবদুল মোত্তালিবের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহর সঙ্গে (বনি জুহরাহ গোত্রের প্রধান জুহরাহর পুত্র আবদ মান্নাফ এবং আব্দ মান্নাফের পুত্র) ওয়াহাবের কন্যা আমিনার বিবাহ হয়। তখন আবদুল্লাহ্‌র বয়স ছিল কুড়ি বছর এবং আবদুল মোত্তালিবের সত্তর বছর। ওই বয়সেও আবদুল মোত্তালিব এত শক্তিশালী ছিলেন যে ওই একই দিনে তিনি তাঁর আত্মীয়ের কন্যা হালা নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণীর গর্ভে পরবর্তীকালে ইসলামের সিংহ হামজার জন্ম—যিনি সম্পর্কে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর চাচা। আবদুল্লাহ মাত্র তিনদিন শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন। পরে আপন বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে আসেন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রী আমিনাকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে তিনি বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ার পথে গমন করেন। ফেরার পথে তিনি মদিনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার কথা শুনে পিতা আবদুল মোত্তালিব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হারেজকে পাঠান। কিন্তু হারেজ ফিরে এলেন বৃদ্ধ পিতার নিকট এক গভীর বেদনাদায়ক মর্মান্তিক সংবাদ নিয়ে—আবদুল্লাহ আর ইহজগতে নেই। বৃদ্ধ পিতা ও নববধূ আমিনা হতবাক্ হতভম্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ়, শোকে-দুঃখে ম্রিয়মাণ। জগদ্বরেণ্য নবী **হযরত মহম্মদ** (দঃ) তখনও মা আমিনার গর্ভে।

কথিত আছে, কোন এক পরমা সুন্দরী যুবতী মহানবীজীর পিতা আবদুল্লাহকে বিয়ে করার জন্য দিন-রাত যখন-তখন খুবই পীড়াপীড়ি করতেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। আবদুল্লার বিয়ে হলো তদানীন্তন ইয়াসরেব (মদিনা) বাসিনী যুবতী বিবি আমিনার সঙ্গে। এই বিয়ের পর একদিন ওই সুন্দরীর সঙ্গে আবদুল্লার সাক্ষাৎ। সুন্দরী বিয়ের জন্য আর কোনই আগ্রহ দেখালেন না। তখন আবদুল্লাহ অবাক হয়ে তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সুন্দরী উত্তরে বললেন—"যা হওয়ার হয়ে গেছে, আর কি হবে।" তখন সমাজে একাধিক বিয়ে প্রচলিত ছিল। আবদুল্লাহ বললেন—তিনি তো আরও বিয়ে করতে পারেন। তখন সুন্দরী বললেন—"না, যে জিনিসটির জন্য আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, সে জিনিসটি আর নেই।" আবদুল্লাহ—"কোন্ জিনিস"? সুন্দরী—"আপনার ললাটদেশে একটি অসাধারণ জ্যোতি সর্বদা চমকাতো, সেটি কোন মহিলার গর্ভে চলে গেছে। আমার আশা ছিল, ওইটিকে গর্ভে ধারণ করে কোন এক জগদ্বিখ্যাত শিশুর বিশ্ববিখ্যাত মা হওয়া। আপনাকে বিয়ে করার ওইটিই ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য। সে আশা যখন আর নেই, তখন আর বিয়ে করে কি হবে।" আবদুল্লাহ ছিলেন তখনকার আরবের সুন্দরতম সুপুরুষ।

গাইবে যখন মানব-শিশু—
মানবতার উচ্চ গান
ভাসবে উঠে সেই সাগরে—
পদ্মরাগে মাতার প্রাণ।

কুরাইশ বংশের উৎপত্তি বা প্রথম ব্যক্তি



তৃতীয় অধ্যায়

অজ্ঞতার যুগ

(Islamic Change was a Historic Necessity)

ইসলামের পূর্বে আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ঃ আরবের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয় ইসলামধর্ম প্রসার ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে। এর পূর্বে সেখানে যা ছিল তা এককথায় কলহের কুরুক্ষেত্র। পববর্তীকালে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নেতৃত্বে আরব একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হয়। কিন্তু সেদিনের আরবে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিল না। ষষ্ঠ শতাব্দীব গোড়ার দিকে কুহতান গোত্রেব কিন্দিজগণ মধ্য আরবে একটি রাজ্য গঠনের চেষ্টা করেন। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জন্মের প্রাক্কালে তাঁদের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। হেজাজ এবং নাজদের নোমাদ গোত্রের মধ্যে অবাজকতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করতে থাকে।

দেশেব অন্যান্য অংশেও আববদের অভ্যন্তবীণ বা বাহ্যিক কোন শক্তিই ছিল না। ইহুদীগণ খ্রীস্টানগণ কর্তৃক প্যালেস্তাইন হতে বহিষ্কৃত হলে খ্রীস্টানগণ প্যালেস্তাইনের সীমান্তে খাইবারে দুর্গ তৈরি করেন। এবং ওই সময়ে তাঁরা মদিনা ও প্যালেস্তাইনের মধ্যে খুব শক্তিশালী গোত্রে পরিণত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁরা কোন একজন শাসকের নেতৃত্বাধীনে নিজেদেব একত্রিত করতে পারেননি। অনুমান কবা যায়, শাসন বা রীতি-নীতি, আইন-কানুন বলতে তাঁদের কিছুই ছিল না। তাঁরা কি নিজেব জন্য, কি অপরের জন্য, কি দেশের জন্য কোন সুদূরপ্রসারী মঙ্গলজনক কাজের ধারাবাহিকতা বহন করতে পাবেননি। সেই সময় ইহুদীদের সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত উপনিবেশ ছিল বনি নাজির, বনি কোরাইজা এবং বনি কাইনুকা।

আরবের অন্যান্য স্থানের অবস্থাও ঠিক একই রকম ছিল। বাইজানটাইন এবং কেটাসিফোন আরবকে বিরামবিহীন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। হাওরানে গাছানিদ ছিল রোমের অধীনে এবং হীরাতে লাখমিদ ছিল পারস্যের অধীনে।

দক্ষিণে আবিসিনিয়ানগণ হিমাবাইতগণকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পারস্য সম্রাটের প্রভাবে সেখানকার স্থানীয় রাজকুমার কর্তৃক তাঁরা নিজেরাই বিতাড়িত হন। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবগণ রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন একটি জঘন্যতম পর্যায়ে ছিলেন যা চিন্তা করা যায় না। না ছিল শাসন, না ছিল শাসক, না ছিল আইন-কানুন—শুধুমাত্র শতধা-বিভক্ত জাতির মধ্যে দিন-রাত চলত খুনোখুনি হানাহানি মারামারি ইত্যাদি। এই ছিল তখনকার দিনে আরবের রাজনৈতিক চরিত্র বা চিত্র।

আরবে ধর্মীয় অবস্থা ঃ ইসলামের পূর্বে আরবে, বিশেষ করে হেজাজে ব্যবসা-বাণিজ্যই প্রাধান্য লাভ করেছিল। এমনকি ধর্মকেও তারা ব্যবসার উপকরণ রূপে ব্যবহার করতেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) মক্কাতে যে কাবার প্রতিষ্ঠা করেন, আরববাসীগণ পরবর্তীকালে তাকে বহু দেবদেবীর মন্দিরাগারে পরিণত করেন। সকল আরববাসী এই মন্দিরে আসতেন আপন আপন দেবদেবীর আরাধনা উপাসনা করাব জন্য। যার ফলে সেখানে প্রচুর লোক সমাগম হতো। স্থানীয় লোকদের দু' পয়সা

রুজি রোজগারেরও ব্যবস্থা হতো। ধর্মকে তাঁরা এইভাবে ব্যবসার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেন। তখনকার দিনে তাই মক্কাকে বেক্কা বলা হতো। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জন্মের চারশ' বছর পূর্বে হেজাজের সম্রাট কোহতান বংশের সাবা নামক ব্যক্তি কাবার ছাদে হোবল নামে এক পুতুল স্থাপন করেন। চারটি প্রধান দেবদেবীর মধ্যে এটি একটি, অন্যান্য তিনটি—লাত, মানাহ ওজ্জা। কাবাতে মোট ৩৬০টি পুতুল বিরাজ করত। প্রতিটি গোত্রের আপন আপন পৃথক পৃথক দেবদেবী ছিল। মক্কা ও ইয়াসরেবের মধ্যবর্তী কুদাইদ নামক স্থানে 'মানাহ' দেবী। নাস্‌লা নামক স্থানে 'ওজ্জা', এবং তায়িফে ছিল 'লাত' প্রতিমা।

শুধু মক্কা শহরেই তাঁদের দেবদেবী ও পুতুল সংরক্ষিত থাকত তা নয়, যাঁরা মক্কা আসতে অসমর্থ হতেন, তাঁরা আপন আপন স্থানীয় শহরে মক্কার প্রতিনিধিস্বরূপ পুতুল রাখতেন এবং সেগুলোর পুজো-অর্চনা করতেন।

মজার কথা, পূজারীগণ আপন আপন খেয়াল খুশিমত দেবদেবীদের চেহারা বা আকৃতি ঠিক করতেন। যেমন, ওয়াদ ছিল পুরুষাকৃতি পুতুল, নাইলা ছিল নারী আকৃতি, সুরা ও যাগুস ছিল সিংহ আকৃতি, যায়ক ছিল ঘোড়া আকৃতি, নসর ছিল শকুন আকৃতি।

বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো করতেন। যেমন—কালর গোত্র ওয়াদের, হুজাইল গোত্র সুয়াব, ইয়ামেনবাসী নসর, হামাদান গোত্র ইলায়ুক, তাইয়াফের বনি ছাকিক গোত্র লাত, বনি কানানা গোত্র ওজ্জা, আস এবং খাররাজ গোত্র মানাহ্‌দেবীর পুজো করত। হোবলের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তখন কাবা গৃহে হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসমাইল, হযরত ঈসা ও বিবি মরিয়মের ছবি ছিল।

এই সমস্ত দেবদেবীদের নামে জীবজন্তু উৎসর্গ দেওয়া হতো। এবং তাদের রক্তমাংস তাদের নিকট আনা হতো। এমনকি মাঝে মাঝে মানুষও বলি দেওয়া হতো।

কাবাই যে দেবদেবীদের একমাত্র স্থান ছিল একথা বলা যায় না। কেননা আরও কয়েকটি খুদে কাবাও তখন দেখা যেত। যেমন—কাবার অনুকরণে গাতফান গোত্রের ছিল লাইস, অনুরূপভাবে বনু খাসামের হলো খাসলা। এর অবস্থান ছিল ওহোদ পাহাড়ের নিকট যেখানে সাইদা নামক প্রার্থনাগারও ছিল। রাবেয়া গোত্রের ছিল যুল কাবাত। নাজরান গোত্রের যে গম্বুজটি ছিল তাকে নজরানের কাবা বলা হতো।

রহস্যটি হচ্ছে—এত যে দেবদেবী এত যে ধর্মযাজক কিন্তু মূলে সেখানে কি ছিল? দেখা যায়, কতগুলো ধর্মের পাণ্ডা তারা সাধারণ মানুষকে নানা দেবদেবীর ভুয়া কথা শুনিয়ে দু' পয়সা রোজগার করত মাত্র। প্রকৃত ধর্ম বা প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি বলতে সেখানে কিছুই ছিল না। তারা পরকালে বিশ্বাস করত না। কাজেই ভাল কাজের জন্য পরকালে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তিতে তাদের কোন আস্থা ছিল না।

আরবের ধর্মরূপ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একটি কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। তাঁরা শুধু যে দেবদেবীর পুজো করতেন তা নয়, তাঁরা আকাশমার্গেরও পুজো করতেন। যেমন—চাঁদ তারা নক্ষত্র সূর্য ইত্যাদি। তবে এই সমস্তের পুজো কখন হতে বা কার দ্বারা আরবে আরম্ভ হয়েছিল, একথা সঠিকভাবে বলা বড়ই কঠিন। সকল দেশেই আকাশমার্গের প্রতি যে একটা দুর্বলতা আছে, সেটা আজকের সভ্যজগৎও অস্বীকার করতে পারে না। তাদের প্রভাব একালের ওপর আছে। একথা প্রায় ছোট-বড় সকলেরই দ্বারা স্বীকৃত। এছাড়া প্রকৃতিজগতের প্রতিও সাধারণ মানুষের একটি মোহ আছে। যেমন—পাহাড় পর্বত

নদনদী গিরি-গুহা বনবৃক্ষ সাগর জঙ্গম ইত্যাদির প্রতি মোহ। সে দিনের ধর্ম এই ভাবেই ধরণীকে রূপ দিয়েছে।

নূহ (আঃ)-এর যুগের ধর্মীয় অবস্থা ঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর সময়েও সেকালের লোকেরা পুতুল পুজো করত। সুতরাং পুতুল পুজো যে প্রাচীন সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এর দ্বারা একটি কথা অতি সহজেই বোঝা যায়—মানুষের মন আপাতমনোহর ভ্রান্ত কোন কিছুকে প্রত্যক্ষভাবে পেতে চায়। সেজন্য কোন কিছুকে জড়িয়ে থাকতে চায়।

নূহ বলেছিলেন—"হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং এমন লোকদের অনুসরণ করেছে যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে। ওরা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল। ওরা বলল—তোমরা তোমাদের দেবদেবীকে পরিত্যাগ করো না, পরিত্যাগ করো না ওয়াদ সুয়া যাগুস যায়ুক ও নাসরকে। ওরা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং সীমালঙ্ঘনকারীদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করে দাও।" কোরআন—৭১ ঃ ২১-২৪

পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহিমের মুখ থেকেও আমরা অনুরূপ কথা শুনি।

"স্মরণ কর—ইব্রাহিম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক, এ নগরকে নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পুজো হতে দূর রাখ। হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে-ই আমার দলভুক্ত। কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

কোরআন —১৪ ঃ ৩৫-৩৬

সমগ্র দেবদেবীর মধ্যে যে চারটি প্রধান, তাদেরও তিনটি সম্পর্কে কোরআনের বিবৃতি—"তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওজ্জা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরও একটি মানাহ্ সম্পর্কে। তোমরা কি মনে কর পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য। এরূপ বণ্টন তো অসঙ্গত বণ্টন। এগুলো তো কেবল নামমাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা ও তোমরা রেখেছ। এবং এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলিল প্রেরণ করেননি।"

কোরআন—৫৩ ঃ ১৯-২৩

প্রাচীন আরব ধারার সঙ্গে বর্তমান ভারতীয় ধারার একটি দিক ওতপ্রোতভাবে মিলে যায়। ভারতীয় বিশাল হিন্দু সমাজের অনেককেই বলতে শোনা যায়—তাঁরা দেব-দেবীর আরাধনা করেন তাঁদেরকে ভগবান মনে করে নয়। ভগবান একজনই একই। এই দেব-দেবীগুলোর মধ্যে তাঁরা শুধু সহজে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে পারবেন মাত্র। প্রাচীন আরবরাও ওই একই কথা বলত আমরা এদের পুজো এজন্য করি যে, এরা আমাদের আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য এনে দেবে। কিন্তু ইসলামে কোন মাধ্যম নেই। বান্দা সরাসরি তার আল্লাহ্‌কে ডাকবে। আল্লাহ্ সাড়া দেবেন। "নিশ্চয় আমি সন্নিকটবর্তী, যখন প্রার্থী প্রার্থনা করে তখন তার প্রার্থনার উত্তর দান করি। অতএব আমার আহ্বানে উত্তর দান করা, আমাকে বিশ্বাস করাই তাদের উচিত, যাতে তারা সুপথ পাবে।" কোরআন—২ ঃ ১৮৬। কেননা কোরআন আরও বলে, তাঁর প্রতি আনুগত্যে কোনরকম অংশ বা ছেদ থাকতে পারে না। যেহেতু পূর্ণ আনুগত্য তাঁরই। 'জেনে রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।'

কোরআন—৩৯ ঃ ৩

কোরআনে শেরক বলতে এই—যা এক স্রষ্টার সঙ্গে অন্যকে অংশী করে, এবং যা আল্লাহ্‌র নিকট অমার্জনীয় ত্রুটি, ক্ষমাহীন দোষ। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জন্ম-প্রাক্কালে সমগ্র আরবের ধর্মীয় অবস্থা ওইরকমই ছিল। কিঞ্চিত মানুষ ব্যতিক্রম স্বরূপ ছিলেন, যাঁদের হানিফ বলা হতো।

ইসলামের পূর্বে আরবের নৈতিক অধঃপতন

কন্যা-হত্যা ঃ আরবের বনি তমিল এবং কুরাইশ গোত্রের মধ্যে তাদের ঔরসজাত কন্যাগণ এক রকমের অসভ্যতা ও বর্বরতার শিকার হয়েই বেঁচে থাকত, তারা তাদের হত্যা করে গর্ব অনুভব করত। চিন্তা করতেই ভয় পাই, মানব মাত্রেরই বিশ্বাসে আসে না—যখন তাদের কন্যাগণ পাঁচ কি ছয় বছরে পা দিত তখন তারা অতি আদরে লালিত কন্যাগণকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দিত। পিতা যখন নিষ্পাপ শিশুকন্যাটিকে গভীর গর্তে নামিয়ে দিত, তখন অসহায় শিশুটি পিতা—পিতা বলে ভীষণ আর্তনাদ করতে থাকত। পাষণ্ড পিতা পাথর নিক্ষেপ আরম্ভ করলে—শিশুকন্যার সকরুণ আর্তনাদে ধরণী হতো দ্বিধাবিভক্ত, বনের পশু পেত লজ্জা, বৃক্ষ-লতা-পাতাও উঠত কেঁদে, আল্লাহ্‌র আরশও উঠত কেঁপে। জগতে এমন কোন পিতা আছেন কিনা জানা নেই, যিনি একথা চিন্তা করতেও ভয় পান না। শিশুহত্যাকে বর্বরতার পরিচয় বলে মনুষ্যকুল গ্রহণ করতে পারলেও পাঁচ বছরের সন্তানকে নৃশংসনিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা অখণ্ড মানবজাতির কাছেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। এ হেন মর্মান্তিক ছিল আরবের শিশুকন্যা-হত্যার কাহিনী। অতি সামান্য কয়েকটি বিশেষ গোত্রের কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তথাকথিত সম্ভ্রান্ত সকলেই এই অমানুষিক কাজে সিদ্ধহস্ত ছিল। কায়েস বিন আসিম নামে এক ব্যক্তি তার দশটি কন্যাকে এইভাবেই কবরস্থ করে। কেউ কেউ দারিদ্র্যের ভয়েও এরূপ করত।

"তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যভয়ে হত্যা কর না। ওদের এবং তোমাদের আমি জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই ওদের হত্যা করা মহাপাপ।"

কোরআন—১৭ ঃ ৩১, ৮১ ঃ ৮

বিধবা ঃ আরবদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি মারা যেত, রেখে যেত কয়েকটি বিধবা। কালবিলম্ব না করে তার শক্তিশালী আত্মীয়গণ এই বিধবাদের ভোগের সম্পদরূপে গ্রহণ করত। এমনকি, পুত্রগণও তাদের সৎমাকে এইভাবে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করত না।

"নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের বিবাহ করেছে, তোমরা তাদের বিবাহ কর না, অবশ্য যা অতীতে হয়ে গেছে তা নিশ্চয় অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।"

কোরআন—৪ ঃ ২২

এই সমস্ত অভাবনীয় প্রথা ও প্রবণতা আরব-সমাজে প্রচলিত ছিল। তাদের কোন বিধিবিধানের বালাই ছিল না, অধিকন্তু নারীগণ ভোগ্যবস্তু রূপেই পরিগণিত ছিল।

ব্যভিচার ঃ ইসলামের পূর্বে আরব ভূমিতে নর-নারীর অবাধ যৌনমিলনে কোন রূপ বিধিনিষেধ ছিল না। প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের এই আচরণ জীবজন্তুর যৌন জীবনধারাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। জীবজন্তুর মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু থাকে না। কিন্তু সেদিনের আরব মহিলাগণ পুরুষদেরকে আকর্ষণ করার জন্য যতরকম উপায় অবলম্বন করা যায় তার

একটিও বাদ দিত না। এহেন ছিল আরব-সমাজের যৌনচিত্র। এই পথ শুধু রাস্তার মেয়েরাই যে গ্রহণ করেছিল তা নয়, সে যুগের সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে-মা-বোনেরাও নিঃসংকোচে দ্বিধাহীন চিত্তে এই ঘৃণ্য পথে পা বাড়িয়ে দিত। কোন বাধা-বন্ধন ছিল না। ইসলামের ইতিহাসে আবু সুফিয়ানের নাম কারও অবিদিত নেই। ওমাইয়ার পুত্র হারব এবং হারবের পুত্র আবু সুফিয়ান। এই আবু সুফিয়ান তদানীন্তন আরবের একজন প্রথিতযশা খ্যাতিমান পুরুষ ও হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর মহাশত্রু ছিলেন। ওহোদে দু'পক্ষে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ চলছে। স্বযং সুফিয়ান হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অন্যদিকে তার প্রিয়তমা স্ত্রী হেন্দা কয়েকজন পরমা সুন্দরী রমণীকে নিয়ে প্রকাশ্যে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় যুদ্ধে বীরসৈনিক যুবকদের সুললিত কণ্ঠে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে, উত্তেজিত করছে—"হে বীর যুবকগণ, যোদ্ধাগণ, যদি তোমরা যুদ্ধে জয়ী হও, অগ্রণী হও, আমরা তোমাদের আলিঙ্গন করব। আমরা তোমাদের ভোগের পণ্য, কামের বস্তু কামিনীরূপে তোমাদের জন্য ফুলশয্যা, মিলনের বিছানা প্রস্তুত রাখব, তোমরা আমাদের পাওয়ার জন্য, ভোগের জন্য, আলিঙ্গনের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে যাও, অগ্রসর হও। কিন্তু যদি তোমরা পশ্চাদবর্তী হও, পরাজয় স্বীকার কর, তা হলে আমরা তোমাদের ত্যাগ করব, কোন আনন্দ পাবে না।"

তখনকার সমাজে বহু নারী তাদের সন্তান প্রসবের পর সন্তানের পিতার নাম বলতে পাবত না। এবং তা না পারাতে তারা এতটুকু লজ্জাবোধও করত না। এবং তার কোন প্রয়োজনও ছিল না। আজকের সভ্য ইউরোপেও তাই। কিন্তু কোরআন বলে—"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না।" কেননা একবার নিকটবর্তী হলে—মানুষ নিজেদের ঠিক রাখতে পারবে না। তাই কোরআন ব্যভিচারের পূর্ব-অধ্যায়কেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ১৭ ঃ ৩২.

বিবাহ ঃ তখনকার দিনে আরবে বিবাহ-মিলন ও বিবাহ-বিচ্ছেদ নারীর জন্য কি ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনত তা ছিল অবর্ণনীয়। একজন পুরুষ তার ইচ্ছা অনুযায়ী যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারত এবং যখন ইচ্ছা তখনই ছেড়ে দিতে পারত। এই ছাড়ার পর পরিত্যক্তা স্ত্রী আর কোথাও বিবাহ করতে পারত না। এই ছিল নারী-সমাজের দাম্পত্য-জীবনের সবচেয়ে করুণ ইতিহাস। স্ত্রী-জীবনের এত বড় করুণ ইতিহাস রচনা করার জন্য পুরুষদের কোন কষ্টকব কিছুই করতে হত না। শুধুমাত্র আপন স্ত্রীর যে কোন অঙ্গকে নিজের মায়ের সেই অঙ্গের সঙ্গে একবার তুলনা করে দিলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যেত। কি জঘন্যতম প্রথা।

জুয়া ও মদ্যপান ঃ আরব চরিত্রকে যে কয়েকটি জিনিস সর্বাপেক্ষা উত্তেজিত করে অধঃপতন ঘটিয়েছিল তার মধ্যে জুয়া ও মদ্যপান প্রধান। এ দুটোর আসক্তি হতে মুক্ত মানুষ তখনকার দিনে আরবে ছিল কিনা সন্দেহের কথা। থাকলে তার দেখা পাওয়া বড়ই কঠিন ছিল। কেননা, যারা এই সমস্ত হতে দূরে থাকত তাদের অসামাজিক হীণমনা নীচ ইত্যাদি বলা হত। মৃত্যুকালে অধিকাংশ পুরুষ তাদের স্ত্রীগণকে পরবর্তীকালের উৎকৃষ্ট জুয়াড়ি মদ্যপায়ীকে বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করে যেত। প্রতিটি রাস্তার মোড়ে ঘরে ঘরে মদের জোয়ার বইত। তখনকার দিনে কবি ও সাহিত্যিকগণ যে কয়েকটি বস্তুকে কেন্দ্র করে তাদের সাহিত্যসম্ভার গড়ে তুলত তার মধ্যে—জুয়া, মদ্যপান, যুদ্ধ ও নারী ছিল প্রধান। 'হামাসা', 'হারিরীর', 'সাবা মুয়াল্লাকা' গ্রন্থগুলো তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

সুদ ঃ আরবের সুদপ্রথা জগদ্বিখ্যাত ছিল। সাধারণত কর্জ যথাসময়ে শোধ করতে না পারলে সুদ আসলের সঙ্গে একত্রিত হত। এইভাবে ঋণীর ঋণ বন্যার স্রোতের আকারে বেড়ে চলত। পরিণতি হত ভয়াবহ। যখন ঋণী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের আর কোন উপায় থাকত না, তখন ঋণদাতা ঋণীর স্ত্রীকে পছন্দ হলে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারত। ইচ্ছা করলে একেবারেই নিজস্ব সম্পত্তি রূপে গ্রহণ করতেও পারত। কোন কোন ঋণীর কোন সুন্দরী কন্যা থাকলে তাকেও তার মাতার সঙ্গে একই সাথে ভোগের পণ্যরূপে গ্রহণ করত। কখনও কখনও ঋণী তার স্ত্রীকে ঋণদাতার নিকট বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করত। সুতরাং ঋণ ও সুদের পরিণতি ছিল ভয়াবহ। আজকের দিনে মানুষ যা চিন্তা করতেও ভয় পায়। এই ভয়াবহ পরিণতির প্রথম সোপান সুদকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করল। কোরআন—২ ঃ ২৭৫, ৩ ঃ ১৩০, ৩০ ঃ ৩৯

গোত্রযুদ্ধ ঃ সারা পৃথিবীর কাছে আরব চরিত্র দুর্ধর্ষ বলেই পরিচিত। নিজে যা ন্যায় মনে করত তার জন্য জীবন দিতেও তারা পিছপা হতো না। এমনি ছিল তাদের চরিত্র। আত্মসম্মান, গোত্রসম্মান, জাতিসম্মান বোধ তাদের কাছে এমনই প্রবল ছিল যার জন্য তারা আমরণ যুদ্ধে লিপ্ত হতেও দ্বিধাবোধ করত না।

ইসলামের চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর পূর্বে আরবের মাটিতে একশ হতে একশ বত্রিশটি যুদ্ধ চলেছিল। সে সময়কে আরবী ভাষায় আইয়ামুল আরাব বা আরবের সময় বলা হত। এই সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ প্রসিদ্ধ, যেমন—আব্বাস ও যাবিয়ান গোত্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ চলেছিল প্রায় চল্লিশ বছর। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পেছনে ছিল—ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। উভয় গোত্রের দুটি বিখ্যাত ঘোড়া ছিল। আব্বাস গোত্রের দাহাস এবং যাবিয়ান গোত্রের গাবরা। এই প্রতিযোগিতার সামান্যতম দোষ-ত্রুটিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হয়। অন্য একটি যুদ্ধ বাসুসের যুদ্ধ নামে পরিচিত। বাসুস একটি মেয়ের নাম। তার একটি মাদি উট ছিল। হঠাৎ একদা এই উটটি অন্য একটি গোত্রের বাগানে প্রবেশ করে। এই নিয়ে দু'দলে—বকর ও তাগলাব গোত্রে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আর একটি ছিল মদিনার আস এবং খাযরাজ গোত্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের অবসান ঘটে হযরত মহম্মদ (সাঃ) দ্বারা, যখন তিনি মদিনার হিযরত করেন।

এই সমস্ত যুদ্ধের পরিণতিতে যে শুধু জীবনহানি ও সম্পদক্ষয় হতো তা নয়, যখন একটি সম্প্রদায় অন্য একটি সম্প্রদায়কে পরাজিত করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্প্রদায়ের নারী ও শিশুকে তারা অধিকার করত। বিজেতা সম্প্রদায়ের নারীদেরকে নিয়ে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে নিজেদের গৌরব বৃদ্ধি মনে করার মতো হীনতম কাজেও দ্বিধাবোধ করত না। আবার সন্ধি হলে ওই সমস্ত নারীদেরই পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু কোরআন বলে—"বিবাদ পরিহার কর।" কোরআন—২ ঃ ১৯১, ২১৭

আরব নিষ্ঠুরতা ঃ আরব জাতি যে শুধু বর্বর ছিল তাই নয়, তাদের নিষ্ঠুরতাও মানুষ মাত্রকেই বিচলিত করে তোলে। কখনও কখনও তারা জীবন্ত উটের বা ভেড়ার লেজ ইত্যাদি কেটে নিত এবং সেই অংশগুলোকে পুড়িয়ে মদের চাট তৈরি করত। কোন কোন সময় উটকে মৃত ব্যক্তির কবরে বেঁধে রাখা হতো। সেই উট ক্ষুধায় ও পিপাসায় প্রাণত্যাগ করত। কখনও কখনও বন্দিনী মেয়েদের তেজস্বী ঘোড়ার লেজের সঙ্গে সজোরে বেঁধে দিয়ে

ঘোড়াটিকে অতি দ্রুতবেগে ছোটানো হতো। কখনও বা চার হাত পায়ে চারটি ঘোড়া বেঁধে সজোরে বিপরীত মুখে ছুটিয়ে দেওয়া হতো। এইভাবে হতভাগিনী নারী অতি নৃশংসভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হতো। সমাজ তা অতি আমোদের সঙ্গেই উপভোগ করত। কখন কখন পুরুষদের একটি ঘরে বদ্ধ করা হতো, তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করত। এসবই ছিল আরবের নিষ্ঠুরতার নিদর্শন।

নানা দেব-দেবীতে বিশ্বাস ঃ ইসলামের পূর্বে আরবগণ নানা দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত এবং এদেরকে তারা জ্বিন বলেই বিশ্বাস করত—এরা মরুভূমি পাহাড় পর্বত জঙ্গল ইত্যাদি স্থানে বসবাস করে। এবং তাদের বিশ্বাসানুযায়ী ওদের বহু রকমের নামও ছিল। তবে সকলেই ছিল অদৃশ্য। প্রাচীন আরবদের বিশ্বাস ছিল—এরা মরুভূমির আরব বেদুইনদের সঙ্গে অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। এদের মধ্যে যারা পুরুষদের সঙ্গে থাকত তাদের তারা আমর বলত, যারা শিশুদের কষ্ট দিত তাদের নাম রুহ, যারা দুষ্ট ছিল—তাদের শয়তান বলা হতো। যারা অধিকতর দুষ্ট ছিল তাদের ইফরিত বলা হতো। এইভাবে মনগড়া বিশ্বাস তাদের প্রভাবিত করত, জীবনের মূল সত্য ও সত্তার দিকে তাদের কোনই আকর্ষণ ছিল না, আগ্রহও ছিল না, জ্ঞানও ছিল না।

গণক ও জ্যোতিষী ঃ তখনকার দিনে আরবে গণক ও জ্যোতিষীর অভাব ছিল না। কেউ বা পাহাড়ে, কেউ বা মন্দিরে, কেউ বা জঙ্গলে নানা ভাবে বসবাস করত। আরবগণ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদেরকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। তাদের বিশ্বাস ছিল—এই সমস্ত লোকের পেছনে কোন না কোন জ্বিন আছে। তারাই তাদের ভাল-মন্দ শক্তিদান করছে। এমনকি যখন হযরত মহম্মদ (সাঃ) সমাজে তাঁর আপন বক্তব্য প্রকাশ্যভাবে প্রচারে ব্রতী হলেন এবং মাঝে মাঝে যখন দু'চারদিন কাবায় আসতেন না, তখন আবু লাহাবের স্ত্রী বলত—শয়তান তাকে ছেড়ে গেছে তাই সে আর আসে না। এই ছিল আরবের গণক জ্যোতিষী ও জাদুকর সম্পর্কে ধারণা।

কবি ও কবিতা ঃ আরব কবিতার দেশ, কবির দেশ, যদিও আরবে সে সময় লেখাপড়ার তেমন কোন চর্চা ছিল না। তবুও যেটুকু ছিল তাঁ ছিল কবিতায়। তারা নিজেদেরকে আরব বলত এবং বাকি বিশ্বকে আজম বলত। আরব অর্থাৎ যারা বাগ্মী বুদ্ধিমান এবং আজম অর্থাৎ যারা বোকা এবং বলতে কইতে তেমন পারে না।

তাদের কবিতায় কয়েকটি মূল বক্তব্য ছিল। যেমন—ব্যক্তিগর্ব, গোত্রগর্ব, পরস্ত্রী প্রেম, মদ্যপ্রেম, জুয়াপ্রেম, যুদ্ধপ্রেম, আতিথ্য প্রেম, স্বদেশ প্রেম, সাহস প্রেম, বুদ্ধি প্রেম ইত্যাদি। নারীদেহের এমন কোন অঙ্গ ছিল না, যাকে উলঙ্গ ও উত্তাল ভাবে বর্ণনা করা হত না।

বিভিন্ন কবি কবিতা রচনা করত। তাদের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা ভাল হত সেটিকে কাবার দ্বারে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। 'সাবয়া মুয়াল্লাকাত' ওইরূপ একটি অতি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ যার অর্থ সাতটি নির্বাচিত গ্রথিত কাব্য বা ঝুলন্ত কাব্য। সাহিত্যগুণে এই কবিতাগুচ্ছ আজও সারা বিশ্বে পরিচিত। আরব পরিচিতির জন্য এর মূল্য কোনদিনই হ্রাস হওয়ার নয়।

আরবের ইমরুল কায়েস, যাঁকে ইংল্যাণ্ডে শেকস্‌পিয়র বলা হয়, তার 'কাসিদাতুল লামিয়া' শত নৈতিকতার বিরুদ্ধে গিয়ে আজও আরবের মাটিতে অমর। এই সমস্ত কবিদের কথা পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"এবং তারা কবিদের অনুসরণ করে, যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখ না ওরা লক্ষ্যহীন ভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার করে থাকে? এবং যা বলে তা করে না।"

কোরআন—২৬ ঃ ২২৪-২২৬

যে কারণে এই সমস্ত কবিতাবলী শত দুষ্ট দোষী হয়েও সাহিত্যে অমরতা লাভ করেছে সেটা শুধু তার সাহিত্যগুণ।

আরবের জাতীয় গুণ ঃ জগতের যে কোন জাতি যে কোন বংশ যে কোন জিনিস তার অস্তিত্বে টিকে থাকতে পারে না বহুকাল—দু' একটি সদ্‌গুণ ব্যতীত। অসভ্য আরব জাতিও এর ব্যতিক্রম নয়। তাদের মধ্যেও এমন কিছু সদ্‌গুণ ছিল যা সুসভ্য জাতির মধ্যেও কম দেখা যায়।

সত্যবাদিতা ঃ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে আরব-জাতীয় চরিত্রের মধ্য গগনে যে গুণটি সূর্যের মত দীপ্তমান হয়ে ওঠেছিল সেটি তাদের সত্যবাদিতা। তারা এই সংসারের সকল কিছুকে বিসর্জন দিয়েছিল সত্যের জন্য, কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করেনি। এই সত্যবাদিতা ছিল তাদের চরিত্রের প্রধানতম ভূষণ। তারা সব কিছুই জানতো, কেবল মাত্র জানতো না—মিথ্যা বলতে, ছলনা ও প্রতারণা করতে। তারা মহানবীজীকে প্রকাশ্যে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন দিনই মদীনার ইহুদীদের ন্যায় বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করেনি, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

তাই সত্যবাদিতা ছিল তাদের জাতীয় চরিত্রের প্রধানতম অলংকার। তারা সহস্র বছর ধ'রে সত্যের ক্ষেতে যে কঠোর সাধনা করেছিল, তারই সোনার ফসল রূপে একদিন অসভ্য আরবে জন্ম নিলেন—বিশ্বসভ্যতার জনক চিরবিশ্বাসী চিরসত্যবাদী আল্‌-আমীন **হযরত মহম্মদ** (দঃ)।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা ঃ দুর্ধর্ষ আরব চিরদিনই স্বাধীনচেতা। তাদের মধ্যে গোত্র বা বংশ-ঝগড়া যে দিনের পর দিন চলতে থাকত, তার মূলে ছিল স্বাধীনচেতা মন। তারা কোনদিনই কারও প্রভাব বরদাস্ত করতে পারত না। সুতরাং এইরূপ একটি জাতিকে যে কোন শাসক বা রাজা-বাদশার পক্ষে বশীভূত করা বা ইচ্ছার দাস করাও সহজ ছিল না।

সাহসিকতা ঃ আরবের সাহসিকতা পৃথিবীর সর্বত্র সুবিদিত। তারা জীবনে যে জিনিসটিকে সবচেয়ে ঘৃণার চোখে দেখেছে সেটা কাপুরুষতা। তাদের এই সাহসিকতা শুধু পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আরব নারীগণও চরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও।

বাণিজ্য ও শিকার ঃ আরববাসী স্বাধীনমনা, তাই তারা কোনদিনই কারও দাসত্ব স্বীকার করতে পারেনি। এই কারণই তাদের বাণিজ্যমুখী করে তোলে। তাদের চরম সাহসিকতা তাদেরকে শিকারপ্রিয় করে তোলে।

স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ঃ আরবের স্মৃতিশক্তি জগদ্বিখ্যাত। যে কোন একজন আরববাসীকে জিজ্ঞাসা করলে তারা সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন পঁচিশ পুরুষের ধারাবাহিক নাম বলে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, আরবরা কাব্যপ্রিয় জাতি। তারা তাদের কাব্য জগতের আদি-অন্ত মুখস্থ বলে যেতে পারে। পৃথিবীর কোন দেশেই এরূপ দেখা যায় না। এমনকি যখন হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর নিকট কোরআন অবতীর্ণ হতো, তখন সাহাবাগণ একবার শুনেই

আজীবন আপন আপন স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারতেন। ইসলাম জগতের চার মহান খলিফার জীবনই তার জ্বলন্ত উপমা, জীবন্ত-দৃষ্টান্ত। শুধু তাই নয়, হযরত মহম্মদ (সাঃ) যে সমস্ত কথা বলতেন—সেগুলোও তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণ স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারতেন। এই সমস্ত কারণে আরবের স্মৃতিশক্তি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে।

আরব বুদ্ধিমত্তার নিকটও সমগ্র জগৎ ঋণী। ইসলাম-অধ্যুষিত আরবভূমি সারা বিশ্বকে বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতের সন্ধান দিয়েছে। বর্তমান সভ্যতায় আরবের আবদান অসামান্য। সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান-অঙ্ক-এলজেবরা-জ্যামিতি-রসায়ন-জ্যোতিষী ইত্যাদি সকল শাখাতেই আরবের দান অবিসংবাদী। বর্তমান সভ্যতা এইসব কারণে আরবের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী।

আতিথেয়তা ও বদান্যতা ঃ আরবের আতিথেয়তা ও বদান্যতা পৃথিবী-বিখ্যাত। অতিথিকে তারা দেবতার দূত মনে করত এবং সেই মতোই তারা অতিথির সঙ্গে ব্যবহার করত। অতিথির সম্মানে যে কোন ব্যয়বহুল খরচেও আরববাসী কখনও কার্পণ্য করত না। অতিথিকে রক্ষা করা তারা তাদের একান্ত ধর্ম বলে মনে করত। নিজের জীবন দিয়েও আশ্রিতের জীবন যেভাবে তারা রক্ষা করত, পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। আতিথেয়তা ও বদান্যতার প্রয়োজনে আপন পত্নী এবং কন্যাকেও অতিথির মনোরঞ্জনে নিয়োজিত করতেও দ্বিধাবোধ করত না।

উদারতা, সরলতা ঃ আরবের উদারতা ও সরলতা বিশ্বজনীন। তারা কখনও তাদের পাপকে গোপন করত না। বরং পাপের প্রকাশ করাকেই তারা গৌরবের বা গর্বের কাজ বলে মনে করত। তারা প্রকাশ্যে হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করেছে, তাঁকে ও তাঁর সহচরদের হত্যা করারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু কুত্রাপি কোথাও কখনও এ প্রমাণ পাওয়া যাবে না যে, অরা গোপনে বিষ প্রয়োগে কাউকে হত্যার চেষ্টা করেছে। এখানে ছিল তাদের সরলতা ও বীরত্ব। তারা হযরত মহম্মদ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করেছিল। এর একমাত্র কারণ ছিল মহানবী তাদের গতানুগতিক অন্ধ ধর্মধারায় আঘাত দিয়েছিলেন। হযরত মহম্মদ (সাঃ) তাদের দৃষ্টিতে খারাপ লোক ছিলেন না। সমগ্র আরববাসী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল, "মহম্মদ সৎ ও মহান"। তাই ধর্ম সম্পর্কে যখন তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিল তখন একসঙ্গে সমগ্র আরব-জাহান মহানবীর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল। এটাই তাদের সরলতা ও উদারতার আদর্শ দৃষ্টান্ত।

তদানীন্তন পৃথিবীর নৈতিক ও ধর্মীয় চিত্র

ইহুদী ঃ পবিত্র কোরআন যে সমস্ত ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করেছে তার প্রায় অর্ধেক ইহুদীদের সম্পর্কে। হযরত মুসা (আঃ) একজন অন্যতম নবী ছিলেন। ইহুদীগণ ছিল তাঁর উম্মত। হযরত মুসা (আঃ) আজীবন চেষ্টা করেছিলেন তাদের সঠিক পথে আনতে, কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করাতে। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনাও তাদের কোন মঙ্গল করতে পারেনি। তারা ছিল দারুণ কুচক্রী প্রতারক। তারা তাদের নবীকে সরাসরি কোন কাজে বাধা দিতে না পারলে চক্রান্ত করে বাধা দিতো ; ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আপন স্বার্থ সিদ্ধ করত। নিষেধ সত্ত্বেও তারা শনিবারের মৎস্য শিকার করত, এ কথা পবিত্র কোরআনেও উল্লিখিত আছে। এ হতেই বোঝা যায় তারা কত কুচক্রী ছিল।

হযরত ঈসা (আঃ)-র সঙ্গেও তাদের ব্যবহার ছিল বড়ই জঘন্য। তাঁকে তারা শূলে চড়াতেও দ্বিধাবোধ করেনি। হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গেও তাদের ব্যবহার ছিল একই। হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর অন্তিম শয়নে যে রোগযন্ত্রণা তাঁকে মাথা ব্যথায় অধীর করে তুলেছিল, সেটা ছিল এক হতভাগিনী ইহুদী নারীর চক্র। খাইবারের যুদ্ধে এক ইহুদী নারী বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে দাওয়াত করে আহারের সঙ্গে বিষপান করায়। দ্বীনের নবী সামান্য খাবার মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অন্যদের আর সে খাদ্য খেতে দেননি। এই রকমই ধারা ছিল ইহুদীদের প্রতারণার, শেষ নবীর সঙ্গেও।

হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর জন্মের পূর্বেই খ্রীস্টানগণ ইহুদীগণকে পবিত্রভূমি হতে বের করে দেন। তখন তারা উত্তর আরবে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আরবগণও তাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করে।

খ্রীস্টান ঃ হযরত ঈসা (আঃ) এসেছিলেন খ্রীস্টানদের পথ দেখাতে। কিন্তু পথ তারা দেখেনি। অধিকন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-কে বেদনার সঙ্গেই বিদায় নিতে হয়েছিল। পবিত্র কোরআনই এ সম্পর্কে স্পষ্ট বলে—"আর ইহুদীরা বলে ওজাইর আল্লাহ্‌র পুত্র, এবং খ্রীস্টানরা বলে মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র, এ তাদের মুখের কথা, পূর্বে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা তাদের মতো কথা বলে। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন, তারা কেমন করে সত্যবিমুখ হয়। তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে তাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়ম নন্দন মসীহকেও। কিন্তু ওরা এক উপাস্যের উপাসনা করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তারা যাকে অংশী করে তা হতে তিনি কত পবিত্র।" কোরআন—৯ ঃ ৩০-৩১

পূর্ব রোম সাম্রাজ্য ঃ ৩২৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি রোম সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়, পূর্ব রোম এবং কনস্টানটাইন। সেখানকার রাজা আপন রাজ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করেন। পরবর্তীকালে এ পরিণতি পূর্ব রোমকে সর্বাপেক্ষা খারাপ অবস্থায় নিয়ে আসে। কারণ তারা নিজেদের মধ্যে নানা মতবাদ নিয়ে গৃহযুদ্ধে নেমে পড়ে। অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়। আরবে খ্রীস্টানগণ মরিয়মকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে। যদিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিক্ষা ছিল 'আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়'। কিন্তু তারা স্বয়ং ঈসাকেই আল্লাহ্‌র পুত্ররূপে গ্রহণ করল। এবং "যারা বলে আমরা খ্রীস্টান তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তারা যা আদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গেছে। সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি। তারা যা করত, আল্লাহ্ তাদের তা জানিয়ে দেবেন।" কোরআন—৫ ঃ ১৪

হত্যা খুনোখুনি চরমে ওঠে। একে অন্যকে হত্যা করে আমোদ উপভোগ করত। তাদের এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে ঐতিহাসিকগণ বলেছিলেন, তারা হিংস্রতায় বন্যপশুকেও ছাড়িয়ে গেছে। "এ কারণেই বনি ইসরাইলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে যদি একজন অন্যজনকে হত্যা করে, অথবা পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করে, তবে সে যেন সমস্ত লোককে হত্যা করল। আর কেউ কারও প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। তাদের নিকট তো আমার রসুলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল। কিন্তু এরপরেও অনেকে পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘনকারী রয়ে গেল।" কোরআন—৫ ঃ ৩২

যখন হযরত মহম্মদ (সাঃ) শিশুমাত্র, তখনকার দিনে কনস্টানটিনোপলে যে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটল, পৃথিবীর ইতিহাসে আজও তা নজিরবিহীন। বাইজানটাইনের সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু ন্যায়পরায়ণ সম্রাট মাউরিসের কাহিনী মানব ইতিহাসের এক কলঙ্ক। সম্রাটের সম্মুখে তাঁর পঞ্চ পুত্রের নৃশংস প্রাণদণ্ড। সেই বধ্যভূমিতেই পরে হতভাগ্য সম্রাটের রানী ও রাজকুমারীদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও পাশবিক অত্যাচারে প্রাণনাশ। পরে চরম অমানুষিকতার সঙ্গেই সম্রাটেরও প্রাণহানি। রাজপরিবারের অন্যান্যদের প্রতিও ঠিক ওই একই ব্যবহার। মৃত্যু সেখানে বিভীষিকার রূপ নিল। প্রথমে চোখ তুলে নেওয়া এবং পা আর হাত কেটে দেওয়ার পরে জিহ্বা ইত্যাদি অঙ্গের ওপর ধারাবাহিক অত্যাচার। তখনকার দিনে স্বামী ও পিতাগণ আপন স্ত্রী ও সন্তানদের বাড়ির অন্যান্য গৃহপালিত জীব-জন্তুর ন্যায় জবাই বা হত্যা করতে পারত। এ ছিল জঘন্যতম পাপ।

"আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারে না।" কোরআন—১৬ ঃ ৬১

"মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি ওদের আস্বাদন করানো হয় যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে।"

কোরআন—৩০ ঃ ৪১

পারস্য ঃ পারস্যবাসীদের অবস্থাও ওই একই ছিল। জুরাস্টারাইনবাদের মূল কথা তারা ধরে নিয়েছিল—সমস্ত কিছু ভাল কাজ হয় ওরমুজের খাতিরে এবং সমস্ত কিছু মন্দ হয় আহরিম্যানের জন্য। তাই তারা ওরমুজের প্রশংসা বা পুজো করত। তখনকার রাজাগণকে দেবতার স্থানে আসীন করা হতো। এককথায় নানা কুসংস্কারে পূর্ণ ছিল সেদিনের পারস্য।

ভারত ঃ মুসলমান বিজয়ের পূর্বে ভারতের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও একথা সত্য যে পৃথিবী যখন দর্শন বা মানব-প্রকৃতি বা মানবাত্মা সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করতে পারেনি, তখনকার দিনেও ভারতভূমি ছিল বহু দার্শনিকের সূতিকাগার। সমাজব্যবস্থা ভারতে যাই হোক, মহামানবের আবির্ভাব চিরদিনই এখানে ঘটেছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে পৃথিবীর কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা ভারত তপোবন ও ঋষি-মহর্ষির দেশ।

উপনিষদ ও গীতা ভারতের অবিনশ্বর গ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বহু পুরাতন ধর্ম বলেই হোক আর অন্য যে কারণেই হোক, একমাত্র এক ঈশ্বরের উপাসনার ধারা ভারতবর্ষে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। সেখানে একের পরিবর্তে বহুর উপাসনা হয়। যার ফলে পরবর্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব পুতুল পূজার বিরুদ্ধে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম নিজেই পুতুল পুজোর শিকারে পরিণত হয়ে পড়ল। বৌদ্ধধর্মের করুণতম ইতিহাস হচ্ছে স্বয়ং বুদ্ধদেব ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যগণ স্বয়ং বুদ্ধদেবকেই ভগবান রূপে পুজো করতে লাগলেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই সেই সময় হিন্দুধর্মে সাধারণ নারীর স্থান অতীব নিম্নেই ছিল। সাধারণভাবে পুরুষের ভোগের সামগ্রীরূপেই সে চিহ্নিত ছিল। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে নারীসত্তার স্বাধীন বিকাশ অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদি কৃত্রিম বিভাগের ফলে আপন কর্ম-সাধনা ও মনুষ্যত্বের অধিকারে নয়, বরং সাধনাহীন, বিবেকবর্জিত অন্ধ জন্মগত পরিচয়ই মানুষকে সেদিন সামাজিক মর্যাদা দান করেছিল। আজও।

চীন ঃ চীন চিরদিনই বাস্তবধর্মী, কঠোর পরিশ্রমী। জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি তাদের প্রিয় ছিল। ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, ঈশ্বরের দূতে বিশ্বাস ইত্যাদি চীনে চিরদিনই ছিল অপরিচিত।

মানুষের রক্ষক ইসলাম ঃ মানুষকে মানুষ রূপে রক্ষা করতে এসেছিল ইসলাম। সেদিন সারা বিশ্ব দেখেছিল—বিশ্বজুড়ে সমাজ-ব্যবস্থার কি নিদারুণ অধঃপতন। পশু ও মানুষে কোনরূপই ভেদাভেদ ছিল না। বরং পশু তার ধর্ম পশুত্ব পালন করত। কিন্তু মানুষ তার মনুষ্যত্বের এতটুকুও রাখতে পারেনি। মনুষ্যত্ব-মানবতা উপকথায় বা রূপকথায় পরিণত হয়েছিল। মানব-সন্তান ভুলে গিয়েছিল তার দুর্লভ মানব জন্মের মহিমা ও মূল্যায়ন। মানুষ যে আপন আপন ধর্মের বহু বিচিত্র শাখায় ফেরেশ্‌তা বা দেবতা হতেও শ্রেষ্ঠ ফুল রূপে ফুটে উঠতে পারে, একথা সেদিন অর্বাচীনের অসার বক্তব্যে পরিণত হয়েছিল। হিংসা বিদ্বেষ ও আচরণে পশু অপেক্ষাও মানুষ হয়েছিল হিংস্র ও হৃদয়হীন। বিবেক-বিবেচনা, লজ্জা-সরম, বিচারবুদ্ধি সমস্ত মানবীয় গুণগুলিই যেন মানব সমাজ হতে একেবারেই বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

এই অবস্থায় পৃথিবীর প্রয়োজন হয়েছিল—মনুষ্য সমাজের জন্য নতুন ইতিহাস গড়ার, মানব-শিশুকে মানুষ রূপে রক্ষা করার ও মানুষ রূপে গড়ে তোলার। এই নতুন ইতিহাস রচনা করতে ও মানুষকে মানুষ রূপে রক্ষা করতেই ইসলামের আগমন ও আবির্ভাব ঘটেছিল। মহান আল্লাহ্ এবাদত ও উপাসনা করার নিমিত্ত সেদিন যেমন ফেরেশ্‌তাকুলেরও কোনই অভাব ছিল না, ঠিক তেমনিভাবে (কোরআনের কথায়) সারা সৃষ্টিজগৎও চালিয়ে যাচ্ছিল—স্রষ্টার বিরামবিহীন জয়গান ; কেবল মানুষ ব্যতীত। সুতরাং নিছক আল্লাহ্‌র গুণগান বা এবাদত-বন্দেগীর জন্যই ইসলামের আগমনের খুব একটা প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি না। তার আশু আগমনের প্রয়োজন ছিল—মানুষকে মানুষ করার জন্য। সুতরাং মানব-সন্তানকে এক বাক্যে মনে রাখতে হবে যে, মনুষ্যত্ব ও মানবতাকে তুলে ধরাই আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনা। এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মহান আল্লাহ্ পাঠালেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম রসুল হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে। যিনি প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করলেন—'ইসলাম'। তাই ইসলাম (আল্লাহ্‌র সমীপে) সর্বজয়ী দ্বিকাল (ইহকাল-পরকাল) জয়ী মনুষ্যত্ব ও মানবতা লাভের প্রার্থনা, মনুষ্যত্ব জয়ের জন্য আল্লাহ্‌র বন্দনা। এরই প্রকৃত নাম আল্লাহ্‌র উপাসনা।

বিস্তারিত দ্রষ্টব্য—অবতরণিকা ঃ কোরআন হাদিসের মূল লক্ষ্য ; পূর্বাভাস ঃ ইসলাম জগৎ ও বাস্তব সমাজ ; চরিত্রে মহানবী ঃ ৮৯ নং (চ)।

কোরআন—২ ঃ ১৭৭, ৪ ঃ ১৭১, ৫ ঃ ১৬৬, ৬ ঃ ১০৮, ১৬ ঃ ৩৬, ১৭ ঃ ১৫, ২২ ঃ ৩৭, ৬৭, ২৩ ঃ ৫৩, ৩০ ঃ ৩২, ৩৫ ঃ ৪, ৩৭ ঃ ১৮১, ৪৯ ঃ ১৩।

❑ তৃতীয় পর্ব

● কোরআনের আলোকে

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী ●

॥ বিশ্ব বুকে মহানবীর জীবন—

আধ্যাত্মিক জগতের

অনুভূতি অভিজ্ঞতা ও আত্ম-দর্শনের

চরম ও চূড়ান্ত পরিণতি।

ইহলোক ও পরলোকের—

শ্রেষ্ঠতম সমন্বয়কারী শ্রেষ্ঠতম মানুষ।

॥ এক পলকে মহানবী (দঃ) ॥

মানুষের কল্যাণে মানব মুক্তিতে
সারাদিন ব্যস্ত যিনি আকুল-ব্যাকুল
আল্লাহ্‌র আরশ ভেদি' শক্তি আহরণে
সারারাত্রি সাধনায় মহম্মদ রসুল।

॥ এক ঝলকে মহানবী (দঃ) ॥

সবর ঃ

সততার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তুমি—
শিশু হতে জীবনের সকল স্তরে
অসভ্য আরব দেশের মক্কার বুকে—
সংবর্ধিত আল-আমীন সকলের ঘরে।

শুক্‌র ঃ

মক্কার অত্যাচারে দিনে ও রাতে—
পেয়েছি তোমার মাঝে পাহাড়-সব্‌র
মদিনার রাজশক্তি সুখের দিনে—
পেলাম তোমারই মাঝে সাগর-শুক্‌র।

মক্কার জীবন

নবুয়তের (ঐশী প্রত্যাদেশের) পূর্ববর্তী জীবন ঃ

১—২৫ বছর বয়ঃক্রম ঃ

দুঃখ ও দারিদ্র্যের মাঝে ⟶ সততাব জীবন।

২৫—৪০ বছর বয়ঃক্রম ঃ

সংসার জীবনে ও হিরা গুহায় ⟶ সাধনার জীবন।

নবুয়তের পরবর্তী জীবন ঃ

৪০—৫২ বছর বয়ঃক্রম ঃ

শক্তি ও সম্পদহীন সময়ে ⟶ সবর, সহ্য ও ধৈর্যের জীবন।

মদিনার জীবন ঃ

৫৩—৬৩ বছর বয়ঃক্রম ঃ

শক্তি ও সমৃদ্ধির মাঝে ⟶ আল্লাহ্‌র নিকট শুক্‌র কৃতজ্ঞতার জীবন এবং মানুষের নিকট ক্ষমা ও দয়াব জীবন, ত্যাগ ও তিতিক্ষার জীবন। সুতবাং যখন মহানবীর কোন শক্তি বা সম্পদ ছিল না, তখন তাঁর জীবনে ছিল— সহ্য ও ধৈর্য, আবার যখন শক্তি ও সম্পদ এল, তখন তাঁর জীবনে এল—ক্ষমা, দয়া, দান ও ধ্যান। তাই মহানবী (দঃ)-এর জীবন ছিল—সহ্য ও ধৈর্যের জীবন, ক্ষমা ও দয়ার জীবন। কি অপূর্ব জীবন, কি অপূর্ব আদর্শ!

তোমাকে ধরিয়া ধন্য জগৎভূমি
মানব সমাজে নবী সূর্য তুমি। কোরআন--৩৩ ঃ ৪৬

॥ এক নজরে মহানবী (সাঃ) ॥

১। জন্ম ঃ সোমবার, ১২ রবিউল আউয়াল, ৮ জুন ৫৭০ খ্রীঃ।

২। ১-৫ বছর ঃ ধাত্রীমা হালিমার ঘরে অবস্থান।

৩। ৬ বছর ঃ মা-হারা শিশু-বালক।

৪। ৬-৭ বছর ঃ দাদা আবদুল মোত্তালিবের নিকট।

৫। ৮-২৫ বছর ঃ চাচা আবু তালিবের নিকট।

৬। ২৫ বছর ঃ বিবি খাদিজার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন।

৭। নবুয়ত (ঐশী প্রত্যাদেশ) লাভ ঃ ১৭ রমজান, ১ ফেব্রুয়ারি ৬১০ খ্রীঃ, ৪০ বছর বয়সে।

৮। মক্কায় ঃ নবুয়তের পর প্রথম ১৩ বছর পূর্ণ সমাজ-সংস্কারে এক আল্লাহ্ ও সৎজীবন যাপনের জন্য আহ্বান।

৯। নবুযতের ৫ম বর্ষ ঃ ১৫ জনের আবিসিনিয়ায় বর্তমানে ইথিওপিয়ায় হিযরত (৬১৪ খ্রীঃ)।

১০। নবুযতের ৭ম বর্ষ ঃ ৩ বছরের জন্য সমাজচ্যুত ও সমাজ থেকে বিতাড়িত (৬১৬-৬১৯ খ্রীঃ)।

১১। নবুয়তের ১০ম বর্ষ ঃ তায়েফের পথে নির্যাতিত নবী, এই বছরেই 'মেরাজ' বা স্বর্গারোহণ, নামায প্রবর্তিত (৬১৯ খ্রীঃ)।

১২। নবুয়তের ১৩ শ' বর্ষ ঃ ৬২২ খ্রীঃ হিজরী সনের প্রথম বর্ষা। (৬২২ খ্রীঃ) মহানবীর মদিনায় হিযবত (গমন)।

১৩। হিজরীর ১ম বর্ষ ঃ মদিনায় 'মসজিদে নববী' স্থাপন এবং পাঁচবার (ওয়াক্ত) নামায নির্ধারিত।

১৪। হিজরীর ২য় বর্ষ ঃ "আযান" প্রবর্তিত, যাকাত ও রোযা নির্ধারিত।

১৫। হিজরীর ৩য় বর্ষ ঃ এই বছর বদর ও ওহোদ যুদ্ধ।

১৬। হিজরীর ৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ 'পর্দা' প্রবর্তিত, 'হজ' নির্দেশিত, খন্দকের যুদ্ধ, এই বছরই বিখ্যাত হুদাইবিয়ার সন্ধি।

১৭। হিজরীর সপ্তম বর্ষ ঃ খাইবার জয়, মদ নিষিদ্ধকরণ, ৬২৯ খ্রীঃ।

১৮। হিজরীর ৮ম বর্ষ ঃ মক্কা বিজয়, ৬৩০ খ্রীঃ, ৬ জানুয়ারি তায়েফ ও হুনাইনের যুদ্ধ।

১৯। হিজরীর ৯ম বর্ষ ঃ তবুক অভিযান।

২০। হিজরীর ১০ম বর্ষ ঃ ১১৪ হাজার ভক্তসহ মহানবীর বিদায় হজ।

২১। হিজরীর ১১শ বর্ষ ঃ ৬৩ বছর বয়সে সোমবার ১২ রবিউল আউয়াল, ৮ জুন ৬৩২ খ্রীঃ পরলোকগমন।

২২। সমগ্র জীবনকাল ঃ ২২,৩৩০ দিন ৬ ঘণ্টা মতো।

২৩। মহানবীর ধর্মপ্রাণ সৎ খলিফাগণ ঃ হযরত আবুবকর—বিপদের দিনে ইসলামের প্রকৃত রক্ষাকারী, হযরত ওমর ফারুক—ইসলামি রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, হযরত ওসমান—কোরআন শরীফ একত্রকারী, হযবত আলি—তাসাউফের (ইসলামের সূফীবাদ অতীন্দ্রীয়বাদ) জড়, জ্ঞানের দরজা, আসাদুল্লাহ্ আল্লাহ্র সিংহ। অর্থাৎ মহাজ্ঞানী ও মহাবীর।

চতুর্থ অধ্যায়

অন্ধকার ও উষা

(ইসলাম কেন এলো)

অন্ধকার ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জন্মের প্রাক্কালে পৃথিবীর অবস্থা মোটেই উজ্জ্বল ছিল না। অজ্ঞানতার অন্ধকারে মনুষ্যজগৎ নিমজ্জিত ছিল। তখনকার আফ্রিকার ছবি বলতে প্রায় বর্বরতার ছবিই মানুষের চোখে ভেসে ওঠে। ইউরোপও তখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর নামে ঈশ্বরের পুত্র বলে কলঙ্ক লেপন করেছিল। শত্রুকে ভালবাসার তো প্রশ্নই ওঠে না, ভাইকে বধ করার ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত। ওই সময় তাদের মধ্যে দলাদলি হিংসা-বিদ্বেষ এতদূর এগিয়েছিল, যা পশুত্বকেও হার মানায়। গ্রীসের গৌরব, রোমের মাহাত্ম্য সবই তখন বিলীন। লণ্ডন থেকে কনস্টানটিনোপল, স্পেন থেকে রাশিয়া এই বিস্তৃত অঞ্চল অন্ধকারে নিমগ্ন। সেদিন ছিল না আর মুসার আদেশ এবং ঈসার নসিহত। শুধু শয়তানের রাজত্ব বিরাজ করছিল। সেদিন বেদুইন আরব ভুলে গিয়েছিল নূহ (আঃ)-এর নির্দেশ বা ইব্রাহিম (আঃ)-এর উপদেশ।

পারস্য, চীন, ভারত সকল স্থানের অবস্থা ওই সময় প্রায় একই ছিল। কেউ বা সত্য হতে বহু দূরে, কেউ বা সত্য-বিস্মৃত, কেউ বা জেনেশুনে সত্যের অপলাপ করে। এই অবস্থায় মনুষ্যকুলকে রক্ষা করবে কে? সকলেই যখন নিরাশ, সকলেই হতাশ, সেই সময়ে জরাজীর্ণ মানবতার উদ্ধারকল্পে মানুষকে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্‌র উদাত্ত বাণী—"ঘোষণা করে দাও, হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ—আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ্ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" কোরআন—৩৯ ঃ ৫৩

উষা ঃ মানবতার উত্থান ও উদ্ধারকল্পে এই বাণী মরুজগতে মরুবাসীর নিকট যাঁর দ্বারা প্রেরিত হলো, তিনিই হলেন আল্লাহ্‌র মোস্তফা—নির্বাচিত ব্যক্তি, "রাহমাতালল্লিল আ'লামিন—বিশ্বের জন্য করুণা স্বরূপ", সিরাজুম মুনিরা—আধ্যাত্মিকতার সূর্য, 'আলকাওসার'—অফুরন্ত সদ্‌গুণে গুণান্বিত, আল মর্তুযা—আল্লাহ্‌র অতীব প্রিয়জন, আল হাবিব—আল্লাহ্‌র বন্ধু, —সমগ্র সৃষ্টির সেরা—হযরত মহম্মদ (দঃ)

আবদুল্লাহর সঙ্গে আমিনার বিবাহ ঃ আবদুল মোত্তালিবের কনিষ্ঠ পুত্র তদানীন্তন আরবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রবান সুঠাম স্বাস্থ্যবান সুন্দর যুবক আবদুল্লাহর সঙ্গে (যোহরার পুত্র মানাফ, মানাফের পুত্র ওয়াহাব) ওয়াহাবের কন্যা তদানীন্তন আরব-সমাজের তিলোত্তমা উর্বশী এবং অসামাজিক পরিবেশের অসাধারণ গুণবতী আমিনার বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। আবদুল্লাহ তিনদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করার পর স্ত্রী আমিনাকে আপন বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিছুদিন পরই আবদুল্লাহ স্ত্রী আমিনাকে সন্তানসম্ভবা অবস্থায় বাড়িতে রেখে বাণিজ্যোপলক্ষে সিরিয়ার পথে রওনা হন। সিরিয়া হতে ফেরার পথে মদিনায় (তখনকার

ইয়াসরিব) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। সেখানে তাঁকে সমাধিস্থও করা হয়। তখনও পৃথিবীর শেষ দূত, দুর্গত মানবতার মহান কাণ্ডারী, ভাবী মহানবী, মহাবিপ্লবী হযরত মহম্মদ (দঃ) মাতৃগর্ভে।

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জন্ম ঃ তখনও বিশ্বসূর্য উদিত হয়নি, যখন আধ্যাত্মিকতার গৌরবরবি জগৎকে আলোকিত করল। বিধবা মা আমিনা ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে ৮ জুন, ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার ঊষার শুভলগ্নে একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেন। দাদা আবদুল মোত্তালিব শিশুপুত্রের নাম রাখেন—মহম্মদ (দঃ) অর্থাৎ চরম প্রশংসিত। মা স্নেহভরে নাম রাখেন আহমাদ অর্থাৎ চরম প্রশংসাকারী। পবিত্র কোরআনে দুটো নামই উল্লেখিত আছে।

কোরআন—৪৮ ঃ ২৯, ৬১ ঃ ৬।

এই সনটি ছিল হস্তীসনের প্রথম বছর। মহানবীর জন্ম-তারিখ নিয়ে নানা মত আছে। ৫৭০ খ্রীঃ ২০ এপ্রিল হতে ২৯ আগস্ট, এবং ৯ রবিউল আউয়াল হতে ১২ পর্যন্ত উল্লেখ দেখা যায়। এটা ধর্মের না হলেও পাণ্ডিত্যের কচকচানি। মহানবীর জন্ম-তারিখ নিয়ে অকারণ সময় নষ্ট না করে, তিনি কি জন্ম দিয়ে গেছেন, তা নিয়ে গবেষণা করা উচিত। এ সম্পর্কে মওলানা মহঃ ইলিয়াস সাহেব একটি সুন্দর কথা বলেছেন ঃ

মীমাংসা যার নেই জগতে, ধাও কেন তার পশ্চাতে
ছাড় ছাড় কলম ছাড় নইলে হবে পস্তাতে। (তামাচা)

সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি স্রষ্টার এই যে অপরিসীম করুণা দর্শন তার জন্য মনুষ্যকুল প্রথম তাঁরই কাছে ঋণী। পরবর্তী অধ্যায়ে যাঁর মাধ্যমে এই করুণা এল, তাঁরই নিকট ঋণী। সেই মাধ্যম হলো মহামানব হযরত মহম্মদ (দঃ), যিনি মানুষকে শিক্ষা দিলেন গ্রন্থ-জ্ঞান, করলেন পবিত্র। সমগ্র মনুষ্যকুলই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর কাছে ঋণী বা উপকৃত। কে তাঁকে স্বীকার করল, কে তাঁকে অস্বীকার করল সে-কথা এখানে গৌণ। তিনি সকল মানুষকেই স্বীকার করেছেন, সকল নবীকেই স্বীকার করেছেন, সকল আসমানী কেতাবকেই স্বীকার করেছেন। কাউকে অস্বীকার করার মতো মানসিক দুর্বলতা তাঁর মোটেই ছিল না। যার জন্য সমগ্র জীবনে তাঁর মুখ থেকে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয়নি।

তাঁর জন্মদিনে পারস্যের রাজপ্রাসাদ ও বহু রাজা-বাদশার রাজতক্ত কেঁপে উঠল। কারণ সেগুলো ন্যায়, সুন্দর ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না (প্রকাশ্যে কোন কিছুই ঘটেনি। তাই যদি ঘটবে, তাহলে ওই শিশুটি ওই দিনই জগদ্বিখ্যাত হয়ে যেতেন। এবং একজন অতিরুগ্ণা গরিব ধাত্রী মায়ের কাছে থাকতে হতো না।)। পূর্ববর্তী নবীগণ সকলেই চেষ্টা করেছিলেন সুন্দরের পথে সকলকে একত্রিত করার জন্য, কিন্তু অধিকাংশই আংশিক সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাই সকলের সমূহ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর আগমন। তাই তিনি ছিলেন সকল নবীর শেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। সকল মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। তাই আজও পেয়ে যাচ্ছেন—স্রষ্টার এবং সৃষ্ট সকল সৎ মানুষের শুভেচ্ছা আশীর্বাদ—

"আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, হে বিশ্ববাসীগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাঁকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর।" কোরআন ঃ ৩৩ ঃ ৫৬

আল্লাহ্‌র অফুরন্ত করুণার অধিকারী হয়েও মানুষের জন্য অফুরন্ত করুণার ধারক হয়েও তিনি কোনদিনই দেবত্বের দাবিদার হননি। সবসময় নিজেকে অতি সাধারণ মানুষরূপে পরিচয় দিয়েছেন এবং সকল মানুষকে দেখিয়ে গেছেন সরল সহজ পথ, এককথায় সমাজ-জীবনের শ্রেষ্ঠতম পথ। যে পথ সত্যপ্রিয় নর-নারীর সামনে চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত। আজ পৃথিবীর বুকে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর কোটি কোটি উম্মতের অন্তর-আত্মায় আল্লাহ্‌র অসংখ্য গুণগান তাঁর চির মাহাত্ম্য চিরদিনের জন্য চির অম্লান। যারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন—পিতা-মাতা ভাই-বোন ছেলে-মেয়ে আত্মীয়-স্বজন ধন-সম্পদ মান-যশ, এমনকি তাদের জীবন অপেক্ষাও সে সব মানুষের এই অকৃত্রিম ভালবাসাই একমাত্র সত্যের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

এই যে সৃষ্টির সেরা মানুষ হযরত মহম্মদ (দঃ), তাঁর জন্ম কোন রাজমহলে নয়, কোন রাজা-বাদশার ঘরে নয়, জাগতিক কোন বিরাট কিছুকে কেন্দ্র করে নয়, কোন রুচিসম্মত সমাজ বা পরিবেশে নয়। এককথায় মরুর অনাথ এতিমরূপে মরুদুলালের আগমন। তাঁর এই জন্মধারাতেও রয়ে গেছে বিরাট রহস্য। যতদিন জগৎ আছে, যতদিন মানুষ আছে, ততদিন এ রহস্যের উদ্‌ঘাটন হতেই থাকবে। মূলকথায় সকল এতিমের তিনি সান্ত্বনা। বলতে গেলে তিনি শুধু এতিমেরই বেদনার সান্ত্বনা নন, বরং সকল যন্ত্রণারই সান্ত্বনা।

কোরআন—৯৩ ঃ ১-১১।

শৈশব ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর দাদা আবদুল মোত্তালিব সে যুগের মক্কার একজন অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি। বিরাট পরিবার তাঁর। সকলের ব্যয়ভার বহন সহজ-সাধ্য নয়। তবুও তিনি এই এতিম বালককে প্রাণ দিয়েই ভালবাসতেন। অতীব সুদর্শন পুত্র আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর তিনি তাঁর ঔরসজাত পুত্রের অনুপম মুখচ্ছবি দেখেই পুত্র হারানোর যন্ত্রণা অনেকখানিই লাঘব করেন। এই অভাবনীয় অতুলনীয় অচিন্তনীয় শিশুর জন্মগ্রহণের কথা শোনামাত্রই দাদা আবদুল মোত্তালিব সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবধূর (মা আমিনার) ঘরে আগমন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নবজাত শিশুকে দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে কাবা গৃহে প্রবেশ করেন এবং শিশুর নাম রাখেন 'মহম্মদ'। এই নামটি সমগ্র আরবে অপরিচিত না হলেও সুপরিচিতও ছিল না। এর অর্থ প্রশংসিত।

আবদুল মোত্তালিবের উৎসব আয়োজন ঃ এতিম বালকের নাম রাখার পর মোত্তালিব ফিরে এলেন মা আমিনার কাছে। তাঁকে বললেন অপেক্ষা করতে, যতক্ষণ বনী সাদ গোত্রের ধাত্রী-মাতাগণ মক্কায় না আসে। কেননা তখনকার দিনের প্রথায় সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেমেয়েরা শৈশবে ধাত্রীমাতার কাছে মানুষ হতো। জন্মের সাত তারিখে আবদুল মোত্তালিব এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। ওই ভোজসভায় মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলেন—বালকের নাম গতানুগতিক ধারাতে না রেখে কেন এরূপ রাখলেন। সে-সময়ে আরবের মানুষের নাম অধিকাংশই তাদের দেব-দেবীর নামানুসারে রাখা হতো। কিন্তু এই বালকের বেলায় তার ব্যতিক্রম হলো। দাদা মোত্তালিব উত্তর দিলেন, "আমি মনে করি ভবিষ্যতে এই বালক স্বর্গে আল্লাহ্‌র দ্বারা এবং মর্তে তাঁর সৃষ্টির দ্বারা প্রশংসিত হবে।"

এইভাবে দাদা আবদুল মোত্তালিবের মহান সুপ্ত ইচ্ছা সুমহান পৌত্রের সমগ্র জীবনে দুর্বার বেগে কার্যকর হয়ে চলল। দাদা আবদুল মোত্তালিব যে বৃক্ষচারাটি লালন করলেন, ক্ষণিকের নানা বাধা-বিপত্তি ঝড়ঝাপটা তাপ-রৌদ্র অগ্রাহ্য করে বৃক্ষচারা একদিন মহান মহীরূহতে পরিণত হলো। এই নামের মাহাত্ম্য সমগ্র পরিবেশকেই যেন মহান করে তুলেছে। তাঁর জন্মের পূর্বেই মা আমিনা সন্তানের মহত্ত্ব সম্পর্কে এক আশ্চর্যজনক শুভ স্বপ্ন দেখেন। শুধু যে সন্তানের নামই বিশিষ্টতা বহন করেছে তা নয়, পিতা আবদুল্লাহর নামও তাই। কোন দেব-দেবীর সঙ্গে তা জড়িত নয়। যার অর্থ আল্লাহ্‌র দাস। মা আমিনার নামও তাই। যার অর্থ সন্তুষ্ট বা সুরক্ষিতা নারী।

মা আমিনা অপেক্ষা করতে থাকেন বনী সায়াদ গোত্রের ধাত্রী মায়ের জন্য, যাতে তিনি অনতিবিলম্বে শিশুকে তার হাতে ন্যস্ত করতে পারেন। ইতিমধ্যে আবু লাহাবের দাসী সওবিয়াহ্‌র কাছে শিশু লালিত হতে থাকে। আবু লাহাব ছিল হযরতের চাচা। এই একই দাসী মহাবীর হামজাকে দুধ পান করান। এইদিক দিয়ে হামজা ও হযরত দুধ-ভাইও বটেন। হামজা ছিলেন হযরতের সর্বকনিষ্ঠ চাচা। পরবর্তীকালে এই হামজাই "ইসলামের সিংহ" আখ্যা লাভ করেন। যদিও ধাত্রীমাতা সওবিয়াহ কয়েকদিন মাত্র হযরত (দঃ)-কে দুধ পান করিয়েছিলেন, তবুও তাঁর প্রতি ছিল হযরত (দঃ)-এর অকুণ্ঠ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। হযরত (দঃ)-এর জন্মের দু-এক সপ্তাহ পরই বনী সায়াদ গোত্রের ধাত্রীমাতাগণ আপন আপন পালক শিশুর সন্ধানে মক্কা এল। কিন্তু তারা সকলেই শিশু মহম্মদ (দঃ)-কে বাদ দিয়ে গেল, এই ভেবে যে, এতিম শিশুকে নিয়ে কি হবে, কে তার জন্য টাকা-পয়সা দেবে ইত্যাদি। সকলেই বড়লোকের সন্তানের পেছনে ধাওয়া করল।

বনী সায়াদ গোত্রের আবু জাইয়েবের কন্যা হালিমা নাম্নী এক ধাত্রীমাতা প্রথমে শিশু মহম্মদ (দঃ)-কে দেখে প্রত্যাখ্যান করলেন। পরে যখন সমস্ত ধাত্রীমাতা এক-একটি করে শিশু পেয়ে গেল, তখনও হালিমা কোন শিশু পাননি। যেহেতু তিনি ছিলেন রুগ্‌ণা দুর্বল, তাই কোন ধনী তাঁকে শিশু দেননি। এদিকে শিশু মহম্মদ (দঃ)-এর ভাগ্যেও কোন ধাত্রীমাতা জোটেনি।

সকল ধাত্রীমাতা শিশুলাভ করে বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু হালিমা শিশুহীন অবস্থায় ফিরে যেতে অপমানিতা বোধ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর স্বামীকে (হারিস) বললেন—যা হয় হবে, তিনি ওই এতিম শিশুটিকেই [মহম্মদ (দঃ)] নেবেন। স্ত্রীর এই দৃঢ় সংকল্পে স্বামী উত্তর দিলেন, তার (ওই শিশুর) উপস্থিতিতে আল্লাহ্‌ই তোমার বরকত দেবেন। এইভাবে হালিমা হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে লালন-পালনের ভার গ্রহণ করলেন। পরে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল—যেদিন হতে তিনি ওই শিশুর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেছিলেন ঠিক সেইদিন হতেই তাঁর সমস্ত কিছুতেই আল্লাহ্‌র অপরিসীম বরকত দেখা দেয়।

এইভাবে শৈশবে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর লালন-পালনের ভার পড়ল হালিমার ওপর। হালিমা দু'বছরের জন্য শিশুকে গ্রহণ করলেন। হালিমার মেয়ে শায়েমাই অধিকাংশ সময় শিশু মহম্মদকে দেখাশোনা করত। খোলা মাঠে মুক্ত প্রান্তরে হযরতের জীবন গঠনের

'যোগ এল। উপরে অনন্ত আকাশ, নিচে বিশাল প্রান্তর তার, মাঝে শিশু মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনসৌধ রচনা হতে থাকল। যখন দু'বছর অতিক্রান্ত হলো, মা হালিমা শিশুকে মা আমিনার নিকট হাজির করলেন। মা আমিনা শিশু মহম্মদ (দঃ)-এর অবস্থা সন্তোষজনক দেখে পুনরায় আরও দু'বছর শিশুকে হালিমার কাছে রাখার প্রস্তাব দিলেন। এইভাবে শিশু মহম্মদ পরবর্তী দু'বছরও মা হালিমার নিকট কাটালেন।

এই ভাবে পাঁচ থেকে ছয় বছর কেটে গেল মা হালিমার কাছে শিশু মহানবীর। ওপরে সুনীল আকাশ, নিম্নে মুক্ত প্রান্তর, অদূরে উপত্যকা, নিকটে অধিত্যকা, তারই ক্রোড়ে কোন দূর অতীতের নীরব সাক্ষী পর্বতমালা। তারই মাঝে শিশু মহানবী, নিখিল বিশ্বের ভাবী মহামানব, বিশ্ব-স্রষ্টার ভাবীদূত। দুর্গত মানবতার দরদী বন্ধু দুধভাই বোনদের সঙ্গে গরিব মা হালিমার ছাগল পাল চরিয়ে বেড়াতেন। কখনও মেষপালক বালক রূপে পর্বতে আরোহণ করতেন। কখনও বা কোন্ অজানার ভাবনা-চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়তেন। শিশু মহানবী—বালক মহম্মদ (দঃ) সম্পর্কে মা হালিমার একটা কথা বিশেষ লক্ষণীয়—"আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি আহারে-বিহারে, কথা-বার্তায়, চাল-চলনে, কাজে-কর্মে, সরবতায়-নীরবতায় ইত্যাদি সকল কিছুতেই শিশু মহম্মদ (দঃ)-এর একটা অসাধারণ মহত্ত্বের ভাব সদাই যেন ফুটে উঠত।" এই মা হালিমার বাড়ির সকলের নিকটই শিশু মহম্মদ (দঃ) হয়ে উঠেছিলেন এক চরম আকর্ষণীয় বালক। তাঁকে কিছুক্ষণ না দেখলে কেউই যেন থাকতে পারতেন না। এমনই এক মনোরম পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। দুধ-বোন 'শায়মা' শিশু মহম্মদ (দঃ)-কে কোলে নিয়ে দোলা দিতেন। বালক মহম্মদ (দঃ) যখন দাঁড়াতে বা কিছুটা চলতে শিখলেন, তখন বোন শায়মা একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন, তা শুনে শিশু মহম্মদ (দঃ) খুশিতে পুলকিত হয়ে উঠতেন। কবিতাটির ভাবানুবাদ—

বেঁচে থাক মহম্মদ প্রার্থনা মোর
দেখি যেন তোরে আমি তরুণ কিশোর,
নিখিলের মহাজন মহাসম্মানিত
মানব-কল্যাণে শিশু হোক প্রশংসিত।
হিংসুক শত্রু তার হোক অধমান
দাও তারে সম্ভ্রম চিরস্থায়ী মান।

শহরের বিষময় গ্লানি ও মালিন্য হতে মুক্ত মাঠের বিশুদ্ধ হাওয়ায় গঠিত হতে লাগল মহম্মদ (দঃ)-এর প্রথম জীবন।

মহানবীর সিনাচাক বা বক্ষ বিদারণ ঃ কথিত আছে, এই সময়ে দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত ফেরেশ্‌তা মনুষ্য রূপ ধারণ করে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সিনাচাক করেন। এর মূল উদ্দেশ্য মানব হৃদয়ের কলুষ-কালিমার কেন্দ্রভূমিটিকে একেবারেই দূরীকরণ করা। এই প্রসঙ্গে অনেকে বলেন, কোরআন শরীফের অস্পষ্ট ইঙ্গিত "আমি কি তোমার (মহম্মদ) বক্ষ প্রশস্ত করে দিইনি? আমি তোমার ভার লাঘব করেছি। যা তোমার পৃষ্ঠকে অবনত করেছিল। আমি তোমার জন্য তোমার প্রশংসাকে (নামকে) মহিমান্বিত করেছি। ফলত

দুঃখের (পর) সঙ্গেই সুখ আছে। নিশ্চয় দুঃখের সঙ্গেই সুখ আছে। অতএব যখন অবসর পাও পরিশ্রম কর। এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ কর।"

কোরআন—৯৪ ঃ ১-৮।

এখানকার মোদ্দা কথা হলো—বক্ষ বিদারণের মূল উদ্দেশ্য পবিত্রকরণ। তাই মহানবীর অন্তর হতে অপবিত্র জিনিস বের করে ফেলে দেওয়া হলো, ফেললেন স্বয়ং জিবরাইল ফেরেশ্‌তা ও অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণ। অস্ত্রোপচারের সময় ব্যবহার করলেন জান্নাতের সোনার তস্‌তরি, পানি ছিল জমজমের, যার দ্বারা হৃৎপিণ্ডটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করলেন। পরে সেটাকে যথাস্থানে সংযোজন করলেন। ফেরেশ্‌তাগণ জান্নাত হতে নিয়ে এলেন—জ্ঞান ও বিশ্বাস। তাঁর হৃদয় উন্মোচিত করে ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, ওই সময় হযরত মহম্মদ অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলেন। সঙ্গী বালকদের নিকট হতে এ সংবাদ শুনে মা হালিমা ও তাঁর স্বামী ছুটে এলেন। তাঁরা তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করে বাড়ি নিয়ে আসেন। একবার যৌবনে পদার্পণ করার সময় আর একবার নবুয়ত পাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে এবং মেরাজে যাওয়ার পূর্বে হযরত মহম্মদের অনুরূপভাবে বক্ষ বিদারণ করা হয়েছিল। হযরত আনাস এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বক্ষ বিদারণ ঘটনাটি সম্পর্কে মন্তব্য করা কঠিন বা নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে এই কাহিনীটি ইসলাম-জগতে কিংবদন্তীর মতো প্রচলিত। কোন নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থে এটা পাওয়া যায় না এবং কোরআনের কোথাও এর উল্লেখ নেই। সেই কারণেই নানা জনের নানা মত। ঘটনাটি সম্পর্কে নানান মত ও ব্যাখ্যা দেখা যায়। কেউ বলে দৈহিকভাবেই বক্ষ বিদারণ হয়েছিল, আবার অনেকে বলে এটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। আবার এটিকে রূপক ভাবে গ্রহণ করলে দেখা যায়—নবী, রসুল ও মহামানবদের হৃদয় স্বাভাবিক ভাবে সম্প্রসারিত করা হয়। মহাসত্যকে গ্রহণ করতে হলে হৃদয়ের পরিব্যাপ্তির একান্ত প্রয়োজন। মহানবীর হৃদয়ে বা অন্তরে কলুষ-কালিমা বলে জন্মগতভাবেই কোনদিনই কিছুই ছিল না। যদি থাকত, তাহলে নবী হওয়ার পূর্বেই অসভ্য আরবে—'আল্‌-আমিন' চির সত্যবাদী উপাধি লাভ করতেন না। তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনেকে রসুলুল্লাহর বক্ষ বিদারণ ঘটনাকে দার্শনিক আলোকেই ও আধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষাপটেই গ্রহণ করে থাকেন। আর একটি কথা—মানুষের কোন চারিত্রিক উন্নতি যে কোন অস্ত্রোপচার দ্বারা সম্ভব নয়ই। ওটার জন্য দরকার সাধনা, সান্নিধ্যলাভ, সঠিক অনুশীলন ইত্যাদি। সুতরাং কোরআনের বর্ণনানুযায়ী ঘটনা দৈহিক নয়, আধ্যাত্মিকই।

কেননা কোরআন শরীফের প্রথম উক্তিটিই অতি পরিষ্কার। মহান আল্লাহ্ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর অন্তরকে এতখানি প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন যে, যে কোন কঠিনতম সত্যকে গ্রহণ করতেও তাঁর কোনদিন অসুবিধা হয়নি। বরং যে কোন রকমের সত্যকে গ্রহণ করা বা বরণ করাই তাঁর ধর্মের কারণ হতো। মহাসত্যের প্রথম আবির্ভাবে মাঝে মাঝে তিনি তাঁর জীবনকে গুরুভার মনে করতেন। এরপরই আল্লাহ্ তাঁর জন্য একে সহজ-করে দিলেন। কিন্তু এর জন্য হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনে সাধারণ কোন খেদ ছিল না। তিনি ও তাঁর

জন্যে রচিত আধ্যাত্মিক রাজত্বের সিংহাসন লাভের জন্য শুধু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং তিনি সৎকাজ, সহনশীলতা ও সত্যবাদিতা সহ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম গুণাবলী দ্বারাই জীবনের মহান ভিত রচনা করেছেন। তাঁর আত্মা এতই প্রশস্ত ছিল যে, যে কাজ সকলের জন্য সুকঠিন সেটা তাঁর কাছে ছিল সরল ও সহজ। এমনই ছিল তাঁর তুলনাহীন চিত্ত ও বিত্ত। তাই আধ্যাত্মিক জগতে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সম্রাট।

পূর্ণ পাঁচ বছর হযরত মহম্মদ (দঃ) হালিমার ঘরে লালিত হলেন। তাঁর শরীর এবং মনের ওপর এই পাঁচ বছরের প্রভাব সমগ্র জীবনে কার্যকরী হয়েছিল। শিশুকালে মানবশিশু যে অবস্থায় যে ভাবে যে পরিবেশে মানুষ হয়, সমগ্র জীবনে তার সেই প্রভাব থেকে যায়। মহামানব হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। মরুভূমির এই পাঁচ বছরের জীবন হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মহান পবিত্র জীবনকে সুগঠিত করার জন্যে বহু মূল্যবান উপাদান জুগিয়েছে। এটাও সেই বিধাতা পুরুষেরই বিধান।

প্রথম হতেই তিনি জীবনকে এমন ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, গঠন করেছিলেন যা অসাধারণ মানুষের পক্ষেও অসম্ভব। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কঠোর পরিশ্রম বা ষড়রিপু কোনদিনও তাঁকে পরাস্ত কবতে পারেনি। তাঁর ছিল স্বাধীন মনোভাব, অদম্য মনোবল যা সমগ্র মানব ইতিহাসে বিরল। শারীরিক দিক থেকেও তিনি ছিলেন অতি সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী, সে যুগের আরবরা পরিচালিত হয়েছিল—না তরবারি দ্বারা, না কলম দ্বারা, বাহন ছিল—ভাষাজ্ঞান, ভাষার সাবলীলতা, বাক্‌ভঙ্গিমা ইত্যাদি। এই সমস্ত গুণরাশিও তাঁর কোন অংশেই কম ছিল না। যদিও তিনি ছিলেন **নিরক্ষর মানব**। কিন্তু তার বাক্‌ভঙ্গিতে অতি কঠিন কথাকে অতি সহজভাবে বলার যে শক্তি, তা ছিল তাঁর অসাধারণ।

অনেক সময় তিনি নিজেকে আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলে পরিচয় দিতেন। কেননা, তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত এবং বাল্যকালে লালিত-পালিত হয়েছিলেন বনি সাদ্ বিন্ বকর গোত্রে। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সমগ্র জীবনে এই পাঁচ বছরের প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল। মাত্র কয়েকদিন যে দাসী সওবিয়াহ্‌র নিকট তিনি মানুষ হয়েছিলেন তাঁকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং ধাত্রীমাতা হালিমাকে তিনি আজীবন কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করতেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিবি খাদিজার সঙ্গে হযরত মহম্মদ (দঃ) পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন মা হালিমা কিছু সাহায্যের জন্য তাঁর নিকট হাজির হন। তিনি তাঁকে একটি উট সহ এক উটের মাল ও চল্লিশটি ভেড়া দিয়ে সাহায্য করেন এবং যখনই পরবর্তীকালে এই মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তখনই হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন।

তায়েফ বিজয়ের পর মা হালিমার কন্যা শায়মা বন্দী হন। শায়মাকে যখন বন্দিনী রূপে হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর নিকট আনা হলো, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিনতে পারলেন এবং কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই তৎক্ষণাৎ তাঁর আপন পরিবারে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে ফেরত পাঠালেন।

হযরত মহম্মদ (সাঃ) ছয় বছর বয়সে একবার তাঁর মায়ের নিকট চলে আসেন। এদিকে মা হালিমা তাঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ান। আবদুল মোত্তালিবের নিকট হাজির

হলে তিনিও খুঁজতে আরম্ভ করেন। পরিশেষে ওয়রাকা বিন নাওফল নামক এক ব্যক্তি তাঁর সন্ধান দেন।

মা হালিমার নিকট বিদায় নেওয়ার পর হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর দাদা আবদুল মোত্তালিবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। দাদা আবদুল মোত্তালিব তাঁকে এত বেশি স্নেহ করতেন যে, ওই স্নেহের তুলনা হয় না। তাঁর সর্বাপেক্ষা স্নেহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন শিশু মহম্মদ (দঃ)। এই সময়ে মক্কার মধ্যে প্রধান ছিলেন আবদুল মোত্তালিব। তাই তাঁর জন্য কাবাগৃহে একটা বিশেষ আসন থাকত। এই আসনের চারিপার্শ্বে তাঁর পুত্রগণও বসতেন এবং সেই সঙ্গে শিশু মহম্মদ (দঃ) দাদার কাছে খেলাধুলা করতেন। এইভাবে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবন বেশ আনন্দের সাথে অতিবাহিত হচ্ছিল।

যে মহান মহাপুরুষ তাঁর সমগ্র জীবনে প্রচার করবেন সুখের সঙ্গে দুঃখ, দুঃখের সঙ্গে সুখ—তাঁর জীবনে এককভাবে এর কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। মা আমিনার ইচ্ছা হলো এবার তিনি তাঁর শিশুপুত্রকে মাতৃকুলের সঙ্গে একবার পরিচয় করাবেন। তাই মদিনার পথে যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন উম্মে আইমান নামক এক চাকরানীকে, যাকে রেখে গিয়েছিলেন স্বামী আবদুল্লাহ। এবার মদিনায় মা আমিনা তাঁর শিশুপুত্রকে দেখালেন সেই ঐতিহাসিক স্থান যেখানে তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। দেখালেন সেই ঐতিহাসিক সমাধি স্থান যেখানে তাঁর পিতা চিরনিদ্রায় চিরশায়িত। শিশু মহম্মদ (সাঃ) অনুধাবন করলেন তিনি এতিম। স্নেহময়ী মাতা তাঁর শিশুপুত্রকে সেই দীর্ঘ কাহিনী শোনালেন—কি করে তাঁর প্রিয় পিতা এখানে সমাধিস্থ হলেন। মহানবী তাঁর সমগ্র জীবনে মায়ের সঙ্গে এই প্রথম মদিনা যাত্রার কাহিনী ও করুণ ইতিহাস কোনদিনই ভোলেননি। বরং সমগ্র জীবন তিনি তাঁর সহচরদের এই কাহিনী, এই করুণ বৃত্তান্ত কথায় কথায় বলে বোঝাতেন, কেন তিনি এই মদিনাকে এত বেশি ভালবাসতেন।

পরলোকে মা আমিনা ঃ মদিনায় একমাস থাকার পর তিনি এবার ঠিক করলেন ফিরে যাবেন মক্কায়। যে দুটো উটকে সঙ্গে এনেছিলেন তাদের আবার বোঝাই করলেন ফেরার প্রস্তুতিতে, সঙ্গে থাকল ওই দাসী উম্মে আইমান। যখন তাঁরা মদিনা ও মক্কার মাঝপথে হাজির হলেন, তখন মা আমিনা অসুস্থ বোধ করলেন এবং সামান্য অসুস্থতাতেই পরলোকগমন করলেন এবং সেখানেই তাঁর সমাধি দেওয়া হলো। মরুভূমিতে রয়ে গেল মাত্র দুটি প্রাণী শিশু মহম্মদ (সাঃ) ও দাসী উম্মে আইমান। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! দু' মাস পূর্বেও মক্কায় দাদা আবদুল মোত্তালিব ও মা আমিনার সঙ্গে সুখেই দিন কাটছিল। মায়ের সঙ্গে মদিনায় ভ্রমণ, তার সুখের রেশ। আর এখন কি অবস্থা। পিতা নেই, মাতা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, আত্মীয় নেই, স্বজন নেই। পিতাকে হারিয়েছেন জন্মের পূর্বেই, মাতাকে হারালেন নির্জন মরুভূমিতে। মরুভূমিতে চোখের সামনে নিজের মাকে হারানো যে কতখানি পীড়াদায়ক, আপন এতিম অবস্থাকে শিশু মহম্মদ (দঃ) কিভাবে অনুভব করলেন, তাঁর মনে কি প্রভাব বিস্তার করল, একথা অনুভব করতে হবে, বোঝানো দুষ্কর।

সাধারণত মানুষ ষাট বছরেও যে দুঃখ-অনুতাপের সম্মুখীন হয় না, শিশু মহম্মদ (দঃ) তাঁর জীবনে ছয় বছর পূর্ণ হতে না হতেই তার চেয়ে বহুগুণ দুঃখ-তাপের

সম্মুখীন হলেন। নিশ্চয় এর পেছনে ছিল মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। যিনি ভবিষ্যতে সারা বিশ্বমানবের সুখ-দুঃখ আপন অন্তরে অনুভব করবেন তাঁর জীবনে এই হলো প্রকৃত প্রাপ্য। তাঁর অন্তরে দুটি জিনিস বারবার সবকিছুকে অতিক্রম করে গেছে। একটি আল্লাহ্‌র আরাধনা, অন্যটি মানবসমাজের জন্য সঠিক কল্যাণ চিন্তা। তিনি এই দুটি কাজে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই দিনগুলোকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাঁর পরবর্তী জীবনের আল্লাহর মহান ঐশী প্রত্যাদেশ। "তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পান নি? এবং তোমাকে আশ্রয় দান করেন নি? তিনি তোমাকে পথান্বেষী প্রাপ্ত হন, পরে পথনির্দেশ দেন। তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পান, পরে তোমাকে সম্পদশালী করেন।"

কোরআন—৯৩ ঃ ৬-৮

পরলোকে আবদুল মোত্তালিব ঃ শিশু মহম্মদ (দঃ)-এর দুঃখের এখানেই পরিসমাপ্তি হলো না। মাকে হাবানোর ঠিক দু'বছর পরে অর্থাৎ আট বছর বয়সে সমগ্র আরবের অসাধারণ মানুষ দাদা আবদুল মোত্তালিবকে হারালেন। মাকে হারিয়ে শিশু মহম্মদ (দঃ) যেরূপ শোকাভিভূত হয়েছিলেন দাদাকে হারিয়ে ঠিক সেইরূপই হলেন। এই মৃত্যু হাশিম গোত্রকে আলোড়িত করে তোলে। এবং এই মৃত্যুর প্রভাবে সমগ্র আরবের ইতিহাস অন্যদিকে মোড নেয়। কেননা হাশিম গোত্রে তখন এমন একজনও ছিলেন না যিনি মোত্তালিবের স্থান পূরণ করতে পারেন। আবদুল মোত্তালিবের পুত্র আবু তালিব অতীব সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত গরিব, তাই কিছুতেই তীর্থগামীদের ভার বহন করতে রাজি ছিলেন না। অন্যদিকে হারিস ছিলেন একেবারেই অকেজো। অন্য পুত্র আবু লাহাব তো দুষ্টের সর্দার। এহেন কঠিন সময়ে আবদুল মোত্তালিব দেহত্যাগ করার পর আবু তালিব কাজ চালাতে থাকেন।

আবু সুফিয়ান ঃ আবদুল মোত্তালিবের মৃত্যুতে বনু হাশিম গোত্র দীর্ঘ দু'পুরুষ ধরে যে প্রভুত্ব আরবে চালিয়ে আসছিল তা ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো। এর জঘন্যতম পরিণতি হলো—হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ৪০ বছর বয়স থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত এই দীর্ঘ কুড়ি বছর আবু সুফিয়ান তাঁর ঘোর শত্রু হয়েছিলেন। তাব প্রথম কারণ আবু সুফিয়ানেব ধারণা ছিল—হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন ওই বনু হাশিম গোত্রের মানুষ, যে গোত্র আবু সুফিয়ানের পূর্বপুরুষ হারব ও উমাইয়াকে মক্কার প্রাধান্য হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আসল ইতিহাস তা নয়, দূরে সরিযে দেওয়া হয়নি। ববং তারা আপন অযোগ্যতার জন্য দূরে সরে গিয়েছিল আপন ইচ্ছাতেই। দ্বিতীয়ত, হযরত মহম্মদ (দঃ) আরবের সমস্ত পুতুলগুলোকে ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। অথচ এই পুতুলগুলোর ওপরই আবু সুফিযানের নেতৃত্ব নির্ভব করত। আবু সুফিয়ানের এই শত্রুতা আবও জোরদার হলো আবু লাহাবেব সহায়তায়। জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে এদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তবুও তিনি তাঁর স্বভাবজাত, সহজাত ও জন্মগত অদম্য মনোবল হাবাননি। ন্যায ও সত্যের জন্য সংগ্রামে তিনি কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তাঁর সংগ্রাম কোন সাম্রাজ্যকে জয় করতে নয়, ধ্বংস করতেও নয়, তাঁব সংগ্রাম ছিল মূলত সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে। এখানে তিনি ছিলেন আপসহীন চির সংগ্রামী মানব।

অভিভাবক আবু তালিব ঃ আবদুল মোত্তালিব তাঁর মৃত্যুশয্যায় শিশু মহম্মদ (দঃ)-এর অভিভাবকত্বের ভার দিলেন আবু তালিবের ওপর। কেননা আবু তালিব ভাইপোকে পুত্রের অধিক স্নেহ করতেন। কারণ মহম্মদ (দঃ)-এর বুদ্ধিমত্তা, বিবেক বিবেচনা, বদান্যতা, উদার হৃদয় ও মহত্ত্ব সকলকে অতিক্রম করেছিল।

এখন থেকে আবু তালিবই হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পিতা ও মাতা স্বরূপ। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনে একটা করুণ ইতিহাস—আবু তালিব জীবনে মুসলমান হননি। কিন্তু সমগ্র জীবন তিনি মহম্মদ (দঃ)-কে ছায়ার মতো রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। একদিনের জন্যও তাঁদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের কোনরূপ তিক্ততা দেখা দেয়নি। শুধু আবু তালিব বলে নয়, যে কোন বিধর্মীর সঙ্গে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সম্পর্ক কোনদিনের জন্যই তিক্ত হতো না, যতক্ষণ না সে অসৎ আচরণ করত। অনেকেরই ধারণা, মুসলমান না হলে হযরত মহম্মদ (দঃ) তার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতেন। কিন্তু এটা একেবারেই ভুল ধারণা। যে মানুষের মধ্যে তিনি মনুষ্যত্বের বিকাশ লক্ষ্য করতেন, তাঁকে সবসময়ই অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তাই আবু তালিব যদিও একজন অমুসলমান ছিলেন, তবুও তাঁদের দু'জনের সম্পর্কে এতটুকুও মলিনতা আসেনি কোনদিনই।

মেষপালক রূপে বালক মহম্মদ (দঃ) ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) যখন চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তখন তিনি চাচার অবস্থা সচ্ছল না থাকায় মেষপাল চরাতেন। প্রায় নবীগণকেই দেখা যায় প্রথম জীবনে মেষপাল চরানোর কাজ করতে। হযরত মহম্মদ (দঃ) নিজেই বলে গেছেন তিনি কিছু পয়সার বিনিময়ে অন্যালোকেরও মেষ চরাতেন। আমাদের দেশের মেষপালক বালকদের মতো তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরে সমস্ত দিন পালাক্রমে মেষ চরাতেন। পরবর্তীকালে যখন তাঁর সাহাবীগণ (সহচর) তাঁকে পাকা জাম এনে দিতেন, তখন তিনি বলতেন পাকা কালো জাম আনতে, কেননা পাকা কালো জাম খেতে সুস্বাদু। এ অভিজ্ঞতাও তাঁর বালক জীবনের।

সিরিয়া ভ্রমণ ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বয়স যখন বারো বছর তখন আবু তালিব মনস্থ করলেন সিরিয়াতে বাণিজ্য উপলক্ষে যাত্রা করবেন। পথিমধ্যে নানা বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের জন্য ভাইপো হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে না নিয়ে যাওয়ার কথাও চিন্তা করলেন। কিন্তু হযরত মহম্মদ (দঃ) চাচা আবু তালিবকে এতই ভালবাসতেন তিনি তাঁর সঙ্গে যাবেনই। তাই আবু তালিব তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চাচা ও ভাইপো উভয়ে বসরা নামক স্থানে হাজির হলেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই সময়ে বসরায় **বুহাইরা** নামক এক খ্রীস্টান পাদ্রী বালক মহম্মদ (দঃ)-কে দেখেন। তাঁর দৃষ্টিতে বালক মহম্মদ (দঃ)-এর এমন কোন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে যাতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন—কালে এই বালক একদিন নবীর মর্যাদা লাভ করবেন। আবু তালিবকে তিনি সতর্ক করেন, যাতে তিনি এই অসাধারণ বালককে আর কোথাও না নিয়ে যান, কারণ ইহুদীরা এর ক্ষতি করতে পারে। এই ভ্রমণই হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে প্রথম বহির্বিশ্বের স্বাদ আস্বাদন করায়—তিনি বিশ্বের বিরাটত্ব আপন অন্তরে অনুভব করেন।

এতদিন তিনি ছিলেন অনুর্বর মক্কার মরুভূমিতে। আজ তিনি শস্য-শ্যামলা বসরাতে। তিনি সামুদ গোত্রের রাজত্বভূমি বিরাট প্রান্তর ওয়াদিল কুরাও অতিক্রম করেন। তিনি দেখলেন তাঁদের ধ্বংসাবশেষ। পরবর্তীকালে পবিত্র কোরআনে যার বর্ণনাও আছে।

কোরআন—২৬ ঃ ১২৩, ১৩৯, ১৪১-১৫৮, ১৬০, ১৭৬।

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বয়স যদিও তখন বারো বছর, কিন্তু তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তির ব্যাপকতা ও গভীরতা আকাশের ন্যায় বিরাট ও সমুদ্রের ন্যায় বিশাল হয়ে উঠেছিল। এইবারের বাণিজ্য যাত্রায় আবু তালিব আশাতিরিক্ত লাভবান হয়েছিলেন। এই বাণিজ্যযাত্রা এত সুখকর ছিল যে জীবনে কোনদিনই তিনি সে কথা ভোলেননি।

মক্কার জীবন ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) চাচা আবু তালিবের সঙ্গে মক্কাতেই রয়ে গেলেন। তাঁর কাছে থাকাকালীন তিনি সর্বদাই চাচার কথামত চলতেন। এবং তাঁর সকল কাজে সাহায্য করতেন। তিনি চাচার সঙ্গে মক্কার তীর্থযাত্রীদের পানি বিতরণ করতেন। তিনি তীর্থযাত্রীদের বিশাল সমাবেশ লক্ষ্য করতেন। সেখানে বহু গোত্র সমবেত হতো। কোন গোত্র তাদের কাব্যশক্তি দ্বারা প্রকাশ করত নিজেদের মাহাত্ম্য, কোন গোত্র তাদের আতিথেয়তার গর্ব করত। এইভাবে সকলেই আপন আপন মাহাত্ম্য প্রচার করত। তিনি নীরবে সবকিছু শুনতেন। হযরত মহম্মদ (দঃ) এইভাবে সমগ্র আরব-জাহানের প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

ফিজর যুদ্ধ ঃ আরবগণ যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তবে বছরের কয়েকটি মাসকে তারা পবিত্র জ্ঞান করায় ওই মাসগুলোতে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। সে মাসগুলো ছিল বছরের প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ ও দ্বাদশ মাস, কিন্তু বিশেষ কারণে ফিজর যুদ্ধ সংঘটিত হয় দ্বিতীয় মাসে।

যুদ্ধের কারণ ঃ বনু হাওয়াজিন গোত্রের নোমান বিন-আল-মুনজির নামক এক ব্যক্তি প্রতিবছর ওকাজ নামক স্থানে একটি মরু যাত্রীদল (ক্যারাভ্যান) পাঠাতেন। এবারেও পাঠিয়েছিলেন উরুয়ার নেতৃত্বে। উরুয়া যখন পথিমধ্যে তখন কুরাইশ গোত্রের বার্দ নামক এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মক্কার বাইরে উভয় গোত্রে তুমুল সংগ্রাম বাধে। দীর্ঘ চার বছর এই সংগ্রাম চলতে থাকে। ফিজর যুদ্ধেই আবু সুফিয়ানের পিতা হারব প্রাণ হারায়।

এই সময় হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বয়স ছিল পনেরো বছর। এই যুদ্ধে আবু তালিব ছিলেন বনু হাশিম গোত্রের প্রধান। এবং এই যুদ্ধে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রধান কাজ ছিল—শত্রুপক্ষের যে তীর নিক্ষিপ্ত হতো সেগুলো একত্র করে চাচা আবু তালিবকে দেওয়া। এই যুদ্ধে তিনি কাউকে আঘাত করেননি। এবং নিজেও আঘাত পাননি। এই যুদ্ধে তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় লাভ হয়েছিল বিরাট অভিজ্ঞতা, যা পরবর্তী জীবনে কাজে লেগেছিল।

ফজল সংঘ ঃ এই অহেতুক অনর্থক অমানুষিক দীর্ঘদিনের সংঘর্ষের অবসানের পর করুণ হৃদয় আবু তালিব ও দয়ার মূর্তপ্রতীক হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রচেষ্টায় সেখানে স্থাপিত হলো ফজল সংঘ। এর উদ্দেশ্য ছিল সকল গোত্রকে ভাল কাজে একত্রিত করা,

মন্দ কাজে নিষেধ করা। আবদুল মোত্তালিবের পুত্র জুবাইর সকলকে আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং সকলেই একত্রিত হয়েছিলেন আবদুল্লাহ বিন জাদামের গৃহে। জাদাম সকলকেই একটি ভোজ দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। হযরত মহম্মদ (দঃ) যদিও তখন বালক তবুও এই ব্যাপারে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। পরবর্তীকালে তিনি বলতেন, "যদি আর একবার জাদামের গৃহে শপথ নিতে পারতাম তাহলে বহু লাল উট লাভের চেয়েও উত্তম হতো।"

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর স্বাধীন চিন্তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ ঃ মহম্মদ (দঃ)-এর জন্ম ও শৈশবের ইতিহাস অতি করুণ। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন পিতাকে হারালেন, শিশুকালেই মাকে হারালেন। বাল্যকালে দাদাকে হারালেন। সুতরাং পরিস্থিতি পরিবেশ বাধ্য করল তাঁকে আপন ধারাতে গড়ে উঠতে। পারিপার্শ্বিক যুবকদের কোন প্রভাব তাঁর ওপরে পড়ার কোন সুযোগই পেল না। উচ্ছৃঙ্খল জীবন গড়ে ওঠার জন্য যে দুটো জিনিসের একান্ত দরকার তা তাঁর ছিল না। এক অর্থ, দ্বিতীয় সেই অর্থের অপব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট অবসর। কোনটিই তিনি পাননি। আল্লাহ্ তাঁকে এই সমস্ত না দিয়েই দিলেন ভাবী চরিত্র গঠনের অফুরন্ত সম্পদ, জাগতিক-দাবিদ্র্যকে বোঝার অফুরন্ত জ্ঞান। পুতুল পুজো সম্পর্কে হযরত মহম্মদ (দঃ) চিরদিনই ঘৃণার মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি কোনদিনই পুতুল পুজো বরদাস্ত করতে পারেননি। কোন যুবকগোষ্ঠীও তাঁকে কোনদিনই এর প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেনি। তিনি যুবকদের সঙ্গে খুবই কম মেলামেশা করতেন, কেননা তিনি আনন্দ পেতেন নির্জনতায়, মেলামেশায় নয়। তাই প্রয়োজনের বাইরে একটি কথাও বলতেন না। তিনি চিন্তায় বিভোর থাকতেন। সে চিন্তা ছিল সমস্ত মানবগোষ্ঠীর চিন্তা, আকাশ-পাতাল বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত সারা বিশ্বের চিন্তা।

বাণিজ্যযাত্রায় মহম্মদ (দঃ) ঃ চরিত্রের ওই অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষসাধন ব্যতীতও তাঁকে কাজ করতে হতো তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্যও। কুড়ি বছর বয়স থেকেই তিনি বাণিজ্যোপলক্ষে নানাস্থানে যাত্রা করেন। এই সময়ে তিনি কয়েকজন ধনী বণিকের কর্মচারী বা প্রতিনিধি হিসাবে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব দেশে বাণিজ্যোপলক্ষে গমন করেন। এই সমস্ত যাত্রাগুলোতে তাঁর মানবিক ব্যবহার ও বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্কে তাঁর চাবিত্রিক সততা এতই উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত হয় যে, তাঁকে সকলেই দ্বিধাহীন চিত্তে **আল্-আমিন** অর্থাৎ চিরবিশ্বাসী নামে অভিহিত করতে থাকেন। জীবনের যে কোন অবস্থাতেই তিনি কথার খেলাপ করেননি। তাই নানাদিক থেকে সমগ্র আরববাসীর নিকট তাঁর চরিত্রের সাধুতা সন্দেহের বহু উর্ধ্বে স্থানলাভ করে। সমগ্র আরব-জাহানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যে কোন বিষয়েই তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত। এহেন মানবের সংস্পর্শে তাঁরা পূর্বে আর কোনদিন আসেননি। কোন এক সময় আবদুল্লাহ বিন আবি আল্হামসা বলেন—মহম্মদ (দঃ) নবী হওয়ার বহু পূর্বেই একবার কোন একটি বিষয়ে হযরতের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়। মহম্মদ (দঃ)-কে তিনি কোন এক বিশেষ জায়গায় অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যের কথা আবদুল্লাহ্ সে কথা ভুলে যায়। এদিকে মহম্মদ (দঃ) পূর্ব কথামত নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে আবদুল্লাহ্র জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। সারাটা দিন কেটে গেল,

আবদুল্লাহ্‌র দেখা নেই। পরদিন মহম্মদ (দঃ) একই অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকেন। আবার দিন কেটে গেল, তৃতীয় দিনটিও এইভাবেই কেটে গেল। আবদুল্লাহ্‌ একেবারেই ভুলে গেলেন। হঠাৎ তিনদিন পর আবদুল্লাহ্‌ ওই পথে অন্য কাজে যাচ্ছিলেন। দেখা হল মহম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে। দেখলেন তিনি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। আবদুল্লাহ্‌কে সর্বাপেক্ষা হতবাক করল মহম্মদ (দঃ)-এর স্নিগ্ধ ব্যবহার। তিনি দেখলেন, তাঁর চোখে-মুখে কোথাও এতটুকুও বিরক্তির লেশ মাত্র নেই, ধীর-স্থির অবিচল মানুষ, অতি স্বাভাবিক সানন্দে আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। আবদুল্লাহ্‌ ভাবলেন, মহম্মদ (দঃ) কেবল মানুষ নয়, মহামানব মহাপুরুষ। তাঁর তুলনা নেই, এজগতে তিনিই তাঁর একমাত্র তুলনা। পরবর্তীকালে সেই হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সুযোগ্য উম্মত (শিষ্য) হযরত বাইজিদ বোস্তামীর মা রাত্রিকালে একবার পানি পান করতে চাইলেন, ঘরে পানি না থাকায় বাইজিদ (রঃ) নিকটবর্তী নদী হতে পানি আনতে যান। পানি নিয়ে এসে দেখেন মা আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন বাইজিদ (রঃ) পানি হাতে সারা রাত্রি মায়ের শিয়রে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। না-জানি, কখন মা আবার পানি চান। এ হেন গুরুর হেন শিষ্য খুবই স্বাভাবিক। মাতৃভক্তি মহাগুণ।

আল্লাহপাক হযরত জিবরাইল (আঃ) মারফত রসুলুল্লাহ্‌কে জানিয়েছিলেন যে, "আমি নিশ্চয়ই আপনার চেয়ে সম্মানী কোন কিছু সৃষ্টি করিনি। আর আমি শপথ করে বলছি নিখিল বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, তাদের নিকট প্রকাশ করব আপনার গৌরব এবং আমার নিকট আপনার যে কত মর্যাদা, আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করতাম না।" [যুরকানী ঃ ১-৬৩]

হযরত মহম্মদ (দঃ) নিখিল বিশ্বে মহান আদর্শ ও মহত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বহু ধর্মের লোক বিশ্বাস করে যে মানবশিশু আদি পিতা আদম (আঃ)-এর পাপ বহন করে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় ; কিন্তু ইসলামধর্ম একথা বিশ্বাস করেন না। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি মানবশিশু (ফিতরৎ) প্রকৃতির (ইসলামের) ওপর জন্মগ্রহণ করে। ভাল-মন্দ স্বভাবের বীজ প্রতিটি মানবশিশুর প্রকৃতিতে সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী জীবনে তার পরিবেশ, প্রবৃত্তি, শিক্ষা এবং সাধনার ওপর চরিত্রের বিকাশলাভ ঘটে। মহানবী (সাঃ)-এর অনলস সাধনা দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও আধ্যাত্মিক উত্তরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছিল। তিনি বিক্ষুব্ধ বিশ্বের বুকে ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে শান্তির চেতনা নিয়ে এসেছিলেন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তাঁর জীবনের ধৈর্য, সাধনা, সততা, সহনশীলতা, সংযম, শ্রম-নির্ভরতা, একাগ্রতা, দৃঢ়চিত্ততা এককথায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমাজ-সংস্কারে তাঁর নিরলস সংগ্রামী মন, বিশ্বজোড়া শান্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব কামনা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবী চেতনা ও আন্দোলন এবং এইসবের সংমিশ্রণজাত ও সহজাত অত্যুচ্চ মানবতাবোধই তাঁকে মানবমণ্ডলীর নেতা ও শ্রেষ্ঠতম সমাজ-সংস্কারের মর্যাদা দান করেছে।

হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর অভ্যন্তরীণ শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সর্বকালের সর্বদেশের শ্রেষ্ঠতম মানবের মর্যাদা লাভ করলেন এবং আরব-জাহানের তথা সারা জাহানের নেতা ও পথপ্রদর্শক হলেন।

অনেকে বলে থাকেন—আল্লাহ্ অনুগ্রহবশত মহানবীকে নেতা করলেন, চরম কৃতকার্যতা দান করলেন। কথাটা ঠিক। কিন্তু শুধু এইটুকু বললে মহানবীর মহান জীবনের সঠিক মূল্যায়নও হলো না। মহানবী ছিলেন অতীব উচ্চমার্গের কঠোর সাধক। আল্লাহ্ দয়া করে সেই সাধনাকে দিলেন স্বীকৃতি ও অনুমোদন। কেননা ইসলামে চেষ্টা ব্যতীত কিছুই নেই। মহানবী বলেন—"চেষ্টা আমার হাতে, ফল আল্লাহ্‌র হাতে।" কোরআন বলে—"মানুষের জন্য চেষ্টা ব্যতীত কিছুই নেই।" ৫৩ ঃ ৩৯-৪২

ছাত্র-ছাত্রীগণ পরীক্ষার খাতায় লিখে আসে—আপন আপন কর্ম ফল, পরীক্ষক দেন তাকে স্বীকৃতি। জীবনের কর্মই জীবনকে করে মহান ; আল্লাহ্ দেন স্বীকৃতি। তিনি সকলকেই শক্তি দিয়েছেন পাপ-পুণ্য ও ভাল-মন্দের পথে চলার। যে যেদিকে খুশি চলে।

সন্ধিস্থানে শক্তি দিয়ে রওনি ক্ষান্ত
দর্শক তুমিই ওহে পৃথিবী পান্থ।
পাপ ও পুণ্যের বীজ মানব-মনে
জীবিত সদাই রয় মনের বনে।
আপন স্বভাব গুণে প্রসূন টুটে
দু' কুলেরই দুটি ফুল উঠিবে ফুটে।

মহানবী সেই জীবন সাধনার এক ও অদ্বিতীয় সাধক, অচিন্তনীয় একটি পূর্ণ মানব। তবে একথাও দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, শুধুমাত্র সাধনা দ্বারাও 'নবী' হওয়া যায় না ; এমনকি একটি ভাল পরীক্ষাতেও প্রথম হওয়া যায় না ; ধনী, সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক কোন কিছুই হওয়া যায় না, আল্লাহ্‌র দয়া ব্যতীত। ইসলাম মানুষের চেষ্টা ও আল্লাহ্‌র রহমতের মিলনভূমি।

কাবার প্রস্তুতি ঃ চারদিকে পাহাড়বেষ্টিত কিছুটা নিম্নভূমিতে কাবার অবস্থান। যখন হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বয়স ২৩ বছর, সেই সময় এক বন্যাতে কাবার বিশেষ ক্ষতি হয়। এমনকি এর পূর্বেও কাবার পুনর্নির্মাণের কথা মক্কাবাসীগণ চিন্তা করেছিলেন। যেহেতু এতে কোন ছাদ ছিল না, তার ভেতরের মূল্যবান জিনিসপত্রগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কুসংস্কার তাদের এতই অন্ধকারে রেখেছিল যে, তারা কাবার গায়ে হাত দিতে চিরদিনই বড় ভয় পেত।

হঠাৎ এই সময় তারা বাকুম নামক এক ব্যক্তির নাম জানল যে সে কাঠের ভেড়া তৈরি করতে পারত। তারা ওয়ালিদ বিন্ আল্ মুগিরাকে তার নিকট পাঠিয়ে দিল ওই ভেড়া তৈরির কিছু কাঠ, মাল-মসলা ও স্বয়ং বাকুমকে সঙ্গে আনতে, যাতে তারা কাবার পুনর্নির্মাণ করতে পারে। বাকুম ছিল জাতিতে রোমান, গ্রীক। তখন মক্কাতে একজন ছুতোর মিস্ত্রিও ছিল না। এইভাবে কুরাইশগণ কাবার পুনর্নির্মাণের কাজ আরম্ভ করলেন। এবং এই কাজের দায়িত্ব চার ভাগে ভাগ হলো চারটি প্রধান গোত্রে। কিন্তু কেউই প্রথমে কাজ আরম্ভ করতে সাহস করছিল না। পাছে কিছু অঘটন ঘটে যায়। অবশেষে ওয়ালিদ আরম্ভ করলেন। তাঁর দেখাদেখি সকলেই হাত লাগালেন। মানুষ-সমান উঁচু হওয়ার পর সমস্যা দেখা দিল। "হাজারুল আসওয়াদ" পবিত্র কালোপাথর স্থাপনের সমস্যা। কাবাগৃহে কালোপাথর

রাখাটা খুবই একটা সম্মানজনক ব্যাপার। তাই চার সম্প্রদায়ই আপন আপন শক্তি নিয়ে উঠেপড়ে লাগল কালোপাথর স্থাপনের জন্য। এমনকি দুই প্রধান সম্প্রদায় বনু আব্দুদ্দার ও বনু আদি মুখোমুখি সংগ্রাম করার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। বনু আব্দুদ্দার সকলের সম্মুখে রক্ত নিয়ে হাত রঞ্জিত করে শপথ করল—তারা পাথর বসাবে। যা 'রক্ত-শপথ' নামে পরিচিত। তখন দলের মধ্যে অতিবৃদ্ধ জ্ঞানী আবু ওমাইয়া বিন্ আল্‌মুগিরা আল্ মাঘজুমি পরিস্থিতি অতি ভয়াবহ দেখে সকলকে ডেকে বললেন—"তারা যেন তাঁকেই তাদের বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করেন—যিনি আগামীকাল বাবুস সাফাতে প্রথম প্রবেশ করবেন।" সকলেই সম্মত হলেন। পরদিন তাঁরা দেখলেন—হযরত মহম্মদ প্রথম প্রবেশকারী। তখন সকলেই আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন—**আল্‌-আমিন—চিরবিশ্বাসী বলে।** সকলেই বলে উঠলেন তাঁরা তাঁরই কথা মেনে নেবেন। তাঁরা সমস্ত কথা তাঁকে বললেন। তিনি কালবিলম্ব না করে সিদ্ধান্ত নিলেন। আদেশ দিলেন—'একখণ্ড কাপড় আনার জন্য। কাপড় আনা হলো। তিনি নিজহাতে পবিত্র কালো পাথরকে কাপড়ের মাঝখানে রাখলেন। এবং চার গোত্রের চার প্রধানকে কাপড়ের চার কোণ ধরার আদেশ দিলেন। তাঁর কথামত সকলেই কাপড় উত্তোলন করল। যথাস্থানে পাথর নিয়ে যাওয়া হলো। তখন তিনি নিজ হাতে পাথরটিকে নিয়ে সকলের মনোনীত স্থানে স্থাপন করলেন। এইভাবে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের হাত থেকে তাঁর মধ্যস্থতায় আরবগণ রক্ষা পেল। কুরাইশগণ কাবা গৃহের উচ্চতা ৩৬ ফুট পর্যন্ত নির্মাণ করলেন।

কাবাগৃহের এই নির্মাণকাজে হযরত মহম্মদ (দঃ) সাহায্য করতেন। কালো পাথর সম্পর্কে তাঁর দেওয়া বিচার-পদ্ধতি সকল আরববাসীকেই মুগ্ধ করে। আর সকলের মধ্যেই তিনি একটা বিশেষ সম্মানের আসন লাভ করলেন—তখনও নবুয়তের ১৭ বছর বাকি। পবিত্র কাবা গৃহের এই পুনর্নির্মাণের ফলে হযরত মহম্মদ (দঃ) এবং অনেকেরই মনে হয়েছিল পুতুলের স্থান এখন অতীতের কাহিনী। যদিও এই পুতুল সমূলে অপসারণের জন্যে আরও ৩৭ বছর লেগেছিল। অর্থাৎ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ২৩ বছর বয়স হতে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত, যেদিন সমগ্র আরব-জাহান ঘোর অন্ধকার হতে অনন্ত ঊষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

প্রথম বিবাহ ও প্রথম ঐশী-প্রত্যাদেশ

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বিবাহ ঃ বাণিজ্যোপলক্ষে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সততা সকল শ্রেণীর সকল মানুষকে মুগ্ধ করেছিল। তখনকার দিনে আরবে একটা প্রথা ছিল—ধনী ব্যক্তিগণ এক একজন প্রতিনিধি (এজেন্ট) নিযুক্ত করতেন আপন আপন ব্যবসাতে। যখন হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বয়স ২৪-২৫-এর মধ্যে, তখন আরবের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা খালেদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জা বিন কুসাই-এর কন্যা খাদিজা আপন ব্যবসাব জন্য একজন প্রতিনিধির সন্ধান করছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন বিদুষী, তেমনি ছিলেন ধনী। তাঁর পর পর দু'বাব বিয়ে হয়। দ্বিতীয়বারের স্বামী বহু ধনসম্পদ রেখে পরলোকগমন করেন। খাদিজা তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর সকল ধনসম্পদের উত্তরাধিকারিণী হন। এরপর বহু আরব ধনী বণিক তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন; কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

বিবি খাদিজা মহম্মদের গুণাবলীর কথা জানতে পেরে তাঁকে বাণিজ্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। আবার কেহ বলেন—যখন আবু তালিব জানতে পারলেন—বিবি খাদিজা একজন বিশ্বস্ত বাণিজ্য-প্রতিনিধির খোঁজ করছেন, তখন তিনি হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নাম প্রস্তাব করেন। তখন বিবি খাদিজা মহম্মদকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে আপন বিশ্বস্ত দাস মিসরাহ সহ সিরিয়ায় প্রেরণ করলেন। মিসরা ছিলেন বিবি খাদিজার একজন অত্যন্ত বিশ্বাসী ও অনুগত দাস। এই পথ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট অপরিচিত ছিল না। বারো বছর বয়সে আবু তালিবের সঙ্গে তিনি এখানে এসেছিলেন।

হযরত মহম্মদ (দঃ) খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে এই বাণিজ্যযাত্রা পরিচালনা করলেন। সিরিয়ান খ্রীস্টানগণ তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন। হযরত মহম্মদ (দঃ) কম কথা বলতেন ; কিন্তু কাজে তিনি ছিলেন অসাধারণ পটু, আর অপরের কথা শুনতেন ধৈর্য ধরে, মন দিয়ে। তাঁর এই বাণিজ্যযাত্রা খুবই লাভজনক হয়েছিল। বিবি খাদিজা জীবনে আর কোন বাণিজ্যযাত্রায় এত লাভ পাননি। শুধু তাই নয়, হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে পড়েন।

হযরত মহম্মদ (দঃ) বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে একদিন দুপুর নাগাদ মক্কায় ফিরে এলেন। বিবি খাদিজা তাঁব গৃহের ছাদ থেকে উটের ওপর আরোহিত হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে দেখলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে নেমে এলেন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। বাণিজ্য সম্পর্কে যাবতীয় কথা তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তাঁর হৃদয় আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। মিসরা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মহত্ত্ব, সততা, ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বিবি খাদিজাকে ওয়াকিবহাল করেন। মিসরার বর্ণনানুযায়ী, তখনকার দিনে আরবে এমন একজনও যুবক ছিলেন না যাঁকে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর যে কোন একটি গুণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রতি খাদিজার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ক্ষণিকের মধ্যেই অনুরাগে পরিণত হয়। তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর। বহু আরব ধনী সন্তান তাঁর পরিণয়

প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। পরিশেষে অন্তরে বরণ করলেন এক সম্পদহীন যুবককে। এখানে বিবি খাদিজার দূরদর্শিতার যে মাপকাঠি তাও অতি প্রশংসার্হ। তিনি তাঁর জাগতিক ধনসম্পদ লক্ষ্য করেননি। লক্ষ্য করেছিলেন—তাঁর চারিত্রিক অগাধ গুণরাশি। তিনি তাঁর এই অনুরাগের কথা তাঁর সহচরী ও বন্ধু বিবি নফিসাকে বলেন। কিন্তু তাঁর মনে হলো—তিনি কি এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন? প্রেম নারী-জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি। তাঁদের শিখিয়ে দিতে হয় না, এ ব্যাপারে তাঁরা কি পদক্ষেপ নেবেন। তিনি নফিসার মারফত হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মতিগতি জানতে চাইলেন। এবং নফিসা সঠিকভাবেই যোগাযোগ করলেন।

কথোপকথন ঃ

নফিসা ঃ বিয়ে-সাদি করছেন না কেন, কি হয়েছে?

মহম্মদ (দঃ) ঃ আমার কি আছে যে বিয়ে করব।

নফিসা ঃ থাক্ না থাক্ তাতে কিছুই আসে যায় না; আপনাকে যদি কোন পরমাসুন্দরী মহিলা তাঁর মহত্ত্ব, ভালবাসা ও ধনসম্পদ সহ আমন্ত্রণ করেন তাতে আপনার বক্তব্য কি?

মহম্মদ (দঃ) ঃ কোন্ সে মহিলা?

নফিসা ঃ বিবি খাদিজা।

মহম্মদ (দঃ) ঃ আমি কি করে এগোতে পারি?

নফিসা ঃ ওটা আমার কাজ।

মহম্মদ (দঃ) ঃ তা হলে আমি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

হযরত মহম্মদ (দঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে খাদিজা তাঁকে শুধু ভালবাসেন না, তাঁর প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগও আছে। তবু পুরুষ হয়েও তিনি প্রথম কোন প্রস্তাব বা ইঙ্গিত দেননি, কেননা তিনি জানতেন—খাদিজা বহু আরব নন্দনের দাবি বা প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। অধিকন্তু মেয়েরা কাউকে ভালবাসলেই যে তাকে বিয়ে করবে এমন নয়। এটা নারী মাত্রেরই ভালবাসা ও প্রেমের গূঢ় রহস্য। তাই নারী-চরিত্র বোঝা বড়ই কঠিন। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই হযরত মহম্মদ (দঃ) প্রথম সাড়া দেননি। যাই হোক, পরিশেষে যখন প্রস্তাব এল, তখন সানন্দে গ্রহণ করলেন চাচার সঙ্গে পরামর্শ করে।

বিবি খাদিজা বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে মোটেই দেরি করলেন না। তাঁর পিতা খালেদ বিগত ফিজর যুদ্ধে মারা যান। তাই তাঁর চাচা ওমর বিন আসদ্ দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেন। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হলো।

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর দেহগত পরিচয় ঃ বিবি খাদিজা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রতি যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার দুটি দিক লক্ষ্য করে। তাঁর সুন্দর দেহগত দিকও যেমন ছিল, আবার উত্তম চরিত্রগত দিকও তেমনি ছিল। এই উভয় দিকই তাঁকে আকণ্ঠ অনুরাগে আকৃষ্ট করেছিল। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সমগ্র চেহারাটি ছিল অতীব লাবণ্যময়। খুব লম্বাও না বেটেও না, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ বাহু, ভ্রূর ওপর ঘন কালো চুল, যার দু'প্রান্ত এসে মিশেছে নাসিকা সেতুর ওপর; দীর্ঘ প্রলম্বিত কালো চক্ষুযুগল, সাদা অংশগুলোর পাশে

ছিল কিছু রক্তিমাভ রং। চক্ষুমণি শেষ হয়েছে—বিশাল চক্ষু সীমায়, সুন্দর নাসিকা; দাঁতগুলো অতীব সুন্দর ও সুসজ্জিতভাবে সাজানো, ঘন দাড়ি, দীর্ঘ মনোরম ঘাড়, প্রশস্ত বক্ষ, দীর্ঘ স্কন্ধদ্বয়, রং গাঢ় কমলাবর্ণ; সুগঠিত উরু ও পদদ্বয়; চলার পথে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে অর্থাৎ বিনম্র নয়নে মাটির দিকে দৃষ্টিপাত করে চলতে থাকেন। পদক্ষেপ দ্রুত। তাঁর চালচলন কথাবার্তা অতি সন্তোষজনক; তাঁর দূরদর্শিতা সবসময় প্রমাণ করছিল বিচক্ষণতার পরিচয়, যার জন্য মানুষ মাত্রই তাঁর ইচ্ছার কাছে আনত হত। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, ওই সমস্ত দৈহিক সৌন্দর্যও বিবি খাদিজাকে মুগ্ধ করেছিল। সুতরাং এই বিয়েকে একটা ভালবাসার পূর্ণ পরিণতি বলা যেতে পারে। হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে পেয়ে বিবি খাদিজাই যে একাকী খুব লাভবান হলেন তা নয়; হযরত মহম্মদ (দঃ)-ও তাঁর সমগ্র জীবনে এরূপ একটাও গুণবতী জীবন-সঙ্গিনী পাননি। একদিকে স্বয়ং মহম্মদ (দঃ) যেমন ছিলেন চিরবিশ্বাসী আল-আমিন, অন্যদিকে বিবি খাদিজাও ছিলেন তাহেরা বা পরম পবিত্রা। তাই এই বিয়েতে দুদিকে দুটো নর-নারীই শুধু নেই, একদিকে আছে চিরবিশ্বাসী, অন্যদিকে আছে চিরপবিত্রা। তাই এ মিলন বিশ্বাস ও পবিত্রের মিলন। বয়সের দীর্ঘ ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের দীর্ঘ ২৫ বছরের বিবাহিত জীবনে কোনদিনই কোন তিক্ততার উদ্ভব হয়নি। এমনই ছিল সুমধুর তাঁদের দাম্পত্য-জীবন।

তদানীন্তন আরব ছিল কবিতা ও কাব্যের দেশ। সেদিনের আরব ভূমিতে বিবাহে প্রীতি উপহারের যে ধারা, তার মধ্যে আজিও শিক্ষার এবং দাম্পত্য জীবনের বহু কল্যাণময় দিক রয়ে গেছে, যা মানব-সমাজে, যুগল জীবনে চিরন্তনের দাবি রাখে।

প্রীতি উপহার

নারীরে নারীত্ব দিয়ে দিলে যাহা দান
প্রেম তার জীবনের সহজাত গান।
পুরুষে পৌরুষ দিয়ে পাশে দিলে কূপ
নিবারিতে তৃষ্ণাজল রমণী স্বরূপ।

নারীহৃদয়

নারী তো বসুন্ধরা, পুরুষ জীবন
ফেলিবে ধবার বুকে সূর্যের কিরণ।
নারী মন পেতে চায় পুরুষের প্রাণ
যে-প্রাণ পৌরুষ নিয়ে নহে ম্রিয়মাণ।

পুরুষপ্রাণ

রূপ নয় রুচি বাগে কালো ও ধলো
শ্রাবণের মেঘ সম হও তুমি কালো
জানিলে অন্তর দিয়ে বাস তুমি ভালো
জানিব সুন্দরী নও স্বর্গের আলো।

কবি-মন ঃ নারী প্রসঙ্গে

নিজেরে করিয়া দান করিতে বরণ
গড়েছ যৌবন ঘাট হৃদয় আসন।
দেহরে রাখিয়া দূরে প্রাণ দিও প্রাতে
বিকাল ফুরালে ফের বধূ হয়ো রাতে।
এখান-ওখান নয় যেখানেতেই রও
একটি হৃদয় মাঝে দুটি তুমি হও।
অকূল দরিয়া বুকে দিনে হও দ্বীপ
নিশীথে রওশন হও প্রেমের প্রদীপ।
সঙ্গিনী সুখের মূল স্বর্গ সৃজয়
জগৎ যাতনা ফের নরক নিশ্চয়।

কবি-মন ঃ পুরুষ প্রসঙ্গে

সমাজ সম্পদে যদি পুরুষ চাবি
রক্ষণ তাহার তালা নারীর দাবি।
নর যদি ধরণীতে সুকঠিন স্থল
নিখিল অবনী পরে নারী তার জল।
ছোট নয় বড় নয় কেহ কারও চেয়ে
উভয়ই হয়েছে বড় অপরে পেয়ে।
তোমার পৌরুষ প্রাণে না করিয়া দ্বিধা
তার মান তারে দিও তাহার মর্যাদা।
প্রাণ দিয়ে বাসে ভাল জাগে যদি বোধ
উভয়েরই এক সাথে সব-ঋণ শোধ।

তোমার প্রেমের লীলা দু'বুকে বহি
সৃজন করুক স্বর্গ মর্ত্যে রহি। —কাব্যকানন

চরিত্রগত পরিচয় ঃ এই বিবাহ হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে সামাজিকতার দিক থেকেও অনেকখানি প্রাধান্য দান করেছিল। তিনি বিবি খাদিজার প্রভূত ধনসম্পদ হাতে পেয়ে অহঙ্কারীও হননি বা কৃপণও হননি, অমিতব্যয়ীও হননি। এই অগাধ ধনরাশি তাঁর চরিত্রের এতটুকুও পরিবর্তন করতে পারেনি। তিনি যে মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, প্রভূত ধনসম্পদ হাতে পেয়ে তা সেই সুমহান চরিত্রের অনুকরণই করলেন, অর্থাৎ ওই ধন দিয়ে অসময়ে সাহায্য করতেন গরিব-দীন দুঃখীদের। দরিদ্র এতিম আগন্তুকদের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ দৃষ্টি।

যখনই তিনি কারও সঙ্গে করমর্দন করতেন জীবনে কখনও নিজে আগে হাত টেনে নিতেন না। কখনও কারও প্রতি কথা বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। যখন কোন লোক তাঁকে কিছু বলতেন, তিনি যিনিই হোন, তিনি শুধু তাঁর কথাই মনোযোগ সহকারে শুনতেন। তিনি কথা কম বলতেন, শুনতেন বেশি। যখনই কোন সভা-সমিতিতে যোগদান করতেন, কখনও নিজে কিছু বলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন না, যতক্ষণ না সকলেই

তাঁকে কিছু বলার জন্য বিশেষ অনুরোধ-উপরোধ করতেন, কিন্তু যখনই যা কিছুই বলতেন, সত্য ব্যতীত কিছুই বলতেন না, তিনি হাসতেন তবে জোরে নয় বরং মৃদু, যখন কোন কিছুতে রাগান্বিত হতেন তখন রাগ প্রশমিত করতেন। এমনকি মাঝো মধ্যে ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হয়ে উঠত। তাঁর মন ছিল আকাশের মতো উদার। জীবনে কোনদিন কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি। দানে-ধ্যানে-জ্ঞানে বিচারে-আচারে তিনিই ছিলেন তাঁর দৃষ্টান্ত। তাঁর পরিকল্পনা-শক্তি ছিল যেমন অসাধারণ, তাঁর সংকল্পও ছিল তেমনি সুদৃঢ়। যে কোন ন্যায় ও সত্য পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে তিনি কোন বাধাকেই বরদাস্ত করতেন না। এই সমস্ত অসাধারণ গুণরাশিই তাঁর শত্রুকে করেছিল তাঁর কাছে দুর্বল, হীন এবং তাঁকে করেছিল অজাতশত্রু। এই সমস্ত গুণরাশি বিবি খাদিজা ছাড়া আর কেউই বিশেষ লক্ষ্য করতেন না। হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর গুণরাশিই তাঁকে 'মহম্মদ' করেছে। ওহী বহু পরে এসেছে।

পুতুল পুজোর বিরোধী চারজন ঃ কাবা গৃহে কালো পাথরের অবস্থান, ফিজর যুদ্ধের করুণ কাহিনী ইত্যাদি ঘটনা বহু আরববাসীকেই চিন্তিত করে তুলেছিল—পুতুল পুজো একটা ভণ্ডামি ব্যতীত কিছুই না। কথিত আছে, কোন একদিন আরববাসীগণ একত্রিত হয় এবং তাদের মধ্যে চারজন প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে যে তারা পুতুল পুজো মানে না। তারা ছিল যায়েদ বিন-আমর, ওসমান বিন-হুয়াইরিস, আব্দুল্লাহ বিন-জাহাস, অরাকা বিন-নাওফল। তারা বলল—তোমাদের ভিত্তি কোন সত্যের ওপর নেই, বরং মিথ্যার ওপর কাজ করে যাচ্ছো। আমাদের কি প্রয়োজন আছে একটা পুতুলের সামনে হাজির হওয়ার, যে কারও কোন ভাল বা মন্দ কিছুই করার শক্তি রাখে না। অনুসন্ধান কর সত্যের।

এরপর অরাকা খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষা নেন। আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে আবিসিনিয়ায় গমন করেন। তিনিও সেখানে খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষা নেন ও পরলোকগমন করেন। তাঁর বিধবা পত্নী আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা পরবর্তীকালে হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে বিবাহ করেন। যায়েদ বিন-ওমর সিরিয়া ও ইরাকের পথে রওনা হয়ে যান এবং তিনি পরবর্তী জীবনে চিন্তার মুক্তি নিয়েই রয়ে যান। তিনি বলতেন—হে আল্লাহ্! কোন্ পথে পুজো করলে তুমি খুশি হবে তা যদি আমি জানতাম, আমি তাই করতাম, কিন্তু আমি তা জানি না।

ওসমান বিন হুয়াই-রিস বিবি খাদিজার আত্মীয় ছিলেন। পরে তিনি বাইজানটাইন চলে যান। সেখানে বাদশার খুব প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। তাঁর ইচ্ছা ছিল মক্কা বিজয়ের। কিন্তু তা হয়নি। তাঁকে বিষপান করানো হয়। এইভাবে চারজন পুতুল পুজোর বিরোধীগণের জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু বস্তুত তাঁরা তাঁদের চিন্তার ওপর কোন ফলশ্রুতি রেখে যেতে পারেননি।

বিবি খাদিজার সন্তান-সন্ততি ঃ যুগল দম্পতির বছরগুলো দ্রুত অতিবাহিত হতে থাকল। হযরত মহম্মদ (দঃ) প্রকৃত ভালবাসা লাভ করলেন বিবি খাদিজার কাছ থেকে। খাদিজা তাঁর জীবনের সমস্ত ধনসম্পদ এমনকি, তাঁর জীবনকেই হযরত মহম্মদ (সাঃ)-কে উৎসর্গ করলেন। এককথায় তাঁরা ছিলেন দুই দেহ, কিন্তু এক আত্মা। বিবি খাদিজার জীবিতকালে রসুলুল্লাহ (দঃ) আর কোন বিয়ে করেননি।

সাধ্বী রমণী বিবি খাদিজা হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে তাঁর গর্ভজাত দুই পুত্র ও চার কন্যা উপহার দেন। পুত্রগণ—(১) কাসিম (২) আবদুল্লাহ। কন্যাগণ—(১) যয়নাব (২) রুকাইয়া (৩) উম্মে কুলসুম (৪) ফাতেমা। বিবি মারিয়ার গর্ভে জন্ম নেন হযরত ইব্রাহিম। তিনি শিশুকালেই মারা যান। হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির পরেই খাদিজার পুত্রদ্বয় তাদের শিশু অবস্থাতেই পরলোকগমন করে। এবং তাদের পিতা-মাতাকে তারা গভীর শোকাচ্ছন্ন করে রেখে যায়। কারণ নিশ্চয় পিতা-মাতা অতি স্বাভাবিকভাবে আশা করেছিলেন অন্তত একটা পুত্রসন্তান যেন থাকে তাঁদের ভাবী উত্তরাধিকারীরূপে। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর লীলা তা মেনে নেয়নি। তাঁরা যায়েদ বিন হারিসকে পোষ্য পুত্ররূপে লালন-পালন করেন। এই যায়েদ ছিল বিবি খাদিজার ক্রীতদাস। বিবি খাদিজা এই যায়েদকে দান করেন হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর হাতে। তিনি তাঁকে আপন পুত্রবৎ দেখতেন। লোকে বলত যায়েদ মহম্মদ (দঃ)-এর পুত্র।

মেয়েদের বিবাহিত জীবন ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা যয়নাবের বিবাহ হয় আবুল আস্ বিন রাবি বিন আব্দ্ শামস-এর সঙ্গে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যা রুকাইয়া ও কুলসুমের বিবাহ হয়—উৎবা ও উতাইবার সঙ্গে, যাঁরা ছিলেন আবু লাহাবের পুত্র। যখন হযরত মহম্মদ (দঃ) ইসলামধর্ম প্রচার করলেন, তখন আবু লাহাব তাঁর পুত্রদ্বয়কে বাধ্য করলেন তাঁদের স্ত্রীদের পরিত্যাগ করতে। ফলত এই দুই মেয়েরই একের পর এক ইসলাম-জগতের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান বিন আফ্ফানের সঙ্গে বিবাহ হয়। এইজন্য হযরত ওসমান (রাঃ)-কে জিন্নুরাইন (দ্বিজ্যোতিসম্পন্ন) বলা হয়। তিনি একের মৃত্যুতে অন্যকে বিবাহ করেছিলেন। সর্বকনিষ্ঠা কন্যা রমণী-জগতের রাণী বিবি ফাতেমা (রাঃ)-এর বিয়ে হয় আবু তালিবের পুত্র হযরত আলির সঙ্গে। বিবি ফাতেমাই ছিলেন তাঁর ভাইবোনদের মধ্যে একমাত্র সন্তান, যিনি তাঁর পিতার ওফাতের সময় জীবিত ছিলেন। তিনিও পিতার ওফাতে এতই আঘাত পান যে, ছয় মাসের মধ্যে পরলোকগমন করেন।

জগতের কোন কিছুই হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মনকে পরাভূত করতে পারেনি। কেননা, তাঁর মন ছিল সদাই ধ্যানমগ্ন, তিনি সবসময় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন সেই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড আল্লাহ্‌কে জানার উদ্দেশ্যে। অবিরাম সাধনায় স্রষ্টাকে জানার উদ্দেশ্যে তাঁর মন ছিল চির ব্যাকুল।

হিরা গুহায় মহম্মদ (দঃ) ঃ মক্কার দু' মাইল দূরে হিরা নামে একটি পাহাড় আছে। প্রতিবছর রমজান মাসে হযরত মহম্মদ (দঃ) এই পাহাড়ের ওপরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটাতেন। যে পাহাড়কে বর্তমানে জাবলে-নূর (আলোর পাহাড়) বলা হয়। হযরত মহম্মদ (দঃ) সেখানে উপবাস করতেন, প্রার্থনা করতেন। এই উপাসনা এতই উচ্চ মার্গের হতো যে তিনি সবকিছু ভুলে যেতেন। এমনকি নিজেকেও। এই ধ্যানে তিনি জাগতিক কোন কিছুই পেতে চাননি, চেয়েছেন শুধু মহাসত্যের উপলব্ধি জ্ঞান, সত্যজ্ঞান লাভ। কে এই জগৎ চরাচরের স্রষ্টা, কে এই আকাশ, পাতাল, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রকে সৃষ্টি করলেন? কে এদের নির্ধারিত গতিপথে চলার ইঙ্গিত দান করলেন? কে এই দিন ও রাত্রির সৃজনকারী, কে এই বৃক্ষের পূর্বে তার বীজকে সৃজন করলেন, কে এই মুরগির পূর্বে তার

ডিমের আবির্ভাব ঘটালেন? এদের কে আগে, কে পরে, কে মানুষের আদি জন্মদাতা? কেন মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ? সেই জীবশ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য কি? নানা জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে নিয়ত অস্থির করে তুলত।

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর অন্তরে এই যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উদ্ভাসিত হতো, নিশ্চয় তা আল্লাহ্র অপার মহিমা হতেই তাঁর অন্তরে স্বতঃ উৎসারিত হতো। যথেষ্ট উত্তর মিলত না। কেননা, আল্লাহ্র তরফ হতে উত্তর তখনও সরাসরি আসতে শুরু হয়নি। তিনি চিন্তা করতেন মানুষ জন্মগ্রহণ করে আবার মৃত্যুবরণ করেন। মানুষ এসব এড়িয়ে যেতে পারে না। আবার সূর্য চন্দ্র নক্ষত্ররাজি এমন একটা বিরামবিহীন গতিতে পরিভ্রমণ করছে, সেখানে কোন ছেদ নেই। অমান্যের কোন অধিকার নেই। কার অমিত ইচ্ছায় তারা বিরামবিহীনভাবে কর্মরত। পুতুল তো এই সমস্তের কিছুই পারে না। তবে কেন সে পূজ্য?

খ্রীস্টানগণ তাঁদের নবীকে নবী-জননীকে দেব-দেবী বানিয়ে বসল। কখনও বা আল্লাহ্র পুত্র বানিয়ে ছাড়ল। ইহুদীগণও তাদের পুরোহিতগণকে দেবতা বানাল। কিন্তু মরণশীল মানুষ কখনও দেবতা হতে পারে না। হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর হিরা গুহা সাধনার এই আত্ম-জিজ্ঞাসায় বিভোর থাকেন। বাহ্যিক জগতে এর কোন উত্তর তিনি পেতেন না। তখন মন তাঁর ছুটত অন্তর-জগতে। সেখানে তিনি নির্বাক হতেন। কিন্তু তিনি অদম্য অজেয় শক্তিধর পুরুষ। তিনি প্রতি বছর রমজান মাসে এ জীবন-জিজ্ঞাসার কঠিন সাধনা চালিয়ে যেতেন।

তিনি বারবার এসব প্রশ্নের উত্তরে নিরাশ হতেন, কিন্তু কি যেন কোথা থেকে তাঁকে আবার ওই একই পথে নিয়ে যেতো। শুধুমাত্র রমজান মাসেই যে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন তা নয়। ধীরে ধীরে সমগ্র জীবনটাই ওই পথে প্রবাহিত হতে থাকল। পরিশেষে তিনি কিছু কিছু আলো পেতে থাকলেন। এই বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নানা স্বপ্ন দেখতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলো বর্তমান জগৎ সম্পর্কে স্বপ্ন দেখেন, যা ঘটেনি, কিন্তু ঘটার পথে। তিনি ওই সব কথা বিবি খাদিজার কাছে বর্ণনা করতেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিবি খাদিজা ওগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখতেন। খাদিজার বিশ্বাস এরূপভাবে প্রগাঢ় হয়ে উঠল যে, তিনি তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে উৎসাহই দিতেন। এতে হযরত মহম্মদ (দঃ) আত্মজিজ্ঞাসা ও মহাসত্যের সন্ধানে নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করতে প্রেরণা পেতেন।

যখন তাঁর বয়স ৪০ বছর তিনি আপন মনে একটা আস্থার সন্ধান পেতে থাকলেন। আত্মবিশ্বাস বা মনোবল তাঁকে উৎসাহিত করত মানবমণ্ডলীকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য। কিন্তু তিনি জানতেন না তা কিভাবে সম্ভব। তিনি তাঁর উপবাস ও সাধনার মাত্রা বাড়াতে থাকলেন। হিরা গুহা ছাড়াও দীর্ঘদিন তিনি মুক্ত মরুভূমির নানা স্থানে পরিভ্রমণ করতেন, আবার ফিরে আসতেন হিরা গুহায়। ধীরভাবে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর এই ধ্যানমগ্ন পরিভ্রমণ মাঝে মাঝে ছয় মাস পর্যন্ত চলতে থাকত। পরে ফিরে আসতেন প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজার নিকট। তাঁকে বলতেন নানা দুর্যোগ ও দুর্ভোগের কথা, নানা ভয়ের কথা। কিন্তু কোথাও তিনি এতটুকুও ভয় পেতেন না। কেননা তাঁর মতো পবিত্র উজ্জ্বলতম ব্যক্তিকে কোন শয়তানই স্পর্শ করতে পারে না।

দ্বীনের নবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর আল্লাহ্‌কে সরাসরি পাওয়ার পূর্বে তাঁর ধ্যানের প্রকৃতি কেমন ছিল, ওহী নাজেলের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন্ ধরনের সাধনা করতেন, যে সাধনা তাঁকে সরাসরি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে হাজির করল? মনে রাখতে হবে সোপান ব্যতীত যে কোন সাধনার সৌধে ওঠা যায় না।

করেছ ধৈর্যের সাথে অন্তহীন ধ্যান
পেয়েছ নিখিলজোড়া আদি-অন্ত জ্ঞান। —কাব্যকানন

ইসলাম ধর্মের মহান কাণ্ডারী হযরত মহম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌কে লাভ করলেন—তাঁর অনন্ত মহিমার দিকে তাকিয়ে, বিশ্ব-জগতের প্রতি তাকিয়ে, মানবতার মহান কর্তব্যকে স্মরণ করে জীবন-জিজ্ঞাসায় ; আর তাঁর প্রায় শিষ্যরা আল্লাহ্‌কে পেতে চান কেবলমাত্র কয়েকবার প্রাণহীন অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে, এটা কি আদৌ সম্ভব!

যে জন অক্ষম এই জীবন-জিজ্ঞাসায়,
পড়ে না তাহার মন প্রভু মহিমায়।

বহুদিন পর ভারত-পথিক স্বামী বিবেকানন্দ বললেন ঃ

"বহু রূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর।"

বিশ্বনবীর জীবন, তাঁর চরিত্র কেমন ছিল পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরামগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মা আয়েশা (রাঃ) সংক্ষেপে পূর্ণাঙ্গ জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন—'আল-কোরআনই তাঁর জীবন, তাঁর চরিত্র।' তাই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বলন্ত উদাহরণসহ সঠিক পথনির্দেশ পাওয়ার লক্ষ্যে নবী জীবনের চর্চা সমাজে, পরিবারে ও আপন জীবনে যত বেশি হয় ততই মঙ্গল।

সে চর্চা আমাদের দেশে হয় ; বোধ করি অন্য সব দেশ অপেক্ষা বেশিই হয়। কিন্তু সে সঙ্গে একথা বললেও বোধহয় অধিক হবে না যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দুনিয়ার যে কোন জাতির চেয়ে বিশ্বনবীর সঙ্গে আমাদেব অসঙ্গতি সবচেয়ে বেশি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় যে কোন দিকেই তাকানো যাক না কেন, এই অসঙ্গতি ও বৈপরীত্যের অসংখ্য নজির অহরহই প্রত্যক্ষ করা যাবে। জ্ঞান, বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে আমাদের তফাত ও ফারাক এতো বেশি যে, কেউ যদি কেবল আমাদের নিত্য-দিনকার কাজগুলো দেখত আর কোন কথা শুনতে না পেত তাহলে অন্যে যাই ভাবুক না কেন, আমরা যে বিশ্বনবীর উম্মত একথা অন্তত ভাবতে পারত না। অথচ ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যার অবস্থান ভাবলোকের চেয়ে কর্মজগতেই বেশি প্রকট। ইসলামের স্রষ্টা যেমন নির্গুণ নয় বরং সর্বগুণের আকর ও আধার তেমনি ইসলামের অনুগামীদের পরিচয় ফুটে উঠবে তার কথায় নয়, কাজের মধ্য দিয়ে। বিশ্বনবীর প্রতি যতটা মহব্বত বা ভালবাসা, ইসলামের প্রতি যতটা আনুগত্য আমরা কথায় প্রকাশ করি, কাজে যদি তার আংশিক প্রতিফলন ঘটত তাহলে আমাদের সমাজের তথা রাষ্ট্রের চেহারাটাই ভিন্ন হতো। তাই আজ বলতে হয় কোথায় বিশ্বনবী আর কোথায় তাঁর অনুসারী বলে দাবিদার এই আমরা। বিশ্বনবী যেমন উপদেশ দিয়েছেন ঠিক সঙ্গে সঙ্গে

নিজের জীবনে তা বাস্তবায়িত করে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন সবার সামনে। বস্তুত আচরণের মধ্য দিয়ে চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার দ্বারাই সত্যিকারভাবে আকর্ষণ করা যায় কোন আদর্শের প্রতি। দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিশ্বনবী দুর্বার গতি সৃষ্টি করেছিলেন ইসলামের প্রতি। তাঁর অনুগামীদের কাছ থেকে লাভ করেছেন এমন অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আনুগত্য যে, দুনিয়ার কোন ধর্মগুরু নেতা, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু বা কোন ব্যক্তিই যা কোন দিন লাভ করেননি। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কুরাইশপক্ষের আলোচনাকারী আরওয়া বিশ্বনবীর কাছ থেকে ফিরে গিয়ে তাঁর দলের লোকেদের নিকট বলেছিলেন, "আমি পারস্যের সম্রাট, রোমের হেরাক্লিয়াস ও আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীকে দেখেছি। দেখেছি, তাদের প্রতি তাদের প্রজাদের আচরণ। কিন্তু মহম্মদের প্রতি তাঁর অনুগামীরা যে ভালবাসা, আনুগত্য ও মর্যাদার সঙ্গে আচরণ করেন তেমন আচরণ কোন নেতা বা রাজার ক্ষেত্রে দেখিনি কোথাও।"

প্রথম ওহী ঃ একদা হযরত মহম্মদ (দঃ) যখন হিরা গুহায় ধ্যানস্থ অবস্থায়, তখন কে যেন এসে তাঁকে বললেন পড়তে বা আবৃত্তি করতে। মহম্মদ (দঃ) উত্তর দিলেন—"আমি পড়তে জানি না।" তখন তিনি অনুভব করলেন, কে যেন তাঁকে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতো জোরে যে তাঁর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো এবং তখন তিনি ছেড়ে দিলেন। এবং আবার আদেশ করলেন—"পড়ুন।" মহম্মদ (দঃ) বললেন—"আমি পড়তে জানি না।" তখন তিনি আবার তাঁকে ওইভাবে আলিঙ্গন করলেন। এবং একই নির্দেশ—"পড়ুন।" হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে এইভাবে তৃতীয়বার আলিঙ্গন করতে তাঁর অন্তর্লোক ভাস্বর হয়ে উঠল এবং বললেন—"আমি কি পড়ব?" তখন তিনি বললেন—"তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে পাঠ কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন—মানুষকে, জমাট রক্তপিণ্ড হতে সৃষ্টি করেছেন। তুমি পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন—মানুষকে, যা সে জানত না।" কোরআন—৯৬ ঃ ১-৫

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন—"প্রথমে হযরত রসুলে খোদার ওপর যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তা ছিল তাঁর নিদ্রাযোগে সত্য স্বপ্ন।"—বুখারি, মুসলিম।

আরবী শব্দ "ইকরা"-র অর্থ উভয়ই হয়—পড়া এবং আবৃত্তি করা। যদি আমরা পড়া মনে করি তাহলে প্রশ্ন রয়ে যায় হযরত মহম্মদ্ (দঃ) পড়তে জানতেন না। আর যদি আবৃত্তি গ্রহণ করি তাহলে কোনই প্রশ্ন থাকে না। যাই হোক, হযরত (দঃ) যা শুনলেন তা-ই আবৃত্তি করলেন। এবং অদৃশ্য পুরুষ চলে গেলেন। শব্দগুলো যেন তাঁর অন্তরে গ্রথিত হয়ে গেল। কিন্তু যখন তিনি পূর্ণভাবে জাগরিত হলেন—দেখলেন কেউই নেই। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল—কোথায় তিনি, যিনি তাঁকে ওই শব্দগুলো আবৃত্তি করতে বললেন। এবং তিনি কে? এই প্রশ্নের কোন ব্যাখ্যা পেলেন না। সুতরাং তিনি এটাকে স্বপ্ন ধরে নিলেন। যদিও মনে মনে জানলেন এটা স্বপ্ন নয়, তাঁর অনন্ত জীবন-জিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষ উত্তর। যদিও তিনি তথায় কাউকে দেখতে পেলেন না, তবুও মহামানব মহম্মদ (দঃ) সেখানে রয়ে গেলেন। যখন তিনি একেবারেই নিশ্চিত হলেন এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলতে কেউই নেই, তখন তিনি দ্রুত নির্গত হলেন। এবং আবৃত্তি করতে থাকলেন

ওই পবিত্র কথাগুলো এবং নিজেকে কঠোরভাবে প্রশ্ন করতে থাকলেন কোথায় কে? হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন একটা শব্দ। মাথা তুললেন আকাশের দিকে। তিনি দেখতে পেলেন সেই অদৃশ্যকে মানবাকারে মধ্যগগনে। তিনি আবার দেখলেন, ওই একই দৃশ্য। শুনলেন একই শব্দ। এবং তিনি ওইখানেই রয়ে গেলেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) একজনকে পাঠালেন তাঁর নিকট। কিন্তু সে লোক হিরা গুহায় কাউকে দেখতে পেল না। যখন সেই অদৃশ্য লোক সেখান হতে অন্তর্ধান হলেন তখন হযরত মহম্মদ (দঃ) বিবি খাদিজার নিকট ফিরে এলেন। তখন তাঁর অন্তর আলোড়িত। প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাকে বললেন— "আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর।" বিবি খাদিজা তাঁকে আবৃত কবলেন। তিনি এমন এক কম্পনের মধ্যে ছিলেন মনে হয়েছিল তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর ভয়ভীতি সমস্ত দূর হয়ে গেল। তিনি যেন বিচলিত নয়নে তাকালেন বিবি খাদিজার প্রতি। বিবি খাদিজা যেন তাঁকে কিছু সাহায্য করবেন। "হে খাদিজা, তুমি কি জান, আমার কি হযেছে" এবং তিনি সমস্ত কথা খাদিজাকে বললেন। এই কথা শুনে বিবি খাদিজার কোন ভয বা সন্দেহের উদ্রেক হলো না। (মধ্যগগনে অদৃশ্যকে মানবাকাবে দেখা নিয়ে মতান্তব আছে)

কুরাইশ বংশেব উৎপত্তি বা প্রথম ব্যক্তি ছিল কুশাই। এই কুশাই গোত্রের লোক ছিলেন হযরত মহম্মদ (দঃ) ও বিবি খাদিজা উভয়েই। তাই বিবি খাদিজা এইভাবে সম্বোধন করে বলে উঠলেন—"হে আমার পিতৃব্যের পুত্র, শান্ত হোন, শক্ত হোন, আমি তাঁর নামে শপথ করে বলছি—যাঁর হাতে খাদিজার জীবন, আমি দৃঢভাবে আশা করি, আপনি মানবমণ্ডলীর নবী হতে চলেছেন। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি তিনি আপনাকে কোনদিন অসম্মানিত অবস্থায় ত্যাগ করবেন না—যিনি জীবনে সকল আত্মীয়-স্বজনকে সমভাবে আদর করেন, যিনি জীবনে মিথ্যা কথা বলেন না, যিনি দীন-দুঃখীর বোঝা নিজে বহন করেন, যিনি মানুষকে বিপদে সাহায্য করেন।"

এই কঠিন সময়ে বিবি খাদিজার এহেন সান্ত্বনায় হযরত মহম্মদ (দঃ) অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তবে তিনি অতান্ত ক্লান্ত বোধ করেছিলেন তাই ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন উঠলেন তখন আর সেই মহম্মদ নেই। এখন তিনি অন্য মানুষ, "আমি তোমাদেরই মতো মানুষ, তবে আমার প্রতি আল্লাহর ওহী এসেছে"। এখন জানতে পারলেন বিশ্বপ্রভুকে। এখন তিনি তাঁর বিশেষ দূত। এই দূতের কাজ তিনি ততক্ষণ করে যাবেন, যতক্ষণ না সেই এক অদ্বিতীয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ১৮ ঃ ১০৯, ১১০, ৪১ ঃ ৬

প্রথম ওহীর রহস্য পর্যালোচনা ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) চিরদিনই উদ্‌গ্রীব ছিলেন শুধু অজানাকে জানতে—এই বিশ্ব-জগতের অন্তরালে কি রহস্য বা কোন সত্য নিহিত আছে। এবং তাঁর প্রতি যে প্রথম ওহী, তা ছিল তাঁর ওই জানার প্রথম সোপান।

তিনি আদি রহস্যের মূল সত্য সম্পর্কে জানলেন তাঁর প্রভু বা প্রতিপালককে। আরবীতে যাকে বলা হয় 'রব'। যিনি একদিকে স্রষ্টা ও অন্যদিকে সারা বিশ্বের পালক, সেই প্রতিপালকের নামেই তাঁর জানার বা শিক্ষার প্রথম সোপান। "আদি রহস্যের অন্তরালে বসিয়া চির সুন্দর, নবীর বুকে দিয়েছ গতি রাখো নি কোন বন্দর।"

মানুষের স্রষ্টা মহানকে জানতে বা বুঝতে প্রথমে মানুষকেই জানতে হবে। তাছাড়া মহানকে জানার অন্য কোন পথ বা পন্থা নেই। মানুষের স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করলেন একটা রক্তপিণ্ড হতে, যা অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু হতে পৃথক।

যে সৃষ্টি হবে মহান স্রষ্টার একান্ত প্রতিনিধি, যাঁর থাকবে বিবেক নামে এক মহাবস্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে, তার থাকবে জ্ঞান ধ্যান বুদ্ধি বিবেচনা ইত্যাদি। যেগুলো তাকে পৃথক করবে অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু হতে। এবং এই জ্ঞানার্জনের পথে কলমই হবে তার প্রথম বা প্রধান বাহন। যতক্ষণ মানুষ কলম ধরতে না শেখে ততক্ষণ সে জগতে তার জ্ঞান-গরিমার কিছু দিতে পারে না। এখানে স্রষ্টার প্রথম গুণ হিসাবে মানুষ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট হতে যা পেল, সেটা তাঁর উদারতা, বদান্যতা। অর্থাৎ পাপী-তাপী সকলকেই তিনি প্রতিপালন করেছেন। তাঁর স্নেহের দৃষ্টি হতে কেউই দূরে না। সুতরাং ইসলামধর্মের আধ্যাত্মিকতার ক্রমোন্নতির পথে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনের শুভ মুহূর্তে যে দুটো জিনিস সর্বপ্রথম নজর কাড়ল তা "জ্ঞান ও উদারতা", যে দুটোর ওপর ইসলাম জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। এই জ্ঞান সম্পর্কে হযরত মহম্মদ (দঃ) বলেন—"তালাবুল ইলমু ফারিজাতুন আলা কুল্লে মুসলেমিন ওয়া মুসলেমাতিন।" জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরজ বা অতি অবশ্যই কর্তব্য। উদারতা সম্পর্কে দানশীলতা সম্পর্কে আল-কোরআনে সূরা রহমান কত সুন্দরভাবেই মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে, "পরম দয়ালু, তিনিই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে ভাব প্রকাশের মাধ্যম ভাষা শিখিয়েছেন।"

কোরআন—৫৫ ঃ ১-২৪

এই জ্ঞান সম্পর্কে মানুষ যাতে সচেতন হয় তার জন্য কোরআন মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে ঃ "রাব্বে যিদ্‌নি ইল্‌মান"— কোরআন—২০ ঃ ১১৪

মাগিছি কাতর প্রাণে করুণা তোমার,
বৃদ্ধি কর বিদ্যাবল হে প্রভু আমার।"

এই জ্ঞান দু' প্রকারের। একপ্রকার যা মানুষ তার সাধনা দ্বারা, অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জন করতে পারে। অন্য প্রকার যেটা মানুষ আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ ছাড়া লাভ করতে পারে না। সেখানে দরকার "এলমে লাদুন্নি"—আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞান। ১৮ ঃ ৬৫। তাই কোরআন প্রথমেই বলছে—"তিনি মানুষকে শিক্ষা দেন যা সে জানে না।"

একমাত্র আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান ব্যতীত আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন জ্ঞানীর পক্ষে জানা কি সম্ভব হয়েছে মৃত্যুর পর তাঁর জীবনে কি ঘটনা ঘটতে চলেছে? কোরআন সেই মহাগ্রন্থ যা মানুষকে সেই জ্ঞান দিতে পারে, যার মাধ্যমে সে তার অখণ্ড জীবনের প্রস্তুতি নিতে পারে। মানুষ এই জীবনে প্রস্তুতি নেবে তার পরজীবনের। এবং এই জীবনেই নির্ভর করছে তার পরজীবন কিসের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়াচ্ছে। এখানে সে যে বীজ রোপণ করবে ওখানে তাই ঐ বৃক্ষরূপে দেখা দেবে।

মহান স্রষ্টা অতি দয়ালু। তিনি মানুষকে এখানে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন—যেন সে তার আপন প্রস্তুতিতে ওপারে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারে। তাই মৃত্যু মানুষের জীবনের সমাপ্তি নয়, স্থানান্তরণ। একটি সুন্দর কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মুহূর্তে আনন্দ পায় গিয়ে স্তনান্তরে"

মৃত্যু ঠিক যেন তাই।

আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞানভাণ্ডার কোরআন সব মানুষের কাছে উন্মুক্ত। এর জন্য মানুষকে কোন মাসুল দিতে হয় না। মাসুল যা দেওয়ার মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) সমগ্র জীবন ধরে দিয়ে গেছেন। এর জন্য দুটো জিনিসের প্রয়োজন। একটা তাঁর উদারতা, সংকীর্ণতা নয়। অন্যটি এক আল্লাহ্‌র প্রতি অগাধ বিশ্বাস। যে এটা করল সে নিজেকে রক্ষা করল, যে অমান্য করল সে নিজেকে ধ্বংস করল। স্বয়ং আল্লাহ্‌কে পেতে, জানতে মানুষকে নিয়েই প্রথম জ্ঞানান্বেষণ কেন?

দুর্জ্ঞেয় আল্লাহ্‌র স্থান দূর সীমানা
জানতে একের রূপ অজ্ঞাত অজানা
দিলেন দ্বীনের নবী অফুরন্ত আশা
বাড়াইয়া জীবনের জীবন জিজ্ঞাসা।
যে জন অক্ষম এই জীবন জিজ্ঞাসায়
পড়ে না তাহার মন প্রভু মহিমায়
জিজ্ঞাসা তোমাকে আর তোমার চিত্তকে
তুমি যে মানব সেই মানব বিত্তকে।
নিজেকে ভুলিয়া ভবে নহে শুধু ধ্যান
মহানে বুঝতে চায় মানবিক জ্ঞান
মানুষ হইতে তিনি দূরে নয় কভু
মানবের মাঝে আছে মানুষের প্রভু।
দেহ ও প্রাণের লীলা মানুষে যেমন
জগৎ প্রভুর কাছে জগৎ তেমন।
মোর প্রাণ শরীরের ক্ষুদ্র সীমায়
তুমি আছ জগতের অখণ্ড লীলায়
তোমার শরীর এক অখণ্ড জগৎ
তারই মাঝে মোব দেহ অতি তৃণবৎ।
মোর দেহ তব দেহে জগৎ কায়া
সেই দেহে মোর প্রাণ সে তব ছায়া।
মোর দেহ মোর প্রাণ মোর পরমায়ু
তোমারই শরীর মাঝে তোমারই স্নায়ু।
পূরণ কবিয়া সব প্রাণের দাবি
চিনিতে দিলেন নবী চেনার চাবি—
"যে চিনেছে আপনার আপন আত্মারে
চিনেছে অদৃশ্যময় মহান আল্লাহ্‌রে।" —হাদিস

—কাব্যকানন

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ব্রত ঃ প্রথম ছয় বছর

মহানবীর মক্কার জীবনে নবুয়তের পর হিযরত পর্যন্ত প্রধান ঘটনারাশি ঃ হিরা গুহা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত মহম্মদ (দঃ) ঘুমন্ত এবং বিবি খাদিজা (রাঃ) জাগ্রত। এ সময়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন, যা তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে শুনেছিলেন তাই নিয়ে। দীর্ঘ পনেরো বছর তিনি তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে যেভাবে জানেন জগতের কারও পক্ষেই হযরতকে সেইভাবে জানা কোনদিনই সম্ভব হয়নি বা হবে না। কেননা বন্ধু জানল তাকে নবী হওয়ার পর, প্রতিবেশী জানল তাঁকে নবী হওয়ার পর, দেশ-বিদেশ জানল তাঁকে নবী হওযাব পর। সারা জাহান জানল তাঁকে নবী হওয়ার পর। কিন্তু তাঁর যে সাধনাব ওপর, যে গবেষণার ওপর, যে সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহ্ তাঁকে নবী করলেন, সেই ভিত্তিভূমিব রচনাকাল ও উপাদান সম্পর্কে বিবি খাদিজা ব্যতীত কেউই নেই, যিনি বেশি বলতে পারেন।

বিবি খাদিজা তখন তাঁকে লক্ষ্য কবেছিলেন—আববে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যাকে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে তুলনা কবা যেতে পারে। কি উদারতায়, কি বদান্যতায়, কি সত্যবাদিতায়, কি সততায়, কি দীন-দুঃখী-গরিবদের প্রতি সমবেদনায়। তিনি সবসময় মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে, অজ্ঞতা হতে জ্ঞানের দিকে, ঘৃণা হতে ভালবাসার দিকে, নশ্বর হতে অবিনশ্বরের দিকে নিতে চেয়েছিলেন।

প্রিয় স্বামীর প্রতি প্রথম ওহী আসার পর তিনি নিজেকে প্রিয়তম স্বামীর স্থলে বসিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকলেন, কে এই বার্তাবাহক? কে এই অবিনশ্বর স্বর্গীয় দূত? কে এই অদৃশ্য আত্মা, যিনি পৃথিবীর এই সুন্দব মানুষটির সঙ্গে অলৌকিক যোগাযোগ স্থাপন করেছেন সমস্ত মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। এই চিন্তা বিবি খাদিজাকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করে তুলত।

দীর্ঘ পনেরো বছর তিনি তাঁর জীবনকে লক্ষ্য করেছেন। বিবি খাদিজাব মনে এক প্রবল আলোড়ন দেখা দিল। তিনি নিশ্চিতভাবে জানলেন, তাঁর স্বামী সাধারণ মানুষ নন। শুধু যে জানলেন তা নয়, তাঁর অসাধারণত্বের দামও দিতে থাকলেন। স্বামীর জীবনের সামান্যতম ক্ষতিকে তিনি তাঁর জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে করতেন।

তিনি নতুনভাবে চিন্তা করতে লাগলেন—তাঁর প্রিয় স্বামী তাঁকে যা বললেন সেগুলো কি কুরাইশদের বলবেন, অথবা কি করবেন? নিশ্চয় তিনি কোন জ্ঞানীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। পরিশেষে তিনি চিন্তা করলেন ওরাকা বিন-নাওফল, যিনি ছিলেন তাঁর আত্মীয়, পরে খ্রীস্টান হন, আরবের সেই জ্ঞানীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। প্রিয় স্বামীকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে তিনি ওরাকার নিকট গমন করলেন, তাকে সংক্ষেপে সবকিছুই বললেন। ওরাকা শুনে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং বললেন ঃ

"ও খাদিজা যিনি সকল পবিত্রের পবিত্রতম, যাঁর হাতে ওরাকার জীবন, যদি তুমি আমাকে সত্য কথা বলে থাক, তাহলে বিশ্বের নববিধান এসেছে তাঁর প্রতি, যা এসেছিল হযরত মুসার প্রতি, নিশ্চয় তিনি মানবমণ্ডলীর নবী হতে চলেছেন তাঁকে বল দৃঢ় থাকতে।"

বিবি খাদিজা অতি দ্রুত বাড়ি ফিরলেন, দেখলেন প্রিয়তম স্বামী তখনও নিদ্রিত। তিনি যেন তাঁকে আজ আর একবার নতুনভাবে বরণ করলেন নতুন আশা-উদ্দীপনা ও গভীর অনুরাগ-সহ। কোন নবী এরূপ স্ত্রী পেয়েছেন কিনা সন্দেহ, বিবি খাদিজা ছিলেন তাঁর পূর্ণ জীবনসঙ্গিনী। তিনি তাঁর প্রতি কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। হঠাৎ হযরত মহম্মদ (দঃ) উত্তেজিত অবস্থায় উঠে পড়লেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকল। কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকল। তিনি উঠে বসলেন এবং আবৃত্তি করতে থাকলেন। বিবি খাদিজা শুনলেন—

"হে মোদাচ্ছের (বসনাবৃত), ওঠ, এবং সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের মহিমা ঘোষণা কর, তোমার পোশাক পবিত্র কর, অপবিত্র হতে দূরে থাক, অধিক পাওয়ার আশায় অন্যকে কিছু দিও না। তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে ধৈর্য ধারণ কর।"

কোরআন—৭৪ ঃ ১-৭

বিবি খাদিজা তাঁর কাছে ফিরে এসেছিলেন অফুরন্ত অনুরাগ ও আনন্দ-উচ্ছ্বাস নিয়ে এবং তাঁকে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ও বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করছিলেন। তখন তিনি তাঁকে উত্তরে বলছিলেন—হে খাদিজা, ঘুমের ও বিশ্রামের সময় শেষ হয়ে গেছে। ফেরেশ্‌তা জিবরাইল আমাকে বলেছেন—মানুষকে সতর্ক করতে। তাদের আল্লাহর দিকে এবং তাঁর আরাধনার দিকে আহ্বান করতে। কাকে আমি ডাকব, কে আমার ডাকে সাড়া দেবে। তখন বিবি খাদিজা সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন—"এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই ও হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর রসুল বা প্রেরিত পুরুষ।" এবং জ্ঞাত করলেন ওরাকার সঙ্গে তাঁর সমস্ত কথোপকথন। সুখের বিষয় বিবি খাদিজা আগাগোড়াই পুতুল পুজোর ঊর্ধ্বে ছিলেন।

এরপর হতে যখনই ফেরেশ্‌তা জিবরাইল আসতেন, বিবি খাদিজা নবীর কষ্ট লাঘবে সাহায্য করতেন। যেহেতু তিনিই ছিলেন তাঁর ওহীর একপ্রকার সাক্ষাৎ সাক্ষী।

কয়েকদিন পর হযরত মহম্মদ (দঃ) কাবার পথে রওনা হলেন। এবং সেখানে ওরাকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। যখন হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁকে সব কথাই বললেন, তখন ওরাকা বললেন ঃ

"যাঁর হাতে ওরাকার জীবন, আপনার প্রতি এসেছে বিশ্ববিধান ও আদেশ ; যা এসেছিল হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি এবং নিশ্চয় তাঁর কওম তাঁকে মিথ্যাবাদী ভেবেছিল, তাঁর ক্ষতি করেছিল, তাঁকে নির্বাসিত করেছিল, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। নিশ্চয় আমি আপনাকে সাহায্য করতাম, যদি সেদিন পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, যেদিন আপনার দেশবাসী আপনাকে নির্বাসিত করবে।"

এরপর ওরাকা মহম্মদ (দঃ)-এর সম্মতিতে তার মাথায় চুম্বন করলেন। ওরাকা যা কিছু বললেন, তাতে হযরত মহম্মদ (দঃ) একমত হলেন এবং বুঝতে পারলেন তাঁর কাজ কত

কঠিন। তিনি আপন মনে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন কিভাবে একটি জাতিকে পরিবর্তনের পথে আনবেন, যারা সবসময় মদ্যপ, জুয়ায় আসক্ত, খুন-খারাবি, লুঠতরাজ করে আর অহঙ্কারে মত্ত থাকে। কি করে তিনি ওইরূপ একটি জাতিকে পাথর, প্রতীক, পুতুল ইত্যাদির পুজো হতে দুরে আনবেন। যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে তাদের পূর্বপুরুষগণ পুতুল পুজো করে আসছে, যদিও তিনি তখনও পর্যন্ত জানতেন না, তাঁর পূর্বের নবীগণ কত কঠিন পরীক্ষাব ভিতর দিয়ে অতিক্রম করেছেন। কিন্তু ওরাকার কথা কানে হামেশাই নীরবে বাজতে থাকল। "তারা তোমাকে অবিশ্বাস করবে, তোমার ক্ষতি করবে। তোমাকে নির্বাসনদণ্ড দেবে, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে।"

বিবি খাদিজা সবসময় ছিলেন তাঁর প্রেরণাদাত্রী। তিনি ছিলেন ধনী ও গুণী অসাধারণ মহিলা। প্রথম ওহী আসার পর বেশ কিছুদিন ওহী আসা বন্ধ ছিল। তখন বিবি খাদিজা অহরহ কামনা করতেন যাতে তাড়াতাড়ি আবার স্বর্গীয় বাণীতে তাঁর স্বামীর চিত্ত ভরপুর হয়ে ওঠে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী আল্লাহ্ কখন পাঠাবেন, তিনিই জানেন। এই মধ্যবর্তী সময়ে এক এক ঘণ্টাকে হযরতের কাছে মনে হতো এক-একটি দিন। দিনকে মনে হতো বছর। এই মধ্যবর্তী সময়টা এক সপ্তাহের মত ছিল। কিন্তু হযরতের কাছে যুগ-যুগান্তর মনে হতো। কেননা মানুষ চিরদিনই মানুষ, তার আছে শোক-দুঃখ এবং নানা দুর্ভাবনা। হযরতের জীবনেও এর কোন ব্যতিক্রম ছিল না। তবে তাঁর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য ছিল একটিই— তাঁর জীবনে আল্লাহ্‌র বাণী তার প্রকৃত স্বরূপে প্রকাশিত তাই তিনি নবী মহম্মদ (দঃ)।

ভাবনাবিহীন ভয়ের ও আনন্দের কোন মূল্য নেই। তাই সুকঠিন সাধনা ও কঠোর কর্তব্যের পথে তিনি পেয়েছিলেন অপরিসীম আনন্দ—আল্লাহ্‌র ওহীর মাধ্যমে। এই ওহী যখন সপ্তাহখানেকের জন্য বন্ধ ছিল, তখন তাঁর মানব-হৃদয় নানা ভাবনা-চিন্তায় অধীর হয়ে উঠেছিল। পাছে মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন, পাছে তিনি তাঁকে ত্যাগ করেন, কেননা প্রত্যেক প্রেমিকই তাঁর প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে এরূপ চিন্তাই করে থাকেন। পরিস্থিতি এরূপ ভয়াবহ ছিল যে তিনি নিজে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারতেন না। বিবি খাদিজা তাঁকে এই কঠিন সময়ে সান্ত্বনা দিতেন—"আল্লাহ্ তোমাকে কখনও ত্যাগ করবেন না। তিনি তোমাকে নিশ্চয় সাহায্য করবেন।" যদিও হযরতের এতে কোন সন্দেহ ছিল না, তবুও তাঁর উদ্বেগের সীমা ছিল না। আবার উদ্বেগ যত বেশি ছিল, তাঁর আনন্দও তত বেশি হতো যখন তিনি পেতেন আল্লাহ্‌র অসীম আশ্বাস। হযরতের জীবনের এই অসাধারণ ধৈর্য ও অভাবনীয় অধ্যবসায় তাঁকে তাঁর সাধনায় দিয়েছে চরম সফলতা। সাধারণ মানুষের জীবনে তাঁর আদর্শ অনুকরণযোগ্য ও শিক্ষণীয়। যদিও হযরতের গভীর আস্থা ছিল, আল্লাহ্‌র দেওয়া গুরুদায়িত্ব বহন করার শক্তি তিনিই তাঁকে দান করবেন। তবে এটাও তিনি জানতেন, আল্লাহ্ তাঁকে পথের সন্ধান দেবেন, কিন্তু চলতে হবে তাঁকেই, প্রত্যেক নবীর জীবনেই তা ঘটেছে। তাই আল্লাহ্‌র বাণীকে প্রচার করতে অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো হযরতকে তাঁর আপন মানবিক শক্তিকেই প্রয়োগ করতে হয়েছে। তাই সেখানে বেধেছে সংগ্রাম। সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। উভয় পক্ষেই হয়েছে হতাহত। হযরত ছিলেন মানুষ। ভুল মানুষের চির সঙ্গী, ভ্রান্তি মানুষের চির সাথী। এই ভুল-ভ্রান্তির পথে আল্লাহ্ তাঁকে দিতেন নির্ভুল পথনির্দেশ।

যাতে তিনি মানবমণ্ডলীকে দিতে পারেন জীবন-পথের অন্তহীন নির্ভুল দিশা। এইজন্যই ওহী না আসার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি পথ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। হযরতের জীবন এমনই সংযত জীবন ছিল যে, অন্য কোন মানুষের সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না। কেননা হযরতের ওপর যে বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল আজ পর্যন্ত কোন নবী বা মানুষের ওপর তা অর্পিত হয়নি। তাই ওই গুরুদায়িত্ব বহনের শক্তিও তাঁর দরকার ছিল। তখন হযরত নিজে নিজেকেই যেন বলতেন—ওই পথ স্মরণ করে, "হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে জ্ঞান দান কর" এবং তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল ঃ

"শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর যখন তা নিস্তব্ধ হয়। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি তোমার প্রতি বিরূপও হননি। নিশ্চয় তোমার পরকাল (পরবর্তী জীবন) তো ইহকালের (প্রথম জীবন) অপেক্ষা শ্রেয়। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে এমন জিনিস দান করবেন, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি এবং তোমাকে আশ্রয় দান করেননি? তিনি তোমাকে পথহারা অবস্থায় পান, পরে পথ-নির্দেশ করেন। তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পান, পরে তোমাকে সম্পদশালী করেন। সুতরাং তুমি এতিমদের প্রতি কখনও কঠোর হয়ো না। সাহায্যপ্রার্থীকে ভর্ৎসনা করো না। তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

কোরআন—৯৩ ঃ ১-১১

এই সংবাদ একজন মানুষের পক্ষে অভাবনীয় সৌভাগ্যের প্রতীক। এই সংবাদ নজিরবিহীন, কেননা পৃথিবীর কোন মানুষ স্রষ্টার নিকট হতে এইরূপ আশা ও উদ্দীপনার বাণী লাভ করেননি।

তাই হযরত মহম্মদ (দঃ) নিজের ওপর নিজেই আজ পূর্ণ আস্থাবান। এতে মক্কাবাসীগণ তাঁকে অস্বীকারই করুক আর অপছন্দই করুক, তাতে কিছু আসে যায় না।

তাঁর ভবিষ্যৎ আজ স্বয়ং স্রষ্টার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে সম্মান যত বড় তার গুরুদায়িত্বও তত বিরাট। এবং হযরত মহম্মদ (দঃ) আজ সেই মহান দায়িত্ব বহনের জন্য বিপুলভাবে প্রস্তুত। আজ তাঁকে বিরাট বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ্ স্মরণ করিয়ে দিলেন—তিনি ছিলেন অনাথ, এতিম গরিব দরিদ্র। কিন্তু অতীতের সেইসব স্তরই আল্লাহ্ আপন করুণা বলে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। আবার সামনেও আসতে পারে কঠিন সংগ্রাম। সেখানেও আল্লাহ্ সহায় হবেন। কিন্তু সেই সহায়তা লাভের জন্য হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে হতে হবে আকাশের মতো উদার। বহন করতে হবে আল্লাহ্র মহান বাণী এবং সাহায্য অন্য কিছুই না, শুধু আল্লাহ্র বাণী।

এই বাণীটুকু পাওয়ার পর হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবনে কি অমানুষিক দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে তা তিনিই শুধু অনুধাবন করেছেন। রাজাবাদশার মতো রাজসিংহাসনে বসে হুকুম দিয়ে পার পাননি। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের তিক্ত স্বাদ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

"জীবন মন্থন বিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।"

প্রাণের বিনিময়েও তিনিই ছিলেন পবিত্র কোরআনের প্রথম প্রচারক ঃ

"হে রসুল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর, তুমি তাঁর বাণী প্রচার করলে না।" কোরআন—৫ ঃ ৬৭

হযরতের মন থেকে নানা চিন্তা-ভাবনা দূর হলো। আশঙ্কার অবসান হলো। বিবি খাদিজার আশ্বাসবাক্য, সান্ত্বনাবাক্য সত্যে পরিণত হলো। এবার প্রিয়তমা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে হযরতের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ঠিক এই মুহূর্ত হতে জীবনে কত ভীষণ ক্ষণ কত মহাসঙ্কট, কত বিভীষিকাময় পরিস্থিতি এসেছে, কিন্তু হযরত এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা হারাননি। ওই দিন হতে যে যা বলেছে, যে যা করেছে তাতে মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনে এতটুকুও এসে যায়নি। তিনি অটল ছিলেন, অবিচল ছিলেন। কেননা তিনি তখন তাঁর অতীতের জীবনকে আয়নার মতো সামনে দেখতে পেতেন। এতিম অবস্থায় কে রক্ষা করেছিলেন, নানা বিপর্যয়ে কে স্থান দিয়েছিলেন। বিরাট ধনীনন্দিনী সম্ভ্রান্ত আরব মহিলা বিবি খাদিজার অন্তরে কে প্রগাঢ় অনুরাগের সৃষ্টি করেছিলেন? হযরত আজ আপনাতে ও আল্লাহ্‌তে পূর্ণ আস্থাবান।

একদিকে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনের প্রতি আপন কর্তব্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা, অন্যদিকে বিরোধীগণের পূর্ণ অনাস্থা। এবার আস্থা ও অনাস্থার সংগ্রাম শুরু হলো। আলো ও অন্ধকারের যুদ্ধ—"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র জ্যোতি নির্বাপিত করতে ইচ্ছা করে, অবিশ্বাসীগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না। তিনিই স্বীয় রসুল (দূত)-কে সুপথ ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন। যেন তিনি একে সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করেন, যদিও এটি অবিশ্বাসীদের নিকট অপ্রীতিকর।" কোরআন—৯ ঃ ৩২-৩৩

হযরত মহম্মদ (দঃ) ও তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী বিবি খাদিজার অন্তরে আল্লাহ্‌তে সুদৃঢ় বিশ্বাস আজ পাথরের মতো, পাহাড়ের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তবুও শুধু বিশ্বাসে কাজ হয় না। ব্যক্তিজীবনে তার প্রয়োগের প্রয়োজন। যে কোন জিনিস তার প্রয়োগ ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই আজ প্রয়োগের পালা। পরীক্ষার পালা।

"হে মুযযাম্মিল (বস্ত্রাচ্ছাদিত) রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ কর—অর্ধরাত্রি অথবা তা অপেক্ষা কম বা বেশি। কোরআন ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে আবৃত্তি কর। অচিরেই আমি তোমার প্রতি গুরুত্বপূর্ণ বাণী অবতীর্ণ করছি। উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ ও একান্ত সংযম হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল।" কোরআন—৭৩ ঃ ১-৬

হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর প্রার্থনায় কোরআন আবৃত্তি করেন। বিবি খাদিজা তাঁকে অনুসরণ করতে থাকেন। এ যেন সত্য ও পবিত্রের মিলন। এবং স্বয়ং আল্লাহ্ তার সাক্ষী। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রতি পরবর্তীকালে সারা জাহানের যে আনুগত্যপূর্ণ বিশ্বাস, তার শুভ সূচনা আপন বাড়িতেই। প্রিয়তমা জীবন-সঙ্গিনী বিবি খাদিজা (রাঃ)-ই প্রথম মুসলমান হওয়ার চির গৌরব লাভ করেছেন। নির্জন ঘরে নিশীথ রাতে সমগ্র মক্কা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখন এই দুটি মানুষ একান্ত মনে আল্লাহ্‌র আরাধনায়

অবলুণ্ঠিত। মরুজগতের একজন বালকই এই গোপন প্রার্থনা অবলোকন করত। সেই বালক হযরত আলি (কঃ)।

হযরত আলি (কঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ আবু তালিব হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর চাচা এবং অভিভাবক। তাঁর ছিল তিন পুত্র। আলি, জাফর, আকিল। যদিও তিনি অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা ওই সময় মোটেই ভাল ছিল না। তাঁর ভার কিছুটা লাঘব করার জন্য মহম্মদ (দঃ) আলিকে নিজে গ্রহণ করেন এবং জাফরের ভার হযরত আব্বাসের ওপর ন্যস্ত করেন। সুতরাং এই সময় আলি হযরত মহম্মদ (দঃ) ও খাদিজার (রাঃ) কাছেই থাকতেন। একদা বালক আলি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা নতশিরে কার আরাধনা করেন? তখন হযরত (দঃ) বলেন—এক আল্লাহ্‌র, যিনি সকল কিছুরই স্রষ্টা, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন পিতামাতা বা পুত্রকন্যা নেই। তিনি জাগতিক সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। তিনি সকল মানুষের প্রতি পরমদয়ালু, দাতা। এবং হযরত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—সে কি তাঁকে বিশ্বাস করবে? বালক উত্তর দিল—"নিশ্চয় আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করব।" কিন্তু পরবর্তী সকালে সে উত্তর করল—"আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করার কিছুই নেই। আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা না করেই। তবে কেন আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করব আল্লাহর এবাদত (আরাধনা) করার জন্য।" এইভাবে বিবি খাদিজার পর আলিই প্রথম মুসলমান। পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

যায়েদের ইসলাম গ্রহণ ঃ হারিসের পুত্র যায়েদ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ভৃত্য ছিলেন, তিনি হযরত আলির পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনে পূর্বাভাসের বিরাট শুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল যে তাঁর অতি নিকটে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই প্রথম তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস আনলেন। তাঁরা পূর্ব হতেই মুগ্ধ ছিলেন হযরতের ব্যক্তিত্ব, সততা ও সাধুতায়। তাই বাড়ির সকলেই তাঁকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন সর্বপ্রথম। এইখানেই হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনের চরম সফলতার বীজ নিহিত ছিল। যখনই যে কোন লোক একবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তখনই সে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। তাঁর অতি বড় জঘন্যতম শত্রুও যখনই তাঁর পূর্ণ পরিচয় পেয়েছে বা কাছে এসেছে, তাঁর সততার ও সাধুতার প্রশংসা না করে পারেনি। তাঁর সমগ্র জীবনে এমন একটা দৃষ্টান্তও নেই, তাঁর সহচর তাঁকে ছেড়ে গেছে বা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, বরং তাঁর সহচররা তাঁর জন্য সম্পদ দিয়েছে, প্রয়োজনে বিনা দ্বিধায় জীবন দিয়েছে।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মহাব্রতের শুরুতেই কঠিন দিনগুলোতে তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু পান, তাঁর নাম হযরত আবুবকর বিন কুহাফা আল তাইয়িনী, তাঁরা সর্বদা একে অন্যের বাড়িতে যেতেন। আবুবকর (রাঃ) হযরতকে জানতেন একজন সৎ সাধু ও সত্যবাদী হিসাবে। হযরত আবুবকর (রাঃ) একজন ধনী বণিক ছিলেন। কুরাইশগণের মধ্যে আবুবকরের সামাজিক খ্যাতি ও প্রভাব ছিল অসাধারণ। তাঁকে যদিও আল্ আমিন বা চিরবিশ্বাসী উপাধি দেওয়া

হয়নি, তবুও তিনি ছিলেন হযরতের পরবর্তী ব্যক্তি। হযরত তাঁকে সিদ্দিক বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করেন।

হযরত তাঁর মহাব্রতের কথা কুরাইশ গোত্রের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য চিন্তা করতে থাকলেন। এবং এর জন্য দু'-একজনকে প্রতিনিধিরূপে মনে মনে স্থির করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন—হযরত আবুবকর (রাঃ)। তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে পূর্ণভাবে আপন আস্থাভাজন করে তোলেন। এবং তাঁকে সমস্ত কাহিনী বললেন—হিরা গুহার কাহিনী, আপন বাড়িতে ফেরেশ্‌তা জিবরাইলের আগমন, অতঃপর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা ইত্যাদি। এই সমস্ত কথা বলার পর তিনি হযরত আবুবকরকে প্রস্তাব দিলেন—এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করতে ও পুতুল পুজো পরিত্যাগ করতে। হযরত আবুবকর (রাঃ) এতটুকুও দ্বিধা না করেই সঙ্গে সঙ্গে হযরতের নিকট ইসলাম গ্রহণ করে হযরতের বাণীকে বিশ্বাস করে নিলেন। এই প্রসঙ্গে কোরআন শরীফে একটি সুন্দর আয়াত আছে—"যারা সত্য-সহ এসেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে, তারাই তো সাবধানী।"

কোরআন—৩৯ ঃ ৩৩

হযরত আবুবকর তাঁর আনুগত্যের কথা আল্লাহ্ এবং তাঁর দূতের নিকট জানালেন ও জানালেন তাঁর বন্ধুমহলে। তিনি ছিলেন আরবের অন্যতম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাই কোন ব্যক্তিই তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজ করত না। এইভাবে আরবের মহৎ ব্যক্তিগণ সকলেই প্রায় হযরত আবুবকরের দেখাদেখি 'ইসলাম' গ্রহণ করলেন। এখানে আবুবকর ছিলেন দূতের দূত। প্রথম তিনি যাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন তাঁদের নাম—(১) ওসমান বিন-আফফান, (২) আবদুর রহমান বিন-আউফ, (৩) তালহা বিন উবাই দুল্লাহ, (৪) সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, (৫) জুবাইর বিন-আওয়াম, (৬) উবাইদা বিন-জাররাহ।

প্রথম যুগে গোপনে ইসলামে দীক্ষাগ্রহণ ঃ যখনই হযরত আবুবকর (রাঃ) কাউকে ইসলামের মর্মবাণী বোঝাতে সক্ষম হতেন তখনই তিনি তাঁকে হযরতের নিকট নিয়ে আসতেন, সেখানে তিনি ইসলামে দাখিল হতেন। অতঃপর নবী মহম্মদ (দঃ) তাঁকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু ইসলামে দীক্ষিত মুসলমানগণের ওপর প্রথম যুগের প্রথম কর্তব্য ছিল সালাত বা 'নামায'। প্রথম যুগে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প, তাই তাঁরা কুরাইশদের ভয়ে তাঁদের বিশ্বাসকে গোপন করতেন এবং তাঁরা মক্কার বাইরে গিয়ে প্রার্থনা করতেন। নবী ছিলেন তাঁদের সকলের প্রতি দয়ালু অভিভাবক, ভ্রাতা, শিক্ষক। তিনি অধিকাংশ রাত্রি জেগে কাটাতেন আপন আরাধনায়। এবং দিনের বেলায় তিনি ঘরে ঘরে ঘুরতেন—যেখানে দুঃখী দুর্বল দীন, যেখানে গরিব দরিদ্র, ভিখারির আর্তনাদ শুনতে পেতেন! তিনি তাদের প্রত্যেককে সাহায্য করতেন। কাউকে টাকা দিয়ে, কাউকে সান্ত্বনা দিয়ে, কাউকে সেবা দিয়ে সকল দীন-দরিদ্রের অন্তর তিনি জয় করেন। এইভাবে আরব সম্ভ্রান্তগণের কিছু অংশ যেমন ইসলামে দীক্ষিত হলেন, ওদিকে দীন-দুঃখীরাও বেশ কিছু অংশ ইসলামে দাখিল হলেন। এবং যাঁরা দাখিল হলেন প্রত্যেকেই লক্ষ্য করলেন—জীবনের জয়যাত্রা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।

কুরাইশ ও ইসলাম ঃ প্রথম তিন বছর হযরত মহম্মদ (দঃ) গোপনে ধর্মপ্রচার চালিয়ে তাঁর পরিচিত ব্যক্তিবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্য হতে চল্লিশজনকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। এইভাবে তিন বছর অতিক্রান্ত হলো। তখন বেশ কিছু সংখ্যক নরনারী ইসলামে দীক্ষালাভ করেছেন। এখন আর এটা গোপন থাকতে পারে না। আরববাসী তখন এখানে-ওখানে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নতুন ধর্মমত, তাঁর নতুন শিষ্যদের সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে আরম্ভ করল। ধর্মযাজকগণ মৃদু আঘাতও দিতে থাকল। কেননা তাদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগল। তারা ভাবল তাদের প্রধান পুতুল—**হুবাল, লাত, মানাত, উয্যা নাইলা** ইত্যাদির জন্য তারা জীবনে কত গভীর ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং পরিশেষে বিজয়ী হয়েছে। তারা ভাবল বহু আরব, হাজারে হাজারে খ্রীস্টান ও ইহুদী রয়েছে, তারাই যখন তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি, সেখানে মহম্মদ (দঃ) একাকী এবং তাঁর সামান্য ক'জন শিষ্য কি করতে পারে? এইভাবে তারা আপন শক্তি-সম্পদে অন্ধ হয়ে ঘুমিয়ে রইল।

ইসলাম প্রকাশ্যে প্রচার ঃ কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাদের ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। সময়ই তাদেরকে সজাগ করে তুলল। এটাই বোধহয় প্রকৃতির নিয়ম, সদ্যোজাত শিশু দোলনায় ঘুমিয়ে থাকে, বয়স বা সময় তাকে দোলনার মধ্যে জাগিয়ে দেয়, আবার দোলনার শিশুকে একদিন দৌড়াদৌড়ি করতে বা বিদ্যালয়ের পথে দেখা যায়। আবার বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীকে একদিন জীবনের নব অধ্যায় উত্তাল যৌবন তাদের নবজীবনের পথে সংসারে লিপ্ত করে। তখন শিশুরাই শিশুর পিতা ও মাতা। তারা যে আজ পিতা-মাতা হবে এ বার্তা তাদের শুনিয়ে দিতে হয় না, সময়ই তাদের শুনিয়ে দেয়—'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।'

"প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল আছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে।"

কোরআন—৬ ঃ ৬৭

একদিন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন—তাঁর বংশধর হতে নবী পাঠাতে, যাতে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারেন এবং পবিত্র করতে পারেন।

কোরআন—২ ঃ ১২৯

আজ হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর হলো ঃ

"বলো আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী।" কোরআন—১৫ ঃ ৮৯

"অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো তা প্রকাশ্যে প্রচার কর, অংশীবাদীদের উপেক্ষা কর, বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট।" কোরআন—১৫ ঃ ৯৪-৯৫

"তোমার আত্মীয়-স্বজনকে তুমি সতর্ক করে দাও।" কোরআন—২৬ ঃ ২১৪

আল্লাহর এই বিশেষ ঘোষণা প্রচার করার জন্য হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজনকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। সকলেই হাজির হলেন, তিনি সকলকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন। তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ল সকলেই চলে গেল। আগামী দিন আবার হযরত সকলকে আমন্ত্রণ জানালেন। যখন তাঁরা আহার শেষ করলেন তখন নবী বললেন ঃ

"আমি জানি না, সমগ্র আরবের মধ্যে এমন লোক কেউ আছেন কিনা যিনি আপনাদের নিকট এমন কোন ভাল জিনিস এনেছেন যা আমি এনেছি তা অপেক্ষা উত্তম. আমি যা আপনাদের নিকট এনেছি তা আপনাদের ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল করবে। এবং আমার আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন—আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাতে। আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন—এই কাজে যিনি আমাকে সাহায্য করবেন, আমার বন্ধু হবেন, আমার উপদেষ্টা ও সহকারী হবেন?" তখন সকলেই সমস্বরে নবীকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। একমাত্র বালক আলি নবীর সমর্থনে দাঁড়িয়ে বলল ঃ

"হে আল্লাহ্র নবী, নিশ্চয় আমি আপনার সাহায্যকারী হবো, আমি আপনার সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।"

উপস্থিত সকলেই কেউ বা মৃদু হাসল, কেউ কেউ হো হো করে হেসে উঠল নগণ্য বালকের কথায়। কিন্তু এই বালককেই হযরত অন্তরের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। তিনি পরবর্তীকালে "আল্লাহ্র সিংহ" আখ্যা লাভ করেন।

সাফা পাহাড়ের ঘোষণা ঃ হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের বা চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো—যখনই কোন কাজ করার জন্য তিনি মনে মনে স্থির করতেন বা সেটাকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন তখন জগতের কোন শক্তিই তাঁকে সেই কাজ থেকে বিরত করতে পারত না। কেননা তাঁর শক্তি বা সাহস ছিল অসাধারণ ; আপন আত্মীয় স্বজন দ্বারা নানা বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ হয়ে তিনি একদিন মক্কার সাফা পাহাড়ের ওপর মক্কাবাসীদের আহ্বান করলেন—"হে কুরাইশগণ! তোমরা একত্রিত হও, হে কুরাইশগণ! তোমরা একত্রিত হও।" সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল—"মহম্মদ তোমাদের সাফা পাহাড়ে আহ্বান করছেন। জনগণ সেখানে একত্রিত হলো এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো—ব্যাপার কি? তিনি বললেন, "আপনারা একটা কথা বিবেচনা করুন। যদি আমি আপনাদের বলি—এই পাহাড়ের পেছনে একদল শত্রু (আপনাদের আক্রমণ করার জন্য) অপেক্ষা করছে, আপনারা কি আমাকে বিশ্বাস করবেন? তারা বললেন—"হ্যাঁ, কেননা আপনি এমন একজন ব্যক্তি যাঁর কোনরূপ গ্লানি নেই, আমরা জানি আপনি সারা জীবনে একটাও মিথ্যা কথা বলেননি।"

তিনি বললেন—"আমি আপনাদের কঠিন সতর্ককারী, হে আবদুল মোত্তালিব বংশ, হে আব্দ মনাফ বংশ, হে জোহরা গোত্র, হে তাইয়েফ গোত্র, হে মাখজুম গোত্র, হে আসাদ গোত্র, আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন—আমি যেন আমার নিকট ও দূর আত্মীয়-স্বজনদের সতর্ক করি। এবং আমি এর জন্য আপনাদের নিকট হতে কি ইহজীবনে কি পরজীবনে কোনরূপ লাভ কামনা করি না। আমি শুধু আপনাদের বলতে চাই—আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।"

তাঁর চাচা আবু লাহাব বলল, "আজই তুমি ধ্বংস হও। তুমি কি এইজন্যই আমাদের এখানে ডেকেছিলে!"

আবু লাহাবের এই অভিশাপ উচ্চারণে হযরত মহম্মদ (দঃ) অত্যন্ত আঘাত পান। তিনি মুখে কোন কিছু না বললেও তাঁর পবিত্র মুখের ওপর প্রতিভাত হয়ে ওঠে চরম বিরক্তির ছাপ। কিন্তু আল্লাহ্ মহম্মদ (দঃ)-কে ধ্বংস করলেন না। ধ্বংস করলেন, অভিশাপ দিলেন

সেই আবু লাহাবকে; এবং হযরতকে দিলেন চরম সান্ত্বনা। ফেরেশ্‌তা জিবরাইল সঙ্গে সঙ্গে হাজির। হযরত পেলেন—অসীম আনন্দ, অপরিসীম ভরসা।

"আবু লাহাবের দু' হাত ধ্বংস হোক এবং সেও ধ্বংস হোক। তার ধনসম্পদ এবং সে যা অর্জন করেছে তা তার কোনই কাজে আসবে না। অচিরেই সে লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে।" কোরআন—১১১ ঃ ১-৩

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বিরুদ্ধে কুরাইশগণ ঃ কুরাইশ গোত্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের অন্তরে হযরতের সম্পর্কে একটা চরম শত্রুতা ও ঘৃণা দানা বেঁধে ওঠে। বিশেষ করে উমাইয়া এবং মাখজুম গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান এবং আবু জেহেল, আবু লাহাব ও তাঁর স্ত্রী উম্মে জামিল এবং তার কয়েকজন সর্বদিক দিয়ে হযরতের বিরোধিতা করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে।

কিন্তু আরবের অবিশ্বাসী জনগণের মনে এ বাণী সাড়া দিল, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়—তিনি নিরাকার।

আল্লাহ্‌পাক রসুলুল্লাহকে জানালেন, "নেই কোন উপাস্য আমি ব্যতীত, আমার নিকট সরাসরি এস। যখন তোমরা আমার কাছে আসবে, আমি তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করব, অতীতে যা করেছ তার জন্য তোমরা হতাশ হয়ো না। আমার উপস্থিতিতে আমার বিধি-বিধানে তোমরা আবার পবিত্র হবে। আমি তোমাদের চির মুক্তি দেব পাপ ও কদর্যতা হতে। তোমরা হবে সুখী, আমি হবো তোমাদের সঙ্গে আনন্দিত। কিন্তু যদি তোমরা আমাকে অস্বীকার করো তখন তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য এবং আমি তোমাদের সতর্ক করছি ভয়াবহ পরিণতির জন্য, যখন অনুতাপের আগুন দূষিত অন্তর হতে বের হতে থাকবে এবং তাদের ধ্বংস করবে চিরদিনের জন্য, যতক্ষণ আমি খুশি না হই।"

আরবের মহৎ ব্যক্তিগণ এবং দরিদ্র ও নির্যাতিত জনসাধারণ এই আহ্বানে সাড়া দিল। কাবার রক্ষাকারীগণ তার ৩৬০টি পুতুল সহ বড়ই বিব্রতবোধ করতে থাকল। তারা একে অপরের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের প্রধান ছিল তিনজন—আবু লাহাব, আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ান।

কুরাইশদের আক্রমণের প্রথম অস্ত্র—নিন্দাজনক কবিতা ঃ তখনকার দিনে আরবে কবিদের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। তারা তাদের বিশেষ বিশেষ কবিদের ডাক দিল—আবু সুফিয়ান বিন হারিস, আমর বিন আস্, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর।

এই সমস্ত ভাড়াটে কবিরা হযরত মহম্মদ (দঃ) সম্পর্কে নানা কুৎসামূলক কবিতা লিখতে আরম্ভ করল। কিন্তু আরবের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানত হযরত মহম্মদ (দঃ) কত সৎ, আদর্শবান, মহাসংযমী ও সুবিচারক।

তাদের ওই মিথ্যা কবিতাগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই পচা কাগজে পরিণত হতে থাকল। এর দ্বারা জনসাধারণ ভিতরে ভিতরে রুষ্ট হয়ে উঠল। অধিকন্তু হযরতের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল।

আক্রমণের দ্বিতীয় অস্ত্র—অলৌকিকতা দাবি ঃ যখন কুরাইশদের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হলো তখন তারা অন্য উপায় চিন্তা করে বলল, "কখনই আমরা তোমাকে বিশ্বাস

করব না, যে পর্যন্ত তুমি আমাদের জন্মভূমি হতে প্রস্রবণ প্রবাহিত না করো অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় নদীনালা প্রবাহিত করে দেবে। অথবা তুমি স্বীয় রুচি অনুযায়ী আকাশকে আমাদের ওপর খণ্ডাকারে নিক্ষেপ কর কিংবা আল্লাহ্ ও ফেরেশ্‌তাগণকে আমাদের সামনে আনয়ন কর, অথবা তোমার একটি স্বর্ণনির্মিত গৃহ তৈরি কর। অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কেতাব অবতীর্ণ না করবে, যা আমরা পাঠ করব।"

কোরআন—১৭ ঃ ৯০-৯৩

আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে উত্তর ঃ "বল—মহান পবিত্র আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক। এবং আমি তো একজন প্রেরিত মানব (দূত) ব্যতীত নই।" কোরআন—১৭ ঃ ৯৩

তারা বলত তুমি মৃতকে জীবিত কর। অথবা হযরত মুসার ন্যায় অলৌকিকতা প্রদর্শন কর। তিনি উত্তর দিতেন—"সকল অলৌকিকতার মালিক আল্লাহ্।"

প্রকৃত অলৌকিকতা ঃ চিন্তাশীল মানুষ একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারে সমস্ত বিশ্ব এবং তার প্রতিটি জিনিসই আল্লাহর এক-একটি বিরাট অলৌকিকতা। সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মানুষ একযোগে চেষ্টা করেও আল্লাহ্‌র ক্ষুদ্র সৃষ্টি একটি মাছি তৈরির ক্ষমতা রাখে না। এরপর চন্দ্র-সূর্য গ্রহ তারা নক্ষত্র তো আছেই। মানুষ ওইগুলোকে তৈরি করা তো দূরের কথা, তাদের একদিনের গতির সামান্যতম পরিবর্তন করতেও অক্ষম। দিন ও রাত্রির গতি পরিবর্তনে কত মঙ্গল, মানুষ একবার চিন্তা করলে বুঝতে পারে। এর মধ্যে তাদের যে কোন একটি মাত্র কিছুদিনের জন্য স্থায়ী হলে মানুষের কি না দুর্গতি আরম্ভ হবে, মানুষ একবারও চিন্তা করতে পারে না। তার নিজের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তার খাদ্যের পরিপাক প্রক্রিয়া, তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তার সর্ব অঙ্গের সচল শক্তি ইত্যাদি এ সকলই কি আল্লাহ্‌র অদ্ভুত দান নয়? এদের একটিও লৌকিক নয়, সবই অলৌকিক।

জগতে খাদ্য উৎপাদন সেও একটি আল্লাহ্‌র অপরিসীম দান। কে বৃষ্টির মূলে, কে আলো ও বাতাসের মূলে, কে ঋতু পরিবর্তনের মূলে, কে জগতের অখণ্ড গতি নির্ণয়ের মালিক। যে কোন মানুষ একবার চিন্তা করলেই অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারে।

তোমাকে দেখিয়া নয়, দেখিতে শিখি
ক্ষীণ সৃষ্টি দেখে তব তোমারে দেখি।
কোরআনে পুরাণে নয় তোমাতে খুঝি
আকাশে পাতালে মর্ত্যে তোমাকে বুঝি।
অতি ঘৃণ্য ঘৃণ্য বস্তু নাহি কোন ঘ্রাণ
গড়ে তোলে গরীয়ান মহীয়ান প্রাণ।
সৃষ্টির আদিতে নাই আতর গোলায়
জীবন মরণ গড়া কাদায় ধুলায়।

কোরআন—৩ ঃ ৬, ৬৭ ঃ ১১, ৭৭ ঃ ২০-২৩, ৮২ ঃ ৫,
৮৬ ঃ ৫-৭, ৯২ ঃ ৩, ৯৫ ঃ ৪, ৯৬ ঃ ২

দেখি না এমন সৃষ্টি তোমার সৃষ্টিতে
পড়ে না কল্যাণে যাহা আমার দৃষ্টিতে
ক্ষতি করে প্রাণ নাশে নিখিলের কত
তবুও মঙ্গল ধরে সরীসৃপ যত।
ক্ষুদ্র জ্ঞানের সীমা চোখের আড়ালে
রেখেছ কত কি তুমি আকাশে পাতালে
রেখেছ আপন রূপ লুকায়ে নিরাকারে
রেখেছ রহস্য কত আলোতে আঁধারে। কোরআন—৫৭ ঃ ৩
নিবিড় অরণ্য কত গভীর জঙ্গল
রেখেছ তাহারও মাঝে মানব মঙ্গল।
রেখেছ কত কি তুমি ভিতরে বাহিরে
রেখেছ কত কি তুমি বিপুল সংসাবে।
যেখানে যাহাই আছে সবেই কল্যাণ
চিনেছে যে জন সেই মানব মহান।
তোমাব সৃষ্টি মাঝে সকলই মঙ্গল
আমরা বুঝি না শুধু কেবলই চঞ্চল।
তোমার সৃষ্ট বাজ্য সৃষ্টিকে চিনিতে
জগৎ পারেনি যার কণাও জিনিতে।
অতি ক্ষুদ্র সৃষ্টি তব সকলই সফল
বুঝিতে মানব বুদ্ধি বিবেক বিকল। কোরআন—২ ঃ ২১৬
তোমার সৃজিত জীব গুণ ছাড়া কই
দেখি না মানব সৃষ্টি দোষ ছাড়া বই।
তোমারে দেখিবে যেই আমার এ দৃষ্টি
সেই তো তোমারই দান তোমারই সৃষ্টি। —কাব্যকানন

ইসলাম কি ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) যে মিশন, যে ব্রত মানুষের কাছে তুলে ধরলেন তা-ই ইসলাম, অর্থ শান্তি—অর্থ সমর্পণ। তিনি এই ইসলামের মাধ্যমে মানুষের কাছে কি দিলেন?

প্রথম দিলেন—এক সত্য। যিনি মহাসত্য, যিনি অদ্বিতীয় অখণ্ড, যিনি দয়াময় স্রষ্টা এবং সারা বিশ্বের প্রতিপালক ও মালিক। তাঁর কোন সন্তান বা পিতা-মাতা নেই এবং তাঁর কোন সাদৃশ্যও নেই।

ইসলাম বলে—মেনে নাও সেই একজে, ভালবাস তোমার প্রতিবেশী ভাইকে, ন্যাযের সমর্থন কর, অন্যায়ের অবিচারের অনাচারেব অত্যাচারের অসম্মানের অবমাননা কর। পবিত্র থাকো মনে ও দেহে। পিতামাতাকে ভালবাস, সম্মানের সঙ্গে তাদের সেবা কব, গরিব আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদয় হও। দরিদ্র-দুঃস্থ অনাথ এতিম পথিককে খেতে দাও, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দাও। কোন মানুষ বা প্রাণীর ক্ষতি করো না। সন্তানকে বধ করো না।

যে অন্যায়ভাবে একটি মানুষকে হত্যা করল—সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকেই হত্যা করল। যে একটি বিপন্ন জীবনকে রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীকেই রক্ষা করল। প্রতিশোধ না নেওয়াই উত্তম কাজ। প্রতিহিংসা যেন মানুষকে পশুতে পরিণত না করে। সীমাহীন কিছু করো না। আপন সম্পদেও অমিতব্যয়ী হয়ো না। আল্লাহ্‌র মহান নীতিকে যে কোন অবস্থায় অবমাননা করো না। সে-ই এই সংসারে সবচেয়ে ধার্মিক যে আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্মানীয়। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে বিনম্র হও। গর্ব মানুষের মহাশত্রু। ক্রোধকে প্রশমিত কর—সে তোমার ধ্বংসকারী, যৌন-কামনাকে প্রশমিত রেখো, কেননা সে মানবকুলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু। অনাথ বা এতিমের সম্পদকে লক্ষ্য রেখো, অন্যায়ভাবে কোনকিছু আত্মসাৎ করো না। তোমাদের উপর স্ত্রীলোকদের সম অধিকার আছে। যেমন আছে তোমাদের তাদের প্রতি। মনে রেখো—তোমার ভাল কাজই তোমার জন্য স্বর্গ, তোমার মন্দ কাজই তোমার নরক। আল্লাহ্ তোমার ভাল কাজের পুরস্কার বহুগুণে বর্ধিত করবেন। যদিও মন্দ কাজের শাস্তিতে তা করেন না। তিনি মহান দয়াময়। তিনি সকল পাপীকেই ক্ষমা করেন। যদি পাপী সময় থাকতে অনুতাপ করে সৎকাজে ফিরে আসে। মৃত্যুর মুখে অনুশোচনা অর্থহীন। এই সমস্ত ইসলামের সৎবাণী। হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন যাঁর প্রচারক।

পবিত্র কোরআন নিজেই অলৌকিক ঃ "বল তোমরা, কোরআনে বিশ্বাস কর বা না কর, যাদের এর আগে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয়, তখনই তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে ; তারা বলে আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হবেই।" কোরআন—১৭ ঃ ১০৭-১০৮

কিন্তু অধিকাংশ কুরাইশরাই এতে বিশ্বাস করেনি, কেননা ভবিষ্যৎ বলে তারা কিছু মানত না। তারা বর্তমান জগতের ভোগকেই বড় বলে জানত। তাই তারা ভোগের মধ্যে অতিমাত্রায় বিচরণ করত। জগতে এমন কোন ভোগ্যবস্তু ছিল না, যা তারা আস্বাদন করত না, সে যতই নিকৃষ্টতম হোক। তারা তাদের বাগভঙ্গির ও বাগ্মিতার জন্য গর্ব করত। যখন কোরআন অবতীর্ণ হতে থাকল, তখন তাদের বলা হলো—যদি তারা পারে এরূপ একটিমাত্র বাক্য আনয়ন করুক। দরকার হলে সমগ্র আরব একত্রিত হোক।

"আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা তাতে সন্দেহ কর, তাহলে তোমরা অনুরূপ একটা সূরা আনয়ন করো। এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও—আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। কোরআন—২ ঃ ২৩

বল—যদি মানুষ ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ কোরআন আনয়নের জন্য সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কোরআন আনতে পারবে না।" কোরআন—১৭ ঃ ৮৮

কুরাইশদের মুখ বন্ধ হলো। তারা দাবি করেছিল একটা অলৌকিক জিনিস। পবিত্র কোরআন আজ হাজির। সকলেই জানত হযরত মহম্মদ (দঃ) নিরক্ষর মানব। তাঁর পক্ষে এটা রচনা যেমন অবাস্তব, তেমনি অলীক। সমস্ত আরব-জাহান স্তম্ভিত। সকল বড় বড় কবি-লেখক বিস্মিত। কারও মুখে কোন কথা সরে না। সকলেই নিজে নিজে বলতে থাকে—এত সুন্দর রচনা, সাবলীল রচনা, ব্যাকরণ-শুদ্ধ রচনা, শ্রুতিমধুর রচনা, জড়তা-

জটিলতাবিহীন রচনা, উচ্চাঙ্গের রচনা, অচিন্তনীয় ও অভাবনীয় রচনা, অতুলনীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী রচনা কেউ কোন সময় দেখেনি বা শোনেনি।

তাই পবিত্র কোরআন সমগ্র বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানাল—যদি কেউ পার, এর সমতুল্য একটি সূরা আনয়ন করো। আজ পর্যন্ত কারও দ্বারা তা সম্ভব হয়নি, হবেও না। সুতরাং প্রমাণিত হলো— কোরআন লৌকিক নয়, অলৌকিক।

কুরাইশ কর্তৃক আক্রমণের তৃতীয় ধারা—ভয়, প্রলোভন, নিগ্রহ ও উৎপীড়ন ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মহাব্রতের পঞ্চম বর্ষ। তিনি তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি পুতুল পুজো করে ও সেই অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়—তার কোন ক্ষমা নেই। তখন মানুষ দলে দলে তাঁর নিকট আসে ও তাঁর ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। এতে কুরাইশগণ ও তাদের প্রধানগণ তেলে-বেগুনে চটে উঠল। তাদের মান-সম্মান সবকিছু নষ্ট হতে চলেছে। এটা তাদের কাছে একেবারেই অসহনীয়। এদিকে ইসলাম দিনের পর দিন হু-হু করে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। তখন তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পরিশেষে তারা একটি উপায় স্থির করল। তারা জানত—হযরতের চাচা আবু তালিব হযরতকে দারুণ স্নেহ করেন—অথচ তিনি ইসলাম কবুল করেননি। তারা এর সুযোগ নিল এবং আবু তালিবের কাছে গেল। তাঁকে বুঝিয়ে বলল —তিনি যেন হযরত মহম্মদ (দঃ) কে ওই সমস্ত কাজ থেকে বিরত করেন। যদি তিনি বিরত করতে না পারেন তাহলে তারা আপন পথ বেছে নেবে।

চির শান্ত প্রকৃতির আবু তালিব তাদের যতটা পারলেন শান্ত করে বিদায় দিলেন, কিন্তু হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর সমস্ত শক্তি অর্পণ করলেন মানুষকে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড আল্লাহ্‌র পথে আনার জন্য।

তখন কুরাইশগণ একে অন্যের সঙ্গে আবার আলোচনায় বসলেন—এবং আবার আবু তালিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সঙ্গে ছিল বিরাট শক্তিধর যুবক আমর বিন-ওয়ালিদ-বিন মুগিরা। এবং তাঁকে দ্বিতীয় বারের মতো বললেন—আপনার পুত্রবৎ ওই যুবককে আনুন এবং মহম্মদ (দঃ)-কে আমাদের কাছে সমর্পণ করুন। আবু তালিব তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ওদিকে হযরত তাঁর কাজ অসীম বিক্রমে চালাতে থাকলেন।

তৃতীয়বার বা শেষবারের মতো কুরাইশগণ আবু সুফিয়ান বিন-হারবের নেতৃত্বে আবু তালিবের সঙ্গে দেখা করেন। এবার তারা শুধু হযরতকেই হত্যার হুমকি দিল না—সঙ্গে সঙ্গে আবু তালিবকেও। তারা আবু তালিবকে বলল—আপনি বয়স্ক ব্যক্তি, মহৎ ব্যক্তি, সমাজে সম্মানীয় ব্যক্তি। আমরা ইচ্ছা করি আপনি আপনার ভাইপোকে ওই সমস্ত কাজ হতে বিরত থাকতে বলুন। আমরা আর তার ওই সমস্ত নোংরামি সহ্য করব না। আমরা শপথ নিচ্ছি, কেউ আমাদের পূর্বপুরুষদের গালিগালাজ করবে, আমাদের বিশ্বাসে আঘাত হানবে, আমাদের বোকা বানাবে, এটা আমরা আর বরদাস্ত করব না। হয় আপনি তাকে বাধা দিন, না হয় আপনার ও তাঁর বিপদ অনিবার্য, যদি আমরা বেঁচে থাকি।

এইভাবে কুরাইশগণ হযরতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করল। হিজরী সনের সপ্তম বর্ষে হুদাইবিয়ার রণক্ষেত্রে সন্ধি সূত্রে যার কিছুটা পরিসমাপ্তি হলো। এই সমস্ত

যুদ্ধের কোনটিতেই হযরত নিজে আক্রমণকারীর ভূমিকা নেননি। হযরত যে সমস্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছেন তা কেবল তাঁর আদর্শ ও ধর্মপ্রচারের জন্য। কেননা তিনি ছিলেন মূলত প্রচারক। এই প্রচারে যারা বাধা দিতে এসেছে তাদের সঙ্গে ঘটেছে তাঁর সংঘর্ষ, চলেছে সংগ্রাম।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন—আবু তালিবকে হযরতের উত্তর এবং কুরাইশদের আবার শাসানি ঃ আবু তালিবের সঙ্গে কুরাইশদের তৃতীয়বারের সাক্ষাৎ তাকে এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। আবু তালিব কুরাইশদের শত্রুতাকে ততটা ভয় করতেন না, যতটা অপছন্দ করতেন সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের নিকট হতে দূরে থাকতে। অধিকন্তু তিনি অভাবী থাকায় কুরাইশদের বিরুদ্ধে সরাসরি যাওয়া বা কিছু করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। আবার অন্যদিকে হযরতকে তিনি আপন পুত্র অপেক্ষা বেশি ভালবাসেন। সুতরাং তিনি পড়লেন উভয় সঙ্কটে। না হযরতকে ছাড়তে পারেন, না আপন পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস বা বংশকে ত্যাগ করতে পারেন। কোনটিকেই তিনি ছাড়তে পারছিলেন না। তিনি হযরতকে সমস্ত ঘটনা বুঝিয়ে বললেন—"আমাকে এই সঙ্কট থেকে মুক্তি দাও এবং তুমিও মুক্ত থাক এবং আমাকে নিয়ে এমন কিছু করো না যা আমার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠবে।"

পরিস্থিতি অসহনীয় হচ্ছিল। হযরত তাঁর নগণ্য কয়েকজন শিষ্যের ভয়াবহ পরিণতি চিন্তা করলেন। তিনি কি তাঁদের চেয়ে দুর্বল? কখনও না। সবার ওপরে চিন্তা করলেন মহান আল্লাহ্‌র কথা। যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁকে ভালবাসেন, যিনি তাঁকে কথা দিয়েছেন, যাঁর জীবন সমাপ্তি সূচনা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হবে। হযরত চরম শ্রদ্ধা ও গভীর ভালবাসার সঙ্গেই চাচা আবু তালিবকে তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা বললেন—"যদি কেউ আমাকে আমার এই ব্রত ত্যাগ করানোর জন্য আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবুও আমি আমার ব্রত ত্যাগ করব না। আমাকে আমার আল্লাহ্‌ সাহায্য করবেন—নতুবা আমার এই সাধনায় আমি মৃত্যু বরণ করব।"

দুই হাতে দাও যদি সূর্য আর চাঁদ
আমার আদর্শ আমি নাহি দিব বাদ।

আবু তালিব চিরদিনই সৎ-সাহসী মানুষদের ভালবাসতেন। তাই ভাইপোর উত্তরে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। যদিও নিজে মুসলমান ছিলেন না, তিনি নিজে মনে মনে বহুবার চিন্তা করেছেন—হযরতকে কুরাইশদের নিকট সমর্পণ করা এক অতি কাপুরুষতার কাজ। তাই তিনি তা করেননি, তিনি ভাইপোকে অতি স্নেহভরে ডাকলেন এবং বললেন—"ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি যা পছন্দ কর তা প্রচার কর। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে রক্ষা করব।"

আবু তালিব হাশিম ও মোত্তালিব গোত্রের প্রধানদের ডাকলেন, এবং তাঁদের বললেন সমস্ত কথা, যা কিছু ঘটেছে। বললেন—হযরতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা। তিনি উভয় গোত্রকে বুঝিয়ে বললেন এটা তাঁদের কর্তব্য, যাতে কেউ মহম্মদ (দঃ)-এর কোন ক্ষতি করতে না পারে। সকলেই একমত হলেন। কিন্তু আবু লাহাব কড়া কথায় সকলকে শাসিয়ে দিলেন,

এবং যোগ দিল হাশিমী গোত্রের চিরশত্রু উমাইয়া গোত্রের সঙ্গে, বিশেষ করে হযরতের চরম শত্রুতে পরিণত হলেন। কিন্তু মহম্মদ (দঃ)-এর কথা অনড় রয়ে গেল। তিনি শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলকে জানিয়ে দিলেন—তাঁর ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ দিলেও তিনি তাঁর ব্রত ত্যাগ করবেন না। এতে উভয় দিকেই দু' রকমের প্রভাব বিস্তার করল, শত্রুদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার ও মিত্রদের বুকে ভরসার সঞ্চার হলো। অনেকেই ভেবেছিল—এবার হয়তো চাচা আবু তালিব ও ভাইপো হযরতের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হবে। কিন্তু তাঁরা যেমন ছিলেন তেমনিই রয়ে গেলেন।

উৎপীড়ন-নিগ্রহ চরম মাত্রায় ঃ হযরতের শত্রুপক্ষ এখন চরম মাত্রায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে উঠল যে কোন প্রকারের ক্ষতি করার জন্য। সে ক্ষতি মানসিক হোক, দৈহিক হোক। এ কথা বহু আগেই ওরাকা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তারা আজ সেই পথই বেছে নিল।

হযরত বেলাল (রাঃ)-এর বিশ্বাস ও অত্যাচার ঃ মুসলিম জগতে হযরত বেলাল (রাঃ)-এর নাম বড়ই প্রিয় ও পরিচিত। তিনি ছিলেন নিগ্রো। তিনি ধর্মান্তরিত হওয়ার পর মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করতেন। তাই আজও তিনি সারা বিশ্ব-মুসলমানের অতি প্রিয় প্রথম মোয়ায্‌যীন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বিন খালাফের ক্রীতদাস। হযরত বেলাল ইসলামধর্ম গ্রহণ করায় তাঁর প্রভু দারুণ চটে গেলেন। কিন্তু ক্রীতদাস তাঁর নতুন বিশ্বাস হতে কিছুতেই প্রত্যাবর্তন করলেন না। তাতে পরিণতি হলো—তাঁর প্রভু তাঁকে উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর শুইয়ে বুকের ওপর চাপিয়ে দিতেন বিরাট পাথর, যেন সে এতটুকুও নড়াচাড়া করতে না পারে। যখন ক্রীতদাসকে বলা হতো তুমি ওই নতুন ধর্ম হতে আপন ধর্মে ফিরে এস, তিনি বলতেন—আহাদ্ আহাদ্—এক এক অর্থাৎ এক আল্লাহ্। একদিন হযরত আবুবকরের চোখে পড়ল এই অমানুষিক অত্যাচার, তিনি তাঁকে তাঁর প্রভুর কাছ থেকে কিনে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আজাদ বা মুক্ত করে দিলেন। এইভাবে বহু দাসদাসীকে হযরত আবুবকর আজাদ করেছিলেন। যাঁরা পরবর্তী জীবনে এক একজন বিশিষ্ট মুসলমানে পরিণত হয়েছিলেন। শুধু দাসদাসীদের প্রতিই যে অত্যাচার বেড়েছিল তা নয়, স্বাধীন ব্যক্তিদের জীবনও নানা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। হযরত আম্মার-এর পিতা ইয়াসিব এবং মাতা সুমাইয়ার প্রাণান্তের হৃদয়বিদারক কাহিনী মানুষ মাত্রকেই বিচলিত করে তোলে। পুত্রের সম্মুখে পিতার দুটো পায়ে দুটো উট বেঁধে তাদের বিপরীত দিকে ছুটিয়ে ইয়াসিবকে দু'খণ্ড করা হয়, এবং পতির সম্মুখেই পত্নীর গুপ্তাঙ্গে তীর নিক্ষেপ করে বধ করা হলো। এই সুমাইয়াই ইসলাম জগতের প্রথম শহীদ রমণী। পরে হযরত ইয়াসিবকেও ঐভাবেই প্রাণ দিতে হয়। তাই তরবারির যোগে ইসলাম প্রচার হয়নি। বরং তরবারির যোগে ইসলাম হয়েছিল কণ্টকিত, ক্ষতবিক্ষত। এমনকি এই অত্যাচারের হাত থেকে স্বয়ং হযরত মহম্মদ (দঃ)-ও নিষ্কৃতি পাননি। আবু লাহাবের স্ত্রী হযরতের যাতায়াতের পথে রাতে কাঁটা পুঁতে দিত, যাতে তিনি ক্ষতবিক্ষত হন। হযরত বিনা প্রতিবাদে প্রত্যহ ওইগুলোকে পথ হতে সরিয়ে দিতেন—যাতে কোন মানুষ কষ্ট না পায়।

মানুষ মহম্মদ (দঃ)-এর ওপর এই অত্যাচার শুধু দু'-একদিন বা দু'-একমাস চলেনি, চলেছে বছরের পর বছর। এই বছরগুলো হযরত ও তাঁর অনুসারীদের পক্ষে ছিল

অত্যন্ত কঠিন। এই বছরগুলোতেই হযরত ও তাঁর অনুসারীরা শুধু ধর্মের না, জীবনেরও কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এত বাধা এবং কষ্ট সত্ত্বেও সত্য ও ধর্মের পথ হযরত মহম্মদ (দঃ) পরিত্যাগ করেননি। প্রতি পদে পদে হযরতকে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে, পরে এসেছে আল্লাহ্‌র সাহায্য কখনও আগে নয়। এমনই ছিল তাঁর জীবনে সত্যের সাধনা। তিনি ছিলেন সহিষ্ণুতার প্রতীক হিসেবে যেমন, তেমনি জ্ঞানে ও গুণে এবং সাধনায় ছিলেন মানবতার শ্রেষ্ঠতম দাবিদার।

তাঁর প্রতি অতি অমানুষিক অত্যাচারেও তিনি কখনও কাউকে দোষারোপ করেননি। কাউকে অভিশাপ দেননি, তাদের ধ্বংসের জন্য ফরিয়াদ করেননি—তিনি শুধু আল্লাহ্‌র দরবারে বারবার প্রার্থনা জানিয়েছেন, তারা পথভ্রান্ত, তুমি তাদের পথ দেখাও। যে কোন মানুষেরই আগে গুণ অর্জন করতে হয়। সেই গুণই যোগ্য পদমর্যাদা এনে দেয়। হযরতের জীবনেও এর কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে তিনি ছিলেন—"মানুষ মহম্মদ (দঃ)"। বাড়ির চাকর-বাকর অন্যান্যদের কাছে ছিলেন—"মানুষ মহম্মদ (দঃ)"। প্রতিবেশীর কাছে ছিলেন—"মানুষ মহম্মদ (দঃ)"। আত্মীয়-স্বজনের কাছে ছিলেন—"মানুষ মহম্মদ (দঃ)"। দেশবাসীর কাছে ছিলেন—"মানুষ মহম্মদ (দঃ)"। অর্থাৎ সকলের কাছে ছিলেন "মানুষ মহম্মদ (দঃ)"। এই মানুষের কাছেই ওহী এলো। তখন হলেন নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, শেষ নবী।[১]

তাঁদের প্রতি অত্যাচার যতই বাড়তে থাকল, আল্লাহ্‌র পথে তাঁদের বিশ্বাস ও সাধনা-শক্তি ততই বাড়তে লাগল। হযরতের বজ্রবাণী সকল উম্মত অনুসারীর মুখে মুখে ঘুরতে থাকল—"তারা যদি আমাদের ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় এবং আমাদের ব্রত হতে বিরত হতে বলে, তবুও আমরা আপন ব্রতে বিরত থাকব না, হয় আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেন, নচেৎ আমরা আমাদের মহাব্রতে জীবন ত্যাগ করব—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

হযরত ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি সকল রকমের অত্যাচার, এমনকি মৃত্যুযন্ত্রণাও শেষ পর্যন্ত হার মানল। পবিত্র কোরআনের অদম্য প্রেরণাবাণী এবং হযরতের জীবন্ত উপমা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রতিটি অনুসারীকে করে তুলল মহাবীর, মহাত্যাগী, মহাসাধক, মহাসৈনিক। তাঁরা দিব্যচোখে দেখতে পেলেন—জীবন-রহস্যই জীবনের মহানন্দ এবং তা বিধৃত হয় বিশ্ব প্রতিপালকের সঙ্গে আত্মসংযোগে। তাঁরা সে গোপন রহস্য বুঝতে পারলেন, জীবন ভোগে নয় ত্যাগে, আত্ম-বিচ্ছেদে নয়, আত্ম-সংকীর্ণতায় নয়, আত্মসংযোগে। এইভাবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা তাঁদের অন্তরাত্মাকে এক স্বর্গীয় আভা ও আলোতে উন্মীলিত করে তুলল। তাই পবিত্র কোরআন ও হযরত মহম্মদ (দঃ) দুই-ই অলৌকিক ঘটনা।

আবু জেহেলের অকথ্য গালাগালি ও হামজার ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) ও তাঁর অনুসারীদের ওপর নির্যাতন এত বেশি হতে থাকল—হাশিম গোত্র তখন বাধ্য হল সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে। একদিন হযরত আপন মনে রাস্তা দিয়ে চলেছেন, আবু জেহেল পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সে হযরতকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও উৎপীড়ন

১। The Readers Digest Great Encyclopaedic Dictionary, Vol III, Page 1360

আরম্ভ করল। হযরত প্রতিবাদে একটি কথাও না বলে ফিরে চলে গেলেন। সে-সময় আরবে হামজা মহাবীর নামে খ্যাত। হামজা ছিলেন হযরতের আপন চাচা ও কিছুদিনের জন্য একই ধাত্রী মায়ের দুধ খাওয়ার সুবাদে দুধ-ভাই। হামজা শিকার করেই জীবিকা সংগ্রহ করতেন। ওইদিন তিনি শিকারে বেরিয়েছেন—শিকার থেকে ফিরে শুনলেন আবু জেহেল হযরতকে অকথ্য অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করেছে। তিনি সোজা কাবা গৃহের দিকে রওনা হন। অন্যান্য দিনের মতো আজ তিনি কাউকে সালাম বা অন্য কোন কথা না বলে সরাসরি আবু জেহেলকে অপমান করে—ধনুকের ঘায়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিলেন। তখন চারদিকে হই-হই রই-রই কাণ্ড পড়ে গেছে। মাখজুম গোত্রের কিছু লোক ছুটে চলে এল হামজাকে আঘাত করতে। মহাবীর হামজা সকলকে স্তব্ধ করে দিলেন। অধিকন্তু তিনি প্রশ্ন করলেন—কেন সে নিরপরাধ হযরতকে অন্যায়ভাবে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন—তিনি আজ হতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, এবং তাঁর সমগ্র জীবনকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করলেন। মহাবীর হামজার এই আকস্মিক ঘোষণা সমগ্র আরবকে ভাবিয়ে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ও তাঁর সহচরদের নির্যাতিত হৃদয় আনন্দে, উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় ভরপুর হয়ে উঠল। এইভাবে ন্যায়ের পথে ইসলাম পেয়েছে নিখিল বিশ্বের স্রষ্টার সাহায্য ও নিখিল মানবের সমবেদনা।

হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে আপন পথে আনতে আরবদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ঃ হযরতের জঘন্যতম শত্রু আবু জেহেলের অমানুষিক ব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফল—মহাবীর হামজার ইসলাম গ্রহণ। আবার হামজার ইসলাম গ্রহণের প্রত্যক্ষ ফল—সমগ্র আরবের নতুন দিগদর্শন। আরববাসী চিন্তা করতে বাধ্য হলো—হযরতের প্রতি অত্যাচারে ফল ভাল হবে না। তারা চিন্তা করতে আরম্ভ করল—এ ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে হবে—সেটা হুমকি বা অত্যাচার নয়। এ নব পরিকল্পনার উদ্ভাবক ছিল আরব নেতা উৎবা বিন-রাবেয়া। সকলেই একমত হলো। উৎবা হযরতের নিকট গমন করল এবং বললো ঃ

"হে আমার ভাইপো, আপনার মহত্ত্বের জন্য আমাদের সকলের মাঝে সমগ্র সমাজে আপনার এক বিশেষ স্থান আছে। কিন্তু বর্তমানে আপনি এমনি এক ভীষণ বস্তু উত্থাপন করেছেন যা আমাদের বিভক্ত করে দিয়েছে (আরব এই প্রথম মেনে নিল তারা বিভক্ত, হযরত আর একা নন। হামজার ধর্মান্তরকরণ সমগ্র আরবের সমাজ ব্যবস্থার বা ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দেয়)। আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি প্রস্তাব আপনার নিকট রাখছি। আশা করি, আপনি যে কোন একটিতে সম্মত হবেন। যদি আপনি আপনার এই ব্রতের বদলে ধনরত্ন আশা করেন তাহলে আপনাকে আমরা এত ধনরত্ন দেব—আপনি আমাদের সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনীলোকে পরিণত হবেন। অথবা যদি আপনি মান-সম্মান-যশ প্রত্যাশা করেন তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের মধ্যে প্রধানরূপে গণ্য করব অথবা যদি আপনি বাদশাহ হতে চান, তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের বাদশাহ মনোনীত করব। আর যদি আপনি কোন সুন্দরী রমণী কামনা করেন তাহলে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী আপনাকে উপঢৌকন দেব। আপনি এর যে কোন একটিতে সম্মত হলে আমরা তাই করব।

উৎবার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর হযরত সূরা জাসিয়া (৪৫) থেকে কিছুটা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন। তার তেরো আয়াত (বাক্য) পর্যন্ত পাঠ করা হয়েছে এমন সময় উৎবা

কোরআন শরীফের আবৃত্তি শুনে এতই মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে ওঠেন যে তিনি আর হযরতকে আবৃত্তি করতে দিলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন—হযরতকে এসব কথা বোঝাতে আসা অবাস্তব। তিনি শিকার করতে এসে শিকার হয়ে গেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং কুরাইশদের নিকট ফিরে এসে বললেন—তারা যেন হযরতকে আপন পথে চলতে দেয়। যদি হযরত কৃতকার্য হন, সে কৃতকার্যতা তাদেরই হবে। যদি তিনি মারা যান তারা মুক্তি পাবে। তখন কুরাইশগণ তাকে বলল—সে যাদুগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু উৎবা তাঁর মত আর ত্যাগ করলেন না।

• **মুসলমানদের প্রথম আবিসিনিয়ায় হিযরত (৬১৪ খ্রীঃ) ঃ** হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মহাব্রতের এটা ছিল পঞ্চম বর্ষের শেষ। যখন ভয়, শাসানি, অত্যাচার, অনাচার, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, গালাগালি, লোভ, প্রলোভন, অনুরোধ, উপদেশ, পরামর্শ, মীমাংসা, কূটনীতি সবই একের পর এক চরমভাবে ব্যর্থ হলো, তখন তারা মরিয়া হয়ে মাত্রাহীন অত্যাচার আরম্ভ করল। মুসলমানদের জন্য মক্কায় বাস করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। হযরত মুসলমানদের উপদেশ দিলেন মক্কা ত্যাগ করতে। তারা জিজ্ঞাসা করল—আমরা কোন্ দেশে যাব? হযরত উত্তর দিলেন—নাজ্জাসীর দেশ আবিসিনিয়ায় যাও, তিনি সেখানকার রাজা। তোমরা সেখানে ততক্ষণ বাস করবে, যতক্ষণ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অন্য পথ না দেন।

তখন অতি সংগোপনে প্রথম এগারোজন পুরুষ ও চারজন মহিলা আবিসিনিয়ার পথে যাত্রা করলেন এবং সেখানেই বসবাস স্থাপন করলেন। যখন দেশে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে—মক্কাতে আর মুসলমানদের প্রতি কোন অত্যাচার করা হয় না, এই গুজব শোনার পর তাদের কয়েকজন মক্কায় ফিরে এসে দেখলেন—অত্যাচার পূর্বের অপেক্ষা অনেক বেশি মাত্রায় চলছে। তখন তাঁরা এবং আরও কয়েকজন—মোট পঁচাশিজন একত্রে আবিসিনিয়ার পথে যাত্রা করলেন, সঙ্গে কতিপয় নারী ও শিশু ছিল। এবং তাঁরা আবিসিনিয়াতেই প্রথম হিযরত করেন। এই আবিসিনিয়ার মাটিতে হিযরতকারীদের প্রথম সন্তান হযরত যুবাইর ও আসমার পুত্র আব্দুল্লাহ। মতান্তরে মদিনার মাটিতে আব্দুল্লাহ প্রথম মুসলিম সন্তান।

এই হিযরতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঃ

১। হযরত ওসমান বিন-আফফান
২। " আবু হুজাইফা বিন-উৎবা
৩। " ওসমান বিন-মাযউন
৪। " আব্দুর রহমান বিন-আউফ
৫। " জুবাইর বিন-আওয়াম
৬। " আবদুল্লাহ বিন-মাসউদ
৭। " মুসায়াব বিন-উমাইয়ির
৮। " আমির বিন-রাবিয়া
৯। " সুহাইল বিন-বাইদা
১০। " জাফর বিন আবু তালিব

এঁরা সকলেই ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাই এঁদের দেশত্যাগ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে—অত্যাচার কত বেড়েছিল। নতুবা তাঁরা জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করবেন কেন!

তাঁদের শত্রুপক্ষ এখানেই স্থির ছিল না। তারা চেষ্টা করেছিল তাঁদের আশ্রয়স্থলকেও আক্রমণ করতে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেটা আর হয়নি, কেননা মক্কাবাসী তাদের আক্রমণ করার পূর্বেই তাঁরা জাহাজে করে পাড়ি দিয়েছেন—আবিসিনিয়ার পথে। জাফর বিন আবু তালিব ছিলেন শেষ যাত্রী। মক্কাবাসীদের ধারণা ছিল যদি মুসলমানগণ অন্য কোথাও যায় সেখানেও এই বিষ ছড়াবে। সুতরাং তাদের এখানেই শেষ করতে হবে। অত্যাচারিত মুসলমানগণ দেশত্যাগ করেও যে প্রাণে বাঁচবে তাঁদের সে উপায়ও ছিল না। মক্কাবাসীগণ তাঁদের অসহায় অবস্থায় অস্ত্রহীন অবস্থায় চিরতরে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। যখন তারা দেখল কিছু সংখ্যক মুসলমান তাদের অজ্ঞাতে অন্য কোথাও চলে গেছে, তখন তারা মরিয়া হয়ে উঠল, কি করে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা যায় এবং কি করে তাদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া যায়। রক্তমুখী বাঘের মতো ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করল। পরিশেষে জানতে পারল তারা আবিসিনিয়ায়। তখন তারা পরামর্শ করল আবিসিনিয়ার রাজার নিকট দূত পাঠানো হোক। রাজা যেন তাদের ফেরত দেন। এইভাবে তারা আমর বিন-আস ও আবদুল্লাহ বিন-রাবেয়াকে দূতরূপে নিযুক্ত করল। এই দূতদ্বয়কে তারা বহু উপঢৌকনসহ নাজ্জাসীর নিকট পাঠাল। যাতে তারা সহজে রাজার মন জয় করতে পারে।

দূতদ্বয় নাজ্জাসীর নিকট হাজির হলো। এবং রাজাকে যা বলল—আমাদের কয়েকজন ক্রীতদাস আমাদের না বলে এখানে চলে এসেছে এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মমত ত্যাগ করে এক নতুন ধর্মে বিশ্বাস এনেছে। দূতদ্বয় জানাল, তারা অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক। রাজার সঙ্গে তাদের বহুদিনের সম্পর্ক, যাতে সেই সম্পর্কে কোনরূপ চিড় না ধরে, সেইজন্যে তিনি যেন তাদের চাকরগুলোকে তাদের হাতে অর্পণ করেন। রাজা সবকিছু খোঁজ নিয়ে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

মক্কার মুসলমানগণ রাজার নিকট হাজির হলে, রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তাঁরা পূর্ব ধর্মমত ত্যাগ করলেন? তাঁরা রাজার ধর্মমতও গ্রহণ করেননি কেন?

উত্তরে জাফর বললেন—"হে রাজা, আমরা ছিলাম এক অজ্ঞ জাতি। আমরা পুতুল পুজো করতাম, মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করতাম এবং অসামাজিক কাজ সবই করতাম। আমরা প্রতিবেশীকে জোর করে আক্রমণ করতাম এবং তাদের খতম করতাম।"

"আমাদের অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয় তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের মধ্য হতে আমাদের নিকট একজন দূত পাঠালেন। যাঁকে বাল্যকাল হতে মহৎ, সত্যবাদী ও পবিত্র বলে জানতাম। তিনি আমাদের আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করলেন। যাতে আমরা আল্লাহ্‌র অখণ্ড সত্তা ও একত্বকে মেনে নিই। আমরা যেন তাঁর এবাদত করি এবং অন্যান্য সকল দেবতাকে ত্যাগ করি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের পুজো করত, তারা পাথরমূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আল্লাহ্‌র দূত আমাদের সত্য বলতে, ঋণ শোধ করতে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সৎ ব্যবহার করতে, নিষিদ্ধ বস্তু হতে দূরে থাকতে ও রক্তপাত না করতে নির্দেশ দেন। তিনি নিষেধ করেন—যে কোন প্রকারের অন্যায় করতে, মিথ্যা বলতে, আমানতে

খিয়ানত করতে, এতিমজনের মাল হরণ করতে। তিনি নির্দেশ দেন কেউ যেন আল্লাহ্‌র অংশী বা শরিক না করে, সকলেই যেন মহান আল্লাহ্‌র আরাধনা করে, সকলেই যেন গরিবকে সাহায্য করে। সুতরাং আমরা তাঁকে বিশ্বাস করেছি। তাঁকে অনুসরণ করেছি। তিনি যেগুলোকে নিষিদ্ধ বলেছেন সেগুলো হতে আমরা দূরে থাকি। যেগুলো সম্পর্কে আদিষ্ট করেছেন, সেগুলো করে থাকি। এই কারণে আমাদের দেশের লোকগুলো আমাদের বিশ্বাসের পথে যত রকমের বাধা-বিপত্তি আনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যখন তাদের অত্যাচার আমাদের সহ্যসীমাকে অতিক্রম করল, তখন আমরা বাধ্য হলাম দেশত্যাগ করতে। আশ্রয় নিলাম আপনাদের দেশে। আপনি বিচার করুন।"

আবিসিনিয়ার রাজা জাফরের কথায় এতই মুগ্ধ হলেন যে, তিনি ওহীর কিছু অংশ আবৃত্তি করার জন্য জাফরকে অনুরোধ করলেন। বিজ্ঞ জাফর এমন এক জায়গা পাঠ করলেন যেটা শুনলে যে কোন খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী ইসলামধর্মের শাশ্বত উদার দৃষ্টি-ভঙ্গিতে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। যখন নাজ্জাসী সূরা মরিয়মের (১৯) কিছু অংশ শুনলেন, তখন তিনি মুগ্ধচিত্তে বলে উঠলেন—"এই কথাগুলো সেখান থেকেই এসেছে, যেখান থেকে এসেছিল- আমাদের প্রভু যীশুর কথাগুলো। নিশ্চয়ই এই কথাগুলো হযরত মুসার প্রতি উচ্চারিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌র শপথ আমি কখনও তোমাদের তাদের নিকট অর্পণ করব না।"

পরদিন আবার ওই দূতদ্বয় নাজ্জাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং বলল—"তারা (মুসলমানগণ) প্রভু যীশুর বিরুদ্ধে ভীষণ অপবাদ দিয়েছে।" রাজা সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ডেকে আনলেন। এবং জিজ্ঞাসা করলেন তারা কি বলছে আমাদের বিরুদ্ধে। বিজ্ঞ জাফর আবার উত্তর দিলেন—"আমরা আপনাকে তাই বলেছি যা আমাদের নবী আমাদের শিখিয়েছেন।" রাজা সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড কাঠ নিয়ে একটি দাগ টেনে বললেন—"আমি অত্যন্ত খুশি যে, আপনাদের ধর্ম ও আমার ধর্মে কোন ব্যবধান নেই—এই দাগ অপেক্ষা।"

এইভাবে আবিসিনিয়ার রাজার নিকট সত্য প্রকাশ পেল। কেউ কেউ বলেন—তিনি পরে মুসলমান হয়ে যান। এবং স্থানান্তরিত মুসলমানগণ সম্মানের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন, যতদিন পর্যন্ত তাঁরা মদিনায় হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে মিলিত না হলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ কে এমন আছেন যিনি আপন জন্মভূমিকে না ভালবাসেন! তাই আবিসিনিয়ায় স্থানান্তরিত মুসলমানগণ বারবার প্রিয় মক্কার কথা বলতেন। অবুঝ মন মানতে না চাওয়ায় কেউ কেউ আবার ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু অপরিসীম অত্যাচারের কবল থেকে কেউ রেহাই পাননি।

তখন হযরতের নবুয়ত প্রচারের ষষ্ঠ বছর। মক্কায় ওমর বিন-খাত্তাব নামে এক যুবক ছিলেন, তাঁর বয়স তখন ২৬-এর মতো। শারীরিক ও মানসিক গঠনে সবল, সকল দিক থেকেই তিনি ছিলেন মহাযোদ্ধা। তিনি আপনজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে ভালবাসতেন। এদিক থেকে তিনি যে একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর ধর্মমত ছিল পূর্বপুরুষের ধর্মমত। আরববাসীদের মজ্জাগত ধর্মবিশ্বাস

জড়বাদ পৌত্তলিকতায়। তৌহিদের অমোঘ বাণী তাতে আঘাত হানলো "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।" এই বাণী—আরবদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কারকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তাদের বিশ্বাসে আঘাত হানে। মূর্তি পুজোর পরিবর্তে একেশ্বরবাদ, জড়বাদের স্থলে আধ্যাত্মিকতা, নগ্ন ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে পরলোক বিশ্বাস প্রবর্তনে তারা দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই কারণেই তিনি বা তারা ছিল—হযরতের পরম শত্রু। যখন মক্কার বহু লোক দেশত্যাগ করল, যখন একই পরিবারে দুই মতবাদ নিয়ে অশান্তি দেখা দিচ্ছে, যখন ভাই ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করছে, যখন আত্মীয় আত্মীয়কে দুশমন ভাবছে, যখন মানুষ মানুষকে দেখে ভয় করছে, যখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান দেখা দিচ্ছে, যখন পিতা প্রিয় পুত্রকে ত্যাজ্য করছে, যখন নানা অশান্তিতে দেশ ছেয়ে গেছে, তখন ওমর চিন্তা করলেন—এই সমূহ পাপের মূলে হচ্ছে এক মহম্মদ (দঃ)। সুতরাং ওই পাপীটাকে খতম করতে পারলে সবই শান্ত হয়। তাই ওমর মনে মনে স্থির করলেন হযরতকে চিরতরে খতম করতে হবে।

এবার তিনি হযরতকে খতম করার জন্য তাঁর অবস্থান জানতে চেষ্টা করলেন। জানতে পারলেন—সাফা পাহাড়ের কাছে আকরামার ঘরে মহম্মদ (দঃ) তাঁর বন্ধু আবুবকর, হামজা ও আলি এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলোচনায় রত আছেন। তিনি স্থির করলেন ওইখানেই তাঁকে বধ করা হবে।

দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ওমর পথে পা বাড়ালেন। পথিমধ্যে নোমান বিন-আবদুল্লাহর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো, নোমান তাঁকে বললেন—হে ওমর, তোমার আত্মীয়রা তোমাকে প্রতারণা করছে। তুমি তোমার লোকগুলোকে আগে ঠিক কর। পরে মহম্মদ (দঃ)-কে হত্যা করবে। তুমি কি জান –আব্দ মানাফ বংশ তোমাকে ত্যাগ করেছে।

রহস্যটি ছিল—ওমরের বোন ফাতেমা এবং তার স্বামী সাদ বিন-জায়েদ উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন ওমর নোমানের নিকট এই তথ্য জানতে পারলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই খোলা তরবারি নিয়ে তাঁদের দিকেই রওনা হলেন। তাঁদের গৃহে প্রবেশ করলেন, ভেতরে কে যেন পবিত্র কোরআন আবৃত্তি করছিলেন। যখন তাঁরা জানতে পারলেন---ওমর আসছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁরা সাবধান হয়ে গেলেন। ওমর জিজ্ঞাসা করলেন—আমি শুনতে পেলাম তোমরা কি পাঠ করছিলে। তাঁরা ইতস্তত করতে থাকেন। তিনি তাঁদের ধমক দিলেন। বললেন—"আমি জানতে পেরেছি—তোমরা উভয়েই মহম্মদ (দঃ)-এর অনুসারী হয়েছো এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস এনেছো।"

বল্লার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাদকে প্রহারে উদ্যত হলেন। তাঁর স্ত্রী ফাতেমা সহ্য করতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালেন। ওমর বোনকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে তাঁর দেহ থেকে দ্রুত রক্ত নির্গত হতে থাকল। তখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনই বেপরোয়া হয়ে উত্তর দিলেন—'নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস এনেছি, তুমি যা পারো কর।'

যখন ওমর তাঁর বোনের সারা শরীর জুড়ে রক্তধারা প্রবাহিত হতে দেখলেন, তিনি স্নেহ-মায়া-মমতায় একেবারেই অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর সমস্ত রাগ ক্ষণিকের মধ্যে অনুতাপে পরিণত হলো। তিনি শান্ত হলেন। বোনকে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়

সেই লেখা, দাও আমাকে। তাঁরা বললেন আগে তুমি ওযু করে পবিত্র হয়ে এসো। তখন ওমর ওযু করে পবিত্র হয়ে এলো। তাঁরা সেই সূরা হাদিদের (৫৭) সাতটি মাত্র আয়াত (বাক্য) শরীফ তাঁর হাতে দিলেন। তিনি পড়লেন। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডল পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি লজ্জায়, ক্ষোভে ও অনুতাপে মাথা নত করলেন। তিনি বার-বার পড়লেন এবং তাঁর হৃদয় ওই সমস্ত কথাগুলোর অসাধারণ সৌন্দর্য-মহিমা দ্বারা এমনিভাবে আলোড়িত হলো—তাঁর মন ও হৃদয় হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রতি ও তাঁর ব্রতের প্রতি অতীব শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। সেই মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে তিনি সরাসরি হযরতের কাছে গেলেন। হযরত তখন তাঁর কতিপয় সহচরসহ আলোচনায় রত, যখন তিনি আকরামার গৃহে পৌঁছালেন—যেখানে নবীয়ে করীম (সাঃ) ছিলেন, একজন বলে উঠলেন "ওমব মুক্ত তরবারি সহ আসছেন।"

উপস্থিত ব্যক্তিদের হামজা বললেন—তাঁকে ভেতরে আসতে দাও, যদি তিনি ভাল মন নিয়ে আসেন উত্তম, নচেৎ তাঁরই তরবারি দ্বারা আমি তাঁর মস্তক ছেদন করব। যখন তিনি দরজার মধ্যে প্রবেশ করলেন—তখন হযরত তাঁর স্বভাব সুলভ ব্যবহারমতো তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন—"হে ওমর, কি উদ্দেশ্য! ওমর উত্তর দিলেন, "হে আল্লাহর নবী, আমি আমার বিশ্বাস ঘোষণা করার জন্য এসেছি।"

হযরত মহম্মদ (দঃ) এবং তাঁর সহচরগণ আশাতীত আনন্দে উচ্চস্বরে প্রশংসা করলেন সেই এক এবং অদ্বিতীয়ের—"আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার"—আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

পবিত্র কোরআন শরীফের যে কয়েকটি আয়াত দ্বারা তদানীন্তন মক্কার অন্যতম বীরপুরুষ ওমর মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় মোহিত হয়ে উঠেছিলেন, যাঁর ইসলাম গ্রহণে সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে মোড় ফিরে গিয়েছিল, সেই প্রসিদ্ধ আয়াত কয়টির অর্থ ঃ

"(১) আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়। (২) আসমান ও জমিনের সর্ব আধিপত্য তাঁরই, তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩) তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি ব্যক্ত ও গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (৪) তিনিই ছয় দিবসে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন —যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও ভূমি হতে নির্গত হয়, এবং আকাশ হতে যা বর্ষিত হয় এবং আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন। (৫) আসমান ও জমিনের আধিপত্য তাঁরই, সমস্ত বিষয় আল্লাহ্র দিকে প্রত্যর্পিত হয়। (৬) তিনি রাতকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে করেন রাতে, তিনি অন্তর্যামী। (৭) আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ্ তোমাকে যে ধনসম্পদ দান করেছেন তা হতে সৎ পথে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে তাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে।" কোরআন—৫৭ ঃ ১-৭

এই কয়েকটি মনোরম বাক্য শুনে ও পাঠ করে আরবের মহাবীর ওমর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন—"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মহম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত দূত।"

কঠিন সংগ্রাম ও কঠোর সাধনার দ্বারা হযরত মহম্মদ (দঃ) সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করেছিলেন। সামনে ছিল তাঁর দীর্ঘ পথ, দুর্জয় সাধনা, দুর্লভ মানব চিন্তা, দুর্বার বাসনা; তাঁর ওপর ছিল আল্লাহর অপার করুণা।

আবিসিনিয়া হতে প্রত্যাবর্তন কেন? ঃ ওমর ছিলেন কাজে ও কথায় এক অসাধারণ ব্যক্তি—এবং তিনি যখনই যা কিছু করতেন মনেপ্রাণে করতেন। তাঁর ইসলামধর্ম গ্রহণের কথা সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ল, আবিসিনিয়ার হতভাগ্য মুসলমানগণও জানতে পারলেন। ওমরের ইসলামধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে কোন মুসলমানই প্রকাশ্যে মক্কাতে প্রার্থনা করতে পারেননি। হযরত ওমর কিন্তু ইসলামধর্ম গ্রহণ করার পর কাবার সন্নিকটে প্রকাশ্যে প্রার্থনা করেন। এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য মুসলমানগণও যোগদান করেন। এই সংবাদ আবিসিনিয়ায় পৌঁছানো মাত্র সেখানকার মুসলমানগণ চিন্তা করলেন—হয়তো বা জন্মভূমি মক্কার অবস্থা আজ পরিবর্তনের পথে। তাই তাঁদের কেউ কেউ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু পবিস্থিতি তখনও ভীষণ ঘোরালো ছিল বলে তাঁরা আবার আবিসিনিয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হন।

কোন কোন জ্ঞানপাপী বিদেশী লেখক একটা অবান্তর প্রশ্ন বা অপবাদ হযবত মহম্মদ (দঃ)-এব চরিত্রে আরোপের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। প্রথমদিকে হযরত যখন কাবা বা কাবার সন্নিকটে প্রকাশ্যে প্রার্থনা পরিচালনা করতেন—তখন তিনি কোরআন শরীফের সূরা নজমের যে অংশটুকু পাঠ করেন তাতে আরবের ৩৬০টি পুতুলের প্রধান চারটির মধ্যে তিনটির প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে, তারা 'লাত', 'ওয্যা' ও 'মানাত'। জ্ঞানান্ধ বা ঈর্ষান্ধ বিদেশী লেখকগণ এই আয়াত বা কথাটির অর্থ বা প্রাসঙ্গিকতা কোন কিছু বিচার-বিবেচনা না করেই বলেছেন যে, হযরত মহম্মদ (দঃ) মক্কাবাসীদের প্রধান তিনটি দেবতা মেনে নিয়ে সন্ধি করেছেন। যে কোন না'বালককেও ওই আয়াত কয়টি পড়তে দিলে সে অনায়াসেই বলে দেবে এখানে সন্ধির কোন প্রশ্নই নেই—বরং ওই পুতুল দেবতাগুলোর অসারতা সম্পর্কে মানবমণ্ডলীকে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। সেই পবিত্র আয়াত কয়টি—

১৮। সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেইছিল।

১৯। তোমবা কি ভেবে দেখেছ "লাত ও ওয্যা" সম্পর্কে?

২০। এবং তৃতীয় আবেকটি 'মানাত' সম্পর্কে?

২১। তোমরা কি মনে কর পুত্রসন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যাসন্তান আল্লাহর জন্য?

২২। এইরূপ বণ্টন তো অসঙ্গত বণ্টন।

২৩। এইগুলো তো কেবল নামমাত্র, যা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রেখেছ। এব সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলিল প্রেরণ করেননি। তোমরা নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ কব, যদিও তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে।

কোরআন—৫৩ ঃ ১৮-২৩

যখন হযরত একাকী, যখন হযরত বিষাদ-বন্যার উত্তাল তরঙ্গে, যখন তাঁর প্রাণনাশের হুমকি, তখন তিনি উত্তর দিলেন—"এক হাতে সূর্য ও অন্য হাতে চন্দ্র দিলেও আমি আমার ব্রত হতে বিমুখ হবো না।" সেই হযরত যখন তাঁর দু' পাশে মহাবীর হামজা, মহাযোদ্ধা

ওমর, যখন বহু ধনী তাঁর শিষ্য, যখন মেরাজ সম্পন্ন, তখন তাঁর সৌভাগ্য হলো প্রকাশ্যে কাবায় প্রার্থনা করার, তখন কি করে তিনি ওই অবান্তর কথা মেনে নেবেন। একথা যেমন অযৌক্তিক তেমনি অসঙ্গত।

অসহযোগ ঃ কুরাইশগণ অনেক দিন থেকে হযরতকে হত্যার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু বনি হাশিম ও বনি মোত্তালিব গোত্রের প্রতিবাদে তা কাজে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। আবু তালিবের কাছে কুরাইশরা দাবি করেছিল—যে একজন যুবকের পরিবর্তে হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে আমাদের হাতে দিন আমরা তাঁকে হত্যা করে সব অশান্তি দূর করি। বনি হাশিম ও বনি মোত্তালিব গোত্রের প্রতিবাদে তারা যুদ্ধ করতে সাহস করেনি। হযরত মহম্মদ (দঃ), তাঁর সহচরবৃন্দ এবং হাশিম মোত্তালিব গোত্রের সঙ্গে মক্কাবাসীগণ এবার অসহযোগ আরম্ভ করল, তাঁদের সঙ্গে সকল রকম সামাজিক ব্যবহার বন্ধ করল। এইভাবে তারা একটা সভা ডাকল—এবং সেই সভাতে অসহযোগের কয়েকটি প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং সেটি কাবাগৃহে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। প্রস্তাব—"কেউই ওদের সঙ্গে কোন বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করবে না। কেউই ওদের কোন দ্রব্য ক্রয় করবে না। এবং ওদেরকে কোন বস্তু বিক্রয় করবে না। সামাজিক আদান-প্রদান আলাপ-আলোচনা সবই বন্ধ থাকবে। কেউ যদি কোন অবস্থায় সাহায্য করে তাহলে তাদের কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে।"

এবার তারা দ্বিমুখী অত্যাচার আরম্ভ করল। একদিকে অমানুষিক পীড়ন, অন্যদিকে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ—যাতে মুসলমানগণ তিলে তিলে মারা যায়। এই অত্যাচার আরম্ভ হলো হযরতের ব্রতের সপ্তমবর্ষের শুরুতে।

কোরআন ও কুরাইশ ঃ কুরাইশদের সকল অগ্রগতির মহাপ্রতিবন্ধক হয়েছিল একমাত্র পবিত্র কোরআন। তারা বহুদিকে বহু কিছুর সত্য-মিথ্যা মোকাবিলা করেছে, কিন্তু পবিত্র কোরআনের মুক্ত ঘোষণায় সকলের সকল চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেছে। মক্কাবাসীদের একান্ত ধারণা ছিল—একবার যদি হযরত কোরআনকে আল্লাহর বাণী বলে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে সকল মানুষ হযরতের অনুগামী হয়ে যাবে। তাই তারা সর্বপ্রকারের আঘাত হানার চেষ্টা করেছিল পবিত্র কোরআনে। হযরতের অসীম সাধনার এই পবিত্র কোরআনকে যে-ই শিকার করতে এসেছে সে-ই শিকার হয়ে গেছে। মহাবীর ওমরের মতো খ্যাতনামা পুরুষও তা থেকে নিষ্কৃতি পাননি।

কোরআন হযরতকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে ঃ

অভিযোগ ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) জাবির নামক এক খ্রীস্টান ব্যক্তির নিকট মাঝে মাঝে যেতেন। মক্কাবাসীগণ অপবাদ প্রচার করেন—জাবির তাঁকে কোরআন শিখিয়ে দিচ্ছে, যা তিনি আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করছেন। আসলে জাবিরের মাতৃভাষা আরবীই ছিল না। সুতরাং তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয় কি করে যখন আরবের সমস্ত বিখ্যাত লেখক কোরআনের অনুরূপ একটি বাক্য আনতে সমর্থ নয়। তাই পবিত্র কোরআনেরই প্রতিবাদ ঃ

"আমি তো জানিই তারা বলে তাকে (হযরত মহম্মদকে) শিক্ষা দেয় এক মানুষ ওরা যার প্রতি এই কথা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়, কিন্তু কোরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী।" কোরআন—১৬ ঃ ১০৩

আরবের বিখ্যাত কবি তোফায়েলের ইসলাম গ্রহণ ঃ এই সময়ে আরবে তোফায়েল আলা দাউসি নামে একজন বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণী মহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবি ছিলেন। তিনি হযরতের নাম শুনে মক্কায় আসেন হযরতের সঙ্গে দেখা করতে। এই কথা যখন মক্কাবাসীগণ জানতে পারল, তখন মৌমাছির মতো তাঁর কাছে সকলেই জমায়েত হলো। এবং তারা তাঁকে হযরতের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে সতর্ক করে দেয়। হযরতের বিরুদ্ধে যা কিছু বলার তা বলতে বাকি রাখেনি। তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি, অন্যদিকে নামকরা সাহিত্যিক কবি। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, কারও কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য মক্কা আসেননি। স্বয়ং হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের জন্য এসেছেন। সুতরাং সাক্ষাৎ আলোচনাতেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি হযরতের নিকট গমন করলেন। হযরত তাঁকে সাদরে বরণ করলেন। এবং পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ পাঠ করে শোনালেন। মহাকবি কালবিলম্ব না করেই ইসলামধর্মে তখনই দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ হারালেন না। জ্ঞানীর জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট। তিনি ফিরে গেলেন তাঁর দেশে, সঙ্গে নিয়ে গেলেন প্রত্যাদিষ্ট ওহী, যা অবতীর্ণ হয়েছিল হযরতের ওপর এবং তাঁর দেশের অধিকাংশ মানুষই তখন মুসলমান হয়ে যায়। মহম্মদ (দঃ)-এর মক্কা বিজয়ের পরে তাঁরা মক্কায় এসে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এটা ঘটেছিল ব্রতের একাদশ বছরে।

কুড়িজন খ্রীস্টানের ইসলাম গ্রহণ ঃ তখন হযরত মহম্মদ (দঃ) মক্কাতে। ২০ জন আরব খ্রীস্টান তাঁর নিকট এলেন এবং তাঁরা পবিত্র কোরআনের মর্মবাণীকে বিশ্বাস করলেন, তাঁরা শুধু বিশ্বাসই করলেন না, হযরত ঈসা (আঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন তার মিল তাঁরা দেখতে পেলেন। আরব খ্রীস্টানদের এই ব্যবহারে আরব অবিশ্বাসীগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো। তারা নতুন বিশ্বাসীদের অভিশাপ দিল, কিন্তু এই অভিশাপ তাঁদের ক্ষান্ত করতে পারল না। তাঁরা আপন দেশে ফিরে গেলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন নতুন ধর্মের নব বিশ্বাস।

"বল—তোমার কোরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর যাদের এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখনই তা পাঠ করা হয় তখনই তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারা বলে—আমাদের প্রতিপালকই পবিত্রতম, আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হবেই।"
কোরআন—১৭ ঃ ১০৭-১০৮

আরবের কয়েকজন নিন্দাকারীর গোপনে ইসলামের মাহাত্ম্য স্বীকার ঃ তখনকার দিনে যে কয়েকজন ব্যক্তি বেশি করে ইসলামের নিন্দা ও কুৎসা রটনায় ব্যস্ত থাকত, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল, আবু লাহাব, আল্ আখ্নাস্ প্রমুখ অন্যতম। এদের মধ্যে আবু লাহাব ও আবু জেহেল ব্যতীত সকলেই নিশীথ রাতের গোপন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে হযরতের কণ্ঠনিঃসৃত পবিত্র কোরআনের সুমধুর ধ্বনি শুনতে যেত। একদা হঠাৎ একের সঙ্গে অন্যের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তখন সকলেই ভীষণ লজ্জায় পড়ে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় তারা এমন কাজ আর কখনও করবে না। কিন্তু চোরের মতো গোপনে একাজ তারা করেই যেত। আবু সুফিয়ান নিজেকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার চিন্তা নিয়েছিল। একমাত্র

আবু লাহাব ও আবু জেহেলের অন্তরে কোন দাগ কাটেনি। হযরতের বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে সে নিহত হয়। সেই ঘটনা শোনার সাতদিন পর আবু লাহাবেরও মৃত্যু হয়।

পবিত্র কোরআন প্রচারে হযরতের কঠোর সাধনা ঃ আল্লাহ্ হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন "ইসলাম' প্রচার করতে এবং মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতে। এইজন্য তাঁর দায়িত্ব ছিল শুধুমাত্র প্রচার করা, আহ্বান করা। কিন্তু তিনি তাঁর দায়িত্বে এতই সতর্ক ছিলেন যে, যাতে কোন রূপ ত্রুটি না হয় তাই তিনি সকল মানুষকে ইসলামের শীতল ছায়ায় আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তাঁর ধারণা ছিল—হয়তো সকল মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করতেই হবে। এই নিয়ে তাঁর সাধনার কোন সীমা ছিল না। এতে তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতেন, মানসিক একটা কষ্টও পেতেন, হযরতের এই উৎকণ্ঠা ও মানসিক উদ্বেগকে উপশম করার জন্য আল্লাহ্ কিছু সান্ত্বনা বাক্য দিলেন, তখনও হযরত মদিনায় হিযবত করেননি।

"অংশীবাদীরা বলবে—আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর উপাসনা করতাম না। তাঁর আদেশ ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করতাম না। ওদেব পূর্ববর্তীগণ এইরূপই করত। রসুলদের কর্তব্য শুধু স্পষ্ট বাণী প্রচাব করা।" কোরআন—১৬ ঃ ৩৫

"তুমি ওদের পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও যে পথভ্রান্ত আল্লাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন না, এবং ওদের কোন সাহায্যকারীও নেই।"

কোরআন—১৬ ঃ ৩৭

"আমি মানুষের জন্য তোমার প্রতি সত্যসহ কেতাব অবতীর্ণ করেছি অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজ কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে বিপথগামী হয় নিজ ধ্বংসেরই জন্য এবং তুমি ওদের তত্ত্বাবধায়ক নও।" কোরআন—৩৯ ঃ ৪১

"ওদের যে (শাস্তির) কথা বলি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিযে দিই অথবা যদি (এর পূর্বে) তোমাব মৃত্যু ঘটাই, তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা, হিসাব-নিকাশ সে তো আমার কাজ।" কোরআন—১৩ ঃ ৪০

হযরতকে সাধনায অতি ক্লান্তিকর অবস্থায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে ঃ

"অতঃপর এটি কি সম্ভব যদি তারা এই কথা বিশ্বাস না করে তবে কি তুমি সেই দুঃখে তাদের পেছনে স্বীয় জীবন নষ্ট করবে।" কোরআন—১৮ ঃ ৬

আবার জোর করতেও নিষেধ করা হয়েছে ঃ "তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই বিশ্বাস করত, তবে কি তুমি বিশ্বাসী করার জন্য মানুষের ওপর বল প্রয়োগ করবে।" কোরআন—১০ ঃ ৯৯

"তুমি তাদের ওপর সংরক্ষক (দারোগা) নও।" ৮৮ ঃ ২২। কেননা "ধর্মে বল প্রয়োগ নেই।" কোরআন—২ ঃ ২৫৬

"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।"

কোরআন—১০৯ ঃ ৬

আসলে হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর জীবনে সাধনা ব্যতীত অন্য কিছু জানতেন না। তাই তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকে ওই পথে উৎসর্গ করেন। এবং এই উৎসর্গের পেছনে অন্য কিছু

ছিল না, একমাত্র ছিল সর্বমানবের জন্য নিষ্কাম বাসনা ও কালিমাহীন কামনা। তাই বলতে পেরেছিলেন—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

অন্ধমানব আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম ঃ একদা হযরত মহম্মদ (দঃ) কুরাইশদের অন্যতম এক নেতা ওয়ালিদ বিন মুগিরার সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত। এই সময় ইবনে মাকতুম নামক এক অন্ধ ব্যক্তি হযরতের নিকট আসেন এবং কোরআন সম্পর্কে তাঁকে কিছু শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন।

একজন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার মাঝখানে অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে হযরত বিরক্ত বোধ করলেন। এবং আপন কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন। এদিকে অন্ধ ব্যক্তি তাঁকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। তখন হযরত বিরক্তি সহকারে অন্যদিকে ঘুরে গেলেন। যখন মহম্মদ (দঃ) মুগিরার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করলেন, তখন ফেরেশ্‌তা জিবরাইল নিম্ন আয়াত শরীফ সহ হাজির ঃ

১। "সে [মহম্মদ (দঃ)] ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল।

২। কারণ তার নিকট এক অন্ধ (আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম) এল।

৩। তুমি কি জান হয়তো সে পবিত্র হতো।

৪। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। এবং উপদেশ দ্বারা উপকৃত হত।

৫। ফলত যে ব্যক্তি নিঃশঙ্ক (পরোয়া করে না, বিভবশালী)।

৬। তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছো।

৭। সে নিজে শুদ্ধ না হলে তোমার কোন অপরাধ নেই।

৮। যে তোমার নিকট দৌড়ে আসে এবং

৯। শঙ্কাও করে।

১০। তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে।" কোরআন—৮০ ঃ ১-১০

তখন হযরত খুবই অনুতপ্ত হলেন এবং তাঁর মনে হলো হয়তো বা আল্লাহ্ এতে ক্ষুব্ধ হলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার ফেরেশ্‌তা ঃ

১১। কখনও না, (মনে রেখো এরূপ আচরণ অনুচিত) এটি উপদেশবাণী।

১২। অতএব যার ইচ্ছা সে এটি স্মরণ করুক। কোরআন—৮০ ঃ ১১-১২

আমরা এই ঘটনা হতে জানতে পারলাম, মহান আল্লাহ্ তাঁর দূতকে কতখানি নিখুঁত অবস্থায় রেখেছেন। আমরা যেটিকে একেবারেই ত্রুটি মনে করি না, সেটাও তাঁর কাছে ত্রুটি। তাই হযরত বলছেন—"হাসানাতুল আব্‌রার ; সাইয়াতুল মোকাররেবীন"—দূরস্থ ব্যক্তির জন্য যেটি পুণ্য, নিকটস্থ ব্যক্তির জন্য সেটি পাপ।" অর্থাৎ একজন নাবালক ছেলে-মেয়ে বা একজন অশিক্ষিত ব্যক্তির জন্য যেটা শোভনীয়, সেইটাই একজন বয়স্ক বা শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য অন্যায় অশোভনীয়।

ইবনে মাকতুম অন্ধ না হলে হয়তো ওই অবস্থায় তিনি হযরতকে বিরক্ত করতে যেতেন না।

কোরআন প্রচারে বাধার নতুন পদ্ধতি ঃ আরবে প্রতিবছর ওকাজ মাজানা ও ধুল মাজাজে মেলা বসত। হযরত এই জনসভায় গিয়ে আপন কথা প্রচার করতেন।

মুগিরার সভাপতিত্বে অবিশ্বাসীগণ একটা সভা ডাকল—হযরতকে কি নামে ডাকবে স্থির করার জন্য। কেউ কেউ বলল—তাঁকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলা হোক। কিন্তু হযরত জীবনে কোনদিনই ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। তিনি সবসময় বলতেন গায়েবের খবর আল্লাহ্ জানেন। সকলেই বলল এটা অসঙ্গত। তখন কেউ কেউ বলল—তাঁকে পাগল বলা হোক। তখন ওয়ালিদ বললেন—ওটাও হতে পারে না। কেননা তিনি চরম বিবেকবান পুরুষ। তখন কেউ কেউ প্রস্তাব দিল—তাঁকে জোলা বলা হোক। ওয়ালিদ বলল, না। কেননা তিনি কোন সময় সূতা বহন করেন না। তখন সকলেই ওয়ালিদকে জিজ্ঞাসা করল তাঁকে কি নামে ডাকা যেতে পারে? তখন ওযালিদ পরামর্শ দিল—তাঁকে কথার জাদুকর বলো। কেননা তিনি কথার জাদু দ্বারা একটা মানুষকে তার পিতা-মাতা-ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন হতে পৃথক করছেন।

একদিক দিয়ে এটা সত্য, যখনই কোন মানুষ হযরতের কথায় মুগ্ধ হয়ে কোরআনে বিশ্বাসী হতেন, তখনই তিনি মুসলমান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের নিকট হতে দূরে সরে পড়তেন। এই কথা অবিশ্বাসীগণ মেলায় সকল মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করল—তারা যেন ঘৃণাক্ষরেও হযরতের নিকট না যায় এবং তাঁর কোন কথাই না শোনে। শুনলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এইভাবেই কুরাইশগণ একদিন কোরআন শরীফকে আপন অজ্ঞাতানুসারেই অতি মানবীয় আল্লাহর সৃষ্টি বলে মেনে নিল।

বাধার শেষ পন্থা—নাদের বিন হারিছ ঃ যখন কুরাইশগণ কোনদিক দিয়েই কোন রূপেই পবিত্র কোরআনের মোকাবিলা করতে পারল না. তখন তারা একজন অতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক ঠিক করল। তারা নাদের বিন হারিছের কাছে হাজির হলো। সে প্রাচীন রাজা-বাদশাহের কাহিনী সুললিত কণ্ঠে চারণ কবিদের মতো অবিরাম বলতে পারত। এরপর ঠিক হলো—অবিশ্বাসীগণ তাকে টাকা জোগাবে এবং সে হযরতের পিছু পিছু ধাওয়া করবে। যখনই যেখানেই হযরত তাঁর প্রচারকার্য চালাবেন, তখনই সেও তার স্বভাবসুলভ বাগভঙ্গিতে গান আরম্ভ করবে।

এইভাবে হযরত যখনই যেখানেই প্রচারকার্য আরম্ভ করতেন, নাদের সেখানেই গোলমালের সৃষ্টি করত। এমনকি যখন নামাযের জন্য আযান দেওযা হতো, তখন নাদের গান ও কাহিনী জুড়ত। এবং অন্যান্য সঙ্গীরা কেউ বা ঘণ্টা বাজাত, কেউ বা ঢোল বাজাত, কেউ বা অহেতুক কুকুরের মতো চিৎকার করত। এককথায় যাতে কেউ আযান শুনতে না পায়, তারা সে রকম করত।

"অবিশ্বাসীরা বলে, তোমরা কোরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তি কালে সোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে জয়ী হতে পার।" কোরআন—৪১ ঃ ২৬

যখন অবিশ্বাসীদের সকল চেষ্টা সকল উদ্যম সব উৎসাহ নিভে গেল, যখন সকল অত্যাচার সকল অনাচার সব অবিচার নির্মমভাবে হার মেনে গেল, তখন তাদের সামনে আর একটিই পথ খোলা ছিল—সেটা হযরতকে "একঘরে করা"। সকলে সভা করে একমত হয়ে কাবা গৃহে নব অধ্যায়ের নতুন কর্মসূচী টাঙিয়ে দিল—"**হযরত একঘরে**"।

সপ্তম অধ্যায়

কুরাইশদের বয়কট, হযরত সমাজচ্যুত, একঘরে ও অন্তরীণ

নবুয়তের (ব্রতের) সপ্তম থেকে দশম বছর

ব্রতের সপ্তম বর্ষের দশম মাস থেকে দশম বছর পর্যন্ত হযরত ও তাঁর সাহাবাদের একেবারেই কুরাইশগণ একঘরে করে দেন। কুরাইশগণ হযরতের নিকট থেকে কোন জিনিস ক্রয়ও করতেন না, বা তাঁদের নিকট কোন বস্তু বিক্রয়ও করতেন না। শুধু তাই নয়, তারা তাঁদের সঙ্গে সমস্ত রকমের সামাজিক সম্পর্ক ত্যাগ করেন। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মোট চারশ'র মতো। তাও তাঁরা কোন একটি জায়গায় ছিলেন না। তিন স্থানে ছড়িয়ে ছিলেন। আবিসিনিয়ায় কিছু, হযরতের সঙ্গে কিছু, কিছু আবার এখানে ওখানে।

সামান্য সংখ্যক মুসলমান তাও আবার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত। সরাসরি হযরতের উপদেশ হতেও তাঁরা বঞ্চিত। তাঁর অসাধারণ উৎসাহ দান হতে তাঁরা বঞ্চিত। এককথায় সমগ্র ইসলাম জাহানের সূতিকাগার তখন যে কোন সঙ্কট মুহূর্তের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁদের অসীম মনোবল ব্যতীত আর কিছুই তাঁদের ছিল না। এখানেই হযরতের মানবিক মূল্যের যথার্থ মূল্যায়ন—

নিঃস্ব জীবনে শুধু নৈতিক বল
তোমাকে পাহাড় হতেও করেছে সবল। --কাব্যকানন

কুরাইশদের প্রতিজ্ঞা ও বৈরীভাব লক্ষ্য করে আবু তালিবের পরামর্শে হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর সাহাবাগণ বনি হাশিম ও বনি মোত্তালিব গোত্রের লোকজন সহ 'আবু তালিব' নামক গিরিসঙ্কটে প্রস্থান করলেন। এই গিরিসঙ্কটটি আগে থেকেই বনি হাশিম গোত্রের অধিকারে ছিল। তাঁরা ভাবলেন, সেখানে একতাবদ্ধ হয়ে সতর্কতার সঙ্গে থাকলে বিপদ কম হবে এবং বাইরে থেকে খাদ্যসংগ্রহ করা সহজ হবে। তাঁদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দ্রব্যসামগ্রী ফেলে রেখে তাঁরা সামান্য খাদ্যশস্য ও পানীয়-সহ সেখানে অবস্থান করছিলেন। এদিকে কুরাইশগণ যাতায়াতের সব যোগাযোগ বন্ধ করার বন্দোবস্ত করে, যাতে তাঁরা কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে না পারে। কাজেই যত দিন যেতে লাগল ততই খাদ্যদ্রব্যের অভাব দেখা দিল। গিরিসঙ্কটের মধ্যে মুসলমানগণ এক দুদিন নয়, দেখতে দেখতে দু' বছরেরও বেশি সময় আবদ্ধ ছিল। সাহাবাগণ বলেন যে, এই সময় ক্ষুধার জ্বালায় বাচ্চা শিশুদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হয়ে উঠত, এমনকি গিরিসঙ্কটের বাইরে থেকে এই করুণ মর্মবিদারক কান্নার আওয়াজ শোনা যেত। তবু মক্কাবাসী কুরাইশদের পাষাণ-হৃদয় একটুও বিচলিত হত না। আর একদিকে শত অন্যায়, অত্যাচার, অসহ্য ক্ষুধার জ্বালা, স্ত্রীলোক ও শিশুদের করুণ মর্মবিদারক কান্না, স্বজনদের মলিন মুখ সর্বোপরি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হযরত ও তাঁর সাহাবাবৃন্দের

কি সহ্য, কি ধৈর্য, কি অটল নির্বিকার বিশ্বাস। এরূপ আল্লাহর নির্ভরতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাই আল্লাহর অপার রহমতে তাঁর সাফল্যেরও কোন তুলনা নেই। এই সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখ আছে—

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ভয়-ভীতি দ্বারা ও ক্ষুধা দ্বারা এবং ধন-প্রাণ শস্যহানির দ্বারা পরীক্ষা করব! হে রসুল, তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও—যারা বিপদ এলে বলে থাকে যে, আমরা তো আল্লাহরই, নিশ্চিতভাবে তারই দিকে ফিরে যাব। এরাই তো তারা যাদের ওপর আল্লাহর অসীম করুণা বর্ষিত হয় এবং এরাই সৎপথপ্রাপ্ত।"

কোরআন—২ ঃ ১৫৫-৫৬

বিরাম বিহীন অত্যাচারে ওষ্ঠাগত প্রাণ
অদ্বিতীয় এক আল্লাহর করিছে জয়গান।

হযরত কোনদিনই দমিত হওয়ার লোক ছিলেন না। কেননা তিনি জানতেন—সত্য কোন সময়েই চিরতরে নির্বাপিত হতে পারে না। তাই তাঁর ভেতরে আগুন সবসময়ই প্রজ্বলিত ছিল, সে আগুন নেভানোর শক্তি পৃথিবীর কোন শক্তিরই ছিল না। আরবের প্রচলিত নিয়ম মতে পবিত্র মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকত, তাই হযরত এই কয়েক মাস তাঁর মতামত প্রচারের সুযোগটা গ্রহণ করতেন। যে সমস্ত তীর্থযাত্রী ওকাজ মাজানার ও ধুল মাজাজের জনসমাগমে যোগদান করতে আসতেন, হযরত তাঁদের মধ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করতেন। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের অভিসন্ধিতে আবু লাহাব সবসময়ই হযরতকে অনুসরণ করে থাকত—যাতে তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে না পারেন। কিন্তু ক্ষুধা, ভয়, ক্ষোভ কোন কিছুই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। কেননা তিনি জানতেন একদিন আল্লাহর বাণী মানুষের মন জয় করবেই। এবং আল্লাহর সাহায্য তিনি পাবেন। শত অত্যাচার, শত শত লাঞ্ছনা হযরতকে দমাতে পারেনি। কিন্তু সকলেই তো হযরত ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে ছিল সাধারণ মানুষ নারী শিশু প্রভৃতি। তাঁদের এত তীব্র ও কঠোর অমানুষিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল যে তা অবর্ণনীয়, কেউই কোন আহার পাওয়া তো দূরের কথা, আহারের সন্ধানও পেতেন না। সকলের অবস্থা অতি অসহনীয় হয়ে উঠল, যখন তাঁদের মাছুম শিশুরা ক্ষুধায় চিৎকার করতে থাকত। বনের লতাপাতা শুকনো চামড়া ইত্যাদি খেয়ে তাঁরা জীবন ধারণ করতেন।

আবু লাহাব, আবু জেহেল ও আরও কতকগুলো পাষাণহৃদয় মুসলমানদের এরূপ অবস্থায় আমোদ উপভোগ করত, এবং তারা চিন্তা করত—এবার মহম্মদ (দঃ)-এর অবস্থা, আর কোন উপায় নেই ; যখন অবিশ্বাসী কুরাইশগণ দেখল দিনের পর দিন নিরপরাধ লোকগুলো অসহায়ভাবে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে, তখন তাদের মধ্যে কতকগুলো লোকের হৃদয় বিগলিত হয়ে উঠল, তারা গোপনে বিশ্বাসীদের ছেলেমেয়েদের খাদ্য জোগান দিতে আরম্ভ করল। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হাশিম বিন আমর। তিনি জুহাইর বিন উমাইয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। জুহাইয়ের মা আতিকা ছিলেন আবদুল মোত্তালিবের কন্যা।

তাঁদের দু'জনের গোপন কথোপকথনে জুহাইর কুরাইশদের হযরতকে ওই একঘরে করানোর লিখিত প্রস্তাবকে বাতিল করার প্রস্তাব দেন। এবং তাঁরা আরবের আরও

তিনজনের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করেন। তাঁরা ছিলেন—মুতিম বিন আদি, আবুল বখতারি ইবনে হাশিম এবং জামাহ বিন আসওয়াদ। অতঃপর এই পাঁচজনে একত্রে ঘোষণা করলেন ওই লিখিত একঘরেনামা বাতিল।

পরদিন সকালে জুহাইর কাবায় গমন করলেন। এবং কাবা সাতবার প্রদক্ষিণ করার পর ঘোষণা করলেন—"হে মক্কার অধিবাসীগণ, হে মক্কার অধিবাসীগণ" সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক সেখানে সমবেত হয়। তখন তিনি ঘোষণা করলেন—আমি কখনও কুরাইশদের সঙ্গে একত্রে বসব না। যতক্ষণ পর্যন্ত নোংরা প্রস্তাবনামাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া না হয়।

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবু জেহেল চিৎকার করে উঠল—"তুমি একজন মিথ্যাবাদী, শপথের এই কাগজ তুমি কখনও ছিঁড়ে ফেলতে পারো না।"

তখন ওই পাঁচজন এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলে বলে উঠলেন আবু জেহেল মিথ্যাবাদী। এবং উপস্থিত সকল মানুষ ওই পাঁচজনের সমর্থনে কথা বলায় আবু জেহেল রাগে ফেটে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করলেন।

মুতিম ওই নোংরা প্রস্তাবনাটিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন, শুধু ওই অংশটি বাদ দিয়ে যেখানে লেখা ছিল "হে আল্লাহ্, তোমার নামে।"

অবরোধমুক্ত মহম্মদ (দঃ) ঃ এই ঘটনার পর হযরত অবরোধ থেকে বাইরে এলেন এবং তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাঁর শত্রুপক্ষ বহুগুণে তাদের অত্যাচারের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে। এই দুর্দিনে হযরত তাঁর সহকর্মীদের এতটুকুও সাহায্য করতে পারতেন না। তবুও তাঁদের ঈমানের জোর জাগিয়েছিল তাঁদের এক স্বর্গীয় জীবনীশক্তি। তাই জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও তাঁরা ছিলেন অটল।

দুঃখ-শোকের বছর ঃ আবু তালিব ও বিবি খাদিজার জীবনাবসান ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নবুয়তের দশম বছর। তখন আবু তালিবের বয়স আশি। একদিকে হযরত অবরোধমুক্ত, অন্যদিকে তাঁর একান্ত সাহায্যকারী মানুষ আবু তালিব জীবনের শেষ শয্যায় শায়িত। যখন কুরাইশগণ জানতে পারল আবু তালিব আর বেশিদিন নেই, তখন তাঁর নিকট গেলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনি আমাদের মধ্যে একজন প্রধান জ্ঞানী ব্যক্তি। আপনি জানেন কি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে দিন-রাত আমাদের এবং আপনার ভাইপো হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মধ্যে। আপনি তাঁকে ডাকুন এবং সম্মত করান, আমরাও সম্মত হবো। তিনিও আমাদের আক্রমণ করবেন না, আমরাও তাঁকে আক্রমণ করব না; তিনি তাঁর ধর্ম পালন করবেন। এবং আমরা আমাদের ধর্ম পালন করব। তিনি যেন একটা সন্ধিতে আসেন, একটি শর্তে আসেন। কিন্তু হযরতের চরিত্র ছিল দুর্নিবার ঃ

রাখিয়া "তওহিদ-রব" হৃদয়ে বন্দী
সেখানে মানোনি কোন শর্ত সন্ধি। —কাব্যকানন

আল্লাহর নিকট হতে ইঙ্গিতও ঠিক সেই রূপেই পেলেন, "সুতরাং তুমি মিথ্যাবাদীদের কথামত চলো না। ওরা চায় যে তুমি নত হলে ওরাও নত হবে।"

কোরআন—৬৮ ঃ ৮-৯

হযরতকে আবু তালিবের শয্যাপাশে ডাকা হলো। তিনি হাজির হলেন। আরবের প্রধান ব্যক্তিগণও হাজির হলেন। যখন হযরতকে ওই সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন, "আমার শুধু একটি কথাই বলার আছে, যা আপনাদের আরবদের বাদশা এবং বিদেশের সম্রাটও বানাবে। আবু জেহেল বলল, "ঠিক আছে, তোমার পিতার শপথ, এটা এককথায় সমাধান হয়ে যাক। হযরত বললেন, "বলুন আল্লাহ্ এক, আমরা ঐ সমস্ত পুজো ত্যাগ করলাম।" এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হযরতকে ত্যাগ করলেন এবং যা বলে গেল কোরআনের কথায়—

"এদের নিকট এদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এল, এতে এরা বিস্ময়বোধ করছে এবং অবিশ্বাসীরা বলে 'এ তো এক জাদুকর মিথ্যাবাদী। সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এটা বিস্ময়কর ব্যাপার। ওদের প্রধানরা এই বলে কেটে পড়ে—তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় অবিচল থাক। নিশ্চয় তা (মহম্মদের) এক স্বেচ্ছাকৃত বাক্য।" কোরআন—৩৮ ঃ ৪-৬

সুতরাং হযরতের জীবনের একান্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আবু তালিবের অন্তিম শয্যাপাশে কোন কিছুই স্থির হলো না। এদিকে আবু তালিব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই বিবি খাদিজাও ইহলোক ত্যাগ করেন। এমন দু'জন একই বছরে হযরতকে ছেড়ে গেলেন—যাঁদের তুলনা ছিল না। হযরতের জীবনের প্রথম অধ্যায়ে এই দু'জন মানুষের সক্রিয় সাহায্য সহানুভূতি সমবেদনা এত বেশি যে তাঁর সমগ্র জীবনে এঁদের তুলনা ছিল না।

স্বজন বিয়োগে হযরতের বিরহবেদনা ঃ মহানবী ঘরে-বাইরে আল্লাহর দুটো নিয়ামতকে লাভ করেছিলেন, ঘরে ছিলেন গরীয়সী মহিলা জীবন-সঙ্গিনী বিবি খাদিজা, যিনি ছিলেন তাঁর জীবনের সকল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উৎস ও সান্ত্বনার জীবন্ত প্রতীক; বাইরে ছিলেন গরীয়ান্ পুরুষ পিতৃব্য আবু তালিব, যিনি ছিলেন তাঁর দুর্জয় জীবনের মহাদুর্দিনের বিরল ব্যক্তিত্ব, অটল মানুষ। আজ ঘর ও বাহির দুই-ই শূন্য। এই দু'জনের মৃত্যুতে হযরতের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়েছিল তা অনুভব করা ব্যতীত লেখা সম্ভব নয়। তিনি এতই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন যে, এর পূর্বে তিনি কখনও কোন দুঃখে বা শোকে এতখানি মর্মাহত হননি। তিনি নিজে বলে গেছেন, তাঁর জীবনে জগতের কোন দুঃখই আবু তালিবের বিয়োগ-যন্ত্রণাকে অতিক্রম করতে পারেনি। আবু তালিব যেমন হযরতকে আপন পুত্র অপেক্ষা বেশি ভালবাসতেন, হযরতও তেমনি আবু তালিবকে আপন পিতা অপেক্ষা বেশি ভালবাসতেন। বিবি খাদিজা তাঁর জীবনে এক বিশেষ (মহান) স্থান অধিকার করেছিলেন।

অসহ্য শোকযন্ত্রণার পরও হযরত আবার ইসলাম প্রচারে ঃ হযরতের বয়স ৫০, শত শোক-দুঃখেও তিনি আজ অবিচল। তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সহনশীলতা সবকিছুই আজ তাঁকে পূর্ণতা দান করেছে। এদিকে অবিশ্বাসীগণ তাঁদের অত্যাচারের মাত্রা বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। একদিন হযরত আপন মনে মক্কার পথে চলেছেন। এমন সময় একজন দুষ্ট কুরাইশ তাঁর পবিত্র দেহে ও মাথায় পচা কাদা ছুঁড়ে দিল। হযরত কোন কথা না বলেই আপন

মনে আবার বাড়ির পথে ফিরে গেলেন। সদ্য মা-হারা কন্যা ফাতেমা-বিবি পিতাকে এই অবস্থায় দেখে অধীরভাবে কেঁদে উঠলেন এবং পিতাব পবিত্র দেহকে পরিষ্কার করলেন। কিন্তু তখনও হযরত একটা কথাও তাদেব বিরুদ্ধে বললেন না। কন্যাকে বললেন, "হে আমার প্রিয় কন্যা, তুমি কেঁদো না, আল্লাহ্ তোমার পিতাকে রক্ষা কববেন।"

মহানবী ও হযরত আবুবকর প্রহৃত ঃ এই সময় একদিন হযরত কাবায় প্রার্থনায় রত ছিলেন। এমন সময় উক্‌বা বিন আবি মুয়িত নামক এক ব্যক্তি হযরতের গলায় কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে জীবনের মতো শেষ করার উপক্রম করে। তখন অন্যান্য কুরাইশগণ পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে, এমন সময় হযরত আবুবকর ছুটে গিয়ে তাঁকে দুরাচারের কবল থেকে রক্ষা কবেন। এবং চিৎকার করে বলে ওঠেন—তোমরা কি একটি মানুষকে একেবারেই বধ করে ফেলতে চাও, যেহেতু তিনি বলেছেন, "আমার প্রভু একমাত্র আল্লাহ"। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবুবকরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত প্রহার করে।

আবার একদিন যখন হযরত আপন মনে কাবায় আরাধনায় রত, এমন সময় দেবদেবীদের নামে উৎসর্গীকৃত উটের নাড়িভুঁড়িগুলো তাঁব শরীরের ওপর নিক্ষেপ কবা হয়। তিনি এতই নিবিড়ভাবে ধ্যানমগ্ন ছিলেন কিছুই বুঝতে পারেননি। তখন কুরাইশগণ হাসাহাসি করছে। তিনি তখনও নীরব প্রার্থনায়—

জীবন হয়েছে যবে ওষ্ঠাগত
বাধার কণ্টকেতে ক্ষতবিক্ষত
তখনও নিবিড় প্রাণে অবিরাম ধ্যান
দাও প্রভু অবোধেরে বোধশক্তি জ্ঞান।
যে কাজ করিছে তারা অবোধ মনে
তুমি তাদের ক্ষমা কর ক্ষমাশীল মনে।
করিলে প্রার্থনা তুমি ওগো নিরঞ্জন—
দাও প্রভু সকলেরে সত্যান্বেষী মন। —কাব্যকানন

হযরত আবুবকরের দেশত্যাগের ইচ্ছা ঃ অত্যাচার এত তীব্র হয়ে উঠল যে হযরত আবুবকরের মতো ধৈর্যশীল মানুষও মক্কা ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন। তিনি ছিলেন হযরতের একান্ত বন্ধু। একদিন আবুবকর মক্কা ত্যাগ করলেন, এবং পৌঁছলেন বার্ক আল গামেদ নামক স্থানে। সেখানে তিনি কোরা গোত্রের প্রধান ইবনে দুগান্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দু'জনের কথোপকথনে ইবনে দুগান্না সমস্ত বিষয় জানতে পারলেন। ইবনে দুগান্না সমস্ত কিছু জেনেশুনেই হযরত আবুবকরকে নিজের কাছে রাখতে পারলেন না। আবার আবুবকরের মতো এক ন্যায়পরায়ণ ও পরোপকারী ব্যক্তি দেশ ছেড়ে চলে যান, তাও তিনি চান না। পরিশেষে তিনি তাঁকে পুনরায় মক্কায় নিয়ে গেলেন এবং কুরাইশ প্রধানদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, যাতে আবুবকর মক্কায় বসবাস করতে পারেন। কুরাইশগণ সম্মত হলেন—কয়েকটি শর্তে। আবুবকর জোরে কোরআন শরীফ পাঠ করতে পারবেন না। যাতে কুরাইশদের ছেলে-মেয়েরা শুনে বিপথগামী না হয়। আবুবকর প্রথমত

রাজি হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবুবকর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। তিনি উচ্চস্বরে কোরআন শরীফ আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন। তখন কুরাইশগণ ইবনে দুগান্নার কাছে নালিশ করল। ইবনে দুগান্না হযরত আবুবকরের নিকট এসে বললেন, "আপনি শর্ত ভঙ্গ করেছেন। মক্কাবাসীগণ ভাবছে আমি এমন একজন মানুষের দায়িত্ব বা প্রতিবেশিত্ব নিলাম, যিনি শর্ত ভঙ্গ করেন, আমি এরূপ পছন্দ করি না।" তখন হযরত আবুবকর বললেন—"আমি আপনার প্রতিবেশিত্বকে ফেরত দিলাম। এবং আল্লাহর প্রতিবেশিত্ব নিলাম।" এইভাবে মুসলমানগণ তাঁদের আপন ধর্মে অটল রয়ে গেলেন, ওদিকে অবিশ্বাসীগণ তাদের অত্যাচারেও অটুট রয়ে গেল।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তায়েফের পথে হযরত মহম্মদ (দঃ) ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) সংসারের সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে মন স্থির করলেন, একমাত্র আল্লাহর বাণী প্রচারে। যখনই কোন আঘাত তাঁর জীবনে আসত, তা থেকে তিনি তিনগুণ শক্তি সঞ্চয় করতেন। তিনি নিষ্ক্রিয় নীরব জীবন অপেক্ষা মৃত্যুকে অনেক শ্রেয় মনে করতেন। তিনি অবিশ্বাসীদের নেতা আবু জেহেলকে মুখের ওপর বলেছিলেন—দিন আগত, যেদিন সমস্ত কুরাইশগণ এক আল্লাহতে ঈমান আনবে। নিজের প্রতি তাঁর এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি জানতেন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবেন তাঁর আল্লাহ্, এবং আল্লাহর বাণী সর্বত্র পৌঁছবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শুধু মক্কা নয়, সমগ্র আরবেই আল্লাহর বাণী অচিরাৎ পৌঁছবেই।

একদিন তিনি তাঁর পালিত পুত্র যায়েদকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা হতে ৬০ মাইল দূরে তায়েফের পথে যাত্রা করলেন। তখন ছিল তাঁর নবুয়ত বা ব্রতের দশ বছরের দশ মাস। তিনি সেখানে বানু বকর গোত্রে আল্লাহর বাণী প্রচারে উদ্যত হলেন। কিন্তু লক্ষ্য করলেন—তারা মক্কার কুরাইশগণ হতে এতটুকুও কম নয়। তারা সকলেই হযরতকে ঘৃণাভরে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভাবে প্রত্যাখ্যান করল। হযরত জানতেন—তিনি তায়েফবাসীদের থেকে কি অভ্যর্থনা পাবেন। তবুও তিনি গিয়েছিলেন—কেননা, তিনি ছিলেন প্রধানত প্রচারক। ফলাফল আল্লাহর হাতে। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রাপ্তির কোন দুরাশা নিয়ে কোথাও যেতেন না। ফলে কোথাও হতাশও হতেন না। নিরাশ বা নৈরাশ্য তাঁকে কোনদিনই নিস্তেজ করতে পারত না। তিনি ছিলেন অপ্রতিহত মানব মহান।

তায়েফে 'লাত' দেবতার পুজোর জন্য একটা বড় মন্দির ছিল। হযরত প্রথমত সেখানেই গেলেন, এবং সেখানকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের ডাক দিলেন। যেমন আব্দ জালিল বিন আমর বিন উমাইর, মাসুদ এবং হাবিব। হযরত তাদের সকলকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন। তারা এমন উত্তর দিল যা অসঙ্গত, অযৌক্তিক এবং অবান্তর।

হযরত তাদের ত্যাগ করলেন। কিন্তু তারা হযরতকে ত্যাগ করল না। তারা কতকগুলো দুষ্ট যুবক ও বালকদের লেলিয়ে দিল হযরতের পেছনে। তারা হযরতের ওপর ইঁট পাটকেল, ধূলা-মাটি, ঢিল-কাদা, গোবর ইত্যাদি নানা নোংরা জিনিস নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। দীর্ঘ তিন মাইল পর্যন্ত তারা এইভাবে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে তাঁকে পাগলের মতো এক মর্মান্তিক অবস্থায় নিয়ে আসে। তাঁর শরীর ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত,

পায়ের জুতো রক্তে রঞ্জিত হলো। তাঁর এই যাত্রা এমনি ভয়াবহ ছিল, তিনি নিজে বলেছেন অত্যাচারের তীব্রতায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, অবশেষে তিনি উৎবা বিন রাবেয়ার কাছে পৌঁছলেন, যখন দুষ্ট লোকগণ তাঁকে ত্যাগ করল, তিনি নিস্তার পেলেন। এমনই ছিল তাঁর কঠোর সাধনা, অসাধারণ সহ্য ও অসীম ধৈর্য যা সমগ্র মানব ইতিহাসে বিরল ও নজির বিহীন।

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মহম্মদ (দঃ) ঃ মানুষের জীবনে মানুষকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য যদি কোন অবকাশ থেকে থাকে, তাহলে হযরতের জীবনে ওই কাজটি সমাধা করার জন্য তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের সময়টি শ্রেষ্ঠতম সুযোগ ছিল। কেননা সমগ্র তায়েফবাসীদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না, যে সামান্যতম মানবিক জ্ঞান রাখে। সকলেই একই পথের পথিক। সুতরাং হযরতের মনের কোণে যখন কেউই এতটুকুও স্থান অধিকার করতে পারল না, তখন তিনি একবার বলে উঠতে পারতেন "সব জাহান্নামে যা।" কিন্তু তিনি বললেন—"হে আল্লাহ্, এ আমারই চরম দুর্বলতা, শক্তির শিথিলতা, উপায় ও পন্থার দৈন্য।" এককথায় তাঁর বক্তব্য ছিল—মানুষ যে তাঁর বিরোধিতা করল, সেটা তাঁরই দুর্বলতার কারণে, তাদের পাপে নয়।

সদাই জাগ্রত ছিলে সদা হাসি মুখে
সহিতে সকল কিছু সব দুঃখে সুখে।
পেয়েছিলে দেখিবারে হেন ক্ষমতা
সহজে নিজের দোষ নিজ দুর্বলতা।
বলেছ, বলোনি কভু "উহ্ কিংবা আহ্
আমারই দুর্বলতা দোষ-ত্রুটি যা"।
গ্লানিহীন করিবারে সমাজ গঠন
অকাতরে সব কিছু করিলে বরণ।
দিন নাই রাত নাই অবিরাম ধ্যান
দাও প্রভু অবুঝেরে বোধশক্তি জ্ঞান।
অবোধ মানবকুলে যত দোষ পাও
তুমি তাদের ক্ষমা করে বোধোদয় দাও।
আকুতি কাকুতি মোর ভুলেভরা ভূমি।
ভূজনে বুঝিতে দাও মহাসত্য তুমি। —কাব্যকানন

"হে পরম দয়ালু দয়াময়! তুমি সকল দুর্বলের শক্তিদাতা, তুমি আমারও শক্তিদাতা, আমি যখনই যার হাতেই পড়ি সে অপরিচিত হোক, শত্রু হোক, কোন কিছুই আসে যায় না। যদি তোমার অনুগ্রহ আমার সঙ্গে থাকে, যদি তুমি সন্তুষ্ট থাক। আমি কোন কিছুই গ্রাহ্য করি না। কেননা তোমার দেওয়া সুখ-সম্পদ সকল কিছুর উর্ধ্বে। হে আমার প্রভু! আমি সমস্ত কিছু তোমারই আলোতে দেখতে চাই। আশ্রয় প্রার্থনা করি, যা সকল অন্ধকারকে দূরীভূত করে, যা জাগতিক পারলৌকিক সকল ঘটনাকে তোমার রাগ ও অসন্তুষ্টি হতে আমার চোখে তুলে ধরে। আমি তোমার সন্তুষ্টি ব্যতীত কিছুই অনুসন্ধান করি না এবং

তোমার সাহায্য ব্যতীত আমার কোন শক্তি নেই ভাল কাজ করার জন্য অথবা মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার জন্য।"

তুমি যদি থাক মোর জীবন তরীতে
কোন ভয় নাহি করি দরিয়াতে চলিতে।

কি মহান চিত্ত। যে মানুষ এক পলকের জন্যও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও কথা ও সাহায্য চিন্তা করতেও পারতেন না। তিনি কিন্তু কখনও আপন কর্তব্যে অবহেলা দেখিয়ে আল্লাহর ওপর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তও থাকতেন না, তাতে যত রকম যা কিছুই সহ্য করতে হোক না কেন। তাঁর ওপরের প্রার্থনা হতে যা বোঝা যায়—তিনি কারও ওপর কোন দোষারোপ করতেই যেন জানতেন না। তাঁর একদিকে ছিল আল্লাহ্ এবং অপরদিকে ছিল বিপথগামী বিপুল মানবমণ্ডলী। মাঝে একটা নিরক্ষর মানব, মানবসূর্য মহানবী।

হযরতের উপরোল্লিখিত প্রার্থনার পর আল্লাহ্ তাঁকে উত্তর দিলেন—

"সুতরাং তুমি পূর্ণ ধৈর্য ধারণ কর, ওরা এই শাস্তিকে সুদূর-পরাহত মনে করে। কিন্তু আমি দেখছি এটি আসন্ন।" কোরআন—৭০ ঃ ৫৭

হযরত আপন মনে একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে একদিন সকল আরবই তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং আজকের এই বাহ্যিক যন্ত্রণা স্থায়ী হবে না।

তিনি এই সময় রাবিয়ার পুত্রদের গৃহে অবস্থান করছিলেন, হযরতকে এক পাত্র আঙুর খেতে দেন। আঙুরের পাত্রটি নিয়ে আসে আদ্দাস নামক এক ভৃত্য। আদ্দাস জাতিতে খ্রীস্টান, সে লক্ষ্য করল হযরত আঙুর খাওয়ার পূর্বে "আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন।" এতে আদ্দাস একেবারেই মুগ্ধ হয়ে গেল। সে ধারণাই করতে পারেনি যে, একজন আরব খাওয়ার পূর্বে এরূপ বলতে পারে। পরে সে জানতে পারল হযরত মহম্মদ (দঃ) একজন নবী। জানার সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁকে নবী বলেই বিশ্বাস করল, এবং মুসলমান হলো।

এই সময় হযরত অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায় ছিলেন। তখন সমগ্র কুরাইশদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে এগিয়ে আসে তাঁর জীবন রক্ষা করার জন্য। তিনি এই সময় বহু কুরাইশ প্রধানদের কাছে দুত পাঠালেন—যদি কেউ তাঁকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু কেউই রাজি হলো না। একমাত্র মুতিম বিন আদির পুত্রগণ হযরতকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং কুরাইশদের জানিয়ে দিয়েছিলেন—হযরত তাঁদের পিতার রক্ষণাবেক্ষণে আছেন।

বিভিন্ন গোত্রে মহম্মদ (দঃ)-এর বার্তা বা প্রস্তাব ঃ হযরত তায়েফ হতে ফেরার পর আবার মক্কাবাসীদের মধ্যে মনোনিবেশ করলেন। একদিকে মক্কাবাসী অবিশ্বাসী কুরাইশগণ হযরতের তায়েফের সংবাদ জেনে আনন্দে আত্মহারা। আবার অন্যদিক হতেও আনন্দ উথলিয়ে উঠল যখন তারা জানতে পারে সমগ্র আরবে হযরতকে আশ্রয় দেওয়ার মতো একজন মানুষও নেই। একমাত্র ছিলেন মুতিম বিন আদি। কিন্তু তিনি ছিলেন অবিশ্বাসী। তাই তাদের ধারণা ছিল মুতিমের আশ্রয় তেমন কিছু নয়। হযরত তায়েফ হতে ফেরার পর মক্কার কয়েকটি বিশেষ গোত্রের কাছে আবেদন রাখলেন—

বানু কেন্দা, বানু কলব, বানু হানিফা, বানু আমির। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেউই হযরতের কথায় কর্ণপাত করল না। এমনকি ঘৃণাভরেই প্রত্যাখ্যান করল। একমাত্র বানু আমির সাহায্য করতে চাইল একটা শর্তের ওপরে—যদি হযরত বিজয়ী হন, তাহলে সকল কাজে তার আদেশ বলবৎ থাকবে। তখন হযরত উত্তর দিলেন, সে তো আল্লাহর হাতে। তখন তারাও প্রত্যাখ্যান করল।

বিবি আয়েশার সঙ্গে হযরতের আকদ এবং বিবি সৌদার সঙ্গে বিবাহ ঃ নবুয়তের দশম বছরে আরবের শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মানব হযরত আবুবকরের একান্ত ইচ্ছায়, তাঁর সঙ্গে হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর সম্পর্ক আর দৃঢ় করার জন্য আবুবকরের নাবালিকা কন্যা আয়েশার সাথে আকদ সম্পন্ন করেন। কিন্তু বিবাহ পূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করা হয় আরও কয়েক বছর পর মদিনায়। ঐ সময় হযরত সৌদা নাম্নী এক বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। যাঁর স্বামী প্রথম মুসলমানদের মধ্যে আবিসিনিয়ায় গমন করেন। এবং সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে মারা যান। তখন থেকে তাঁর দেখাশোনা করার মতো কেউই ছিল না। তখন হযরত তাঁকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এই সময় পর্যন্ত ইসলামে বিবাহ সম্পর্কে কোন বিধিনিষেধ অবতীর্ণ হয়নি।

মেরাজ

হযরতের স্বর্গে আরোহণ

নবয়ুতের দশম বছরে হযরতের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। যা আল্ ইস্রা জেরুজালেমে রাত্রিভ্রমণ এবং মেরাজ অর্থাৎ ঊর্ধ্ব-গগনে আরোহণ নামে পরিচিত।

সারা মুসলিম-জাহানে এই পবিত্র ভ্রমণ ও ওই আরোহণ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনে এই সম্পর্কে বা এই প্রসঙ্গে মেরাজ বলে কোন বিশেষ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় না। যখন অবিশ্বাসীগণ হযরতের নবয়ুতের প্রমাণস্বরূপ স্বর্গে আরোহণ করে তাঁকে লিখিত কেতাব আনতে বলে তখন সেখানে শব্দ ছিল "তারকা ফিস সামায়ে।" স্বর্গে আরোহণ করো। তাঁরকা অর্থাৎ আরোহণ করো। তারকা শব্দ রাকিয়া হতে গৃহীত। অর্থ সে আরোহণ করেছিল।

মেরাজ শব্দ আরাজা হতে গৃহীত। যার অর্থ সে আরোহণ করেছিল। কিন্তু এই দুই আরোহণের মধ্যে একটা ব্যবধান রয়ে গেছে। রাকিয়া—দৈহিক আরোহণ এবং আরাজা—স্বর্গীয় দূতের আরোহণ এবং আত্মার আরোহণ। পবিত্র কোরআনে এই আত্মিক আরোহণেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

"এমন একদিন ফেরেশ্‌তা এবং রুহ্ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।" কোরআন—৭০ : ৪

এখন বোঝা যাচ্ছে, হযরতের আরোহণ কয়েক সেকেণ্ডের বা মুহূর্তের বা মিনিটের, কয়েক দিন বা মাস বা বছরের নয়। কারণ জাগতিক বছর ধরতে গেলে কয়েক হাজার বছর পেরিয়ে যাবে। কিন্তু তা যায়নি। কেননা নবীর আয়ুষ্কাল মাত্র ৬৩ বছর। আবার এই মেরাজ শব্দটি আল্লাহ্ ব্যবহার করেছেন—ফেরেশ্‌তা ও রুহের জন্য, যাদের কোন শরীর নেই। যুক্তির খাতিরে আমরা আরও দু'-একটা দিক লক্ষ্য করতে পারি। মিল এক শ্রেণীতে হয়। যেমন জল জলের সঙ্গে মিশতে পারে, তেলে-জলে মিল হয় না। তেমনি আকার আকারের সঙ্গে মিশবে, এবং নিরাকার নিরাকারের সঙ্গে মিশবে। কিন্তু আকার ও নিরাকারে মিলতে পারে না। আল্লাহ্ নিরাকার এবং মহানবী আকার দেহ বিশিষ্ট। সুতরাং এখানে মিল অযৌক্তিক। তবে আল্লাহ্ কি আকারে আসবেন, সেটাও অযৌক্তিক, বরং আকার বিশিষ্ট মহানবী নিরাকারে বিলীন হয়ে উন্নীত হলেন। এবং মিলন হলো।

যখন আমরা কোন মাইয়েতকে (মৃত ব্যক্তি) দেখি তখন বলি—'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন"—নিশ্চয় সবকিছু আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। মৃত্যুর পর নবনাবীর এই যে প্রত্যাবর্তন, তা তো দেহগত নয়, দেহ তো পচে যাচ্ছে, সুতরাং প্রত্যাবর্তন প্রাণের বা আত্মার। অতএব মানুষের সঙ্গে আল্লাহর যে সাক্ষাৎ সেটা অশরীরী সাক্ষাৎ। এখানকার এই 'রাজেউন' শব্দ 'মেরাজ' বা 'আরজা' সঙ্গে একই

সূত্রে বাঁধা। এখানে আরও একটি দৃষ্টান্তে জিনিসটা পরিষ্কার হতে পারে। আমরা যখন কাউকে কোন কথা বলি, এমনভাবে বলি, যেন তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কান শুনতে পায়। কিন্তু আল্লাহ্ যখন তাঁর দূতকে কোরআন দিলেন, তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কানে দেননি। তাই অপর কেউ শুনতে পায়নি। এবং স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন—"আমার কোরআন তোমার অন্তরে নাজেল করেছি।" এখানেও নিরাকার আল্লাহ্ তাঁর দূতের নিরাকার অন্তরকেই ব্যবহার করলেন। সুতরাং নিরাকার আল্লাহর সঙ্গে তাঁর দূতের আকারবিহীন রুহের অন্তরের মিলন হয়েছিল।

হযরতের নবুয়তের দশম বছর, সাত মাস। ২৭শে রজব। সেদিন তিনি আবু তালিবের কন্যা হিন্দার বাড়িতে ছিলেন। হিন্দা বলেন—

ওই রাত্রে আল্লাহর নবী আমার ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। তিনি রাত্রির প্রার্থনা সেরে পরে ঘুমিয়েছিলেন। এবং আমরাও ঘুমিয়েছিলাম। অতি প্রত্যুষে আল্লাহর নবী উঠলেন এবং আমাদের জাগালেন। এবং তখন তিনি তাঁর প্রার্থনা সারলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে প্রার্থনা সারলাম। এবং তিনি বললেন—

"ও উম্মুহানি (হিন্দার ডাক নাম), এই ঘরে আমি তোমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করেছি। যেমন তোমরা দেখেছ। তারপর আমি পবিত্র স্থানে গিয়েছি এবং সেখানে প্রার্থনা সেরেছি। এবং তারপর তোমাদের সঙ্গে প্রভাত প্রার্থনা সারলাম, যেমন তোমরা দেখছো।"

হিন্দা বললেন, "হে আল্লাহর নবী, সাধারণ মানুষকে আপনি এই কথা বলবেন না, কেননা তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী ভাববে ও আপনার ক্ষতি করবে।" আল্লাহর নবী উত্তর দিলেন, "আল্লাহর শপথ আমি সকলকে একথা বলবই।"

অন্য হাদিস হতে জানা যায়—আল্লাহর নবী ওই রাতে কাবাতে নিদ্রা যান, এবং কাবার ওই অংশের যে অংশের ছাদ নেই, যাকে হাতিম বলা হয়। যখন ওই রাত্রিভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। যেটি সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়, ঘটনাটি সত্য। তবে কখন ঘটল, সেটা বলা সহজ নয়। কিন্তু নবুয়তের দশম হতে ত্রয়োদশ বছরের মধ্যে যে ঘটেছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

অনেকের মতে রাত্রিভ্রমণ ও মেরাজ সশরীরেই হয়েছে, অর্থাৎ হযরত মহম্মদ (দঃ) সশরীরেই রাত্রিভ্রমণ (জেরুজালেমে হাজির হয়েছিলেন) ও স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন। আবার অন্যান্যগণ বলেন রাত্রিভ্রমণ ও স্বর্গারোহণ সশরীরে হয়নি। রুহানি বা অন্তর জগতের ভেতর দিয়েই হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) ও আবু সুফিয়ান এই মতের পক্ষে। আবার আর একদল বলেন, রাত্রিভ্রমণ সশরীরে এবং স্বর্গারোহণ রুহানি বা অশারীরিক।

এই মেরাজ হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এরও হয়েছিল। হযরত মুসা (আঃ)-এর হয়েছিল। সুতরাং এটা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জন্য নতুন কিছু নয়। তবে সে যুগে মেরাজ বোঝা যতখানি শক্ত ছিল, আজ আর তা নয়। আজ রেডিওর যুগ। টেলিভিশনের যুগ। মানুষ সহজেই বুঝতে পারছে হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষের কথা। মানুষ কি করে অতি সহজে আপন বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছে, আবার বক্তাকে দেখছেও। সুতরাং আধ্যাত্মিক পুরুষগণ, যাঁদের দিব্যজ্ঞানের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না, তাঁরা যে স্বর্গ-মর্ত্য দেখতে পারেন, এতে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে।

মেরাজকে আর একটি দিকে চিন্তা করলে বোঝা যায় এটা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় ঊর্ধ্বতম শিখরে আরোহণ। এটা চিন্তা করলে মেরাজ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না। কারণ হযরত যা বলেছেন সেটাকে মেনে নিয়ে সকলেই মুসলমান, কোন মুসলমানই কিন্তু আল্লাহকে দেখেনি। রসুল যা বলেছিলেন তাই মেনে নিয়েছেন। কোন মুসলমানই ফেরেশ্‌তা জিবরাইলকে দেখেনি, শুধু রসুল বলেছেন তাই সকলে মেনে নিয়েছেন, কোন লোকই রসুলের প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হওয়া আপন কানে শোনেননি। তিনি বলেছেন সবাই মেনে নিয়েছেন। যদি রসুলকে মেনে নেওয়া না যায়, বিশ্বাস করা না যায়, তাহলে কোন কথাই আর ওঠে না। কিন্তু যখন তাঁকে নির্বিবাদে মেনে নেওয়া যায়, তখনই সব সমাধান সহজেই হয়ে যায়।

কোন নবীই বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক নন। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকগণ বিশ্বরহস্য সম্পর্কে যতটা বলতে পারেন, নবীগণ তা অপেক্ষা বহুগুণে বেশি বলতে পারেন। অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের ধ্যান ও ধারণা সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে। আধ্যাত্মিক বা স্বর্গীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও পক্ষেই জগৎ-সত্য সম্পর্কে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়। তাঁরাই বলতে সক্ষম হয়েছেন যাঁরা বাস্তব দৃষ্টিতে সবকিছু উপলব্ধি করেছেন। মেরাজ সেই বাস্তব দৃষ্টির বাহন, যা অন্যান্য নবীগণও পেয়েছেন।

আজ থেকে একশ বছর পূর্বে মানুষ যা চিন্তা করতে পারেনি, আজ তা স্বচক্ষে দেখছে। সুতরাং এটা আল্লাহ্ ও রসুল মহম্মদ (দঃ)-এর পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয় যে, কয়েক পলকে সমগ্র স্বর্গ-মর্ত্যকে তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরা হলো, তাঁকে সমস্ত কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হলো। আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে স্থান, পাত্র ও কালের ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই হযরত অবলীলাক্রমে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর অতীত ও ভাবী মানবধারাকে। তিনি দেখেছিলেন সমস্ত যুগের নবীগণকে, লক্ষ্য করেছিলেন তাঁদের কার্যধারা। তিনি দেখেছিলেন আল্লাহর ফেরেশ্‌তা কিভাবে তাঁর আদেশ পালন করছেন। তাঁর আত্মা নবুয়তের বহু পূর্বেই বিশ্বরহস্য জানার জন্যে আকুল প্রার্থনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আজ নবয়ুতের দশম বছর পর্যন্ত তারই অনুধাবন ও অনুশীলন চলছে। সুতরাং এ বিশ্বরহস্য মাঝে মানবরূপী মহম্মদ (দঃ) যে কি ছিলেন—এ নিগূঢ় রহস্য উদ্ধারে আরও লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যাবে। হযরতের জীবনের যে কোন একটি দিক একটু ধীর ও স্থির ভাবে লক্ষ্য করলে যে কোন মানুষই অবাক বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারে না। তাঁকে নিছক একটা ধর্মপ্রচারক রূপে দেখলে সূর্যকে একটি সরষে রূপেই দেখা হবে।

হযরত মুসার আল্লাহ্ দর্শন ঃ অনেক সময় সাধারণ দৃষ্টি যা দেখতে পায় না, অন্যভাবে বা অসাধারণ দৃষ্টিতে তা দেখতে পায়। একবার হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌কে দেখার জন্য ফরিয়াদ করলেন। কিন্তু মুসার পক্ষে মানবিক দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌কে দেখা সম্ভব হয়নি।

"মুসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে হাজির হলেন, তাঁর প্রতিপালক তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। তখন তিনি বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমাকে দেখব।" তিনি বললেন—"তুমি আমাকে কখনও দেখতে পাবে না। বরং তুমি (তুর) পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর্। যদি ওটি স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে।" যখন

তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে তাঁর জ্যোতি প্রতিফলিত করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল। আর মুসা জ্ঞানহীন হয়ে পড়লেন। যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন, "মহিমাময় তুমি, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী।" কোরআন—৭ ঃ ১৪৩

এটাই ছিল হযরত মুসা (আঃ)-এর মেরাজ। তিনি জাগতিক চোখে যা দেখতে পাননি, রুহানি চোখে তা-ই দেখতে পেলেন। এবং সেই দেখেই তিনি প্রথম বিশ্বাসী হলেন। হযরত মুসা তাঁর অবচেতন অবস্থাতেই সবকিছু দর্শন করলেন। এবং এই অবস্থাতেই তিনি পেলেন—স্বর্গীয় বাণী বা ওহী।

"তিনি বললেন, হে মুসা! আমি নিশ্চয় তোমাকে আমার বাণী ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, সুতরাং আমি যা দিয়েছি তা গ্রহণ করো ও কৃতজ্ঞ হও। আমি তার (তোমার) জন্য ফলকের ওপর সব বিষয়ের উপদেশ ও সব বিষয়ের বিবৃতি লিখে দিয়েছি। অতএব তুমি ওটি দৃঢ়রূপে ধারণ কর। এবং তোমার সম্প্রদায়কে তার উৎকৃষ্ট দিক গ্রহণ করতে আদেশ কর। অচিরেই আমি তোমাকে অসৎশীলদের বাসস্থান দেখাব।" কোরআন—৭ ঃ ১৪৪-১৪৫

ওই গুলোই ছিল হযরত মুসার প্রতি ঐতিহাসিক দশটি আদেশ, যা তিনি তাঁর এই মেরাজ যোগে (জাগতিক অচেতন অবস্থায়) লাভ করেন। যা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনে অন্যরূপে ঘটে। যা একদিন ওরাকা বিন নাওফল হযরত মহম্মদ ও বিবি খাদিজাকে বলেছিলেন, "সমগ্র মানবমণ্ডলীর গতি নির্ণয়নে বিশ্ব প্রতিপালকের নীতি ও নির্দেশ তাঁর প্রতি এসেছে, যেমন এটি একদিন এসেছিল হযরত মুসার প্রতি।"

হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এরও এইভাবে মেরাজ সম্পন্ন হয়েছিল। কেননা আল্লাহ্ তাঁর সকল নবীকেই বিশ্বরহস্য জানিয়ে দেন। ওই জ্ঞান ব্যতীত তাঁরা বিশ্বের গতি নির্দেশ করবেন কি করে।

"আমি এইভাবে ইব্রাহিমকে আসমান ও জমিনের পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই, যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" কোরআন—৬ ঃ ৭৫

যে ব্যক্তি কখনও কোন শহর দেখেনি, তিনি যত বড়ই জ্ঞানী হোন তাঁর পক্ষে অন্যাকে শহর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান দান করা অসম্ভব। সুতরাং প্রতিটি নবীরই প্রয়োজন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁরা পেয়েছেন মেরাজের মাধ্যমে। সুতরাং মেরাজ শুধু হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, বরং সকল নবীরই জীবনের এক অপরিহার্য দিক।

হযরতের আল্লাহ্ দর্শন ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর দর্শনের কথা সমগ্র কোরআন শরীফে ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে বনি ইসরাইল (১৭) ও নজম (৫৩) সূরায়।

বনি ইসরাইল সূরার প্রথম আয়াতেই হযরতের মেরাজ সম্পর্কে প্রকাশ্য ঘোষণা ঃ

"তিনি পবিত্রতম, যিনি একদা রাতে তাঁর সেবককে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য ভ্রমণ করিয়েছিলেন—মসজেদুল হারাম (খানায়ে কাবা) হতে মসজেদুল আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস) পর্যন্ত, যার সীমাকে আমি সৌভাগ্যযুক্ত করেছি, যেন আমি তাকে কতিপয় নিদর্শন প্রদর্শন করি, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" কোরআন—১৭ ঃ ১

পবিত্র মসজিদ মক্কার কাবা এবং দূরবর্তী মসজিদ জেরুজালেমের মসজিদ, যে মসজিদের দিকে হযরত প্রথম অবস্থায় মুখ করে নামায পড়তেন। জেরুজালেম বহু নবীর সূতিকাগার। যাকে পবিত্রভূমিও বলা হয়। হযরত মহম্মদ (দঃ) জীবনে কখনও সেখানে যাননি। মহান আল্লাহর ইচ্ছা হলো তাঁর প্রিয় নবীকে ওই ঐতিহাসিক মসজিদ দেখাতে হবে, দেখালেন। শুধু দেখালেন না, সেই মসজিদ বিজড়িত অতীতের বহু ঘটনাই তাঁকে জানালেন।

হযরতকে দেখানো হলো কি করে মুসা (আঃ) স্বর্গীয় তৌরাত গ্রন্থ পান। এবং কি করে বনি ইসরাইল হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধর হলেন। এবং তাঁদের ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁকে ওয়াকিবহাল করা হলো। "তোমরাই তো তাদের বংশধর যাদের আমি নূহের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ দাস।" কোনআন—১৭ ঃ ৩

অতীতে কিভাবে জেরুজালেম দু'বার ধ্বংস হলো, তাও তিনি জানিয়ে দিলেন—"একবার ব্যাবিলনের দ্বারা, অন্যবার রোমের দ্বাবা, অতঃপর এই দুয়ের প্রথমটির নির্ধাবিত কাল যখন উপস্থিত হলো তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী আমার দাসদের পাঠিয়েছিলাম, ওরা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত ধ্বংস কবেছিল।"

এখানে আরও সতর্ক করা হযেছে, মুসলমানরা ইহুদীদের ওপর জয়ী হবে। তবে তারা যদি সতর্ক না থাকে, তাহলে তারা তাদের বিজিত বস্তু হারাবে ইহুদীদের মতোই। সে যেন অতিরিক্ত সত্বরতাপ্রিয় না হয়।

"মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে, সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে, মানুষ তার মনে যা আসে তার পরিণাম চিন্তা না করেই আশু রূপায়ণ কামনা করে।"

কোনআন—১৭ ঃ ১১

এরপর হযরতকে পৃথিবীর মাটি হতে মহাশূন্যে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তাঁকে সমগ্র সৌরজগৎ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করা হলো। বছর মাস দিন রাত কিভাবে হচ্ছে, সমস্ত কিছু তাঁকে সযত্নে ব্যাখ্যা করা হলো।

সৌরজগৎ সম্পর্কে তাঁকে বিশদ জ্ঞান দেওয়ার পর এবার তাঁকে মানবমণ্ডলী সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করা হলো। প্রত্যেক মানুষেরই একটি জীবনীখাতা আছে। সেখানে দিন-রাত রেকর্ড হচ্ছে। সে যা করেছে, যে ভাল কাজ কবে সে নিজের জন্যেই করে, যে মন্দ কাজ করে সেও নিজের জন্যই করে, কেউ কারও ভার বহন করবে না। এই সম্বন্ধে তাঁকে বিশদ জ্ঞান দান করা হলো।

করেছ ধৈর্যের সাথে অন্তহীন ধ্যান
পেয়েছ নিখিল জোড়া আদি-অন্ত জ্ঞান।

"আমি প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম তার গ্রীবা সংলগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য এক কেতাব বের করব, যা সে উন্মুক্ত পাবে। তুমি তোমার গ্রন্থ পাঠ কর, তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য আজ তুমি নিজেই যথেষ্ট। যারা সৎপথ অবলম্বন করে, তারা নিজেদের মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে। এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে, তারা নিজেদের ধ্বংসের

জন্য পথভ্রষ্ট হবে। এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। আমি রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকেই শাস্তি দিই না।" কোরআন—১৭ ঃ ১৩-১৫

অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে জগতের ভূত-ভবিষ্যৎ ও উত্থান-পতন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান দান করেন। মানুষ যেন মনে না করে রাজত্ব শুধু তাদেরই কৃতিফল মাত্র।

"আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন আমি ওর সম্পদশালী লোকদেরই (সৎকাজ করতে) আদেশ করে থাকি, এবং (ওরা তা অগ্রাহ্য করলে) আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি, তোমাব প্রতিপালকই তাঁর দাসদের পাপাচারণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট। কেউ পার্থিব সুখসম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি। পরে ওর জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, সেখানে সে প্রবেশ করবে—নিন্দিত ও (আল্লাহর) অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়, যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং ওর জন্য যথাসাধ্য সাধনা করে তাঁদেরই সাধনা স্বীকৃত হবে। তোমার প্রতিপালক তাঁব দান দ্বারা এদের ও ওদের (পাপী) সাহায্য কবে থাকেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবধারিত ; লক্ষ্য কব, কিভাবে আমি ওদের একদলকে অপর দলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। পরকাল নিশ্চয়—মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।" কোরআন—১৭ ঃ ১৬-২১

এরপর আল্লাহ্তালা তাঁর প্রিয় রসুলকে জাগতিক কয়েকটি সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন। যেগুলো অন্যান্য নবীদেরও দান করেছিলেন। এইগুলো মানুষ যদি তার দৈনন্দিন চলার পথে এতটুকুও স্মরণ করে চলে, তাহলে সাধারণ মানুষ মহামানব বা অতিমানব না হতে পারে, কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে সে অমানুষ হবে না। এবং যে কোন মানুষ যদি মানুষই থাকতে পারে, তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে। এবং সেই মানুষ থাকার জন্য যে মানবিক শক্তির দরকার, যে সঞ্জীবনী সুধার দরকার, তারই জোগানের জন্য সত্য ধর্মজীবনে একান্ত প্রয়োজন—

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন—তিনি ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করো না, এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, ওদের উফ্ (বিরক্তিসূচক শব্দ) বলো না, এবং ওদের ভর্ৎসনাও করো না। ওদের সঙ্গে সম্মানসূচক নম্র কথা বলো। তাদের উভয়ের জন্য সদয় বিনীতভাবে বাহু নত কর, ও বলো—হে আমার প্রতিপালক, তারা শৈশবে আমাকে যেরূপ প্রতিপালন করেছে তুমিও তাদের প্রতি অনুরূপ করুণা কর।"

কোরআন—১৭ ঃ ২৩-২৪

"তোমাদের অন্তরে যা আছে—তোমাদের প্রতিপালক তা জ্ঞাত আছেন, যদি তোমরা সৎকর্মশীল হও, তবে নিশ্চয়—তিনি আল্লাহ্ অভিমুখীদের প্রতি ক্ষমাশীল।" ১৭ ঃ ২৫। মানুষের মনটা সবসময়ই আল্লাহ্মুখী হওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এক চমৎকার দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ না করে পারছি না—"তোরা সমুদ্রবুকে জাহাজে ক্যাপ্টেনের দিক্ নির্ণয় যন্ত্রটা দেখেছিস? সেটা সবসময় উত্তরদিকে থাকে, তাই ক্যাপ্টেনের দিক্ ভুল হয় না। তোরা তোদের মনটা সবসময় ঈশ্বরের দিকে রাখবি, তাহলে তোদের ন্যায় অন্যায়ের দিক্ ভুল হবে না।"

মানুষ যেন কেউ কারও প্রাপ্য হরণ না করে। গরিবকেও বঞ্চিত না করে, এবং আপন সম্পদ হলেও যেন অপব্যয় না করে। যেটুকু অপব্যয় করবে, সেটুকু দীন-দুঃখীদের দান করবে। যদি কেউ না করে সে পাপাত্মা।

"আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" কোরআন—১৭ ঃ ২৬-২৭

সংসার-জীবনে মানুষ যেন কোন কিছুতেই অতিরিক্ত না হয়ে ওঠে—"তুমি বদ্ধ মুষ্টি (অতিকৃপণ) হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্ত (অতিদাতা) হয়ো না। হলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে।" কোরআন—১৭ ঃ ২৯

মানুষ যেন মনে না করে—ধন-সম্পদের নিয়ন্ত্রণ শুধু তার চেষ্টার ওপরই নির্ভরশীল—সর্বোপরি হাত আল্লাহর।

"তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন, তিনি তাঁর দাসদের ভালোভাবে জানেন ও দেখেন। তোমরা অভাবের আশঙ্কায় সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই ওদের ও তোমাদের জীবিকা দান করি। ওদের হত্যা করা মহাপাপ।" কোরআন—১৭ ঃ ৩০-৩১

ব্যভিচার বা অবৈধ যৌনমিলন মানবসমাজে এতই ক্ষতিকর ও এতই ঘৃণ্য যে ইসলাম তাকে শুধু নিষেধই করে না, বরং তাঁর ধারে কাছে যেতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কেননা নর-নারী যুবক-যুবতী যেন ওইরূপ অবস্থার ধারে কাছেও না যায়, যেখানে তা ঘটার সম্ভাবনা আছে বা মন দুর্বল হয়ে যেতে পারে, সেখানে যেন কেউ ভুলেও না এগোয়।

কেননা "মানুষের মন মন্দপ্রবণ"। ১২ ঃ ৫৩। "তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।" কোরআন—১৭ ঃ ৩২, ৭৪, ৭৫

মানুষ যেন সংসার-জীবনে কেউ কাউকে লেনদেনে ঠকিয়ে না দেয়—

"মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করবে, এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।"

অতঃপর আল্লাহ্তালা তাঁর প্রিয় রসুলকে মানব-জীবনের পতনের সর্বাপেক্ষা মূল কারণটি সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং যেটিকে আল্লাহ্ সবচেয়ে অপছন্দ করেন—

"তোমরা পৃথিবীতে গর্বভরে চলো না, যেহেতু তুমি (পা ভরে) ভূপৃষ্ঠ ভেদ করতে পারবে না; এবং উচ্চতায় তুমি কখনও পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না।"

কোরআন—৪ ঃ ৩৬, ৭ ঃ ১৪৬, ১৭ ঃ ৩৭, ২৮ ঃ ৭৬,
৩০ ঃ ১১০, ৩১ ঃ ১৮, ৩৯ ঃ ৭২, ৫৭ ঃ ২৩

হযরত মহম্মদ (দঃ) মেরাজের মাধ্যমে এই সমস্ত জ্ঞান লাভ করেন। তাই আল্লাহ্তালা বলেছেন—

"তোমার প্রতিপালক 'ওহীর' মাধ্যমে তোমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, এইগুলো তার অন্তর্ভুক্ত।" কোরআন—১৭ ঃ ৩৯

এরপর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক সম্পর্কে তাঁকে সম্যক জ্ঞান দান করা হয়, তিনি জানতে পারলেন—পরিচালক একজনই আছেন এবং সমস্ত কিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্। অখণ্ড তাঁর জগৎ চরাচর।

"বল—ওদের কথামত যদি তাঁর সঙ্গে আরও উপাস্য থাকত, তবে তারা আরশ অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত। তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং ওরা যা বলে তা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে।" কোরআন—১৭ ঃ ৪২-৪৩

এভাবে নবী মহম্মদ (দঃ) তাঁর প্রত্যক্ষ দিব্যজ্ঞানের দ্বারা জানতে পারলেন—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একজনেরই দ্বারা পরিচালিত, সেখানে তাঁর কোন সহকারী বা সাহায্যকারী নেই, প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তিনি এক ও একক। যখন কেউ এক ও অদ্বিতীয়ের উপাসনা হতে বিরত থাকত, তখন হযরতের মনে খুবই কষ্ট হতো। তাই তাঁকে দেখানো হলো—

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুই তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না ; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বুঝতে পারো না ; নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল ক্ষমাপবায়ণ।" কোরআন—১৭ ঃ ৪৪

নবী মহম্মদ (দঃ) অন্যান্য সকল নবী অপেক্ষা আল্লাহর মহত্ত্ব ও গৌরব বর্ণনায় ও আধ্যাত্মিকতায় একেবারেই শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিলেন এবং তাঁর আল্লাহ্ও তাঁকে সকল নবী অপেক্ষা শীর্ষস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই মেরাজেই তিনি **দৈনন্দিন পাঁচবার নামায কায়েম করার নির্দেশ** লাভ করেন। এর পূর্বে তিনি দু'বার নামায পড়তেন, সকাল ও সন্ধ্যায়। সূর্য ওঠার আগে এবং ডোবার আগে। কোরআন—৭ ঃ ২০৫, ৩০ ঃ ১৮

"সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করবে এবং প্রভাতে ফজরের নামায পাঠ কর, প্রভাতের কোরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ হবে।"

কোরআন—১৭ ঃ ৭৮

আসলে মেরাজ আল্লাহ্ এবং তাঁর নবীদের মধ্যে ঘটনা। এর মাঝে সাধারণ মানুষের কিছু কবার নেই। প্রত্যেক নবীরই মেরাজ হয়েছে। তবে যে যেমন নবী তাঁর মেরাজ তেমনি ঘটেছে। যেমন অফিসারদের সঙ্গে মন্ত্রীর সাক্ষাৎ। যেমন অলি-আওলিয়ার জীবনে ঘটে থাকে মোরাকেবা মোশাহেদা। এই মোরাকেবা মোশাহেদায় তাঁরা বহু কিছু লাভ করে থাকেন, যেখানে সাধারণ মানুষের কোন কথা চলে না, এ এক অন্য জগৎ। নবীদের জীবনে মেরাজ ওই উর্ধ্বতম ব্যাপার। যেখানে জগৎ চরাচর কোন থৈ পায় না। তাই মেরাজ সম্পর্কে কারও কিছু বলার নেই। এই মেরাজ সম্পর্কে সূরা নজমের মধ্যে একটা সুন্দর বর্ণনা আছে ঃ

১। শপথ নক্ষত্রের যখন তা অস্তমিত হয়।

২। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়।

৩। এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।

৪। কোরআন তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

৫। তাকে শিক্ষা দান করে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্।

৬। সহজাত জিবরাইল, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল।

৭। এবং সে (জিবরাইল আঃ) ছিল উর্ধ্ব দিগন্তে।
৮। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী।
৯। ফলে তাদের মধ্যে দু' ধনুকের জ্যা পরিমাণ ব্যবধান থাকল।
১০। তখন আল্লাহ্ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন।
১১। যা সে দেখেছে তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি।
১২। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে?
১৩। নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।
১৪। প্রান্তবর্তী বদরিকা বৃক্ষের নিকট।
১৫। যার নিকট বাস উদ্যান অবস্থিত।
১৬। যখন বৃক্ষটি যার দ্বারা শোভিত হওযার তার দ্বারা মণ্ডিত ছিল।
১৭। তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।
১৮। সে তো তার প্রতিপালকেব মহান নিদর্শনাবলী দেখেই ছিল।

কোরআন—৫৩ ঃ ১-১৮

ওপরের আয়াত শরীফে আল্লাহ্‌তালা তাঁর নবী মহম্মদ (দঃ)-কে আকাশের তারকার সঙ্গে যেন তুলনা করেছেন। মানবজগতে নবী যেন নক্ষত্রসম। তারকা যেমন তার নির্ধারিত পথে পরিভ্রমণ করছে, নবী তেমনি আপন কাজে পরিভ্রমণরত। সেখানে তিনি কারও কোন বাধা-নিষেধ শুনতে রাজি নন। তাই আল্লাহ্‌তালা বলেছেন—"তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়। তারকার যেমন নিজ ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন প্রশ্ন নেই, নবী-জীবনেও কতকটা ঠিক তাই। তিনি শুধু যেন ওহীর প্রচারক মাত্র। তিনি আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু করে যান। নক্ষত্র যেমন আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে ঘোরে, নবী তেমনি আল্লাহর ইচ্ছায় চলেন।"

হযরত মহম্মদ (দঃ) হতে আরম্ভ করে প্রতিটি নবীর আত্মা সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় পরিচালিত এবং এই সমস্ত আত্মাগুলো আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হয়ে পড়েন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার ওপর তাঁরা তাঁদের জীবন-মরণ সমস্ত কিছু এক কথায় উৎসর্গ করে রাখেন। এমন পথে বিচরণ করেন যে, কোন মালিন্যই তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না।

১। 'ইয়াসীন (হে মহামানব), ২। শপথ জ্ঞানগর্ভ কোরআনের, ৩। নিশ্চয় তুমি রসুলগণের অন্তর্গত, ৪। তুমি সরলপথে প্রতিষ্ঠিত।" কোরআন—৩৬ ঃ ১-৪

"এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, কেতাব তথা আমার নির্দেশ, তুমি তো জানতে না কেতাব কি এবং বিশ্বাস কি, পক্ষান্তরে আমি একে আলোরূপে সৃষ্টি করেছি। যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি। তুমি তো কেবল সরলপথই প্রদর্শন কর।" কোরআন—৪২ ঃ ৫২

তাই হযরত মহম্মদ (দঃ) মনুষ্যজগতের আধ্যাত্মিক সূর্য ও নক্ষত্র। তাঁর একটিই কাজ—আলো দান। এই আলো তিনি দান করেছেন বিরামবিহীন ভাবে সূর্যের মতো, নক্ষত্রের মতো। তাঁর পথও ছিল অতি নির্দিষ্ট পথ। সেখান থেকে কোনদিন তিনি বিচ্যুতও হননি।

সূর্য ও নক্ষত্র যেমন অবিচল থেকে যায় আপন কক্ষপথে, তিনিও ঠিক তেমনি ছিলেন। এই শক্তি ও আলোর জন্য তাঁকে লাভ করতে হয়েছিল—আল্লাহর দেওয়া পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান তিনি যাঁর মাধ্যমে লাভ করলেন—তাই-ই মেরাজ।

"তাঁর দৃষ্টিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নির্দেশাবলী দেখেই ছিল।" কোরআন—৫৩ ঃ ১৭-১৮

মেরাজ খুবই উচ্চপর্যায়ের ধ্যানের ব্যাপার। তা নবী ব্যতীত অন্য কোন মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। তবে সাধারণ মানুষের জন্য নামাযই মেরাজ স্বরূপ, কেননা মহানবী বলেছেন—"আস্‌সালাতু মে'রাজুল মু'মেনীন"—অর্থাৎ, নামায (প্রার্থনা) বিশ্বাসীদের মেরাজ, কিন্তু কোন্ নামায, সে ওইরূপ নামায, যে নামাযে নামাযী নিজেকে নিজেই স্বর্গে উত্তোলন করতে পারেন। এই কারণে নামায শেষ হলে দুটি সালাম দিতে বা ফেরাতে হয়। একটি ডানে ও অন্যটি বামে। এর গভীর তাৎপর্য—নামাযী (যেন) তাঁর নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর আরশ্ বা স্বর্গে আরোহণ করেছেন, এবং নামায শেষে প্রথমে স্বর্গবাসী ফেরেশ্‌তা বা দূতদের সালাম-সহ ধরাতে অবতরণ করেন এবং মর্ত্যবাসীদেরও সালাম জানিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হন। এইজন্য নামাযে সালাম ডানে ও বামে। এর মূলগত তাৎপর্য—উচ্চ ধ্যানে আল্লাহর আরশে (স্বর্গে) একটি সালাম ও মর্ত্যে মিলিত হওয়া মাত্র একটি সালাম। এখানে শরীরের কাজ খুব একটা নেই বললেই চলে, যা আছে অন্তরের কাজ, সাধনার কাজ, সত্যের উপলব্ধির কাজ। সূফী ও ওলি-আওলিয়াগণ, পীর ও দরবেশগণ—মোরাকেবা ও মোশাহেদা দ্বারা ফানা আর বাকা স্তরে পৌঁছে বেলায়েতপ্রাপ্ত হন। নবী আর রসুলগণের এই মেরাজ হলো ঊর্ধ্বতম ধাপ। সাধারণত নবী ও রসুলগণের জন্য মেরাজ ও মোজেজা, আর ওলি-আওলিয়াগণের জন্য মোরাকেবা ও মোশাহেদা এবং কেরামত প্রযোজ্য হয়।

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সীমিত জ্ঞানের পরিসরে, যুক্তি ও তর্কের, বিবেক ও বিবেচনার মাধ্যমে যা বলার বললাম, কিন্তু সকলের ঊর্ধ্বে বলতে চাই—আল্লাহর দূত মহানবীর জন্য সশরীরে ও আত্মিকভাবে দু'দিক থেকেই মেরাজ বা স্বর্গারোহণ মোটেই অসম্ভব ছিল না, এটাকে নিয়ে কলহ করা ঠিক না। ফেৎনা ও ফসাদ এড়িয়ে চলাই কোরআনের নির্দেশ।

কোরআন—২ ঃ ১৯১, ২১৭

নবম অধ্যায়

মক্কায় শেষ তিন বছর ঃ আকাবার শপথ এবং মক্কাতে সমাজ-সংস্কারক বা নবীরূপে হযরত

নবুয়তের দশম বর্ষের শেষ থেকে ত্রয়োদশ বর্ষ

হযরত আবুবকর ছিলেন হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর আজীবন বন্ধু। প্রধান উপদেষ্টা ও বিশ্বাসী ভক্ত। মহানবী তাঁকে আল্‌সিদ্দিক নামে ভূষিত করেন। সত্যই তিনি ছিলেন— সত্যবাদী কোমল হৃদয় মানব-দরদী, গরিবের বন্ধু সহনশীল, অতীব শান্ত মানব। সে যুগে আরবেব সকলেই তো অবিশ্বাসী। কিন্তু অসভ্য বলি আর অজ্ঞ বলি বা যা কিছুই বলি, আরব বেদুইনদেব মধ্যে এমন একটি গুণ ছিল, যে গুণটি আজকের দিনের অনেক সভ্য সমাজেও দুর্লভ। তারা প্রতারক বা বিশ্বাসঘাতক ছিল না। তারা যা কিছুই করত সোজাসুজি কবত, যা কিছু বলত সামনা-সামনি বলত। এটা ছিল তাদের চরিত্রের মহৎ গুণ। তারা আবার প্রকাশ্য বিশ্বাসীদেব নিপীড়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ধর্মান্তরকরণ ঃ তুফায়েল বিন আমর দাউসী নবুয়তের দশম বছরের শেষের দিকে ইসলামধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর যশ, নাম ও ইসলামের নীতি সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ল। ইসলাম প্রচারে হযরত মহম্মদ শুধু একাকী নন, তাঁর বহু শিষ্য বহু দিকে এই গুরুভার স্বেচ্ছায় আপন কাঁধে তুলে নিয়েছেন। খ্রীস্টানদের মধ্যে ২০ জনের এক ধর্মান্তরিত প্রতিনিধি দল আপন এলাকায় যথারীতি ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তুফায়েল ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত বংশের একজন সুশিক্ষিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি তাঁর আপন এলাকা ইয়ামেনে ইসলাম প্রচারে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন।

তবে ইসলাম প্রচারের জন্য সবচেযে উর্বরক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল মদিনা। তাই বলা হয, ইসলামেব মহীরুহের বীজ বপন হয মক্কায়, লালন-পালন মদিনায়, ধ্বংস দামাসকাসে। প্রশ্ন থেকে যায়, হযরত মহম্মদ (দঃ) মদিনায় পা দিলেন না, অথচ মদিনায় ইসলাম প্রচার জোরদার হলো কি করে? এর একমাত্র কারণ যখন মদিনাবাসীগণ মক্কায় তীর্থ করতে আসতেন তখন হযরত তাঁর কথা সকলের নিকট বলতেন। এইভাবে ইসলাম মদিনায় প্রসাবলাভ করে।

আবদুর ঃ মদিনাবাসী গিফার গোত্রেব প্রখ্যাত ব্যক্তি আবদুরের এই সময় ইসলামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তিনি সমস্ত কিছু জানার জন্য তাঁর ভাই আমিসকে হযবতেব নিকট পাঠান। আমিস মক্কা হতে ফিরে গিয়ে তাঁকে জানালেন হযরত মহম্মদ (দঃ) ভাল কাজ কবতে আদেশ দিচ্ছেন এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করছেন। আবদুর এতে সন্তুষ্ট না হযে ছদ্মবেশে নিজে মক্কায় গমন করেন। সেখানে হঠাৎ দেখা আবু তালিবের পুত্র হযরত আলিব সঙ্গে। তিনি তাঁকে নবীর নিকট নিয়ে গেলেন। আবদুর নবীকে জিজ্ঞাসা করলেন

ইসলাম কি? নবী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেলন। শুধু তাই নয়, তিনি এত উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে কাবায় গিয়ে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। তখন অবিশ্বাসীগণ তাঁকে এমন প্রহার করে যে তিনি মৃতপ্রায় হয়ে যান। হঠাৎ হযরতের চাচা আব্বাস এই ঘটনা দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন এবং আবদুরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। অবিশ্বাসীদের তাঁর পরিচয় দেন যে তারা যাকে প্রহার করলেন—তিনি গিফার গোত্রের নেতা আবদুর, যাঁদের সঙ্গে মক্কাবাসীদের খুব ভাল সম্পর্ক। আবদুর আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েও আবার ইসলামের জয় ঘোষণা করলেন। অবিশ্বাসীগণ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। তখন আব্বাস আবদুরকে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন।

সয়িদ বিন সামিত মদিনার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তাঁকে সকল মদিনাবাসী আদর্শ মানুষ হিসাবে দেখেন। তিনি একদিন মক্কায় হযরতের কাছে এলেন। হযরত তাঁকে কোরআনেব কিছু অংশ আবৃত্তি করে শোনালেন। সয়িদ সঙ্গে সঙ্গে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন।

আইয়াস্ বিন মাদা ঃ এই সময় মদিনাতে দুটি গোত্র আপন আপন প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। একটি আস্, অন্যটি খাজরাজ। দু' দলের মধ্যে চিরন্তন ঝগড়া চলতে থাকে। খাজরাজ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আনস্ বিন রাফির নেতৃত্বে মক্কায আসে। এই প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য ছিল মক্কার জনসাধারণের সমর্থন লাভ। এদের মধ্যে ছিলেন আইয়াস্ বিন মাদা। নবী মহম্মদ ইসলামধর্মের কথা তাদের বললেন। আইয়াস্ সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলেন। যদিও দলের নেতা আনস্ এতে ক্ষুব্ধ হলেন।

দামাদ ঃ ইনি ছিলেন ইয়ামেনের অধিবাসী। একজন বিখ্যাত জাদুকর। তিনি শুনেছিলেন হযরত মহম্মদ (দঃ) একজন বিখ্যাত জ্বিনকে বশে রেখেছিলেন। তিনি মক্কার কুরাইশদের নিকট এলেন। এবং তাদের বললেন তিনি মহম্মদ (দঃ)-এর জ্বিন ছাড়িয়ে দেবেন। এরপর তিনি মহম্মদ (দঃ)-এর নিকটে গেলেন। তাঁকে বললেন—আপনি কি আমার বক্তব্য আগে শুনবেন? তখন মহম্মদ (দঃ) বললেন—আপনি আমার কথা আগে শুনুন। এরপর তিনি পাঠ করলেন—"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রার্থনা কবি, এবং তাঁরই নিকট সাহায্য চাই। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন কবেন, তাঁকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না। যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাঁকে কেউ পথ দেখাতে পাবে না। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এবং তাঁর কোন শরিক নেই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহম্মদ (দঃ) তাঁর দাস ও দূত।" এই কথাগুলো প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাযে খোৎবায় পাঠ করা হয়। এরপরও নবী মহম্মদ (দঃ) আরও কিছু পাঠ করতে উদ্যত হলে, দামাদ বাধা দেন। এবং ওই কথাগুলোই আবৃত্তি করতে বলেন। তখন নবী তিনবার ওই কথাগুলো আবৃত্তি করেন। অতঃপর দামাদ বলেন আর প্রয়োজন নেই। আমি বহু কবি জাদুকরের কথা শুনেছি। কিন্তু এরূপ কথা কখনও শুনিনি। ভাবের দিক থেকে এই কথাগুলো এতই গভীর যা সমুদ্রর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। আমি এখন একজন মুসলমান।

বুয়াসের যুদ্ধ ঃ এদিকে আন্স বিন রাফি মদিনা হতে ফিরে এলো। এবং আস্-খাজরাজের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধই বুয়াসের যুদ্ধ নামে পরিচিত। প্রথম

দিকে খাজরাজ গোত্র জয়ী হলে পরিশেষে আস্‌ গোত্রই জয়ী হয়। তবে উভয় গোত্রেরই ক্ষয়ক্ষতির সীমা ছিল না। এই সুযোগে ইহুদীগণ একটা মতলব আঁটছিল—যখন উভয় গোত্রই দুর্বল হয়ে পড়বে তখন তারা মদিনা দখল করবে, কিন্তু তা হয়নি।

আকাবার প্রথম শপথ (৬২১ খ্রীঃ) ঃ আকাবা মক্কার নিকটবর্তী হিরা পাহাড় ও মিনার নিকটবর্তী স্থান। নবুয়তের একাদশ বছরে এখানে তিনি ছয়জন মদিনাবাসীকে শপথ বাক্য পাঠ করান, যার মূল কথা তাঁরা মদিনায় গিয়ে ইসলাম প্রচার করবেন। তাঁদের নাম—১। আবু ইমামা বিন জরাহ্‌, ২। আউফ বিন হারিস, ৩। রাফি বিন মালেক, ৪। কুতাবা বিন আমির বিন হুদাইদা, ৫। আকাবা বিন আমির বিন নাবি, ৬। সাদা বিন রাবি।

এঁরা হযরতের নির্দেশমতো মদিনায় ইসলাম প্রচারের ব্রতে রত থাকলেন। নবুয়তের দ্বাদশ বছরে আস্‌ ও খাজরাজ গোত্র হতে আরও একটি বড় প্রতিনিধি দল হজে এলেন। তাঁরা হযরতের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাদের মধ্যে বারোজন ব্যক্তি দলের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তারা হযরতের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর সকলেই মুসলমান হয়ে গেলেন, এবং তারা ছয় দফায় একটি শপথপত্র নবীর হাতে দিলেন—

১। আল্লাহর সঙ্গে আমরা কাউকে শরিক করব না।
২। আমরা ব্যভিচার করব না।
৩। আমরা চুরি করব না।
৪। আমরা শিশুহত্যা করব না।
৫। আমরা কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেবো না।
৬। আমরা সকল ভাল কাজে আল্লাহর নবী মহম্মদ (দঃ)-কে মান্য করব।

যখন তাবা এই শপথ গ্রহণ করলেন তখন নবী বলেন—"যে এই শপথনামা মান্য করবে, আল্লাহর কাছে তাঁর পুরস্কার জান্নাত, যে অমান্য করবে তার বিধানও আল্লাহর কাছে, তিনি ক্ষমাও করতে পারেন, নাও পারেন।" এরপর হযরত মুসায়াব বিন উমাইরকে তাদের নিকট কোরআন ও ইসলাম শিক্ষা দিতে পাঠালেন। মুসায়াব সেখানে গমন করলেন এবং নবীর নির্দেশমতো কাজ করতে থাকলেন, তাতে আশাতীত ফল পাওয়া গেল।

উসাইদ এবং সায়াদ বিন মাদ ঃ মুসাযাব সায়াদ বিন জারাহ-এর সঙ্গে মদিনায় মিলিত হলেন। একদিন মুসায়াব এবং সায়াদ বিন জারাহ বানু আবদাল আশহাল এবং বানু জাফর গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য একটা স্থানে মিলিত হলেন। সায়াদ বিন মাদ এবং উসায়াদ বিন হুদাইর যথাক্রমে ওই দুই গোত্রের নেতা ছিলেন। তাঁরা ওই সভার খবর পেয়ে সেখানে হাজির হলেন, যাতে তারা কাউকে ধর্মান্তরিত করতে না পারে।

সায়াদ উসাইদকে বলল—তুমি কত উদাস, ওই দুটো লোক (মুসায়াব ও আসাদ) আমাদের সমস্ত মানুষকে বিপথগামী করছে। বরং তুমি সেখানে যাও এবং তাদের বলো তারা যেন ওরূপ না করে এবং তারা যেন আমাদের বিরক্ত করতে না আসে। আমি যেতাম, কিন্তু আসাদ আমার আত্মীয়। উসাইদ সেখানে গিয়ে মুসায়াবকে ভর্ৎসনা করল। এবং ওইরূপ করতে নিষেধ করল। তখন শান্ত মুসায়াব তাকে বলল—"আমি মনে করি, তুমি এখানে এসো এবং আমার নিকট বসো এবং আমি যা বলি তা শোন। পরে তুমি তোমার স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।" উসাইদ বলল, ঠিক আছে। তখন মুসায়াব তার নিকট ইসলামের

মর্মবাণী ব্যাখ্যা করল এবং কোরআনের কিছু অংশ আবৃত্তি করল। উসাইদ সমস্ত কিছু নীরবে শুনল, নীরবে বুঝল এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করল। দু' রাকাত নামাযও পড়ল।

এদিকে সায়াদ বিন মাদ অতি উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছে উসাইদের জন্য। যখন সে ফিরল, সায়াদ জিজ্ঞাসা করল—কি হলো? উসাইদ বলল, "আমি তাদের সকল কথা বললাম। তারা বলল, "তারা তোমার সঙ্গে আলোচনা না করা পর্যন্ত কোন কিছুই করবে না ; তুমি একবার সেখানে যাও।" সায়াদ সেখানে গমন করল। আর সেখানে সায়াদ-এর পরিণতি তার বন্ধু উসাইদের অনুরূপ হলো।

আবদুল আশহাল গোত্রের ধর্মান্তরকরণ ঃ হযরত ওমর বিন খাত্তাবের মতো সাদ ছিলেন অতি বাস্তবমুখী কঠোর মানুষ। তিনি অস্ত্রধারণ করলেন, এবং সমগ্র গোত্রকে একত্রিত করলেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা আমার সম্পর্কে কি চিন্তা করেছেন? তাঁরা বলেন—আপনি আমাদের নেতা ও প্রধান ব্যক্তি, চিরদিন আমরা আপনার উপদেশমতো কাজ করেছি। তখন সাদ বলেন, আজকের এই ব্যাপারে আমি আপনাদের কোন নরনারীকেই কিছু বলব না, যতক্ষণ না আপনারা এক আল্লাহ্ ও তাঁর দূত হযরত মহম্মদ (দঃ)-এ বিশ্বাস স্থাপন করেন। সন্ধ্যার পূর্বেই সকলেই মুসলমান হয়ে গেলেন। এই ঘটনার কথা দ্রুত মদিনায় পৌছল। ইসলামের মহান কাণ্ডারী সমস্ত কিছু অবগত হলেন।

আকাবার দ্বিতীয় শপথ এবং মহানবীকে মদিনায় আমন্ত্রণ (৬২২ খ্রীঃ) ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) হযরত মুসায়াবকে মদিনায় ইসলাম প্রচারে নিয়োগ করেন। মুসায়াব চরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করেন। যার ফলে মদিনার মুসলমানগণ হযরতকে মদিনায় আমন্ত্রণের জন্য ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলাকে মক্কায় প্রেরণ করেন। এটা ছিল হজের সময়। হযরত তাঁদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার মিলিত হলেন। কিন্তু মদিনাবাসীদের সঙ্গে এটা ছিল তাঁর তৃতীয় মিলন, সঙ্গে ছিলেন হযরতের চাচা আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব, যিনি তখনও মুসলমান হননি। কিন্তু বিপদসঙ্কুল স্থানে তিনি সবসময়েই তাঁর সঙ্গে থাকতেন, কেননা তিনি জানতেন হযরতের বহু শত্রু ওঁত পেতে আছে। আর তিনিই প্রথম খাজরাজ গোত্রকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, ওহে খাজরাজ গোত্র, আপনারা জানেন মহম্মদ (দঃ) আমাদের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। এবং আমরা তাঁকে আমাদের সর্বস্ব দিয়ে রক্ষা করে আসছি। তিনি আপনাদের ব্যতীত অন্য কারও সঙ্গে যুক্ত হতে সম্মত হননি। যদি আপনারা চিন্তা করেন আপনারা আজ যে প্রতিজ্ঞা করবেন, কাল তা রক্ষা করতে সক্ষম হবেন. এবং আপনারা হযরতকে শত্রুর হাত হতে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন তাহলে হযরত আপনাদের নিকট থাকবেন, আর যদি আপনারা চিন্তা করেন বিপদের দিনে তাঁকে একাকী ত্যাগ করবেন, তাহলে এখনই ত্যাগ করুন।

তখন মদিনাবাসীগণ উত্তর দিলেন, আমরা আপনার নিকট হতে অনেক কিছু শুনেছি, এখন আল্লাহ্র নবীর নিকট হতে শুনতে চাই। তখন নবী মহম্মদ (দঃ) পবিত্র কোরআন হতে কিছু আবৃত্তি করেন. আপনারা কি শপথ নিচ্ছেন যে আপনারা আমাকে আপনাদের শিশু ও স্ত্রীলোকদের ন্যায় শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন? এ কথায় তাঁদের প্রধান বারাবিন মারুর সরাসরি হস্ত সম্প্রসারণ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসুল, আল্লাহর শপথ, আমরা যুদ্ধপ্রিয় ও যুদ্ধজাত সন্তান, যুদ্ধ আমাদের রক্তের সঙ্গে সংমিশ্রিত।

হযরত মহম্মদ (দঃ) উত্তর দিলেন, জীবন-মৃত্যুতে আমি আপনাদের সঙ্গে এবং আপনারাও আল্লাহর সঙ্গে। আমি যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব আপনারাও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন এবং আমি যাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করব, আপনারাও তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করবেন।

তখন তাঁরা শপথ গ্রহণে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু আব্বাস উবাইদা তাঁদের এই বলে থামিয়ে দিলেন—আপনারা কি এই শপথের তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন? এই শপথের দ্বারা আপনাদেরকে আপনাদের অতীতের সমস্ত সংস্কার হতে মুক্ত হতে হবে। আপনজনকেও পর করতে হবে এবং পরকে আপন করতে হবে। তখন তাঁরা নবীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে আল্লাহর নবী, আমরা যদি সমস্ত পরিত্যাগ করে আপনার সঙ্গে থাকি, আমরা কি প্রতিদান পাবো? উত্তর ছিল জান্নাত। এইভাবে তাঁরা শপথবাক্য পাঠ করলেন।

"আমরা শপথ নিচ্ছি সুখে-দুঃখে সবসময় আমরা আপনার কথামতো চলব। এবং যে কোন অবস্থাতেই আমরা আল্লাহ্ ও সত্য হতে বিচ্যুত হবো না।"

তখন নবী মহম্মদ (দঃ) মদিনাতে তাঁদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য বারোজনকে নিযুক্ত করলেন, তাঁদের মধ্যে নয়জন খাজরাজ গোত্রের। এই নয়জনের প্রথম তিনজন আকাবাতেই শপথ গ্রহণ করেন।

(১) আসাদ বিন জারাহ, (২) রাফি বিন মালিক, (৩) উবাইদা বিন সামিত, (৪) সাদ্ বিন রাবি, (৫) মঞ্জুর বিন আমর, (৬) আবদুল্লাহ বিন রাওয়া, (৭) রবা বিন মারুর, (৮) আবদুল্লাহ বিন আমর, (৯) সাদ্ বিন উবাইদা।

আস্ সম্প্রদায়ের তিনজন ঃ (১০) উসাইদ বিন হুজাইরিয়র, (১১) সাদ বিন খুজাইমা, (১২) আবদুল হাশিম বিন তাইহান।

নবী মহম্মদ (দঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ খুবই খুশি হলেন, কেননা তাঁদের আলোচনা অত্যন্ত শান্তির সঙ্গে ফলপ্রসূ হলো এবং কুরাইশদের কেউই গোপন তথ্য জানতে পারল না। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলেন।

হে কুরাইশগণ, মহম্মদ (দঃ) এবং তাঁর সঙ্গী যুবকগণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

মদিনাবাসীগণ কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু নবী মহম্মদ তাঁদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিলেন না। বরং তিনি তাঁদেরকে আপন আপন তাঁবুতে বিশ্রাম নিতে বললেন। পরদিন কুরাইশগণ মদিনাবাসীদের তাঁবু পরিদর্শন করলেন। এবং জিজ্ঞাসা করলেন কেন তাঁরা মহম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে শপথবাক্যে আবদ্ধ হলো। তারা কোন উত্তর পেল না। তখন কুরাইশগণ অনিশ্চিত অবস্থায় ফিরে গেল। এবং মদিনাবাসীগণও মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

কুরাইশগণ পরে এই শপথবাক্য সম্পর্কে আরও বহু তথ্য আবিষ্কার করল। এবং তারা মদিনাবাসীদের পশ্চাতে ধাওয়া করল কিন্তু তারা নবীর নবম শিষ্য সাদ বিন উবাইদা ব্যতীত কাউকে ধরতে পারল না। তারা তাঁকে প্রহার করল এবং তাঁর ওপরে ভীষণ অত্যাচারও করল, যতক্ষণ না তাঁকে জুবাইয়ের বিন মুতীম উদ্ধার করেন, যাঁর সঙ্গে তার ব্যবসার সম্পর্ক ছিল।

দশম অধ্যায়

মহানবী মদিনায় (ইয়াসরিবে) হিযরতের কারণসমূহ

.হযরতের হিযরতের অন্তরালে কি ছিল ? ঃ এই অধ্যায়ে আমরা যা কিছু লক্ষ্য করলাম, সবগুলোকেই হিযরতের কারণ বা ঘটনাপ্রবাহ বলা যেতে পারে। তবে পরবর্তী ঘটনায় হিযরতের কারণগুলো আরও প্রকটরূপ ধারণ করল।

নবীজীবনের সঙ্কটময় সময় ঃ যত দিন যেতে লাগল, কুরাইশরা যেন ততই আস এবং খাজরাজ গোত্রের আকাবার শপথ সম্পর্কে দিন দিন সজাগ হতে লাগল। বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীগণ একত্রে কোনদিনই বসবাস করতে পারে না। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকল—যাতে ইসলামেব জ্যোতি চিরতরে নির্বাণ লাভ করে। নবী মহম্মদ (দঃ) বহু পূর্বেই এ সম্পর্কে ধারণা করেছিলেন, তাই তিনি আকাবার শপথের ব্যবস্থা করেন। এবং শিষ্যগণকে মদিনায় হিজরত করতে নির্দেশ দেন, যাতে কুরাইশগণ তাঁদেবকে নিধন করতে না পাবে।

মুসলমানদের মদিনায় গমন ঃ একাকী এবং দু'-তিন দলে মুসলমানরা মদিনার পথে যাত্রা করল। সেখানে অতি আদরে তাঁদের গ্রহণ করা হলো। এইসব মুসলমানদের প্রতি যে অত্যাচার কবা হযেছিল তা এককথায় অবর্ণনীয়। কাউকে বন্দীখানায়, কাউকে গভীর কূপে, কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। অধিকাংশ মানুষকে ধন-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়, এমনকি অনেকে আপন স্ত্রী ও সন্তানকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি।

নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ব্রতের ত্রয়োদশ বছর। তখন মক্কাতে কোন মুসলমানই নেই—একমাত্র নবী (দঃ) নিজে এবং আলি (রাঃ) ও আবুবকর (বাঃ) ব্যতীত। অবিশ্বাসী কুরাইশগণ বুঝতেই পারল না হযরত মক্কায় থাকবেন, না আবিসিনিয়ায় যাবেন, না মদিনায় যাবেন। হযরতের পরামর্শ পরিষদ ছিল। তাঁর মধ্যে ছিলেন হযরতের একান্ত বন্ধু বা অনুচর হযরত আবুবকর। তিনি হযরত (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবেন ? হযবত (সাঃ) উত্তর দিলেন—অপেক্ষা করুন আল্লাহ্‌ব আদেশের, সম্ভবত আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন। কিন্তু হযরত (সাঃ) তাঁকেও জানালেন না কখন কিভাবে কোথায় কোন্ পথে যাত্রা করবেন। বিচক্ষণ ধীর আবুবকর (রাঃ) বুঝতেই পারলেন অবস্থা কত ভয়াবহ। শুধু তিনি তিনটে সবল উটকে উত্তমরূপে খাইয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

শত্রুপক্ষ কুরাইশগণ দিন দিন ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করল। হিংসা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন তাদের একেবারেই অন্ধ করে তোলে। তারা সমস্ত রকমের অত্যাচারে হযরতকে জর্জরিত করে তোলে। কিন্তু মহামানব সকল কিছুকেই পরাস্ত করলেন। তাদের কতিপয় বিশেষ ব্যক্তি ইসলামধর্মে দীক্ষিত হলো। এমনকি অবিশ্বাসীদের অন্তর্গত আবদুল মোত্তালিবের পুত্র আব্বাস এবং আরও কয়েকজন সদাই প্রস্তুত ছিলেন নিজেদের জীবন দিয়েও হযরতের জীবনকে রক্ষা করতে। তারা বুঝতে পেরেছিল, অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে ; সমগ্র মদিনাবাসীগণ হযরতের পক্ষে। সিরিয়ার সঙ্গে কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্যও

বন্ধ। মক্কা ও মীনার হজ্জও বাধাব কন্টকে ক্ষতবিক্ষত। শুধু তাই নয়, যে কোন মুহূর্তে হযবতের অনুগামীগণ মক্কাবাসীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কুরাইশগণ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যে কোন প্রকারেই হোক এই অন্তহীন যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি দবকার।

মক্কাবাসীদের একটি পরিষদ ভবন ছিল। তাব নাম দাবুল নাদওয়া। এখানে মক্কাবাসীগণ তাদের বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমাধানে একত্রিত হতেন। এখানে একত্রিত হলেন কুরাইশদের প্রধান প্রধান চোদ্দজন ব্যক্তি। এঁরা বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন ঃ

বানু আব্দুস শামস্ ঃ

১। সাইবা } রাবিয়াব পুত্র
২। উতবা }
৩। আবু সুফিয়ান বিন হারাব বিন উমাইযা বিন নাওফল
৪। তাইমা বিন আদি
৫। জুবাইয়েব বিন মুতীম
৬। হাবিছ বিন আমির

বানু আবদুদদার ঃ

৭। নাদেব বিন হাবছে বিন কালদা

বানু আসাদ বিন আবদুল উজ্জা ঃ

৮। আবুল বখতারি বিন হিশাম
৯। জামাহ্ বিন আসওয়াদ
১০। হাকিম বিন হিজাম

বানু মাখজাম ঃ

১১। আবু জেহেল বিন হিশাম

বানু শাম ঃ

১২। নাবিযা
১৩। মুনাব্বা বিন হাজ্জাজ

বানু জুমাহ ঃ

১৪। উমাইয়া বিন খালাফ্ [হযরত বেলাল (রাঃ)-এব পূর্ব মালিক]

একজন পরামর্শ দিল হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে বেঁধে একটা বদ্ধ ঘবে ফেলে বাখা হোক, যতক্ষম না তাঁর মৃত্যু হয়।

নাজাদের এক বৃদ্ধ উত্তর দিলেন না, ওটা হবে না। কেননা এই সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এবং তাঁর সহযোগীরা এগিয়ে আসবেন এবং তাঁকে উদ্ধাব কববেন। অন্য একজন পরামর্শ দিল, তাঁকে একটা সবল উটেব পেছনে বেঁধে দেওয়া হোক, এবং উটকে সজোরে তাড়ানো হোক যতক্ষণ না তাঁর মৃত্যু হয়।

সঙ্গে সঙ্গে এক বৃদ্ধ উত্তব দিলেন, তোমরা জান না। মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে হযরত অদ্বিতীয়। সুতরাং ওই ভাবে প্রকাশ্যে রাস্তায় কিছু করা চলবে না।

বানু মাখজাম গোত্রের আবু জেহেল শেষ প্রস্তাব দিল—(১) প্রত্যেক গোত্রের একজন করে বীর সাহসী যুবককে আনা হোক। (২) ওই সমস্ত যুবক রাত্রিবেলায় হযরতের ঘর ঘেরাও করুক। (৩) যখনই হযরত ঘর থেকে বের হবেন সঙ্গে সঙ্গে যুবকগণ তাঁর ওপর লাফিয়ে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বধ করবে। এতে সকল গোত্রই যোগদান করবে। তাহলে হযরতের গোত্র বা বংশ সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। বরং হত্যার জন্য মুক্তিপণ নিতে বাধ্য হবে। এই প্রস্তাবটিই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। হযরত (দঃ) এই সভার বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারলেন। তখন সিদ্ধান্ত নিলেন মক্কা ত্যাগের। কোরআন শরীফেও এর কিছু উল্লেখ আছে।

"এবং স্মরণ কর তোমরা যখন পৃথিবীতে অল্প সংখ্যক দুর্বল ছিলে তখন তোমরা আশঙ্কা করেছিলে যে লোকেরা তোমাদের বলপূর্বক নিয়ে যাবে, অনন্তর তিনি তোমাদের আশ্রয় দিলেন এবং স্বীয় সাহায্য তোমাদের শক্তিসম্পন্ন করেন এবং পবিত্র বস্তু হতে তোমাদের জীবিকা দান করলেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।" কোরআন—৮ ঃ ২৬

"যখন অবিশ্বাসীরা তোমার সম্পর্কে ষড়যন্ত্র করছিল বন্দী করার জন্য কিংবা হত্যা করার জন্য কিংবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা চক্রান্ত করছিল এবং আল্লাহ্ও কৌশল করছিলেন এবং আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।" কোরআন—৮ ঃ ৩০

আল্লাহর এই মহাকৌশলে মহানবী হযরত (দঃ) আলিকে তাঁর বিছানায় রেখে দিয়ে নিজে হযরত আবুবকরের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কি করে কোন কৌশলে হযরত দুর্ধর্ষ আরব জাতির সকল গোত্রের সকল বীর তেজস্বী প্রতিনিধিদের উপেক্ষা করে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়িতে গেলেন, এ কৌশল আজও সঠিক ভাবে এ পৃথিবীর কারও জানা নেই। "আমি ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে অন্তরাল স্থাপন করেছি এবং দৃষ্টির ওপর আবরণ রেখেছি ; ফলে ওরা দেখতে পায় না।" এখানেই আল্লাহ্ মহাকৌশলী। ৩৬ ঃ ৯। কোরআন আবার বলে—"তিনি তোমাকে অবশ্যই স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন।" ২৮ ঃ ৮৫। এদিকে সমগ্র মক্কাবাসী সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। তারা সকালে উঠে দেখবে হযরত মহম্মদ (দঃ) আর ইহলোকে নেই। নেই আর কোন দ্বন্দ্ব। যেটুকু থাকবে তা আরবদের চির গতানুগতিক যুদ্ধধারা বা মুক্তিপণ দেওয়া নেওয়া। এতে আরবরা এতটুকুও ভয় করে না।

জীবন বিপন্নময় অন্ধকার রাতে
সন্ধি কভু কর নাই অজ্ঞতার সাথে।

হযরত (দঃ)-এর এই পন্থা এতই গোপন ছিল যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত আবুবকরেরও জানা সম্ভব হয়নি। তিনি শুধু নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। হযরত আবুবকরের কন্যা আসমা এদের এক ব্যাগ শুকনো যুই ফল দিলেন। এবং তিনি কোন বাঁধার দড়ি না পেয়ে নিজ কোমর-বন্ধন ছিঁড়ে বেঁধে দিলেন।

"বলো, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে (ইয়াসরিবে-মদিনাতে) কল্যাণের সঙ্গে প্রবেশ করাও এবং (মক্কা হতে) শান্তিপূর্ণ বহির্গমনে বহির্গত কর। তোমার নিকট হতে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর।" ১৭ ঃ ৮০।

ঘনীভূত অন্ধকারের মাঝে দুটি মানুষ নীরবে বাড়ি হতে বেরিয়ে পড়লেন। মক্কা হতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে সওর পাহাড়। সেখানে তাঁরা উপস্থিত হলেন। এই পাহাড়ে আরোহণ

করা খুবই শক্ত। এর ভেতরে ছিল একটি গুহা। উভয়ই বহু কষ্টে এর মধ্যে প্রবেশ করলেন। হযরত আবুবকর ওর ভেতরের গর্তগুলোকে নিজের কম্বল ছিঁড়ে বন্ধ করলেন। একটি গর্ত কম্বলাভাবে খালি রয়ে গেল। আবুবকর আপন পা দিয়ে সেটাকে বন্ধ করলেন। এবং ক্লান্ত নবী মহম্মদ (দঃ) তাঁর কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে ওই গর্ত হতে আবুবকরের পায়ে সাপ কামড়ে দেয়। তীব্রযন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। তবুও পাছে হযরতের ঘুম ভেঙে যায়, এই আশঙ্কায় তিনি আড়ষ্ট হয়ে থাকিলেন। হঠাৎ আবুবকরের অশ্রুবিন্দু হযরতের মুখমণ্ডলে পড়ায় তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। হযরত তাঁর ক্ষতস্থানে মুখের লালা লাগিয়ে দেওয়ায় তিনি যন্ত্রণা হতে মুক্তি পান।

হযরত তাঁর নিজেব বিছানায় চাদর ঢাকা দিয়ে আলিকে রেখে যান। কারও বোঝার কোন অবকাশ ছিল না। তরুণ সাহসী যুবকদল মুক্ত তরবারি সহ হযরতের ঘর ঘিরে আছে, তারা মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখছে; হযরত আজ তাদের হাতের মুঠোয় বন্দী। কিন্তু হযরত কোথায় আছেন এ কথা কেউই জানত না, মাত্র তিনজন ব্যতীত ; যাঁরা ছিলেন হযরত আবুবকরের ছেলে ও মেয়েরা—আসমা, আয়েশা এবং আবদুল্লাহ।

নিরপরাধ আলি নির্বিকারে সকাল পর্যন্ত ঘুমাচ্ছেন। যখন তিনি উঠলেন, অতন্দ্র কুরাইশ প্রহরীগণ দেখল-- একি! কোথায় মহম্মদ (দঃ)! তারা জিজ্ঞাসা করল হযরত আলিকে। তিনি উত্তরে দিলেন - তোমরা প্রহরী ছিলে, না আমি ছিলাম? তোমরাই তো আমাকে বলবে তিনি কোথায় গেলেন।

সমগ্র কুরাইশকুল অবাক, হতভম্ব। এ কি হল! তারা চিন্তা করল, হযরত এ হেন প্রহরী ভেদ করে কখনও পালাতে পারেন না। কোথাও তিনি লুকিয়ে আছেন। আবুবকর (রাঃ) ছিলেন তাঁর একান্ত বন্ধু। আবু জেহেল দ্রুত তাঁব বাড়িতে গমন করলেন হযরতের খোঁজে, সেখানে দেখলেন কেউ নেই। আছেন আবুবকরের মেয়ে আসমা। আবু জেহেল তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলেন। আসমা উত্তর দিলেন, জানি না। আবু জেহেল তাঁর গালে চড় মারলেন। তবুও তিনি কিছুই প্রকাশ করলেন না।

চারদিকে মহা হইচই পড়ে গেল। হযরতের খোঁজে চারদিকে লোক বেরিয়ে পড়ল। কেহ বা ঘোড়ায় চেপে, কেউবা উটে, কেউবা পায়ে হেঁটে কিন্তু সকলেই ফিরে এল। কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

এদিকে আসমা প্রত্যহ রাতে গোপনে তাদের জন্য খাবার নিয়ে যেতেন ওই পর্বত গুহায়। আমর হযরত আবুবকরের ভেড়াগুলো দেখত এবং দুধ সরবরাহ করত। গুহা পর্যন্ত সমস্ত পদচিহ্ন সে বিলোপ করত। আবুবকরের পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁদের নিকট কুরাইশদের সমস্ত সংবাদ পৌঁছে দিতেন।

কুরাইশগণ নাছোড়বান্দা। তারা গুহার মুখে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু সেখানে কোন মানুষের চিহ্ন দেখতে পেল না। তাঁদের মনে হলো এখানে কোন মানুষ নেই। এ সম্পর্কে একটা সুন্দর কাহিনী আছে। মহানবী এবং হযরত আবুবকর গুহার মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর আদেশে বর্বর নামক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলো গুহামুখে ঝুঁকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো বুনো কবুতর সেখানে বাসা বাঁধে। বাসা বাঁধার পরই স্ত্রী কবুতরটি ডিম পাড়ে। এবং ডিমে তা দিতে থাকে। এই ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মাকড়সা এসে তাদের বাসার মুখে

বা ওপরে জাল বুনে দেয়। মক্কার কুরাইশগণ যখন দেখল গুহামুখে কবুতরের ডিম, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধারণা হলো—এখানে কোন মানুষ প্রবেশ করতে পারে না। তারা ওই স্থান ত্যাগ করল। এই ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কেননা গুহামধ্যে যাঁরা নিত্য গমনাগমন করতেন, যাঁরা এই গুহার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত—যেমন হযরত আবুবকরের সুযোগ্য পুত্র ও কন্যা—আবদুল্লাহ এবং আসমা এবং আবুবকরের ক্রীতদাস আমের ইবন সোহাইরা (পরে আজাদ) এবং স্বয়ং হযরত আলি। এঁদের প্রথম জন আবদুল্লাহর কাজ ছিল গুপ্তচর বৃত্তি অর্থাৎ মক্কার কুরাইশগণ দিবালোকে কি পরামর্শ করেছেন, সেগুলোকে রাতের আঁধারে গুহায় নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেওয়া। এ কাজ তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছিলেন। সাহসিনী বিবি আসমা ও আয়েশা তাঁদের যাত্রাকালে কিছু খাবার তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমের হযরত আবুবকরের ছাগ ও মেষপাল চরিয়ে বেড়াতেন। তিনি রাত্রির এক প্রহর অতিবাহিত হলে ওই ছাগ ও মেষপাল নিয়ে সওর পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হতেন। এক ছাগ ও মেষ দোহন করে সঞ্চিত দুধ তাঁদের দিতেন, যা তাঁরা পান করতেন। মূলত এটাই ছিল তাঁদের জীবিকা।

এই চারজনের মুখ থেকে আমরা উপরোক্ত ঘটনা বা কাহিনীর লেশ মাত্র পাইনি। আমাদের কথা গুহার মধ্যে কি ঘটল, না ঘটল, সেটা যদি কেউ জানতেন—তা জানতেন একমাত্র মহানবী এবং তাঁর একমাত্র সঙ্গী হযরত আবুবকর। এবং এঁদের কাছ থেকে প্রথম জানার অধিকারী ছিলেন ওই চারজন। যাঁরা ছিলেন গুহার প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি। যাঁরা ছিলেন হিজরতের গোপন কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। যাঁরা ছিলেন হযরতের একান্ত বিশ্বাসী মানুষ। এই প্রত্যক্ষদর্শী, এই বিশ্বাসী মানুষদের নিকট হতে আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। এই বর্ণনার মূল রাবী (অর্থাৎ হাদিস বর্ণনাকারী) আবু মোহয়াব মাক্কী, এই ব্যক্তি যে কে, তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। এঁর পরবর্তী রাবী 'আওন'। এই 'আওন' সম্পর্কে বিখ্যাত ইমাম বোখারির মন্তব্য—"আওন অজ্ঞাত অবস্থার মানুষ।" সুতরাং এই ঘটনা কতটা সত্য নির্ভর, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি। এমনকি হযরত আয়েশা, যিনি একদিকে হযরতের স্ত্রী ও অন্যদিকে এই ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাঁর নিকট হতেও এহেন চমকপ্রদ কাহিনীর কিছুই জানতে পারলাম না। সুতরাং সন্দেহের অবকাশ অতি স্বাভাবিক।

তবে গাছের ডাল নুয়ে পড়া ও তাতে যে কোন পাখির বাসা বাঁধাও যেমন স্বাভাবিক কথা, তেমনি গুহামুখে মাকড়সার জাল বোনাও স্বাভাবিক কথা। এগুলোর কোনটাই অস্বাভাবিক কাজ কিছু নয়, বরং স্বাভাবিক। তবে 'সওব' পাহাড়ের গুহামুখে যে ওই সব ঘটেছিল, একথা জোরের সঙ্গে কে বলতে পারে। এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর কোন উল্লেখ নেই। তাই আমাদের বলার কথা—যে কোন কষ্টকল্পিত অলীক অলৌকিকতা সৃষ্টি করে মহানবীকে বড় করার দরকার নেই, কেননা জগতের যে কোন অলৌকিকতা অপেক্ষা মহানবীর পূত পবিত্র চরিত্রই কি বড় অলৌকিকতা নয়? একজন নবীশ্রেষ্ঠ মহানবীর জন্য এরূপ সহস্র ঘটনা ঘটা বা ঘটানো অতি তুচ্ছ ব্যাপার। সুতরাং শুধু মুসলমান বলে নয়, সকল মানুষেরই সতর্ক থাকা উচিত—ভাষা মেঘের জালে সত্য-সূর্য যেন আচ্ছন্ন হয়ে না যায়। মহানবী সত্যের মূর্ত প্রতীক, তার ধারে-কাছেও যেন মিথ্যা না যায়। যদি কেউ

মহানবীকে আপন মূর্খতাবশত বড় করতে গিয়ে খুশিমতো বর্ণনার মিথ্যা জালে জড়িয়ে দেন, অলীক অলৌকিকতার আবরণে ঢেকে দেন, নিশ্চয় তিনি মহানবীর অভিশাপ ব্যতীত আশীর্বাদ পেতে পারেন না। কেননা—

মহম্মদ মানুষ তবে মানব সেবায়
মানব জীবনে যাঁর মিথ্যা কিছু নাই। কোরআন—৩৩ ঃ ২১

যখন মক্কাবাসীগণ গুহাদ্বারে উপস্থিত হয়ে হইচই করছিল, তখন হযরত আবুবকর অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং বললেন আমরা মাত্র দু'জন। হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁকে বললেন, চিন্তা করবেন না, আমরা দু'জন নই নিশ্চয়, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই মহাঘটনার কথা পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ আছে ঃ

"যদি তোমরা তাকে (রসুলকে) সাহায্য না করো, ফলত আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন অবিশ্বাসীরা তাকে বের করছিলেন এবং সে ছিল একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে স্বীয় সঙ্গীকে (আবুবকর) বলেছিল তুমি চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ সান্ত্বনাবাণী অবতীর্ণ করেন এবং তাকে এমন সৈন্যদল দ্বারা সাহায্য করেন যা তোমরা পূর্বে দেখোনি এবং অবিশ্বাসীদের কথা নীচ (অগ্রাহ্য) করেছিলেন। এবং আল্লাহর কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।" কোরআন—৯ ঃ ৪০

তিন দিন তিন রাত হযরত মহম্মদ (দঃ) ও হযরত আবুবকর (রাঃ) ওই গুহার মধ্যে কাটালেন। এদিকে কুরাইশগণ তন্ন তন্ন করে খুঁজে হয়রান হয়ে পড়ল। একটা সুবিধামতো সময়ে হযরত আবুবকরের ওই তিনটি উট সফর-প্রস্তুতিসহ গুহাদ্বারে হাজির হলো। হযরত আবুবকর আবদুলাহ্ বিন উরিকাতাকে পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করলেন এবং তিনজনই উটের ওপর উঠলেন। উট ঘোরালো পথ ধরে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করল। প্রথমে মক্কার দক্ষিণ দিকে, পরে লোহিত সাগরের উপকূল ধরে তাইনের পথে রাত্রিযোগে যাত্রা এগিয়ে চলল।

সুরাকা-র কাহিনী ঃ মক্কাবাসীগণ একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করল। যে কেউ হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে জীবিত কি মৃত অবস্থায় হাজির করতে পারবে সে পাবে এ পুরস্কার। ওদিকে তিনজনের কাফেলা নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে থাকল। অবশেষে একজন লোক এল এবং কুরাইশদেব খবর দিল—সে দেখেছে তিনজন মানুষকে তিনটি উটের ওপর অমুক পথে এগিয়ে যেতে। সুরাকা বিন মালিক সেখানে উপস্থিত ছিল। তার ওই ঘোষণায় খুব লোভ হলো। সে বলল—ওই তিনজন মহম্মদ (দঃ) বা তাঁর দল নয়। এবং সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল, সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ফিরে এল, এবং ওই লোকটির নির্দেশিত পথে হযরতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। সুরাকার ঘোড়া তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। যখন হযবত মহম্মদ (দঃ) ও আবুবকর তাঁদের উটগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য চিন্তা করছেন তখন তাঁরা দেখতে পেলেন একটি দ্রুতগামী ঘোড়া দু'বার হোঁচট খেল। তখন নবী প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ, আমাদের শয়তানের শয়তানি থেকে রক্ষা কর।" সুরাকার ঘোড়া আবার একবার পড়ে গেল। তখন সে বুঝতে পারল এটা একটা খারাপ লক্ষণ। সে সামান্য দূর থেকে চিৎকার করে বলতে থাকল—আমি জুসহামের পুত্র সুরাকা। আমাকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে দিন। আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি, আমি আপনাদের প্রতারণা করব

না। আমার দ্বারা আপনাদের কোন ক্ষতিও হবে না। তখন হযরত ও আবুবকর তার জন্য অপেক্ষা করলেন। এবং হযরতের নির্দেশমতো আবুবকর তাকে একটি লিখিত আশ্বাস দিলেন এবং সুরাকা এই প্রতিজ্ঞা দিয়ে ফিরে গেল—সে আরও অনুসারীদের নিয়ে ফিরে আসবে।

হযরত (দঃ) কুবাতে ঃ হযরত এবং আবুবকর সময় নষ্ট না করেই আবার যাত্রা করলেন। এই যাত্রায় তাঁদেরকে পানি ও গরমের জন্য অত্যধিক কষ্ট পেতে হয়েছিল। অবশেষে তাঁরা পৌঁছালেন বানু শাম গোত্রের এলাকায় এবং তাঁদের প্রধান বারিদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বারিদা তাঁদের অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। তখন মদিনা বেশি দূরে নয়। মহানবীর সঙ্গে সদলবলে যাত্রাকালে বারিদার প্রদত্ত ঐতিহাসিক সংবর্ধনা ও অভিবাদন আকাশ-পাতাল মুখরিত করে তোলে ঃ

এসেছেন শান্তিরাজ শান্তি দিতে মানবে
সন্ধির স্থাপয়িতা রুখে দিবে দানবে।
নিখিলের মহানন্দ নিরুপম নিষ্ঠা
ন্যায় ও বিচারে হবে শান্তি রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

হযরতের সংবাদ এরই মধ্যে মদিনায় পৌঁছে গেল। তখন মদিনাবাসীগণ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা কবলেন তাঁদের সংবর্ধনা জানানোর জন্য।

ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ ঃ ছয়দিনের অবিরাম যাত্রার পর হযরত কুবাতে পৌঁছালেন। তখন ছিল রবিউল আওয়াল মাসের অষ্টম দিন।[১] আরবী বছরের তৃতীয় মাস, ইংরেজি ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। হযরত মহম্মদ (দঃ) ও হযরত আবুবকর শিষ্যগণের সঙ্গে পরস্পরকুশল ও সাদর সম্ভাষণের পর মদিনার কুবা পল্লীতে বানি আমের বংশের কুলসম এবনে হেদ্‌মের বাড়িতে পৌঁছালেন। হযরত কুবা পল্লীতে চোদ্দ দিন অবস্থান করেন।[২] এখানে স্থানীয় মুসলমানদের সাহচর্যে একটা মসজিদ স্থাপন করলেন। এই সমজিদ নির্মাণকার্যে হযরত স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটাই ইসলাম-জগতের প্রথম মসজিদ। শেষ দিনে হযরত আলি তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। হযরত মহম্মদ (দঃ) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর মক্কায় হযরত আলির ওপর কুরাইশরা অমানুষিক অত্যাচার করতে থাকে। অবশেষে তাদের কাছ থেকে মুক্তিলাভ করে, তিনি মক্কায় হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর কাছে যারা টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, গয়না ইত্যাদি গচ্ছিত রেখেছিল তাদের সব ফেরত দিয়ে অবিলম্বে মদিনার পথে যাত্রা করেন।[৩] তিনি মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত সমগ্র পথ পায়ে হেঁটে যাত্রা করেছিলেন। সারা রাত পথ হাঁটতেন এবং দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতেন। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে ২৭ সেপ্টেম্বর, রবিউল আওয়াল শুক্রবার হযরত মদিনায় পদার্পণ করেন। এবং তখন থেকেই মুসলিম-জগতে ইসলামী হিজরী সন গণনা করা হয়।

১ বোখারি।
২। বোখারি ৪৮৬।
৩। আবু-দাউদ, ফৎহুল বারী।

কুবাতে চোদ্দ দিন অবস্থান করার পর হযরত তাঁর মাতৃকুলের আত্মীয় নজ্জার বংশের লোকেদের মদিনা যাত্রার কথা জানালেন। হযরতের আগমন সংবাদ পেয়ে তাঁরা আনন্দ উৎসাহে বীরজাতির নিয়ম অনুসারে সকলে খোলা তরবারি নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হলেন।[১] মদিনার মুসলমান জনসাধারণ সংবাদটি জেনে আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল। সেদিন ছিল শুক্রবার, হযরত মদিনার পথে হওনা হলেন। তাঁর সামনে পিছনে ভক্তের দল আনন্দে আত্মহারা হয়ে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর জুম্মার নামাযের সময় হলে হযরত বনি সালেম গোত্রের পল্লীর নিকট জুম্মার নামায আদায় করেন। জুম্মার ফরজ নামাযেব আগে তিনি খোৎবা বা অভিভাষণ দান করেছিলেন।

মদীনাতুন নবী ঃ

হযরত এখানেই প্রথম জুম্মার নামায পরিচালনা করেন। এবং এটাই ছিল ইসলাম-জগতের **প্রথম জুম্মার নামায।** এই নামাযের পব তিনি নিজ উষ্ট্রী কাসওয়ার ওপর আরোহণ করে শহরে প্রবেশ করলেন।[২] এই দিনটি ছিল ইয়াসরিব অধিবাসীদের জন্য স্বর্ণদিবস। এদিন থেকেই শহর ইয়াসবিবকে 'মাদিনাতুন নবী' বা নবীর শহর আখ্যা দেওয়া হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলেই হযরতকে অভাবনীয় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সকলেই তাঁকে আল্লাহর মহাদূত রূপে এক বাক্যে ববণ কবলেন। যুবকরা উল্লাসে ফেটে পড়ল। যুবতীরা বাড়ির ছাদ থেকে নানারকম কবিতা ও শ্লোকের মাধ্যমে তাঁকে অন্তরের অকৃত্রিম অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন।

জনসমুদ্র হযরতের উটকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে এবং প্রধানগণ স্বয়ং হযরতকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের প্রার্থনা তাঁদের বাড়ির সামনে হযরত তাঁর উটকে থামান। তিনি সকলকেই বিনীতস্বরে বললেন—তাঁর উষ্ট্রী আল্লাহর পথ-নির্দেশনায় চলেছে। সে যেখানে থামবে সেখানে আমি থামব। উষ্ট্রী এমন এক জায়গায় থামল, সে স্থানের মালিক দুই এতিম বালক সাহাল এবং সুহাইল। হযরত অবতরণ করলেন। ওই স্থানটি ক্রয় করা হলো মাজ বিন আফ্রার মাধ্যমে। ওই স্থানটিতে হযরত একটি মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সংলগ্নে তাঁব ঘরও। এবং তাই করা হলো। এবং সেই হতে আজ পর্যন্ত ওই মসজিদ—মসজিদে নববী বা নবীর মসজিদ নামে পরিচিত। সহি মোসলেম শরীফ হাদিসে উল্লেখ আছে যে, হযরত মহম্মদ (দঃ) মদিনায় প্রবেশকালে ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যের উত্তরে বললেন, 'বানু নাজ্জার বংশ হলো আমার পিতামহ আবদুল মোত্তালিবের মাতুল গোত্র—আমি তাদের কাছে নামব। আমি এভাবে তাঁদেরকে সম্মান দেখাতে চাই।' যে জায়গায় মদিনার পবিত্র মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে এসে হযরতের উট বসে পড়ল। হযরত তখন বললেন, 'খোদা চান তো এটিই আমার

১। বোখারি।

২। তাবরি।

৩। মোসলেম ২-৪১৯।

৪। মদিনা শব্দের অর্থ—শহর। ৩৩ ' ১৩।

আশ্রয়স্থল।' বল বাহুল্য যে, এটিই নাজ্জাব বংশের পল্লী। ভাগ্যবান স্বনামধন্য আবু আইউব আনসারির বাড়িও এর পাশেই অবস্থিত। হযরত উট থেকে নামলে ভক্তপ্রবর আবু আইউব তাঁকে সসম্মানে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে সুবিধাজনক বিবেচনা করে হযরত নিচের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আইউব ধন্য হলেন। মদিনাও ধন্য হলো।

উপসংহার ঃ

প্রথম কারণ—ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক ঃ মক্কা ছিল বড়ই অনুর্বর ভূমি ; যেদিকেই দেখা যায় শুধু বালুকারাশি, উত্তপ্ত মরুভূমি। বন নেই, বৃক্ষ নেই, বর্ষা নেই, বাদল নেই মাঝে মাঝে স্বল্প বৃষ্টি শুধু প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখে। অপরদিকে ইয়াসরিব (মদিনা) সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা, প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য। এই কারণেই আমরা লক্ষ্য করি মক্কার মানুষ জন্মগতভাবেই ছিলেন কঠোর মনোভাবাপন্ন, সেখানকার জলবায়ু ও প্রকৃতিই তাঁদেরকে ওই ভাবেই গড়ে তুলেছিল। তাঁদের প্রকৃতি যেন কোন কিছুকেই ধীর স্থির ভাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিল না। তাঁরা ছিলেন চির চঞ্চল, চির দুর্বার। শ্রাবণের বারিধারা, বর্ষার বাদল, বনের বিহঙ্গরাজি ও বসন্তের কোকিল তাঁদের মনকে কোনদিনই নমনীয় করার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু অপরদিকে ইয়াসরিব ছিল ঠিক এর বিপরীত। সেখানকার মাটির মানুষ, প্রাণী প্রকৃতি সকলকে যেন সুন্দর কোমল স্বভাবের করে গড়েছে। জগতের কোন কাঠিন্য যেন তাঁদের স্পর্শই করতে পারেনি। তাই তাঁরা কঠোর হতে শেখেননি। শত্রু-মিত্র সকলকেই যেন গ্রহণ করেছেন সাদরে। এই কারণেই ইসলামের চারা বৃক্ষটির প্রথম লালন-পালনের জন্য মক্কা অপেক্ষা মদিনা ছিল যোগ্য স্থান।

দ্বিতীয় কারণ—ঈর্ষাগত ঃ একথা সর্বকালে সর্ব দেশের জন্য প্রযোজ্য যে, কোন মানুষ কোন দেশে বড় হলে, সর্বপ্রথম তাঁর আপন দেশবাসী প্রায় তাঁকে স্বীকৃতি দেয় না। এই না দেওয়ার নানা কারণ দেখা যায় ; কোথাও থাকে জটিলতা, দুর্বলতা, কোথাও থাকে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঈর্ষা। কোথাও থাকে অভিমান, অহঙ্কার, কোথাও থাকে অবজ্ঞা, অজ্ঞতা, কোথাও থাকে ক্রোধ ও ঘৃণা। কোথাও থাকে অহেতুক জল্পনা-কল্পনা, কোথাও থাকে অলীক আলোচনা-সমালোচনা, কোথাও থাকে প্রতিহিংসা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি। মক্কাবাসীগণ মহানবী সম্পর্কে এই সমস্ত দুর্বলতা থেকে নিষ্কৃতি পাননি। তাই মহানবীর স্বীকৃতি বা তাঁকে সাদরে বরণ করা মক্কাবাসীদের দ্বারা হলো না। যেটা হলো মদিনাবাসীদের দ্বারা।

তৃতীয় কারণ—ধর্মযাজক পুরোহিত সমাজ ঃ শুধু আরব দুনিয়া নয়, বিশ্বের যে কোন দেশের যে কোন বিপ্লবের কথা চিন্তা করলে দেখা যায়, তা সহজে সিদ্ধিলাভ করেনি। এর মূলে একটি মাত্রই কারণ। কারণটি হচ্ছে—কতিপয় বা কতকগুলো মানুষ দেশের অধিকাংশ মানুষকে অন্ধকারে রেখে নিজেরা সুখভোগ করতে চায়। এই অন্ধকারে রাখতে যারা সর্বাপেক্ষা সিদ্ধহস্ত, তারা হলো সমাজের জ্ঞানপাপী, ভণ্ড, পীর-ফকির, ধর্মযাজক ও পুরোহিত সমাজ। সেদিনের আরবেও মক্কা ছিল দেশের তীর্থভূমি। কাবা ছিল সেই তীর্থের প্রাণকেন্দ্র। এই প্রাণকেন্দ্র কাবাকে কেন্দ্র করেই মক্কার প্রধান গোত্রগুলো বিশেষ করে কুরাইশগোষ্ঠী বহু দিন ধরে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ, মান-সম্মান প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রেখে

আসছিল। সমগ্র আরবের দৃষ্টি ছিল কাবার দিকে। আবার এই কাবার প্রধান পুরোহিত ছিল কুরাইশগণ। ধর্মের নামে তারা একটা জঘন্যতম ব্যবসা চালাচ্ছিল। আশীর্বাদের নামে মানুষকে তারা চরম অভিশাপে ও নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যখনই মহানবী জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন; সত্য ও সুন্দরের পথে জ্ঞানের দীপশিখা জ্বালিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কাবার প্রধান পুরোহিত কুরাইশকুল প্রমাদ গুণল—এ যে ভীষণ বিপদ। দৃঢ় সংকল্প করল—রুখতেই হবে। এই সমস্ত ভণ্ড পীর-ফকির-ধর্মযাজক-পুরোহিতগণকে কোনদিনই কেউ বোঝাতে পারেননি। যেহেতু তারা জ্ঞানপাপী। এই কারণে মহানবীর বাণীও মক্কাতে ব্যর্থ হলো। কিন্তু ইয়াসরিবে (মদিনাতে) সার্থক হলো, সফল হলো, সুন্দর হলো, ইসলামের চারা বৃক্ষ ফলবান বৃক্ষে রূপায়িত হলো। কেননা সেখানে ছিল না কোন জ্ঞানপাপী ধর্মযাজক ও পুরোহিত সম্প্রদায়।

চতুর্থ কারণ—আস্ ও খাজরাজ গোত্রের আমন্ত্রণ ঃ পূর্বেই আলোচনা হয়েছে—মদিনার দুই প্রধান গোত্র আস্ এবং খাজরাজ দীর্ঘদিন ধরে বুয়াসের যুদ্ধে রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই তারা শান্তির সন্ধানে কোন মহান ব্যক্তিত্বের সন্ধান করছিল, যিনি তাঁদের এই দীর্ঘদিনের কলহকে মিটমাট করে দিতে পারেন। ইন্ধন যোগাচ্ছিল সেখানকার চতুর ইহুদীগণ আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সুতরাং তাঁরা সাদরে আমন্ত্রণ জানাল মহানবীকে মদিনায় আসার জন্য।

পঞ্চম কারণ—ইহুদীদের আগ্রহ ঃ প্রথম দিকে ইহুদীদের ধারণা ছিল—মহানবী তাঁদের ধর্ম গ্রহণ করবেন এবং তাদের চির শত্রু খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের সাহায্য করবেন। এই আশায় তারা চরম আগ্রহ প্রকাশ করেছিল—মহানবীকে মদিনায় পেতে। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল হযরত মহম্মদ (দঃ) নিজেই একজন নবী। তাই শিকার করতে গিয়ে শিকার হয়ে গিয়েছিল।

হিযরতের গুরুত্ব ঃ ইসলামের ইতিহাসে হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে মহানবী শান্তি পেলেন; ইসলাম পায়ের তলায় মাটি পেল। এখানেই মহানবী ইসলামের অধিকাংশ ধর্মীয় বিধিবিধানের যাবতীয় নির্দেশ দান করেন। এখানেই তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে বিশ্বে প্রথম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তাই এখানে তিনি একদিকে সার্থক রাজনীতিবিদ, অন্যদিকে সফল ধর্মীয় শিক্ষক। শুধু তাই নয়, এই মদিনার মাটিতেই তিনি বিশ্বের সেরা সমাজ-সংস্কার, আবার জাতির জনক। এই মদিনার বুকেই তিনি মানব-জীবনের, মানবসমাজের এমন কোন দিক নেই, যে-দিকটাকে নিপুণভাবে লক্ষ্য করে যাননি। আবার যেখানেই তিনি হাত দিয়েছেন—হয়েছে তার আমূল পরিবর্তন। এককথায় তাঁর যে মহান ব্রত ছিল একদিকে বিশ্ব-স্রষ্টার বন্দনা, অন্যদিকে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় করে তোলা, এ সবই মদিনার মাটিতে ষোল কলায় সার্থক হয়েছে। তাঁর যে মূল লক্ষ্য ছিল—পবিত্র কোরআনে প্রচার ও মূল নেশা ছিল—মানবজাতির উত্থান; এই দুটোই তাঁর কর্মবহুল জীবনাকাশে সূর্য ও চাঁদের মতো বিশ্বব্যাপী বিকশিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং মক্কা হতে মদিনার বুকে মহানবীর হিজরতের গুরুত্ব ইসলামের ইতিহাসে গৌরবজনক উজ্জ্বলতম অধ্যায় রচনা করেছে।

একাদশ অধ্যায়

হিজরীর প্রথম দুই বছর

মদিনাতে ধর্মীয় শিক্ষক ও রাজনীতিবিদ রূপে মহানবী

মক্কা থেকে যে সমস্ত মুসলমান মদিনায় এলেন তাঁদের মুহাজেরিন বা উদ্বাস্তু বলা হতো। এবং মদিনার মুসলমানদের আনসার বা সাহায্যকারী বলা হতো।

হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর স্বভাবসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে মদিনাতে মসজিদের কাজ আরম্ভ করলেন। যখন তা প্রস্তুতির পথে, তখন তিনি আবু আইউব খালিদ বিন জায়েদ আনসারির বাড়িতে বাসা নিলেন। তিনি স্বয়ং মসজিদের নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করলেন। বিশাল এক প্রাঙ্গণে এই মসজিদের কাজ আরম্ভ হয়। এর কিছু অংশ খেজুর পাতা বা কাঠখড়ি দ্বারা আবৃত ছিল এবং বেশির ভাগ ছিল উন্মুক্ত। এর একদিক নির্দিষ্ট ছিল আগন্তুক ও পথিকদের জন্য, যাদের কোন বাড়িঘর ছিল না—যাদের 'আহলুল সুফ্‌ফা' বলা হতো অর্থাৎ মাদুরের সঙ্গী। এর এক পাশে ছিল অতি সাদাসিধে অবস্থায় হযরতের ঘর বা হুজরা। রাত্রির উপাসনার সময় ব্যতীত এখানে কোন আলো থাকত না। রাত্রির আলোও ছিল খড় জ্বালিয়ে। যখন মসজিদের কাজ সমাপ্ত হলো হযরত তাঁর বাসা পরিবর্তন করলেন। পরবর্তীকালে এই মসজিদই—মসজিদ-ই-নববী।

মদিনায় ধর্মীয় শিক্ষক ও ধর্মের বিধানদাতা রূপে মহানবী ঃ ইসলামধর্মের অনুশাসন অনুষ্ঠানের জন্য কতকগুলো বিধিবিধান আছে। যেগুলোর অধিকাংশই মহানবী মদিনায় প্রত্যাদেশ লাভ করে তার অনুগামীদের নির্দেশ দান করেন। যেমন শারীরিক পবিচ্ছন্নতার জন্য গোসল, ওজু এবং মানসিক পবিত্রতার জন্য ঈমান, আযান, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ।

১। **গোসল বা স্নান ঃ** শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য এই বিধান। তবে যদি কেউ অসুস্থ হয, তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা আছে। এখানেই ইসলাম অত্যন্ত উদার।

২। **ওজু বা প্রক্ষালন ঃ** নামায বা প্রার্থনার পূর্বে, ইসলামী নিয়মে হাত-মুখ-পা ধোওয়া এবং মস্তক মসেহ করাকে ইসলামী পরিভাষায় ওজু বলা হয়।

৩। **তায়াম্মুম ঃ** যদি কারও শরীর ভাল না থাকে এবং পানি না পায়, তবে তার জন্য গোসল বা ওজু করার প্রয়োজন নেই। তার পরিবর্তে সে তায়াম্মুম করতে পারে। তায়াম্মুম অর্থাৎ—পবিত্র মাটি স্পর্শযোগে পরিচ্ছন্ন হওয়া।

উপরোক্ত তিনটি বিধান সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের উক্তি—"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উপাসনার নিকটবর্তী হয়ো না। যে পর্যন্ত তোমরা যা বল, তা বুঝতে না পার, এবং যদি তোমরা পথচারী না হও, তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়—যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। তবে যদি তোমরা পীড়িত হও, অথবা সফরে থাক, অথবা

তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানা থেকে আসে, অথবা তোমরা রমণী স্পর্শ (সহবাস) কর, এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তার দ্বারা তোমাদের মুখ ও হাত মুছে ফেল, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপমোচনকারী ক্ষমাশীল।"

কোরআন—৪ ঃ ৪৩

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যখন নামাযের জন্য প্রস্তুত হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ (কনুই পর্যন্ত) ধৌত কর এবং মস্তক সমূহ মুছে ফেল, এবং পদগ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে, এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও। তবে বিশেষ ভাবে পবিত্র হবে।"

কোরআন—৪ ঃ ৪৩, ৫ ঃ ৬

৪। ঈমান ঃ

(ক) আত্মচেতনা, জীবনচেতনা, বিশ্বচেতনা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসংযম, আত্ম উপলব্ধি, বিশেষ করে আল্লাহ্-উপলব্ধি, এগুলোর সমষ্টিগত নামই ঈমান।

(খ) সারা সৃষ্টিজগতের প্রতি তাকিয়ে আল্লাহ্র মহিমা জগতের প্রতি যে অনুভূতিময়, উপলব্ধিময় বিশ্বাস, তারই নাম ঈমান।

(গ) আল্লাহ্র মহান গুণাবলীকে আপন জীবনে বাস্তবায়িত করার যে বাসনা, যে সুদূর প্রসারী আত্মবিশ্বাস, তারই নাম ঈমান।

(ঘ) মহানবীর নবুয়ত লাভের পূর্বে এই জাতীয় ঈমানই তাঁর বুকে বিরাজিত ছিল। এবং এই জাতীয় ঈমানের ওপর তিনি নবুয়ত লাভ করেছিলেন।

একটি ছাত্র বিশ্বাস করে যে, ভালভাবে পড়াশোনা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু যে একদিনও বই খোলে না তার এরূপ বিশ্বাস না থাকাই ভাল। অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে ঈমান নামক বিশ্বাসটিও ঐরূপ প্রাণহীন নিষ্ক্রিয় জড়পদার্থে পরিণত হয়েছে, বা কতকগুলো প্রাণহীন অনুষ্ঠানে অনুশাসন ও অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। যেখানে দেহ আছে, কিন্তু প্রাণ নেই। ধর্মের দেহ —অনুষ্ঠান ও অনুশাসন, প্রাণ তার অনুভূতি ও অনুভব এবং তার যথাযথ প্রয়োগ।

দেহ ও প্রাণের লীলা জগৎ-অন্তরে
ইসলাম বহিরাবরণ ঈমান-অন্তরে।

৫। আযান ঃ মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বিখ্যাত মেরাজের সময় হতে পাঁচবার নামায নির্ধারিত হয়। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায মদিনাতে মুসলমানদের জন্য যথাযথ বিধিতে পরিণত হয়। মক্কাতে এই বিধি এভাবে দৃঢ়তা পায়নি, তার একমাত্র কারণ কুরাইশদের বিরামহীন অত্যাচার। মহান ইসলামের যে বীজ একদিন মক্কায় রোপিত হলো, তা ধীরে ধীরে মদিনায় লালন-পালন হতে থাকল। তাই বলা হয়, ইসলামের জন্ম মক্কায়, লালন মদিনায় ও সমাধি দামাস্কাসে। মদিনাতে সেই লালনের পালা আরম্ভ হলো। নামাযে মুসলমানদের ডাকা প্রয়োজন বোধ করলেন সকলেই। তাই কেউ বললেন— ইহুদীদের মতো তুরী বাজানো হোক, কেউ বা বললেন ইংরেজদের মতো ঘণ্টা বাজানো হোক। কিন্তু মুসলমানরা কোনটাতেই খুশি হতে পারলেন না।

অবশেষে স্বপ্নাদিষ্ট হযরত ওমরের পরামর্শে মহানবী নির্দেশ দিলেন—মুখে আহ্বান করো নামাযীগণকে। এবং এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলে বিবেচিত হলো। মসজিদে নববীর

নিকটে বানু নাজ্জার গোত্রের এক মহিলার বাড়ি ছিল। হযরত বেলাল (রাঃ) সেই বাড়ির ওপরে উঠে সকলকে নামাযের জন্য জোর আওয়াজে আহ্বান জানাতে থাকলেন। "আযান" অর্থ আহ্বান ঃ

১। "আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

২। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

৩। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মহম্মদ (দঃ) আল্লাহর দূত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মহম্মদ (দঃ) আল্লাহর দূত।

৪। নামাযের জন্য এসো, নামাযের জন্য এসো।

৫। মঙ্গলের জন্য এসো, মঙ্গলের জন্য এসো।

৬। নিদ্রা অপেক্ষা নামায উত্তম, নিদ্রা অপেক্ষা নামায উত্তম। (এটা কেবল ফজরের নামাযেব সময়।)

৭। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

৮। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।"

এই কথা ক'টি বাক্যে যেমন সরল, বুঝতে তেমনি সহজ, সমগ্র ইসলামধর্মের আদি-অন্ত যেন এর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সারা বিশ্বের সর্বত্র একই সময়ে কোটি কোটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এক আল্লাহর এবাদতে। সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে হযরতের নামোচ্চারণ। হযরত মহম্মদ (দঃ) এই আযান ব্যতীত আর যদি কিছুই করে না যেতেন তবুও তাঁর নাম নিঃসন্দেহে চির অমরত্ব লাভ করত। এ এমনি এক অপূর্ব জিনিস। কিন্তু তিনি এই ওজু ও আযানের মতো আরও সহস্র উজ্জ্বল বিধি-বিধান মুসলিম-জাহানকে দান করে গেছেন।

৬। নামায ঃ নামায ফারসী শব্দ। আরবী সালাত্ অর্থাৎ দোয়া বা প্রার্থনা। ইসলামধর্মে অনুষ্ঠানগত ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রতিদিন পাঁচবারের নামায অতি অবশ্যই পালনীয়। এবং অন্যান্য অনুশাসনের মধ্যে এটাই প্রধান অনুশাসন। মহানবী জীবনে একবারও এটাকে বাদ দেননি। এমনকি মৃত্যুর মহামুহূর্তেও তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে যে দুটো কথা বের হয়েছিল—'নামায' ও 'গরিব মানুষ'। অর্থাৎ এই দুটোই তাঁর মহাজীবনের ছিল প্রধান লক্ষ্যবস্তু—স্রষ্টার স্মরণ ও সৃষ্টির সেবা। এই স্রষ্টার স্মরণ সম্পর্কে স্বয়ং স্রষ্টা তাঁর আপন বাণী পবিত্র কোরআনে অন্যান্য সকল নির্দেশ অপেক্ষা বেশি নির্দেশ (৮২ বার) দিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষ যেন তাঁকে সদাই স্মরণ করে।

কোরআন—১১ ঃ ১১৪, ২০ ঃ ১৪, ১৩২, ২২ ঃ ৭৮, ২৯ ঃ ৪৫

নামায সম্পর্কে কোরআনের বিভিন্ন নির্দেশ

১। জামায়াতে (একত্রে) নামায পড়ার নির্দেশ ঃ	২ ঃ ৪৩
২। মক্কার কাবাগৃহে নামায পড়ার নির্দেশ ঃ	২ ঃ ১২৫
৩। সংক্ষিপ্তভাবে নামায পড়ার নির্দেশ ঃ	৪ ঃ ১০১-৩

৪। পাঁচবার দৈনিক নামায পড়ার নির্দেশ ঃ ১৭ ঃ ৭৮, ৭৯
৫। স্পষ্টাক্ষরেও মাঝামাঝি স্বরে নামায পড়ার নির্দেশ ১৭ ঃ ১১০, ৭৩ ঃ ১-৬
৬। নামাযে বিনীত নম্র হওয়ার নির্দেশ ঃ ২৩ ঃ ২
৭। নামায সম্পর্কে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ ঃ ২৩ ঃ ৯
৮। মানুষের কাজ যেন নামাযকে ভুলিয়ে না দেয় ঃ ২৪ ঃ ৩৭
৯। নামায মানুষকে কদর্যতা ও অশ্লীলতা হতে দূরে রাখে ঃ ২৯ ঃ ৪৫
১০। শুক্রবারে জুম্মার নামায পড়ার নির্দেশ ঃ ৬২ ঃ ৯
১১। লোক দেখানো নামায পড়া নিষেধ ঃ ১০৭ ঃ ৪-৬

প্রতিদিনের পাঁচবার নামাযের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। ফজর নামায, অর্থাৎ সূর্য ওঠার আগে প্রভাতকালীন নামায।

কোরআন—৭ ঃ ২০৫, ২০ ঃ ১৩০, ৩০ ঃ ১৭, ৩৩ ঃ ৪২, ৫০ ঃ ৩৯, ৫২ ঃ ৪৮, ৭৬ ঃ ২৫

২। জোহর নামায, অর্থাৎ মধ্যাহ্নের সূর্য ঢলে পড়ার পর নামায।

কোরআন—১৭ ঃ ৭৮, ৩০ ঃ ১৮

৩। আসর নামায, অর্থাৎ বিকালের নামায। কোরআন—৩০ ঃ ১৮ , ৫০ ঃ ৩৯

৪। মগরেব নামায, অর্থাৎ সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে যে নামায।

কোরআন—৭ ঃ ২০৫, ২০ ঃ ১৩০, ৩০ ঃ ১৭

৫। এশার নামায, অর্থাৎ রাত্রির প্রথমাংশের নামায।

কোরআন—৫২ ঃ ৪৯, ৭৬ ঃ ২৬

অন্যান্য নামায ঃ

৬। জুম্মার নামায, অর্থাৎ প্রতি শুক্রবারে জোহর নামাযের পরিবর্তে সকলে একত্রিত ভাবে যে নামায পড়া হয়। কোরআন—৬২ ঃ ৯

৭। তাহাজ্জোদ নামায অর্থাৎ মধ্য রাত্রির পর যে অতিরিক্ত নামায পড়া হয়।

কোরআন—১৭ ঃ ৭৯, ৭৩ ঃ ২০

৮। ঈদের নামায, অর্থাৎ ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহার নামায। যাকে বলা হয় ঈদ ও বকরিদের নামায। সকাল থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত পড়া হয়ে থাকে।

কোরআন—২ ঃ ১৮৩, ২২ ঃ ২৬, ২৮, ১০৮ ঃ ২

৯। জানাযার নামায, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়ার নামায।

১০। এশরাকের নামায, অর্থাৎ সূর্য ওঠার পরের নামায। এশরাক শব্দের অর্থ আলোকিত হওয়া, তাই জগৎ আলোকিত হওয়ার পর এ নামায পড়তে হয়।

১১। চাশ্‌তের নামায অর্থাৎ বেশ একটু বেলা হলে যে নামায পড়া হয়। চাশ্‌ত ফরাসী শব্দ। আরবী যোহা। আমাদেব দেশে যোহার নামায কেউ বলে না, যেমন—সালাত্ আরবী শব্দ না বলে এই দেশে সকলেই বলে থাকে নামায।

১২। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামায ঃ অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য গ্রহণগ্রস্ত হলে মহানবী আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে বলেছেন।

১৩। ইস্তেসকার নামায ঃ আরবী 'ইস্তেসকা' শব্দের অর্থ পানি চাওয়া। কোন সময় দেশে পানি না হলে মুসলমানগণ নামায সহকারে আল্লাহ্‌র নিকট পানি ভিক্ষা করে, তারই নাম ইস্তেসকা।

১৪। ভূমিকম্পের নামায ঃ দেশে ভূমিকম্প হলে বিভিন্ন ভাবে নামাযের যে প্রার্থনা করা হয়।

১৫। এস্তেখারার নামায ঃ এস্তেখারা আরবী শব্দ, এর অর্থ কোন জিনিসের ভাল দিকটা খোঁজা। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট মঙ্গল দিকটা জানতে চাওয়া। এটা মহানবীর প্রিয় ছিল। কোরআন—২ ঃ ২৩

১৬। তওবার নামায ঃ পাপ করে চরম অনুশোচনার সঙ্গে যে নামায পড়া হয়।

১৭। সমস্যা বা অভাব মোচনের নামায ঃ অভাবে বা সমস্যায় পড়ে যে নামায পড়া হয়। এ নামায মহানবী ভালবাসতেন।

১৮। শবেবরাতের নামায ঃ আরবী শাবান মাসের ১৪ই দিনগত রাতে যে নামায পড়া হয়। এই রাতে বহু মুসলমান কবরস্থানে গিয়ে আপন আপন স্বর্গত প্রিয়জনদের জন্য মঙ্গল কামনা করে থাকেন।

১৯। আশুরার নামায ঃ ১০ই মহরম তারিখে ইমাম হোসেন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হন। তাঁদের আত্মার মঙ্গল কামনার নামায।[১]

নামাযের মূল বক্তব্য ঃ প্রথম যে পাঁচটি নামায, এগুলো সকল মুসলমানের জন্য অতি অবশ্যই পালনীয়। কেননা মহানবী বলেন—"নামায ধর্মের স্তম্ভ।" আবার বলেন—"নামায ব্যতীত ইসলামের কোন মূল্যই নেই।" কোরআন বলে—"নামায কায়েম কর" অর্থাৎ মনোনিবেশ সহকারে পড়। এখানে প্রশ্ন মানুষ নামায কেন পড়বে? কোরআনে উত্তর—"আমার (আল্লাহর) স্মরণের জন্য।" "নিশ্চয়ই নামায মানুষকে কদর্যতা ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখবে।" অর্থাৎ মানুষ নামাযের দ্বারা হবে পূত-পবিত্র, শুদ্ধ-বিশুদ্ধ, নির্মল-নিষ্কলঙ্ক। এবং যখনই মানুষ এই পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে তার নামায দ্বারা, তখনই সে কৃতকার্য। কেননা কোরআন বলে—"কৃতকার্য তারাই, যারা নির্মল অন্তর বিশিষ্ট।" আবার বলে—"অনন্তর আল্লাহর কাছে কারও নিস্তার নেই, পবিত্র অন্তর ব্যতীত।" তাহলে দেখা যাচ্ছে ইসলামের কৃতকার্য ব্যক্তি একমাত্র তারাই, যারা শুধু-বিশুদ্ধ। কোরআন আরও বলে—জান্নাত বা স্বর্গ একমাত্র তাদেরই পাওনা বা প্রাপ্য—"যারা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ও সৎশীল।"

ইসলামের মূলতন্ত্রে কৃতকার্য তিনি, স্রষ্টায় বিশ্বাস রেখে সৎশীল যিনি।
কোন বলে ইসলামের স্বর্গ পেল কারা, স্রষ্টায় বিশ্বাস রেখে সৎশীল যারা।

কোরআন—২ ঃ ২৫, ১৮ ঃ ১৭

এখন আমরা মূল কথায় ফিরে যাই। নামাযের মূল উদ্দেশ্য দেখলাম—মানুষকে সৎ করা, শুদ্ধ করা। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই নামায পড়েন, কিন্তু নামাযের ফলপ্রাপ্ত মুসলমান শুদ্ধ মানুষ খুবই কম। অর্থাৎ যাঁরা একাগ্রতার সঙ্গে নামায পড়েন, তাঁরা শুদ্ধ

১। ইসলামের ইতিহাস, ষষ্ঠ খণ্ড উমাইয়া খেলাফত—প্রথম ইয়াজিদ, মহরম ও কারবালা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মানব। এরূপ ফলপ্রাপ্ত নামাযী খুবই কম। যাই হোক স্কুল-কলেজ খোলা আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা তার ফল তুলতে না পারলে তাদেরই দোষ। সুতরাং নামায তার মহান আবেদন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে পারে তার অবদান তুলে নিক।

নামায কি ও কেন—আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় নামাযের স্থান সর্বোচ্চে ঃ ইসলাম তার সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে নামাযকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে। মহানবী বলেন—"আস্‌-সালাতু মিরাজুল্ মুওমেনীন," নামায বিশ্বাসীদের জন্য (মেরাজ) স্বর্গারোহণ। আমরা প্রথমেই লক্ষ্য করেছি—নামাযের মূল উদ্দেশ্য—স্রষ্টার স্মরণ ও মানুষের শুদ্ধিকরণ। এই স্মরণ ও শুদ্ধিকরণ যখন পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছায় নামাযের মাধ্যমে তখনই নামাযীর স্বর্গারোহণ ঘটে থাকে। অর্থাৎ নামাযী তখন তার সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়ে যায়। এজন্যই নামাযকে সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে, কেননা তারই মাধ্যমে বিশ্বাসী মানব সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়ে থাকে। তাই নামায ব্যতীত ইসলাম অর্থহীন। যদি কেউ নামায ব্যতীত মুসলমান হওয়ার দাবি রাখেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে দাবিও অর্থহীন।

অতএব নামাযের মাধ্যমেই প্রত্যেক নামাযীর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাঁচবার 'মেরাজ' বা স্বর্গারোহণ ঘটবে, যদি সে ঘটাতে সক্ষম হয়। এই স্বর্গারোহণের পর যখন স্বর্গ হতে স্বর্গীয় শক্তি সহ বিদায় নেবে, তখন একবার 'সালাম' উচ্চারণ করবে, এবং যখন মর্ত্যের মাটিতে পৌঁছাবে, তখন দ্বিতীয়বার সালাম দেবে। তাই প্রতি নামাযান্তে দু'বার সালাম আছে। দু'বার সালামের গূঢ়তম রহস্য এই।

এখন প্রশ্ন জাগে--মুসলিম-জাহানে নামায তো অনেকেই পড়ছেন, কিন্তু দৈনিক পাঁচবার স্বর্গারোহণ তো বহু দূরের কথা, সমগ্র জীবনে একবারও সেটা হচ্ছে কি? যদি হয়, খুবই ভাল কথা। যদি না হয়, তাহলে নামাযী মাত্রেরই একবার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই কি—কেন হচ্ছে না। যাতে পূত-পবিত্র নামাযীরা বুঝিয়ে দিতে পারেন সারা বিশ্বের বে-নামাযীদের—নামাযের মূল বক্তব্য কি এবং নামায কেন?

তবুও এই অধ্যায়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করার দরকার আছে, স্বর্গারোহণ হোক আর নাই হোক, সকল মুসলমানের জন্য—নামায অতি অবশ্যই পালনীয়। চেষ্টায় যেন হতোদ্যম বা নিরাশা না থাকে। কেননা ইসলামে নিরাশা বলে কিছু নেই।

নিখিলে নামায তব শুদ্ধির সোপান যোগে—
স্বর্গলোকে আরোহণ
স্বর্গলোকের শক্তি নিয়ে পূর্ণ মানব রূপে--
মর্ত্যলোকে বিচরণ।
ধরণীর উপঘাতে—ইহাই আদর্শ ছিল
নবীজীর আচরণ
মর্ত্যে-নামায তব সংসার সমুদ্র হতে
স্বর্গেতে আরোহণ।

৭। রোযা ঃ কোরআন শরীফের দ্বিতীয় সূরা বাকারাহে যে সমস্ত জরুরী ঘোষণা করা হয়েছে তাদের মধ্যে রমযান মাসে ২৯ অথবা ৩০ দিন রোযা রাখা অন্যতম। রোযা ও ফারসী

শব্দ, আরবী—'সওম'। যার অর্থ কুকাজ ও কুচিন্তা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বা রাখা। অর্থাৎ মানুষ এই রোযার মাধ্যমে কুচিন্তা ও কুকাজ থেকে বিরত থাকে। রোযা বা রমযান 'রময' ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ পুড়িয়ে দেওয়া। অর্থাৎ কুচিন্তা ও সকল 'কু'-কে পুড়িয়ে দেওয়া। এ সম্পর্কে কোরআনের নির্দেশ—

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য হয়েছিল, যেন তোমরা সংযত হও। রমযান—রজনীতে স্ত্রী-গমন তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তারা তোমাদের পোশাক, তোমরা তাদের পোশাক।......সুতরাং এখন তোমরা স্ত্রী-গমন করতে পার,...এবং পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা হতে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর।" কোরআন—২ ঃ ১৮৩-১৮৭, ৪৪ ঃ ৩-৫, ৯৭ ঃ ১-৫

৮। যাকাত ঃ কোরআন শরীফে সূরা বাকারাহে যাকাত সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে। যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, তবে তার বিশদ ব্যাখ্যা আছে হাদিস শরীফে। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ দান করতে হবে। সোনা-গয়না টাকা-পয়সা ধন-দৌলত বা যার যে জিনিসই থাকুক, শতকরা ২১/২ ভাগ দান করাকে যাকাত বলে। মুসলিম সমাজে মুসলমানগণ ইসলামের এই শাশ্বত নীতিটিকে মেনে নিলে একদিকে কোন মুসলমানই যেমন অতিরিক্ত ধনী হতে পারে না, অন্যদিকে কোন প্রতিবেশী মুসলমান তেমনি একেবারে নিঃস্ব গরিব থাকতেও পারে না। ইসলামের সাম্য এভাবেই সাম্যবাদের শিক্ষা দিচ্ছে। সদ্‌কা ফিতের, উষর যাকাতের মূল উদ্দেশ্য গরিবকে সাহায্য দান করা। এ সম্পর্কে কোরআনের বিধান—২ ঃ ২১৫, ২৬৭, ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ৪ ঃ ৭৭, ১৬২, ৫ ঃ ৫৫, ৬ ঃ ১৪১, ৯ ঃ ১১, ১৮, ৬০, ৭১, ২২ ঃ ৪১, ২৩ ঃ ৪, ২৪ ঃ ৩৭, ৫৬, ২৫ ঃ ৬৭, ২৭ ঃ ৩, ৩০ ঃ ৩৯, ৩১ ঃ ৪, ৩৩ ঃ ৩৩, ৪১ ঃ ৭, ৭৩ ঃ ২০, ৭৬ ঃ ৮, ৯, ৯৮ ঃ ৫

নামাযের যেমন মূল বক্তব্য বা উদ্দেশ্য—মানুষকে শুদ্ধ করা, পবিত্র করা, যাকাতের তেমনি মূল বক্তব্য—মনকে শুদ্ধ করা এবং মনকে পবিত্র করা। নামাযের যেমন মৌলিক আবেদন—মানবতার উত্থান, যাকাতের তেমনি মৌলিক আবেদন—গরিবকে সাহায্য দান। নামাযের যেমন প্রথম কথা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। যাকাতের তেমনি প্রথম কথা গরিবকে মনে রাখা। লোক-দেখানো নামাযের যেমন কোন মূল্য নেই, শেষ মুহূর্তে লোক-দেখানো দানেরও তেমনি বিশেষ কোন মূল্য নেই। মহানবী তাঁর জীবনে আল্লাহ্‌কে স্মরণের জন্য নামাযের কথা যেমন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তেমনি গরিবকে রক্ষা বা যাকাতের মাধ্যমে সাহায্য করার জন্য গরিবের কথা মনে করিয়ে দিয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। মহানবীর মহানব্রতের সূর্য স্বরূপ ছিল যেমন আল্লাহর স্মরণ, চন্দ্র স্বরূপ ছিল তেমনি দানের মাধ্যমে গরিবের উত্থান। এইভাবে মহানবী মানব হৃদয়ে সদাই দুটো জিনিস লক্ষ্য করতে খুবই ভালবাসতেন। একটি আল্লাহর স্মরণ ও অন্যটি অসহায় গরিবের ভরণ-পোষণ। মহানবী আজ সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সমাজ-সংস্কারকের গৌরব অর্জন করেছেন, এর মূলে আছে বিশ্ব-গরিবের জন্য দেওয়া তাঁর অমূল্য বিধান। তাঁরই মহান বাণী—ধনী যদি রোগ মুক্তি পেতে চায়, গরিবকে দান করুক, ধনী যদি স্বর্গ পেতে চায়, অসহায়কে সাহায্য করুক,

ধনী যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ভালবাসা পেতে চায়, গরিবকে ভালবাসুক। এইভাবে তিনি গরিবের জন্য যাকাত বা দানের ঘোষণা দিয়ে দানের ব্যবস্থা উন্মুক্ত করে গেছেন।

৯। **হজ ঃ** মক্কার কাবা শরীফে তওয়াফ অর্থাৎ প্রদক্ষিণ ও নামায পালন। এবং অন্যান্য বিধিবিধান পালন করা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

নবী হযরত ইব্রাহিমেরই ধারা কোরআন শরীফে তার পুনঃ অনুমোদন লাভ।

যাদের মক্কা শরীফে যাওয়ার মতো শক্তি ও অর্থ আছে, তাদের জন্য একবার হজ করা ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)।

হজ সম্পর্কে কোরআন ঃ

১। কাবা শরীফের মর্যাদা—২ ঃ ১২৫, ৩ ঃ ৯৬-৯৭, ২২ ঃ ২৬-২৭

২। হজের দিন সমূহ—২ ঃ ১৯৭-১৯৯

৩। তওয়াফ ও যিয়ারতের বিবরণ—২২ ঃ ২৯

৪। মাকামে ইব্রাহিম—২ ঃ ১২৫

৫। সাফা ও মারওয়া পাহাড়—২ ঃ ১৫৮

৬। উমরাহ আদায়—২ ঃ ১৯৬

৭। কেশ মুণ্ডন—৪৮ ঃ ২৭

৮। এহরাম—৫ ঃ ১, ৯৫, ৯৬

৯। কোরবানির পশু—৭ ঃ ৯৭, ২২ ঃ ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৬-৩৭

মদিনাতে রাজনীতিবিদ হযরত মহম্মদ (দঃ) ঃ দেড়শ মুসলমান যাঁরা মক্কা থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শুধু হযরত আবুবকর ও হযরত ওসমান ব্যতীত কারও কিছুই ছিল না।

আস্ এবং খাজরাজ গোত্র বিগত বাউসের যুদ্ধে রণক্লান্ত। তারা ইহুদীদের সঙ্গে এক প্রকার সন্ধি-সম্পর্ক রেখেই চলছে। তাই ইহুদীগণ আশা করছে হযরত (দঃ) খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবেন। কারণ তাদের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল—মক্কার কুরাইশগণ হযরত (দঃ)-কে ছেড়ে কথা বলবে না। এমনকি যাঁরা আবিসিনিয়ায় হিযরত করেছেন তাঁদেরকেও ছাড়বে না। স্বয়ং হযরতকেও মদিনায় শান্তির সঙ্গে থাকতে দেবেন না। অধিকন্তু হযরতের নিজস্ব কোন সম্বল নেই, টাকা-পয়সা, সৈন্য-সামন্ত, উট-ঘোড়া এমনকি বাড়িঘর পর্যন্ত ; সুতরাং তাদের ধারণা হযরতের অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু হযরতের একটি জিনিস ছিল যেটি কারও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না, সেটি হচ্ছে—আল্লাহর দেওয়া শক্তি, সাহস ও উদ্দীপনা এবং নিজ স্বভাবজাত—সাধনা, সহ্য, ধৈর্য, বিচক্ষণতা এবং উদারতা। মদিনার রাজনৈতিক পরিবেশ বড়ই মেঘাচ্ছন্ন ছিল। রাজনীতিবিদ রূপে মহানবী সমস্ত মেঘ কাটিয়ে সূর্যের আলো দান করলেন। সকলেই পেল শান্তি ও স্বস্তি। মদিনা শান্তি শহরের মর্যাদা লাভ করল।

মহানবী আপন ঘরের এককে একত্র করলেন ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পরিস্থিতি ও পরিবেশ অন্যান্য নবীদের মতো ছিল না। তাঁকে সবকিছু শূন্য থেকে সৃষ্টি

করতে হয়েছে। তাঁকে পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে হয়েছে। দুর্বলতার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতে হয়েছে, বিভেদের মধ্যে, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য আনতে হয়েছে। এমনকি পবিত্র কোরআন নিজেই স্বীকার করেছে তাঁর এই গুরুদায়িত্ব ও বোঝা সম্পর্কে। "আমি তোমার ভার লাঘব্ করেছি যা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক।" কোরআন—৯৪ ঃ ২-৩

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সহ্য ও ধৈর্যগুণ সকল নবীর উর্ধ্বে ছিল তার প্রমাণ তাঁর জীবন। তাঁর পূর্বে বহু নবী এসেছিলেন, সকলেই পাপীদের সঙ্গে, অত্যাচারীদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার আল্লাহর কাছে প্রার্থনাও করেছিলেন ওই সমস্ত পাপীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনে কোনদিনই এরূপ ঘটেনি। তাঁর অসীম সহ্যের কথা পবিত্র কোরআনেও স্বীকৃত।

'তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট একজন রসুল এসেছে, তোমরা বিপদাপন্ন হও, এ তার নিকট অসহ্য। সে তোমাদের হিতাকাঙক্ষী, বিশ্বাসীদের জন্য স্নেহশীল দয়াময়।" কোরআন—৯ ঃ ১২৮

"আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত ছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত, সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর এবং তুমি কোন সঙ্কল্প করলে—আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। যারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন।" কোরআন—৩ ঃ ১৫৯

এগুলো শুধু হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনে গতানুগতিক বাক্য ছিল না। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়েছে। এবং এ থেকেই হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর উম্মত বা শিষ্যগণ তাদের ব্যবহারিক জীবনের চরম শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সমাজে মানুষ কিভাবে চলবে, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁরই জীবন।

মানুষ এ থেকে বেশ কয়েকটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে—

(১) প্রকৃত জীবন অফুরন্ত আরাম ও আয়াসের মধ্যে নয়। হযরতের জীবন ছিল এরই প্রতিক্রিয়া বা প্রতিকৃতি।

(২) তিনি হবেন সকলের মঙ্গলের জন্য সকলের পরামর্শদাতা।

(৩) তিনি হবেন মানবপ্রেমিক, দয়ালু, উদারচিত্ত, ক্ষমাশীল, প্রিয় ভার্যা।

(৪) তিনি সকলকে আদেশ দেবেন সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে।

(৫) তিনি সকল বিষয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিজেই নেবেন, তবে কার্য করবেন এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করে।

হযরত এই সমস্ত গণতান্ত্রিক গুণাবলী হতে জীবনে কোনদিনই বিচ্যুত হয়নি।

ভ্রাতৃত্ববোধ ঃ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ মুসলমানদের শুধু মুখের কথা নয়, নিছক সামাজিক কথা নয়। তাঁদের মহান ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআন স্পষ্টাক্ষরে বলে—"বিশ্ববাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।" কোরআন—৩ ঃ ১০৩, ৪৯ ঃ ১০

ইসলামের ইতিহাসে মিতে ঃ মনুষ্য সমাজের জন্য ইসলাম একটি ব্যাপক ও উদার ধর্ম। সে ধর্ম দ্বারা হযরত মহম্মদ (দঃ) মক্কা ও মদিনাবাসীদের সকল ব্যবধান রহিত করেন। সকল গোষ্ঠী ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সকল ব্যবধান রহিত করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে যুগ্মভাবে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের নমুনা স্থাপন করেন। (১) মহম্মদ (দঃ) এবং হযরত আলী বিন আবু তালেব (২) হযরত হামজা (হযরতের চাচা) এবং যায়েদ (হযরতের দাস) (৩) আবুবকর এবং খারিজা বিন জায়েদ আনসারি (৪) ওমর বিন খাত্তাব এবং উতবা বিন মালিক খাজরাজ আনসারি (৫) আবু উবাইদা বিন জাররাহ এবং সাদ বিন মাদাহ আনসারি (৬) আবদুল রহমান বিন আউফ এবং সাদ বিন রাবী আনসারি (৭) জুবাইর বিন আওয়াম এবং সালামা বিন সুলামা (৮) ওসমান বিন আফ্‌ফান এবং আস বিন সাবিত আনসারি (৯) তালাহ বিন উবায়দুলাহ এবং কাব বিন মালিক (১০) মুসাব বিন উমাইর এবং আবু আইউব আনসারি (১১) আম্মার বিন ইয়াসীর এবং হুদাইফা বিন ইয়ামিন এবং আবও অনেকে। প্রত্যেক মোহাজিরের একজন আসনার ভাই ছিলেন।

কোরআন—৪৯ ঃ ১০

এই স্বর্গীয় বন্ধনে দুটো দিক পূরণ হয়েছিল। আনসারদের নৈতিক মর্যাদা বা সামাজিক সম্মানকে অনেকখানি উন্নত করেছিল। অন্যদিকে মোহাজেরদের হযেছিল জাগতিক লাভ। তাঁদের একে অন্যের প্রতি এরূপ ভালবাসা ছিল, যা সহোদর ভাইদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় না। কেননা তাঁদের এই ভালবাসা ছিল— আল্লাহর জন্য, পারিবারিক কারণে নয়। আনসারগণ তাঁদের সমুদয় ধনসম্পদে মোহাজের ভাইগণকে অবলীলায় অংশ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু মক্কাবাসীগণ কারও বোঝা হতে ভালবাসতেন না। তাঁরা জানতেন কি করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয়, কি করে মরুভূমির বালুরাশিকে সোনায় পরিণত করা যায়। তাঁরা তাড়াতাড়ি নিজেদেব ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করেন, হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাঃ) চাষ-আবাদে মনোনিবেশ করেন এবং তাঁরা এমন এক পদ্ধতির প্রচলন করেন যার ফলে মদিনাবাসী আনসারগণ খুবই ভাল ফল পান। এই পবিত্র বন্ধন হতে মুসলিম জগতের 'মিতার' উৎপত্তি। একে অপরকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে পরস্পর পরস্পরকে মিতা বা মিতে বলে সম্বোধন করেন। আমাদের দেশে অনেক সময় দু'জনের একই নাম হলে উভয় উভয়কে মিতে বলে সম্বোধন করে থাকেন। কিন্তু এর উৎপত্তি আরবের মাটিতে ইসলামের মহানবী কর্তৃক।

জাতি সংঘের জনক মহানবী

প্রথম স্রষ্টা ঃ মুসলমানগণ তখনও মদিনাতে সংখ্যালঘু। বিশ্বরাজনীতির মহাসাধক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হযরত (দঃ) তাঁর অন্তর-দৃষ্টিতে বুঝতে পারলেন—অভ্যন্তরীণ শান্তি সুনিশ্চিত না হলে এবং বহিরাক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত না হলে জাতীয় উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। তাই হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির ফলে বুঝতে পেরেছিলেন ঈর্ষাকাতর ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধি কবার প্রয়োজনীয়তা। তিনি সকলকে বুঝিয়ে দিলেন—তিনি এসেছেন ধর্মকে স্থাপন করতে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে নয়। তিনি এসেছেন আরবদের নিকট, যেমন হযরত মুসা (আঃ) এসেছিলেন ইহুদীদের মধ্যে।

—"আমি তোমাদের নিকট তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ এক রসুল (দূত) পাঠিয়েছি। যেমন ফেরাউনের নিকট রসুল পাঠিয়েছিলাম।" ৭৩ ঃ ১৫। এবং তখনও হযরত (সাঃ) বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। যে সমস্ত উপবাস-ব্রত ইহুদীরা তখন পালন করত হযরত মহম্মদ (দঃ) সেগুলি পালন করতেন। সমগ্র মদিনাবাসীদের শান্তি সমৃদ্ধি ও একতার জন্য এটা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং কোন একটা মতবিরোধ হওয়ার পূর্বেই এটা হওয়া প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন দীনের নবী মহম্মদ (দঃ)। তাই তাঁর নেতৃত্বে সকল গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে একটা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। এবং গঠন করলেন জাতি সংঘ, (U.N.O. Common Wealth) যা বিশ্বের প্রথম জাতি সংঘ। প্রথম জন্মদিলেন—Republican।

মহানবী ও অন্যান্যদের মধ্যে সন্ধিপত্র ঃ ১। "কুরাইশ এবং ইয়াসরিবের মুসলমান ও বিশ্বাসীগণ এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করেন বা যারা তাঁদের সঙ্গে সংগ্রাম করেন, অন্যান্য গোত্র হতে সকলেই তাঁরা একটা পৃথক গোত্র। ২। তাঁদের মধ্যে প্রতিটি গোষ্ঠী সততার সঙ্গে মুসলমানদের সাহায্যার্থে কিছু খরচ করবে। তা কোন মুক্তিপণেই হোক বা ঋণ পরিশোধার্থেই হোক। ৩। কোন বিশ্বাসীই অন্য কোন দলে যোগ দেবে না। যতক্ষণ অন্যরা তা না করে। ৪। আপন গোষ্ঠীর মধ্যে যদি কেউ অন্যায়, অবিচার ও পাপাচারণে লিপ্ত হয় তাহলে সকলেই একত্রে তাব বিরুদ্ধাচরণ করবে যদিও সে ব্যক্তি তাঁদের কারও পুত্রও হয়। ৫। কোন বিশ্বাসীই অন্য বিশ্বাসীকে বধ করবে না। এবং কোন বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে অন্য কোন অবিশ্বাসী সাহায্য করবে না। ৬। কেউ কারও ধর্মে বা ধর্মপালনে আঘাত করবে না। ৭। কারও ব্যক্তিগত পাপে তার গোষ্ঠী শাস্তি পাবে না। ৮। মদিনাতে রক্তপাত হবে না। ৯। সকলেই আল্লাহ্‌র ও আল্লাহর নবীর অনুশাসন মেনে চলবে।"

মহানবী ও ইহুদীদের মধ্যে সন্ধিপত্র ঃ ১। যে সমস্ত ইহুদীগণ বিশ্বাসীদের অনুসরণ করবে, তাঁদেরকেও বিশ্বাসীগণ দুঃখে-কষ্টে সাহায্য করবে। এবং যতক্ষণ কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলবে, ইহুদীগণও বিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের খরচ বহন করবেন। ২। মুসলমানদের বিশ্বাস মুসলমানদের জন্য, ইহুদীদের বিশ্বাস ইহুদীদের জন্য। ৩। যুদ্ধব্যয় ব্যতীত সকলেই আপন আপন খরচ করবে। ৪। তবে এই সন্ধি স্বাক্ষরকারীগণ সকলকে ভাল কথায় ভাল কাজে পারস্পরিক বন্ধুত্বে স্বাক্ষর ব্যতীত একে অপরকে সাহায্য করবে। যুদ্ধের সময় ইহুদীগণ মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধখরচ বহন করবে। ৫। এই সন্ধিপত্রের সকল স্বাক্ষরকারীগণ দ্বারা ইয়াসরিবদের মন্দিরাদির সীমানা স্থানগুলোর ও ইয়াসরিবের পবিত্রতা রক্ষিত হবে। প্রতিবেশীগণ একে অন্যের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কেউ অন্য কোন নারীকে গ্রহণ করবে না তাঁদের অনুমতি ব্যতীত। ৬। কুরাইশগণকে কেউ কোন প্রকার সাহায্য করবে না বা তাঁদের সাহায্যকারীকেও না এবং যদি কেউ ইয়াসরিবকে আক্রমণ করে তখন সকলেই একত্রিতভাবেই প্রতিরোধ করবে। ৭। যখন তারা সন্ধির জন্য একত্রিত হবে—তখন একে অন্যকে সংবাদ দেবে, পরামর্শ করবে। ৮। যদি এই সন্ধি সম্পর্কে কোন সন্দেহ দেখা দেয় তখন তা মীমাংসার জন্য আল্লাহর রসুলের নিকট প্রেরিত হবে।

দেখা যাচ্ছে, সন্ধিটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ আপন লোকদের মধ্যে সীমিত। দ্বিতীয় অংশ ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের। দ্বীনের নবীর দূরদর্শিতার যেন কোন সীমা ছিল না। তাই তিনি আগে ঘর ঠিক করেছিলেন। দ্বিতীয় অংশে ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধিপত্রটা হলো ঠিক মুসলমানদের মতোই । সেখানে দুই দলের মধ্যে কোন ভেদ থাকল না। কিন্তু আল্লাহর দূত হযরত মহম্মদ (দঃ) থাকলেন একমাত্র নির্দেশক।

আজ হতে তেরশো বছর আগে এই সন্ধিপত্র সম্পূর্ণ এক বিধর্মী গোত্রের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে স্থান পেয়েছিল সমাজ-জীবনের সকল দিকই। আজও সেগুলোকে পরিত্যাগ করার কোন উপায় নেই। কয়েকটি গোত্র এই সন্ধিপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, হযরত (দঃ) শীঘ্র তাদের সঙ্গে অন্য এক সন্ধিনামা সম্পাদন করে মদিনাকে এক সুন্দর সুরক্ষিত শান্তিধামে পরিণত করেন।

মদিনার মাটিতে রাজনীতিবিদ মহানবীর পর্বতসম ব্যক্তিত্ব লাভ ঃ

সন্ধিগুলোর গুরুত্ব ঃ এই সন্ধিগুলোর দ্বারা মদিনার আপামর জনসাধারণ পেল চরম শান্তি ও পরম স্বস্তি, পুরুষ পেল তার পৌরুষের চরম মূল্য, নারী পেল তার নারীত্বের চরম নিরাপত্তা, ধনী পেল তার ধনের প্রকৃত সদ্ব্যবহার প্রণালী, গরিব পেল তার গরিব জীবনের শত যন্ত্রণার মুক্তি ; অনাথ এতিম, অন্ধ, খোঁড়া সকলেই পেল আশ্রয়, যুবক পেল তার উদ্দাম যৌবনের পথসন্ধান, যুবতী পেল তার সতীত্বের পূর্ণ স্বাদ ও মর্যাদা। সাধারণ মানুষ পেল তার চিন্তা, কথা ও কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা। এক কথায় মদিনা পেল—শান্তি ও সভ্যতার দীপ জ্বালানোর এক অভাবনীয় দুর্নিবার ও দুর্বার শক্তি।

এবার এত কিছু দান করে দাতা মহানবী কি পেলেন? মহানবী কর্তৃক সমাধান প্রাপ্ত এই সন্ধিগুলো প্রমাণ করল—মহানবী কেবলমাত্র একজন গতানুগতিক ধর্মীয় প্রচারকই নন, তিনি এমনই একজন রাজনীতিবিদ, যা সমগ্র বিশ্ব আজও আর একটির জন্ম দিতে পারেনি। এই বক্তব্য সম্পর্কে অধ্যাপক মূইর বলেন—"It reveals the man in his mind real greatness, a master mind, not only of his own age, but of all ages."

এই সন্ধিগুলো দ্বারা মহানবী যেমন সবল করলেন আপন হস্তকে, ঠিক তেমনিভাবে দুর্বল করলেন মক্কার কুরাইশদের। মদিনার মাটিতে আজ তিনি আপন ঘরকে করলেন সুদৃঢ়, পরকে করলেন আপন, গড়ে তুললেন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে Common Nationality, জাতি সংঘ। আজ তিনি প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্মদাতা জনক, আজ তিনি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ। আজ তিনি সকল মানুষেরই আদর্শ মানুষ, প্রিয় মানুষ, প্রাণের প্রিয়জন, বিপদে বন্ধু, শোকে সান্ত্বনা, সুখে আপনজন।

মদিনাতে আজ সবার ঊর্ধ্বে সকলের মাঝে রাজনীতিবিদ মহানবী সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ও গভীর এবং পর্বতের ন্যায় সুদৃঢ়-সুউচ্চ ও সুমহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেন। মদিনাতে রাজনীতিবিদ মহানবীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এখানেই।

ধর্মীয় জগতে হযরতের আদর্শ জীবন ঃ মদিনায় উপস্থিতির দিন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত (দঃ) সেখানে এক অতুলনীয় আদর্শস্থানীয় জীবনযাপন করলেন,

গ্রহণ করলেন কোরআন, প্রচার করলেন কোরআন, শিক্ষা দিলেন কোরআন, দরিদ্র ও দুঃস্থকে করলেন দান, রোগী ও দুর্বলের করলেন সেবা, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে দিলেন বিপদে সান্ত্বনা-সাহায্য এবং আপন গোষ্ঠীকে রক্ষা করলেন শত্রুর বিরামবিহীন জঘন্যতম নানা আক্রমণ থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করলেন, পরিকল্পনা করলেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সারা বিশ্বজুড়ে এমন এক ধর্মীয় রাজ্যের, যা কোনদিন কেউ কল্পনাও করেনি। কোন একক প্রচেষ্টায় এরূপ বিরাট ও বিশাল কাজ কোনদিনই সম্ভব হয়নি। সারা পৃথিবীর বুকে তিনি এমন এক রাজ্য স্থাপন করে গেলেন, কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন কম করে পাঁচবার এক সুরে অপার করুণাময় স্রষ্টার বিজয় ঘোষণায় জগৎকে মুখরিত করে তুলছে। অতঃপর মনোনিবেশ করলেন ধর্মীয় বিধিবিধান দানে। ৩০ ঃ ৩০।

বদর যুদ্ধের পূর্বাভাস

হযরতের সতর্কতা ঃ যে দিন মক্কাবাসী কুরাইশগণ হযরত মহম্মদ (সঃ)-কে হত্যা করার শেষ পদক্ষেপ নিয়েছিল সেদিন আল্লাহ্ই তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু মক্কাবাসীগণ তাদের প্রতিজ্ঞার কথা ভোলেনি। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল যেখানেই হোক তারা হযরতকে বধ করবেই এবং তাঁর সহচরদেরও। তাই হযরত (দঃ) মদিনায় এসেও নিজেকে বিপন্মুক্ত চিন্তা করতে পারেননি। তিনি সবসময় সতর্ক ছিলেন কখন তারা মদিনা আক্রমণ করবে। তাঁর সঙ্গে ইহুদীদের যে সন্ধিপত্র এটাই ছিল মক্কাবাসী কুরাইশগণের মদিনা আক্রমণের ইঙ্গিত।

তিনি এলহাম্ ও ঐশীযোগে জানতে পারছিলেন মক্কায় কি ঘটেছে এবং অচিরাৎ মদিনায় কি ঘটবে। ইতিমধ্যেই তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই সময় তাঁর পক্ষে শুধু মসজিদে বসে নামায পড়া ও কোরআন শরীফ পড়াই যথেষ্ট ছিল না। তিনি ছিলেন সমাজ-জীবনের সকল দিকেরই এক সুমহান আদর্শপুরুষ। তিনি সকল দিক থেকেই সকলেরই কথা চিন্তা করেছিলেন। কিভাবে সমস্ত মানবসমাজকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, কিভাবে আল্লাহর বাণীকে সর্বত্র প্রচার করা যায়। সংসার জীবনের বহু বাধাবন্ধনের ভেতর দিয়েই তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। দিন-রাত সে সম্পর্কে তাঁর মন তাঁকে বারবার আঘাত করছিল, তার ওপরই পেলেন আল্লাহর বাণী। তাঁর নবী-মন যেন বুঝতেই পেরেছিল—আক্রমণ আগতপ্রায়।

"হে বিশ্বাসীগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর, তারপর দলে দলে বের হও, অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও।"

শুধু এইটুকুই না। এমনকি, যখন মুসলমানগণ নামায পড়বেন, তখনও যেন সতর্কতা অবলম্বন করা হয়—

"এবং তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করবে, তখন তাদের একদল তোমার সঙ্গে যেন দাঁড়ায় ও তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সেজদা করা হলে তারা যেন তাদের পশ্চাতে অবস্থান করে আর অপর দল যারা নামাযে শরিক হয়নি তারা তোমার সঙ্গে যেন নামাযে শরিক হয়। এবং তারা যেন সতর্ক, সশস্ত্র থাকে।

অবিশ্বাসীরা আশা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও। যাতে তারা তোমাদের ওপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক, তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই, কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি রেখেছেন। অনন্তর যখন নামায সমাপ্ত করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথভাবে নামায প্রতিষ্ঠা কর। নির্ধারিত সময়ে নামায প্রতিষ্ঠা করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"

কোরআন—৪ ঃ ১০২-১০৪

"হে মোমিনগণ, আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য, তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।"

কোরআন—৫ ঃ ১০৫

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির ভেতরে তখনও কোরআন নাজেল সম্পূর্ণ হয়নি, বহু বাকি। কিন্তু এখানেই হযরত-জীবনের বৈশিষ্ট্য। তিনি আগামী দিনের সকল কিছুর পূর্বাভাস পেতে থাকতেন। এবং সেই অনুপাতে সকলকেই সতর্ক করতেন। তাঁর জীবনের যে মহান ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রকৃত আদি-অন্ত নকশা তাঁর মানস-পটে সর্বদাই উদ্ভাসিত হতে থাকত। কোরআন শরীফ ঠিক নিয়মিতভাবে নাজেল হয়নি। সময়ের কোন সূচীপত্র ছিল না। মহানবী তাঁর মহান ব্রতের পথে এগিয়ে যেতেন। যখন নিজেকে খুব বিপন্ন মনে করতেন বা কোন স্থির একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা চিন্তা করতেন, তখন তিনি আল্লাহর সাহায্য পেতে প্রার্থনা করতেন। ঠিক এমনি সময়ে কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হতো। তাই তাঁর মহান জীবনই ছিল কোরআনের পূর্ণতম প্রয়োগভূমি বা বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা। এইজন্যই বলা হয়, হযরত মহম্মদ (দঃ) নিজেই ছিলেন জীবন্ত কোরআন।

কোন কোন পাশ্চাত্ত্য জীবনীকার মহম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে কুরাইশদের যুদ্ধ ঘোষণা অস্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা, হযরত (সাঃ) কি অবস্থায় মক্কা হতে বিতাড়িত হলেন, কিরূপ ভাবে সেখানকার মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চলছিল, কিভাবে স্বামীদের স্ত্রী থেকে পৃথক রাখা হতো, কি অবস্থায় শিশুদের মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হতো, কিভাবে মুসলমানদের ধন-সম্পদ হরণ করা হতো—সর্বশেষে কিভাবে স্বয়ং হযরতকে হত্যার জন্য একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল? এসব যদি কুরাইশদের পক্ষ হতে যুদ্ধ ঘোষণা না হয়, তবে কি দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা হয়? বর্বর জ্ঞানপাপী পাশ্চাত্ত্য লেখককে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়।

মক্কার কুরাইশগণ মুসলমানদের যে সমস্ত সম্পত্তি বা সম্পদ জোর করে দখল করে নেয়, তারা সেগুলোর কণামাত্রও প্রত্যর্পণ করেনি। হযরতের জীবন বধের যে নিশ্চিত প্রচেষ্টা, তার জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনাও করল না। এমনকি, সৌজন্যমূলক দুঃখ প্রকাশও করল না। তারা বরং মদিনার আবু আইউব খালিদ বিন যায়িদ (আনসারি) নামক একজন ইহুদীকে একটা চরমপত্র দিল।

"তুমি এমন একটি মানুষকে [হযরত (সাঃ)] তোমার বাড়িতে থাকার জন্য আশ্রয় দিয়েছো। এখন তোমার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তুমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কর—এবং

তাঁকে বাড়ি হতে বিতাড়িত কর। অন্যথায় আমরা শপথ নিচ্ছি—এক সঙ্গে আমরা তোমাকে আক্রমণ করব। আমরা তোমাদের যুবকগণকে হত্যা করে তোমাদের যুবতীদের অধিকার করব।"

মক্কাবাসীগণ অত্যন্ত খুশি হতো যদি তারা দেখতে পেত হযরত মহম্মদ (দঃ) সদলবলে নিহত হয়েছেন। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল ইসলামকে চিরতরে জগৎ থেকে বিলুপ্ত করতে। কিন্তু আল্লাহ্ ইসলামকে পূর্ণ করলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় দূতকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন।

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে, শুধু এই কারণে যে তারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।" কোরআন—২২ ঃ ৩৯-৪০

এই সূরার এই অংশটুকু অবতীর্ণ হয় মক্কায়। তখনও হযরত মদিনায় হিযরত করেননি। সুতরাং এদিক থেকেও কি করে তিনি আল্লাহর বিনা অনুমতিতে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। অন্যত্র আল্লাহ্তালা আবার বলেন,

"তোমরা কেন ওই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। যারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল এবং রসুলকে বের করতে সংকল্প করেছিল এবং তারাই প্রথম তোমাদের আক্রমণ করেছিল। তোমরা কি তাদের ভয় কর? বিশ্বাসী হলে আল্লাহ্কেই ভয় করা উচিত।" কোরআন—৯ ঃ ১৩

এইভাবে হযরত মহম্মদ (দঃ) আল্লাহর নিকট হতে পূর্ণ অনুমতি পেলেন যুদ্ধ করার জন্য এবং তিনি তার জন্য প্রস্তুত হতে আরম্ভ করলেন। তবে তিনি মক্কা আক্রমণ করলেন না। মক্কাবাসীদের বদরে আহ্বান করলেন।

হযরত জানতেন কুরাইশগণ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেই, তবে কখন এবং কোথায় সেটা জানতেন না। তাই সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় তিনি নিজের লোকদের সেখানে পাঠালেন যাতে তাঁরা মক্কাবাসীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারে।

হযরতের প্রথম পরিদর্শক দল মক্কার পথে (১ম হিঃ, ৬২২ খ্রীঃ) ঃ হযরত সব সময় লক্ষ্য করছিলেন, মক্কাবাসীগণ কি করছে। তাই তিনি চাচা হামজা (রাঃ)-এর অধীনে ত্রিশজন অশ্বারোহী পাঠালেন। তাঁরা লোহিত সাগরের তীর ধরে যাত্রা করলেন। লক্ষ্য করলেন পথিমধ্যে কেউ মদিনা আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে কিনা। কিছুদূর যাওয়ার পর হামজা (রাঃ) লক্ষ্য করলেন আবু জেহেলের নেতৃত্বে তিনশো অশ্বারোহী। কোন যুদ্ধ বাধল না। হামজা (রাঃ) নিরাপদে ফিরলেন।

ষাট জন অশ্বারোহীর দ্বিতীয় দল ঃ মক্কাবাসীগণ বদ্ধপরিকর তারা মদিনা আক্রমণ করবেই। এই সংবাদ হযরতের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি আবার উবাইদা বিন হারিসের নেতৃত্বে ৬০ জন অশ্বারোহীর একটি দল মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করলেন। তাদের মক্কার কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ২০০ জন অশ্বারোহীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলো না। উভয় পক্ষই নিরাপদে ফিরে গেল।

যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব ধারা বা গোপন কৌশল সেনাপতিকে মেনে চলতে হয়, যার দ্বারা অপর পক্ষের পরিকল্পনাগুলো জানা যায় এবং অপর পক্ষকে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সজাগ করিয়ে দেওয়া হয়, হযরত (সাঃ) সেগুলোর সবই করে যাচ্ছিলেন। এরপর হযরত (সাঃ) আবার দক্ষিণ দিকে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ১৮ হতে ২০ জনের এক অশ্বারোহী দলকে পাঠালেন। তারাও নিরাপদে ফিরে এলো।

পরিদর্শকের দ্বিতীয় অভিযান (২য় হিঃ, ৬২৩ খ্রীঃ) ঃ উভয় পক্ষেরই যেন একজনেরও জীবনহানি না হয় এইভাবে হিজরীর প্রথম বছর কেটে গেল। হযরত (দঃ) হিজরীর প্রথম বর্ষে যে তিনদল কাফেলা পাঠিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্য মোটেই যুদ্ধ ছিল না, ছিল তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা। কোন সম্পদ লুটেরও অভিপ্রায় ছিল না।

হযরত শুধু চেয়েছিলেন সতর্কতা অবলম্বন করতে, তাঁর প্রতি আল্লাহর যা নির্দেশ ছিল, এবং যুদ্ধের অনুমতিও ছিল। মক্কাবাসী প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু মক্কাবাসীগণ কখনও এরূপ কোন অভিযোগ হযরত (দঃ)-এর বিরুদ্ধে আনেনি যে তিনি মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযান পাঠিয়েছিলেন। মক্কাবাসীগণ লক্ষ্য করেছিল হযরত (দঃ) হিজরীর প্রথম বর্ষেই মদিনার সকল গোত্রকেই এমনভাবে আপন করে নিয়েছিলেন যে, তারা তাঁর কৃতকার্যতায় ভীত হয়ে পড়ে। এককথায় সমগ্র আরবে হযরত মহম্মদ (দঃ) শুধু নবীই ছিলেন না, তাঁর বিচক্ষণতার সমকক্ষ কোন লোকও আরবে ছিল না। এজন্যই মক্কাবাসীগণ হিজরীর প্রথম বছরে মদিনা আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি।

স্বয়ং হযরতের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পরিদর্শক (২য় হিঃ) ঃ হিজরীর প্রথম বর্ষ সাড়ে নয় মাস শেষ হলো। যেহেতু তা আরম্ভ হয়েছিল হিজরীর তৃতীয় মাসে রবিউল আউআলে। হিজরীর দ্বিতীয় সনে হযরত (দঃ) স্বয়ং একটি পরিদর্শক দল পরিচালনা করেন। কিন্তু এর প্রধান করেছিলেন সাদ বিন ওবাইদাকে। তিনি গাজোয়াতুল আবওয়ার দিকে যাত্রা করলেন, ওযাদাসের নিকটবর্তী স্থানে কুরাইশ ও বানু দামরাকে দেখার জন্য। তিনি কুরাইশদেরকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু বানু দামরা তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন।

হযরত (দঃ) তাঁর শক্তি সুদৃঢ় করে একমাস পর আবার বায়ুতের দিকে মোহাজের ও আনসারদের নেতৃত্বে ২০০ জনের যাত্রার আদেশ করলেন। আনসারগণ প্রমাণ করল এটা শুধু নিছক একটা সমরবাহিনী নয়, সম্মিলিত বাহিনী, তার প্রমাণ হলো বদরের যুদ্ধে। জানতে পারা গিয়েছিল উমাইয়া বিন খালাফের নেতৃত্বে একটি দল সিরিয়ার পথে যাত্রা করেছে। কিন্তু হযরত (দঃ)-এর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো না। হযরত (দঃ)-ও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন না। কিন্তু দ্বীনের নবী জানতে পারলেন একটি বাহিনী মদিনার দিকে সরাসরি চলে আসছে। কিন্তু তারা মদিনা আসবে, না সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যাবে জানা দরকার। এর জন্য আবার একটি পরিদর্শক দল প্রেরিত হলো, যাতে মদিনাবাসীগণ হঠাৎ আক্রান্ত না হন। এর দু'তিন মাস পরে আবু সালমা বিন আবু সাদের নেতৃত্বে আবার একটি পরিদর্শক দল পাঠালেন। তাঁরা দ্বিতীয় হিজরীর পঞ্চম মাসের শেষে এবং ষষ্ঠ মাসের প্রথমে যাত্রা করলেন। এবং এরা সংবাদ আনলেন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি দলের। আবু সুফিয়ান তাঁদের ছাড়িয়ে গেলেন। এবং তাঁরাও তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন না, মদিনায়

ফিরে এলেন। এই যাত্রায় মুসলমানদের সঙ্গে বানু হামজা, বানু মুদলেজ এবং বায়ুতের জনসাধারণের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

একটি বিশেষ কথা স্মরণ রাখা দরকার, এই যে যাত্রার পর যাত্রা, এতে মুসলমানগণ কোন সময়ই একজনও মক্কাবাসীকে হত্যা করেননি, একটি প্রাণীকেও অপহরণ করেননি, একটি দেবস্থানও বলপূর্বক দখল করেননি। তাঁদের এই যাত্রার মূলে ছিল মাত্র দুটি কারণ ঃ একটি—খবরাখবর নেওয়া অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ কি করছেন বা কি কব্বতে চাইছেন। আর অপরটি—সেখানে নিজেদের প্রতিপত্তি স্থাপন করা। এছাড়া ওই সমস্ত যাত্রাগুলোতে মুসলমানদের কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। যদি মক্কাবাসীগণ শান্তি স্থাপনের যে কোন আলোচনায় হযরতের সঙ্গে বসতে রাজি হতেন তাহলে হযরত তা সানন্দেই গ্রহণ করতেন। যেমন তিনি গ্রহণ করেছিলেন মদিনার ইহুদীগণকে এবং পাঁচ বছর পরে মক্কাবাসীগণকেও তিনি এই ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। যখন হুদাইবিয়াতে তিনি ছিলেন যথেষ্ট শক্তিশালী, তখন তিনি মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতেন। তাদের ধ্বংস করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাতে রাজি ছিল না। বরং তাঁর শেষ যাত্রার দিন-কুড়ি পরই মক্কাবাসীদের কুরজ বিন জাফির নামে এক ব্যক্তি কিছু কুরাইশকে সঙ্গে নিয়ে মদিনার নিকট হাজির হয় এবং মদিনাবাসীদের বেশ কিছু সংখ্যক উট ও ভেড়া অপহরণ করে নিয়ে চলে যায়। এই দিক দিয়ে হযরতের হিযরতের পূর্বে কি পরে সবসময়ই কুরাইশগণ ছিল আক্রমণকারী।

হযরত লুণ্ঠনকারী কুরজকে অনুসরণ করার জন্য মদিনার উপকূলে যায়েদ বিন হারেসকে নিযুক্ত করলেন। হিজরীর দ্বিতীয় বর্ষে রজব মাসে আসাদ গোত্রের আবদুল্লাহ বিন জাহসের নেতৃত্বে কয়েকজন মহাজেরিনকে একটি বন্ধ পত্রসহ পাঠালেন। যেখানে তাঁকে যেতে বলা হয়েছিল সেখানে পৌঁছনোর দুদিন পর সেই পত্র খুলতে বলা হয়েছিল। তিনি সেই ভাবে পত্র খুললেন এবং পড়লেন। পত্রে যা ছিল "যখন তুমি দেখবে—এ চিঠিতে যা আছে এরপর তুমি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখালায় গমন করবে এবং কুরাইশগণকে অনুসরণ করবে ও আমাদের সংবাদ দেবে।"

ওমর বিন হাজরামির মৃত্যু (২য় হিঃ ৬২৩ খ্রীঃ) ঃ আবদুল্লাহ পত্র পড়লেন। এবং সকলকে জানালেন, সকলেই একমত হলেন। সকলেই যাত্রা করলেন নাখালার দিকে। তাঁদের দু'জন সহচর সাদ বিন ওয়াক্কাস জুহরি এবং উৎবা বিন গাজয়ান তাঁদের উটগুলোর সন্ধানে বের হলেন এবং তাঁরা কুরাইশ দ্বারা ধৃত হলেন। নাখালায় ওমর বিন হাজরামির নেতৃত্বে মুসলমানগণ এক দল কুরাইশ বাহিনীকে দেখতে পেলেন। এটা ছিল রজব মাসের শেষ দিন, সাদ্ নিজ দায়িত্বে কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করার পর ওই দলটিকে অনুসরণ করলেন। তখন শত্রু পক্ষ হতে তারা কিছু তীর ছুঁড়ল। এবং হাজরামি মারা গেলেন। মুসলমানগণ দু'জনকে বন্দী করে মদিনায নিয়ে এলেন।

নাখালা যাত্রার কালে হযরত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন ঃ নাখালা যাত্রায় মুসলমানগণ কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, এটা হযরত ধারণাও করেননি। কেননা এটা ছিল 'রজব' মাস। তাই তিনি সাদকে বললেন, তিনি যুদ্ধলব্ধ কোন কিছু গ্রহণ করবেন না

এবং তা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণও করবেন না। তিনি শুধু আল্লাহর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। এদিকে মক্কাবাসীগণ কিছু মদিনাবাসী কুরাইশের মাধ্যমে দারুণ আলোড়ন তুলতে লাগলেন যে, হযরতের বিরুদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ করা হবে। কেননা তিনি পবিত্র মাসে যুদ্ধে অনুমতি দিয়েছেন। তখন হযরত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন উপদেশের জন্য। আল্লাহ্ জানালেন—

"তারা তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি বল—ওতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, পবিত্র মসজিদে বাধা দেওয়া, তার বাসিন্দাকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট গুরুতর অন্যায় এবং হত্যা অপেক্ষা অশান্তি গুরুতর এবং যদি তারা সক্ষম হয় তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফেরাতে না পারা পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হবে না। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে যায় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অনন্তর ইহলোকে ও পরলোকে তাঁদের সকল কার্যই ব্যর্থ হবে। এবং তারাই নরকের অধিবাসী, সেখানেই তারা স্থায়ী হবে।" কোরআন—২ ঃ ২১৭

এই ঐশীবাণী আসার পর মুসলমানরা অত্যন্ত খুশি হলেন। হযরত সাদ বিন ওয়াক্কাস ও উৎবা বিন গাজোয়ানকে দুই মক্কাবাসীকে বন্দীর পরিবর্তে মুক্ত করলেন। একজন বন্দী ছিলেন হকাম বিন কাইজান, পরে তিনি মুসলমান হন এবং মদিনাতেই রয়ে যান।

হিজরীর দ্বিতীয় সনের সপ্তম মাস রজব পর্যন্ত মদিনার ঘটনাবলী ঃ হযরত যে বাহিনীগুলোকে মক্কার দিকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা ছিল সংখ্যায় অতি অল্প, কারণ তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তদারকি করা, খবরা-খবর সংগ্রহ করে আনা। তখনও পর্যন্ত হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন আবু আইউবের বাড়িতে অতিথি রূপে। এবং এই সময় তিনি জায়েদ বিন হারিস এবং আবু রফিকে পাঠান তাঁর কন্যা ফাতেমা এবং উম্মে কুলসুম এবং স্ত্রী সাওদা বিনতে জামাহ ও আসমা বিনতে জায়েদকে আনার জন্য। তাঁর সহচর আবদুল্লাহ বিন আবুবকর এবং তালহা বিন উবাইদুল্লাহও তাঁদের সঙ্গে আসেন। মসজিদে নববীর কাছে তার বাড়ি বা হুজরা তৈরি হয়ে গেছে। এবং হিজরীর প্রথম বর্ষের শেষের দিকে তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে ওই নতুন বাড়িতে চলে আসেন।

স্ত্রী রূপে আয়েশা (রাঃ) ঃ হিযরতের পূর্বেই হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে আয়েশার বিবাহ (আকদ্) হয়েছিল। তারপর আয়েশা তাঁর ভাইদের সঙ্গে মদিনায় এলেন। তখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ সম্পন্ন হলো। আয়েশা হযরতের গৃহে প্রবেশ করলেন। ধনী-নন্দিনী আয়েশা অত্যন্ত আরাম-আয়েশের সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন। এবং তাঁর খেলার বস্তুগুলো তাঁর নিকট খুবই প্রিয় ছিল, মহান স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি আয়েশাকে দুদিক দিয়েই পূর্ণ করে তুলেছিলেন। এক তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য মক্কা-মদিনার সকল সুন্দরীকে ম্লান করে দিয়েছিলেন। অন্য তার গুণগত সৌন্দর্য অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা সকল বিদুষীকে হার মানিয়েছিলেন। হযরত তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনিও হযরতকে এতখানি মুগ্ধ ও জয় করেছিলেন, যার কোন তুলনা হয় না। কেননা তাঁর স্মৃতিশক্তি ও বিচারশক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল যাকে এক কথায় অসাধারণ ও অতুলনীয় বললেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু হযরতের জীবনের অতি মূল্যবান অর্ধেক

ঘটনাবলী তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করার সুযোগ পাননি। কেননা তিনি যখন হযরতের নিকটবর্তী হন তখন হযরতের জীবনের দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। ৫৭০ খ্রীঃ যে মহামানবের জন্ম, ৬৩২ খ্রীঃ যাঁর ওফাত তাঁর নিকট ৬২৩ খ্রীঃ এলে মহাজীবনের সব জানা সম্ভব নয়। তবুও ইসলামের ইতিহাসে তাঁর স্থান বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর পরই। কিন্তু বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর তুলনা কারো সঙ্গেই হওয়া সম্ভব নয়। খাদিজা (রাঃ) খাদিজাই, তবুও ইসলাম জগতের এমন কোন ঐতিহাসিক নেই যিনি বিদুষী আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার না করেই তাঁর কলম থামাতে পেরেছেন। কেননা হযরতের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে তিনি যে নিখুঁত সংবাদ পরিবেশন করেছেন তার কোন তুলনা হয় না। তবে ইসলামের আধ্যাত্মিক জগতে রমণীকুলে বিবি ফাতেমার স্থান অদ্বিতীয়, তিনি মুসলিম রমণীকুলের রাণী।

মহম্মদ (দঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন উবাই ঃ যখনই হযরত মহম্মদ (দঃ) মদিনায় পৌঁছলেন সঙ্গে সঙ্গে আস্ ও খাজরাজ গোত্রে অবিশ্বাসীগণ যারা বাউস যুদ্ধে গুরুতর ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল একটি কুমতলব এঁটে বসল, মদিনার ইহুদীদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাইকে তারা তাদের রাজা বানাবে, ফলে মহম্মদ (দঃ)-কে ধ্বংস করা সুবিধা হবে। এই চিন্তায় তারা একটি সোনার মুকুট তৈরি করল। এবং আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের অভিষেকের জন্য সকল প্রস্তুতি নেওয়া হলো। কিন্তু হযরতের মদিনাতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

মক্কার কুরাইশগণ সভা করে একটি প্রস্তাব-সহ মদিনার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের নিকট এই মর্মে পত্র পাঠান, তারা যেন মহম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও তাঁকে ধ্বংস করে। আবদুল্লাহ মনে মনে ভাবল, এই এক সুযোগ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার ও নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার।

সে সঙ্গে সঙ্গে সভা ডাকল। মক্কার সভায় প্রস্তাব ছিল—"আমরা শপথ করছি তোমরা মহম্মদ (দঃ)-এর যুবকদের হত্যা করবে ও তাদের স্ত্রীলোকদের অধিকার করবে।" হযরত সব সংবাদ পেয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলকে নিয়ে এক সভা ডাকলেন। সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "হে মদিনাবাসীগণ! মক্কাবাসীরা তোমাদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়েছে, যদি তোমরা তাদের ফাঁদে পড়, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তোমরা তোমাদের আপনজনকে অর্থাৎ মদিনার মুসলমানগণকে হত্যা কর, তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। মক্কাবাসীরা হবেন শক্তিশালী, তারা তোমাদের ধন-সম্পদ লুট করবে। তাই তোমাদের সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কাজ, এসো আমরা সকলেই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করি, আমরা ইহুদীদের সঙ্গেও একমত হয়েছি। সুতরাং মক্কার গুপ্তসংবাদবাহীকে জানিয়ে দাও আমরা তাদের ভয়ে ভীত নই।"

এইভাবে জনগণের কাছে আবদুল্লাহ বিন উবাই কথা বলার পূর্বেই সমস্ত সভা সর্বসম্মতিক্রমে হযরতের প্রস্তাব মহানন্দে মেনে নিল। মদিনাবাসীগণও যুদ্ধে কম ছিল না। যদিও দুর্ধর্ষপনায় মক্কাবাসীদের খ্যাতি ছিল চরম। সভা শেষ হলো। আবদুল্লাহ বিন উবাই কিছুই বলার সুযোগ পেল না। কিন্তু বিরক্ত হলো। ভেতরে ভেতরে চক্রান্ত চালানোর চেষ্টা করল।

পারস্যের আবদুল্লাহ বিন সালাম ও সালমানের ইসলাম গ্রহণ ঃ হিজরীর প্রথম সনে পারস্যবাসী সালমন ইসলাম কবুল করেন। ইহুদীদের মতো তারাও মহম্মদ (দঃ)-কে স্বাগত জানায়। তাঁর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করার উদ্দেশ্য ছিল শুধু তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে নিজেদের কাজে লাগানো ও তাঁকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা। কিন্তু তাদের ধর্মযাজক ও শিক্ষিত একজন আবদুল্লাহ বিন সালাম তাঁর সমগ্র পরিবারবর্গকে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এই কথা ইহুদীদের কর্ণগোচর হওয়ার পূর্বেই তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন সালামের স্থান কেমন।" তারা উত্তর দিল, "তিনি একজন মহান ব্যক্তি এবং একজন মহৎ লোকের পুত্র, তিনি আমাদের মধ্যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি।"

তখন আবদুল্লাহ বিন সালাম যা করেছেন বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের ইসলামে আহ্বান জানালেন। তারা তা ভাল মনে গ্রহণ করতে পারল না। তারা হযরতের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করল। নানা দিক থেকে হযরতকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করল, যেমন করেছিল ছ'শ বছর পূর্বে ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে। ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি আবার ঘটল। আল্লাহ্‌তালা মুসলমানদের উৎসাহ দিতে ও ইহুদীদের সতর্ক করতে কোরআন শরীফের দ্বিতীয় সূরার ৪০-৪৬ আয়াত অবতীর্ণ করলেন—

"হে বনী ইসরাইল, আমি তোমাদের যে সুখ-সম্পদ দান করেছি তা স্মরণ কর এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব। এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। তোমাদের নিকট যা আছে তারই সত্যতা অবতীর্ণ করেছি। বিশ্বাস কর। এবং তোমরা তার প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। এবং আমার নিদর্শনাবলীর পরিবর্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো। সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না। তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং রুকুকারীগণের সঙ্গে রুকু কর। কি আশ্চর্য! তোমরা লোকদের সৎকাজের জন্য আদেশ দিচ্ছো। এবং নিজেদের সম্পর্কে বিস্মৃত হচ্ছো, অথচ গ্রন্থ পাঠ করো। তবে কি তোমরা বোঝ না? তোমরা ধৈর্য ও উপাসনা-সহ সাহায্য প্রার্থনা কর, এবং তা বিনীতগণ ব্যতীত অন্য সকলের নিকট কঠিন। (বিনীতগণ) যারা বিশ্বাস করে যে নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হবে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।" ২ ঃ ৪০-৪৬

ইহুদীগণের ভেতরে দৃঢ়সংকল্প ছিল তারা ভেতরে ভেতরে করবে এক, বাইরে করবে আর এক, মুখে বলবে হযরতের বন্ধু। কিন্তু ভেতরে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কি করে হযরত (সাঃ)-কে মক্কার মতো মদিনা থেকেও বহিষ্কার করা যায়, ভেতরে ভেতরে তারা সে ষড়যন্ত্রের সহযোগিতা করছিল। তারা হযরত (সাঃ)-কে পরামর্শ দিল—মদিনাকে মক্কা ও জেরুজালেমের মধ্যবর্তী পথ করার জন্য। তারা তাঁকে বলল, জেরুজালেম বহু নবীর আবাসভূমি এবং হযরতের জন্য মক্কা ও মদিনা অপেক্ষা উপযুক্ত স্থান।

হযরত (সাঃ) তাদের কৌশল লক্ষ্য করলেন। এবং শীঘ্র আল্লাহর নির্দেশ এসে পৌঁছাল দিক পরিবর্তনের জন্য। কারণ তখনও হযরত (সাঃ) নামায পড়তেন

জেরুজালেমের বাইতুল মোকাদ্দেসকে সম্মুখে রেখে। এরপর থেকে তিনি মক্কার কাবার দিকে নামাযের জন্য মুখ ফেরালেন।

"নিশ্চয় আমি আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানো লক্ষ্য করেছি। সুতরাং আমি তোমাকে সেই কেবলা অভিমুখী করব যা তুমি ইচ্ছা কর। অতএব তুমি পবিত্রতম মসজিদের দিকে তোমার মুখমণ্ডল ফেরাও। তোমরা যে যেখানেই থাক, ওর দিকে মুখ ফেরাও এবং যাদের কেতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে এটি তাদের প্রতিপালকের সত্য, তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বেখবর নন।"

কোরআন—২ ঃ ১৪৪

ইহুদীগণ প্রচণ্ড চটে গেল। ঠিক এই সময়ে নাজরান হতে ৬০ জন অশ্বারোহী বিশিষ্ট একটি খ্রীস্টান দল মদিনায় এল। তাঁরা সকলেই ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিত লোক, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতা বাড়ানো, এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ ডেকে আনা।

মহানবী তাঁদের সকলকেই যথাযথভাবেই স্বাগত জানালেন। কতিপয় লোক দ্বারা তাঁদের সেবাযত্ন করলেন। তাঁদের আপন উপাসনা করতে দিলেন। এবং তাঁরা যাতে খুশি হয় তাঁদের সেই ভাবেই থাকতে দিলেন। পরে তিনটি ধর্মের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হলো—ইসলাম, খ্রীস্টান ও ইহুদী। খ্রীস্টানগণ ইহুদীকে অস্বীকার করল এবং ইহুদীগণ খ্রীস্টানগণকে অস্বীকার করল। আল্লাহ্তে প্রকৃত বিশ্বাস ব্যতীতই উভয়গোত্র ঝগড়া করতে থাকল।

"ইহুদীরা বলে খ্রীস্টানদের কোন ভিত্তি নেই এবং খ্রীস্টানগণ বলে ইহুদীদের কোন ভিত্তি নেই। অথচ তারা গ্রন্থ পাঠ করে।" কোরআন—২ ঃ ২১৩

যখন উভয় পক্ষই হযরত (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন, "তোমরা বল—আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসা ও ঈসাকে যা দেওয়া হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালক হতে যা দেওয়া হয়েছিল, সমস্তের ওপর আমরা বিশ্বাস করেছি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।" কোরআন—২ ঃ ১৩৬

কোরআন শরীফের সুরা বাকারাহের ১৩৬ হতে ১৪১ পর্যন্ত আয়াত শরীফ দ্বারা এই আলোচনা সমাপ্ত হলো।

ইসলাম গ্রহণে বাধা ঃ অবিশ্বাসীদের জন্য জাগতিক মান-সম্মানই ইসলাম গ্রহণে বাধা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। তাদের ভাবনা হলো, যদি ইসলামে তাঁরা প্রবেশ করে তাহলে তাদের জাগতিক মান-সম্মান সবকিছুই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যেখানে সকল মানুষই আল্লাহর নিকট সমান। আপন আপন কর্মের ভিত্তিতে সকলেই তাঁর কাছে সমান।

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে

পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানী, যে অধিক ধর্মভীরু (সংযমী)।" কোরআন—৪৯ ঃ ১৩

এককথায় তখন সকলেই ইসলামের মাহাত্ম্য ও হযরতের মহানুভবতা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন, সামাজিক লোকলজ্জাই তাদের বাধা-স্বরূপ ছিল।

কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধপ্রস্তুতি ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে, জাবির বিন কুরজ মদিনাবাসী মুসলমানদের কিছু সংখ্যক উট ও ভেড়া লুট করে নিয়ে যায়। তখন হতেই হযরত (সাঃ) অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। এদিকে মদিনার ইহুদীগণ গোপনে হযরত (দঃ)-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আরম্ভ করেছে। মক্কাবাসীগণ হযরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ৬২৩ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে আবু সুফিয়ান তার বিরাট বাহিনী নিয়ে সিরিয়া হতে তাড়াতাড়ি বাণিজ্য করে প্রচুর ধন-সম্পদ সহ মক্কায় ফিরে এল। এবং মক্কার কুরাইশগণ তাদের সমস্ত কিছু নিয়ে হযরত (দঃ)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিল। এইরূপ ভয়াবহ গুরুতর পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তাঁর দূতকে সবসময় সতর্ক করে দিতেন। এবং তিনিও সেই সতর্কতানুযায়ী কাজ করতেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফিয়ানকে মক্কায় আতঙ্কহীন অবস্থায় ফিরতে বাধা দিলেন। তবে আক্রমণ করা উদ্দেশ্য ছিল না।

হযরতের পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ানকে এই বাধা দেওয়াটা ছিল একটা সুনিপুণ রণকৌশল মাত্র। এই মরুযাত্রী দলটি প্রায় ৫০ হাজার দেরহামের মালপত্র বহন করেছিল. এবং আরবের কোন পরিবারই এই দলে অংশ নিতে বাকি ছিল না। হযরত (সাঃ) চিন্তা করলেন যদি এই দল যুদ্ধ করতে মনস্থ করে তাহলে তাদেরকে অর্ধেক লোক রাখতে হবে দলের সম্পদ ও লোকজনকে রক্ষা করতে, অথবা তাদেরকে হযরতের লোকের সঙ্গে শান্তি সন্ধি করতে হবে। সোজাসুজি মদিনা দখল করতে তারা সাহস পাবে না।

কুরাইশদের বিভ্রান্ত করতে হযরতের কৌশল ঃ নিজের কৌশল কাজে লাগানোর জন্য মহানবী (সাঃ) তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ও সায়িদ বিন জায়িদকে সিরিয়া থেকে আবু সুফিয়ানের দলের ফেরার সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য পাঠালেন। তাঁরা বের হলেন এবং মদিনার উত্তর-পূর্বে একশ মাইল দূরে আল হাওয়ুরা নামক স্থানে জুহান্নীর নিকট থামলেন। যখন দলটি নিকটে এল তখন তাঁরা হযরত (দঃ)-কে সংবাদ দিলেন।

যখন আবু সুফিয়ান আল হাওয়ুরাতে পৌছাল তখন জুহান্নীর নিকট জানতে চাইল হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর খবরা-খবর কি? জুহান্নী কোন কথাই প্রকাশ করল না। আবু সুফিয়ান ছিল বিশেষ চালাক লোক। সে গিফার গোত্রের জমজম বিন আমর নামক এক ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠিয়ে দিল, যাতে মক্কাবাসী এই দলকে সাহায্য করে। খুব সম্ভব সে হযরতের রণকৌশল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছিল।

যথাসময়ে জমজম আপন রণকৌশলে মক্কায় হাজির হলো। আপন উটটাকে রক্তাক্ত দেখিয়ে মক্কাবাসীদের উত্তেজিত করার নিমিত্ত উটের নাক, কান ও অন্যান্য স্থান ক্ষত-বিক্ষত করল। এবং নিজের জামাটাও ছিঁড়ে একাকার করল। মহম্মদ (দঃ)-এর হাত থেকে আবু সুফিয়ান ও তার দলকে রক্ষা করার জন্য সাহায্য করতে আরববাসীদের সে চিৎকার করে আহ্বান করল।

দ্বাদশ অধ্যায়

বদরের যুদ্ধ (৬২৪ খ্রীঃ)

হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে ধ্বংস করতে কুরাইশদের প্রস্তুতি (২ হিঃ) ঃ জমজমের এই কথা শোনামাত্র আবু জেহেল সকল মক্কাবাসীকে কাবা শরীফে একত্রিত হতে আহ্বান করল। আবু জেহেলের শরীর মনে হত যেন লোহা দিয়ে তৈরি। সে সময় কুরাইশদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে তাকে অমান্য করতে পারে। তবু কুরাইশগণ দু' দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল; কেউ কেউ মনে করেছিল "বিগত হরবউল ফিজরের জন্য" তারা পেছন থেকে আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু কার্যত তা হয়নি। সকল গোত্রের সকল নেতাকেই সেদিন যেতে হয়েছিল। কারও পবিত্রাণ ছিল না। আবু লাহাব যেতে পারেননি, তাঁর স্থলে আস্ বিন হিশাম বিন মোগিরাকে পাঠিয়েছিলেন। অস্ত্র ধারণ করতে পারে এমন লোক কেউই মক্কাতে বাকি ছিল না।

বদর যুদ্ধে কুরাইশ সৈন্য ঃ এক হাজার পদাতিক, সাতশ উষ্ট্রারোহী, তিনশ অশ্বারোহী সৈন্য সবরকম সাজসরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করে। ১৩ জন ছিল শুধু খাওয়ার ব্যবস্থাপনার জন্য। যুদ্ধসম্ভার বহনের জন্য ছিল শত শত উট।

আবু সুফিয়ান ব্যতীত সকল নেতাই উপস্থিত ছিল। সৈন্যবাহিনী বিখ্যাত বদরে উপস্থিত হয়ে জানতে পারল আবু সুফিয়ান নিরাপদে সিরিয়া হতে মক্কার পথে যাত্রা করেছে। যাত্রার পথে আবু সুফিয়ান এই বিরাট বাহিনীকে সংবাদ পাঠিয়ে দিল—সে কোন রকমে মহম্মদ (দঃ)-এর হাত হতে রক্ষা পেয়েছে। সুতরাং মদিনায় কোন সৈন্য পাঠানোর দরকার নেই। ফলে কিছু সংখ্যক কুরাইশ মক্কায় ফিরে গেল।

কিন্তু আবু জেহেল মক্কায় ফিরল না। সে শপথ করে বলল—"আমরা কখনও ফিরে যাব না। আমরা বদরেই শিবির স্থাপন করব। এবং তিনদিন সেখানে অবস্থান করে আমরা উট জবেহ্ করব, ভোজ করব, পান করব, গায়কগণ গান করবে। সমস্ত আরব-জাহান আমাদের এই বীরত্বপূর্ণ ঘটনা লক্ষ্য করবে এবং আমাদের ভয় করবে চিরদিনের জন্য।"

বদর ছিল আরবের একটি বাজার। আবু জেহেল চেয়েছিল—ওখানে তার বীরত্বকে কেন্দ্র করে ইতিহাস রচনা করতে। এরপর বিরাট বাহিনী এগিয়ে গেল বদর উপত্যকায়। সেখানেই তারা শিবির স্থাপন করল।

হযরত মহম্মদ (দঃ) ও তাঁর ৩১৩ জনের ক্ষুদ্র বাহিনী ঃ শত্রুপক্ষকে লক্ষ্য করার জন্য যখন হযরত মদিনা হতে যাত্রা করছেন তখন তাঁর সঙ্গে মাত্র ৩১৩ জন মানুষ। ৭০টি উট ও ২টি ঘোড়া, প্রতিটি উটে তিনজন মানুষ এবং মাত্র কয়েকজনের নিকট কিছু অস্ত্র। বাকি সকলের হাতে নিছক একটা করে তরবারি, অক্ষম এবং বালকদের বাদ দিলে যাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৩-৩০৭ জন। এঁদের মধ্যে ৮৩ জন মোহাজেরিন ও ৬১ জন আস্ গোত্রের ও বাকি খাজরাজ গোত্রের। তারা দাফিয়ান উপত্যকায় পৌঁছলে আবু জেহেলের সৈন্যদের সাড়া পেলেন।

হযরতের মদিনায় প্রত্যাবর্তন ঃ হযরতের নতুন সমস্যা দেখা দিল। একটি দলের সঙ্গে সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে দেখা করা এক জিনিস, আর বিরাট সংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা আর এক জিনিস। কোন কাজ করার পূর্বে সকলের সঙ্গে আলোচনা করা হযরতের জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। যখন তিনি মদিনায় ফিরে এলেন তখন মদিনার কিছু লোক ও ইহুদীগণ বেশ কিছুটা শক্ত হয়ে আছে। তারা যে হযরতের পক্ষে নয় একথা সকলেরই জানা হয়ে গেছে। এবং তারাও ঠিক করে রেখেছে হযরতকে মদিনা থেকে ওইভাবে বিতাড়িত করা হোক, যেভাবে মক্কাবাসীগণ তাঁকে বিতাড়িত করেছে। কিন্তু তার পূর্বে হযরত আল্লাহর অমোঘ নির্দেশ পেয়ে গেছেন। তিনি তাঁর স্বভাবমতো যে কোন আদেশ বা নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে সকলের সঙ্গে একবার পরামর্শ করতেন। সকলকে মনের কথা বলার সুযোগ দিতেন। যার ফলে তিনি সকলের মনকে জানার সুযোগ পেতেন এবং তখনকার অবস্থাও জানতে পারতেন। ফলে জোর-জবরদস্তির কোন প্রশ্ন থাকত না।

হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) সর্বদাই তাঁর সঙ্গে ছিলেন যুদ্ধ করার জন্য। তবুও তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন—"আপনারা আপনাদের মতামত দিন।" তখন মিকদাদ বিন আমর বললেন—

"হে আল্লাহর নবী, আল্লাহ্ যেভাবে আপনাকে নির্দেশ দেন আপনি সেইভাবে এগিয়ে চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। আল্লাহর কসম, আমরা কখনও ইহুদীদের মতো আপনাকে বলব না যে আপনি যান ও আপনার আল্লাহ্ যাক এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকব। কিন্তু আমরা আপনার ও আপনার আল্লাহর সাথে আছি। যুদ্ধ করুন তাদের সাথে। আমরাও আপনার সাথে থেকে যুদ্ধ করব।" জনগণ তখন নিস্তব্ধ। হযরত আবার বললেন—"আপনারা আপনাদের মতামত দিন।" তিনি মদিনাবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, একদিন তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল তারা হযরতকে রক্ষা করবে বলে। যেমন তারা রক্ষা করে আপন ছেলেমেয়েদেরকে। কিন্তু তারা বাধ্য ছিল না হযরতের সঙ্গে মদিনার বাইরে যেতে। এইজন্যই হযরত মদিনায় ফিরে এলেন। আনসারগণ তাঁর কথার মর্ম বুঝতে পারলেন, তখন সাদ বিন মাদাহ বললেন—হে আল্লাহর নবী, আপনি কি আমাদের এই কথা বলতে চাইলেন? তিনি বললেন—হ্যাঁ। তখন সাদ উত্তর দিলেন—"আমরা আপনাকে বিশ্বাস করেছি ও আপনার সত্যকেও আমরা সাক্ষ্য বহন করছি আপনাকে যা (কোরআন শরীফ) দেওয়া হয়েছে তা মহাসত্য। যার জন্য আমরা আপনার কথা শুনতে ও মানতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনি এগিয়ে চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন তিনি যদি আমাদের নির্দেশ দেন সমুদ্র পার হতে তবে আমরা আপনার সাথে ঝাঁপ দেবো। একজনও আমাদের পেছনে অপেক্ষা করবে না। আগামী দিনে শত্রুর হাতে যাই ঘটুক আমরা সকলেই একমত, একসাথে লড়ে যাবো। সম্ভবত আল্লাহ্ আমাদের পক্ষ হতে আপনাকে ওই জিনিসই দেখাবেন যাতে আপনি খুশি হবেন। আল্লাহর রহমত মাথায় নিয়ে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে চলুন।"

সাদ-এর বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরতের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

তখন তিনি বলে উঠলেন, এগিয়ে চল এবং আনন্দ কর। আল্লাহ্ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন—আমরা দুটি দলের যে কোন একটির সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হবো (আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য দল অথবা আবু জেহেলের সৈন্যবাহিনী)। তখনও মুসলমানগণ জানত না যে আবু সুফিয়ান চলে গেছে।

বদর অভিমুখে হযরতের অভিযান (রমজান, ২ হিঃ) ঃ হযরত তাঁর অভিযানে সম্মতি স্বরূপ হযরত আলি বিন আবু তালিব ও জুবাইর বিন আওয়াম এবং সাদ বিন ওয়াক্কাসকে খবরা-খবর নিতে পাঠালেন। তাঁরা দু'জন বালককে আনলেন—যারা তাদের শত্রু বাহিনীকে দেখেছিল। তাদের প্রশ্ন করা হলো কিন্তু তারা ঠিক সংখ্যা বলতে পারল না। কিন্তু হযরত (সাঃ) কৌশলে সংখ্যা আন্দাজ করে নিলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা দৈনিক ক'টি উট জবেহ করত? তারা উত্তর দিল প্রথমদিন ন'টা, পরদিন দশটা। তখন হযরত আন্দাজ করে নিলেন সেখানে সৈন্যরূপে ৯০০-১০০০ জন কুরাইশ ছিল। ওই দুই বালকের নিকট থেকে তিনি আরও জানতে পারলেন যে, সেখানকার নেতাগণ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেই। হযরত তাঁর লোকজনকে ইঙ্গিতে জয়ের আভাস দিয়ে বললেন, মক্কা তোমাদের প্রতি নিক্ষেপ করেছে তার ধনভাণ্ডার ও লোকজন। অর্থাৎ মক্কার প্রাণ বদরে উপস্থিত আছে। তোমরা যুদ্ধ করে জয় করতে পারবে।

আবু সুফিয়ানের পলায়ন ঃ দু'জন মুসলমান পানীয় জলের সন্ধানে গিয়ে দু'জন বালিকার কাছে জানতে পারল, আগামীকাল আবু সুফিয়ানের দলবল এখানে আসতে পারে। তাঁদের উট জলাশয়ের নিকটে একটি ঢিবিতে বাঁধল। তারা সেখান থেকে খবরা-খবর সংগ্রহ করে হযরত (সাঃ)-কে জানাতে থাকল।

আবু সুফিয়ান এত সহজে ধরা দেওয়ার লোক নয়। সে তার বাহিনীকে পিছনে রেখে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বদরের দিকে এল। সেখানকার পানিরক্ষক মাজদিকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি এখানে কাউকে দেখেছ?" সে উত্তর দিল, "দুজন লোক তাঁদের উট এই ঢিবিতে বেঁধে রেখেছিল।" আবু সুফিয়ান উটের পদচিহ্ন লক্ষ্য করল এবং দেখল উটগুলো কি খাবারের অংশ ফেলে গেছে। ওইগুলো থেকে সে বুঝতে পারল উঠগুলো মদিনার। তখন সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দলবল নিয়ে সমুদ্রতীর ধরে যাত্রা করল যাতে কেউ তাকে আর অনুগমন করতে না পারে। এরপর সে সব অবস্থা জানিয়ে আবু জেহেলকে সংবাদ পাঠাল। তখনও মুসলমানগণ আশা করছেন আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু আবু সুফিয়ান ছিলেন বিচক্ষণ দূরদর্শী ও সতর্ক মানুষ।

পরের দিন মুসলমানগণ বুঝতে পারলেন আবু সুফিয়ানকে আর ধরা যাবে না। তখন কুরাইশ সৈনিকদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই ছিল মহান আল্লাহর পূর্ব নির্দেশ এবং তাঁর মহান দূত মহম্মদ (দঃ) তা জানতেন। কিন্তু অন্যান্য সকল মুসলমানও তা জানতে পারলেন যখন তাঁরা সেখানে পৌছালেন। কোরআনে এর উল্লেখ আছে। বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আল্লাহর ইঙ্গিতে। এ থেকে কারও পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় ছিল না।

তারা (অবিশ্বাসীগণ) ওদের (মুসলমানগণকে তাদের তুলনায়) চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখেছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় সাহায্য দানে শক্তিশালী করেন।

কোরআন—৩ ঃ ১৩

"যখন আল্লাহ্ উভয় দলের একদল সম্বন্ধে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে নিশ্চয় এটি তোমাদের জন্য এবং তোমরা অস্ত্রহীনদের নিজের জন্য মনোনীত করেছিলে। আল্লাহ্ সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নির্মূল করেন। এটি এইজন্য যে তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্যে প্রতিপন্ন করেন। যখন তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তিনি ওটি কবুল করেছিলেন, আমি তোমাদের এক সহস্র ফেরেশ্তা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।"

কোরআন—৮ ঃ ৭-৯

সূরা ইমরান ও আনফালের প্রথম দিকের আয়াতগুলো বদর যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ। এবং বাকি কয়েকটিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় হযরত (সাঃ) কি সমস্যায় পড়েছিলেন। কেননা হযরত আবুবকর, ওমর ও মিকদাদ এবং সাদ যুদ্ধ সম্পর্কে যেভাবে উৎসাহিত ছিলেন অন্যরা ঠিক তেমনটি ছিল না। তাই বদর যুদ্ধে জয়লাভ করা হযরতের পক্ষে সত্যই খুব সহজ ছিল না।

"যখন তোমরা উপত্যকার নিকট প্রান্তে ছিলে তখন তারা ছিল দূর প্রান্তে এবং উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে, যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করতে চাইতে তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মতভেদ ঘটত। কিন্তু (উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করে) যা ঘটবার আল্লাহ্ তাই ঘটালেন। ফলত যে নিহত হবার সে প্রকাশ্যে নিহত হবে এবং যে জীবিত থাকবার সে প্রকাশ্যে জীবিত থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।" কোরআন—৮ ঃ ৪২

বোঝা যাচ্ছে, বদরের যুদ্ধ ছিল আল্লাহর অভিপ্রেত। কেননা মুসলমানগণ ইচ্ছা করেছিলেন আবু সুফিয়ানের ওপর বিজয়ী হতে। কিন্তু আল্লাহ্ মুসলমানদের দ্বারা তা করাতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন চির সিদ্ধান্ত হোক বিশ্বাস (ইসলাম) ও অবিশ্বাসের মধ্যে। এ ঘটনা হিজরীর দ্বিতীয় সনের।

বদরের এই অচিন্তনীয় বিজয়ের পূর্ণ গৌরব এক আল্লাহরই তাঁর অফুরন্ত করুণার জন্য, ও হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর অসাধারণ নেতৃত্বের জন্যে। যে গুণে তিনি শত্রুদের যুদ্ধে জয় করার পূর্বে শুধু মুসলমানদেরই নয়, সকলের অন্তর জয় করেছিলেন।

বদরের যুদ্ধ, তার পরিণতি এবং ২য় হিজরীর অন্যান্য ঘটনাবলী ঃ বদরের যুদ্ধের সময়কাল ৬২৪ খ্রীঃ ১৪ জানুয়ারি। এর চেয়ে কঠিনতম দিন ইসলামের ইতিহাসে আর আছে বলে আমাদের জানা নেই। যদি মুসলমানগণ এই যুদ্ধে হেরে যেতেন, তাহলে ইসলাম জগতের বুক থেকে একেবারেই মুছে যেত কিংবা কয়েক শ' বা কয়েক হাজার বছরের জন্য পিছিয়ে যেত। কারণ যুদ্ধটা কোন রাজ্যলাভের ব্যাপারে ঘটেনি। যুদ্ধ বেধেছিল বিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্বাসের, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরের, সুরের সঙ্গে অসুরের ত্যাগের সঙ্গে ভোগের, সংযমের সঙ্গে অসংযমের।

হযরত মহম্মদ (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ ইনশাআল্লাহ্ জয়ী হবে। যখন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হলো, তখন এই মহাজয়ই প্রমাণ করল—তাঁর কথার মূল্য কতখানি। তিনি পূর্বেই তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন—"আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়েছেন—দু'দলের কোন একটিকে পরাস্ত করার—আবু সুফিয়ান বাহিনী অথবা আবু জেহেলের সৈন্যদল। আবু সুফিয়ান সরে পড়েছে। বাকি আবু জেহেল ও তার সৈন্য দল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ হবেই।"

বদরে মুসলিম তাঁবু ঃ মুসলমানগণ বদরের দিকে দ্রুত ধাবমান হলো। এখানে বদর অর্থাৎ একটি মনোহর কূপ। এই জনপ্রিয় কূপের নামানুসারেই ওখানকার নাম বদর। এই বদর কূপের নিকট হাজির হয়ে হযরত মহম্মদ (দঃ) উট থেকে অবতরণ করলেন। তখন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি হুবার বিন মানজির বিন জামু, হযরতকে অবতরণ করতে দেখে বললেন—"হে আল্লাহর নবী, এই স্থান যেখানে আল্লাহ্ আপনাকে নামার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, এই স্থান, আমাদের জন্যও। আমরা এখান হতে এগিয়ে যাবো না, পিছিয়েও যাবো না। আপনি কি বলেন? একি আত্মরক্ষা ও আক্রমণ উভয় দিক থেকেই উপযুক্ত স্থান নয়?" মহম্মদ (দঃ) বলেন—হ্যাঁ, ঠিকই।

তখন হুবারের পরামর্শ ও মহম্মদ (দঃ)-এর অনুমতিক্রমে সেখানে একটি খাল খনন করা হলো, যাতে সেখানে বৃষ্টির জল জমিয়ে রাখা যায়। তাঁরা সেখানে একটি পৃথক কুঁড়েঘরও তৈরি করলেন—শুধু মহানবীর জন্য, যাতে তিনি সেখানে বসে নির্জনে যুদ্ধ-নির্দেশ দিতে পারেন ও নীরবে আল্লাহর প্রার্থনা করতে পারেন।

বদরে মহম্মদ (দঃ)-এর প্রতি মুসলমানদের অপত্য ভালবাসা ঃ মহানবী তাঁর লোকজনকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করলেন। কিন্তু সৈনিক ও যুদ্ধসম্ভারের স্বল্পতায় মনে মনে তিনি শঙ্কিত হলেন। আল্লাহ্ ও হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর সঙ্গে ছিলেন একদিন গারে সওরে (সওর গুহায়), আজও তিনি তাঁর সঙ্গে। যখন মহম্মদ (সাঃ) বিহ্বল চিত্তে আপন নির্জন কুটিরে ধ্যানমগ্ন তাঁরা দু'জনে আবার তাঁর নিকটে হাজির। মহানবী কাবার দিকে মুখ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা পড়ছেন, তখন তাঁর দেহ ও আত্মা আল্লাহর ধ্যানে লীন—অনুগামীদের পাপরাশি ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনায় নিমগ্ন, তাঁর আকুল প্রার্থনা—আল্লাহ্ যেন তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। তিনি তাঁর একান্ত সাহায্যের জন্য উদ্বেলিত। একেবারে ফানা ফিল্লাহ আল্লাহ্তে লীন অবস্থায় মহানবীর পবিত্র মুখ দিয়ে যে স্বর্গীয় বাণী উচ্চারিত হয়েছিল ঃ

"হে আল্লাহ্! এই সমস্ত কুরাইশগণ তাদের বন্ধু-বান্ধবসহ তোমার দূতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এসেছে। হে আল্লাহ্, আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি যা তুমি অঙ্গীকার করেছ।"

"হে আল্লাহ্! আমাদের এই ক্ষুদ্রবাহিনী যদি ধ্বংস হয় তাহলে এই পৃথিবীতে তোমার আরাধনার জন্য আর কেউই থাকবে না।"

মহানবী এই কথা বারবার উচ্চারণ করছিলেন। হযরত আবুবকর আবার তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন—"আল্লাহ্ আপনার প্রার্থনা শ্রবণ করেছেন, তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন।"

কিন্তু মহানবী তাঁর বিনীত প্রার্থনা করেই চলেছেন আল্লাহর একান্ত সাহায্যের জন্য। তিনি এমনভাবে নিজেকে আল্লাহর সমীপে হাজির করেছেন যা তিনিই একমাত্র পারেন। যে মানুষ একদিন মেরাজের মাধ্যমে সপ্ত আকাশ অতিক্রম করে স্বর্গারোহণ করেন, তিনিই আজ ধরার মাটিতে শিশুর মতো ক্রন্দনরত। "আমাদের সৈন্যসংখ্যা, আমাদের যুদ্ধসম্ভার কোনটাই কিছু নয়, একমাত্র তোমার সাহায্যই আমাদের রক্ষা করতে পারে।"

এই বলতে বলতে তিনি যেন সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, যার মধ্যে লাভ করলেন আকুল প্রার্থনার অমোঘ উত্তর। (৫৪ ঃ ৪৪)। তখন তিনি উঠলেন। তিনি খুশি হয়ে বেরিয়ে এলেন আপন লোকদের কাছে এবং তাদের অনুপ্রাণিত করলেন যুদ্ধের জন্য।

"আল্লাহর শপথ, যার হাতে মহম্মদ (দঃ)-এর জীবন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ আজ তাদের সাথে যুদ্ধ করে সমরে ধৈর্য ধারণ করে, সকল বিপদের সম্মুখীন হয়েও কোন রূপেই পশ্চাদপদ না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের জন্য আছে নিশ্চিত জান্নাত।"

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনুগামীদের অন্তর বিদ্যুতের ন্যায় চমক দিয়ে উঠল। তাঁরা যেন জান্নাতকে তাঁদের চোখের সামনে দেখলেন। দু'হাজার শত্রু সৈন্যকে তাঁরা তাঁদের চেয়েও কম মনে করলেন।

"হে নবী! বিশ্বাসীগণকে যুদ্ধে উদ্দীপ্ত কব, যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শজনের ওপর জয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশজন থাকলে তারা এক হাজার অবিশ্বাসীদের ওপর জয়ী হবে, কারণ তারা অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়।"

কোরআন—৮ ঃ ৬৫-৬৬

মহানবী তাঁদের অনুপ্রাণিত করলেন ; তাঁরা এমনভাবে অনুপ্রাণিত হলো যেন তাঁরা সকলে মিলে একটি মানুষ হয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। তাঁরা যেন বাঁচতে যাচ্ছে না, মরতেই যাচ্ছে। তবুও বাঁচল, কারণ তাঁদের সম্মুখে ছিল—

"অবিশ্বাসীরা যেন কখনও মনে না করে যে, তারা অগ্রগামী হয়েছে, নিশ্চয় তারা অতিক্রম করতে পারবে না। তোমরা যথাসাধ্য তাদের জন্য প্রস্তুত হও এবং অশ্বগুলোকে সামনে বেঁধে রাখ, তার দ্বারা আল্লাহর শত্রুকুল ও তোমাদের শত্রুকুলকে ভয় প্রদর্শন কর। তাছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা জান না, এবং তোমরা যে কোন বিষয় হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে, ওর পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে, তোমরা অত্যাচারিত হবে না। যদি তারা সন্ধির দিকে আকৃষ্ট হয়, তবে তুমিও এতে আগ্রহ দেখাবে। এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি স্বীয় সাহায্য ও বিশ্বাসীগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি ওদের অন্তরসমূহে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। হে নবী, তোমার জন্য ও তোমার অনুসারীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

কোরআন—৮ ঃ ৫৯-৬৪

বদরের যুদ্ধ বর্ণনা (২য় হিঃ ; ৬২৪ খ্রীঃ) ঃ মহম্মদ (দঃ) মুসলমানগণকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁরা যেন আগে আক্রমণ না করেন। এটা ছিল তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের প্রথম

বা প্রধান নীতি। কিন্তু কুরাইশগণ কখনও স্থির থাকতে পারত না। তারা মুসলমানদের আক্রমণ করে বসত। আবু জেহেল প্রথমে আমীর হাজরামিকে ডাক দিল, যে ছিল ওমর হাজরামির ভাই, যে ওমর দু'মাস পূর্বে মুসলমানদের একটি তীরের আঘাতে নাখালায় প্রাণ-ত্যাগ করে। তারই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আবু জেহেল কুরাইশদেরকে আহ্বান জানাতে থাকে। আমীর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, "হে ওমরা, হে ওমরা" বলে কেঁদে উঠল। তখন আসওয়াদ বিন আবদুল আসাদ মাখজামি মুসলমানদের পানি সরবরাহের সমস্ত কিছু ভেঙে দেওয়ার জন্য অগ্রসর হলো। কিন্তু কোনরূপ ক্ষতি করার পূর্বেই পুরুষসিংহ হযরত হামজা তাকে হত্যা করল। তখন রাবেয়ার পুত্র উৎবা ও সাইবা এবং উৎবার পুত্র ওয়ালিদ একসঙ্গে মুসলমানদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানাল। তিনজন মদিনাবাসী এগিয়ে গেল। কিন্তু মক্কাবাসীগণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করল না। তারা মহম্মদ (দঃ)-কে আহ্বান করল, "হে মহম্মদ (দঃ)! আমাদের নিকট আমাদেরই মক্কার অভিজাত লোকদের পাঠাও।"

তখন হযরত মহম্মদ (দঃ) এর উত্তরে সাইবার বিরুদ্ধে তাঁর চাচা হযরত হামজা ও ওলিদের বিরুদ্ধে আলি বিন আবু তালিবকে এবং উৎবার বিরুদ্ধে উবাইদা বিন হারিসকে যুদ্ধ করাব নির্দেশ দিলেন। হযরত হামজা ও আলি মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের বিরোধীকে হত্যা করেন। আলি উৎবাকে হত্যা করেন, যে উৎবা উবাইদাকে আঘাত করেছিল এবং গর্বিত হয়ে পড়েছিল। এবার সাধারণভাবে ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এটা ছিল ২য় হিজরীর ১৭ রমজান, শুক্রবার, ইংরেজি ১৪ জানুয়ারি, ৬২৪ খ্রীঃ।

সমগ্র মানব ইতিহাসে এরূপ যুদ্ধ কি কেউ দেখেছে! মাত্র তিনশ পদাতিক মানুষ লড়েছেন—তিনশ অশ্বারোহী ও সাতশ উষ্ট্রারোহী সৈনিকের বিরুদ্ধে। আবার ওই তিনশ' মানুষের নিকট কোন প্রকৃত যুদ্ধসম্ভার ছিল না। মুসলমানদের ছিল দুটো ঘোড়া ও সত্তরটি উট। কিন্তু তাঁরা কেউই ওইগুলোকে ব্যবহার করেননি। সকলেই পদাতিক ছিলেন।

মুসলমানদের সঙ্গে শক্তি নয়, সম্ভার নয়, সৈন্য নয়, সংখ্যা নয়, শুধু ছিল স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের অন্তরে হযরতের প্রতি বিদ্বেষ ব্যতীত কিছুই ছিল না। মুসলমানদের ছিল এমন এক হাদি, পথপ্রদর্শক, সেনাধ্যক্ষ, যাঁর যোগাযোগ ছিল অনন্তের সঙ্গে কিন্তু অবিশ্বাসীদের তেমন কোনই নির্ভরতা ছিল না। এই কারণেই মুসলমানদের জয় ছিল অবশ্যম্ভাবী।

হযরত এই বিরাট যুদ্ধে সোজাসুজি নির্দেশ দিয়েছিলেন শুধু বেছে বেছে কুরাইশ নেতা ও প্রধানদের আক্রমণ করার জন্য, যাতে সাধারণ মানুষ বেশি মারা না যায়। মুসলমানরা ঠিক সেই ভাবেই এগিয়ে গেলেন। মুয়াজ বিন আমর নামে একজন যুবক আনসার আল্লাহর সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জেহেল (অজ্ঞতার পিতা)-কে আক্রমণ করলেন। আবু জেহেলের সর্বশরীর বর্ম দ্বারা আবৃত। মুয়াজ তাঁর ভারী তরবারির এক আঘাতে আবু জেহেলের পা কেটে ফেলেন। এবং আবু জেহেল ঘোড়া হতে পড়ে যায়। ঠিক একই সময় পেছন হতে আবু জেহেলের পুত্র একরামাহ মুয়াজের বাম হাতে জোরে আঘাত করে, ফলে মুয়াজের হাত কাটা অবস্থায় ঝুলতে থাকে। এবং তিনি ওই অবস্থাতেই যুদ্ধ চালিয়ে যান। যখন বাঁর

মুয়াজ দেখলেন কাটা হাতটা তাঁর যুদ্ধে অসুবিধার সৃষ্টি করছে, তখন তিনি ওই হাতটাকে একেবারেই কেটে ফেলে দিলেন এবং অমিতবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।

হযরত বেলাল তাঁর পুরাতন প্রভু উমাইয়া বিন খালাফ এবং তার পুত্র আলিকে আক্রমণ করেন এবং উভয়কেই বধ করেন।

এইভাবে মক্কাতে যে ১৪ জন নেতা হযরতকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের ১১ জনই এখানে মৃত্যুবরণ করল। এরা হলো—

১। সাইবাহ বিন রাবিয়াহ। ২। আকাবহ। ৩। তাইমা বিন আদি। ৪। হারিস বিন আমর। ৫। নাজর বিন হারিস। ৬। আবুল বখতারি। ৭। জামাহ বিন আসাদ্। ৮। আবু জেহেল। ৯। বানিয়াহ পিতা হাজজাজ্। ১০। মুনাব্বাহ। ১১। উমাইয়া বিন খালাফ।

যে তিনজন জীবিত ছিল—

১। আবু সুফিয়ান (এ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না)। ২। জুবাইর বিন মুতিম। ৩। হাকিম বিন হিজাম্।

এঁরা পরে তিনজনেই ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। এদিকে যুদ্ধ বিপুল বিক্রমে চলছে, হযরত তার সামান্য সংখ্যক সৈনিককে উৎসাহ দিচ্ছেন, অনুপ্রাণিত করছেন। এবং শেষ পর্যন্ত এক মুঠো বালি নিয়ে কোরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত পড়ে কুরাইশদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন এই বলে—"শত্রুর মুখ বিকৃত হোক।" তখন মুসলমানগণ পুরোদমে উৎসাহ বোধ কবলেন। শত্রুকুল দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা দেখল কোন নেতা বা প্রধান তাদের পেছনে নেই। এমনকি মৃতদেহগুলোকে তুলে নেওয়ার লোক নেই বা মৃত্যুযন্ত্রণায অস্থির লোকগুলোকে সাহায্য করারও কেউ নেই। এমনিভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় বদর প্রান্তে ৩১৩ জন মুসলমানের নিকট এক হাজার সশস্ত্র কুরাইশ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটল। কোরআন—৮ঃ ১৭

এই যুদ্ধে মুসলমানগণ হারাল ছয়জন মোহাজের এবং আটজন আনসার। সব মিলে মোট ১৪ জন শহীদ হলেন। আর মক্কাবাসীর ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হলেন। সবে মিলে ১৪০ জন। সুতরাং ১০ জন অবিশ্বাসীর সমান একজন বিশ্বাসী।

কুরাইশদেব গর্ব অহঙ্কার বিনীত মুসলমানদের নিকট চিরতরে খর্ব হলো। জয়ী হলো মুসলমানগণ, জয়ী হলো আল্লাহর মহান ইচ্ছা। জয়ী হলো সত্য।

"যখন তিনি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের স্বস্তির জন্য তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বারিবর্ষণ করেন, যেন তিনি তাঁর দ্বারা তোমাদের পবিত্র করেন ও তোমাদের শয়তানি কুমন্ত্রণা দূরীভূত করেছেন এবং যেন তিনি তোমাদের অন্তরসমূহ সুদৃঢ় করেন ও তোমাদের চরণসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।" ৮ ঃ ১১। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রার্থনারই ফলস্বরূপ।

"যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, অতএব বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সুপ্রতিষ্ঠিত কর, আমি অচিরেই অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করছি। অতএব তাদের কণ্ঠ (স্কন্ধ) সমূহের ওপর আঘাত করো এবং তাদের অঙ্গুলির সংযোগসমূহে (গাঁটেগাঁটে) আঘাত করো। কোরআন—৮ ঃ ১২

সমগ্র যুদ্ধটাই যেন আল্লাহ্ নেপথ্যে পরিচালনা করলেন, তাই অবিশ্বাসীরা একেবারেই দিশাহারা হয়ে গেল। যখন মুসলমানগণ উল্লাসভরে বালি নিক্ষেপ ও হত্যার কথা বলাবলি করছিলেন, তখন আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন—

"তোমরা তাদের বধ করনি, আল্লাহ্ তাদের বধ করেছেন এবং যখন তুমি বালি নিক্ষেপ করেছিলে, তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন এবং এটি বিশ্বাসীদের উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রবণকাবী মহাজ্ঞানী।" কোরআন—৮ ঃ ১৭

হযরত (দঃ) তাঁর সঙ্গীদের আবু জেহেলের দেহ খুঁজতে বললেন।

আবদুল্লাহ বিন মাসুদ মৃতদেহ দেখার জন্য গেলেন। তিনি দেখলেন আবু জেহেল মৃতপ্রায় তবে মরেনি। আবদুল্লাহ বিন মাসুদ তাকে বললেন, "হে আল্লাহর শত্রু, লক্ষ্য কর, আল্লাহ্ তোমাকে কোন্ হীন অবস্থায় এনেছেন।" তখন আবু জেহেল তাকে জিজ্ঞাসা করল, যুদ্ধের খবর কি! আব্দুল্লাহ তাকে বললেন—মক্কাবাসীগণ হেরে গেছে। এই কথা শুনে আবু জেহেল আবদুল্লাহকে বলল—তার মাথা কেটে দিতে। তবে সম্পূর্ণ গর্দানটা যেন মাথাব সঙ্গে লেগে থাকে। যাতে তার মাথা সকলের মাথা থেকে একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য বহন করে। যাতে সবচেয়ে বড় মনে হয়, যাতে দলনেতা বলে বোঝা যায়। এইরূপ ছিল তাব গর্ব ও অহঙ্কারেব মাত্রা। বিজয়েব পরই হযরত মহম্মদ আল্লাহ্কে সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। পবে মৃতদের নিকট গমন করলেন। দীর্ঘ একটা গর্ত করলেন এবং সেখানে মৃতদেহগুলোকে ফেলে মাটি ঢাকা দিলেন। হযরত বেলালেব অত্যাচারী উমাইয়া বিন খালাফের দেহ এতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়।

মৃত ব্যক্তিদেব মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন যাদের হযরত মহম্মদ (দঃ) মক্কায় থাকাকালীন অত্যন্ত ভালবাসতেন। তারা ছিল আবু কায়িস বিন আসলাত, আলি বিন উমাইয়া এবং আস্ বিন মুনাববাহ। এরা বাধ্য হয়েছিল যুদ্ধ করতে। কুরাইশ বংশে এমন খুব কম পরিবারই ছিল—যে পরিবারের কোন লোক এ যুদ্ধে মারা যায়নি।

যুদ্ধ শেষে হযরত (দঃ) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সব এক জায়গায় করলেন এবং বানূ নাজ্জার গোত্রের আবদুল্লাহ বিন কাবের ওপর ভার দিলেন এবং আবদুল্লাহ বিন রাবিয়া ও জায়েদ বিন হা'রিসকে মদিনার বিভিন্ন পথে যুদ্ধজয়ের সুখবর প্রচার করতে আদেশ দিলেন।

এই শুভ সংবাদ ঠিক সেই মুহূর্তে মদিনার মাটিতে পৌঁছাল যখন মদিনাবাসীগণ হযরতের কন্যা হযরত ওসমান বিন আফ্ফানের স্ত্রী রোকাইয়াকে সমাধিস্থ করছেন। যখন হযরত মদিনা ছেড়ে যান তখন তাঁর কন্যা রোকাইয়া নিদারুণ অসুস্থ। তাই তিনি তাঁর স্বামী হযরত ওসমান (রাঃ)-কে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য রেখে যান। আবদুল্লাহ্ বিন রাবিয়া এবং যায়েদ বিন হারিস সেখানকার লোকদের বলতে থাকল কিভাবে যুদ্ধ চলল, কিভাবে তাঁদের জয় হলো এবং যে সমস্ত কুরাইশ বধ হয়েছিল তাদের নামগুলো বলতে থাকলেন।

মুসলমানদের এই যুদ্ধজয়কে ইহুদীরা সহজে গ্রহণ করতে পারল না। তারা এই সংবাদকে বিকৃত করে প্রচার করতে থাকল যে মহম্মদ (দঃ) যুদ্ধে নিহত হয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গীরাও পরাজিত। কারণ যায়েদ বিন হারিস হযরতের স্ত্রী-উটের ওপর চেপে

এসেছেন। যদি তিনি জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনিই তাঁর উট কাসওয়াতে চড়ে আসতেন। এবং যায়েদ বিন হারিস যে সমস্ত কথা বলছে সবই মিথ্যে। পরাজয়ের পরে কি হবে সেই ভয়ে তাদের এই মিথ্যাভাষণ।

মুসলমানদের নিকট আল্লাহ্ ইহুদীদের অন্তরের কথা খুলে দিলেন। যখন সত্য সংবাদ সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল, তখন ইহুদী নেতারা বলে উঠল—মাটির তলদেশই তাদের জন্য শ্রেয়, ওপর অপেক্ষা অর্থাৎ মৃত্যুই তাদের এখন ভাল। এবং তাদের মধ্যে কাব বিন আশরফ নামে একজন মক্কা গমন করল এবং সেখানে মহম্মদ (দঃ) বিরোধী কবিতা ও ভাষণ দ্বারা সেখানকার কুরাইশদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। যেন তারা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। "এবং যদি তারা সক্ষম হয় তবে তারা তোমাদের ধর্ম হতে ফেরাতে না পারা পর্যন্ত তোমাদের সাথে যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হবে না।"

কোরআন—২ ঃ ২১৯

যুদ্ধলব্ধ ধন ভাগ-বণ্টন নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে একটু মতবিরোধ দেখা দিল। পরে হযরত (দঃ) নিজে হস্তক্ষেপ করলে সবকিছুর সমাধান হয়ে গেল। তিনি যা কিছু নীতি নির্ধারণ করলেন সবই স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায়। তিনি সকলকে যুদ্ধলব্ধ ধন দেওয়া স্থির করলেন। যেমন অনেকে বাধ্য হয়ে মদিনাতে ছিলেন, যুদ্ধে যেতে পারেননি। যেমন হযরত ওসমান (রাঃ) নিজেই একজন। তবে বণ্টনের সময় কিছু কম-বেশি তিনি করেছিলেন। সকলকেই কিছু কিছু দিয়েছিলেন।

বন্দীদের সকলকেই মদিনায় আনা হয়েছিল একমাত্র দু'জন ব্যতীত, উকবা বিন আবি মুয়াইত এবং নজর বিন হারিস। যারা সবসময় মক্কাতে মুসলমানদের প্রতি নিদারুণ নির্যাতন করেছিল এবং হযরত মহম্মদ (দঃ) ও কোরআন শরীফের প্রতি অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত। তাদের পথিমধ্যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

বদর যুদ্ধের বন্দীদের প্রতি মহানবীর নজিরবিহীন ব্যবহার ঃ মুসলমানদের মদিনাতে প্রবেশ করার একদিন পরে বন্দীরা প্রবেশ করল। যখন বন্দীরা প্রবেশ করল, হযরতের স্ত্রী সাওদা বিন যামাহ বন্দী আবু ইয়াযিদ সুয়াহিলকে লক্ষ্য করলেন—দু'হাত পেছনে বাঁধা। তখন তার কোমল নারীমন, সহানুভূতিশীল রমণী হৃদয় থাকতে পারল না। তিনি বলে উঠলেন—"হে আবু ইয়াযিদ। তুমি কি তোমার আত্মা ও হাতকে সমর্পণ করেছ। মৃত্যু এ অপেক্ষা শ্রেয় ছিল।" তিনি এই মন্তব্য করলেন এজন্য যে তার হাত পেছনে বাঁধা ছিল, যা দেখা যাচ্ছিল না। এবং তিনি এই বন্দীটিকে মুখোমুখি দেখলেন তাই থাকতে না পেরে ওই কথা বললেন। হযরত মহম্মদ (দঃ) তখন ঘর থেকে স্ত্রীর মন্তব্য শুনতে পেয়ে বলে উঠলেন—হে সওদা, তুমি কি আল্লাহ্ ও আল্লাহর দূতের বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করতে চাও। তিনি উত্তর দিলেন—হে আল্লাহর নবী, আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। যখন আমি বন্দীটিকে ওই অবস্থায় দেখলাম, তখন আমি নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে ওই কথা বলেছি। বোঝা যায় তখনকার মানুষ কত ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করতেন এবং বন্দীদের প্রতিও তাঁদের মন কত মমতায় ভরা ছিল। মূল কথা হযরত মহম্মদ (দঃ) নিজেই ছিলেন দয়ার সাগর, ক্ষমার পাহাড়। তাই তিনি যখন মুসলমানদের

মধ্যে বন্দীদের বণ্টন করে দিলেন, তখন সঙ্গে দিলেন কঠোর নির্দেশ—কোন বন্দীর প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার না করতে, যতক্ষণ না মক্কাবাসীগণ তাদের উদ্ধার করে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন। মহানবী যুদ্ধক্ষেত্র হতে বিজয়ী বেশে ফেরার পথে আপন সঙ্গীদের নিয়ে হেঁটে ফিরলেন, এবং বন্দীদের উটের ও ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আনলেন। ফেরার পথে তাঁরা নিজেরা শুকনো খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন, কিন্তু বন্দীদের খেতে দিতেন মিহি আটার রুটি। বিশ্ব-ইতিহাসে বন্দীদের প্রতি এ ব্যবহার আজও নজিরবিহীন।

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সাহাবা হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে বন্দীদের বিচারের বিষয় নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। হযরত ওমর তাঁর চিরাচরিত কঠোর স্বভাবের জন্যে মত দিলেন বন্দীদের হত্যা করা হোক। কেননা তা দেখলে অন্য কেউ আর ওইরূপ করতে সাহস করবে না। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর চিরাচরিত কোমল স্বভাবের জন্য মত দিলেন—দয়া করার জন্য। দয়ার নবী মহম্মদ (দঃ) তাই-ই করলেন।

একজন কবি বন্দী ছিলেন। তিনি হযরতকে বললেন—"হে মহম্মদ (দঃ)! আমার পাঁচটি কন্যা, আমার অভাবে তারা না খেয়ে মরে যাবে। আপনি আমাকে তাদের প্রতিদান স্বরূপ ছেড়ে দিন।" দয়ার নবী মহম্মদ (দঃ) সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ছেড়ে দিলেন।

মদিনাবাসীগণ হযরত (দঃ)-এর কথায় বন্দীদের প্রতি কি সদয় ব্যবহার করেছিল তার জ্বলন্ত প্রমাণ আবু আজিজ বিন ওমর নামে একজন বন্দী আবু ইউসারের নিকট ছিল। আবু ইউসার নিজে সারাদিন খেজুর খেয়ে দিন কাটাত। কিন্তু বন্দী আবু আজিজকে রুটি খাওয়াত। এমনি ছিল তাদের ঈমান ও মানবিকতাবোধ। হঠাৎ একদিন আজিজের ভাই মুসাব ওই ঘটনা দেখল এবং ইউসারকে বলল—তার ধনী মা আছেন। তিনি তার ছেলের জন্য পূর্ণ বন্দী-মুক্তিপণ দিতে সক্ষম। সুতরাং তুমি তাকে সহজে ছেড়ো না। তখন আজিজ তার ভাই মুসাবকে বলল, তুমি আমার ভাই হয়ে আমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করার জন্য বলছ। তখন মুসাব বলল—তুমি আমার ভাই, কিন্তু যার কাছে আছো তিনি আমার ইহকাল পরকাল উভয় কালেরই মহান ধর্মগুরু অর্থাৎ মুক্তিদাতা।

দীর্ঘ আলোচনার পর বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হলো এক হাজার দেরহামের পরিবর্তে। তবে যে গরিব তাকে একেবারেই বিনা পয়সায় হযরত (দঃ) ছাড়ার অনুমতি দিলেন। এবং তাদের মধ্যে যে গরিব অথচ কিছু লেখাপড়া জানে, তাদের দশজন করে মুসলমানকে আক্ষরিক জ্ঞান দান করার ভার দেওয়া হল। তারপর তারা মুক্তি পেলো।

হযরত যয়নাব ও আবুল আস ঃ যয়নাব মহানবীর বড় মেয়ে। এবং আবুল আস ছিলেন মহানবীর স্ত্রী খাদিজা বিবির বোনের ছেলে। অর্থাৎ যয়নাব ও আবুল আস ছিলেন খালাতো ভাই-বোন। মহানবীর নবুয়তের কয়েক বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়। নবুয়তের পর কুরাইশগণ আবুল আসকে চাপ দিল স্ত্রী যয়নাবকে ত্যাগ করতে, কিন্তু আবুল আস তা করলেন না।

বদরের যুদ্ধে আবুল আস বন্দীরূপে মদিনাতে আনীত হলেন। তখন স্ত্রী যয়নাব স্বামীর মুক্তিপণ হিসাবে আপন হারটিকে মদিনাতে পাঠিয়ে দিলেন। যে হারটি স্বয়ং বিবি খাদিজা

যয়নাবকে বিয়েতে উপহার দিয়েছিলেন। মহানবী প্রেরিত হারটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তমা স্ত্রী ও কন্যার কথা তাঁর মনকে বিচলিত করল।

মহানবী আবুল আসকে মুক্তি দিলেন বিনাপণে। এবং ওই হারটি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন কন্যা যয়নাবের নিকট। শুধু আসকে একটি শর্ত দিলেন, তুমি যয়নাবকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিও। এতে আস সানন্দে সম্মতি দিলেন। এবং মক্কা গিয়ে স্ত্রী যয়নাবকে সব বললেন। এবং মদিনাতে পাঠানোর মনস্থও করলেন। কিন্তু কুরাইশদের বাধাতে তা সম্ভব হলো না।

ইতিমধ্যে মহানবী যায়েদ বিন হারিসকে একটি আংটি দিয়ে বললেন—'মক্কা যাও। এবং এটাকে কন্যা যয়নাবের নিকট পাঠাবে। সে পরে তোমার নিকট রাতের অন্ধকারে এলে, তুমি তাকে মদিনায় আনবে। যায়েদ মক্কা গিয়ে মাঠে যয়নাবের রাখালকে দেখতে পেলেন। এবং তাকে আংটি দিয়ে বললেন—'যয়নাবকে দিও'। আবল আস ও যয়নাব আংটি পেয়ে সকল কিছু বুঝতে পারলেন। এবং তাঁরা যায়েদের অবস্থান জেনে নিয়ে রাতের অন্ধকারে সেখানে হাজির হয়ে একটি উটে সওয়ার হয়ে (যায়েদ ও যয়নাব) মদিনার পথে যাত্রা করলেন।

পথিমধ্যে ঘটল বিরাট দুর্ঘটনা। কয়েকজন দুর্ধর্ষ অমানুষ মরু-বেদুঈন এই নিরীহ গো-বেচারী মানুষ দুটিকে একাকী একটি উটে দেখতে পেয়ে মহানন্দে নেচে উঠল। যেন নেকড়ের সম্মুখে অবোলা হরিণ। সন্তান-সম্ভবা রসুল-তনয়া বিবি যয়নাব বহু প্রকারে অনুনয় বিনয় করলেন। বারবার জানালেন—কন্যা পিতার নিকট যাচ্ছে। তারা যেন পথ অবরোধ না করে। তারা তাঁদের সর্বস্ব নিয়ে পথ ছেড়ে দিক। কিন্তু পশুর দল পথ অবরোধ করেই দাঁড়াল। বিবি যয়নাব তখন আরও বহু প্রতিশ্রুতি দেওয়ার চেষ্টা করলেন। যাতে তারা ছেড়ে দেয়। কিছুতেই কোন কাজ হলো না। তখন অসহায়া নারী ক্রন্দনরত অবস্থায় আকুলভাবে ব্যাকুল নিবেদন পেশ করতে থাকলেন। কিন্তু নর-পশুর দল অবিচল থাকল তাদের চরম পশু মনোবৃত্তিতে। দলনেতা নর-পশু, মানব-কুলের চির অভিশাপ হেবার ইবনে আসওয়াদ ক্রন্দনরত নারীর আকুল ও ব্যাকুল আবেদনে কোন রূপেই কর্ণপাত না করে সাক্ষাৎ নরকের বিভীষিকা মূর্তি ধারণ করল। তখন বিবি যয়নাব প্রায় জ্ঞানহারা। এবং ওই নরাধমই এই জ্ঞান-হারা রমণীর প্রতি প্রথম পাশবিক অত্যাচার আরম্ভ করল। এ কাহিনী জগৎ-ব্যভিচারের কলঙ্কিত ধর্ষণের অধ্যায়ে নিখিল বিশ্বের নারী নির্যাতনের ইতিহাসের নির্মমতম কাহিনী রূপে মানুষ মাত্রকেই চিরদিন বেদনার বালুচরে বিদীর্ণ করে তুলবে।

ওই নির্জন প্রান্তরে অসহায়া নারীর আকাশ-ভাঙা ক্রন্দনেও পশু-মানবের পশুপ্রবৃত্তি টলল না। একজন গর্ভবতী অসহায়া নারীর উপর ওই পশুর দল একের পর এক পশুর ক্ষুধা মেটাল, যখন যয়নাব জ্ঞানহারা, সংজ্ঞাহারা, রক্তাপ্লুত যয়নাব কেবল মাত্র প্রাণহারা হতে বাকি ছিলেন। এরই সকরুণ পরিণতিতে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্রাণহারা হলেন। পরে মৃত্যু প্রায় যয়নাবকে যায়েদ কোন মতে মদিনার বুকে পিতা মহানবীজীর নিকট হাজির করলেন। এই ঘটনাতে মহানবীজী কি যে দুঃখ পেয়েছিলেন, তা বলার নয়, ব্যাখ্যারও নয়।

এ কাজ নারীতে নয় নরকে গমন
পশুও করে না এই হীন আচরণ।
হে মহানবী—
একবার কেঁদেছিলে মানুষ গেলে
শতবার কেঁদেছিলে মনুষ্যত্ব ম'লে।

এবার আবুল আস একাকী মক্কাতে রয়ে গেলেন। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে তিনি একটা কাফেলা নিয়ে সিরিয়া গেলেন। ফেরার পথে এই কুরাইশ কাফেলা যায়েদ বিন হারিস কর্তৃক বন্দী হয় মদিনার নিকটেই। আস প্রাণভয়ে রাতের অন্ধকারে মদিনাতেই প্রবেশ করে স্ত্রী যয়নাবের নিকট নিরাপত্তা চান। যয়নাব তাঁকে আশ্বাস দেন।

প্রভাতকালে মহানবী যখন ফজর নামাযে দাঁড়িয়ে গেছেন, এমন সময় পেছনে মেয়েদের কাতার হতে যয়নাবের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"হে মোমিনগণ, আমি মহম্মদের কন্যা যয়নাব। আমি আবুল আসকে নিরাপত্তা দিয়েছি, আপনারাও তাকে দিন।" তখন মহিলাগণ পুরুষের পেছন সারিতে মসজিদে জামাতে নামায পড়তেন।

সালাম ফিরিয়ে মহানবী বললেন—"আমি যা শুনেছি, তোমরাও তা শুনেছ কি?" অতঃপর মহানবী বললেন—"যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ, এ ঘটনার আমি কিছুই জানি না।" তখন সকলেই আসকে নিরাপত্তা দিলেন। মহানবী বাড়ি ফিরে মেয়েকে বললেন—"তার থাকা-খাওয়ার জন্য সম্মানজনক ব্যবস্থা করবে। তবে জেনে রেখো, তুমি এখন আর তার জন্য হালাল বা বৈধ স্ত্রী নও।"

কেউ কেউ আসকে পরামর্শ দিল—তুমি ওই ধনসম্পদ সহ মদিনাতে মুসলমান হয়ে থেকে যাও। আস উত্তর দিলেন—"ঠক ও কাপুরুষের মত ও কাজ করব না।" এই বলে আস ধনসম্পদ সহ মক্কাতে ফিরে গিয়ে পরে বীরবেশে মদিনায় এসে মুসলমান হয়ে স্ত্রী যয়নাবকে নিয়ে পূর্ববৎ ঘরসংসার আরম্ভ করলেন।

সায়িকের অভিযান ঃ এইভাবে ওই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। মক্কাবাসীদের এতই লজ্জা হয়েছিল, তাঁরা একে অন্যের প্রতি তাকাতে পর্যন্ত লজ্জাবোধ করত। তারা অত্যন্ত দুঃখে ম্রিয়মাণ অবস্থায় দিন কাটাত, তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত দুষ্ট লোকগুলো উপদেশ দিত—তোমরা কেঁদো না! তাহলে মুসলমানরা খুশি হবে। তাদের দলনেতা আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করেছিল—যতদিন না সে এর প্রতিশোধ নিতে পারে, ততদিন কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করবে না। এইভাবে সে তার নেতৃত্বে দু'শ অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে মদিনার শেষ প্রান্তে এক খেজুর বাগানে আগুন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু মদিনাবাসীগণ বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা পলায়ন করে। মুসলমানগণ বাগানে এসে দেখল তারা দু'জন মুসলমানকে একাকী পেয়ে হত্যা করে গেছে। তখন মুসলমানগণ পশ্চাদ্ধাবন করল, কিন্তু মক্কাবাসীগণ প্রাণভয়ে এত জোরে দৌড়েছিল যে, তারা তাদের উটের বোঝা হাল্কা করার জন্য মালপত্রগুলো পর্যন্ত রাস্তায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, যাতে ছিল প্রচুর শুকনো খেজুর। এই শুকনো খেজুরকে আরবীতে সায়িক বলা হয়। তাই এই অভিযানের নাম সায়িকের অভিযান। এটা সংঘটিত হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীর জুলহজ মাসে।

বদর যুদ্ধের পরিণতি ও ওমাইর ঃ ইসলাম-জগতের প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ। এবং এই যুদ্ধে জয়লাভ ইসলামের ইতিহাসে এক অতুলনীয় সাফল্য। এ যুদ্ধ মুসলমানদের চির অনুপ্রাণিত করল। শুধু সম্পদ লাভের দিক থেকে এর সাফল্যকে পরিমাপ করা যায় না। হযরত মহম্মদ (দঃ) নিজে যেমন সকল মুসলমানের সকল দিকের আদর্শ, তেমনি ইসলাম-জগতে বদর যুদ্ধ সকল যুদ্ধের আদর্শ যুদ্ধ। যে কোন মুসলমান মহাসঙ্কটে পড়লে—কি করবে—তখন যেন লক্ষ্য করে হযরত মহম্মদ (সাঃ) বদর যুদ্ধের আগে কি করেছিলেন। এবং কি করে মহান আল্লাহর অপার সাহায্য লাভ করেছিলেন। বদর যুদ্ধে আরও মহাশিক্ষা—যখন কোন মুসলমান যুদ্ধ করবে, তখন সে শুধু যুদ্ধ করবে আল্লাহর জন্য, জয় হবে তখন সুনিশ্চিত।

"নিশ্চয়, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের নিকট হতে তাদের জন্য স্বর্গের বিনিময়ে তাদের জীবন ও তাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন।" কোরআন—৯ ঃ ১১

এরপর সমগ্র আরব-জাহানে সমস্ত ইহুদী ও অবিশ্বাসীগণ সতর্ক হয়ে উঠল, তারা জানতে পারল তাদের মধ্যে একটা বিরাট শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাকে এখনই শ্বাসরুদ্ধ কবতে না পারলে মহাবিপদ আসবে। তাদের অন্তরের ইচ্ছা ছিল—"মহম্মদ (দঃ)-কে হত্যা।"

সাফয়ান বিন উমাইয়া নামক এক ব্যক্তি, যার পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই বদর যুদ্ধে নিহত, সে ওমাইর বিন ওয়াহাব নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করল মদিনাতে গিয়ে হযরত (দঃ)-কে হত্যা করার জন্য। একথা একান্ত গোপন রাখা হলো। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর দূতকে জানিয়ে দিলেন। ওমাইর এক বিষাক্ত ও অতি ধারালো তরবারি নিয়ে মদিনায় উপস্থিত হল। এই তরবারি যার শরীরে ঠেকাবে, তার আর কোন রূপ পরিত্রাণ নেই।

কিন্তু ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) ওমাইরকে অস্ত্রসমেত ধরে ফেললেন এবং হাজির করলেন হযরতের নিকট, মহানবী ওমরকে নির্দেশ দিলেন ওকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য এবং জিজ্ঞাসা করতে, কেন ও মদিনায় এসেছে। ওমাইর বলল—আমার ছেলে বন্দী, আমি তাই এসেছি—আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তাকে ছেড়ে দিন।

তখন মহানবী তাকে বললেন—"সাফয়ান তোমাকে ভাড়া করে নিয়োগ করেছে আমাকে হত্যা করার জন্য এবং যে তরবারি তুমি ধরে আছ তা বিষাক্ত তরবারি।" এরপর মহানবী বর্ণনা করলেন ঠিক আনুপূর্বিক গোপন আলোচনা যা সংঘটিত হয়েছিল একমাত্র তাদের দু'জনের মধ্যে। তখন ওমাইর বলল—"আমি বিশ্বাস করি এক আল্লাহ্তে, স্বীকার করলাম আপনি আল্লাহর দূত। কারণ কেউই জানত না—আমাদের গোপন আলোচনা।" তিনি মুসলমান হলেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে অন্যান্য ঘটনা ঃ ২৬শে এপ্রিল, ৬২৪ খ্রীঃ বদর যুদ্ধের শুভ সংবাদ ১৮ রমজান মদিনাতে পৌঁছাল এবং হযরত মহম্মদ (দঃ) ২১ রমজান মদিনায় প্রবেশ করলেন। এ বছরেই দুটো ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হয়। রমজানের ত্রিশ রোযা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ বছর হযরতের কন্যা উম্মে কুলসুমের সঙ্গে হযরত ওসমানের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত ওসমানের প্রথম স্ত্রী মহানবীর কন্যা রোকাইয়ার মৃত্যুতে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরই হযরত আলি (রাঃ)-এর সঙ্গে রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফতেমার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বাকি বছরটা মোটামুটি শান্তিতেই কাটছিল, তখন হযরত (দঃ) তাঁর উম্মতদের আল্লাহর এবাদত সম্পর্কে নানা কথা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। বছরের শেষের দিকে আবু সুফিয়ান সায়িকের অভিযান করল।

আবু লাহাবের মৃত্যু ও হিন্দার শপথ ঃ বদর যুদ্ধে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়ের দুঃসংবাদ প্রথম মক্কার মাটিতে পৌঁছল যার মাধ্যমে, সে ছিল খোজা গোত্রের হাই সুনাম বিন আবদুল্লাহ। যখন সে মক্কাবাসীদের পরাজয়ের কথা বলল তারা কেউই তার কথা বিশ্বাস করল না। যখন সে তাদের প্রধানদের মৃত্যুর কথা বলল তারা তার কথায় গুরুত্ব দিল না। যেমন মদিনার ইহুদীরা গুরুত্ব দেয়নি। এর একটা মনস্তাত্ত্বিক দিকও ছিল। তারা মানসিকতার দিক থেকে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এরূপ একটি দুঃসংবাদ যখন সবার মধ্যে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল তখন কুরাইশদের প্রধান আবু লাহাব আতঙ্কিত ও অভিশাপগ্রস্ত হয়ে এরূপ ভীষণ জ্বরে পড়ল যে, সাতদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হল। এ ছিল আল্লাহর প্রকাশ্য ইঙ্গিত দশ বছর পূর্বে—

"আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ সে যা উপার্জন করছে, তা তার কোন কাজে আসবে না।" কোরআন—১১১ ঃ ১-২

আবু লাহাব অর্থাৎ অগ্নিশিখার পিতা। আবু লাহাবের মৃত্যুতে আরবের বহু মহিলা কাঁদতে শুরু করল। তখন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তাদের তিরস্কার করল এই বলে—"কাঁদছ কেন, প্রতিজ্ঞা কর এব প্রতিশোধ নেবই।" যদিও তাঁর স্বামী জীবিত ছিল, কিন্তু তার পিতা উৎবা, ভাই ওয়ালিদ ও সাইবাহ আরও অনেক আত্মীয়-স্বজন বদর যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইহুদীদের গভীর ষড়যন্ত্র

তৃতীয় হিজরী

২৫ এপ্রিল ৬২৪ খ্রীঃ—১৪ এপ্রিল ৬২৫ খ্রীঃ

মদিনাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের গভীর ষড়যন্ত্র ঃ মক্কাতে মহম্মদ (দঃ) নিছক নির্জলা এক আল্লাহর দূত। সেখানে তাঁর বাণী বহন করাই ছিল তাঁর প্রধান কর্তব্য। তার জন্য সেখানে তাঁকে বহু অসুবিধা, বিপদ ও ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে সেখানে তাঁর ওপর এরূপ কোন দায়িত্ব ছিল না যে, তাঁকে মক্কার মুসলিমদের জীবন-ধন-মান ইত্যাদির দায়িত্ব বহন করতে হবে। সেখানে তাঁর শুধু একটাই কর্তব্য ছিল—সর্ব অবস্থায় আল্লাহর বাণী বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে। কিন্তু মদিনাতে দায়িত্ব এসে গেল দু'রকমের। প্রথম বা প্রধান দায়িত্ব তো ছিলই। অধিকন্তু আরও এল—মদিনার মুসলমান ও অমুসলমানদের ধন-মান রক্ষার গুরুদায়িত্ব। এমনকি আরব অবিশ্বাসীগণ একটি পবিত্র চুক্তি দ্বারা তাদের প্রতিনিধি উব্বাই মহম্মদ (দঃ)-কে শাসকরূপে মেনে নিয়েছিল।

বদর যুদ্ধের পর ইহুদীদের নতুন কৌশল ঃ বদর যুদ্ধের পর ইহুদীদের চোখ খুলে গেল। তারা নবী মহম্মদ (দঃ)-কে তাদের সামাজিক সুবিধা-অসুবিধার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষে তারা অনুধাবন করেছিল—তারাই আজ নবীর যন্ত্রে পরিণত হতে চলেছে। শিকার করতে গিয়ে নিজেরাই শিকার হয়ে যাচ্ছে। তারা চিন্তা করল সকলেই যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সমগ্র আরব দেশে ইহুদী রাজ্য স্থাপনের কি হবে। তারা চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত নিল, যে কোন উপায়েই হোক নবী মহম্মদ (দঃ)-এর চিন্তা বা প্রভাবকে প্রদমিত, প্রশমিত করতে হবে।

আরবদের চরিত্রের বড় গুণ হলো তারা যা করে সামনা-সামনি। প্রতারণা প্রবঞ্চনা কাকে বলে তারা জানে না। এই গুণই তাদের নিয়ে গিয়েছিল বীরত্বের এক চরম পর্যায়ে। যার জন্য তারা তাদের শত দোষ ঢেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

মদিনার ইহুদীগণ দেখল—দুর্ধর্ষ আরব বেদুইনদের সঙ্গে যুদ্ধ করল কিন্তু পরাজিত হল বীরের জাতি আরব বেদুইনগণ। সুতরাং সরাসরি যুদ্ধ করে মুসলমানদের আর হারানো যাবে না। এ কথা তারা মর্মে মর্মে অনুভব করল। তখন তারা ঠিক করল—নবী মহম্মদ (দঃ)-কে, তাঁর ধর্মকে, সমাজকে ভেতরে ভেতরে বিষাক্ত করে তুলবে এটাই তাদের বড় অস্ত্র এবং তারা তার ব্যবহার আরম্ভ করল।

ইহুদীদের প্রতারণা ও জালিয়াতি সম্পর্কে কোরআন ঃ আবদুল্লাহ বিন উব্বাইসহ কয়েকজন ইহুদী মুসলমান হল। কিন্তু মনে-প্রাণে নয়। "মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যারা বলে—আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী অথচ তারা বিশ্বাসী নয়। তারা (মনে

করছে) আল্লাহ্ ও বিশ্বাসীদের প্রতারণা করছে অথচ তারা নিজেদের ব্যতীত কাউকে প্রতারণা করছে না। কিন্তু এটা তারা বোঝে না।" কোরআন—২ ঃ ৮-৯

এর দ্বারা তারা দু'রকম উদ্দেশ্য সাধন করত। এক, মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় জানার সুযোগ পেত এবং অন্যান্য মুসলমানদের বিভ্রান্ত করারও সুযোগ নিত।

"তাহলে কেতাবীদের মধ্যে একদল বলে যে—বিশ্বাসীগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে সকালে তা বিশ্বাস কর ও বিকালে অবিশ্বাস কর। তাহলে তারা ফিরে যাবে।"

কোরআন—৩ ঃ ৭২

এই অধ্যায়ে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের মুনাফেকীর কথা বলে শেষ করা যায় না। কেননা ওই মুনাফেকী বা প্রতারণা যখন থেকে আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে চলছে আজও। কারণ ওটা তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। তারা মুসলমানদের মধ্যে কলহ-বিবাদ-ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে মনে মনে গভীর আনন্দ উপভোগ করেছে। এইজন্যই কোরআন শরীফ এদের মুনাফেকীন বলে আখ্যা দিয়েছে।

"নিশ্চয় মুনাফেকগণ নরকাগ্নির নিম্নস্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্য পাবে না।" কোরআন—৪ ঃ ১৪৫

"তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম, যে কারণে আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছে, তাদের শাস্তি স্থায়ী হবে।" কোরআন—৫ ঃ ৮০

প্রতারণার কোন ওষুধ নেই। আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের পাপকে ক্ষমা করতে পারেন কেননা তারা না জেনে ওটা করেছে, আর প্রতারকগণ জেনেশুনে বুঝে তবে করে। সুতরাং তাদের কোন ক্ষমা নেই।

রাজদ্রোহী—আল্লাহ্ নিন্দা ঃ যখন প্রতারকগণ নানাদিক থেকে মানুষের মন বিষাক্ত করে তুলছিল, সেই সময় কাব বিন আশরফ ও আবু আফাক নামক দু'জন এবং আস্‌মা বিন মাবওয়ান নামক একজন স্ত্রীলোকও তাদের সঙ্গে যোগ দিল, তারা সকলে মিলে সুন্দর সুন্দর গান লিখতে আরম্ভ করল—

নবীর বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে, তাদের স্ত্রী ও বিবাহযোগ্যা কন্যাদের বিরুদ্ধে, এমনকি আল্লাহর বিরুদ্ধেও গানগুলো শুনতে শ্রুতিমধুর, কিন্তু অতি কুৎসিত শব্দে ভরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল—রাজদ্রোহিতা সৃষ্টি করা, যার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

কিন্তু মুসলমানগণ নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে যাচ্ছিল যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে। এতে তাদের এতটুকু অসুবিধা ছিল না। তারা একদিন গোপনে ওই তিনজনকেই ইহজগৎ হতে পার করে দিল। যদিও এখানে মহানবীর কোন নির্দেশ ছিল না। এটা আল্লাহরই ইচ্ছানুযায়ী হয়েছে। কেননা নাখালাতে ওমাইয়ির বিন হাজরামিকে হত্যার ব্যাপারও স্বয়ং নবী নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য অন্য থাকায় মুসলমানগণ তাকে বধ করল।

ঠিক একই ঘটনা ঘটল মদিনাতেও। আল্লাহ্ নিজেই মুসলমানদের অন্তরে জাগিয়ে দিলেন ওইরূপ করতে। যারা নবীকে ভালবাসত নিজ প্রাণ অপেক্ষা, ধন অপেক্ষা, মান অপেক্ষা, পুত্র-কন্যা অপেক্ষা অর্থাৎ যে কোন জিনিস অপেক্ষা, তারা একদিন মহান

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সমাজ-জীবনের মহা ক্ষতিকারকদের নীরবে বিদায় দিয়ে দিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তাদের সত্যের পথে, শান্তির পথে চালনা করুন।

বনু কাইনুকা গোত্রে ইহুদীগণের প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঃ এক সময় বনু কাইনুকা গোত্রের ইহুদীরা মদিনায় বাস করত। ইহুদীদের মধ্যে এরা ছিল দুর্ধর্ষ, যুদ্ধনিপুণ ও ধনী বলে এদের খ্যাতি ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বনু কাইনুকা গোত্রের ইহুদীরা সর্বপ্রথম বিশ্বাঘাতকতা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। আবু আফাক ও কাব বিন আশরাফ নোংরা কবিতা লিখে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল।

একবার এক মুসলিম মহিলা নিজ কাজে পথ ধরে বাজারে যাচ্ছিলেন; যেখানে বনু কাইনুকা গোত্রের ইহুদীরা বসবাস করত। তখন ইহুদীরা ওই ভদ্রমহিলাকে উত্যক্ত ও অপমান করতে লাগল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ মহিলা, নিরুপায় হয়ে তাঁর পরিচিত এক স্বর্ণকারের দোকানে আশ্রয় নিলেন। একজন ইহুদী তাঁর পিছনে দাঁড়াল ও ভদ্রমহিলার চাদরের কোণ খুঁটিতে বেঁধে দিল। তিনি যখন উঠে দাঁড়াতে গেলেন তখনই তার শরীর হতে কাপড়টি খুলে পড়ে। ফলে মহিলা বিবস্ত্র হয়ে পড়েন, আর নরপিশাচরা হো হো করে হাসতে থাকে। তখন তিনি সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠলেন। এই চিৎকার শুনে একজন মুসলমান পথিক খোলা তরবারি হাতে ছুটে এসে মহিলার সম্ভ্রম রক্ষা করেন। এই সময় ইহুদীদের সঙ্গে তার বচসা বাধে, ফলে ইহুদীরা তাকে আক্রমণ করে। তিনিও আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইহুদীরা সংখ্যায় অধিক থাকায় তিনি নিহত হলেন। অবশ্য তাঁর তরবাবির আঘাতে একজন ইহুদীও প্রাণ হারায়।

এই ঘটনার কথা শুনে মদিনার আনসার ও মহাজেরগণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারা নীরবে ধৈর্য ধরে হযরত (দঃ)-এর আগমনের অপেক্ষায় থাকেন।

হযরত (দঃ) স্বয়ং বাজারে এসে কাইনুকা গোত্রের ইহুদীগণকে আহ্বান করলেন, তারা যেন মুসলমানদের ওপর কোন অত্যাচার না করে। এবং ইহুদীগণকে সম্বোধন করে বলেন, হে ইহুদীগণ, তোমরা আনুগত্য স্বীকার কর, অন্যথায় তোমরা কুরাইশদের মতো বিপন্ন হবে। হযরত (দঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম মহিলার নির্যাতন ও অবমাননা এবং তার রক্ষাকারী আনসার বীরের হত্যার একটি সুষ্ঠু মীমাংসা। যাই হোক ইহুদীরা হযরত (দঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করল না এবং তাঁর উপদেশও গ্রহণ করল না। বরং প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ দিল যে মোহাম্মদ কতকগুলো কুবাইশদের ওপর বিজয়ী হয়েছে বলে গর্বিত কিন্তু তারা যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ছিল। একবার আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেখুক তো। এরপর হযরত মহম্মদ (দঃ) বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন।

আবদুল্লাহ বিন উব্বাই ও বনু কাইনুকার নির্বাসনদণ্ড ঃ যখন বনু কাইনুকা মহানবীর নিকট আত্মসমর্পণ করল না তখন সকলেই বলে উঠল রাজদ্রোহী ইন্ধনকারীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক। কিন্তু মহানবী মৃত্যুদণ্ড চাইছিলেন না। এদিকে আবদুল্লাহ বিন উব্বাই তাঁদের জন্য মধ্যস্থতা করেছিলেন। অবশেষে উবাইদা বিন সামির নেতৃত্বে তাদের নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হল। তারা তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে

আরবের উত্তরদিকে ওয়াদি আল কোরাতে নির্বাসনদণ্ড লাভ করল, পরিশেষে সিরিয়া ও অন্যান্য স্থানে।

বদরের পর সতর্কতা ঃ বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হলো ঠিকই, কিন্তু মক্কা ও মদিনার মধ্যে কোন সদ্ভাব স্থাপন হলো না। বরং মক্কাতে দারুণ প্রস্তুতি চলতে থাকল পুনরায় যুদ্ধের জন্য।

আবু সুফিয়ানের সমগ্র বাহিনী যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কিনতে আরম্ভ করল। কুরাইশদের সঙ্গে বনু বকর ও অন্যান্য গোত্রগুলো মহানবীর বিরুদ্ধে যোগ দিল। এদিকে মদিনার ভিতরে ও বাইরে ইহুদীগণ মক্কার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ আরম্ভ করল। মহানবী সবকিছুই জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনিও আরব উপত্যকার নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন, যাতে তারা ওদের অঞ্চল দিয়ে আক্রমণের জন্য না আসতে পারে।

কুরাইশগণ সিরিয়াতে যাওয়া সুবিধাজনক নয় ভেবে ইরাকে বাণিজ্য করতে মনস্থ করল। তাতে তারা দু'রকম লাভ করতে চাইল—আর্থিক ও যুদ্ধের আঁতাত।

সাফওয়ান বিন উমাইয়া মক্কা হতে বাণিজ্য উপলক্ষে ইরাকের পথে যাত্রা করল ৬২৪-৬২৫ খ্রীঃ, শীতকালে। তখন জল বহনের কোন প্রয়োজন ছিল না। সাফওয়ানের দল নজদের মরুভূমিতে পৌঁছাল। যা মদিনা হতে বহু দূরে। সুতরাং মুসলমানদের আক্রমণের কোনই ভয় নেই। অধিকন্তু আরও সর্তকতা অবলম্বনের জন্য বনু বকর বিন ওয়াইলকে পথপ্রদর্শক হিসাবে নেওয়া হয়েছিল।

মদিনা হতে যায়েদ বিন হারিশ একশো অশ্বারোহী সহ ইরাকের পথে হাজির হলেন। মক্কাবাসী তাদের সমস্ত কিছু ফেলে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করল। এখানে মুসলমানগণ নানা সম্পদ লাভ করলেন। এই ধন-সম্পদ তখন মুসলমানদের অত্যন্ত প্রয়োজন। এসব আল্লাহরই দেওয়া দান রূপে তারা গ্রহণ করলেন।

মক্কা হতে অহরহ কুরাইশদের বিশাল প্রস্তুতির সংবাদ আসছে। মহানবী চিন্তিত হলেন। তিনি তাঁর অপরিসীম দূরদর্শিতায় বুঝতে পারলেন যদি কেউ নিজে নিজেই বিভক্ত হয় তাহলে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তাই তিনি মদিনার মুসলমানদের ভালবাসার একটি পরিবারে পরিণত করতে চাইলেন এবং তাই-ই করলেন।

মহানবী সঙ্গী ও অনুসারীদের উৎসাহিত করতে থাকলেন বিভিন্ন পরিবারকে পরস্পরের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করে। তিনি নিজের মেয়েদের বিবাহ দিলেন হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আলি (কঃ)-এর সঙ্গে। নিজে বিবাহ করলেন হযরত আবুবকরের ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যাকে। এইভাবে তিনি তাঁর আবেষ্টনীকে একটা দুর্গে পরিণত করলেন, যাকে কোনদিনই কেউ ভাঙতে পারেনি।

প্রতিশোধ ঃ মক্কার আকাশে-বাতাসে তখন শুধু একটি কথাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

চতুর্দশ অধ্যায়

ওহোদের যুদ্ধ—তৃতীয় হিজরী

বদর যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হওয়ার পর কুরাইশদের বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা শতগুণে বেড়ে গেল। তারা মুসলমানদের দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য যথাসাধ্য উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগল।

সুতরাং বিশিষ্ট আরব নেতাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হরব, জুবাইর বিন মুতিম, সাফওয়ান বিন উমাইয়া, ইকরামাহ বিন আবু জেহেল, হারিস বিন হিসাম, হাওয়াত বিন আবদুল ওজ্জা এবং আরও অনেকে দারুল নাদওয়াই-এ একত্রিত হলো এবং এমন ব্যাপকভাবে মহম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল, যাতে মুসলমানদের জয়ের কোন আশাই থাকবে না।

কেউ কেউ পরামর্শ দিল—স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিতে। তারা পুরুষদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে পূর্ব পরাজয়ের কথা এবং অনুপ্রাণিত করতে পারবে ভবিষ্যৎ জয়ের লক্ষ্যে। কেউ কেউ বলল, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিন উৎবা ছিল স্ত্রীলোকদের প্রধান। সে মুসলমানদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল. আবু সুফিয়ান যেমন প্রতিজ্ঞা করেছিল—প্রতিশোধ নেওয়ার পূর্বে সে কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করবে না। তার স্ত্রী হিন্দাও অনুরূপ প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল।

কুরাইশগণ সমরাভিমুখে যাত্রা করল। তিন হাজার সৈন্য। সাতশ লৌহবর্ম পরিহিত, ২০০ অশ্বারোহী এবং তিন হাজার উটসহ সকল রকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করল হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

মদিনা আক্রমণের সংবাদ—(৩য় হিঃ) ঃ সমগ্র অবিশ্বাসী কুরাইশদের মধ্যে মক্কাতে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জন্য একজনই সহানুভূতিশীল ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর নাম হযরত আব্বাস (রাঃ)। তিনি ছিলেন হযরতের চাচা। তিনিই মদিনাতে সংবাদটা পাঠালেন। তখন হযরত ছিলেন কুবাতে। তাঁর দূত তাঁর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দিল। যখন হযরত চিঠির সারমর্ম অনুধাবন করলেন, তখন তিনি মদিনাকে সতর্ক করে পাঠালেন—যাতে তারা তাদের উট ও ভেড়াগুলো মদিনার বাইরে না রাখে।

হযরত তাড়াতাড়ি কুবা হতে মদিনায় ফিরে এলেন এবং লোক পাঠালেন মক্কার খবরা-খবর আনার জন্য। তাঁরা তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন এবং হযরত আব্বাসের পাঠানো সংবাদকে যথাযথ বলে বর্ণনা করলেন। আস ও খাজরাজ গোত্র এবং প্রকারান্তরে প্রায় সকল মদিনাবাসীই সেই রাত্রে ভালভাবে ঘুমাতেও পারেননি—চিন্তা, ভাবনা ও ভয়ে। এমনকি হযরত মহম্মদ (দঃ) নিজেও কিছুক্ষণের জন্যে দ্বন্দ্ব ও দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। কেননা এক হাজার মুসলিম কি যুদ্ধ করতে পারে তিন হাজার দুর্ধর্ষ আরব বেদুইনের সঙ্গে? সম্মুখ যুদ্ধ যাদের কাছে তৃণবৎ, তারা একাই আসছে না, সঙ্গে আসছে আরব রমণীগণ।

তারা বাগ্মিতায়, কবিতা রচনায়, অনুপ্রেরণায় অদ্বিতীয়া। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে স্বয়ং হিন্দা—আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। তারা যেন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে আসছে না, তারা আসছে কোন একটি ঐতিহাসিক বধ্যভূমি রচনা করতে, কোন একটি খ্যাতনামা কসাইখানা তৈরি করতে। সেখানে বধ করা হবে, জবেহ্ করা হবে সকল মুসলমানদের এবং তাদের মধ্যমণি হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে। এই ভয়াবহ বীভৎস চিত্র মদিনাবাসীদের সামনে ভেসে উঠেছিল।

যুদ্ধের পূর্বদিন ঃ তৃতীয় হিজরী, ১৩ শাওয়াল, শুক্রবার, ৬২৫ খ্রীস্টাব্দ ২৫ জানুয়ারি।

ওহোদ যুদ্ধ সম্পর্কে দু'টি মত ঃ পরদিন মদিনাবাসীগণ চরম ভীতি নিয়ে শয্যা ত্যাগ করলেন। মক্কাবাসীরা ইতিমধ্যে মদিনা হতে মাত্র তিন মাইল উত্তর-পূর্বে ওহোদ প্রান্তে হাজির। হযরত মহম্মদ (দঃ) সকল মদিনাবাসীকে ডাকলেন, প্রশ্ন রাখলেন কিভাবে শত্রুদের মোকাবিলা করা হবে।

হযরতের নিজস্ব মত ছিল—মদিনাতে থেকে যুদ্ধের মোকাবিলা করা, এতে মদিনার সকল শ্রেণীর মানুষ যুদ্ধে সাহায্য করতে সক্ষম হবে। এই কথা শুনে আবদুল্লাহ বিন উব্বাই একমত হয়ে বললেন—হে আল্লাহর নবী, আমরা শহরে থেকেই শত্রুর মোকাবিলা করব। এবং আমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলেই বাড়ির ভেতর হতেও ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকবে। মদিনা আমাদের দুর্গের মতো সুরক্ষিত থাকবে। আমরা ইনশাল্লাহ জয়ী হবোই। ইহুদী আনসার মোহাজের সকল দলের সকল নেতাই একমত হলেন।

অন্য মত ঃ সকল মুসলমানের ছিল চিন্তার পূর্ণ স্বাধীনতা, এমনকি বাক্‌স্বাধীনতাও। যুবক দলকে তাদের মতামত বলতে বলা হল। তাঁরা অন্য মত দিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন—যাঁরা বদরে যুদ্ধ করেছিলেন—কিন্তু শহীদ হননি। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই বদর যুদ্ধে ছিলেন না, তাই তাঁদের একান্ত ইচ্ছা ছিল—যুদ্ধে খ্যাতনামা হওয়ার। এবং তাঁদের মনে একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁরা শহীদ হলে এপার থেকে ওপারে গেলেই জান্নাতে যাচ্ছেন।

তাঁদের কথা ঃ "আমরা কি আমাদের শত্রুদের চিন্তা করার অবকাশ দেব যে আমরা তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে ভীত ও মৃত্যু হতে দূরে থাকতে পছন্দ করছি। আমরা কি আমাদের জন্মভূমি ও বাসস্থানকে তাঁদের অনুগ্রহের ওপর ছেড়ে দেব। আমরা কি মদিনায় বন্দী হয়ে থাকব। যদি আমরা এরূপ করি তবে শত্রুদের সাহসকে দৈনন্দিন বাড়িয়ে তুলবে এবং তারা লুটের জন্য প্রলুব্ধ হবে। মহান আল্লাহ্ যিনি আমাদের বদরে জয়ী করেছিলেন তিনিই আমাদের ওহোদেও জয়ী করবেন। যদি আমরা মৃত্যুবরণ করি তবে জান্নাত লাভ করব। সুতরাং আমরা যুদ্ধ করব ও মরব আল্লাহর জন্যই।"

এই জ্বালাময়ী ভাষণ সকল যুবকের অন্তরকে স্পর্শ করল, অনুপ্রাণিত করল। তাঁরা সকলেই যেন এক ঈমানের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠলেন। বংশানুক্রমে তাঁরা সকলেই ছিলেন বীর পিতার পুত্র। তাতে যোগ দিয়েছে ইসলামের মহাশক্তি। কিভাবে আজ তাঁরা নিজেকে বন্দী করবেন।

এমনকি বয়স্ক লোকদেরও কেউ কেউ মৃত্যুকে বরণ করতে চাচ্ছিলেন। খাইসামা আবু সাদ বিন খাইসামা বললেন—"আল্লাহ্ আমাদের জয়ী করতে পারেন, কিংবা আমরা শহীদ হতেও পারি, আমি যুদ্ধের জন্য খুবই উৎসুক, কিন্তু বদরে দুর্ভাগ্যবশত যোগ দিতে পারিনি, আমার পুত্র সেখানে গিয়েছিল এবং সে সৌভাগ্যবশত অনন্তজীবন লাভ করেছে। গতকাল আমি তাকে স্বপ্নে দেখি। সে আমাকে বলছে—'হে পিতা আমাদের সাথে যোগ দিন, আমরা আপনার জান্নাতের সাথী হবো। আমি তাই-ই পেয়েছি যা আমার মহান আল্লাহ্ আমাকে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং দেখলাম সবই নির্জলা সত্য।' হে আল্লাহর নবী, আমি বয়স্ক মানুষ, তবুও আমি যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চাই।"

দেখা গেল, অধিকাংশ লোক বীরবিক্রমে যুদ্ধের মোকাবিলা করতে চায়। তখন হযরত তাঁদের সকলের অভিমতকেই অনুমোদন করলেন। হযরত সবসময় অধিকাংশের মতামতকেই প্রাধান্য দিতেন।

শুক্রবার জুম্মার নামাযের পর হযরত (দঃ) যুদ্ধযাত্রার সংবাদ ঘোষণা করলেন।

ওমর বিন খাত্তাব এবং আবুবকর (রাঃ) হযরতকে বর্ম পরিয়ে দিলেন। কিন্তু যাঁরা হযরতের মতের বাইরে মত দিলেন, তাঁদের মনে একটা ভীতির সঞ্চার হলো, এই ভেবে যে তাঁরা হয়তো কোন বড় রকমের পাপ করলেন। কিন্তু হযরত (দঃ) মোটেই কোন আঘাত পাননি। তিনি শুধু বলেছিলেন—"অপেক্ষা কর ও দেখ আমি যা আদেশ করি এবং সেটাকে অনুসরণ কর এবং আমরা (ইনশাআল্লাহ্) বিজয়ী হবো। তোমরা ধৈর্য ধর।" এবং হযরত (দঃ) সকলকে নির্দেশ দিলেন ওহোদের দিকে যাত্রা করার জন্য।

তিনি ইসলামের মধ্যে শাশ্বত জনমত ও গণতন্ত্রের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যেন দেশের যে কোন ব্যাপারে যে কোন শাসক তাঁর পারিষদবর্গ বা দেশবাসীর সঙ্গে অতি অবশ্যই আলোচনা করবেন এবং বেশির ভাগ মানুষ যা বলবেন, তিনি যেন অবশ্যই তাই করবেন।

যদিও তা তাঁর নিজের মতের বিরুদ্ধে যায়, কেননা হযরত (দঃ) আদি-অন্ত জেনেও সাধারণের মতটা গ্রহণ করলেন, যাতে পরবর্তীকালে সকলেই এই নীতিকে কঠোরভাবে মেনে চলে।

আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের প্রতারণা ও স্বপক্ষ ত্যাগ ঃ যখন মহম্মদ (দঃ) মদিনা থেকে খুব বেশি দূরে যাননি, তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই তাঁর ৩০০ ইহুদী অনুসারীদের নিয়ে মুসলমানদের ত্যাগ করলেন এই বলে যে, হযরত তাঁর কথা না শুনে কয়েকজন যুবকের কথা শুনলেন। যখন পরদিন সকাল হলো, হযরত (দঃ) দেখলেন আবদুল্লাহ বিন উবাই নেই, তাঁর তিনশ ইহুদী অনুসারীও নেই। অর্থাৎ হযরতের সঙ্গে থাকল মাত্র ৭০০ মুসলমান—তিন হাজার দুর্ধর্ষ কুরাইশদের বিরুদ্ধে। যাদের ৭০০ শুধু বর্ম পরিহিত সৈনিক। ৪ ঃ ৮৮।

ওহোদের যুদ্ধ-বিবরণ ঃ ২৬ জানুয়ারি, শনিবার, ৬২৫ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় হিজরীর ১৪ শাওয়াল হযরত মহম্মদ (দঃ) ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেন। তিনি এমনভাবে তাঁর লোকজনকে সাজালেন যাতে ওহোদ পাহাড় তাঁদের পেছনে থাকে। তিনি ৫০জনকে নিয়োগ

করলেন সংকীর্ণ গিরিসংকট পথে এবং কড়া নির্দেশ দিলেন—"এখানে সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত থাক, কারণ আমাদের ভয় আছে, তারা আমাদের পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে, সুতরাং আপন আপন স্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান কর। কোন অবস্থাতেই ঐ স্থান ছেড়ে যাবে না। যদি তোমরা লক্ষ্য কর—আমরা শত্রুকে পরাজিত করেছি এবং তাদের শিবির দখল করেছি, তবুও তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না। এমনকি যদি তোমরা দেখ আমরা শহীদ হচ্ছি তবুও তোমরা আমাদের সাহায্যের জন্য এক পা-ও এগিয়ে আসবে না। তোমাদের একমাত্র কাজ ঐ সংকীর্ণ গিরিপথে তাদের ঘোড়াগুলোকে তীরের আঘাতে ধরাশায়ী করা, কেননা ঘোড়া তীরের বিরুদ্ধে কোনদিনই জয়ী হবে না।" এরপর তিনি অন্যান্যদের নির্দেশ দিলেন, তাঁর আদেশ ছাড়া যুদ্ধ শুরু না করতে।

ওহোদ যুদ্ধে কুরাইশ সৈনিকদের ব্যবস্থাপনা ঃ ডানদিকে—খালেদ বিন ওয়ালিদ, বামদিকে একরামা বিন আবু জেহেল, মধ্যভাগে আবু সুফিয়ানের সাথে আবদুল ওজ্জা তালহা বিন আবু তালহা সৈনিকদের সামনে থেকে পেছনের দিক পর্যন্ত আসা-যাওয়ার জন্য, এবং নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাবার জন্য সৈনিকদের ভেতরে গলি রাস্তার ব্যবস্থা রেখেছিল, যে রাস্তাগুলো দিয়ে কুরাইশ সুন্দরীগণ যাতায়াত করবে, পুরুষ সৈনিকদের উত্তেজিত করবে।

ওহোদ যুদ্ধে হযরতের তরবারি ও আবুদুজান্নাহ ঃ উভয় দিক হতেই উভয় সৈন্যদলই প্রস্তুত। কুরাইশ সৈন্যগণ বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভীষণ হুংকার ছাড়ছে। অন্যদিকে মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্যে বিজয় ও জান্নাত লাভের জন্য আকুল প্রার্থনা করছেন। হযরত তাঁর তরবারিটি বের করে ডাক দিলেন, কে এই তরবারি বহন করবে? অনেকেই এগিয়ে এলেন—কিন্তু হযরত (দঃ) আবু দুজান্নাহ অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দিলেন না। তিনি তাঁর তরবারিটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন তাঁরই আবেদন মতো। তখন দুজান্নাহ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর দূত, এর দ্বারা কি কাজ সমাধা করব? হযরত (দঃ) বললেন—"শত্রুকে আঘাত কর যতক্ষণ ভেঙে না যায়।" আবু দুজান্নাহ একটি লাল পাগড়ী মাথায় পরিধান করলেন, এবং মুসলমান ও শত্রুকুলের মধ্যবর্তী পথে আপন স্বভাবসুলভ গর্বিত ভঙ্গিতে যাতায়াত করতে থাকলেন। যখন মহানবী (দঃ) তাঁকে এই ভাবে গর্বিত অবস্থায় ঘোরা-ফেরা করতে দেখলেন তখন বললেন, আল্লাহ্ কখনও এই গর্ব ও ঔদ্ধত্য ভাবকে পছন্দ করেন না, এই বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশ ব্যতীত।

কোরআন— ৪ ঃ ৩৬, ১৭ ঃ ৩৭, ২৮ ঃ ৭৬

ওহোদ যুদ্ধ আরম্ভ ঃ আস গোত্রের আবু আমির বিন সাফিকে কেন্দ্র করেই যুদ্ধ আরম্ভ হলো। আবু আমির তাঁর লোকজনকে পরিত্যাগ করে মক্কাবাসীদের সঙ্গে যোগদান করলেন। তিনি তাঁর পনেরজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে বের হলেন—এই চিন্তা নিয়ে সে আস গোত্রের অন্যান্য লোকজন তাঁর দেখাদেখি সকলেই মক্কাবাসীদের দিকে যোগদান করবে। এবং তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকলেন—হে আসবৃন্দ! আমি আবু আমির। তখন মুসলমানগণ বলতে থাকলেন—হে পাপী, তোমার চক্ষুকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত দান করুন। এইরূপে সাধারণভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

কুরাইশগণ প্রথম একরামার সঙ্গে একশজন অশ্বারোহীর সাহায্যে মুসলমানদের দক্ষিণ দিকটাকে একেবারেই বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করল, কিন্তু মুসলমানগণ তীব্রভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করলেন, যে পর্যন্ত না একরামা পড়ে গেল।

ঠিক অনুরূপভাবে খালেদ বিন ওয়ালিদও ডানদিক হতে বামদিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মহানবী যে সমস্ত তীরন্দাজ নির্ধারিত করেছিলেন, তাঁরা বহু অশ্বকে হত্যা করেন। ফলে শত্রুর দু-কুলই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

হামজা এবং আবু দুজান্নাহ মৃত্যু শব্দ করে সরবে আহ্বান দিতে থাকলেন। যারাই এ পথে এসেছে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আবু দুজান্নাহ একজনকে দেখলেন—যে ব্যক্তি চিৎকার করে মুসলমানদের গালাগালি করছে, তিনি তাকে বধ করার জন্য আপন তরবারি খাপ হতে বের করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলেন সে একজন মহিলা, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা, সঙ্গে সঙ্গেই তরবারি খাপযুক্ত করলেন। এইখানেই আরব মুসলিমদেব বীরত্বের মূল রহস্য নিহিত। মহাবীর হামজা কুরাইশদের পতাকাবাহীকে নিহত করলেন।

মহাবীর হামজার মৃত্যু বা শাহাদত বরণ ঃ জুবাইর বিন মুতায়িমের ওহশী নামে একজন নিগ্রো ক্রীতদাস ছিল। তিনি তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন একটি শর্তের ওপর যদি সে মহাবীর হামজাকে বধ করতে পারে। ক্রীতদাস ছিল পাথর নিক্ষেপে সিদ্ধহস্ত। সে মক্কাবাসীদের নিকট গেল এবং হামজাকে লক্ষ্য করল যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মক্কাবাসীদের হত্যা করছেন। যখন তাঁব দক্ষিণ হস্ত তরবারি চালাতে অবশ হয়ে আসছিল তখন তিনি বাম হাতে তববারি ধারণ করছিলেন। ক্রীতদাস তাঁর সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু মহাবীর হামজা তাকে মোটেই সন্দেহ করেননি। অকস্মাৎ সুযোগ বুঝে নিগ্রো তাঁর দিকে বর্শা নিক্ষেপ করল। সঙ্গে সঙ্গে মহাবীর হামজা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে শহীদ হলেন।

হানাজালা আবু সুফিয়ানকে হত্যার জন্য বের হলে তাঁর পেছন থেকে সাদদাদ বিন আসওয়াদ তাঁকে আক্রমণ করে এবং তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁদের মধ্যে নাদির বিন আস সাদবিন রাবি এবং আলি বিন আবু তালিব সমস্ত কুরাইশ পতাকাবাহীকে হত্যা করেন। এদের মধ্যে আটজনকে স্বয়ং আলি একাই হত্যা করেন। অবশেষে একজনও ছিল না কুরাইশদের পতাকা মাটি হতে তুলে নেওয়ার জন্য।

কুরাইশগণ ভীষণভাবে যুদ্ধ করেছিল, এমনকি তাদের প্রতিটি সৈন্যের পেছনে রেখেছিল একজন মহিলা, যারা অবিরাম বলছিল, "তোমরা কি আমাদের শত্রুদের হাতে দিয়ে যাবে!"

কিন্তু মুসলিম সেনাদের অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য এরূপ কোন নগ্ন মহিলা দলের প্রয়োজন ছিল না। এক আল্লাহর অনুপ্রেরণায় তারা ছিল চির অনুপ্রাণিত। বদর যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানগণ একবারও বাঁচার চিন্তা করেননি। তাঁরা মৃত্যুকে সামনে রেখেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। একশ অশ্বারোহীসহ তিন হাজার কুরাইশ সৈন্য। তবুও হযরত সামান্য সংখ্যক মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করলেন।

কুরাইশগণ ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। যে কয়েকজন থাকল তারাও প্রাণভয়ে পলায়ন করল। মুসলমানগণ তাদের পেছন ধাওয়া করে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন তাদের মাল-সম্পদগুলো অধিকার করতে।

মুসলিম তীরন্দাজদের মহাভুল ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) যে ৫০ জন তীরন্দাজকে পেছন গিরিপথে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি তাঁদের অত্যন্ত সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাঁরা যেন কোন অবস্থাতেই তাঁর বিনা অনুমতিতে ওই স্থান ত্যাগ না করেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন ময়দান পরিষ্কার এবং তাঁদের অন্যান্য ভাইগণ যুদ্ধ-সম্পদ অধিগ্রহণে ব্যস্ত, তখন তাঁরা আর লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। তাঁরাও ওই পথ অনুসরণ করলেন। তাঁরা তাদের নেতা আবদুল্লাহ বিন জুবাইয়ের কথায় কিছুতেই কর্ণপাত করলেন না। ওই স্থান ত্যাগে কোন বিপদ আসতে পারে এমন কোন সন্দেহই তাদের মনে এলো না। তারা যুদ্ধজয়ের মহানন্দে হযরতের সতর্কবাণীকেও বেমালুম ভুলে গেল। সেখানে আবদুল্লাহ বিন জুবাইয়ের সঙ্গে মাত্র ১১/১২ জন রয়ে গেল। বাকি সকলেই ওই সম্পদ সংগ্রহে যোগ দিল।

খালেদ বিন ওয়ালিদ এই সুযোগ লক্ষ্য করল এবং পাহাড়ের অন্যদিকে গিয়ে মাত্র ডজন খানেক তীরন্দাজকে দেখল, একরামা ও আবু সুফিয়ানকে মুসলমানদের এই দুর্বল মুহূর্তের সংবাদ দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষিপ্ত সকল কুরাইশ সৈন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে গেল।

মহানবীর নির্দেশ না মানায় আল্লাহর মহাপরীক্ষা

বিজয় বিপর্যয়ে পরিণত ঃ বিজয় বিপদে ও বিভ্রান্তিতে পরিণত হলো। আল্লাহর পথ ও ইচ্ছা চিরদিনই অপূর্ব। তিনি মুসলমানদের জয়ের একবার পরীক্ষা করেছেন। এখন পরাজয়ের পরীক্ষা করলেন। মদিনার বাইরে এই ওহোদ যুদ্ধে প্রথম দিকে হযরত সম্মতি দেননি। পরে তিনি যখন দেখলেন মুসলমানদের অধিকাংশই বাইরে যুদ্ধ চান তখন সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত ও মতামতকে মেনে নিলেন। কেননা, তিনি এক আল্লাহর ওয়াহেদানিয়াত ব্যতীত সকল বিষয়েই সবসময় আপস ভালবাসতেন। যে সমস্ত যুবক ও বৃদ্ধ বদর যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য কামনা করেছিলেন, তাঁরা আজ কোথায়, তাঁরা তো আল্লাহর সান্নিধ্য পেলেন না, বরং মোলাকাত হলো মাল-সম্পদের সঙ্গে। তাই আল্লাহ্ তাঁদের ইচ্ছাকে পরীক্ষা করলেন ও পূরণ করলেন। কে যেন পেছন থেকে পাঠালেন খালেদ বিন ওয়ালিদকে, আবু সুফিয়ান ও একরামা এলো অন্যদিক থেকে। অন্যান্যরা এলো সামনের দিক থেকে। চারিদিক থেকেই মুসলমানগণ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল। তখন মুসলমানগণ তাঁদের সম্পদ ফেলে তরবারি হাতে নিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কোথায় সেই শৃঙ্খলা, কোথায় সেই নেতার সতর্কবাণী। সমস্ত কিছুই যেন বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তিতে পরিণত হলো। এর একমাত্র কারণ তাঁরা তাঁদের মহান নেতা হযরতের নির্দেশ পালন করেননি। শত্রুপক্ষ দারুণ ও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করল। খালিদের অশ্বারোহী দ্বারা তীরন্দাজদের নেতা আবদুল্লাহ বিন জুবাইর তাঁর ১২ জন সহকর্মীসহ প্রাণ হারালেন। বিশৃঙ্খলা এতই ঊর্ধ্বে উঠেছিল যে, মুসলমানগণ নিজেদের লোককেও চিনতে না পেরে তাদের বধ করেছিলেন। এর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কি হতে পারে! এ ছিল নেতার নির্দেশ পালন না করার শোচনীয় পরিণতি ও চরম শিক্ষা।

বিপদাপন্ন অবস্থায় নবীজীবন ঃ মহানবী নিজেই বারোজন লোকসহ শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন। তখন মুসাব বিন উমাইর ইসলামের পতাকা ধারণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন হযরতের একান্ত নিকটে। তিনি দেখতেও ছিলেন কতকটা হযরতের মতো। তাই পেছন থেকে যখন ইবনে কামিয়া লাইছি তাঁকে আঘাত করল, তখন তিনি শহীদ হলেন। এদিকে কামিয়া মনে করল তিনি স্বয়ং হযরতকেই বধ করেছেন, তাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, মহম্মদ (দঃ) নিহত। পাহাড়ের ওপরে উঠে তার আপন লোকজনকে জানিয়ে দিল যে মহম্মদ (দঃ) নিহত। তখন অবিশ্বাসীরা আনন্দে নাচতে আরম্ভ করল। এদিকে এই সংবাদে মুসলমানগণ বজ্রাহত হলেন। কিন্তু কাব বিন মালেক যিনি হযরতের নিকটেই ছিলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে সকল মুসলমানকেই জানাতে থাকলেন—মহম্মদ (দঃ) জীবিত। তোমরা যে যেখানে আছো সকলে এখানেই চলে এসো। এবং স্বয়ং হযরত নিজেও তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে সকল মুসলমানকে জানিয়ে দিলেন—"হে আল্লাহর বান্দা, তোমরা যে যেখানে আছো সত্বর আমার দিকে চলে এসো। আমি আল্লাহর দূত।"

হযরত নিজেই যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু ঃ মুহূর্তের মধ্যে শত্রুমিত্র সকলেই হযরতের দিকে ধাবমান হলো। কিন্তু শত্রুকুলই আগে হাজির হলো। কেননা তারাই নিকটে ছিল। তারা ছিল এক জায়গায় এবং মুসলমানগণ ছিলেন বিক্ষিপ্তভাবে। আবদুল্লাহ বিন শেহাব নামে এক হতভাগ্য নরপশু অবিশ্বাসী অতি দ্রুত হযরতের নিকট হাজির হলো এবং তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে পাথর ছুঁড়ে আঘাত করল, তখন ওই কামিয়াও বেশি দূরে ছিল না। সে তার আপন ভুল বুঝতে পারল যে হযরতকে হত্যা করা হয়নি। তাই দ্রুত এসে হযরতের মাথায় আঘাত করল। হযরতের লৌহবর্ম তাঁকে রক্ষা করল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর বর্মের দুটো শলা তাঁর ওপর চোয়ালে ঢুকে যায়। তখন ওবাইদা বিন জারাহ তাঁর আপন দাঁত দ্বারা ওই রিং দুটোকে বের করে ফেলেন। এই আঘাতে হযরতের চারটি দাঁত নড়ে যায়। এতে ওবাইদারও দুটো দাঁত চিরতরে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হযরতের সমগ্র জীবনে এ ছিল এক মহাক্ষণ।

আল্লাহর সাহায্যও অতি নিকটে ছিল। সকল অনুসারীগণ অতি দ্রুত তাঁর নিকটে এসে হাজির হলেন। প্রত্যেকেরই রক্তাক্ত দেহ। রক্তাক্ত তরবারি কিন্তু সকলেই যদি শহীদ হতেন তবুও আল্লাহর প্রিয়জন হযরত (দঃ) নিশ্চয়ই রক্ষা পেতেন। কেননা তাঁর জীবন-রক্ষাকারী স্বয়ং আল্লাহ্। অতি সত্বর সকলেই হযরতের চারপার্শ্বে এক পরিবেষ্টনী রচনা করলেন।

আবু দুজান্নাহ সাদ বিন ওয়াক্কাস, আবু তালহা জুবাইর আবদুর রহমান বিন আউফ সকলে সম্মিলিতভাবে হযরতের চারপাশে দাঁড়িয়ে একটা প্রাচীর গড়ে তুললেন। জায়েদ আনসারি এবং তাঁর পাঁচজন সহকর্মী এই প্রতিরক্ষায় প্রাণ হারালেন। এমনকি উম্মে ওমরা নামক একজন মহিলাও এই প্রতিরক্ষার্থে তাঁর হাত হারিয়েছিলেন।

হযরতের জীবননাশের জন্য এইভাবে নানাদিক থেকে নানা চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছিল ইসলামের বীর যোদ্ধাদের অকৃত্রিম প্রচেষ্টায়। এই সময় একজন অবিশ্বাসী

হযরতের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করেছিল। যার ফলে তাঁর ঠোঁট কেটে যায় ও নিচের একটি দাঁতও নষ্ট হয়ে যায়। এই সময় হযরত পিছনের দিকে হটে যাওয়ার সময় একটি পা গর্তে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আলি, আবুবকর ও তালহা তাঁকে তুলে ধরেন।

এইভাবে যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করল। হযরত তাঁর লোকদের নিকটবর্তী কোন একটি উঁচু স্থানে ওঠার নির্দেশ দিলেন। আবু সুফিয়ান তা লক্ষ্য করল। মহানবী ওমর বিন খাত্তাবকে আদেশ দিলেন—তাকে বাধা দেওয়ার জন্য। ওমর বিন খাত্তাব তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ধাওয়া করলেন। এবং আবু সুফিয়ান ও তাঁর লোকদের পাহাড় হতে নামতে বাধ্য করলেন।

এইভাবে হযরতের উঁচু স্থান নির্দেশে মুসলমানগণ অতি দ্রুত একই স্থানে একত্রিত হলেন। তখন কুরাইশগণও ক্লান্ত। অধিকন্তু দেখল মুসলমানগণ এখন একত্রিত। তাই আক্রমণ বন্ধ হলো।

কিন্তু বিপদ কাটেনি। উবাই বিন খালাফ প্রতিজ্ঞা করেছিল হযরতকে হত্যার। সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য একটি ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে আসছিল। হযরত তাকে লক্ষ্য করে তাঁর লোকদের নিষেধ করলেন তাকে বাধা দিতে। এইভাবে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলে হযরত হারিস বিন সিম্মার বর্শাটি দ্বারা তার ঘাড়ে এমন একটি আঘাত দিলেন, সে চিৎকার করে পলায়ন করে।

এদিকে হযরত নিজেও ক্লান্ত। তিনি তাঁর লোকজন নিয়ে নিকটবর্তী একটি গিরিসংকটে আশ্রয় নিলেন। যেখানে আলি বিন আবু তালিব তাঁর ক্ষতস্থান বিধৌত করলেন। আবু সুফিয়ান নিকটে এসে গর্ব ভরে বলতে থাকল—এখানে কি মহম্মদ আছে? হযরতের নির্দেশমতো মুসলমানগণ নীরব থাকলেন। এরপর বলে উঠল—এখানে আবুবকর ও ওমর আছে? কোন উত্তর না আসায়, নিজেই বলতে থাকল— সব শেষ হয়ে গেছে। তখন হযরত ওমর নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে বলে উঠলেন—"হে আল্লাহর শত্রু, আমরা সকলেই জীবিত আছি।" আবু সুফিয়ান তখন হতভম্ব। তবুও গর্ব ভরে বলে উঠল—আলা হুবাল আলা হুবাল (হুবালই সর্বশ্রেষ্ঠ)। তখন মহানবী ওমরকে বলতে বললেন—"আল্লাহ্ আলা—আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই মহান।" তখন আবু সুফিয়ান বলে উঠল—"লানা ওজ্জা ওয়ালা ওজ্জা লাকুম।" আমাদের জন্য ওজ্জা আছে, তোমাদের জন্য নেই। তখন মহানবীর নির্দেশমতো ওমর (রাঃ) বললেন—আল্লাহ্ মাওলানা, ওয়ালা মাওলানা লাকুম—আল্লাহ্ আমাদের রক্ষক, তোমাদের কেউ নেই। আবু সুফিয়ান বলে উঠল—আজকের যুদ্ধ বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ। তখন ওমর (রাঃ) বলে উঠলেন, না। আমাদের মৃতগণ স্বর্গে আর তোমাদের নরকে। আবু সুফিয়ান বলে উঠল—আগামী বছরে আবার বদরে সাক্ষাৎ করব। হযরতের নির্দেশমতো ওমর উত্তর দিলেন—ঠিক আছে, আগামী বছর নির্ধারিত থাকল।

শহীদের অঙ্গহানি ঃ মক্কার কুরাইশগণ এতই নিষ্ঠুর ও এতই নির্দয় ছিল, তারা মুসলিম শহীদদের অঙ্গহানি করতেও কাপুরুষতা অনুভব করেনি। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা মহাবীর হামজার মৃতদেহ হতে কলিজাকে বের করতে চেষ্টা করে। এবং আরও অনেক শহীদের প্রতি তারা এই নির্মম কাপুরুষতা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তারা একটি মুসলমান তো দূরের কথা, মুসলমানদের একটি প্রাণীকেও বন্দী করে মক্কায় নিয়ে যেতে পারেনি।

মক্কাবাসীরা চলে যাওয়ার পর হযরত নিজ পক্ষের শহীদদের কাফন দাফন সমাধা করেন। মক্কাবাসীদের এই দারুণ ঔদ্ধত্য ও গর্বের জন্য তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েও একমাত্র তাঁর মতোই অসীম ধৈর্যশীল পুরুষের মুখে বের হয়েছিল—সময় এলে ওদের বোধোদয় হবে।

দয়ার নবী

ডাকিলে নিবিড় ভাবে নিখিল নিদান—
দাও আল্লাহ্ অবুঝেরে বোধশক্তি দান।
যে কাজ করিল তারা অবুঝ মনে
তুমি তাদের ক্ষমা কর আপন গুণে।
যার লাগি নির্যাতন যত নিপীড়ন—
অন্যায় অবিচার করিতে দমন।
সকল কাজেতে পেলে সহস্র ব্যাঘাত
অন্যায় ষড়যন্ত্র গোপন আঘাত।
তায়েফের মরুপথে নির্যাতিত নবী
ওহোদ প্রান্তরে তুমি নিপীড়িত ছবি।
জীবন হয়েছে যবে ওষ্ঠাগত
বাধার কণ্টকেতে ক্ষতবিক্ষত।
তখনও নিবিড় প্রাণে অবিরাম ধ্যান—
দাও প্রভু অবোধেরে বোধশক্তি জ্ঞান। —কাব্যকানন

"ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর ভালর দ্বারা। ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে। এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয়, যারা ধৈর্যশীল। এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান।" কোরআন—৪১ ঃ ৩৪-৩৫

ওহোদে মুসলমানদের নৈতিক জয় ঃ ওহোদ যুদ্ধের মুসলমানগণ নানাদিক থেকেই ছিল চরম অভাবী। তাঁদের এমন বস্ত্র ছিল না যে তাঁরা তাঁদের শহীদ ভাইদের দেহগুলোকে কাফন দ্বারা আবৃত করে। তাদের ছিল মাত্র দুটো ঘোড়া—কুরাইশদের দু'শো ঘোড়ার বিরুদ্ধে। তিন হাজার কুরাইশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে ছিল মাত্র ৭০০ সৈন্য। অথচ এই যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়ী হলেন।

কুরাইশদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না। এই যুদ্ধে কুরাইশ সৈন্যদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল হযরতকে হত্যা করা। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছিল। মুসলমানগণ যেদিক থেকেই হোক, যে কোন প্রকারেই হোক, হযরতকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন—আল্লাহর সাহায্যে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় বদরের মতোই হতো যদি তাঁরা তাঁদের মহান নেতার নির্দেশ পালন করতো। কিন্তু তা তাঁরা পারেননি। সুতরাং না পারার মাশুল বহন করতেই হবে। কারণ ইসলামের আল্লাহ্ ন্যায়বিচারক। মুসলিম তীরন্দাজগণ মহানবী বা তাঁদের নেতার কথায় কর্ণপাত না করে যে মহাপাপ করেছিলেন তার মাসুল বহন করলেন। এঁতে মুসলমানদের

জন্য বিরাট শিক্ষা নিহিত রয়ে গেল। ওহোদ যুদ্ধ উভয় পক্ষেরই জয়-পরাজয়ের সংমিশ্রণ ঘটে। কুরাইশগণের উদ্দেশ্য ছিল—বদরের প্রতিশোধ নেওয়া। সে উদ্দেশ্য যেদিক দিয়েই হোক, যে কারণেই হোক কিছুটা সফল হয়েছে। আবার মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল—পরাজয় যেন না হয়। মুসলমানদের উদ্দেশ্যও সাধিত হয়েছে। যাদের শাহাদত বরণের ইচ্ছা ছিল। তারাও বরেণ্য হয়েছেন। এই যুদ্ধে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তি প্রাণ হারালো। ১৭ জন বিশিষ্ট কুরাইশ ব্যক্তি মারা যায়—ওয়ালিদ বিন আসি, আবু উমাইয়া আবি হুজাইফার পুত্র হাশিম উব্বাই বিন খালাফ, আবদুল্লাহ বিন হামিদ আসদি, তালহা বিন আবি তালহা, আবু সায়িদ বিন আবু তালহা, তালহার পুত্র মাসাফি ও জালাস, আরতাব বিন সুহরা হাবিল ও অন্যান্যগণ।

মুসলমানদেরও কম ক্ষতি হয়নি। হামজা ও অন্যান্য মুসলমানদের মৃত্যুতে হযরত যে আঘাত পেয়েছিলেন তা প্রকাশ করার নয়। কুরাইশগণ মক্কায় ও মহানবী মদিনায় ফিরলেন। সমগ্র রজনী তিনি ধ্যানযোগে কাটিয়ে যখন সকালে উঠলেন তখন দেখা গেল জগতের কোন গ্লানিই যেন তাঁকে স্পর্শ করেনি। যেন নতুন জীবন নব-উদ্দীপনায় উদ্ভাসিত। এমনই ছিল তাঁর অসাধারণ চরিত্রবল।

১২ শাওয়াল ৩ হিজরী
২৭ জানুয়ারি ৬২৫ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার

পশ্চাদ্ধাবন ঃ মদিনার পথে হযরত হামরা আল আসাদ নামক স্থানে তাঁবু খাটালেন। এদিকে আবু সুফিয়ান মক্কার পথে রাওহা নামক স্থানে তাঁবু খাটালেন। সকালবেলায় হযরত সকলকে ডাকলেন—কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা যাবে মদিনাতে। আবু সুফিয়ান সংবাদ পেল মহম্মদ (দঃ) আবার ফিরে আসছেন। মাবাদ আল খুজায়ী নামক এক ব্যক্তি মদিনা হতে মক্কার পথে যাচ্ছিলেন, তিনি তখনও অবিশ্বাসী। আবু সুফিয়ান তাঁর নিকট হতে মহম্মদ (দঃ)-এর খোঁজ-খবর নিলেন। তিনি বললেন—মহম্মদ (দঃ) তাঁর সঙ্গী-সাথীদের দিয়ে আপনার পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়ে পড়েছেন। তাঁর সঙ্গে এত সৈন্য-সামন্ত যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। সকলেরই আক্রোশ আপনার ওপর। এতে আবু সুফিয়ান খুবই দ্বিধান্বিত অবস্থায় পড়লেন। তিনি যদি মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে সমগ্র জাহান বলবে—আবু সুফিয়ান কাপুরুষ। এবং যদি যুদ্ধের সম্মুখীন হন, এবং হেরে যান, তাহলে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ মাঝমাঠে মারা যাবে।

সুতরাং তিনি তাঁর কয়েকজন অশ্বারোহীকে মহানবীর অনুসন্ধানে পাঠালেন। মহানবী কোন প্রকার ভয়ে ভীত না হয়ে একটি স্থানে অপেক্ষা করতে থাকলেন। রাত্রিকালে আগুন জ্বালাতেন, যাতে শত্রুপক্ষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়। অবশেষে আবু সুফিয়ান ভগ্ন মনোরথ অবস্থায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এদিকে হযরতও ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করলেন মদিনায়।

ওহোদ যুদ্ধ সম্পর্কে কোরআন ঃ কোরআন শরীফের তৃতীয় সূরা ইমরানে এই যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এই যুদ্ধে যোগদানের জন্য আহ্বান জানালে বনু সালেমা ও বনু হারিসা অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। "এবং যখন তুমি বিশ্বাসীগণকে যুদ্ধার্থে ঘাঁটিতে স্থাপন করার জন্য প্রভাতে স্বীয় পরিজন হতে বের হয়েছিলে এবং আল্লাহ্ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক ছিলেন। আল্লাহর প্রতি বিশ্ববাসীগণ যেন নির্ভর করে।" কোরআন—৩ ঃ ১২১-১২২

এরপরও ওহোদ যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ্ কতিপয় আয়াত দ্বারা মুসলমানদের সান্ত্বনা দান করেন। "এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য একে সুসংবাদ ব্যতীত করেননি ও এর দ্বারা তোমাদের অন্তর যেন আশ্বস্ত হয়। এবং পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহর নিকট ব্যতীত সাহায্য নেই। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তিনি এইরূপে তাদের একাংশকে কর্তিত করেন অথবা তাদেরকে দুর্বল করেন। যাতে তাঁরা অকৃতকার্যতা সহকারে ফিরে যায়। এই কাজে তোমার কিছুই করণীয় নেই, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন। কারণ তারা সীমালঙঘনকারী।" কোরআন—৩ ঃ ১২৭-১২৮। "তোমরা শিথিল হয়ো না ও বিষণ্ণ হয়ো না। তোমরাই সমুন্নত যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।" কোরআন—৩ ঃ ১৩৯

"কষ্ট বিপদ ধৈর্য সৎসাহস এই সমস্তগুলোই বিশ্বাসীকে অবিশ্বাসী হতে পৃথক করে দেয়। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আল্লাহ্ এইভাবে তাদের নির্মল করেন ও অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করেন। তোমবা কি মনে কব তোমরাই স্বর্গে প্রবেশ করবে। যারা ধর্মযুদ্ধ করে ও যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য হতে এখনও তাদেরকে প্রকাশ করেননি।"

কোরআন—৩ ঃ ১৪১-১৪২

কুরাইশদের পরাজয় ও মুসলিম তীরন্দাজদের ভুল সম্পর্কে কোরআন শরীফ—"এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের স্বীয় অঙ্গীকার সত্য করলেন যখন তোমরা তাঁর আদেশে সাহস না হারানো পর্যন্ত ঝগড়া করছিলে এবং অবাধ্য হয়েছিলে, তৎপর তোমরা যা (বুটি) ভালবেসে ছিলে, তা তিনি তোমাদের দেখালেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কামনা করছিল। তৎপর তিনি তোমাদের পরীক্ষার জন্য বিরত করলেন ও নিশ্চয় তোমাদের ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল।" কোরআন—৩ ঃ ১৫২

মুসলমানদের জয় যখন পরাজয়ে পরিণত হলো, লব্ধ সম্পদ যখন হারিয়ে গেল, তখন তাঁরা বিষণ্ণ। তাঁদের এই বিষণ্ণ মুহূর্তে কোরআন—

"যখন তোমরা ওপরেব দিকে পালাচ্ছিলে এবং পেছনে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না। যদিও রসুল তোমাদের পেছন থেকে আহ্বান করেছিলেন, পরে তোমাদের তিনি দুঃখের ওপর দুঃখ দিলেন কিন্তু যা অতীত হয়েছে এবং তোমাদের ওপর যা আসেনি, তার জন্য দুঃখ করো না এবং তোমরা যা করছো আল্লাহ্ তা অবহিত।" কোরআন—৩ ঃ ১৫৩ "তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হলে অথবা মৃত্যু বরণ করলে—যা তারা জমা করে আল্লাহর ক্ষমা এবং দয়া তা অপেক্ষা শ্রেয়।" কোরআন—৩ ঃ ১৫৭

ওহোদ যুদ্ধের শিক্ষা ঃ ১। সেনাপতি বা নেতার আদেশ মানা একান্ত প্রয়োজন। ২। অবাধ্যতার ফল শুধু একজনের ওপর পড়ে না, পড়ে অপরাধী নিরপরাধ সকলেব ওপর। "তোমরা সেই অশান্তিকে ভয় কর যা কেবল তোমাদের মধ্যে অত্যাচারীদেরই স্পর্শ করবে না।" কোরআন— ৮ ঃ ২৫। "সমগ্র মুসলমান একটি দেহ একটি মানুষ।"—হাদিস। ৩। পরাজয় ও জয়ে পরীক্ষিত হয় মানুষের সাহস, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা। ৪। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, সকলেরই একই আল্লাহ্ তিনি বিচারক ন্যায়পরায়ণ. যেটা যার প্রাপ্য তিনি তাকে

ততটুকুই দেন। কুরাইশগণ চেয়েছিল প্রতিশোধ, তারা তাই পেয়েছে, মুসলমানগণ চেয়েছিলেন—শাহাদৎ ও জয়, তাঁরা তাই পেয়েছেন, ইহুদীগণ চেয়েছিল আত্মরক্ষা, তারা তাই পেয়েছে। এইভাবে আল্লাহ্ মানুষকে তার আপন আপন আকাঙক্ষা ও সাধনা অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকেন। ৫। সমস্ত কিছুর শেষ ফল এক আল্লাহর হাতে। সেখানে তিনি যা করেন তাই হবে। তবে তিনি শুধু পরীক্ষা করেন, সাধনা লক্ষ্য করেন, "কিন্তু তিনি চান তোমাদের একেকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে।" কোরআন—৪৭ ঃ ৪। ৬। কোন সময়ই শত্রুকে দুর্বল ভেবে তাচ্ছিল্য করা ঠিক নয়। এতে আত্মশ্লাঘা বা অহঙ্কার প্রকাশ পায়। যা পতনের মূল। ৭। বদর যুদ্ধের জয়ে মুসলমানদের মনে কোথায় যেন একটু আত্মশ্লাঘা এসেছিল। পবিত্র কোরআনে সেটা বোঝা যায়। কোরআন—৮ ঃ ১৭ । এবং অহঙ্কারীদের পরাজয় অনিবার্য। কোরআন—৪ ঃ ৩৬, ৭ ঃ ১৪৬, ১৭ ঃ ৩৭, ২৮ ঃ ৭৬, ৩০ ঃ ১১০, ৩১ ঃ ১৮, ৩৯ ঃ ৭২, ৫৭ ঃ ২৩

কুরাইশদের অমানুষিক আনন্দ ঃ যখন আবু সুফিয়ান মক্কাতে ফিরে এল, মক্কাবাসী যখন শুনল—মহাবীর হামজা নিহত, তখন তারা মহানন্দে নৃত্যরত। যখন তারা শুনল—কুরাইশগণ মৃতদেহগুলো নিয়ে যা করেছে, তাতে তারা মহাখুশি।

৩য় হিজরীর অন্য ঘটনা ঃ এই বছরে হাসান (রাঃ) বিন আলি বিন আবু তালিব জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মহম্মদ (দঃ) এই বছরের বাকি দিনগুলো ইসলামের নীতি শিক্ষা দিতে থাকেন। এবং কোরআন শিক্ষা দেন ও তিনি লোকদের তা অনুশীলন করতে বলেন। এইভাবে তিনি মদিনাতে দুবছর নয় মাস পনেরো দিন কাটান। একদিন উদ্বাস্তুরূপে এসে তিনি পরবর্তীকালে ওই প্রদেশের শাসনকর্তা রূপে সম্মানিত হন, এবং তাঁর শত্রুপক্ষ তাঁকে পরাজিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলো। এদিকে হযরত মহম্মদ (দঃ) সদাই মরতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি জীবিত থেকে সকল কিছুকেই জয় করেছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইহুদীদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা

চতুর্থ হিজরী

১৩ এপ্রিল ৬২৫ খ্রীঃ—৪ এপ্রিল ৬২৫ খ্রীঃ

ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় দেখে শুধু যে ইহুদী ও মক্কার কুরাইশগণই খুশি হয়েছিল তা নয়, সমগ্র আরব দুনিয়াও মুসলমানদের দুর্বলতা অনুভব করেছিল। ইহুদীগণ অতর্কিতে তাদের সমর্থন তুলে নিয়ে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে। সেখানে কয়েকজন মুসলমান একাকী কি করতে পারে? ওহোদের যুদ্ধে কতকগুলো বালক শুধু সংখ্যাপূরণই করেছিল।

আবু সালমার অভিযান (১ম মহরম ৪র্থ হিঃ) ঃ আরবগণ জন্মগতভাবে যুদ্ধ ও লুণ্ঠনপ্রিয় ছিল, বনু আসাদ গোত্রের খাওয়ালিদের পুত্র তুলাইহা ও সালমা নবী মহম্মদ (সাঃ)-এর দুর্বলতার সুযোগ নিতে প্রথম চেষ্টা করে। তারা অনবরত আরবদের মধ্যে প্রচার করল—মহম্মদ (দঃ) দুর্বল, সুতরাং মদিনায় গিয়ে মুসলমানদের ধনরত্ন লুট করার এটাই মহা সুযোগ।

এই সংবাদ নবী মহম্মদ (সাঃ)-এর কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ১লা মহরম দেড়শো জনের এক অভিযান প্রেরণ করলেন। এই অভিযানের নায়ক ছিলেন আবু সালমা বিন আবুল আসাদ। এই অভিযানে আরও কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিও ছিলেন—আবু উবাইদা বিন জারাহ, সাদ্ বিন ওয়াক্কাস এবং উসায়িদ বিন হুজাইর।

হযরত তাদের দিনের বেলায় যাত্রা নিষেধ করেছিলেন। দিনের বেলায় কোথাও গোপনে থাকার নির্দেশ দিলেন। এবং রাতের বেলাতেও পরিচিত পথে যেতে নিষেধ করলেন। আবু সালমা নিরাপদে তার বাহিনীকে নিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছালেন। শত্রুগণের সঙ্গে অতর্কিতে দেখা হলো। শত্রুকুল বনু আসাদ সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্ধাবন করল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিস নিয়ে যেতে না পারায় কিছু কিছু প্রাণের ভয়ে ফেলে রেখে গেল। সেখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলো না। আবু সালমা শান্তির সঙ্গে ফিরে এলেন। তিনি ওহোদ যুদ্ধে দারুণভাবে আঘাত পেয়েছিলেন। ওই আঘাতের ফলে তিনি কিছুদিনের মধ্যে মারা যান।

৫ মহরম ৪র্থ হিঃ, ১৭ এপ্রিল ৬২৫ খ্রীঃ ঃ হযরতের কর্ণগোচর হলো খালিদ বিন সুফিয়ান বিন নুবাইয়া অথবা আরানা মদিনা লুণ্ঠের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু তখন মহানবীর হাতে পাঠাবার মতো কোন সৈন্য-সামন্ত ছিল না। তবুও এই দুর্ঘটনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে। নতুবা সমগ্র আরব মদিনার ওপর লেলিহান ক্ষুধায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। মহানবী আবদুল্লাহ বিন উনায়িসের ওপর এই কাজের ভার দিলেন। উনায়িস অসীম সাহসিকতার সঙ্গে মক্কা গমন করলেন, যথাসময়ে খালিদের সঙ্গে দেখা করলেন। জানতে পারলেন তার

আপন কথাতেই সে প্রস্তুত হচ্ছে মদিনা আক্রমণের জন্য। তখন আবদুল্লাহ বিন উনায়িস খালেদকে বধ করলেন ও ২৩ মহরম নিরাপদে মদিনায় প্রস্থান করলেন।

ছ'জন মুসলিম ধর্মপ্রচারক বধ ঃ ৪র্থ হিজরীর দ্বিতীয় সফর মাসে বনু আসাদ গোত্রের সাতজন মদিনাতে গিয়ে মহানবীকে অনুরোধ করলেন—ধর্মপ্রচারক পাঠাতে।

মহানবী তার পূর্বেই বহু স্থানেই ধর্মপ্রচারক পাঠাতে শুরু করেছেন। এমনকি মদিনাতে পূর্বেই বারোজনকে পাঠিয়েছিলেন। ছ'জন ধর্মপ্রচারক বনু হুজাইল গোত্রের নিকট পৌঁছালেন। তারা সেখানে দু'শো জন ছিল। এই ছ'জনের তিনজনকে তারা সঙ্গে সঙ্গেই বধ করল। একজন তখনকার মতো রেহাই পেলেও পরে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে নিহত করা হয়। দু'জনকে বন্দী করে পরে মক্কাবাসীদের নিকট বিক্রি করা হয়। তাদের একজন ছিলেন—জায়েদ বিন দাছাইনা। তাকে বিক্রি করা হয় সাফিয়ান বিন ওসাইয়ার নিকট। সে তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চাকর নাস্‌তাস্‌কে হুকুম দেয় তাকে বধ করতে।

যখন জায়েদকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন আবু সুফিয়ান বিন হরব তাঁকে বলল—"হে জায়েদ, আমি নিশ্চয় তোমাকে রক্ষা করতে পারি। যদি তুমি পছন্দ করো তোমার স্থানে মহম্মদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হোক।" তখন জায়েদ উত্তর দিলেন—মহানবীব মস্তক বিচ্ছিন্ন করা বহু দূরের কথা, তাঁকে একটি ক্ষুদ্র পাথরের আঘাতের বিনিময়েও আমি আমার প্রাণ রক্ষা করতে চাই না। আবু সুফিয়ান বিস্ময় বোধ করলেন। এবং বললেন, পৃথিবীতে একজনকেও দেখিনি মহম্মদ (দঃ)-এর মতো, যাঁকে তাঁর সঙ্গীরা এত ভালবাসলেন। জায়েদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হলো।

এবার ষষ্ঠ ব্যক্তি হযরত খুবাইয়ের পালা। তাঁকে ফাঁসির মঞ্চে ঝোলাবার ব্যবস্থা কবা হলো। যাতে সমস্ত মক্কাবাসী বুঝতে পারে তার পরিণতি। ওই মহাক্ষণে খুবাইর মাত্র দুরাকাতে নামায পড়ার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু নামায অত্যন্ত সংক্ষেপে সারলেন। যাতে মক্কাবাসীগণ মনে না করে মৃত্যুভয়ে নামায দীর্ঘ করছেন। প্রশান্ত চিত্তেই তিনি শাহাদত বরণ করলেন।

ওহোদের যুদ্ধে হযরত যায়েদ ও খুবাইর, দু'জনেই শাহাদতের কামনা করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁদের কামনা পূর্ণ করলেন। হযরত মহম্মদ (দঃ) ও তাঁর সহচরগণ এই সংবাদে দারুণভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন।

সত্তরজন মুসলমান ধর্মপ্রচারক বধ ঃ ইসলামের ইতিহাসে আর একটি করুণ ঘটনা। যে কোন মানুষ শুনলেই শিউরে ওঠে। হয়তো বা এই ৭০ জনই বদর বা ওহোদের যুদ্ধে শাহাদত কামনা করেছিলেন। চতুর্থ হিজরীর দ্বিতীয় মাস সফর ৬২৫ খ্রীঃ। তখনও ছ'জন শহীদের শাহাদত বরণ বেশিদিন হয়নি। আবুবারা আমির বিন মালিক মদিনাতে এসে হযরতের নিকট ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এবং তিনি নিজে জানার পর হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে অনুরোধ করলেন তাঁর জন্মভূমি নাজদে একদল ধর্মপ্রচারক পাঠাতে। হযরত তাঁকে বললেন--তিনি ভয় করেন—নাজদের লোক পাছে তাঁর ধর্মপ্রচারকদের ক্ষতি করে। আবুবারা ছিলেন একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি, তিনি সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলেন। একজন আরববাসীর কথা কাগজ অপেক্ষাও অনেক মূল্যবান। হযরত মহম্মদ

(দঃ) সরল বিশ্বাসে ৭০ জন সুদক্ষ পণ্ডিত ব্যক্তিকে ইসলাম প্রচারে নাজদে পাঠিয়েছিলেন। আশা করলেন—নাজদ মদিনায় পরিণত হবে।

ধর্মপ্রচারকগণ বনু আমির ও বনু সুলাইমা গোত্রের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছালেন। তখন আবুবারার চাচা আমির বিন তুকাইল বনু সুলাইমা গোত্রের প্রধান রাল, দাকুওয়ান এবং আসিয়াকে কুমন্ত্রণা যোগাল ওই ৭০ জনকে বধ করার জন্য। ফলে একজন মাত্র আমির বিন উমাইয়া ব্যতীত সকলেই বধ হলেন।

যখন আমির বিন উমাইয়া মদিনায় ফিরছিলেন পথিমধ্যে বনু আমির গোত্রের দু'জনকে দেখতে পান এবং তাঁদের শত্রু ভেবে বধ করেন। কিন্তু তাঁরা শত্রু ছিলেন না। যখন হযরত মহম্মদ (দঃ) ও তাঁর সাহাবারা এই দুটো দুঃসংবাদ জানতে পারলেন, তখন তাঁরা কি মর্মবেদনা ও দুঃখ অনুভব করলেন সে বলার নয়, অনুভব করার।

কিন্তু হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কাউকেই মদিনার বাইরে পাঠালেন না। বরং সারা মাসে তাঁরা ফজর নামাযে দোওযা "কুনুত" পড়ে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকলেন। মহাবিপদে মহাসঙ্কটে মহানবীর কি বিনীত কর্মপন্থা ও আত্মশুদ্ধিকরণ। জগতের জয় হতে মহাজীবনের জয় এখানেই।

অতীব সঙ্কটজনক অবস্থায় মহম্মদ (দঃ) ঃ মহানবীর প্রচারক দল শহীদ হওয়ার পর তাঁর অবস্থা মদিনাতেও অত্যন্ত গুরুতর রূপ ধারণ করে যদিও মদিনাতে তাঁব শিষ্যসংখ্যা কিছু বেড়েছিল, কিন্তু শত্রুর সংখ্যা সে তুলনায় ২৫ গুণ বেশি বেড়েছিল। শুধু তাই নয়, মদিনা তাঁর কাছে যে কারণে সবচেয়ে গুরুতর হয়ে উঠেছিল, তার মূল ছিল বহু তলদেশে। মক্কাতে ছিল তাঁর জঘন্যতম শত্রু। কিন্তু সেই শত্রু শুধু শত্রুই ছিল, তাদের শত্রুতা ছিল প্রকাশ্যে। তারা যা কিছু করত তা পৌরুষ নিয়ে, এটাই ছিল মক্কার শত্রুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মদিনার শত্রু ছিল—প্রতারক, ঠগ, বিশ্বাসঘাতক। তাই তাদের স্বরূপ বোঝা ছিল অত্যন্ত কঠিন। শত্রুর মোকাবিলা করা যায় কিন্তু মিত্রবেশী শত্রুর মোকাবিলা করা বড়ই কঠিন। মহম্মদ (দঃ) এই অসাধ্য সাধন করলেন। আজ মহানবী মক্কা থেকে বিতাড়িত এবং মদিনাতে প্রতারিত। এখন তিনি কি করবেন। একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তখন সান্ত্বনা পেলেন। সাহায্য পেলেন সর্বময় সাহায্যকারীর।

"এইভাবেই আমি অপরাধীদের প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম, তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট।" কোরআন—২৫ ঃ ৩১

মহানবী চিন্তা করতে থাকলেন—কি করে এই বিরূপ পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন। বনু আমির গোত্রের দু'জনকে হত্যার জন্য হযরত আপন অংশমতো ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত থাকলেন। যেহেতু তাদের সঙ্গে সন্ধিপত্রে সই করা হয়েছিল—মহনবী ও ইহুদীদের মধ্যে। বনু নাজির ও বনু আমির উভয়েই ছিল মহানবীর নিকট মিত্রশক্তির সন্ধিপত্রে আবদ্ধ। হযরত তাঁর বিশিষ্ট অনুচর (হযরত আবুবকর, ওমর, আলি ইত্যাদি) সহ তাদের বাসায় গেলেন ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে। তারা হযরতকে সাদরে বরণ করল। এবং একটা উচ্চ প্রাচীরের গায়ে বসতে দিল।

বিশ্বাসঘাতক ইহুদী ঃ মহানবী ছিলেন সবসময় সজাগ। তিনি যেন লক্ষ্য করলেন— তাদেব মতলব ভাল নয়। তারা ঠিক করল— কাব বিন আশরাফের হত্যার প্রতিশোধ নিতে। সুতরাং তারা জিযাদ বিন কাবকে (মতান্তরে আমর বিন জাহাশ) ঠিক করল ওই উচ্চ দেওয়াল হতে অতর্কিতে পাথর নিক্ষেপ করে হযরতকে বধ করার জন্য। মহানবী তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে কাউকে কোন কথা না বলেই একাকী অন্যান্য সকলকে রেখে মদিনায় ফিরলেন।

মহানবীব সঙ্গীগণ জানতে পারলেন—তিনি নিবাপদে মদিনায় ফিরেছেন। এবং তাঁরাও মদিনায় ফিরে জানতে পারলেন —কেন হযরত চলে এসেছিলেন। এবং তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হতে কি গোপন কথা জানতে পেরেছিলেন। ইহুদীগণ পুনরায় চেষ্টা করেছিল, হযরতকে তাদের মধ্যে পাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বরং একটি পত্রসহ দূত পাঠিয়ে দেন ঃ

"হে বনু নাজিব তোমবা আমার সীমানা ছেড়ে দাও। আমার জীবননাশেব চক্রান্ত দ্বাবা তোমবা আমার সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ করেছ। আমি তোমাদের দশদিন সময় দিলাম। যদি তোমাদের কাউকে এবপর আমার সীমানায় দেখি তাহলে তাব শিরশ্ছেদ কবা হবে।"

এই পত্রেব উত্তরে ইহুদীদের কিছুই বলাব ছিল না। তাবা তাদেব চক্রান্তেব কথা অস্বীকার কবতে পাবল না। যেহেতু তারা এত তাডাতাড়িব সঙ্গে ওই চক্রান্ত করেছিল, যা গোপন বাখা সম্ভব হয়নি।

ইবনে উব্বাই ঃ যখন বনু নাজিব গোত্র এই পত্র পেয়ে মহা সমস্যায় পড়ল, তখন ইবনে উব্বাইয়েব পক্ষ হতে দু'জন দূত এসে বলল, "তোমবা তোমাদের সীমানা বা সম্পদসমূহ ত্যাগ করো না। কিন্তু নিজেদের দুর্গের মধ্যেই থাকবে। আমাব দু' হাজার আপন লোক আছে এবং তাদের পাশে আছে আরব, যারা তোমাদের দুর্গে আসবে এবং তোমাদের যে কোন ক্ষতি হওয়ার পূর্বেই তারা মৃত্যু বরণ করবে।"

বানু নাজির পরামর্শ করল এবং একটা পরিকল্পনা স্থির করল—তারা দুর্গের বাইরে খাইবারে যাবে। এবং সেখানে ফলের মৌসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এই পরামর্শের পর যখন তারা বাড়ি ফিরে এল তখন তাদের মধ্যে বৃদ্ধ হুয়াই বিন আখতার বলল "না, আমরা কখনও আমাদের স্থান ত্যাগ করব না। এ কথা মহম্মদ (দঃ)-কে জানিয়ে দেওয়া হোক। তাতে তাঁরা যা খুশি তাই করবেন। আমরা আমাদের দুর্গে প্রবেশ করবই। আমাদের নিকট যে কেউ আসবে তাকেই বধ করব। আমাদের এক বছরের পুরো খাবার ও পানীয় জল আছে। এবং মহম্মদ (দঃ) আমাদের এক বছর অবরোধ করেও রাখতে পারবেন না।

দশদিন গত হল, কিন্তু কিছুই ঘটল না। দশজন ইহুদী ওইরূপই করল—যা তাদের নেতারা নির্দেশ দিয়েছিল। ফলে মহম্মদ (দঃ) বাধ্য হলেন তাদের অবরোধ করতে। যখনই কেউ তাদের দুর্গের নিকটবর্তী হলেন তখনই তারা তাদের নিজ বাড়ির অংশ ভেঙে ফেলল এবং পাথর নিক্ষেপ করতে থাকল।

বানু নাজিরের নির্বাসন (৪র্থ হিঃ) ঃ বানু নাজিরের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কলা-কৌশল সবকিছুই ভূলুণ্ঠিত হলো। ইবনে উব্বাই বা আরব হতে কোন রকমের সাহায্য এলো না।

ইহুদীগণ মদিনা ত্যাগে সম্মত হলো, যদি তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা পায়। মহম্মদ (দঃ) সম্মত হলেন ওইরূপ শর্তে। তারা তাদের আপন ঘর-বাড়ি ভেঙে দিল, যত পারল— নিজেদের মালপত্র সঙ্গে নিয়ে তাদের নিজ স্থান খাইবারে প্রস্থান করল।

মুসলমানগণ ৫০টা পুরুষ বর্ম, ৩২০টা তরবারি লাভ করলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। মহানবী আল্লাহর নির্দেশমতো সমস্ত কিছু গরিব মহাজেরীন এবং দু'জন আনসারদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

এই ঘটনা **ইহুদীদের** সম্পর্কে কোরআন শরীফের সুরা হাশরের ১-৭ আয়াত উল্লেখযোগ্য ঃ

১। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

২। তিনিই কেতাবীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে তাদের বাসভূমি হতে প্রথম সমাবেশেই বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করোনি যে ওরা নির্বাসিত হবে। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন একদিক থেকে এলো— যা ছিল ওদের ধারণাতীত এবং ওদের অন্তরে যা ত্রাসের সঞ্চার করল। বিশ্বাসীদের নিয়ে ওরা নিজেদের ঘর-বাড়ি নিজেরাই ধ্বংস করে ফেলল। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

৩। যদি আল্লাহ্ ওদের সম্পর্কে নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না নিতেন, তবে ওদের পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে ওদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি আছে।

৪। এটি এইজন্য যে ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলে—আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

৫। তোমরা যে কতক খেজুর গাছ কাটছ অথবা ওর শিকড়ের ওপর ওকে দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিত্যাগ করছ (অর্থাৎ কতকগুলো না কেটে রেখে দিয়েছ) তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে। এইজন্য যে এর দ্বারা আল্লাহ্ দুষ্কৃতকারীদের লাঞ্ছিত করবেন।

৬। আল্লাহ্ নির্বাসিত ইহুদীদের নিকট হতে তাঁর রসুলকে যা দিয়েছেন তার জন্য তোমরা অশ্বে বা উষ্ট্রে চেপে যুদ্ধ করোনি। আল্লাহ তো যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রসুলকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭। আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রসুলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রসুলের, রসুলের আত্মীয়-স্বজনের এবং পিতৃহীন বালক-বালিকার, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের যেন তা পর্যায়ক্রমে তোমাদের অন্তর্গত শুধু ধনীদের হস্তগত না হয়। এবং রসুল তোমাদের যা দেয় তোমরা তা গ্রহণ কর, এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহর শাস্তি দান কঠোর।

কোরআন—৫৯ ঃ ১-৭

৮ ও ৯ নং আয়াতে গরিব মোহাজেরিন ও আনসারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

৮। "এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মোহাজেরদের (দেশত্যাগী) জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহ্ ও রসুলের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে নিজেদের সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। এরাই সত্যাশ্রয়ী।

৯। মোহাজেরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীর যে সকল অধিবাসী বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তারা মোহাজেরদের ভালবাসে এবং মোহাজেরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না। তারা মোহাজেরদের নিজেদের ওপর স্থান দেয়। নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও যে ব্যক্তি কার্পণ্য হতে নিজেদের মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।" কোরআন—৫৯ ঃ ৮-৯

১০ নং আয়াতে ইবনে উব্বাইয়ের মিথ্যা অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে।

১১। "তুমি কি কপটচারীদের দেখনি, ওরা কেতাবীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে, ওদের সেইসব সঙ্গীকে বলে—তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশ ত্যাগ করব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারও কথা মানব না। এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" কোরআন—৫৯ ঃ ১১

১৬ নং আয়াতে দুষ্কৃতকারী শয়তানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারা যেন আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা করতে গিয়ে নিজেদের মরণ কূপ নিজেরাই খনন করল।

যায়েদের বিদেশী ভাষা শিক্ষা ঃ এবার হযরত মহম্মদ (দঃ) মর্মে মর্মে অনুভব করলেন যতটা প্রয়োজন যোদ্ধার ঠিক ততটাই প্রয়োজন আজ লেখকের। কারণ আরবের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়, যাদের ভাষা আরবী নয়। তাই হযরত মহম্মদ (দঃ) যায়েদকে হিব্রু ও সিরিয়ার ভাষা শিক্ষার জন্য নির্দেশ দিলেন। যাতে তিনি ওইসব দেশের পত্রগুলো হযরতকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। এবং হযরতের নির্দেশমতো ওইসব দেশে পত্রালাপ করতে পারেন। এই যায়েদই একদিন ইসলাম-জগতের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরকে কোরআন শরীফ সংগ্রহে নিখুঁতভাবে সাহায্য করেছিলেন। যার জন্যে সমগ্র মুসলিম-জাহান তাঁর নিকট গভীরভাবে ঋণী।

হযরতের প্রস্তুতি ঃ মহানবী আল্লাহ্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন ইহুদীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। মোহাজের ও আনসারগণও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বানু নাজির গোত্র যে সমস্ত জমি ফেলে গেল, মুসলমানগণ সেগুলো আবাদ করল। কিন্তু তবুও মহম্মদ (দঃ)-এর মনে কোন শান্তি ছিল না। কেননা দ্বিতীয়বারের জন্য বদরে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য তাঁকে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছিল। ওই বছর খাদ্যশস্যের এমনি খুব অভাব হচ্ছিল। আবু সুফিয়ান মুখে যাই বলুক তার অন্তরে ছিল—এ বছর যুদ্ধ করা যাবে না। এইজন্য সে শুধু শুধু মুসলমানদের ভয় ধরাবার চেষ্টা করছিল। সে নিম্নলিখিত বার্তা সহ নোয়াইম নামক এক ব্যক্তিকে মুসলমানদের নিকট পাঠাল—

কুরাইশরা এবার একটা সৈন্যবাহিনী তৈরি করছে যার মোকাবিলা করার মতো শক্তি সমগ্র আরবের নেই। যারা এই বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করবে তারা বুঝতে পারবে ওহোদের যুদ্ধে যা ঘটেছিল—এর তুলনায় তা কিছুই নয়।

এই মিথ্যা রটনার কিছু ফল ফলেছিল। বেশির ভাগ মানুষ বাড়িতে থেকে চাষ-আবাদ নিয়ে থাকাই ভাল মনে করল। কিন্তু হযরত মহম্মদ (দঃ) আবু সুফিয়ানকে কথা দিয়েছিলেন—আগামী উৎসব মেলায় তিনি বদরে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে মোকাবিলা

করবেন। যখন তিনি দেখলেন অধিকাংশ অনুগামীই বদর যেতে অনিচ্ছুক, তখন তিনি বললেন—তিনি একাই বদর প্রান্তরে যাবেন, কেননা তিনি কথা দিয়েছেন।

বদরে হযরত মহম্মদ (দঃ); আবু সুফিয়ান অনুপস্থিতঃ সৎ সাহসে মহানবী আল্লাহর প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাঁর শিষ্যগণ সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মেনে নিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন—হযরত কথা খেলাপ করবেন না। প্রকৃতপক্ষে মহানবীকে অবমাননার এতটুকু ইচ্ছা তাঁদের ছিল না। ফল ভালই হলো। হযরতের সাহসিকতায় তাঁরা দ্বিগুণ প্রস্তুতি নিলেন।

এই সময়ে হযরত তাঁর অনুপস্থিতিতে আবদুল্লাহ বিন রাবেয়াকে মদিনার প্রশাসক নিযুক্ত করে ১৫০০ সেনাসহ বদর অভিমুখে যাত্রা করলেন। এই সময় তাঁর দশজন অশ্বারোহী ছিল। এবার তিনি আলি বিন আবু তালিবকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন।

এই সংবাদ আবু সুফিয়ানের মিকট পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে সে তার দু'হাজার সৈন্যসহ বদর অভিমুখে যাত্রা করল। সঙ্গে ৫০ জন অশ্বারোহী। কিন্তু আবু সুফিয়ানের খাদ্যসামগ্রী ঠিকমতো না থাকায় শুকনো গোস্তভোজী সৈনিক এনেছিল। যখন সে আসফানে পৌছল, তখন জানতে পারল এবং দেখতে পেল মুসলমান সৈনিকদের বীরত্ব কতখানি। কিভাবে তাঁরা বদর ও ওহোদ যুদ্ধের মোকাবিলা করেছেন। এই সমস্ত দেখেশুনে সে মক্কাতে ফেরাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল। একমাত্র অজুহাত দেখাল—এবার দুর্ভিক্ষ। সুতরাং এবার যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। হযরত তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আটদিন বদরে অপেক্ষা করলেন। সঙ্গীরা বহু মালপত্র বিনিময় করে যথেষ্ট লাভবান হলেন। এটা ছিল ৪র্থ হিজরীর রজব মাসের শেষ দিন। ৬২৫ খ্রীঃ নভেম্বর ৪র্থ হিঃ ৪ঠা সাবান হযরত মদিনায় ফিরলেন।

দ্বিতীয় বদর যুদ্ধের সঙ্গীদের সম্পর্কে কোরআন; সুরা ইমরান—৩ঃ ১৭২-১৭৫

১৭২ ঃ যারা আঘাত পাওয়ার পরও আল্লাহ্ ও রসুলকে স্বীকার করেছিল তাদের মধ্যে যারা সৎ কার্য করেছে ও সংযত হয়েছে তাদের জন্য মহান প্রতিদান আছে।

১৭৩ ঃ যাদের লোকে বলেছিল—নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে সেই সকল লোক সমবেত হয়েছে অতএব তোমরা তাদের ভয় কর, কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছিল এবং তারা বলেছিল আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কর্ম বিধায়ক।

১৭৪ ঃ তারপর তারা আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল। কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। আল্লাহ্ যাতে রাজি তারা তাই করেছিল। এবং আল্লাহ্ মহান গৌরবশালী।

১৭৫ ঃ শয়তানই (আবু সুফিয়ান) তোমাদের এবং তার আপন বন্ধুদের ভয় দেখায়, কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তাদের ভয় করো না। আমাকেই ভয় করো।

আবু সুফিয়ান হযরত ও তাঁর কোন অনুচরকেই এতটুকুও ভয় প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়নি। বরং সে তার আপন লোকদের ভয় দেখিয়েছিল খাদ্যের অভাব বলে। আবু সুফিয়ান ছিল অত্যন্ত ধূর্ত ব্যক্তি। সে অপেক্ষা করেছিল সুযোগের।

বদরের অন্যান্য ঘটনাঃ এই ৪র্থ হিজরীতে ইমাম হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিব জন্মগ্রহণ করেন। আবার এই বদরেই হযরতের দু'বছরের নাতি আবদুল্লাহ বিন ওসমান বিন আফফান মারা যায়। একটি মোরগ তার চোখ ঠুকরিয়ে দেয়। পরে তা বিষাক্ত হয়ে বালক

মারা যায়। জয়নাব বিনতে খুজাইমাও তারপরে মারা যায়। এই বছর আবদুস সালাম মাখজামি ও তার বিধবা পত্নী উম্মে সালমাকে রেখে পরলোকগমন করেন। হযরত তাঁর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করে বিপন্মুক্ত করেন।

এরপর মহানবী ও তাঁর সঙ্গীগণ নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করলেন। হযরত সকলকে কোরআন শরীফ ও ইসলামের আইন-কানুন শিক্ষা দিতে থাকলেন।

বদরের দ্বিতীয় অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ভয় ধরানো। কিন্তু ফল হলো তার বিপরীত। আরববাসীরাই ভীত হয়ে উঠল।

আবু সুফিয়ান ইসলামের জন্মলগ্ন হতেই শুধু তার অপরিমিত ক্ষতি করেননি বরং মহানবীকেও চরমভাবে সদাই বিব্রত ও বিপদাপন্ন করেছেন। তার পুত্র মুয়াবিয়া সৎ খিলাফতের পতন ঘটিয়েছেন এবং তার পুত্র ইয়াযিদ সকরুণ কারবালার চির কুখ্যাত নায়ক। তাই পবিত্র কোরআন আবু সুফিয়ানকে শয়তান বলেই আখ্যায়িত করেছে। এই শয়তানের সন্তান এবং তার সন্তানও ঠিক যেন তাই। কোরআন—৩ ঃ ১৭৫। আবু সুফিয়ান মহানবীকে যেভাবে বিব্রত করেছিল ঠিক সেই ভাবেই মুয়াবিয়া হযরত আলিকে শুধু বিব্রতই করল না, তার খেলাফতে ভাগও বসাল।

বানু উমাইয়া যুগে আমর বিন মারুফের (অর্থাৎ সৎকাজের জন্য আদেশের বা নির্দেশের) গতিরোধ সম্পর্কে মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন ঃ

"আমার বিশ্বাস কেয়ামতের (উত্থান) দিন যদি জালেমদের ফাছিক দল থেকে পৃথক করে দাঁড় করানো হয়, তাহলে তাদের পয়লা কাতারে বানু উমাইয়ারা থাকবে। সে জালেমরাই ইসলামের এই আজাদির (গণতন্ত্রের) মন্ত্রটিকে জুলুমের স্বীকারে পরিণত করল। এর ঠিক উত্থান ও প্রসারতা লাভের মুহূর্তেই গতিরোধ করে দাঁড়াল। ব্যক্তিগত স্বার্থে এ আদর্শটিকে পদদলিত করল। তাই তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের দিনটি 'অমর বিল মা'রুফের দ্বার রুদ্ধ হওয়ার পয়লা দিন হিসাবে গণ্য হবে।

তারা যে শুধু ইসলামের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্রে পরিণত করে ছেড়েছে তাই নয়, অবশ্য এটাও কোরআনের দৃষ্টিতে প্রকাশ্য কুফরী বৈ নয়। কিন্তু সব চাইতে বড় জুলুম হলো, তারা ইসলামের প্রাণশক্তি সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার নির্দেশটিকে তরবারির জোরে দাবিয়ে দিতে চাইল। মুসলমানদের সত্য বলার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাকে নষ্ট করে দিল।

যেহেতু নবী-যুগের কোরআনী শিক্ষা ও আত্মিক শক্তির প্রভাব তখনও তাজা ছিল, তাই যদিও নানা রূপ বেদাত ও পাপাচারে বাজার কিছুটা গরম ছিল, তথাপি সত্য প্রকাশের প্রচণ্ড ধ্বনি দামেশক্ ও কুফা প্রাসাদে কাঁপন জাগিয়েছিল। ষাট বছরের এক বুড়িকে দরবারে ডাকা হলো। সে মুয়াবিয়ার সামনে বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে শুধু সেই সব চরণ আবৃত্তি করে চলল, যাতে শুধু নবী-পরিবারের প্রশংসাই ছিল না, বরং বানু উমাইয়াদের কুৎসাও ছিল অনেক। আবদুল মালেকের মতো প্রভাবশালী ও অত্যাচারী বাদশাহ মদিনায় এলে, তখন তাঁর দুয়ারে কম্বলধারী ফকিররা এসে তাঁকে 'জালেম' আখ্যা দিয়ে যেত। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, হাজ্জাজ খোলা তরবারি সামনে নিয়ে বসতেন। কিন্তু অনেক প্রাণোৎসর্গী মুমিনরা, যাঁরা তার তরবারিকে উপেক্ষা করে সত্য ভাষণে তাঁর অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতেন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

বানু মুস্তালিকের অভিযান ঃ পরিখার (আহযাব) যুদ্ধ

পঞ্চম হিজরী

৩ এপ্রিল ৬২৬ খ্রীস্টাব্দ—২৩ মার্চ ৬২৭ খ্রীস্টাব্দ

হযরতের জীবনে পঞ্চম হিজরী আরম্ভ হলো শান্তির সঙ্গেই। কিন্তু তিনি ছিলেন সদাই সতর্ক। তিনি সবসময় ভাবতেন সম্মুখে বিপদ। এবং ঠিক সেই ভাবেই তিনি সেগুলোর মোকাবিলা করতেন। তিনি ছিলেন মহাতরীর মহান কাণ্ডারী। তিনি সঠিকভাবেই ইসলাম-তরীকে সংসার-সমুদ্রের দ্বীপ ও পাথর থেকে বিপন্মুক্ত রেখেই পরিচালনা করতেন। কিন্তু হঠাৎ ঝড়-ঝটিকা এসে যেতো। তখন তিনি শক্ত হাতেই তাঁর তরীকে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইঙ্গিত পেলেন গাতফান গোত্র কিছু লোককে একত্রিত করছে তাঁর ওপর আক্রমণ করার জন্য। তিনি কালবিলম্ব না করে ৫০৯ জনের একটি দল নিয়ে ধাত আররেকা নামক স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করলেন গাতফান গোত্রের বানু সালাবা ও বানু মুহারির দল একত্রিত হয়েছে। কিন্তু তারা ওইখানে হযরত মহম্মদকে মোটেই আশা করেনি।

ওই গ্রামগুলোতে হযরতের আকস্মিক উপস্থিতি তাদের সকলকে হতভম্ব করে দিয়েছিল। তারা ভয়ে তাদের স্ত্রীলোকদের অন্যত্র সরিয়ে দিল। কিন্তু হযরতের মূল উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা ছিল না, তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত করা, যেন তারা মদিনা আক্রমণ না করে। হযরত তাদের কোন জিনিসেই হাত দিলেন না। নেওয়া তো দূরের কথা, কোন ক্ষতিও করলেন না। তিনি ইচ্ছা করলে ওই অসতর্ক অবস্থায় তাদের অগণিত স্ত্রীলোক, শিশু ও প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করাতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি কোনদিনই করেননি। যখন তারা নিজেরাই আক্রমণ করত এবং হেরে গিয়ে নিজেদের বিষয়-সম্পদ ফেলে অন্যত্র পলায়ন করত, তখন মুসলমানগণ তাদের পরিত্যক্ত জিনিস গ্রহণ করতেন।

এইভাবে মুসলমানগণ সামান্য ধনরত্ন নিয়ে ফিরে এলো। তিনি সবসময়ই সতর্ক থাকতেন। এমনকি যখন প্রার্থনা করতেন তখনও একদলকে তাদের দলের প্রহরী নিযুক্ত করতেন। এবং নামাযও সংক্ষেপে করতেন, যাতে শত্রুপক্ষ হঠাৎ আক্রমণ করতে না পারে।

তাঁদের মদিনা ফেরার পথে শত্রুপক্ষ কোনরূপ ক্ষতিই করতে পারল না।

৬২৬ খ্রীঃ রবিউল আওয়াল মাস, হযরত উত্তর দিকে বিপদের সঙ্কেত পেলেন। তখন গরমের সময় ছিল এবং আরববাসী সাধারণত শীতকালেই উত্তরে ভ্রমণ করতেন।

যুদ্ধ শীতকালেই সংঘটিত হয়েছিল। তবুও মহম্মদ (দঃ) কালবিলম্ব না করেই শত্রুপক্ষকে হতভম্ব করে তুললেন।

তিনি লোহিত সাগর ও পারস্য উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত জামাতল জুনদেলের দিকে যাত্রা করলেন। মদিনা থেকে প্রায় ১০ ধাপের পথ। হযরত (দঃ) বানু আজরা গোত্র থেকে একজন পথপ্রদর্শক নিলেন। গরম অত্যন্ত প্রখর। তাঁকে দিনের বেলায় বিশ্রাম নিয়ে রাতের বেলায় ভ্রমণ করতে হতো। একমাত্র তিনি ও তাঁর অনুচরদের পক্ষেই এই যাত্রা সম্ভব হয়েছিল।

মুসলমানগণ একদিনের যাত্রার পর একটি স্থানে তাঁবু খাটালেন। এবং শত্রুপক্ষের কিছু গবাদি পশু হস্তগত হলো। জামাতল জুনদেলের শাসনকর্তা ভয়ে আত্মগোপন করল। মহানবী বিভিন্ন স্থানে নিজেদের গুপ্তচর পাঠিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এই বছর এখানে কোন বৃষ্টি হয়নি। যার ফলে পানি ও গবাদি পশুর খাদ্যের খুবই অভাব ছিল। যখন মদিনার নিকটবর্তী হলেন তখন তারা হযরতের নিকট পশুগুলোকে খাওয়াবার অনুমতি চাইলেন—তিনি সানন্দে রাজি হলেন।

বানু মুস্তালিকের অভিযান (৫ম হিঃ) ঃ প্রায় একই সময়ে হযরতের কাছে খবর পৌঁছাল—বানু খোজার একটি শাখা বানু মুস্তালিক কিছু সংখ্যক মানুষকে একত্রিত করছে তাঁকে হত্যা করে মদিনা লুট করার জন্য। এই অভিযানটি ছিল হাবিস বিন তাবি দিরারের নেতৃত্বে। এই সংবাদ যখন অন্যান্য দিক থেকে পরিষ্কার জানা গেল, তখন হযরত তাঁর চির অভ্যাসমত একদলকে অগ্রিম পাঠালেন।

অভিযানে হযরত আবুবকর ছিলেন মুহাজিরদের এবং সাদ বিন ওবাইদা ছিলেন আনসারদের নেতা।

বানু মুস্তালিকের নিকটবর্তী মুরাইসি নামক স্থানে মহানবী পৌঁছালেন। সেখানে একটি সংঘর্ষ বাধল। বানু মুস্তালিকের দশজন এবং মুসলমানদের একজন নিহত হলেন। কিন্তু মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে তারা আর মোটেই টিকে থাকতে না পেরে নিজেদের বিষয়-সম্পদ এমনকি ছেলেমেয়েদেরও ফেলে তারা পালাতে বাধ্য হলো। মুসলমানগণ তাদের সমস্ত পরিত্যক্ত জিনিসের অধিকারী হলেন। এবং সবকিছু এমনকি শত্রুদের ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে মুসলমানগণ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

হারিসের কন্যা জারিয়ার সঙ্গে হযরতের বিবাহ ঃ মুসলমানগণ মদিনায় ফেরার পথে তাঁদের যুদ্ধলব্ধ ধন সকলের মধ্যে বণ্টন করলেন। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে হযরতের শত্রুদের নেতা বানু মুস্তালিক গোত্রের হারিসের কন্যা জারিয়াও ছিল। জারিয়া একজন আনসারের ভাগে পড়ল। সে একজন প্রধানের কন্যা হওয়ার জন্য মুক্তিকামনা করল। এবং তার মালিককে লিখল। তার ধারণা ছিল তার পিতা তাকে মুক্ত করার জন্য যা দরকার তাই করবেন। সে হযরতের নিকট এলো এবং বিবি আয়েশার নিকট অবস্থান করল। এবং তাঁকে বলল—"আপনি জানেন আমি কে এবং কার ভাগে পড়েছি। আমি তাঁকে মুক্তির জন্য বলেছি আপনি আমাকে সাহায্য করুন।" মহানবী তাকে মুক্ত করে দিলেন। এই ঘটনার পরই হারিস মদিনায় এলো। এবং পিতা ও কন্যা দু'জনেই মহম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে দেখা করে মুসলমান হলেন। এবং হারিস হযরতের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিয়ে দিলেন। এই বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ছিল—বানু মুস্তালিক গোত্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।

একটি বিশেষ ঘটনা ও হযরত আয়েশার সতীত্ব সম্পর্কে কোরআন ঃ যাত্রার শেষদিনে বানু মুস্তালিক থেকে মদিনায় ফেরার পথে মরু যাত্রীদল এক জায়গায় বিশ্রামের জন্য থামে। পরে হযরত মহম্মদ (দঃ) যাত্রার জন্য আদেশ দিলেন। অন্ধকার রাত্রি। এই যাত্রায় বিবি আয়েশা (রাঃ) হযরতের সঙ্গী ছিলেন। তিনি একটি উটের যাত্রী। যে উটের ওপর একটি আবৃত 'মহল' ছিল। মরুদলের যাত্রার সময় বিবি আয়েশা (রাঃ) হাজতের (পায়খানা) জন্য একটু দূরে যান। এবং ঠিক যাত্রার প্রাক্কালে ফিরতে পারেননি। তিনি ওজনে খুব হালকা ছিলেন। যার জন্য উষ্ট্রবাহক বুঝতেই পারল না—ভিতবে কেউ আছে কি নেই। তারা শূন্য মহলটিকে উটের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে যাত্রা করল। এদিকে বিবি আয়েশা যখন ফিরে এলেন, দেখলেন তিনি একাকী, যাত্রী দলেব কেউ নেই। তখন রাত্রিও শেষের দিকে। তিনি যেখানে ছিলেন, সেইখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। ভাবলেন উষ্ট্রচালক নিজেই বুঝতে পেরে ফিরে আসবে। কিন্তু কেউ ফিরে এলো না। সাফওয়ান বিন মুয়াত্তিল নামক এক ব্যক্তিকে হযরত নিযুক্ত করেছিলেন পিছনে থাকার জন্য। যাতে যাত্রীদের কোন কিছু পেছনে ভুলক্রমে পড়ে থাকলে তিনি উদ্ধার করতে পারেন। যখন সাফওয়ান তাঁর উট নিয়ে সেখানে হাজির হলেন তিনি দেখতে পেলেন বিবি আয়েশাকে একাকী অবস্থায়, জানতে পারলেন কি ঘটেছে। তখন তিনি তাঁর উটটি বিবি আয়েশাকে দিয়ে নিজে হেঁটে আসতে আরম্ভ করলেন। বিবি আয়েশা নিরাপদে মদিনায় পৌঁছালেন। যখন এই ঘটনা সকলেরই কর্ণগোচর হলো, তখন সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু ইবনে উব্বাই ও তাব সঙ্গে আরও কতিপয় লোক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবি আয়েশা সম্পর্কে নানা কুমন্তব্য করতে আরম্ভ করল। বিবি আয়েশা তা শুনে এতই মর্মাহত হলেন যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এদিকে হযরতও নানা জনের নানা কথায় খুবই অস্বস্তি বোধ করতে থাকলেন।

তখন আয়েশা আর থাকতে না পেরে আপন মায়ের কাছে চলে গেলেন। মা সব ঘটনা শুনে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন।

হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর নিকটতম সঙ্গীদের নিয়ে এ সম্পর্কে একটা তদন্ত করলেন। তদন্তে আযেশা একেবারেই নিষ্পাপ প্রমাণিত হলেন।

হযরত তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আল্লাহ্ অনুতাপের জন্য সমস্ত কিছু ক্ষমা করে দেন। ৩৯ ঃ ৫৩। এবং আয়েশা (রাঃ) তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললেন—'আমি জানি, আমি একেবারেই নিষ্পাপ, নিরপরাধ এবং যে কোন কারণেই জনগণ যা বলছে আমি কি সেটা মেনে নেব? কখনও না। এই ব্যাপারে আমি ক্ষমাও চাইব না। কেননা আল্লাহ্ জানেন আমি নিষ্পাপ ও নিরপরাধ। এবং এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমি তাই বলব, যা বলেছিলেন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা ইয়াকুব্ আঃ—ধৈর্যই উত্তম, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ আমার সাহায্যস্থল।" কোরআন—১২ ঃ ১৮

হযরত আয়েশা (রাঃ) এই ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কেননা তিনি সকলকেই একই উত্তর দিতেন। "আমি নিষ্পাপ এবং খোদা অবিবেচক নন।" কিন্তু তাঁর পিতা-মাতা এই ব্যাপারে এতই দুঃখ পেয়েছিলেন যে তাঁরা একেবারেই মৃতবৎ হয়ে পড়েছিলেন।

এই কঠিন পরীক্ষায় সকল সতী-সাধ্বীর জন্যই দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে। সতীর জনরবে কিছু আসে যায় না। একমাত্র আল্লাহ্ তাদের সুরক্ষক। তখন ঐশীর সময় ছিল তাই আয়েশা (রাঃ) রক্ষা পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ই তাঁর অদৃশ্য হাতে তাঁকে রক্ষা করলেন। পরিশেষে আল্লাহ্ই স্বয়ং আয়েশার চরিত্রের পবিত্রতা সম্পর্কে জানালেন ঃ

"যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল। এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না। বরং এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে ওদের কৃত পাপকর্মের ফল। এবং ওদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।" কোরআন—২৪ ঃ ১১

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিম-জাহানে ব্যভিচার, ব্যভিচারিণী ও মিথ্যা রটনাকারী প্রত্যেকের সম্পর্কে কোরআন হুঁশিয়ারি দিয়ে দিল। তাই সমগ্র মুসলিম জাহান তথা সতী-সাধ্বী নারী-জগৎ হযরত আয়েশার নিকট গভীরভাবে ঋণী। তাঁর অসামান্য মনোবল ও অনন্যসাধারণ চিত্তের অসাধারণ দৃঢ়তার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ নিজে ব্যাপকভাবে নীতি নির্দেশনা দিলেন। এ হলো সতী সাধ্বী নারী জাতির জন্য এক অসামান্য অবদান। একদিন ইহুদীগণ এইভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মা বিবি মরিয়ম সম্পর্কেও একই অপবাদ দিয়েছিলেন। তখনও আল্লাহ্ই তাঁকে রক্ষা করেছেন।

"এবং তাঁরা অভিশপ্ত হয়েছিল তাদের অবিশ্বাস ও মরিয়মের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য।" কোরআন—৪ ঃ ১৫৬

খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধ (৫ম হিজরী) ঃ পঞ্চম হিজরী মুসলমান ও মহম্মদ (সাঃ) উভয়ের জন্যই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মুসলমানগণ সকলেই হযরতের দূরদর্শিতা ও উদ্যমশীলতার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হলো। হযরত তাঁর সকল শত্রুকেই ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন এবং মদিনাও বিপন্মুক্ত হলো। তিনি অত্যন্ত খুশি এইজন্য যে, তাঁর অনুচরগণ তাঁকে অন্ধের মতো অনুসরণ করেছিলেন। তিনিও তাঁদের জন্য যে পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁদের সকলেরই কল্যাণকর হয়েছিল।

মুসলমানগণ আজ সত্যই খুব খুশি, কেননা তখন তাঁরা পূর্ব অপেক্ষা বেশি সমৃদ্ধশালী, অনেক নিরাপদ। তাঁদের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। বানু নাজির ও বানু কাইনুকা মদিনা থেকে বিতাড়িত। এবং মক্কাবাসীগণও দ্বিতীয়বার বদর প্রাঙ্গণে (৬২৬ খ্রীঃ ৪র্থ হিঃ) সাক্ষাৎ করার সাহস পেল না। এবং ৫ম হিজরীতেও না।

সকলেই সাধারণভাবে আশা পোষণ করল—আর বোধহয় ইসলামের মহাতরীতে কোন ঝড় আসবে না। সকলেই সম্মুখে সুন্দর শান্ত আবহাওয়া আশা করলেন।

কিন্তু এ ছিল ঝড়ের পূর্বকালীন শান্ত আবহাওয়া। এবার হযরতের শত্রুগণ তাঁরই রণকৌশল তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করল। এতকাল হযরত হঠাৎ তাদের সম্মুখে হাজির হতেন। আজ তারা অকস্মাৎ হযরতের সামনে হাজির।

বানু নাজির গোত্রকে হযরত মদিনা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন যারা খাইবারে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেছিল। তারা ছিল সমৃদ্ধ সম্প্রদায় ও হযরতের চিরশত্রু। তাদের নেতা ছিল হুই বিন আখতার।

তিনি সমস্ত ইহুদী ও অবিশ্বাসীদের নিকট গোপনে দূত পাঠালেন হযরতের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করার জন্য। এই গোপন সংবাদ সববরাহ এতই গোপনে ও সফলতাব সঙ্গে হয়েছিল যে, কোন মুসলমানই তার কোন হদিস পাননি। ইহুদীগণ অবিশ্বাসী আরবদের বুঝিয়েছিল—তাদেব বাপ-দাদাব ধর্ম হযরতের প্রচারিত ধর্ম অপেক্ষা অনেক শ্রেয়। এবং তাবা কখনও হযরতের সঙ্গে কোন শান্তি সন্ধি করবে না।

"তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি, যাদের গ্রন্থের এক অংশ দেওয়া হয়েছে। তাবা প্রতিমা ও শয়তানদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এবং অবিশ্বাসীদের বলে যে, বিশ্বাসীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপথগামী।" কোরআন—৪ ঃ ৫১

এই যুক্তফ্রন্টে সকলেই মুক্ত হস্তে চাঁদা দিয়ে অংশগ্রহণ করল। বানু নাজির গোত্র আরবের কোন নাম-করা অবিশ্বাসী গোত্রকে এই বাহিনীর বাইরে রাখেনি। ইহুদীদের সঙ্গে মিলল—গাতফান, বানু মুররা, বানু কাজরা, সুলাইম, বানু সাদ, বানু আসাদ; সকলেরই একটি বাসনা ছিল—হযরতের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। হযরত তাঁদের সীমানায় একেব পব এক গিয়েছিলেন। কিন্তু তাবা সকলেই একত্রিতভাবে মহম্মদ (দঃ)-এর সীমানায় এসেছিল। হযবতের এই যুদ্ধ ছিল সমগ্র আববের বিরুদ্ধে। তাদের সমববাহিনী নিম্নরূপ ছিল ঃ

১। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশ ঃ
(ক) চাব হাজার সুসজ্জিত পদাতিক সৈন্য। (খ) তিনশ অশ্বারোহী বর্মসহ। (গ) মালপত্র বোঝাই এক হাজার পাঁচশ উট। ওসমান বিন তালহাব হাতে ছিল পতাকা।

২। উনাইনের নেতৃত্বে বানু কাজরা এক হাজার উটসহ শত শত অনুচব।

৩। আশজা—চারশ সৈন্যসহ নেতা মিসরি বিন রুখাইলা।

৪। মুররা—চারশ সৈন্যসহ নেতা হারিস বিন অউফ।

৫। বানু সুলাইম সাতশো সৈন্যসহ নেতা সাওনা, যে সত্তরজন ধর্মপ্রচাবক মুসলমানকে বধ করে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে।

যখন এই বিরাট বাহিনী মদিনার দিকে যাত্রা আবম্ভ করল, তখনও তাদের সংখ্যাকে দশ হাজারের উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাদ ও বানু আসাদ এতে যোগদান করল।

সুসজ্জিত আবু সুফিয়ান গর্বে স্ফীত। কেননা তার সঙ্গে এমন এক সৈন্যবাহিনী যা আরব কোনদিনই দেখেনি। যাকে কেউই প্রদমিত করতে পারবে না। ওহোদের যুদ্ধে তিন হাজার কুরাইশ সৈন্যের নিকট কিছুই না। সকল অবিশ্বাসীর মনে হলো এবার হযরতের মৃত্যু ও আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর কোনই উপায় নেই।

মদিনাতে মুসলমানদের করুণ দৃশ্য (৫ম হিজরী) ঃ যখন মুসলমানগণ শুনল এই বিরাট বাহিনীর কথা, যেখানে মিলিত হয়েছে সমগ্র অবিশ্বাসী আরব ইহুদী। যেখানে সুনিপুণ শত শত অশ্বারোহী যোদ্ধা, হাজার হাজার মালবাহী উট, যেখানে রণসজ্জার কোন শেষ নেই, সেখানে অতি স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা যেন বজ্রাহত হলেন। এই বিশাল বাহিনী বদ্ধপরিকর যে কোন ভাবেই হোক মুসলমানদের দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হবে। এখানে আজ সন্ধির প্রয়োজন নেই। শর্তের প্রয়োজন নেই। তারা

চিন্তা করছে—ইঁদুর যেমন খাঁচায় পড়ে, মুসলমানগণ তেমনি মদিনায় আবদ্ধ। আজ তারা তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ বধ হবে। তাদের হৃদপিণ্ডগুলো আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ও তার সহচারিণীগণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

পরিখার যুদ্ধ আবু সুফিয়ানের নিকট এক বিস্ময় ঃ মুসলমানদের ছিল এক আল্লাহ্তে অসীম বিশ্বাস। যখনই তাঁরা এই সংবাদ শুনলেন, তখনই তাঁরা প্রস্তুত হতে আরম্ভ করলেন। যখন মুসলমানগণ এই সংবাদ শুনলেন, তখন ওই বিশাল বাহিনী মদিনার পথে যাত্রা করেছে। পৌঁছাতে ছ'দিন সময় লাগল। এই কয়েক দিনে মুসলমানগণ প্রস্তুতি নিলেন।

হযরত মহম্মদ (দঃ) মদিনাকে সুরক্ষিত করার জন্য তাড়াতাড়ি করে পরিষদ দলের সভা ডাকলেন। পারস্যের সালমান যিনি মুসলমান হয়েছিলেন—তিনি শত্রুদের হাত থেকে মদিনাকে রক্ষা করার জন্য শহরের পাশে সালা পাহাড়ের নিকটে খাল খননের পরামর্শ দিলেন। যে খালটি হবে গভীরতায় ৫ গজ ও চওড়াতেও ৫ গজ। সকলেই এই সিদ্ধান্তে একমত হয়ে ছ'দিনের মধ্যে ওই কাজ সমাধা করলেন। অন্যদিকে মদিনায় ঘর-বাড়ি সব ছিল উচ্চভূমিতে, যেখানে হযরতের তাঁবু খাটানো ছিল। পরিখাটিকে সমান কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এবং প্রত্যেক ভাগের রক্ষক হিসাবে দশজন তীরন্দাজকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইহুদীদের বানু কুরাইজা গোত্র যারা তখনও হযরতের সঙ্গে মিত্র সম্পর্কে জড়িত ছিল, হযরত তাদের নিকট থেকে পরিখা খননের অস্ত্রাদি ধার নিয়েছিলেন। তারা মদিনার একদিকে সুরক্ষিত ঘর-বাড়িতে বসবাস করত। হযরত নিজে অন্যান্যদের সঙ্গে এই পরিখা খননের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। তবুও তিনি ছিলেন সকল দিক থেকেই বীর ও তেজোদীপ্ত পুরুষ। খননকার্যের সময় খননকারীগণ একটি স্থানে পাথর পড়ায় সেখানে তারা খনন করতে পারল না, তখন হযরত নিজেই একাকী সেই আশ্চর্য খননকার্য সমাধা করেন। তিনি একা দশজনের দৈহিক শক্তি ধারণ করতেন ও সহস্র জনের চিন্তা ও মানসিক শক্তি ধারণ করতেন। তিনি সত্যিই বীর। যখন আবু সুফিয়ান তার বিশাল বাহিনীকে নিয়ে মদিনার প্রান্তদেশে হাজির, তখন খননকাজও প্রায় সমাপ্ত। আবু সুফিয়ান আনন্দে উল্লাসে একটি সভা ডাকল। তাতে তার ধারণা মদিনা আজ তার হাতের মুঠোয়। তিনি সকলকেই আদেশ দিলেন দ্রুত এগোবার জন্য, সঙ্গে থাকবে প্রচুর রণসম্ভার এবং সৈন্যদের আনন্দ ও উৎসাহ দানের জন্য থাকবে নানা রকমের গান ও বাজনা, এবং রমণীদের নানাবিধ কণ্ঠগীতি, যা সৈনিকদের দ্বিগুণ শক্তিদান করবে। তারা ভাবল, তারা যা স্বপ্ন দেখেছিল আজ তা যেন সম্পূর্ণ। আজ মহম্মদ (দঃ)-এর সাহসও হবে না তাদের সম্মুখে আসতে, আমরা আজ অতি সহজেই বিনাশ করব, এই ছিল তাদের চিন্তাধারা।

হঠাৎ তাদের জোর কদমে চলা ঘোড়াগুলো থেমে গেল। উটগুলো দাঁড়িয়ে গেল। মানুষগুলো হতবাক্ হয়ে গেল। তারা দেখল, এ কি সামনে যে বিরাট গর্ত। তারা এরূপ দেখা তো দূরের কথা, জীবনে চিন্তাও করতে পারেনি। এইখানেই মানুষের চিন্তাশক্তির উদ্ভাবনার জয়, দশ হাজার সৈনিকও যা উতরে যেতে পারে না।

মদিনা অবরোধ (৫ম হিঃ) ঃ শত্রুপক্ষের খাবার, অস্ত্র ইত্যাদির কোন অভাব ছিল না। বরং যোগান অফুরন্ত ছিল। কিন্তু মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোন রূপ যোগান ছিল

না। সত্যি কথা বলতে, তাঁরা ছিল দুটো অগ্নিশিখার মাঝখানে। একদিকে শত্রুপক্ষ এবং অপরদিকে প্রতারক বানু কুরাইজা বংশ।

আবু সুফিয়ান প্রধানত তার বানু নাজির গোত্রের লোকদের নিয়ে মদিনা অবরোধ করলেন। কিন্তু বিশাল সৈন্যবাহিনীর উৎসাহ-উদ্দীপনা সবই কমে গেল। তারা এসেছিল সহজে একদিনে জয় করতে, লুট করতে, প্রতিশোধ নিতে। তারা দিনের পর দিন কষ্ট সহ্য করে যুদ্ধ করতে আসেনি। মদিনা নামে মাত্র অবরোধ হলো। তারা ভিতরেও প্রবেশ করতে পারছে না। কোথাও অশান্তিও করতে পারছে না। তাদের সামনে এক প্রশস্ত গভীর খাল। যা তারা কোন প্রকারেই অতিক্রম করতে পারছে না। তখন অনেকেই চিন্তা করতে লাগল— ফিরে যাওয়া শ্রেয়, পরে আবার আসা যাবে।

কিন্তু বানু নাজির গোত্রের নেতা হুই বিন আখতার সকলকে উৎসাহ দিতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই মহম্মদ (দঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ অনাহারে মারা যাবে। কেননা তারা বাইরে থেকে খাবার সংগ্রহ করতে পারবে না। কথাটা সত্য। সমগ্র আরব তখনও মহম্মদ (দঃ)-এর চরম শত্রু। এদিকে শত্রুপক্ষের খাবার যথেষ্ট। এবং যোগানেরও কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু সমগ্র আরব তাদের।

মুসলমানদের তিন হাজার তীরন্দাজ জীবন-মরণ পণ করে দিনের পর দিন দিন-রাত পাহারা দিতে লাগলেন। তখন তাঁদের অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটতে লাগল।

এক সপ্তাহ অতিবাহিত হলো। দু'সপ্তাহ অতিবাহিত হলো। কিন্তু শত্রুপক্ষ কোন উন্নতিই করতে পারল না। এদিকে মুসলমানগণও অটল। এটা ছিল যিলকদ মাসের ৫ তারিখ। অর্থাৎ ৬২৭ খ্রীঃ মার্চের প্রথম বা ফেব্রুয়ারির শেষ। রাত্রিতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ল। উত্তরদিক থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল, যেন যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি আসতে পারে।

তখন শত্রুগণ মরিয়া হয়ে উঠল। অবশেষে তারা একটা স্থান খুঁজে বার করল, যেখানে পরিখার গভীরতা ও প্রস্থ কম। এটা ছিল মালমা পর্বতের দিক। বানু নাজির বানু কুরাইজার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। এবং সকলকে জানাল মহম্মদ (দঃ) হঠাৎ পেছন থেকে আক্রমণ চালাবেন। তারা প্রচণ্ডভাবে খাল পার হওয়ার চেষ্টা করল। তাদের তিনজন নেতৃত্ব দিল—১। আমর বিন আবদ্দুদ। ২। একরামা বিন আবু জেহেল। ৩। দিরার বিন খাত্তাব। আমরই প্রথম যে পরিখা পার হয়ে এসে মুসলমানদের ডাক দিল একাকী যুদ্ধ কবার জন্য। তখন হযরত আলি বিন আবু তালিব বেরিয়ে এলেন তাব ডাকে সাড়া দিতে। আমর বলল— আমি তোমাকে হত্যা করতে আসিনি। তখন আলি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই। যুদ্ধে আমর নিহত হলো। আমর ছিল সমগ্র আরব বাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।

শত্রুগণ বানু কুরাইজার সঙ্গে ঃ যখন শত্রুগণ বুঝতে পারল—সৈন্যসামন্ত শুধু তাদের শক্তি দ্বারা হযরতকে বধ করতে পারবে না, সেখানে কিছু চতুরতা, বিশ্বাঘাতকতা করতেই হবে, তখন ইহুদী হুই বিন আখতার তার কথা কুরাইশ, গাতফান ইত্যাদি সকল দলনেতাকে বলল। এবং সেইমত কাজ করতে বের হলো। মদিনার এক প্রান্ত ঘেরা ছিল বানু কুরাইজার দ্বারা। হুই বিন আখতার ওই দিকটা মুক্ত করার জন্য তাদের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত হলো।

সে বানু কুরাইজা গোত্রের নেতা কাব বিন আসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কাব খুবই সতর্ক লোক ছিল। সে কারও সঙ্গে কোন আলোচনাই করত না। যতক্ষণ না বুঝত এর দ্বারা সে এবং তার গোত্র লাভবান হবে। হুয়াই কাবকে বলল—"হে কাব আমি তোমার নিকট এ যুগের শ্রেষ্ঠতম মানুষদের এনেছি। সঙ্গে দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিরা এসেছে। তারা সকলেই আমার সঙ্গে এক সন্ধিপত্রে সই করেছে যে, তারা কেউই মদিনা ত্যাগ করবে না যে পর্যন্ত তারা মহম্মদ (দঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করে।" প্রথম দিকে কাব একটু ইতস্তত করল। পরে হুয়াই-এর সঙ্গে একমত হলো এবং আপন গোত্রের ভাগ্যকে ওদের সঙ্গে যুক্ত করে দিল। হুয়াই অজস্র প্রতিশ্রুতি দিল ওদের ভবিষ্যৎ লাভ সম্পর্কে। সে কাবকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিয়ে দিল এই পরিখাটাই মদিনা যাওয়ার একমাত্র বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখনই তারা তাদেরকে মদিনার প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে দেবে সঙ্গে সঙ্গেই মদিনা জয় হয়ে যাবে। এবং হযরত মহম্মদ (দঃ) চিরতরে শেষ হয়ে যাবে।

যখনই হযরত মহম্মদ (সাঃ) কাব গোত্রের এই প্রতারণার কথা শুনলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিকট দূত পাঠালেন। সাদ বিন মাদাহ আস গোত্রের নেতা, সাদ বিন উবাইদা খাজবাজ গোত্রের নেতা এবং আবদুল্লাহ বিন রাহা ও খাওয়ায়াত বিন জুবাইর।

বানু কুরাইজা গোত্রের মিত্র সাদ বিন মাদাহ তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন হযরতের সঙ্গে তাদের সন্ধির কথা। এবং তাদের অনুরোধ করলেন—বানু নাজির গোত্রকে ফেরত পাঠানোর জন্য। কিন্তু ইহুদীগণ আগে থেকে তাদের ভবিষ্যৎ বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছিল। তাই সাদের কথায় কর্ণপাত করার মতো তাদের কোন মানসিকতা ছিল না। যখন তাদের নিকট আল্লাহর নবীর কথা উল্লেখ করা হলো, তখন তারা পরিষ্কার বলল—কে আল্লাহর নবী? আমাদের সঙ্গে মহম্মদ (দঃ)-এর কোন সন্ধি বা চুক্তি হয়নি। এইভাবেই কথা প্রথম শাস্তির সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। কেননা ইহুদী ও বানু কুরাইজাদের মধ্যে ঠিক হয়ে গিয়েছিল তারা তিনদিক থেকে হযরতকে আক্রমণ করবে তাঁকে সর্বস্বান্ত করার জন্য।

১। ইবনুল আওয়ারাস সল্লামি আক্রমণ করবে পেছন থেকে।

২। উইয়িনা বিন হিসন পাশ থেকে।

৩। আবু সুফিয়ান পেছন থেকে।

যখন শত্রুপক্ষ শুনল বানু কুরাইজা গোত্র হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে প্রতারণা করেছে, তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। এবং খুবই উৎসাহিত বোধ করল। এদিকে মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত বোধ করলেন। প্রতারকগণ এই সুযোগে পিছু হটল। হযরতের সৈন্যগণ নির্ভীকভাবে যা বলে উঠলেন, পবিত্র কোরআনই তার সাক্ষী স্বরূপ—

১০। "যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল থেকে সমাগত হয়েছিল, তোমরা ভয়ার্ত হয়েছিলে, তোমাদের প্রাণ হয়েছিল ওষ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে নানা সন্দেহে দোদুল্যমান ছিলে।

১১। তখন বিশ্বাসীরা পরীক্ষিত হয়েছিল, এবং ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

১২। কপটাচারীগণ ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলেছিল—আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়।

১৩। ওদের একদল বলেছিল—হে ইয়াসরিব (মদিনাবাসী)। এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই। তোমরা ফিরে চল এবং ওদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল—আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত। যদিও ওইগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে সরে পড়াই ছিল ওদের উদ্দেশ্য।

১৪। যদি শত্রুগণ চারদিক থেকে নগরে প্রবেশ করে ওদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ওদের বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করত তাহলে ওরা অবশ্যই বিদ্রোহ করে বসত। এতে বিলম্ব করত না।

১৫। এরা তো পূর্বেই আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।"

কোরআন—৩৩ ঃ ১০-১৫

এই সময়ে নিজেদের ঠিক রাখা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে ছিল এক অলৌকিক ব্যাপার। তাঁরা সারা দিনে একবেলাও ভাল করে খেতেও পাননি। পেটে পাথর বেঁধে তাঁরা আল্লাহ্ ও রসুল উভয়ের প্রতি ভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। এক কথায় আল্লাহর প্রতি অকুণ্ঠ ঈমানই তাঁদের শক্তি জুগিয়েছে। বিশ্বাসীরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল, ওরা বলে উঠল আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তো এই কথাই বলেছিলেন। আল্লাহ্ ও তাঁব রসুল সত্যই বলেছিলেন। এতে তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।

মুসলমানদের বিপদ যত বেড়েছে তাদেব বিশ্বাসও আল্লাহর প্রতি ততই বেড়েছে। অন্যদিকে ইসলামের প্রচার ও প্রসার তত বেড়েছে।

হযরতের বিরুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে বানু কুরাইজা ঃ ইহুদী ও বানু কুরাইজা জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে উঠল। তারা ভাবল হযরত কোন প্রকারেই ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে না। তারা চারদিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলল। বানু নাজির গোত্রকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজ তারা তাঁর যোগ্য প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। তারা আমন্ত্রণ জানাল অন্যান্য সকলকে। সকলেই এক জায়গায় একত্রিত হলো। সকলেরই একজন মাত্র শত্রু, তিনি হযরত মহম্মদ (দঃ)। তারা সকলেই ভাবল আজ হযরত একাকী। কেউ তার সহায়ক নেই। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্ ছিলেন তাঁব পক্ষে, তিনি ছিলেন তাঁর সহায়ক। বানু কুরাইজাব ইহুদী মহিলাগণ মুসলমানদের মধ্যে গুপ্তচরবৃত্তি করতে প্রবৃত্ত হলো। তাদের একজন সাফিয়া বিনতে আবদুল মোত্তালিবের চোখে পড়ে। তিনি তাকে হত্যা করেন।

কূটনীতিবিদ মহম্মদ (দঃ) ঃ এবার হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর রণকৌশল অন্যদিকে প্রয়োগ করলেন। গাতফান গোত্রের নুয়াইম নামক এক ব্যক্তি মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু শত্রুপক্ষ একথা জানত না। সে বানু কুরাইজা গোত্রেবও বন্ধু ছিল, হযরত তাকে গাতফান গোত্রের নিকট পাঠালেন। যদি তারা নিরস্ত হয় তাহলে মদিনার উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ তাদেব দেওয়া হবে। পরে তাকে কুরাইজা গোত্রের নিকট পাঠানো হলো। সে কুরাইজা গোত্রের নিকট বলল—গাতফান ও কুরাইশগণ বেশিদিন হযরতকে অবরোধ করে রাখার জন্য অপেক্ষা করবে না। তারা হযরতের সঙ্গে একটা সন্ধি শর্তে আবদ্ধ হয়ে যাবে। নুয়াইম তাদের পরামর্শ দিল যেন তাদের সঙ্গে যোগদান না করে যে পর্যন্ত তারা তাদের

কিছু জামানত স্বরূপ না দেয়। এরপর নুয়াইম গেল কুরাইশদের নিকট। তাদের বলল—বানু কুরাইজা গোত্র হযরতের নিকট লজ্জিত। তাই তারা হযরতের শুভেচ্ছা পাওয়ার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে—তাঁর বিশেষ লোকদের পাঠানোর জন্য। নুয়াইম তাদের উপদেশ দিল যদি বানু কুরাইজা কোন জামানত চায় তারা যেন না দেয়। তারপর সে তার আপন গোত্র গাতফানদের নিকট গিয়ে কুরাইশদের যা বলেছে ঠিক তাই বলল। এবার গাতফান ও কুরাইশ উভয়েই বানু কুরাইজাকে সন্দেহ করতে লাগল। এবং আবু সুফিয়ান কুরাইশদের নেতা সাদের নিকট বার্তা পাঠাল—"হে সাদ, মহম্মদকে অবরোধ করার ব্যাপারটা আমাদের দীর্ঘদিন হয়ে গেল। আমরা মনে করছি তোমরা আগামীকালই তাঁকে আক্রমণ কর। এবং আমরা তোমাদের অনুসরণ করব।"

কুরাইজা উত্তর দিল—

"আগামীকাল আমাদের শনিবার। নিষিদ্ধ দিন। আমরা ওই দিন কিছু করি না।"

আবু সুফিয়ান অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে দূত পাঠালেন। "তোমাদের নিষিদ্ধ দিন এখানেই পালন কর। এ আমাদের জন্য অপরিহার্য যে আগামীকাল মহম্মদ (দঃ)-কে আক্রমণ করতেই হবে। যদি আমরা যুদ্ধের জন্য নামি, এবং তোমরা যদি তাতে যোগদান না কর, তাহলে তোমাদের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আমরা মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট তোমাদের স্বরূপ খুলে দেব।" যখনই কুরাইজা গোত্র এরূপ কথা শুনল তখনই তারা রেগে আগুন হয়ে উঠল। এবং তারা তাদের জামানত কুরাইশদের নিকট ফেরত চাইল।

এখন আবু সুফিয়ান নুয়াইমের কথার মর্ম বুঝতে পাবল। এখন সে গাতফান গোত্র কি করতে চায় জানতে চাইল। গাতফান গোত্র (মদিনায় উৎপন্ন ফসলের লোভে) অসম্মতি জ্ঞাপন করল।

পরিখার যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য ঃ অবরোধের ২৭ দিন। রাত্রি এলো—এলো ভয়ঙ্কর রাত্রি রূপে। প্রবল বেগে ঝটিকা, প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নামল মনে হয়েছিল এ অন্য এক নূহের প্লাবন। বিদ্যুৎ এমনভাবে চমকাতে লাগল সকল মানুষেরই চোখ একেবারেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। এবং অবিশ্বাসীদের মনে সীমাহীন আতঙ্ক ও ভয়ের সৃষ্টি করল। ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে শত্রুদের তাঁবু ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তারা অনুভব করল প্রকৃতির প্রচণ্ড রোষের সামনে মানুষ কত অসহায়। পশুগুলো যে কোথায় চলে গেল তার কোন সন্ধানও কেউ পেল না। বাসস্থান, রান্নাশালা বলে কিছুর চিহ্ন পর্যন্ত রইল না। হযরতের শত্রু আজ এক অজানা শত্রুর মহাকবলে চরমভাবে পর্যুদস্ত। তারা প্রতি মুহূর্তে কল্পনা করতে থাকল হয়তো এখনই হযরতের সৈন্যবাহিনী পরিখা পার হয়ে তাদের আক্রমণ করবে। ইতিমধ্যে তুলাইহা বিন খাওয়াইলিদ চিৎকার করে বলে উঠল—"হযরতের লোকজন আমাদের মধ্যে এসে গেছে। তোমরা নিজেদের রক্ষা কর।" এই কথা শোনামাত্র আবু সুফিয়ান চিৎকার দিয়ে বলে উঠল—"হে কুরাইশগণ, আমি সকাল পর্যন্ত এখানে অবস্থান করব না। সমস্ত পশু নষ্ট হয়ে গেছে। বানু কুরাইজা আমাদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এবং তোমরা লক্ষ্য করছ ঝড় আমাদের কি মারাত্মক ক্ষতি করেছে। এখনই আমাদের চলে যাওয়া উচিত। আমি নিশ্চয়ই চলে যাচ্ছি।"

আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশগণও যাত্রা করল। যা দু'-চারটা উট ছিল, সেগুলোকে নিয়ে মালপত্র যা ছিল তার কিছু কিছু নিয়ে, সকলেই সরে পড়ল। গাতফান গোত্রও তাদের অনুসরণ করল। কিন্তু ঝড় ও বৃষ্টি থামল না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মদিনা থেকে বেশ কিছু দূরে না গেল। যেখান থেকে আর মদিনাকে আক্রমণ করা যাবে না। তখন বৃষ্টি ও ঝড় কমে গেল। এদিকে হযরতের অনুচরগণ এদের বিদায় সম্পর্কে সকাল পর্যন্ত কিছুই জানতেন না। যখন সকাল হলো—তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রস্তুত। কিন্তু হায়, কার সঙ্গে মুসলমানগণ যুদ্ধ করবেন। আজ যে শত্রুর স্থান প্রবল ঝড়-ঝটিকা প্রচণ্ড বৃষ্টি একেবারেই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। সেখানে আজ শত্রুর দুঃস্বপ্ন চিরতরে নির্বাপিত হয়ে গেছে। মহান আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হতে চলল।

বিশ্বাসীদের প্রতি প্রতিশ্রুতি ঃ খাল খননের সময় মুসলমানরা যখন একটি পাথরের সম্মুখীন হলো, যেটাকে কেউই ভাঙতে পারল না, সেটাকে হযরত একাকী সরিয়ে দিলেন। কেননা হযরতের ছিল এক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি। যখন হযরত প্রথম এই পাথরকে লৌহ দণ্ড দ্বারা আঘাত হানলেন, তখন পাথর থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হলো। প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন—খসরুর সাম্রাজ্য তার অনুসারীদের দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় স্ফুলিঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন—সিজারের সাম্রাজ্য তাঁর অনুসারীদের দেওয়া হয়েছে। তিনি মুসলমানদের একথা জানালেন, সে সংবাদ শত্রুদের কাছেও পৌঁছে গেল। অবরোধকালে শত্রুকুল হযরতের এই কথা নিয়ে কতই না হাসাহাসি ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল, কিন্তু একেবারেই অন্ধকারে ছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। তারা তখনই বুঝতে পারল যখন আল্লাহ্ পাঠালেন তাঁর রোষ ক্রোধের অতীব সামান্যতম অংশ।

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল, এবং আমি ওদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু ও অদৃশ্য বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম।" কোরআন—৩৩ ঃ ৯-১০

"আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের তাদের ক্রোধসহ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান পরাক্রান্ত।"

কোরআন—৩৩ ঃ ২৫

হযরত মহম্মদ (দঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ মহানন্দে মদিনায় ফিরলেন। এবং শত্রুদের ফিরে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্কে অসংখ্য ধনবাদ জ্ঞাপন করলেন। "আল্লাহ্ স্বীয় কার্য সম্পাদনে চির অপ্রতিহত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেন না।"

কোরআন—১২ ঃ ২১

হযরত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আবার চিন্তা করতে লাগলেন। এবারে শত্রুগণ আল্লাহর দ্বারাই বিতাড়িত হলো। কিন্তু ইহুদীগণ আবার ফিরে আসার শক্তি রাখত। কিন্তু তারা এই ঋতুটাকে পছন্দ করেনি। পছন্দ করেছিল একটা শীত ও ঝড়ঝটিকা বর্জিত ঋতু।

এখন বানু কুরাইজাদের অবস্থা কি? এটা কি সম্পূর্ণ আল্লাহর সাহায্যেই হলো না! না হলে হযরতের লোকগুলোর কি অবস্থা হতো? তাদের মৃতদেহগুলোকে তারা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করত। তাঁদের স্ত্রীলোক ও শিশুদের কি হতো? একেবারেই অবিশ্বাসীদের

হাতে দাস-দাসীতে পরিণত হতো? এখন তাঁরা ক্ষুধাক্লিষ্ট ও ক্লান্ত। নিশ্চয় তাঁরা আজ বিশ্রাম চান, কিন্তু না, যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা জগতে প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে।

মুসলমানগণ মদিনায় ফিরে এসে হযরত আলির নেতৃত্বে বানু কুরাইজা গোত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, হুয়াই ইবনে আখতার হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করছে। তাদের কথার কোন মাত্রা ছিল না। যখন হযরত (দঃ) নিজে তাদের বাড়ির নিকটবর্তী হলেন হযরত আলি তাঁকে তাদের নিকটে না যেতে অনুরোধ করলেন। হযরত বললেন—"কেন যাবো না। আমি শুনেছি তারা আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায়।" হযরত আলি বললেন—"হ্যাঁ।" তখন হযরত (দঃ) বললেন, "যখন তারা আমাকে দেখবে তখন তাবা ওইরূপ বলতে পারবে না।"

আজ তিনি ইহুদীদের সম্মুখীন হয়েছেন, তিনি আজ তাঁদের দুর্গের নিকটে গেলেন এবং বললেন, "হে নির্বুদ্ধিগণের ভ্রাতাগণ, তোমরা কি চাও, আল্লাহ্ তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নিন।"

তারা বলল—"হে আবুল কাসেম, আপনি বোকা নন।"

বানু কুরাইজার ভাগ্য ঃ মুসলমানগণ দল বেঁধে সেখানে পৌঁছালেন এবং মহম্মদ (দঃ) তাদের আদেশ দিলেন বানু কুরাইজাদেব অবরোধ করার জন্য। আজ তাবা অবরুদ্ধ। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পবিহাস। কুবাইজাদের অবরোধ পনেরো দিন যাবৎ চলতে থাকল। সেখানে বড় ধরনের কোন যুদ্ধ হয়নি, পাথর ও তীর নিক্ষেপ ব্যতীত। কুবাইজা সম্প্রদায় তাদের দুর্গের বাইরে আসতে সাহস করল না। যেমন বানু নাজিরদের বিতাডন সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

যখন তারা সমস্ত সাহায্য থেকে হতাশ হলো তখন তারা হযরতকে প্রস্তাব করল আস গোত্রের লুবাবাকে আলোচনার জন্য পাঠাতে। হযরতের মদিনা আগমনের পূর্বে আস গোত্র বানু কুরাইজার মিত্রশক্তি ছিল, যেমন খাজরাজ বানু নাজিরের ছিল।

যখন আবু লুবাবা তাদের নিকট পৌঁছালেন, তখন তাদের স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সকলেই ব্যাকুলভাবে কেঁদে তাকে জিজ্ঞাসা করল—"হে আবু লুবাবা। আমরা কি হার মেনে হযরতের নিকট আত্মসমর্পণ কবব?" তিনি বললেন—"হ্যাঁ"। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, "যদি তোমরা ওই রূপ না কব তাহলে মৃত্যুই তোমাদের একমাত্র পথ।"

অতঃপর তাদের আপন নেতা কাব বিন আসাদ তাদের নিকট গেল এবং তাদের উপদেশ দিল হযরতকে অনুসরণ করার জন্য, এবং রক্ষা করতে নিজেদের ছেলে-মেয়ে, মাল-সম্পদ ইত্যাদিকে। কিন্তু তারা এ কথায় কর্ণপাত করল না।

তখন কাব বলল—"তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকগণ ও শিশুদের হত্যা কব। এবং বাইরে এসো ও যুদ্ধ কর হযরতেব সঙ্গে। যদি তোমরা জয়ী হও, তাহলে স্ত্রীলোক ও শিশু আবাব পাবে। যদি হেরে যাও তাহলে তোমাদের মৃত্যুর জন্য আর পশ্চাতে কেউ দুঃখ করার জন্য থাকবে না।" তারা এও প্রত্যাখ্যান করল। আসল কথা ছিল তারা সহজে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে চায় এবং সেইভাবে তাদের অনুমোদন দেওয়া হোক। যেমন বানু নাজির গোত্রকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হযরত আর নিজের জীবনের ও অনুসারীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে

ইহুদী কুরাইশদের সঙ্গে সামরিক মিলন করতে সম্মত হলেন না। আস গোত্রের কিছু কিছু তাদের পূর্বের মিত্রের (কুরাইজা) জন্য কিছু অনুরোধও করছিল।

হযরত মহম্মদ (দঃ) ইহুদীদের প্রার্থনা অনুমোদন করলেন তাদের মধ্য থেকেই একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি নির্বাচিত করার জন্য। তারা সাদ বিন মায়াজকে ঠিক করল; কিন্তু তারা ভুলে গেল যখন এই সাদ তাদের নিকট গিয়েছিল, এবং তাদের অনুরোধ করেছিল—বানু নাজিরদের সঙ্গে যোগদান না করতে। তখন তারা তাকে গালাগালি করেছিল ও বিরক্ত বোধ করেছিল তার কথায়।

সাদ মধ্যস্থতার দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের কাছ থেকে পবিত্র শপথ করিয়ে নিল যে, তারা তার রায় মেনে নেবে। উভয় পক্ষই সেইভাবে শপথ নিল। সাদ তাঁর সিদ্ধান্ত দিলেন—"যে বা যারা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের (৩০০-৪০০ জনের) প্রাণদণ্ড হবে। বাকি নির্বাসনদণ্ড লাভ করল এবং তাদের ছেলেমেয়ে ও সম্পদ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে ভাগ হবে।" এই আদেশ মান্য হলো। হুয়াই ইবনে আখতার কুরাইজাদের সঙ্গে ছিল। তাই তাকেও এই রায় মেনে নিতে হলো। মদিনা ইহুদীমুক্ত হলো। কোরআন -৩৩ : ৩০

অতঃপর মদিনাতে কিছু খ্রীস্টান রয়ে গেলেন। মহানবী তাঁদের একটি সনদ বা চুক্তি দান করলেন, যে সনদটি আজও বিশ্ব ইতিহাসের আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ায় অদ্বিতীয়, এবং সহ-অবস্থানের একটি চূড়ান্ত নজির। বিশ্ব মানব জাতিধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কি করে একত্রে বসবাস করবে, সে কথা তিনি ভাষণে নয় ভাবে নয়, আপন আচরণে ও দৃষ্টান্তে শিখিয়ে গেছেন। আজ থেকে বহুকাল পূর্বে ৬২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি যে সনদটি দিয়েছিলেন খ্রীস্টানদের—

১। খ্রীস্টানদের উপর কোন রকমেরই অতিরিক্ত কর থাকবে না।
২। খ্রীস্টান ধর্মযাজকগণ তাঁদের কোন পদ থেকেই বরখাস্ত হবেন না।
৩। কোন খ্রীস্টানকেই তাঁর আপন ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করা হবে না।
৪। কোন সন্ন্যাসীকেই তাঁর মঠ বা মন্দির থেকে বহিষ্কার করা হবে না।
৫। কোন তীর্থযাত্রীকেই তাঁর তীর্থগমনে বাধা দেওয়া হবে না।
৬। কোন গির্জাকেই মসজিদে রূপান্তরিত করা হবে না।
৭। কোন খ্রীস্টান (বা বিধর্মী) মহিলা কোন মুসলমানকে বিয়ে করলেও সে তার আপন ধর্ম পালন করতে পারবে। (মহানবীজীর বহু স্ত্রী অন্যধর্মাবলম্বিনী ছিলেন।)
৮। খ্রীস্টানগণ তাঁদের গির্জা মেরামতে (ইচ্ছা করলে) মুসলমানদের সাহায্য পাবেন।

ন্যায়সঙ্গত শাস্তি ঃ কুরাইজাদের এই শাস্তিকে কেউই অবিবেচনামূলক বলতে পারবে না। মানুষ প্রশংসা করতে পারে তাদের সাহসের যে, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল না, তবে তাও অজ্ঞতা হেতু। জগতের ইতিহাসে দেখা যায় বিশ্বাসঘাতককে চিরদিনই কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করেছে। অথবা তখনকার পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিচার করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়ে থাকে। মানুষের ইতিহাসে কোথাও কোনদিনই কোন বিশ্বাসঘাতককেই আপনা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়নি, কেননা বিশ্বাসঘাতকগণ

সবসময় জানে তারা ধরা পড়লে তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে। মৃত্যুই তাদের সমুচিত শাস্তি হয় এই কারণে যে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে একজনকে হত্যা করার জন্যই। সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতা কাজে না লাগলে পরিণতি ভোগ করবেই। এবং কোন শাসকগোষ্ঠীই এইরূপ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। কেননা দেশ তাতে অশান্তিতে ভরে উঠবে। সুতরাং মৃত্যুই তাদের ন্যায়ত শাস্তি।

হযরত মহম্মদ (দঃ) সর্ব দোষমুক্ত ঃ এই করুণ ঘটনার পিছনে ছিল একটি মাত্র শয়তানের কঠোর চক্রান্ত। তার নাম হুয়াই ইবনে আখতার। সে-ই সকলকে উত্তেজিত করেছিল শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে প্রতারণা করতে। তবুও যখন হযরত মহম্মদ (দঃ) তাদের দুর্গের নিকট গিয়েছিলেন, তখনও তারা যদি ক্ষমা চেয়ে নিতো তাও হতো। কিন্তু তারা তা করল না। বরং তারা পুনরায় হযরতকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল।

এখানে সর্বাপেক্ষা বড় কথা, তাদের এই মৃত্যুদণ্ড হযরত মহম্মদ (দঃ) নিজে মুখে ঘোষণা করেনি বা নিজে বিচার করে তাদের মৃত্যুদণ্ড পরোয়ানা দেননি। হযরত মহম্মদ (দঃ) তাদেরই ওপর ভার দিয়েছিলেন, তারাই একজন মানুষকে নির্বাচিত করুক, যিনি বিচার করে দেবেন। এবং সেই বিচার সকলেই মেনে নেবেন। এইভাবে তারাই ঠিক করল— সাদ বিন মায়াজকে। এই সাদ বিন মায়াজ তাদেরই গোত্রের লোক ছিলেন। সুতরাং তিনি যদি উল্টো রায়ও দিতেন, তাহলে মুসলমানগণ তাও মানতে বাধ্য ছিলেন। সুতরাং এই বিচারের প্রাণদণ্ডের জন্য মহম্মদ (দঃ) ও মুসলমানগণ মোটেই দোষী বা দায়ী নন। দয়ার নবী এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করেননি। তিনি পরম দয়াবশত সকলকেই অন্য কোথাও চলে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এইটাই ছিল নবীজীর চরিত্রের চরম বৈশিষ্ট্য।

৫ম হিজরীর অন্যান্য ঘটনা (যুল হজ মাস) ঃ ১। লোহিত সাগরের তীরে যে সমস্ত মুসলমান ছিলেন, তাদের অবস্থা দেখার জন্য আবু ওবাইদার নেতৃত্বে হযরত (দঃ) তিনশো মহাজেরিন সহ একটি অভিযান পাঠালেন। এখানে যে সমস্ত লোক ছিলেন তাঁরা খাদ্যাভাবে দারুণ কষ্ট ভোগ করেছেন। তাঁরা ওই সমুদ্র তীরে একটা বড় মাছ পান, সেটাকে অবলম্বন করেই তাদের বহুদিন বেঁচে থাকতে হয়।

২। এই মাসেই মাত্র তিনশো জন সহ মহম্মদ বিন মাসলামাহ্‌র একটি অভিযান পাঠান হয় বানু কিলাবকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। মাসলামাহ্‌ পঞ্চাশটি উট ও তিন হাজার ছাগল সহ বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন।

৩। আকাছা বিন মহসীনকে গুপ্তচর হিসাবে মক্কা পাঠানো হয়।

৪। সামাসা বিন আছলকে করতলগত করার জন্য একটা ছোট দলকে পাঠানো হয়। পরে তিনি মুসলমান হন। এরপরে তিনি দেশে ফিরে মক্কায় খাদ্যশস্য পাঠানো বন্ধ করে দেন। পরে মক্কাবাসীগণ মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট নালিশ পাঠালে তিনি সামাসাকে খাদ্যশস্য পাঠাতে অনুমতি দেন।

৫। হযরত মহম্মদ (দঃ) আবিসিনিয়া থেকে কতক নির্বাসিতকে ফিরিয়ে নেন।

এইভাবে মদিনাতে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মূল্যবান একটি বছর সফলভাবে অতিবাহিত হয়। এককথায় পরিখার যুদ্ধ হযরতকে সমগ্র আরবের সম্রাটে পরিণত করেছিল। যদিও তারপর বহু কাজ তাঁর জীবনে বাকি ছিল।

হোদাইবিয়ার সন্ধি

ষষ্ঠ হিজরী

২২ মার্চ ৬২৭ খ্রীঃ—১১ মার্চ ৬২৮ খ্রীঃ

আমরা এই পুস্তকের বহুস্থানে আলোচনা করেছি—ইহুদী অপেক্ষা আরবগণ কম বিশ্বাসঘাতক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ইহুদীগণ আরবদের মধ্যেও এই বিশ্বাসঘাতকতা সংক্রামিত করে তোলে।

জুলকারাদের আক্রমণ ঃ আরবদের মধ্যে একজন অতি বড় বিশ্বাসঘাতক ছিল, যার নাম উইনা বিন হিসন্। জমাতুল জানদলের অভিযানের পর মুসলমানগণ যখন বিজয়ী বেশে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন ওই উইনা বিন হিসন্ তার গো-চারণের জমির অভাবে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর কিছু জমিতে গো-চারণের অনুমতি ভিক্ষা করে। তিনি বিনা দ্বিধায় মদিনাব সন্নিকটের জমিতে তাকে গো-চাবণেব অনুমতি দিলেন। কিন্তু এর প্রতিদানে শত্রুপক্ষেব মদিনা আক্রমণের সময় উইনা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিল। যে সমস্ত উট চরানোর জন্য হযবত তাকে চারণভূমি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে ওই (১০০) সমস্ত উটসহ বিরোধী পক্ষে যোগদান করল।

এই বছরের প্রথম দিকে সে মদিনা লুট করে এবং মুসলমানদের উটগুলোর তত্ত্বাবধায়ককে হত্যা করে তার স্ত্রীকেও অপহরণ করে নিয়ে যায়।

সালমা বিন আমর এই ঘটনা প্রথম দেখতে পেয়ে মদিনাবাসীদের সাহায্যের জন্য চিৎকার করে তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রথম নজর পড়ে এবং তিনিও অনুসরণ করেন। হযরত ও তাঁর অনুগামীগণ যথাসময়ে উট, পশু ও স্ত্রীলোকদের উদ্ধার করেন। কিন্তু উইনা বিরোধী গোত্রের আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে। হযরত ফেরার পথে জুলকাবাদের একটি উট দান করেন এবং নিরাপদে বাড়ি ফেরেন।

ফিদাক অভিযান ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মক্কাত্যাগের সময় থেকেই বানুবকর ছিল তাঁর জঘন্যতম শত্রু। তারা হযরতের বিরুদ্ধে তাদের সকল অভিযানেই মক্কার একটি অংশকে একত্রিত করত। তারা ইহুদীদের সঙ্গে খাইবারের পথে হযরতের বিরুদ্ধে যোগাযোগ করতে থাকল, মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য তাদের শিক্ষা দিতে থাকল, কিন্তু হযরত সকল অভিযানেই অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি এমনভাবে অভিযান পরিচালনা করতেন, শত্রুপক্ষ তাঁর মতলবকে পুরোপুরি বুঝতে পারত না। হযরত মহম্মদ (দঃ) শত্রুদের তাড়াতাড়ি প্রথম আঘাতে পর্যুদস্ত করায় বিশ্বাসী ছিলেন।

হযরত (সাঃ) আল্লাহর সিংহ আলি বিন আবু তালিবকে দু'শো সৈন্যসহ ফিদাক অভিযানে বানুবকরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পাঠালেন। আলি (রাঃ) পাঁচশো উট ও দু'হাজার যুদ্ধলব্ধ ছাগল সহ বিজয়ী বেশে ফিরে এলেন।

আসবাগ বিন আমর কালবীর ইসলাম গ্রহণ ঃ উকাল গোত্রের মরুভূমির কতকগুলি লোক মদিনা এলো এবং ইসলাম গ্রহণ করল। কিছুদিন সেখানে বাস করবার পর তারা তাদের চুলকানি ও অসুস্থতার অভিযোগ করায় হযরত তাদেব পাহাড় অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তাদের দুধ খেতে দেওয়া হতো। তারা কিছুদিনের মধ্যে সেখানে স্বাস্থ্য ফিরে পেল। উইনানের মতো তারাও একদিন হযরতের উটপালককে হত্যা করে উটগুলো সহ পলায়ন করে। হযবত কুরজ্ বিন কালেদ ফিহরীকে তাদের অনুসন্ধানে পাঠান। তারা ধরা পড়ল ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলো।

মহানবীর মূল লক্ষ্য ঃ যেসব অভিযান হযরতের জীবনে সংঘটিত হলো, সেগুলো তাঁব জীবনের মূল ঘটনাপ্রবাহ নয়। তাঁব জীবনের মূল লক্ষ্যটি ছিল—ইসলামের মাধ্যমে অজ্ঞতার বিনাশ ও মানবতার বিকাশ। যুদ্ধ-বিগ্রহ এগুলো ছিল তাঁর জীবনেব অবাঞ্ছিত কাজ। এগুলো তাঁর জীবনেব ওপর জোব করে চাপিয়ে দেওযা হয়েছিল। যদি তাঁকে একাকী আপন সাধনায থাকতে কেউ বাধা না দিত তাহলে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহই বাধত না।

তিনি যখন বিতাড়িত হযে মদিনায় এলেন সেখানেও পরপর ছ'মাস শান্তিতে আপন কাজ করতে পারেননি। এমনকি, একমাসও বোধহয় অভিযান ব্যতীত অতিবাহিত হয়নি। পৃথিবীর একজনও এতখানি হয়রান হয়নি, যতখানি হযরত (দঃ) মদিনাতে হয়রান হয়েছিলেন। সমস্ত ইহুদী ও আরবেব সঙ্গে অবিরাম অশান্তিতে কাটাবার মূলে যা কিছু তাঁকে শক্তি যুগিয়েছিল, সে তাঁর আপন বুদ্ধিমত্তা, আল্লাহর সাহায্য ও অনুসারীদের অকুণ্ঠ ত্যাগ স্বীকাব। কিন্তু তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। তিনি তাঁব শত্রুদের পরাজিত করেছিলেন বীরত্বের সঙ্গেই। তাঁর অনুচর—আনসার ও মোহাজিরগণ তাঁকে এরূপ ভালবাসতেন, যে ভালবাসার তুলনা সমগ্র মানবসমাজে যে কোন মানুষের জীবনেই নজিরবিহীন। যেখানে তাঁর সম্পর্ক ছিল আল্লাহর সঙ্গে সেখানে সকলেই তাঁর অন্ধ ও একান্ত অনুসারী। শুধু তাই নয়, এত প্রতিকূলতার সঙ্গে এত অল্প সময়ে এত বেশি কাজ পৃথিবীর ইতিহাসে কারও জীবনেই করা সম্ভব হয়নি। তিনি এমনই ছিলেন কর্মী-পুরুষ।

মানব-আত্মার পবিত্রতা ঃ নামায (প্রার্থনা), রোযা (উপবাস), সদকা (দান), সহবত (ভালবাসা)—এই চারটি ছিল হযরত (দঃ)-এব জীবনের চার দিক, চাব স্তম্ভ।

হযরতের সঙ্গে কুরাইশদের অনবরত যুদ্ধ চলেছিল তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, তিনি তাদের ভালবাসতেন না। তাদের জন্য তাঁর ভালবাসা দিন দিন বেড়েই গেছে। তিনি সবসময় উৎসুক ছিলেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, তাদের আলিঙ্গন করতে। এখানে তাঁর জীবন থেকে সমগ্র বিশ্ব-মুসলমানের শিক্ষা নেওয়া উচিত। এটা সকল মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য। কেননা ইসলাম ভালবাসার ধর্ম, ঘৃণাব নয়। এ দিক থেকে যে কোন ভারতীয় মুসলমানের সকল ভারতীয়কে ভালবাসা একান্ত কর্তব্য। সেখানে ধর্মের কোন ব্যবধান থাকবে না।

তিনি মদিনাতে প্রথম আট বছর থাকাকালীন কোরআন শরীফের প্রায় ¹/, সূরা প্রাপ্ত হন, যথা ঃ ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ২৪, ৩৩, ৪৭, ৪৮, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪ ও ৬৫।

সূরা ২, ৩, ৪, ৫, ৮ = ৭½/৩০ অংশ কোরআন শরীফের। ২৪, ৩৩, ৪৭, ৪৮ সূরা প্রায় ১/৩০ অংশ এবং ৫৭-৬৫ সূরার প্রায় ১/৩০ অংশ পবিত্র কোরআনের। সুতরাং পবিত্র কোরআনের প্রায় ১/৩০ অংশ তাঁর প্রথম আট বছর মদিনায় থাকাকালীন অবতীর্ণ হয়। তিনি এগুলো নিজেই শিক্ষা করেন, অপরকে শিক্ষা দেন এবং প্রত্যেক সূরাকে আপন আপন জায়গায় স্থাপন করেন। তাঁর জীবনের চারটি স্তম্ভকে কোনদিন বাদ দেননি—নামায, রোযা, দান ও ভালবাসা। তিনি এমনভাবে দান করতেন যে, ২৪ ঘণ্টার জন্য কোন কিছুই তাঁর কাছে জমা থাকত না। এমনই ছিল তাঁর দানের মাত্রা।

যদিও হযরত মদিনার একমাত্র শাসক ছিলেন তবুও বহুবার তাঁর ঘরে কয়েক সপ্তাহ কয়েক মাস যাবৎ আগুন জ্বলেনি, রান্না হয়নি। কয়েক মুঠি খেজুর ও সামান্য দুধের ওপর দিনের পর দিন চলেছে তাঁর জীবনধারণ। যখন যুদ্ধলব্ধ ধন তাঁর হাতে এসেছে, তখনই তিনি তা সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন।

এই পৃথিবীর মানুষ কামনা করে ধন-সম্পদ। হযরতও পেয়েছিলেন প্রচুর ধন-সম্পদ, তবুও তার কণা-ক্রান্তিও নিজের বা পরিবারের জন্য রাখেননি। জীবনে বিলাসিতা কি জিনিস তা জানতেন না।

এই পৃথিবীর মানুষ সাধারণত সবসময়ই তাঁর অনুসারীদের দ্বারা প্রশংসিত হতে ভালবাসে। কিন্তু হযরত ছিলেন তার ব্যতিক্রম, হযরত তাঁর শিষ্য (উম্মত)-দের খুব কড়াভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন প্রশংসায় খ্রীস্টানদের মতো না করে। যেহেতু খ্রীস্টানরা ঈসা (আঃ)-কে প্রশংসায় আকাশে তুলে দিয়েছিলেন। মানুষের কতখানি বিনীত হওয়া উচিত তা আপন জীবনেই তিনি সকলকেই কাজের মাধ্যমে শিখিয়ে গেছেন। তিনি নিজ হাতে আপন জুতো মেরামত করতেন, নিজ হাতে কাপড় ধুতেন ও শুকাতেন, শিশু ও নারীদের সেবা করতেন, মুসলমানদের সঙ্গে অতি সাধারণ কাজগুলোও করতেন। তিনি তাঁর আপন ঘোড়া ও উটগুলোর যত্ন করতেন। তিনি জীবনে কোন রোগীকে দেখতে বা মৃতের সৎকারে যোগ দিতে ভুল করতেন না। তিনি সবসময় সন্তুষ্ট থাকতেন, যদিও তিনি গরিব ছিলেন; সবসময় নিজেকে সুখী বোধ করতেন, যদিও শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন প্রায় সবসময়। তিনি শিষ্যদের দারুণ ভালবাসতেন, বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধদের তেমনি অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন। সাধারণভাবে তিনি স্ত্রীলোক সকলেরই প্রতি ছিলেন বদান্য হৃদয়। এসব অসাধারণ গুণের অধিকারী হয়েও তিনি দিনের মধ্যে খুব কম করে ৭০ বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতেন। তিনি আল্লাহর নিকট এমনভাবে ক্ষমা চাইতেন মনে হতো না তিনি একজন নবী, নবীশ্রেষ্ঠ, বরং মনে হতো তিনি আল্লাহর দুয়ারে নিজেকে অতি সামান্য ধূলিকণা মনে করেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের এত ভালবাসতেন, মনে হতো তাঁরা নিজেরা নিজেদেরও এত ভালবাসতে পারেন না। "তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক রসুল এসেছে, তোমরা বিপদাপন্ন হও, এ তাঁর নিকট অসহ্য। সে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বাসীদের জন্য স্নেহশীল, দয়াময়।" কোরআন—৯ ঃ ১২৮

হযরতের এই ভক্তি-ভালবাসা, বিনীত ভাব, উদারতা, দয়া, দান, ক্ষমা যা কিছুই ছিল, সমস্ত কিছুই ছিল তাঁর জন্মগত ও প্রকৃতিগত। এই গুণগুলোই তাঁকে আল্লাহর নিকট প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল। এই গুণগুলোই তাঁকে সমগ্র জগতের প্রেমিক করে তুলেছিল, সমগ্র

অনুসারীদের নিকট তাঁর চরিত্র ছিল চুম্বকের মতো আকর্ষণীয়। সেই চুম্বক-চরিত্র হযরত (সাঃ)-এর আত্মাকেও পবিত্র করে তুলেছিল। তাঁর অনুসারী হযরত আবুবকর, ওমর, ওসমান এবং আলিও ছিলেন পবিত্র আত্মা, এমনকি তাঁর বাড়ির লোকেরাও।

"আল্লাহ্ তো চাচ্ছেন কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র করতে।" কোরআন—৩৩ ঃ ৩৩

এই পবিত্রতা ছিল হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর একান্ত একনিষ্ঠ জীবন-সংগ্রাম এবং এই পবিত্রতা অনুসৃত হবে তাঁদেরই মধ্যে যাঁরা হবেন তাঁর আসল অনুসারী। এটা ব্যতিরেকে জানতে হবে সবই ভুয়া। কেননা পবিত্রতা নেই যেখানে সেখানে রসুল চরিত্র নেই। "নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে, যে পবিত্র (নির্মল চরিত্র)।" কোরআন—৮৭ ঃ ১৪

জন্মভূমি মক্কার জন্য হযরতের আকাঙ্ক্ষা ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর উদ্যম ছিল অতিমানবীয়। তাই তিনি অতিমানব। এই অনন্যসাধারণ উদ্যমেই তিনি সমস্ত কাজ সমাধা করেছেন। অলসতা ছিল তাঁর চরিত্রের অজানা বস্তু। তিনি তাঁর অনুসারীদেরও অলস হওয়ার সুযোগ দেননি। ওহোদের যুদ্ধের পর যখন তাঁরা পরাজয়ে ভগ্নহৃদয় তখন তিনি পুনরায় তাঁদের একত্রিত করলেন। উৎসাহিত করলেন নতুন উদ্যমে। অবশেষে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। মদিনার পরিখার যুদ্ধে শত্রুদের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বানু কুরাইজা গোত্রকে অবরোধ করার নির্দেশ দিলেন তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে।

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তিনি আরও কঠোর ছিলেন। জামাত-সহ দৈনিক পাঁচবার নামায, বাড়িতে মধ্য রাত্র পর্যন্ত আল্লাহর একান্ত এবাদত, প্রতি বছর রমজান মাসে তিরিশ দিন রোযা রাখা, ঈদের পরে আবার সাতদিন রাখা এবং প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা ছিল তাঁর আধ্যাত্মিকতার নিয়ম। গড়ে প্রতি বছরে প্রায় সত্তর দিন রোযা রাখতেন। তিনি বলতেন, আদর্শ জীবন হলো একদিন অন্তর রোযা রাখা। বদর-ওহোদ ও পরিখার মতো ভয়াবহ যুদ্ধগুলোকে পর পর জয়লাভ করার পর মহানবী আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়েন, এবং আল্লাহর ঘর কাবা তওয়াফ করার জন্য মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তিনি হজ পালনের জন্য কোরআন থেকে নির্দেশও পান। কোরআন—২ ঃ ১৯৭-২১০ এবং ২২ ঃ ২৬-৩৮। কিন্তু মক্কাবাসীগণ আল্লাহর ঘরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। হযরত আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালেন তাঁকে পথ দেখাবার জন্যে। একদিন ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে (ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ৬২৮ খ্রীঃ) স্বপ্ন দেখলেন তিনি হজের পর মাথা কামাচ্ছেন।

হজ দু'রকমের, উমরা অর্থাৎ ছোট হজ। এই ছোট হজ আল্লাহর কাবা পরিদর্শন, বছরের যে কোন সময়েই করা যায়। কাবা প্রদক্ষিণ করা, নামায পড়া, সাফা ও মারওয়ার (পাহাড়) মধ্যে সাতবার দৌড়ান, তারপর মস্তক মুণ্ডন, বড় হজে এগুলো সবই করতে হয়। তার সঙ্গে অতিরিক্ত, বছরে নির্দিষ্ট দিন ৯ই জুলহজ তারিখে আরাফাতে গমন, সন্ধ্যার পরে মোজদেলফা গমন করে সারা রাত্রি অবস্থান। ১০ তারিখের সকালে সেখানে মিনাতে প্রস্তর নিক্ষেপ দুই থেকে তিনদিন অপেক্ষা করে আবার প্রস্তর নিক্ষেপ ও কোরবানি করা এবং কোরবানি করার পর মক্কায় ফিরে এসে পুনরায় কাবায় শেষ প্রদক্ষিণ করা, পরে মস্তক মুণ্ডন।

হযরত মহম্মদ (দঃ) যেটা স্বপ্নে দেখেছিলেন—তা উমরা অর্থাৎ ছোট হজ, তার সঙ্গে আল্লাহর নামে মানুষের জন্য কিছু উৎসর্গ ও বিনা যুদ্ধে মক্কায় প্রবেশ।

হযরত স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তা করেছিলেন—আল্লাহর পক্ষ থেকে যদিও তিনি সরাসরি নির্দেশ পাননি, তবুও সত্বর হজের জন্য মক্কায় গমনের প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু তিনি যদি যান তাহলে তাঁর শিষ্যরাও যাবেন, কেননা তাঁরা কোনদিনই হযরতকে একা কোথাও ছেড়ে দেননি।

যখন তাঁর অনুচরগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কুরাইশগণ কিভাবে তাঁদের মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে, সেটা কি যুদ্ধ দ্বারা, না শান্তিতে। তিনি উত্তর দিলেন—"যুদ্ধে নয়, শান্তিতে।" তখন অনুচরগণ অবাক হলেন। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নেবে কিনা? তিনি বললেন—'না, কিছুই না। একমাত্র ভ্রমণকালে আত্মরক্ষার জন্য যা নেওয়া দরকার শুধু তাই নেবে।"

এইভাবে হযরত তাঁর সকল প্রতিবেশীকে জানিয়ে দিলেন—তিনি এবার জুলকাদ মাসে 'হজ' যাত্রা করবেন, তাঁরাও যেন তাঁর সাথী হন।

হযরতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শান্তি স্থাপন। শান্তি স্থাপন সমগ্র আরবের সঙ্গে, সমগ্র কুরাইশদের সঙ্গে, সমগ্র বিশ্বমানবের সঙ্গে। কিন্তু সবসময় সব লোক তাঁর এই পবিত্র আত্মার আকুল আবেদন নাও বুঝতে পারে।

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর হজযাত্রা (ফেব্রুয়ারি, ৬২৮ খ্রীঃ) ঃ সকল মানুষই আজ আনন্দে আত্মহারা, কারণ দীর্ঘ ছ'বছর পর তাঁরা আবার মক্কা পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন। চোদ্দশো মানুষ, সত্তরটি উট কোরবানি দেওয়ার জন্যে তাঁদের সঙ্গে নিয়েছেন। হযরত উমরার জন্য এহরাম বাঁধলেন—অর্থাৎ সমগ্র শরীরে মাত্র দুটো সেলাইবিহীন কাপড় পরলেন। একটা ওপর অঙ্গের ও অন্যটি নিম্ন অঙ্গের জন্য এবং মনস্থ করলেন—পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান কাবা শরীফ দর্শন করার জন্য। যে আল্লাহর গৃহ হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইল কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়েছিল। পরে আবার কুরাইশগণ তা মেরামত করে যাতে কালোপাথর স্থাপনের ব্যাপারে হযরতের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সকলেই মেনে নেন।

যখন জুল হুজাইফাতে হাজির হলেন, তখন সকলেই হজ বস্ত্র পরিধান করলেন অর্থাৎ এহবাম বাঁধলেন। হজের কোরবানির উটগুলোকে প্রস্তুত রাখলেন। ওই উটগুলোর মধ্যে ছিল আবু জেহেলের বিশেষ উট, যা বদর যুদ্ধে পাওয়া গিয়েছিল। এই যাত্রায় হযরতের স্ত্রী উম্মে সালমা সঙ্গে ছিলেন।

মক্কায় হযরতের প্রবেশে কুরাইশগণের শপথ ঃ যখনই মক্কার কুরাইশগণ শুনল হযরত মহম্মদ (দঃ) এবার সদলবলে মক্কায় প্রবেশ করছেন, তখন তারা একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠল। কুরাইশগণ চিন্তা করল—এটা হযরতের সৈন্য পরিচালনা করার এক অভিনব কৌশল। তিনি জগৎবাসীকে দেখাতে চান—মদিনাতে কুরাইশগণ প্রবেশ করতে পারেনি কিন্তু হযরত মক্কাতে প্রবেশ করলেন। একথাও তারা শুনেছিল ও জেনেছিল যে, হযরত সারা বিশ্ববাসীকেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এবার মক্কায় হজ করতে যাচ্ছেন, যুদ্ধ করতে নয়। পবিত্র মাসে তিনি কোনরূপ অশান্তি করবেন না। তবুও তারা তাদের গর্বজনিত উদ্যমে এটাকে স্বীকার করল না। তারা খালেদ বিন ওয়ালিদ ও একরামাকে দু'শো করে অশ্বারোহী

সেনাসহ পাঠাল পথিমধ্যে হযরতকে বাধা দেওয়ার জন্যে। মহম্মদ (দঃ) যেন কিছুই জানেন না, তাই তিনি তাঁর দলবল সহ সোজা আসফান নামক স্থানে পৌঁছালেন। সেখানে বানু কাব নামক একজনের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কুরাইশদেব খবব কি? লোকটি বললেন—কুরাইশগণ আপনার যাত্রার কথা শুনেছে, এবং তারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে না দিতে বদ্ধপরিকর, সে জন্য তারা খালেদ ও একরামাকে পাঠিয়েছে। তারা বেশি দূরে নেই।

যখনই তিনি জানলেন—কুরাইশগণ তাঁর এই মহৎ কাজে বাধা দিতে আসছে, তখন তাঁর মনে কুরাইশদের সম্পর্কে খুবই দুঃখ হলো। তিনি চেষ্টা করলেন এক শান্তিময় সন্ধি করতে। কিন্তু তারা তখন চেষ্টা করছে তাঁকে বধ করতে। এদিকে হযরতও মরিযা—আল্লাহর ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য তিনি যে কোন প্রকার বিপদের ঝুঁকি নিতে বদ্ধপরিকর।

হযরত উভয় সঙ্কটে ঃ কি করে তিনি তাঁর কাজ সমাধা করবেন। একদিকে তাঁর মহান ব্রত, অন্যদিকে তিনি নিরস্ত্র। কুরাইশগণ এ সংবাদ জানতে পেরেই খালেদ ও একরামাকে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠাল। তাবা হযরতকে পরাজিত করবেই। অথচ হযবত কোন কিছুর বিনিময়েই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নন, আবার কাবা পরিদর্শনও তাঁব অমোঘ ইচ্ছা।

যখন হযরত এই চিন্তায় একেবারেই নিমগ্ন তখন তিনি লক্ষ্য করলেন দু'জন অশ্বারোহী তাঁর দিগন্তে হাজির, তাদের সঙ্গে মক্কাব সৈন্যদল। তাঁর পথ এখন অবরুদ্ধ। তাঁকে এখন ফিরে যেতে হয়, নতুবা ধ্বংস হতে হয়। আর যেন কিছুই করাব নেই। তিনি ওই দুটোর কোনটাই হতে দিতে চান না। তাঁর সঙ্গীগণ সকলেই তখন শহীদ হতে প্রস্তুত। তবে তাঁদের যুদ্ধ করাব মতো অস্ত্রশস্ত্র বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ করা হযরতের ইচ্ছা ছিল না। তিনি চান এই অনতিক্রমকে অতিক্রম করতে।

তিনি চিৎকার করে বললেন—এমন কে আছো, আমাদেব এমন একটি পথ দেখিয়ে দাও যে পথে কোন শত্রু নেই।

একজন বললো—পারি। তিনি তাঁদের অন্যপথে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন—সে পথ বড়ই অসমতল, পাহাড়, গভীর গিরিসঙ্কটে ভরা; মুসলমানগণ অতি কষ্টে ওই পথ অতিক্রম কবে মক্কার নিম্নদেশ বা শহরতলী 'হোদাইবিয়া' নামক স্থানে পৌঁছালেন। এ এক পবিত্র স্থানের অন্তর্গত ছিল। এদিকে খালেদ ও একরামার দল অন্যদিকে চলে যায়। হযরত ঝড়-ঝটিকার মধ্য দিয়ে মক্কার সীমানা স্পর্শ করেন। হযরতের রণ-কৌশল অনুসারে মক্কার সৈন্য তখন অন্য স্থানে। এসবই ঘটল, কেননা আল্লাহ্ ইচ্ছা করেননি—এই পবিত্র মাসে এই পবিত্র সীমানায় হত্যাকাণ্ড ঘটুক। মহম্মদ (দঃ)-এর উষ্ট্রী কাসওয়া হোদাইবিয়া নামক স্থানে এসে থেমে গেল। সকলেই চিন্তা করল, এটা অবসাদজনিত থামা। কিন্তু মহম্মদ (দঃ) বললেন—"না, তিনিই একে থামিয়েছেন, যিনি একদিন থামিয়েছিলেন— হাতিকে (অর্থাৎ আবরাহা বাদশা যখন হাতি-সহ মক্কা আক্রমণ করতে এসেছিলেন—হযরতের জন্ম বছরে)। যদি কুরাইশগণ আজ শান্তির জন্য বলে, আমি নিশ্চয় তা অনুমোদন করব। এবং তাদের সঙ্গে বৈপিত্র্য সম্পর্ক (একই মা ও দুই পিতা) স্থাপন করবো (অর্থাৎ তাদেব বিধবাদের আমরা স্ত্রী রূপে বরণ করতে প্রস্তুত থাকব)।" তিনি তাঁর লোকদের ওইখানেই তাঁবু ফেলতে নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁরা বললেন—"হে আল্লাহর রসুল, এখানে কোন পানি নেই,

কিভাবে এখানে তাঁবু ফেলা যাবে।" তখন তিনি একজনের তূণ থেকে একটি তীর নিলেন এবং নিক্ষেপ করলেন একটি পুরাতন কূপে। তখন কূপ থেকে পানি প্রবাহিত হতে থাকল।

কুরাইশদের একগুঁয়েমি ঃ মুসলমানগণ হোদাইবিয়াতে থেমে গেলেন। এদিকে কুরাইশগণ অনড়, হযরত মহম্মদ (দঃ) কে সদলবলে মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া অপেক্ষা তাঁদের মৃত্যুই ভাল। ইতিমধ্যে খালেদ ও একরামা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কুরাইশগণ খোজা গোত্রের বুদাইল বিন ওয়াকা নামক ব্যক্তির নেতৃত্বে বেশ কিছু সংখ্যক লোককে হযরতের নিকট পাঠাল হযরতের সৈন্যসংখ্যা ও তার উদ্দেশ্য জানতে। অভিযাত্রী দল ফিরে এসে জানাল, হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে আঘাত করা উচিত নয়, কেননা তিনি এসেছেন তাঁর ধর্ম পালন করতে। এখানে যুদ্ধ করা মোটেই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এই মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। হযরতের যুদ্ধ করার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। কিন্তু অভিযাত্রী দল যখন এ কথা বলল, কুরাইশরা তাদের কথা মোটেই বিশ্বাস করল না। তারা অন্য একটি অভিযাত্রী দল পাঠাল কিন্তু তারাও একই কথা বলল।

তখন তারা হুলাইস নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পাঠাল। হযরত তাঁর কোরবানির জন্য ৭০টি উটকে তাদের গলায় কালাদা (অলঙ্কার) পরিয়ে অতি সুন্দরভাবে সকল মানুষের সম্মুখভাগে হাজির করে রেখেছিলেন। হুলাইস তা দেখে এতই মুগ্ধ হলেন যে তিনি হযরতের সঙ্গে দেখা না করেই কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে তিনি যা দেখেছেন সব বললেন। এতে কুরাইশগণ খুবই রেগে গেলেন। হুলাইস রেগে গিয়ে বললেন—"তোমরা যদি মহম্মদ (দঃ)-কে মক্কায় প্রবেশ করতে না দাও, তাহলে আমাদের গোত্রের কোন লোকই মক্কায় প্রবেশ করবে না।"

হুলাইসের সতর্কবাণীতে কুরাইশরা ভয় পেয়ে গেল। তারা আর একটি জ্ঞানী লোকের সন্ধান করল এবং তাঁকে পাঠাল হযরতের নিকট—তিনি উরওয়া বিন মাসুদ। তিনি যখন হযরতের নিকট পৌঁছালেন, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন আবুবকর, মুগিরা বিন সুবা এবং অন্যান্য কয়েকজন। উরওয়া কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন—হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর এই অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্ম পালন ও শান্তি স্থাপন। এবং আরও বললেন —"হে কুরাইশগণ। আমি কেসরা, সিজার ও নেজাস সম্রাটদের আপন আপন রাজত্ব করতে দেখেছি, কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমি কোন সম্রাটকেই দেখিনি তাঁর আপন লোকদের মধ্যে, যেমন দেখলাম হযরতকে। যদি তিনি স্নান করেন, তাহলে তাঁর স্নানের জল তাঁরা মাটিতে পড়তে দেয় না। যদি তাঁর একটি চুলও নিচে পড়ে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেন। সুতরাং যে কোন কিছুর বিনিময়ে তাঁরা হযরত মহম্মদ (সাঃ)-কে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন। এখন তোমরা যা ইচ্ছা কর।"

সময় অতিবাহিত হতে থাকল। কথাবার্তা চলতে থাকল। হযরত একজন দূতকে কুরাইশদের নিকট পাঠালেন। কুরাইশগণ তাঁর একটি উটকে হত্যা করল। তাঁকেও হত্যা করত, যদি না হুলাইস গোত্র হস্তক্ষেপ করত। ৪০/৫০ জন কুরাইশ রাত্রিতে মুসলমানদের তাঁবুর নিকটে আসে, মুসলমানদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে; হযরত তাঁদের ক্ষমা করেন ও মক্কার পবিত্র সীমানার মধ্যে রক্তপাত করতে নিষেধ করেন। কুরাইশগণ হযরতকে যুদ্ধে নামাবার জন্য নানা পথ অবলম্বন করে; কিন্তু ব্যর্থ হয়।

"এ আল্লাহ্‌রই বিধান, প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে, তুমি আল্লাহ্‌র এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না। আমি মক্কা অঞ্চলে ওদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করার পর ওদের হাত তোমাদের থেকে নিবারিত করেছি। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা জানিয়ে দেবেন। ওরাই তো অবিশ্বাস করেছিল, এবং তোমাদের নিবৃত্ত করেছিল মসজেদুল হারাম থেকে, এবং কোরবানির পশুগুলো যথাস্থানে পৌছাতে বাধা দিয়েছিল। মক্কায় অবিশ্বাসীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী না থাকলে, যাদের অজ্ঞাতসারে হত্যা করলে তোমরাও অনুতপ্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এইজন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। যদি ওরা পৃথক থাকত, আমি অবিশ্বাসীদের মর্মন্তুদ শাস্তি দান করতাম। কেননা অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে অজ্ঞযুগের ঔদ্ধত্য পোষণ করত। আল্লাহ্ তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের সান্ত্বনা দান করলেন। তাদের তৌহিদের নীতিতে সুদৃঢ় করলেন। তারা এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত ছিল। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন। আল্লাহ্ তাঁর রসুলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই নিরাপদে মসজেদুল হারামে প্রবেশ করবে।......তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ যা জানেন, তোমরা তা জান না।" সুরা ফাতাহ্ ৪৮ ঃ ২৩-২৭।

কুরাইশদের নিকট হযরত ওসমান বিন আফফান ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) কাবা প্রদক্ষিণ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি হযরত ওমরকে ডাকলেন কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। ওমর বললেন, "হে আল্লাহর নবী, আমার প্রতি কুরাইশদের প্রবল শত্রুতার জন্য আমাব ভয় হচ্ছে, সেখানে আমাকে রক্ষা করার জন্য বানু আদি বিন কাব গোত্রের কেউই নেই। এবং আপনি জানেন কুরাইশদের বিরুদ্ধে আমার কথা ও কাজ এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা কত তীব্র। আমি আপনার নিকট এক ব্যক্তির নাম করছি যিনি এই কাজে আমার চেয়ে উত্তম। তিনি ওসমান বিন আফফান।" তখন হযরত মহম্মদ (দঃ) ওসমানকে পাঠালেন আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নিকট। ওসমান (রাঃ) প্রথম আবান বিন সিয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এই কথোপকথনের সময় নিজেকে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে রেখেছিলেন। যখন তিনি কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তাঁরা বললেন—হে ওসমান, আপনি যদি কাবা প্রদক্ষিণ করতে চান করুন। তখন তিনি বললেন—আমি একাকী কখনই তা করব না, যতক্ষণ হযরত মহম্মদ (দঃ) ওটা না করেছেন। আমরা এসেছি শুধু ওই প্রাচীন পবিত্র গৃহ পরিদর্শন করতে, মহান আল্লাহকে সম্মান দেখাতে। আমাদের নিকট কতকগুলো কোরবানির পশুও আছে। আমরা ওইগুলো কোরবানি করার পরেই মদিনায় ফিরে যাব। তখন কুরাইশগণ বলল—তারা শপথ করেছে মহম্মদ (দঃ)-কে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। এভাবেই আলোচনা দীর্ঘ হতে থাকল, কিন্তু ইতিমধ্যে রটনা হলো হযরত ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে।

এই রটনা যখনই মুসলমানদের কর্ণগোচর হলো তখনই মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি বিক্ষোভ দানা বাধল যা পূর্বে কখনও বাধেনি। হযরত নিজেও চিন্তিত হয়ে পড়লেন কেননা, তিনি নিজেও কোন সংবাদ পাচ্ছিলেন না। যদি এটাই ঘটে থাকে তাহলে কুবাইশগণ পবিত্র মাসেই পবিত্র সীমানায় আরব প্রধানদের এমন একজন মানুষকে হত্যা করল, যা একটি অতি জঘন্যতম কাজ।

বৃক্ষতলে শপথ ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) শপথ নিলেন, "আমরা কিছুতেই এ স্থান ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করি। প্রয়োজন হলে আমরা যুদ্ধও করব।" তিনি তাঁর সকল লোকদের ডাকলেন, একটি গাছের নিচে একত্রিত করলেন এবং তাঁদের শপথ গ্রহণ করালেন। তাঁরা সকলেই মহান নেতার হাতে হাত দিয়ে শপথ নিলেন—"আমরা আমরণ যুদ্ধ করব।" সকলেই শপথ গ্রহণ করলেন, প্রস্তাব নিলেন—সকলেই এক দেহে এক মনে এক প্রাণে ওসমান হত্যার প্রতিশোধ নেবেন। ইতিহাস আজও পর্যন্ত এরূপ নজির স্থাপন কবতে পারেনি—সকলেই একজনের জন্য এবং একজন সকলেরই জন্য।

"বিশ্ববাসীরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট তোমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন, তাদের তিনি সান্ত্বনা দান করলেন এবং তাদের জন্য আসন্ন বিজয় স্থির রাখলেন।—বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা ওরা লাভ করবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।"

কোরআন—৪৮ ঃ ১৮-১৯

এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—খাইবারের জন্য। যখন তাঁর সকল অনুসারী তাঁদের শপথ নেওয়া শেষ করলেন তখন হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে আলিঙ্গন করলেন, যেন অন্যান্য সকলের মতোই হযরত ওসমানও হযরতেব হাত ধরে শপথ গ্রহণ করলেন, পরে হযরত শপথটা নিজেই পড়লেন হযরত ওসমানের পবিবর্তে যেন হযরত ওসমান নিজেই সেখানে হাজির।

এখন তরবারি খাপ থেকে বাইরে, যুদ্ধ নির্ধারিত, হয় জয় কিংবা শহীদ। মুসলমানদের অন্তর আসন্ন স্বর্গলাভের আশায় উৎফুল্ল, মনও অভিযানের নিশ্চিত জয়ে উৎফুল্ল, কি আনন্দ। এদিকে হযরত ওসমান বহাল তবিয়তে ফিরে এলেন। একদিকে যেমন আনন্দ, অন্যদিকে তেমনি নিরানন্দ। হযরত ওসমান বললেন—কুরাইশগণ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর উদ্দেশ্য ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন, তবে খালেদ বিন ওয়ালিদ সৈন্যসহ পথিমধ্যে অবস্থান করছে। মুখোমুখি হলে যুদ্ধ অনিবার্য। একবার যদি মক্কার পবিত্রতা নষ্ট হয়, তাহলে তা হবে চিরদিনের জন্য নজির স্বরূপ।

হোদাইবিয়ায় সাময়িক শান্তি বা যুদ্ধবিরতি (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬২৮ খ্রীঃ) ঃ কুরাইশগণ তাঁদের একজন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি সোহাইল বিন আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান।

এন্‌সাইক্লোপেডিয়া অব্ ব্রিটানিকা থেকে কথাবার্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বৃক্ষতলের বিখ্যাত শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যখন হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর হাতে হাত দিয়ে সকলেই শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা সর্বদাই তাঁব পাশে থাকবেন, তাঁর জন্য জীবনও উৎসর্গ করবেন। কিন্তু কুরাইশ এই ঘটনায় দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তারা জীবনে কোথাও লক্ষ্য করেনি—একজন মানুষের প্রতি এত অফুরন্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। তারা নিজের লোকের কাছে ফিরে এসে সকল কথাই তাদের বলল এবং শক্ত হতে অনুরোধ করল, যাতে কেউ মক্কার প্রান্তভাগ পার হতে না পারে। কুরাইশগণ সেই অনুপাতে কাজ আরম্ভ করল। তারা বলল—এবার মহম্মদ

(দঃ) ফিরে যাবেন। যাতে আরবগণ বলতে না পারে যে, মহম্মদ (দঃ) জোর করে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী বছরে মহম্মদ (দঃ) আসবেন ও কাজ সেরে ফিরে যাবেন। তবে সব কাজ সমাধা কবার জন্য পবিত্র স্থানে তিনদিন অপেক্ষা করতে পারবেন। কিছু আলোচনার পর মহম্মদ (দঃ) সম্মত হলেন।

যখন সন্ধিপত্র লিখতে আরম্ভ করা হলো তখন হযরত মহম্মদ (দঃ) শব্দগুলো বলতে থাকলেন—"পরম দয়ালু আল্লাহর নামে", কিন্তু আরব প্রথানুযায়ী সোহাইল বাধা দিয়ে বলল—আল্লাহুম্মা লিখতে। তখন মুসলমানগণ চিৎকার করে উঠলেন কিন্তু হযরত নিজে এই পরিবর্তন মেনে নিলেন। আবার মহম্মদ (দঃ) বলতে আরম্ভ করলেন—এই শান্তি সন্ধি আল্লাহর দূত বলার সঙ্গে সোহাইল আবার আপত্তি জানাল—মহম্মদ (দঃ)-কে আল্লাহর দূত বলে মেনে নেবেন তাঁর অনুসারীগণ, আরবগণ নয়। সুতরাং তাঁর উপাধি লিখতে হবে—মহম্মদ বিন আবদুল্লাহ (আবদুল্লাব পুত্র মহম্মদ), মুসলমানগণ পূর্ব অপেক্ষা আবও জোবে চিৎকার করে উঠলেন এবং প্রত্যাখ্যান করলেন নামের সঙ্গে দূত শব্দেব পরিবর্তন করতে। মদিনার দুই গোত্রের নেতা ও সাইদ বিন হোদাইর এবং সাদ বিন ওবাদা লেখকেব হাত ধরে বসলেন, ঘোষণা করলেন—"মহম্মদ (দঃ) আল্লাহর দূত লিখতেই হবে অথবা তরবারিই এর সিদ্ধান্ত ঘোষণা কববে। মক্কার প্রতিনিধিগণ এদের এই তেজোদীপ্ত ঘোষণা শুনে বিস্ময় বোধ কবল। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী হযরত (দঃ) গোঁড়া ব্যক্তিদেব বুঝিয়ে দিয়ে আবার পথ বাতলে দিলেন—'বল তোমরা আল্লাহর নামে আহ্বান কর, বা রহমান নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর তাঁর সকল নামই সুন্দর।"

কোরআন—১৭ ঃ ১১০

এই সন্ধির শর্ত সম্পর্কে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে মস্ত বড় আপত্তি ছিল—যদি কোন কুরাইশ তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট আসে (ইসলাম গ্রহণ করতে) তাহলে মহম্মদ (দঃ) বাধ্য থাকবেন তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত পাঠাতে। কিন্তু যদি মহম্মদ (দঃ)-এর কোন অনুসারী কুরাইশদের নিকট যায় তাহলে কুরাইশগণ তাকে মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে না। এই দ্বিমুখী শর্তে মহম্মদ (দঃ)-এব অনুসারীগণ ঘোব আপত্তি জানালেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী মহম্মদ (দঃ) তাই মেনে নিলেন। যদিও কোন আরব এটা মেনে নিতো না। কেননা এর পূর্বে আজ পর্যন্ত সমগ্র কুরাইশ সম্মিলিতভাবে কোনদিনই হযবতকে তাদের পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী একটি দল বলে মেনে নেয়নি। আজ সেটা হলো। অর্থাৎ আজ মহম্মদ (দঃ)-এব বিরাট জয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলো। এবার উঠবে জয়ের সৌধ থেকে বিজয়ের মহাসৌধে।

ইতিহাস-বিখ্যাত হোদাইবিয়ার সন্ধি ঃ "হে আল্লাহ্, তোমার নামে মহম্মদ (দঃ) ইবনে আবদুল্লাহ ও সোহাইল ইবনে আমরের মধ্যে সিদ্ধান্তজনিত এটা একটি শান্তি সন্ধি হলো। ১। তাঁরা সম্মত হয়েছেন তাঁদের সৈন্যগণকে দশ বছরের জন্য নিরস্ত্র রাখতে। এই সময়েব মধ্যে প্রত্যেক দল সুরক্ষিত থাকবে। কেউ কারও দ্বারা আঘাত পাবে না। ২। কেউ কারও কোন গোপন ক্ষতিও করবে না। উভয়ের মধ্যে সরলতা ও সম্মান বিরাজ কববে। ৩। আরবের অন্যান্য গোত্রগণ স্বাধীনভাবে যে কোন পক্ষেব সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন

করে যোগদান করতে পারবে। ৪। কিন্তু যদি কোন কুরাইশ অভিভাবকের অনুমতি না নিয়েই মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট আসে (ইসলাম গ্রহণ করতে) মহম্মদ (দঃ) তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু যদি মহম্মদ (দঃ)-এর কোন অনুসারী কুরাইশদের নিকট আসে (তাদের সঙ্গে মিশতে) কুরাইশগণ তাকে মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে না। ৫। এই বছরে মহম্মদ (দঃ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে আমাদের নিকট হতে ফিরে যাবেন। ৬। কিন্তু পরবর্তী বছর আমাদের মধ্যে আসবেন ও তিনদিন অপেক্ষা করবেন। ৭। তাঁদের সঙ্গে ভ্রমণকালীন অস্ত্র ব্যতীত কোন অস্ত্র থাকবে না এবং ওই তরবারি খাপের মধ্যে থাকবে।"

হোদাইবিয়ার সন্ধির পরবর্তীকাল ঃ এই প্রথম কুরাইশগণ হযরতের সঙ্গে শান্তি সন্ধিতে বসলেন। আজ থেকে সতেরো বছর আগে (৬১০ খ্রীঃ) এই কুরাইশগণই একদিন আবু তালিবের নিকট ঘোষণা করেছিল—হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে ইসলাম প্রচার বন্ধ করতেই হবে, নতুবা যুদ্ধ চলতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না একপক্ষ মৃত্যুবরণ করে। দীর্ঘ সতেরো বছর ওই ভাবেই চলেছে। হোদাইবিয়ার সমস্ত শর্তগুলোই প্রমাণ করল—হযরত মহম্মদ (দঃ) কত শান্তিপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁর ভালবাসা মানবমাত্রের জন্য কত গভীর ছিল। এই সন্ধির প্রাক্কালে বানুবকর গোত্র কুরাইশদের সঙ্গে যোগদান করল ও বানু খোজা গোত্র মহম্মদ (দঃ)-এর দিকে যোগদান করল।

কুরাইশগণ যে ভয় করেছিল, তাই হলো। হোদাইবিয়ার সন্ধির কালি শুকাতে না শুকাতেই স্বয়ং সোহাইল বিন আমরের পুত্র আবু জুনদল হযরতের নিকট এল এবং মুসলমানদের সঙ্গে যোগদান করল। যখন সোহাইল এরূপ দেখলেন তখন তিনি তাঁর পুত্রকে অত্যন্ত প্রহার করলেন এবং টেনে নিয়ে গেলেন। আবু জুনদল চিৎকার করে মুসলমানদের বলল—"তোমরা আমাকে অসভ্য বর্বর কুরাইশদের মধ্যে ফেরত দিচ্ছো। এবং আমার বিশ্বাসের জন্য তারা আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে।"

এই কথা শুনে মুসলমানদের অন্তর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু হযরত সন্ধি শর্ত মানার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি আবু জুনদলকে বললেন, "হে আবু জুনদল, ধৈর্য ধর, নিজেকে সংযত কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার জন্য ও মক্কার দুর্বল লোকদের জন্য পথ বের করে দেবেন। আমরা নিজেদের মধ্যে সন্ধি ও শান্তি রক্ষা করতে বাধ্য। আমরা তাঁদের আল্লাহর নামে শপথ বাক্য দিয়েছি এবং তাঁরাও আমাদের দিয়েছেন। সুতরাং আমরা তা ভঙ্গ করব না।" অতএব জুনদলকে ফেরত দেওয়া হলো মক্কাবাসীদের নিকট। হোদাইবিয়ার সন্ধি কেন হলো, এটাও ছিল মহান আল্লাহর অভিপ্রেত বস্তু। মক্কার মধ্যে কুরাইশদের অনেকেই ছিলেন মনে-প্রাণে মহানবীর একান্ত অনুসারী। কিন্তু এটা ছিল তাঁদের মনের অত্যন্ত গোপনীয় বস্তু। দুর্ধর্ষ কুরাইশদের সম্মুখে বলার মত সাহস তাঁদের তখন ছিল না। কিন্তু তাঁরা মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন কুরাইশদের বর্বরোচিত আচরণকে, অন্যদিকে নীরব প্রাণে শ্রদ্ধা জানাতেন মহানবীর শাশ্বত সুন্দর নীতিগুলোকে। যদি উভয় পক্ষে সেদিন যুদ্ধ বাধত তাহলে ওই নিরপরাধ মনের মানুষগুলো কুরাইশদের পক্ষে এবং মহানবীর বিপক্ষে অনিচ্ছাকৃত ভাবেই যুদ্ধ করতে বাধ্য হতেন। এবং তাঁদের অনেকেই সেই যুদ্ধে মারাও যেতেন। কিন্তু অন্তর্যামী

আল্লাহ্ এটা চাননি। তাই তাঁর দূতের দ্বারা যুদ্ধ সংঘটিত হলো না। এটাও ছিল যুদ্ধ না করার একটা কারণ। তাই কোরআন বলে—

"ওরাই তো (কুরাইশগণ) অবিশ্বাস করেছিল, এবং তোমাদের নিবৃত্ত করেছিল মসজেদুল হারাম (কাবা) থেকে, এবং কোরবানির পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছাতে বাধা দিয়েছিল। মক্কায় অবিশ্বাসীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী না থাকলে, যাদের অজ্ঞাতসারে (যুদ্ধক্ষেত্রে) হত্যা করলে তোমরা (পরে) অনুতপ্ত হতে। এইজন্য যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। যদি ওরা পৃথক থাকত, তাহলে আমি অবিশ্বাসীদের দ্বারা যুদ্ধ বাধিয়ে ওদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।"

কোরআন—৪৮ ঃ ২৫

পরবর্তীকালে দেখা গেল মক্কা বিজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বিশ্বাসী নর-নারীগণ মহানন্দে মহানবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তাঁরা মুনাফেক আবু সুফিয়ানের মতো উড়তে না পেরে অগত্যা অতি অনিচ্ছাকৃতভাবে ভেতরে ভেতরে চরম শত্রুতা পোষণ করে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেননি। তাঁরা ছিলেন নির্মল প্রাণ মুসলমান। তাই আল্লাহ্ তাঁদের রক্ষা করলেন।

হযরত তাঁর কোরবানির প্রাণীগুলোকে কোরবানি দিলেন। এবং মাথা মুণ্ডন করে মদিনার পথে যাত্রা করলেন। এদিকে মুসলমানগণ হোদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করতে থাকলেন। কেউ বলেন ভাল, কেউ বলেন মন্দ। মক্কা ও মদিনার মাঝখানে আল্লাহ্ কোরআন শরীফের ৪৮ নং সূরা 'ফাতহ্' অবতীর্ণ করলেন। এই বিখ্যাত সন্ধিকে কেন্দ্র করেই সূরা ফাতহ্ অবতীর্ণ হলো।

মহম্মদ (দঃ) অত্যন্ত খুশি। যেহেতু আল্লাহতায়ালা এই সূরার মধ্যে দিয়ে তাঁকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন হোদাইবিয়ার সন্ধি তাঁর বিরাট জয়। এবং আরও তাঁকে জানিয়ে দিলেন—পরবর্তী যুদ্ধে জয়ের জন্য। হযরত যা কিছু করেছেন—আল্লাহ্ সব কিছুই অনুমোদন করলেন এবং মুসলমানদের অন্তরে শান্তি দান করলেন।

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয়ে বিজয় দান করেছি।" কোরআন—৪৮ ঃ ১। এটা হোদাইবিয়ার সন্ধিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল।

"তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করবেন।" ৪৮ ঃ ৩। এটা মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী। হযরত ১০,০০০ সৈন্যসহ বিনা বাধায় নীরবে মক্কা বিজয় করলেন। ৪ ও ৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ মুসলমানদের অগ্নিপরীক্ষার জন্য সান্ত্বনা দিয়েছেন। ১০ নং আয়াতে বৃক্ষতলের আনুগত্যের শপথকে আল্লাহ্ বলেছেন—"তাঁদের হস্তসমূহের উপর আল্লাহর হাত আছে।" এখানে যেন হযরতের হাতকে আল্লাহর হাত বলা হয়েছে। কোরআন শরীফে এরূপ বর্ণনা আরও আছে,—'তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তুমি (ধূলি) নিক্ষেপ করনি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।" কোরআন—৮ ঃ ১৭

এখানে গূঢ় রহস্য—অনেক সময় হযরত আল্লাহ্‌তে লীন হয়েছেন বা আল্লাহ্‌ময় হয়েছেন, তবে আল্লাহ্ হননি। কিন্তু আল্লাহ্‌ময় হওয়ার জন্য হযরতের মধ্যে আল্লাহর শক্তির প্রয়োগ হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর মুখ ও হাত দিয়ে বলিয়েছেন বা করিয়েছেন। যেখানে

হিন্দু-সমাজের কেউ কেউ বা অনেকেই বলে থাকেন—"স্বয়ং ভগবান", প্রত্যেক মানুষই যখন তাঁর আপন চরিত্রগত গুণের দ্বারা মনুষ্যত্বের দ্বারা মানবতার দ্বারা আল্লাহ্তে বা ঈশ্বরে লীন হতে পারেন, তখনই মানুষ মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে পৌঁছান। ইসলামের আলিকুল, সূফীকুল ও দরবেশগণের কেরামত এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

১১ থেকে ১৫ নং পর্যন্ত আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা অজুহাত দেখিয়ে জেহাদে যোগদান করেনি। ১৬ নং আয়াতে যে মরুবাসী পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তাদের জন্য বলা হয়েছে, যদি তারা আগামী যুদ্ধে যোগদান করে, তা হলে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন, পুরস্কার দেবেন। ১৭ নং আয়াতে অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ণ প্রভৃতি মানুষদের ক্ষমা করা হয়েছে। ১৮ নং-এ বৃক্ষতলের আনুগত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। ২০ ও ২১ নং-এ আল্লাহ্ আগামী যুদ্ধে বিপুল সম্পদ লাভের কথা বলেছেন।

এই সূরার বাকি আয়াতগুলোতেও আল্লাহ্ যুদ্ধ সম্পর্কেই বলেছেন। এখানে রসুলুল্লাহর সত্যের প্রতি গভীর মনোভাবই যেন আল্লাহ্কে খুশি করেছে, তাই তিনি তাদের সুবিধার্থে পরবর্তীকালে তাঁর প্রতি বিভিন্ন সময়ে কোরআন নাজেল করেছেন। এ যেন হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর অনন্যসাধারণ চরিত্রের অর্জিত ফল। এ যেন শুধু নির্জলা নিরামিষ, করুণা মাত্র নয়, তাঁর কঠোর সাধনার ফল বা ফলশ্রুতি—'কোরআন শরীফ'।

আবু বাসিরের কাহিনী ঃ এই সময়ে আবু বাসির নামে একজন যুবক তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতেই মদিনায় চলে আসে। মক্কাবাসীগণ সঙ্গে সঙ্গে তার মালিকের একটি পত্র নিয়ে মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট পাঠালেন—যাতে তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়। বাসির আবু জুনদলের মতো বহু কথাই বলল, কিন্তু হযরত তাঁর পূর্ব কথামত অনড়। তিনি দ্বিধাহীনভাবে তাকে মক্কাবাসীদের সঙ্গে মক্কায় ফেরত পাঠালেন। ফেরার পথে বাসির তার একজন রক্ষীকে হত্যা করে পুনরায় মদিনায় পালিয়ে আসে। কিন্তু মহম্মদ (দঃ)-এর তাঁকে ফেরত পাঠানো ব্যতীত কিছুই করার ছিল না। তখন বাসির নিরুপায় হয়ে সিরিয়ার পথে সমুদ্রতীরে পলায়ন করল। এদিকে মক্কাতে ওইরূপ দীক্ষান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৭০ জন। মহম্মদ (দঃ) তাদের আপাতত কোন সাহায্যই করতে পারেন না, অর্থাৎ দিনের পর দিন মক্কাবাসীগণ তাদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবে, তখন তারা সকলেই একযোগে আবু বাসিরের নিকট পালিয়ে গিয়ে তাকে নেতারূপে গ্রহণ করল।

এখন এই দলটি স্বাধীনতার সুযোগ পেল নিজেদের বাঁচাবার জন্য এবং তারা সময়মত, সুযোগমত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কুরাইশ মরু-যাত্রীদের পথিমধ্যে আক্রমণ করতে থাকল। তখন কুরাইশগণ হযরতের নিকট সন্ধির এই শর্তটিকে বাতিল করার জন্য প্রার্থনা জানাতে বাধ্য হলো। তখন থেকে আর কোন কুরাইশ দীক্ষান্ত ব্যক্তিকে আর কুরাইশদের নিকট হযরতকে ফেরত পাঠাতে হতো না। এই সুযোগে ওই ৭০ জন ও অন্যান্য আরব বেদুইন সকল দিক থেকেই হযরতের সঙ্গে যোগ দিল। এইভাবে সন্ধির যে শর্তটি মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে আপত্তিকর ও অপমানকর ছিল, কালে সেটাই কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াল। এই ব্যাপারে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নিকটতম সঙ্গীদের মধ্যে হযরত ওমর সবচেয়ে বেশি অভিযোগ তুলেছিলেন। আজ তিনি হযরতের দূরদর্শিতায় সর্বপেক্ষা খুশি।

না পেরে বুঝিতে তব কৃপা ও কল্যাণ
আঁসুজলে ক্ষোভে ভরে করি অভিমান।
কি রহস্য রাখ তুমি কোথায় কি ভাবে
মানুষেব শক্তি নাই সেই ভেদ পাবে।
ধনী ও গরিবে তুমি করনি সমান
কৃপা করে রাখিয়াছ দূর ব্যবধান।
না পেরে বুঝিতে তব বিচিত্র বিধান
মোরা শুধু বলে থাকি করনি সমান।

কোরআনের মতে হোদাইবিয়ার সন্ধি বিরাট জয় ঃ সকলেব চোখেই প্রথমত মনে হয়েছিল হোদাইবিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য একেবারেই অপমানজনক, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ওই সন্ধি যে কত বড় বিজয় তা প্রমাণিত হলো। হযরত আবুবকর বলেছিলেন---ইসলামে এমন কোন জয় নেই যার গুরুত্ব হোদাইবিয়ার সন্ধি অপেক্ষা বেশি। মানুষ সাধারণত আপাত ফলেই ধাবমান কিন্তু আল্লাহ্ দেন স্থায়ী ফল, তবে একটু দেরিতে।

এই সন্ধির পূর্বে মুসলমান ও অন্যান্য সকল লোকের মধ্যে একটা বাধার দেওয়াল ছিল, অর্থাৎ কেউ কারও সঙ্গে কোন কথা বলতে পারত না। সাক্ষাৎ মানেই ছিল সংগ্রাম। এখন এই সন্ধির ফলে তা চিরতরে নিবস্ত হলো। তার পরিবর্তে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস স্থান পেল। যে কোন সাধারণ মানুষ যখনই ইসলামের কথা শুনতে থাকল তারা স্বেচ্ছায় ইসলামে যোগদান করতে থাকল। মাত্র ২২ মাসে এই সন্ধির ফলে যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা অতীতের সমস্ত সংখ্যা অপেক্ষা বেশি ছিল। অর্থাৎ 'সত্য' আরবদের মধ্যে বিরাট আকারে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

হোদাইবিয়ার সন্ধি দু'পক্ষেব মাঝে বিশ্বাসের স্থান কবে দিয়েছিল। এই সন্ধি প্রায় দু'বছর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল. তাতে কুরাইশদের এত ক্ষতি হবে, তারা চিন্তাও করতে পারেনি। অর্থাৎ তারা আপন সুবিধামত সন্ধিশর্ত করেছিল। পরিশেষে তারা হযরতের কাছে সন্ধি বাতিল করার জন্য আবেদন করতে বাধ্য হয়। কোরআন—৪৮ ঃ ১

মহিলা মুহাজেরাত ঃ এঁদের কথা সন্ধিতে উল্লেখ ছিল না। অর্থাৎ পুরুষদের সম্পর্কে সন্ধিতে বলা ছিল---তাদেব ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু মহিলাদের সম্পর্কে কোন কথাই বলা ছিল না। তাই কোরআন তাঁদের সম্পর্কে বলেছিল—"হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের নিকট বিশ্বাসী নারী দেশত্যাগ করে আসলে তাদের পরীক্ষা করো। আল্লাহ্ তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক্ অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা বিশ্বাসী, তবে তাদেব অবিশ্বাসীর নিকট ফেরত পাঠিও না। বিশ্বাসী নারী অবিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয় এবং অবিশ্বাসীগণ বিশ্বাসী নারীদেব জন্য বৈধ নয়। অবিশ্বাসীরা যা ব্যয় করেছে, তা ওদের ফিরিয়ে দাও এবং যখন তোমবা তাদের মোহর দাও তখন তাদের বিয়ে করা তোমাদের অপরাধ নয়। তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবে না, তোমরা যা ব্যয়

করেছ তা ফেরত চাইবে। এবং অবিশ্বাসীরা ফেরত চাইবে, তারা যা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর বিধান, তিনি তোমাদের মধ্যে এই আদেশ করেছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।"

কোরআন—৬০ ঃ ১০

মুসলমান নরনারীর মধ্যে শপথ ঃ "হে নবী! বিশ্বাসী নারীগণ তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ করতে এসে বলে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, অপরের সন্তানকে স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে দাবি করবে না, এবং সৎ কাজে তোমাকে অমান্য করবে না। তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো, এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াময়।" কোরআন—৬০ ঃ ১২

হযরত মহম্মদ (দঃ) ষষ্ঠ হিজরীর ১২ জুলহজ হোদাইবিয়ার শান্তি সন্ধির পর মদিনায় ফিরে এলেন। তাঁর এই অভিযানে সর্ব মোট তিন সপ্তাহ সময় লাগে।

এই বছরের বাকি দিনগুলোতে হযরত মহম্মদ (দঃ) পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত থাকলেন। যখনই তাঁর মহান ব্রতের পরিকল্পনা তাঁর নিকট পরিষ্কার হয়ে উঠল, তখন তিনি আর একটি দিনও নষ্ট করলেন না। তিনি জুলকাদ মাসের প্রথম তারিখে মদিনা ত্যাগ করলেন। সুতরাং তিনি হোদাইবিয়ার মহা ঝামেলা সেরে মদিনাতে মাত্র পনেরো দিনও অপেক্ষা করলেন না। এটা কোন বিশ্রাম নয়, পরবর্তী পরিকল্পনার প্রস্তুতিকাল। কেননা তিনি ছিলেন এমনই কর্মবীর, যাঁকে কোনদিনই কোনরূপ ক্লান্তিই স্পর্শ করতে পারেনি। অতিমানবের বিশ্রাম বলে কিছু ছিল না। তাই তাঁর জীবনের একটি দিন সাধারণ মানুষের এক বছরের সমান।

হোদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত মুসলমানদের বিবাহ সম্পর্কে কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। ৬২৮ খ্রীস্টাব্দে এই সন্ধির পর বিবাহ সম্পর্কে বাধা-নিষেধ অর্পিত হলো।

কোরআন—২ ঃ ২২১

অষ্টাদশ অধ্যায়

ইসলামের আমন্ত্রণ, মুতা অভিযান, হজ্জ সমাপন

সপ্তম ও অষ্টম হিজরী

১০ মার্চ, ৬২৪ খ্রীঃ—২৮ জুলাই, ৬২৯ খ্রীঃ

খাইবার বিজয় ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবন চিরদিনই ঘটনাবহুল। সপ্তম হিজরী থেকে ঘটনাপ্রবাহ এতই বেগবান যে, প্রধান ঘটনাগুলোর উল্লেখই তখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই ঘটনাগুলোকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ইসলামের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তন, অন্যটি ইসলামের আধ্যাত্মিক উন্নতি। তার মানে তখন থেকেই ইসলামের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দুটি ধারা প্রবল বেগে ধাবমান।

এ সময় থেকেই মুসলমানগণ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রচেষ্টার মাধ্যমে লিখতে ও পড়তে আরম্ভ করলেন। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল কোরআন শরীফ শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই শিক্ষাধারা এতই বেগবান হয়ে উঠল যে, এই শিক্ষা গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যে একটি অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন জাতি হয়ে উঠল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞ, বিচারক, ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ, শাসক, সেনাধ্যক্ষ ইত্যাদি।

মহান আল্লাহর প্রতি হযরতের জ্ঞান, তেজ ও বিশ্বাস এবং চির-অম্লান দূরদর্শিতা তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এমনি একটি শক্তির উদ্ভাবন ঘটাল যে, তাঁরা বহু রাজা-বাদশা অপেক্ষা শক্তিমান হয়ে উঠলেন। তাঁদের আত্মা যে কোন কুসংস্কার, অন্ধ রীতি-নীতি থেকে মুক্ত হলো। তারা সরাসরি মহান আল্লাহর এবাদত আরম্ভ করলেন, মাঝে থাকল না কোন দেবদেবী, কেননা তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন আত্মা একমাত্র এক আল্লাহর স্মরণেই শান্তি পেতে পারে। জীবনের এই জ্ঞান দ্বারাই সুমহান আল্লাহ্‌কেই তাঁরা তাঁদের একমাত্র মালিক বা সর্বশক্তিমান বলে জানতে পেরেছিলেন এবং বরণ করেছিলেন জীবনে। তাই জাগতিক কোন কিছুই তাঁদেরকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। "লা-ইলাহা-ইল্লালাহ"—আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, এই মহামন্ত্রই তাঁদেরকে দিয়েছিল অমিতশক্তি, যে শক্তির বলে তাঁরা জগতের সমস্ত শক্তিকে প্রশমিত করতে শক্তি পেয়েছিলেন। তাঁরা হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে মেনে নিয়েছিলেন ওই শক্তি দ্বারা, তাঁকে মেনেছিলেন মহামানব রূপে মহাশক্তির সর্বশক্তির দূতরূপে। তাঁরা জানতেন মহম্মদ (দঃ)-এর আদেশ আল্লাহরই আদেশ, তাঁর নির্দেশ আল্লাহরই নির্দেশ, তাঁর নিষেধ আল্লাহরই নিষেধ।

খাইবারের পথে হযরত মহম্মদ (দঃ) ঃ এই প্রথম হযরত একটি যুদ্ধের পরিষ্কার ফলাফল যুদ্ধের পূর্বেই জানতে পারলেন। এটা আল্লাহ্ তাঁকে জানালেন এই জন্য যে, তাঁরা হোদাইবিয়ার পথে যে কষ্ট, যে ধৈর্যধারণ করেছিলেন এটা যেন তাঁরই প্রতিদান ও পুরস্কার স্বরূপ। হযরত মহম্মদ নিজে জানতে পেরেছিলেন এই জয়টা হবে খাইবারে ইহুদীদের ওপর। তবে কাউকে বিন্দুবৎ জানতে দেননি। কারণ এটাও তিনি

জানতেন, এই ফল পেতে তুমুল যুদ্ধ করতে হবে। কারণ আল্লাহ্ নিজ হাতে কিছুই করবেন না বা করেন না। কোরআন—১৩ ঃ ১১

সপ্তম হিজরীতে মহম্মদ (দঃ) মহরম মাসের প্রথম তারিখে তাঁর সমস্ত সঙ্গীদের নিয়ে খাইবারের পথে যাত্রা করলেন, যাঁরা হোদাইবিয়ার পথে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তিনদিনের পথ অতিক্রম করার পর তিনি ইহুদীদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সুরক্ষিত দুর্গ খাইবারে পৌঁছালেন। এই খাইবার থেকেই বানু নাজির গোত্র হযরতকে অবিরাম যন্ত্রণা দিচ্ছিল ও শত্রুদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছিল। ইহুদীগণ একটা যুদ্ধের আশঙ্কা করেছিল, তবে এত তাড়াতাড়ি নয়। সপ্তম হিজরীর ৪ঠা বা ৫ম দিবসে (১৫ মার্চ ৬২৮ খ্রীঃ) ইহুদীরা তাঁদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলো। তখন ওই দিগন্তে হযরত ও তাঁর অনুগামীগণ ব্যতীত আর কেউই ছিলেন না। হযরতের সঙ্গে একশোজন অশ্বারোহী ছিলেন। সকল ইহুদী তাঁদের দুর্গে প্রত্যাবর্তন করল।

• **জল্পনা-কল্পনা ঃ** এই শক্তিশালী ইহুদীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সত্যিকারের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। কেননা তাঁর শক্তি ছিল অতি সীমিত, পক্ষান্তরে বিরোধীপক্ষের শক্তি প্রবল। তাই আরবগণ হযরতের ওপর অনেকেই বাজি ধরল। বেদুইনগণ তো যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়েই দিল হযরতের পক্ষে এ জয় অসম্ভব। তাদের যুক্তি—যখন দশ হাজার সৈন্যসামন্ত খাল পেরিয়ে মদিনা ঢুকতে সক্ষম হয়নি, তখন হযরতের কতকগুলো মাত্র সৈনিক কি করে ওই বিরাট দেওয়াল ও বিশাল লোহার দরজা ভেদ করবে। এটা অসম্ভব। সুতরাং হযরত এবার উচিত জবাব ও ভাল শিক্ষাই পাবে।

ইহুদীদের পণ—জয় অথবা মৃত্যু ঃ ইহুদীগণও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল এ যুদ্ধে তারা হারলে তাদের অবস্থা বানু কুরাইজাদের মতোই হবে। তাই তারা জীবন-মরণ পণ করে তাদের নেতা সাল্লাম বিন মিসকামের সঙ্গে পরামর্শ করল, ওয়াতি এবং সুলালিম নামক দুর্গে তারা তাদের ধন-সম্পদ ও মেয়েদের সুরক্ষিত করল। তাদের ধনাগার ছিল নায়িম নামক দুর্গে। আর তাদের সৈন্যবাহিনী থাকত নাতাত নামক দুর্গে।

ইহুদীদের সাতটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল, যথা—১। ওয়াতি. ২। সুলালিম, ৩। নায়িম, ৪। নাতাত, ৫। কামুস্, ৬। সাব. ৭। যুবাইর। এবং কতকগুলি সুরক্ষিত বাড়িও ছিল। ইহুদীদের ধারণা ছিল, তাদের বহু সুরক্ষিত দুর্গ আছে, সুতরাং হযরত একের পর এক দুর্গ আক্রমণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাবেন। কারণ দুর্গগুলোকে একসঙ্গে অবরোধ করার মতো সৈন্য হযরতের ছিল না। তাই তারা বুদ্ধি করে তাদের মালপত্রগুলোকে বিভিন্ন দুর্গে ছড়িয়ে রাখল। যাতে হযরত একটা দুর্গ আক্রমণ করলেই—সবগুলো হাত ছাড়া না হয়ে যায়।

এদিকে হযরতের দীর্ঘদিন মদিনা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকা সম্ভব ছিল না, যেহেতু মদিনা তখনও সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত নয়। সেইজন্য শ্রেষ্ঠতম রণকুশলী হযরত প্রথম ধন-সম্পদ লাভের আশা না করেই যারা মাল-সম্পদ রক্ষা করবে ইহুদীদের সেই দুর্গ নাতাত আক্রমণ করার উপদেশ দিলেন। ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। পঞ্চাশ জন মুসলমান আহত হলেন। এদিকে ইহুদী সাল্লাম বিন মিসকাম হলেন নিহত, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন হারিস বিন আবি জাইনাব

অথবা কোন কোন মতে কিনান বিন আবু হোকাইক, যিনি দুর্গ নায়িমের জন্য অবরোধকারী সৈনিকদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্য অবরুদ্ধ সৈনিকদের বহির্গমনের জন্য গোপন সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করেছিলেন। বানূ খাজরাজও ভীষণভাবে দুর্গকে ঘেরাও করল। ইহুদীগণ তাদের সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল। কেননা তারা জানত হেরে গেলে এটাই তাদের শেষ যুদ্ধ।

দিন অতিবাহিত হতে লাগল কিন্তু মুসলমানগণ দুর্গ দখল করতে পারলেন না। তখন হযরত (দঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে সেনাপতি হিসাবে পাঠালেন। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) প্রাণপণে যুদ্ধ করেও দুর্গ দখল করতে পারলেন না। পরদিন তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে পাঠালেন। কিন্তু তিনিও দুর্গে প্রবেশ করতে পারলেন না। তৃতীয় দিন হযরত মহম্মদ (দঃ) হযরত আলিকে ইসলামের পতাকা সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন এবং বললেন—"এই ইসলামের পতাকা নাও এবং যাও যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাকে বিজয়ী করেন।"

যখন হযরত আলি দুর্গে পৌছালেন সঙ্গে সঙ্গে অবরুদ্ধ সৈনিকেরা বের হয়ে পড়লেন। ভীষণ মারাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ হলো। একজন ইহুদী যোদ্ধা এমন ভীষণভাবে হযরত আলিকে আক্রমণ করলেন যে আলির ঢাল ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। আলিও সঙ্গে সঙ্গে ওই ভাঙা ঢালকে দূরে নিক্ষেপ করে দুর্গের একটি লৌহ কপাটকে ঢালরূপে ব্যবহার করে মারাত্মকভাবে যুদ্ধ করতে আরম্ভ কবলেন। পরিশেষে তিনি বিজয়ী হলেন। ইহুদীদের নেতা হারিসের পতন হলো। মুসলমানগণ প্রচণ্ডভাবে দুর্গ আক্রমণ করলেন, কিন্তু তাদের পূর্ণ বিজয় হলো না। কেননা তখন চারটি দুর্গ দখল করতে বাকি। এদিকে খাদ্যদ্রব্যের অভাবে মুসলমানগণ অশ্ব জবেহ করে আহারের ব্যবস্থা করলেন। এই যুদ্ধে হযরত আলি তাঁর ঢাল ভেঙে যাওয়ায় দুর্গের যে লৌহ কপাটটিকে তিনি ঢালরূপে ব্যবহার করেছিলেন, যুদ্ধ শেষে সেটিকে নামিয়ে দেওয়ার পব, ওই ঢালটিকে তার যথাস্থানে পূর্ববৎ স্থাপন করার জন্য সাত জন বিখ্যাত বীরের প্রয়োজন হয়েছিল। অথচ মহাবীর আলি ওটাকে সারাদিন বাঁ-হাতে ঢাল রূপে ব্যবহার করেছিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে জয়ের পরই মহানবী (দঃ) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' আল্লাহর সিংহ নামে ভূষিত করেন।

একদিন হযরত আলি রুটি সামান্য শক্ত হওয়ার জন্য বিবি ফাতেমাকে কিঞ্চিৎ অনুযোগ করলে, বিবি ফাতেমা বলেন—"তুমি খাইবাব বিজয়ী বীর, অথচ এইটুকু শক্ত রুটি ছিঁড়ে খেতে পারছ না? উত্তরে আলি বলেন—"রুটি খাই ক্ষুধার তাগিদে এবং আপন শক্তিতে। কিন্তু যুদ্ধ করি ইসলামের তাগিদে ও আল্লাহর শক্তিতে।"

অবস্থার চাপে ইহুদীগণ কামুস নামক দুর্গে নিজেদের স্থানান্তর করলেন। মুসলমানগণ সেটাও দখল করে নিলেন। কিন্তু কোন দুর্গেই খাবার না পাওয়ায় ভীষণ খাদ্যাভাবে পড়লেন। সুচতুর ইহুদীগণ ওই সমস্ত দুর্গের কোনটিতেই খাদ্যসম্ভার রাখেননি।

এরপর ইহুদীগণ 'আলসাব' নামক দুর্গে স্থানান্তরিত হলো। তারা মরিয়া হয়ে জীবন-মরণ যুদ্ধ আরম্ভ করল। সূচাগ্র পরিমাণ স্থানও যারা বিনা যুদ্ধে ত্যাগ করেনি, তারা যত বড় যোদ্ধাই হোক, আল্লাহর অসীম শক্তির কাছে তারা অজেয় হতে পারে না। আল্লাহর ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা। তাই তারা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেও হেরে গেল আল্লাহর দেওয়া শক্তির

কাছে, যে শক্তি মুসলমানদের দিয়েছিলেন। এই দুর্গটিও মুসলমানদের হস্তগত হলো। এবার হস্তগত হলো প্রচুর খাদ্যসম্ভার।

ইহুদীদের নেতা 'মারহাব' গর্বভরে কবিতা পাঠ করতে করতে মুসলমানদের আহ্বান জানালেন। তখন হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর লোকদের আহ্বান জানালেন—"কে এই লোকটির সঙ্গে লড়বে?" হযরতের অনুমতি নিয়ে মহম্মদ বিন মাসলামাহ্ বের হলেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। মারহাব এত জোরে তরবারি নিক্ষেপ করল যে সকলের মনে হলো মাসলামাহ্ নিহত হলেন, কিন্তু মাসলামাহ্ আপন ঢালের দ্বারা নিজেকে রক্ষা করে মারহাবকে বধ করলেন। এভাবে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হতে লাগল প্রবল বিক্রমে।

এবার ইহুদীগণ 'আল জুবাইর' নামক দুর্গে আশ্রয় নিল। এখন ইহুদীদের আর দুটো মাত্র দুর্গ বাকি—"ওয়াতি" ও "সুলালিম"। যে দুটোতে ইহুদীদের সমস্ত মূল্যবান সম্পদ ও মহিলাগণ সুরক্ষিত ছিল।

ইহুদীগণ মর্মে মর্মে অনুধাবন করল—এবার শেষ অধ্যায়। সুতরাং তাঁরা অতি বিনীতভাবে হযরতের নিকট লিখিত শর্তে শান্তি প্রস্তাব দিলেন—১। তাদের জীবন, সম্পত্তি ও মহিলা এবং শিশুগণকে স্পর্শ করা হবে না। ২। তারা তাদের দেশের অর্ধেক উৎপন্ন ফসল হযরতকে দেবেন। ৩। এবং তারা তাঁর অনুগত প্রজারূপে বাস করবেন। হযরত তাদের শর্ত মেনে নিলেন। ইহুদীগণ মুক্তি পেলেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মতো বড় রকমের শিক্ষাও পেলেন।

এই সন্ধিতেও হযরত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আত্মসমর্পণকারী শত্রুকে তিনি ক্ষমা করলেন। এই ক্ষমা একদিক দিয়ে তাঁর মহান হৃদয়ের ধর্ম, অন্যদিক দিয়ে এক অতুলনীয় জাগতিক লাভ। যদি তিনি তাদের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করতেন কিংবা বিতাড়িত করতেন তাহলে ওই ভূমিগুলো আবাদ করার মতো কোন লোক থাকত না। ফলে হযরতের এই মহাবিজয় ফলশূন্য প্রতিশোধ রূপে দেখা দিত। কিন্তু তিনি তা করেননি। এদিকে ইহুদীগণও চিরদিনের জন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলেন। এবং হযরতও এখানকার উৎপন্ন ফসল দ্বারা মদিনাবাসীদের কিছু সাহায্য করতে পারলেন। প্রতি বছর আবদুল বিন রাহা খাইবারে আসতেন ও উৎপন্ন ফসলের ভাগ নিতেন।

হযরতের মানবতা এতই গগনচুম্বী ছিল, তিনি এই যুদ্ধে যা কিছু যুদ্ধলব্ধ ধন পেয়েছিলেন, তার সমস্ত কিছুই মজুত রেখেছিলেন। পরে সেগুলি সবই ইহুদীদের ফেরত দেন, যেহেতু সন্ধি হয়েছিল। এই খাইবার বিজয়ে হযরত আলি তাঁর অসীম বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য মহানবী কর্তৃক আসাদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সিংহ উপাধি লাভ করেন।

হযরত মহম্মদ (দঃ) তখনও খাইবারের শান্তি প্রস্তাবের শর্তাদি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় তিনি ফিদাক নামক স্থানে একটি অভিযান পাঠালেন। সেখানেও ঠিক খাইবারের মতো শর্তেই শান্তি সন্ধি হলো। সেখানকার অর্ধেক ফসল মুসলমানগণ লাভ করলেন।

এবার হযরত খাইবার থেকে 'ওয়াদিল কুরার' পথে যাত্রা করলেন। সেখানকার ইহুদীগণ যুদ্ধ করল এবং হেরে গেল এবং শেষ পর্যন্ত খাইবারের মতো শান্তি সন্ধি করে মুক্তি পেল। এদিকে তাইমার ইহুদীগণ বিনা যুদ্ধে খাইবারের সন্ধি শর্ত মেনে নিয়ে চুক্তি করল।

ঠিক এভাবেই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র উত্তর আরবের সঙ্গে মুসলমানদের শত্রুতার অবসান হলো। যেমন হোদাইবিয়ার সন্ধিতে দক্ষিণ আরবের সঙ্গে মুসলমানদের শত্রুতা মিত্রতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এ শুধু বিচক্ষণতারই মহাবিজয়। এভাবে সমগ্র আরব মুসলমানদের পতাকাতলে আসে।

খাইবারে হযরতের ওপর বিষ প্রয়োগ ঃ ইহুদীগণ এমন এক জাতি যাদের কৌশল-কলাকৃতি বড়ই অদ্ভুত। তারা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে শান্তি প্রস্তাব করল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে গভীর ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত থাকল, কিভাবে তাঁকে হত্যা করা যায়। একদা এক ইহুদী নেতা হারিসের কন্যা এবং আর এক ইহুদী নেতা সাল্লাম বিন মিসকামের স্ত্রী জয়নাব হযরতকে নিমন্ত্রণ করলেন। যথাসময়ে হযরত ও তাঁর সঙ্গীগণ তার বাড়িতে খেতে বসলেন। হযরত এক মুষ্টি খাবার মুখে দেওয়ামাত্রই বের করে ফেলে দিয়ে বললেন—এ বিষাক্ত খাদ্য। বিসার বিন বরা নামক এক ব্যক্তি সামান্য খাদ্য গিলে ফেলায় সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করলেন।

এই বিষ প্রযোগ করেছিল জয়নাব কিন্তু এর মূলে ছিল তাদের পুরুষদের গোপন ষড়যন্ত্র। জয়নাবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অকপটে তার সমস্ত দোষ স্বীকার করলেন। কেউ কেউ ভাবলেন তার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক, আবার কেউ কেউ ভাবলেন তার অপরাধ যতই গুরুতর হোক না কেন, তাকে ক্ষমা করাই উচিত, কারণ এ যুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর মৃত্যু হওযায় তার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। পক্ষান্তরে দেখা গেল এই ঘটনায় মুসলমানদের মনে ইহুদীদের সম্বন্ধে অবিশ্বাস জন্মাল। তারা কত নীচ বিশ্বাসঘাতক।

এই যুদ্ধে যে সমস্ত রমণী বন্দী হয়েছিল তার মধ্যে বিবি সফিয়াও ছিলেন। তিনি ছিলেন বানু নাজির গোত্রের হোয়াই বিন আখতারের কন্যা। তিনি একজন সাহাবির ভাগে পড়লেন, তখন তিনি হযরতের নিকট দাসী রূপে থাকার জন্য প্রার্থনা জানালেন। হযরত তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তাঁকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন। হযরত জীবনে কাউকেই দাস-দাসী রূপে রাখেননি।

ইসলাম প্রচার [মদ্যপান নিষিদ্ধ] ঃ ইতিমধ্যে নামায, রোযা, যাকাত ও হজ সম্পর্কে কোরআনের বাণী অবতীর্ণ হয়ে গেছে। জুয়া ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু মদ আরবের এতই প্রিয় ছিল যে, একদিনে ওটাকে বন্ধ করলে তার বিপরীত ফল দেখা যেতো। তাই সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্তায়ালা প্রথমে জানিয়ে দিলেন—তোমরা যখন মদ পান করবে, তখন নামায পড়বে না, কেননা মদ্যপানে মানুষের কোন বোধশক্তি থাকে না। সুতরাং ওই সময় তারা নামাযে কি বলছে তা নিজেরাই জানতে পারবে না। এবার যখন মুসলমানরা আপন ইচ্ছায় মদ্যপান ছেড়ে দিতে লাগল, তখন কোরআন একদিন জানিয়ে দিল মদ ও জুয়া একেবারেই হারাম বা নিষিদ্ধ। কোরআন—২ ঃ ২১৯, ৪ ঃ ৪৩, ৫ ঃ ৯০

বিভিন্ন শাসনকর্তাদের প্রতি ইসলামের আমন্ত্রণ ঃ খাইবার বিজয়ের সময়ই হযরত মহম্মাদ (দঃ) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শাসনকর্তাদের নিকট ইসলামের মহান আমন্ত্রণ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। যে সকল দেশে তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন তাদের কিছু কিছু আমরা আলোচনা করব।

আরবের সন্নিহিত যে দুটি সাম্রাজ্য পাশাপাশি ছিল তাদের একটি হারকিউলিসের অধীনে বাইজানটাইন এবং অন্যটি কেসরার অধীনে ইরান। কিন্তু তারা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করত। যখন ইয়েমেন ও ইরাক পারস্য প্রভাবে, তখন মিশর ও সিরিয়া পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবে ছিল। এবং আরব তাদের সকলেরই দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু গাসসান, ইয়েমেন, মিশর ও আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা ছিল নামমাত্র।

এদিকে হযরত মহম্মদ (দঃ) বদ্ধপরিকর সকলকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এর জন্য তাঁর কোন ভয়ের উদ্রেক হয়নি। যখনই তিনি সমগ্র আরবে আপন স্থানটিকে একটু সুরক্ষিত ভাবতে পারলেন, তখনই তিনি আরবের বাইরে নজর দিলেন। তিনি শাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহর দূত। সুতরাং সারা বিশ্বে দূতের কাজ তিনি করবেনই। তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন—"হে মানববৃন্দ, আল্লাহ্ আমাকে বিশ্বজগতের করুণা স্বরূপ পাঠিয়েছেন। সুতরাং তোমরা হযরত মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিষ্যগণের মতো মতভেদ করো না। তাঁর শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কিরূপ মতভেদ? তিনি বললেন –হযরত ঈসা (আঃ) যাঁর প্রতি তাদের ডাক দিয়েছিলেন আমিও তাঁর প্রতিই তোমাদের ডাক দিয়েছি।" তারপর তিনি বললেন—নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে দূত পাঠাচ্ছেন ঃ

১। বাইজানটাইনের হারকিউলিস,
২। ইরানের কেসরা,
৩। মিশরের মাকাকুস্,
৪। গাসসানের হারিস (হিরার রাজা),
৫। ইয়েমেনের হারিস,
৬। আবিসিনিয়ার নাজাস।

হারকিউলিসকে পত্র ঃ হযরতের সকল সঙ্গীই একমত হলেন। হযরত মহম্মদ (দঃ) একটি রূপার আংটি তৈরি করলেন এবং তাতেই খোদাই করলেন—"মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ'—মহম্মদ আল্লাহর দূত। পত্রগুলো এই আংটি দ্বারা সিলমোহর করা হতো। পত্রগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় একই ছিল। তার জন্য আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটি অনুবাদ দিচ্ছি—"পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে আবদুলার পুত্র মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট থেকে রোমের প্রধান হারকিউলিসের প্রতি। শান্তি তার সঙ্গে, যিনি অনুসরণ করেন উপদেশ। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছি। যদি আপনি এটি মেনে নেন, আপনি উপভোগ করবেন নিরাপত্তা (ইসলাম) এবং আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। যদি আপনি গ্রহণ না করেন, তাহলে আপনি আপনার সকল প্রকার পাপ বহন করবেন।" এই পত্র দেওয়া হয়েছিল—দেহ্ইয়া বিন কালবীর মাধ্যমে।

এই সময় হারকিউলিস প্যালেস্তাইনে পারস্য বিজয় উৎসব উদ্‌যাপন করছিলেন। যখন হারকিউলিস হযরতের পত্র পেলেন দেহ্ইয়া বিন কালবী এবং আদি বিন হাতেমের মাধ্যমে তখন তিনি কয়েকজন আরবীকে ডাকলেন পত্রটি বুঝিয়ে দিতে। এবং তিনি আদেশ দিলেন তার রাজ্যে আরবীয় লোকদের দরবারে হাজির হতে। তখন হযরতের চিরশত্রু আবু

সুফিয়ান সেখানে উপস্থিত হলো। হারকিউলিস অন্যান্য সকল পণ্ডিতকে তাঁর সভায় আমন্ত্রণ জানালেন। কতিপয় আরব প্রধানসহ সকলেই হাজির হলো। হারকিউলিস আরবগণকে জিজ্ঞাসা করলেন---"নবুয়তের দাবিদার লোকটি কিরূপ?"

আবু সুফিয়ান---খুব ভদ্র।

হারকিউলিস---দাবিদার কিরূপ বংশের লোক?

আবু সুফিয়ান---মহৎ।

হারকিউলিস---তাঁর বংশে কোন সময় রাজা ছিল?

আবু সুফিয়ান---না।

হারকিউলিস---যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা সবল না দুর্বল, ধনী না গরিব?

আবু সুফিয়ান---গরিব।

হারকিউলিস---অনুসারী সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে না কমছে?

আবু সুফিয়ান---বাড়ছে।

হারকিউলিস---তাঁকে মিথ্যা বলতে শুনেছেন কোনদিন?

আবু সুফিয়ান---না।

হারকিউলিস---তাঁর সঙ্গে কোন সময় যুদ্ধ করেছেন?

আবু সুফিয়ান---হ্যাঁ।

হারকিউলিস ---ফলাফল কি হয়েছে?

আবু সুফিয়ান---কোন সময় আমরা জিতেছি। কোন সময় তিনি।

হারকিউলিস---তিনি কি শিক্ষা দেন?

আবু সুফিয়ান---এক আল্লাহর আরাধনা কর। তাঁর সঙ্গে কোন শরীক করো না। নামায পড়। সৎ হও। সত্য কথা বলো।

তারপর হারকিউলিস বলেন ঃ

"আপনি বলেন---তিনি সৎ বংশজাত। নবী সবসময় সৎ বংশজাত হয়। আপনি বলেন---এর পূর্বে অন্য কেউ তাঁর বংশ থেকে নবুয়তের দাবি করেননি। যদি এরূপ হতো, তাহলে আমি চিন্তা করতাম---তিনিও সেই প্রভাবে কিছু করতে চাইছেন। আপনি বলেন---তাঁর বংশে কোন রাজা নেই। যদি এরূপ হতো তা হলে চিন্তা করতাম---রাজা হওয়ার বাসনা আছে। আপনি বলেন, তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। যিনি মানুষকে মিথ্যা বলেন না, তিনি কি করে আল্লাহ্‌কে মিথ্যা বলবেন। আপনি বলেন, গরিবরা তাকে প্রথম অনুসরণ করেছেন। এইটাই জগতের ধারা। গরিবরাই প্রথম নবীকে মেনে নেন। আপনি বলেন, তার শিষ্যসংখ্যা বেড়েই চলেছে। সত্য চিরদিন বেড়েই চলে। আপনি বলেন, তিনি কখনও কথার খেলাপ করেন না। নবী কোনদিনই প্রতারক হন না। আপনি বলেন, তিনি শিক্ষা দেন---নামায, দয়া, সততা ইত্যাদি। যদি এইগুলো সত্য হয় তাহলে তাঁর রাজ্য ওই পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে---যেখানে আমি বসে আছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম একজন নবী আসবেন। তবে তিনি আরব থেকে আসবেন এরূপ ধারণা করিনি। যদি আমি কোনদিন তাঁর দেশে যাই---তাহলে তাঁর পা ধুইয়ে দেবো।"

এই পত্রটি সর্বসাধারণে পড়ে শোনানো হলো। পত্র শোনার পর সকলেই কোলাহল ও হট্টগোল শুরু করল। হারকিউলিস সভা ভেঙে দিলেন। হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর ব্রতে বিজয়ী হলেন।

পারস্যের কেসরা-রাজের প্রতি পত্র ঃ আবদুল বিন হাদাফার দ্বারা দ্বিতীয় পত্র পারস্যরাজের নিকট পৌঁছাল।

"পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে দূত মহম্মদ (দঃ) থেকে পারস্যের কেসরার বা প্রধানের নিকট। তাঁর ওপর শান্তি যিনি মেনে নেন এই উপদেশ ও বিশ্বাস করেন আল্লাহ্ ও তাঁর দূতকে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সকল মানুষের জন্য আমি আল্লাহর দূত। আমি তাকে সতর্ক করতে পারি, যিনি বিশ্বাস করেন। মুসলমান হন এবং শান্তিতে বসবাস করুন। যদি প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে সকল পাপের বোঝা বহন করতে হবে।" কেসরা সভাসদ্‌সহ ওইরূপ আলোচনায় অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি হযরতের ওই পত্রটিকে অন্যভাবে গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, আমার একজন দাস হয়ে আমাকে এইভাবে পত্র দেওয়ার ঔদ্ধত্য। পত্রটিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দিলেন। যখন হযরত এই সংবাদ জানলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তার রাজত্বকে টুকরো টুকরো করে দেবেন।

কেসরা ইয়েমেনের গভর্নর বাজানের কাছে দূত পাঠালেন ও তাঁকে নির্দেশ দিলেন হিজাজে লোক পাঠিয়ে মহম্মদ (দঃ)-কে বন্দী করে পারস্যে পাঠাতে. বাজান মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট সৈন্য পাঠালেন কেসরার নির্দেশ মানার জন্য। তখন হযরত মৃদু হেসে তাদের বললেন, যাও ফিরে, কে কাকে বন্দী করবে. আল্লাহ্ কেস্‌রাকে বন্দী করেছেন। (কেসরা আপন পুত্র কর্তৃক বধ হয়েছিল) আরো বললেন—অতিসত্বর ইসলামের রাজত্ব পারস্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করছে। দূত ফিরে এসে কেসরার মৃত্যু সংবাদ শুনল।

নেজাসের প্রতি পত্র ঃ যে সময় চারদিকে পত্র পাঠানো হচ্ছিল তখনকার যানবাহন ব্যবস্থা খুবই দুর্গম ছিল। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে পত্র যেতে কিছু দেরি হয়েছিল। তাই অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন পত্রগুলো শুধু খাইবার যুদ্ধের পরই পাঠানো হয়নি, পূর্বেও পাঠানো হয়েছিল। এটা বিচিত্র কিছু নয়।

আমর বিন উম্যাইয়া দামরীকে নেজাসে দূতরূপে পাঠানো হলো। পূর্বেই বলেছি, পত্রগুলোর সারকথা প্রায় একই ছিল। যখন দূত পত্র নিয়ে নেজাসের নিকট হাজির হলো তার পূর্ব থেকেই ওখানে জাফর বিন আবুতালিব ইসলাম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন এবং নেজাস পূর্বেই জাফরের নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যে সমস্ত মোহাজেরিন আবিসিনিয়ায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবাও ছিলেন, যাঁর মুসলিম স্বামী মারা গিয়েছিলেন। হযরত মহম্মদ (দঃ) কুরাইশদের সঙ্গে বিশেষ করে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সম্পর্কটাকে পুনরায় মজবুত করার জন্য দূর থেকেই উম্মে হাবিবার প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁকে পত্নীত্বে বরণ করেন। তাই ইসলাম-জগতে এখনও এই নীতি অনুসারে বর ও কনে যতই দূরে থাকুন, প্রতিনিধি দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন হতে কোন বাধা নেই।

মিশরের মাকাকুসের উত্তর ঃ মিশরের মাকাকুসকে লিখিত পত্রটি হাতিব বিন আবি বালতার মাধ্যমে পাঠানো হলো। তারপর মাকাকুস তার উত্তর দিলেন।

মিশরের প্রধান মাকাকুস থেকে মহম্মদ (দঃ) বিন আবদুল্লার প্রতি উত্তর—"আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনার পত্র পড়লাম এবং পত্র মধ্যে যা বলতে চেয়েছেন তা অনুধাবন করলাম। আমি জানতাম নবী আসছেন। আমি আপনার দূতের সম্মান করেছি। আমি আপনার উপহার স্বরূপ মিশরের দু'জন সুন্দরী দাসীকে কিছু পোশাক সহ পাঠালাম (দু'জনের একজন মারিয়া কিবতিয়া, পরে বিবি মরিয়ম, ইব্রাহিমের মা, হযরতের স্ত্রী)। এবং আপনার চড়ার জন্য একটি ঘোড়াও পাঠালাম (যে ঘোড়াটি পরে ইতিহাস-বিখ্যাত দুলদুল নামে পরিচিত)। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।"

অন্যান্য প্রধানদের উত্তর ঃ ইয়ামামার প্রধান হাওদা বিন আলির উত্তর—"আপনি যা লিখেছেন তা সবই সুন্দর। আপনার রাজত্বে যদি আমাকে কিছু অংশ দেন তাহলে আমি আপনাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত।" হযরত উত্তরে না জানালেন।

রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে সিরিয়ার গভর্নর হারিস বিন গাসসানি হযরতের পত্রপাঠে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে আক্রমণ করার জন্য সেনাবাহিনীকে আদেশ দিলেন। মুসলমানগণ প্রত্যেক দিন আক্রমণের প্রতীক্ষায় থাকলেন।

ইয়েমেনের প্রধানের কাছ থেকে খুবই সন্তোষজনক উত্তর এসেছিল।

অষ্টম হিজরীতে হযরত মহম্মদ (দঃ) আরও ব্যস্ত থাকলেন—সমগ্র আরব দ্বীপপুঞ্জে ধর্মপ্রচারক পাঠানোর জন্যে। যদিও রাজা-বাদশার নিকট তিনি ইসলামের দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) পাঠিয়েছিলেন, তবুও তিনি মনে করলেন—সমগ্র সাধারণ মানুষের কাছেও ইসলামের বাণী পৌঁছানো দরকার।

এই ধর্মপ্রচারক দলের অনেকে ভালই ব্যবহার পেয়েছিলেন, আবার অনেকে নিহতও হয়েছিলেন, এ ছিল তাঁদের প্রচারের অপরিহার্য অঙ্গ। যিনি বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েছেন, তিনি যে সবসময়ই বিজয়ী হয়েছেন এমন নয়। মাঝে মাঝে অমূল্য জীবনকে তাঁর মাশুল দিতে হয়েছে। আল্লাহ্ স্বয়ং হযরতের কোন কিছু করে দেননি, যতক্ষণ না তিনি বা তাঁর অনুসারীরা জীবন-মরণ পণ করে কাজে না নেমেছিলেন। এখানে হযরত মহম্মদ (দঃ) একজন নিরাভরণ মানুষ। তবে জগতের অন্যান্য প্রচারক দলের সঙ্গে তাঁর দলের একটি পার্থক্য ছিল—তিনি কোন সময়ই কোন জাগতিক লাভের জন্য কোন দলকে কোথাও পাঠাননি।

জাতুত তালার মিশন ঃ ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত মহম্মদ (দঃ) জাতুত তালা নামক স্থানে পনেরো জনের একটা মিশন পাঠালেন। কিন্তু তাঁদের নেতা ব্যতীত সকলেই শহীদ হলেন। বসরার গভর্নর হারকিউসিলের লোকের নিকট দূত পাঠালেন। কিন্তু গাসসান গোত্রের একটি লোক তাঁকে হারকিউলিসের নামে হত্যা করেন।

গাসসানের গভর্নর হারিস ইতিমধ্যেই হযরতকে সতর্ক করেছিলেন ও ভয় দেখিয়েছিলেন—যখন তিনি তাঁদের ইসলামের দাওয়াত দেন। প্রকৃতপক্ষে পাশের যে কোন একটি রাজ্যের শাসককে ইসলামে নিমন্ত্রণ করাটাই ছিল মহাবিপদের আশঙ্কা। অনেক সময় এতে বিপদকেই যেন আমন্ত্রণ করা হয়েছিল; কিন্তু তবুও হযরত তা থেকে বিরত হননি। কেননা তিনি ছিলেন প্রচারক।

"তুমি বল, হে মানববৃন্দ। আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসুল। যাঁর আধিপত্য আসমান ও জমিনে। তিনি ব্যতীত উপাস্য নেই। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যুদান করেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। যে (ব্যক্তি) আল্লাহ্ ও তাঁর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এবং তাঁকে অনুসরণ কর যেন তোমরা সুফলপ্রাপ্ত হও।" কোনআন—৭ ঃ ১৫৮

"হে রসুল, তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর, তবে তুমি তার বাণী প্রচার করলে না। এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।" কোনআন—৫ ঃ ৬৭

এখানে কোরআন প্রচার করা ব্যতীত হযরতের অন্য কোন দ্বিতীয় পথ ছিল না। তাই তিনি ও তাঁর অনুচরগণ পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন—তাঁদের জীবনদীপ আছে আল্লাহর নিকট, তিনি যখন যাঁকে ইচ্ছা আপন করে টেনে নেবেন। এখানে তাঁরা কোন ভয়-ভীতি অনুভব করতেন না। তাঁরা শুধু অনুভব করতেন তাঁদের জীবনের আপন কর্তব্য, জীবনের একান্ত লক্ষ্য ও অভিলাষ। এই মহান লক্ষ্য থেকে তাঁরা কোনদিনই লক্ষ্যচ্যুত হননি।

মুতা অভিযান—পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের এক থেকে দেড় লক্ষ সৈনিকের বিরুদ্ধে ইসলামের তিন হাজার বীরসেনা ঃ মহানবীর দূত উমর বিন হারেস, এবং নব দীক্ষিত মুসলমান ফরওয়া বিন আমরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি নানা কারণে মুতা অভিযান পরিচালিত হয়। অষ্টম হিজরীর জামাদিয়ুল আউয়াল মাসে (৬২৯ খ্রীঃ, জুলাই) হযরত মহম্মদ (দঃ) জায়েদ বিন হারিসের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈনিকেব একটি ছোট দল পাঠালেন, পূর্ব রোম সাম্রাজ্যে শুধু প্রমাণ করাতে ক্ষুদ্র মুসলমান দল তাদের ভয়ে ভীত নন। কিন্তু এবার একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল—অভিযানের বহু পূর্বেই। হযরত যে কোন স্থানেই যখনই কোন অভিযান পাঠিয়েছিলেন তিনি তা পাঠাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত গোপন রাখতেন। কিন্তু এবার তা হয়নি। মদিনায় কিছু সংখ্যক শত্রু রয়ে যায়। যে কোন প্রকারেই হোক এই গোপন কথা তাদের কাছে পৌঁছে যায়। তারা সে খবর সঙ্গে সঙ্গে রোমে পৌঁছে দেয়।

হযরত মহম্মদ (দঃ) পূর্বেই অভিযান সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সকলকে বলেছিলেন—যদি এই অভিযানের নেতা যায়েদ বিন হারিস শহীদ হন, তাহলে জাফর বিন আবুতালিব তাঁর স্থান দখল করবে। যদি তিনিও শহীদ হন, তাহলে আবদুল্লাহ বিন রওয়াহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

ইসলামে নওমুসলিম খালেদ বিন ওয়ালিদও এই অভিযানে যোগদান করলেন। পায়ে হেঁটেই এই অভিযানের সঙ্গে মদিনার শেষ সীমা পর্যন্ত গেলেন। বিদায় বেলায় সকলকে উপদেশ দিলেন, "কেউ নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করবে না, কোন শস্যাদি নষ্ট করবে না, কোন ঘর-বাড়ি নষ্ট করবে না, গৃহপালিত জীবজন্তু হত্যা করবে না। সুতরাং এগুলো সবই যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পেল। হযরত আরও নির্দেশ দিলেন, কেউ যেন কাউকেই প্রথম আক্রমণ না করে। এ ছিল তাঁর জীবনের যুদ্ধনীতি। সুতরাং তিনি মানবতার কি মহান পুরুষ ছিলেন তা আজকের সমাজও ভেবে অবাক হয়ে যায়।

অভিযাত্রী দল চলতে থাকল—যতক্ষণ না তারা সিরিয়ার মুয়ান নামক স্থানে পৌছান, তখনও তারা জানল না, তারা কোন দেশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাচ্ছে। তাদের কি ভয়াবহ বাহিনী।

হারকিউলিসের গভর্নর সুর হবিল জানাতে পারল যে হযরতের দল এগিয়ে আসছেন। তখন তিনি তাঁর সকল গোত্রকে একত্র করলেন। এবং নিজের ও হারকিউলিসের সমস্ত সৈনিককে একত্রিত করলেন যতক্ষণ না তা এক থেকে দু'লক্ষে পরিণত হলো।

মুসলমানগণ মুয়ানে থামলেন রাতের জন্য এবং চিন্তা করতে থাকলেন কি করা উচিত। কারণ চির প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ও বিবেকবুদ্ধিমত কারও উচিত নয় এমন এক ঝুঁকি নেওয়া, যা অনিবার্যভাবে তাদের ধ্বংস করবেই। তাদের অভিযান সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ছিল না, অথচ তাদের বিরুদ্ধে বিপুল সমাবেশ। কয়েকজন খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবেই ঠিক করলেন হযরতকে এই সংবাদ দিয়ে তাঁর অনুমতি আনা হোক যে তাঁরা এখন কি করবেন। সকলেই এটা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন রাহা ছিলেন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি এমনভাবে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন সবকিছু অন্যদিকে মোড় নিল, "হে আমার বন্ধুগণ! আজ আপনারা যাকে অপছন্দ করেছেন, তা শহীদ হওয়া ব্যতীত নয় অথচ আপনারা যাত্রা করেছেন শহীদ হওয়ার জন্যই। আমরা শত্রুর সঙ্গে আমাদের সংখ্যা, আমাদের সম্পদ ও আমাদের জাগতিক শক্তি নিয়ে লড়ব না। আমরা শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করব শুধু আমাদের অদম্য বিশ্বাস দ্বারা, যে বিশ্বাসকে স্বয়ং আল্লাহ্ সম্মান দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের এগিয়ে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। আমাদের সামনে দুটো জিনিস, "জয় অথবা শহীদ"। এই তেজোদীপ্ত ভাষণ সকলকে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করে তুলল। সকলেই বলে উঠলেন—সকলেই একমত হলেন—এগিয়ে চলো ইবনে রাহা ঠিকই বলেছেন।"

এ যেন আল্লাহ্‌র মেষশাবক দল যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হতে ছুটে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ যাদের করেছিল তাঁর সিংহ স্বরূপ।

তাঁরা এগিয়ে চললো যতক্ষণ না বল্‌কা নামক স্থানে পৌছালেন। এবং লক্ষ্য করলেন মাশারাফ নামক শহরে হারকিউলিসের বিরাট বাহিনী একত্রিত হয়েছে, যখন মুসলমানগণ তাদের আরও নিকটবর্তী হলেন, তখন তারা মাশারাফ ত্যাগ করে আরও একটি উচ্চস্থান মুতাতে হাজির হলো, এবং এখানেই ইতিহাস-বিখ্যাত মুতা যুদ্ধ আরম্ভ হলো মাত্র তিন হাজার সৈনিকের সঙ্গে প্রায় দু লক্ষ সেনার—চিন্তা করতেও কেমন অবাক লাগে।

মুতা যুদ্ধের প্রথম দিন ঃ তীব্র মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড মাথায় নিয়ে তিনহাজার মুসলমান এগিয়ে চললেন প্রায় দু'লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে। প্রথম সেনা পরিচালনা করছিলেন জায়েদ বিন হারিস। তিনি বিরোধীপক্ষ দ্বারা পর পর দু'বার বিষাক্ত তীরের আঘাতে নুয়ে পড়লেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, ইন্নালিল্লাহে ও ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

হযরতের নির্দেশমত জায়েদের স্থলাভিষিক্ত হলেন জাফর। জাফরের বয়স তখন মাত্র তেত্রিশ বছর। তিনি চারদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে গেলেন। প্রথম তাঁর ডান হাত শত্রু কর্তৃক কাটা যায়। তখন তিনি তাঁর বাম হাত দ্বারা কাজ চালিয়ে যান। তখনও তিনি ঘোড়া থেকে অবতরণ করেননি। যখন তাঁর শরীর দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল, তখন তিনি আপনা হতেই পড়ে গেলেন, তাঁর শরীরের সামনের দিকে তিরানব্বইটি ক্ষতের দাগ ছিল।

এরপর আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা ইসলামের পতাকা ধারণ করলেন। তিনিও প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন, যতক্ষণ না শহীদ হলেন। তখন সাবেত বিন আরকাম ইসলামের পতাকা গ্রহণ করে বললেন—হে মুসলমানগণ! আমাদের সকলে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করা উচিত কে আমাদের নেতারূপে ইসলামের পতাকাকে বহন করবে। তখন সকলেই উত্তর দিলেন, 'আপনি'। তখন তিনি উত্তর দিলেন, আমি এর উপযুক্ত নই।

সকলেই একমত হলেন খালেদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির পদ গ্রহণ করতে। খালেদ ইসলামের পতাকা গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এই যুদ্ধে মুসলমান সেনাদের বিপদ কত ভীষণ, কত ভয়াবহ। খালেদের মতো মহাবীর মুসলমানদের মধ্যে তখন আরও ছিল, কিন্তু তাঁর মতো যুদ্ধ বিশারদ কেউই ছিলেন না। পরবর্তীকালে ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চলতে থাকল, পর পর আটখানা তরবারি খালেদের হাতে ভেঙে পড়ল, অসংখ্য রোমান সেনা তাঁর হাতে নিহত হলো, এককথায় এমন কোন রোমান বীর তাঁর সম্মুখে আসেননি, যিনি প্রাণ নিয়ে ফিরে গেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এ ক্ষণটি যেন তুলনা বিহীন। রোমানরা পেল এক মহাশিক্ষা, মহানবীর উদ্দেশ্যও তাই ছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। এরপর শত্রুপক্ষই যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন।

যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন ঃ পরদিন সকাল হওয়া মাত্রই খালেদ তাঁর সমস্ত বাহিনীকে পাতলা লাইন করে বিরাট আকারে ছড়িয়ে পড়তে বললেন, যেন শত্রুগণ মনে করে মুসলমানগণ তাঁদের ঘেরাও করেছেন। সত্য সত্যই রোমানগণ তাই ভাবল। তারা ভাবল মুসলমানদের সাহায্যের জন্য বিশাল বাহিনী যোগ দিয়েছে। গত সন্ধ্যার তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ভীষণ আতঙ্ক রোমান সেনাদের মনোবলকে একেবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। মহাবীর খালেদের হাতে তারা চরম শিক্ষা পেল। তাই তারা রণে ভঙ্গ দিল। তখন খালেদ তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে মুতা থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ায় রোমানগণ অত্যন্ত খুশি হলো। এবং তারা মহাবীর খালেদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হওয়াটাকে মোটেই পছন্দ করছিল না। এর জন্য তারা আর মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনও করল না অর্থাৎ ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। পক্ষান্তরে রোমানগণ মুসলমানদের সম্পর্কে ভীষণ ভীত হয়ে উঠল।

তিনজন মুসলমান সেনাপতির জীবনাবসানের জন্য হযরত ও তাঁর সঙ্গীগণ সকলেই অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। বিশেষ করে জাফরের জন্য হযরতের দুঃখের কোন সীমা ছিল না। এইভাবে মুতা যুদ্ধের অবসান হলো।

জাত আস্ সালাসাল অভিযান ঃ খালেদের ফেরার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হযরত মহম্মদ (দঃ) আমর বিন আসের নেতৃত্বে সিরিয়ার দিকে এক সৈন্যবাহিনীকে আরবের উত্তর সীমান্তে নিযুক্ত করলেন। যখন তিনি যুধহাম প্রদেশের সালাসাল নামক স্থানে পৌঁছালেন তখন তাঁর মনে মনে ভয়ের উদ্রেক হলো। কেননা তাঁর সেনাবাহিনী ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। যখন হযরতের কাছে এই সংবাদ এল তখন তিনি আবু ওবাইদা বিন জারার নেতৃত্বে একদল সেনা পাঠালেন। যাদের সঙ্গে ছিলেন বিশেষ করে আবুবকর ও ওমর স্বয়ং। কিন্তু যাত্রাকালে হযরত মহম্মদ (দঃ) আবু ওবাইদাকে সতর্ক করে দিলেন। তিনি যেন আমরের সঙ্গে কোন

রূপ মতান্তর না করেন। যেহেতু আমর ছিলেন অত্যন্ত শক্ত মনের মানুষ। যখন আবু ওবাইদা আমরের সঙ্গে দেখা করলেন তখন আমর তাঁকে বললেন, "আপনি সাহায্যকারী রূপে এসেছেন আমিই সেনাপতি। তখন আবু ওবাইদা বললেন—"স্বয়ং হযরত আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন মতান্তর না করতে। সুতরাং আপনি যাই করুন, আমি মেনে চলব।" এমনি ছিল হযরতের নির্দেশনামার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। পরে মুসলমানগণ সিরিয়া বাহিনীকে পরাজিত করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

মুতা যুদ্ধের পরিণতি ঃ মুতা যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে বিদেশীরা নানা মত পোষণ করেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো—আরবের উত্তরে এইরূপ একটা গণ্ডগোল দেখে দক্ষিণ আরবের অবিশ্বাসী দলও একটা গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করতে থাকল। কেননা তারা চিন্তা করছিল রোমানগণ কিছুদিনের মধ্যেই হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে পরাস্ত করে ফেলবে, যুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে, ইত্যাদি জল্পনা-কল্পনা করছিল। কারণ দক্ষিণ আরবগণ বুঝতে পারছিল হযরত মহম্মদ (দঃ) সম্প্রতি উত্তর আবব নিয়েই ক্ষান্ত থাকবেন সুতরাং তাঁকে দুদিক থেকে ঘেরাও করার এটাই মহাসুযোগ।

সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) ঃ

মহা রণকুশল বীর খালেদ, অজেয় খালেদ সগৌরবে মুতা প্রান্তর থেকে মদিনায় প্রত্যাগমন কবলে স্বয়ং মহানবী (দঃ) তাঁকে সাইসুল্লাহ (আল্লাহ্‌র তরবারি) উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধি দ্বিতীয় অন্য কেউই পাননি। মহানবী (দঃ) যা কিছু বলতেন, তার পশ্চাতে বিরাট রহস্য থাকত।

মুতার রণভূমিতে যখন মুসলমানদের তিনজন বীর সেনাপতি শহীদ হলেন, তখন অবস্থা ছিল—অত্যন্ত ভয়াবহ, ভীষণ অন্ধকারময়। হতাশা, নিরাশা ও হতোদ্যম যেন মুসলিম বাহিনীকে অর্ধমৃত করে দিয়েছিল। তাঁদের অনেকেরই এমনও মনে হয়েছিল যে, হয়তো বা একজনও মুসলমান এই মুতা প্রান্তর থেকে আর মদিনাতে নাও ফিরে যেতে পারে।

এই ঘনীভূত ঘোর অন্ধকারে, মহাবিপদে বীর খালেদ সেনাপতি নির্বাচিত হলেন। তিনি মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলেন—মুসলমানদের অবস্থা কত লোমহর্ষক, কত ভয়াবহ, কত শোচনীয় হতে চলেছে। এই সকরুণ ও মর্মভেদী অবস্থা রুখে দেওয়ার জন্য এক আল্লাহ্‌র নিকট দু' হাত তুললেন মুস্‌লিম বাহিনীর জন্য ঃ

রাখিও সম্মান আল্লাহ্ বলি বারে বারে—
এ হাত নামেনি প্রভু তব দরবারে।
বেড়েছে বিপদ স্রোতে সাগরের জল
সাঁতার কাটিতে দাও সন্তরণ বল।
রাখিও সম্মান নবীর বলি বারেবারে
যে-হাত নামেনি প্রভু তব দরবারে।

অতঃপব মুসলিম বাহিনীকে উৎসাহিত করে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিলেন, "তোমরা আমার পশ্চাতে অতীব উত্তম কয়েকখানি তলোয়ার নিয়ে সদাই প্রস্তুত থাকবে। তোমাদের কয়েকজনের কাজই হবে আমাকে নিমিষের মধ্যে তলোয়ার জোগান।"

যুদ্ধ আরম্ভ হলো। দুপুর পর্যন্ত মহাবীর খালেদের আটটি ভয়াবহ তরবারি ভেঙে খান খান। সন্ধ্যার পূর্বেই ভীষণ যুদ্ধের জয়পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনীর বিজয় ডঙ্কা সজোরে বেজে উঠল। যেন সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিল। দামামা দুন্দুভিতে রণ-প্রান্তর কম্পিত হয়ে উঠল। মহাবীর খালেদের গগনভেদী তকবির-ধ্বনি যেন আল্লাহ্‌র আসমানকে করল প্রকম্পিত। আরশকে করল আন্দোলিত। ওইদিনের ওখানকার অরূপ দৃশ্য আজকের দিনে বর্ণনাতীত।

প্রত্যাবর্তিত সেনাবাহিনীকে মদিনাবাসিনীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এতগুলো তরবারি ভেঙে খান খান হলো? উত্তরে তাঁরা বললেন—"বীর খালেদের অব্যর্থ তরবারি কেবল শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীকেই কেটে খান খান করেনি, যার উপর ওই তরবারি পড়েছে, তাকে এবং তার বাহনকেও একসঙ্গে এক চোটে মাটিতে ঠেকিয়ে দিয়েছে। আমাদের মনে হয়নি যে, কোন মানুষ তরবারি চালাচ্ছে। বারবার মনে হয়েছে আল্লাহ্ পাকের কোন অমিত শক্তিধারী স্থির লক্ষ্যে আগুয়ানরত এক মহান ফেরেশ্‌তা। প্রশ্ন হলো—লক্ষ লক্ষ রোমান বাহিনীকে তোমরা মাত্র কয়েক হাজার মানুষ কি করে ভাগিয়ে দিলে, কি করে হারিয়ে দিলে? উত্তর—"আমাদের মনে হচ্ছিল, কয়েক শ' ফেরেশ্‌তা কয়েক লক্ষ রোমান সেনাকে ছাগল তাড়ান করে দ্রুত গতিতে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের সেনাপতি যেন শৃগালের পালে ছিলেন শার্দুলস্বরূপ। তোমরা কি বিশ্বাস করো না বদর যুদ্ধের বাস্তবতা—
"তোমরা তাদের বধ করোনি, আল্লাহ্‌ই তাদের বধ করেছেন।" কোরআন—৮ ঃ ১৭

সুতরাং সেদিন রণপ্রান্তরে সেনাপতি খালেদের তরবারি ছিল 'আল্লাহ্‌র তরবারি।' তাই মহানবী (দঃ) অত্যন্ত সঠিকভাবেই সেনাপতি খালেদকে 'আল্লাহ্‌র তরবারি' উপাধিতে ভূষিত করলেন। সমগ্র পৃথিবীর বুকে আজিও এই তরবারি অজেয় ও অদ্বিতীয়।

জগৎ বীরের সভায় খালিদ তুমিই মোদের গর্ব হে
বিশ্বশক্তি কাঁপিয়ে দিলে মুসলিম নহে খর্ব হে।

আবিসিনিয়া থেকে মোহাজেরিনদের প্রত্যাবর্তন ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) খাইবার থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। ওদিকে আবিসিনিয়ার মোহাজেরিনগণও তাঁর দূতগণসহ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। মহানবীর ৬১৪ খ্রীঃ-এর স্বপ্ন আজ সত্যে পরিণত হলো। এই বছরই তিনি অনেককে আবিসিনিয়ায় যেতে বলেছিলেন, এবং বলেছিলেন আল্লাহ্ সুযোগ দিলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। আজ সেই সুযোগ সমাগত, হযরত তাদের সকলকে আলিঙ্গন করলেন, বিশেষ করে জাফরকে। এমনকি তিনি বলেছিলেন, "আমি জানি না কোনটা বেশি আনন্দের,—খাইবারের বিজয় না জাফরের সঙ্গে সাক্ষাৎ।"

আপাতত হযরত মহম্মদ (দঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ নিজেরা কিছুটা বিপন্মুক্ত বলে মনে করতে থাকলেন। কেননা হোদাইবিয়ার সন্ধি দক্ষিণে কুরাইশ ও আরবদের আক্রমণ থেকে শান্তি দিয়েছিল। এবং খাইবারে ইহুদীদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ উত্তরের শান্তি এনেছিল। কিন্তু এই দুটো অপেক্ষাই বৃহত্তর বিপদ সীমান্তের পরপারে অপেক্ষা করছিল। যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বেদুইনগণকে প্রস্তুত থাকার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

"যেসব মরুবাসী গৃহে রয়ে গিয়েছিল তাদের বল তোমরা অচিরেই এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ওরা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন।"

কোরআন— ৪৮ ঃ ১৬

এই আয়াত শরীফে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিশাল সৈন্যবাহিনীর কথা বলা হয়েছিল। এই যুদ্ধ তাদের মধ্যে সংঘটিত হবে। তখন হয়তো হযরত তাদের মধ্যে (আর বেশিদিন) নাও থাকতে পারেন।

কিন্তু বর্তমানে হযরত তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি আরব সংস্কার সাধনের জন্য নিয়োজিত করলেন। আরবের মধ্যে এই কাজ তাঁর পূর্বে আর কেউই করেননি। তিনি মদিনা ও অন্যান্য স্থানে মসজিদ নির্মাণ করলেন, ধর্মীয় শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে লাগলেন, যাতে তাঁরা শিক্ষকের কাজ করতে পারেন। তিনি এভাবে তাঁদের কোরআন উচ্চারণ শিক্ষা দিলেন এবং তাঁদেব পবিত্র করলেন। মদিনা জ্ঞান ও আলোর কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সেখানে আল্লাহ্ সরাসরি তাঁর দূতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং হযরত তাঁব উম্মতদেব সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতেন। তিনি তাদের ঈমানের সৌন্দর্য ও আল্লাহব গুণাবলী শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা দিতেন জীবন-রহস্য' এই মুসলমানদেব আত্মা যখন এক মনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করত, তখন তাঁরা জাগতিক সমস্ত ক্লেদমুক্ত হয়ে উঠতেন, অসীম অনন্তেব সঙ্গে এক হয়ে যেতেন। আল্লাহ তাঁদেব অন্তরকে ভয় ও লোভ মুক্ত করে দিতেন। তখন ওই সমস্ত পবিত্র আত্মাগুলো এক আল্লাহব সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করতেন না। এবং এখানেই তাঁরা চরম আনন্দ পেতেন।

হিজরীর সপ্তম বর্ষে এইভাবে হযরত তাঁব প্রিয় শিষ্যদের নিয়ে কাটালেন। সকলেই প্রবল আগ্রহে ছিলেন বছরের শেষে তাঁরা কাবা শরীফ গমন করবেন। সেখানে তাঁরা কাবা প্রদক্ষিণ করবেন এবং নামায পড়বেন ওই স্থানে, যে স্থান আজ থেকে ২৫০০—৩০০০ বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর প্রথম সন্তান হযরত ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়ে তৈরি করেছিলেন।

মানুষের শরীর যেমন খাদ্য দ্বারা বেঁচে থাকে, মানুষের জীবন তেমনি জীবনীখাদ্য দ্বারা বেঁচে থাকে। যাদের জীবন খাদ্যের অভাবে মারা গেছে, তাদের দেহটা শুধু জগতে ঘুরে বেড়ায়। ওই জীবন একমাত্র জীবিত, যে জীবন আল্লাহর মধ্যে ও সঙ্গে। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবন ছিল ওই জীবন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল ন্যায্য ও নীতির ঝরনার মূল স্বরূপ। ঝরনা থেকে দিন-রাত ঝরত তাঁর পবিত্র বাণী। এবং যে কথাগুলো এক একটি কাজেব পাহাড়ে পরিগণিত হতো।

এতটুকু আশ্চর্য হওয়ার ছিল না, তাঁর যে কোন শিষ্যই তাঁর জন্য এক হাজার বার জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন, যদি তাঁরা ওই জীবন পেতেন। তবুও ক্লান্তি ছিল না। এইখানেই হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবন-সাধনার যে চরম সাফল্য তাব গোপন বীজ নিহিত। মানুষকে আকর্ষণ করার তাঁর যে অসাধারণ শক্তি তারও গোপন চাবি ছিল এখানেই। যে দুটো জিনিস মানুষকে মানুষ থেকে দূরে রাখে তা হলো গর্ব ও ঘৃণা ভাব। কিন্তু হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনে ওই দুটো ক্ষণিকের জন্য প্রশ্রয় লাভ করা তো দূরের কথা, তাঁর

সমগ্র জীবনে একবারও তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি। বরং তিনি অহরহ গর্ববোধ করতেন তাঁর দারিদ্র্যের জন্য। জগতের রাজা-বাদশা, শাসক, সৈনিক এবং সকল স্তরের সকল মানুষই তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা নিতে পারেন বিনয় ও মহত্ত্বের। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর এই পথে মানুষ অগ্রসর হলে জগৎ-মানুষ সুখী হতে বাধ্য।

হযরত মহম্মদের (দঃ) সুন্নত বা জীবনধারা ঃ একদিন হযরত আলি বিন আবুতালিব হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর সুন্নত কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ

১। আল্লাহর জ্ঞানই আমার পুঁজি (বা সম্বল)।
২। আমার বিশ্বাসের মূল বিচারবুদ্ধি (জাতসিদ্ধান্ত)।
৩। ভালবাসা আমার ভিত্তি।
৪। উৎসাহ আমার ঘোড়া।
৫। আল্লাহ্‌র স্মরণ আমার বন্ধু।
৬। দৃঢ়তা আমার কোষাগার।
৭। দুঃখ আমার সঙ্গী।
৮। জ্ঞান আমার অস্ত্র।
৯। ধৈর্য আমার আবরণ (ঢাল)।
১০। সন্তুষ্টি আমার সম্পদ।
১১। গরিবী আমার গর্ব।
১২। অনুরাগ আমার কৌশল।
১৩। দৃঢ় বিশ্বাসই আমার শক্তি।
১৪। সত্য আমার উদ্ধারকারী।
১৫। আনুগত্য আমার প্রাচুর্য।
১৬। কঠোর প্রচেষ্টা আমার রীতি।
১৭। প্রার্থনা আমার আনন্দ।

এইগুলো হযরত (দঃ) তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তাঁর শিষ্যগণও অক্ষরে অক্ষরে তাঁর অনুসরণ করতেন। জগতের বুকে হযরতের জীবনটাই এক অলৌকিক ঘটনা। অতি জঘন্যতম আরব পরিবেশকে যেভাবে হযরত-চরিত্র পূত ও পবিত্র করে তোলেন তা অন্য কারও পক্ষে করা তো দূরের কথা, জগতের যে কোন ব্যক্তিই চিন্তাও করতে পারেননি। মক্কা ও মদিনা ওই সাধনার তীর্থভূমি।

মক্কার পথে হজযাত্রায় হযরত ঃ দেখতে দেখতে আবার সেই পবিত্র মাস ফিরে এল। হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর দুই হাজার প্রিয়তম শিষ্য নিয়ে আল্লাহর ঘর কাবার দিকে যাত্রা করলেন। দীর্ঘ সাত বছর এই পথ তাঁদের জন্যে অবরুদ্ধ ছিল। এখন আবার মুক্ত, তিনি তাঁর শিষ্যগণ ভ্রমণ-তরবারি ব্যতীত কোনরূপ অস্ত্র সঙ্গে নেননি।

মুসলমানদের আনন্দ ও উৎসাহ ঃ এই হজযাত্রীদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন মোহাজেরিন ও আবিসিনিয়া থেকে আগত প্রবাসীগণ। আজ দীর্ঘদিন পর তাঁর জন্মভূমি ও কুরাইশ কর্তৃক জোরপূর্বক আটকানো প্রিয়জনদের দেখতে পেয়ে খুশি।

যাত্রীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আনসারও ছিলেন। তাঁদের বড়ই উৎসাহ ছিল হযরতের জন্মভূমি দেখার জন্য। দেখার জন্য যেখানে তিনি বিবি খাদিজাকে নিয়ে দীর্ঘদিন সুখে সংসার করেছিলেন। ওই হিরা পর্বতের গুহাকে দেখার জন্য যেখানে ফেরেশ্‌তা জিবরাইল সর্বপ্রথম তাঁর নিকট আগমন করেছিলেন এবং আর ওই জায়গা যেখানে তিনি প্রায় ৩০ মাস মক্কাবাসীগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিলেন। মক্কাতে হযরতের জীবন সারা বিশ্বের নিকট যেমন এক আশ্চর্য কাহিনী, তাঁদের নিকটও ছিল এক অদ্ভুত দেখার স্থান, তাই তারা দেখতে আগ্রহী ছিলেন যেখানে এই মহাজীবনের বীজ প্রথম রোপিত হয়েছিল। সুতরাং মক্কা দর্শন তাদের নিকট স্বর্গ দর্শনের মতো ছিল।

হযরতের সতর্কতা ঃ এই আনন্দ ও মহানন্দের মধ্যেও তাদের মনে নানা কথা উঁকি মারছিল, যদি মক্কাবাসীগণ আবার তাদের থামিয়ে দেয়, অথবা তা অপেক্ষাও খারাপ ব্যবহার করে। কেননা ইহুদীগণ এতদিন পর্যন্ত তাদের বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। কিন্তু হযরত কোন ঝুঁকি নেননি, যেহেতু তিনি ছিলেন নিরস্ত্র। তিনি মহম্মদ বিন মাসালামার অধীনে ১০০ জন অশ্বারোহী গুপ্তচর হিসাবে পাঠালেন। কিন্তু মক্কার পবিত্র সীমা অতিক্রম করার অধিকার তাদের ছিল না। যখন সবকিছু পরিষ্কার দেখলেন, তখন মুসলমানগণ মক্কার নিকটবর্তী মাররাজাহরান নামক উপত্যকায় অবতরণ করলেন। মুসলমানগণ তখন হযরতকে সঙ্গে নিয়ে কাসওয়া নামক পাহাড়ের দিকে উটসহ অগ্রসর হলেন। সঙ্গে আরও ৬০টা উট ছিল, তাদের গলায় কোরবানির চিহ্ন যুক্ত মালা পরিয়ে দেওয়া হলো।

আনন্দপূর্ণ ঃ তাঁরা মক্কা থেকে সামান্য দূরে অবতরণ করলেন। মোহাজেরিনগণ আবার অশ্রুসজল নয়নে বলতে থাকলেন তাঁদের আনসার ভাইদের, কিভাবে তাঁরা তাদের অতীত জীবন এখানে অতিবাহিত করে গেছেন, কিভাবে তাঁরা এখানে মদ্যপানে উন্মত্ত থাকতেন। এবং আজ তাঁদের কি পরিবর্তন। এই সমস্ত অসম্ভব সম্ভব হলো শুধুমাত্র একজন মানুষের দ্বারা, যাঁর নাম হযরত মহম্মদ (দঃ), যিনি আল্লাহর প্রেরিত দূত। তাঁর ওপর আল্লাহর অসীম শান্তি চিরদিনের জন্য বর্ষিত হোক।

কুরাইশদের মক্কা ত্যাগ ঃ আজ মুসলমানরা মহাখুশি। কিন্তু অপরপক্ষে কুরাইশগণ তাদের সমগ্র জীবনে আজকেব মতো এত অখুশি কোনদিনই হয়নি। তারা একদিন মদিনা গিয়েছিল। কিন্তু হযরতের লোকজন তাদের বিতাড়িত করেছিলেন। তারা শত্রু মহম্মদ (দঃ)-কে চিরদিনই ঘৃণা করেছে, আজ সেই মহম্মদ (দঃ) তাঁর দু'হাজার প্রিয়তম একান্ত ভক্ত শিষ্যসহ বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। এর চেয়ে অধিক দুঃখ আর কি হতে পারে। তাদের চোখে মুসলমানদের এই শান্তিবাহিনী শেলের মতো বিঁধতে থাকল এবং তারা নিজেরা নিজেদের অভিশাপ দিল। অভিশাপ দিল আপন ভাগ্যকে। মনের তিতিক্ষায় মক্কা ত্যাগ করল। তাদের চোখে জাদুকর মহম্মদ (দঃ)-কে ছেড়ে দিতে হলো আপন স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের, যাতে মহম্মদ (দঃ) আপন জাদুবলে তাদের ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারেন। তারা মক্কার পার্শ্ববর্তী কুবাই, হীরা ও অন্যান্য পাহাড়ে আরোহণ করে শুধু অধীর আগ্রহে দিন গুনতে থাকল। হযরত মহম্মদ (দঃ) মাত্র তিনদিনের সন্ধি করেছিলেন।

কাবা প্রদক্ষিণ ঃ মুসলমানগণ কাবা প্রদক্ষিণ করলেন। মুসলমানগণ মক্কার উত্তর দিক থেকে অবতরণ করলেন। 'কাসওয়া' উটের রজ্জু ধরলেন আবদুল্লাহ বিন বাহা। বাকি সকলেই তাকে অনুসরণ করলেন পদাতিকভাবে। তখন সেখানে কি দৃশ্য সেটা বর্ণনা করা মোটেই সম্ভব না। কেননা ওটা একান্ত অনুভূতির বস্তু। তাঁরা ছিলেন কাবার অন্তর-দৃষ্টিতে আবদ্ধ, চিরবন্দী, কাবাও ছিল তাঁদের অন্তর-দৃষ্টিতে চিরবন্দী। এই মহাদৃশ্য আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ অবলোকন কবলেন। হঠাৎ শব্দ বেজে উঠল—"লাববায়েক, লাববায়েক, আল্লাহুম্মা লাববায়েক, লা-শারিকা লাকা লাববায়েক—আমি তোমার আরাধনায় এখানে হাজির, আমি এখানে হাজির হে আল্লাহ্, আমি এখানে হাজিব। তোমাব কোন শরীক নেই। আমি তোমার আরাধনায় এখানে হাজির।" দুই হাজার বীর কণ্ঠ থেকে এই গগনভেদী শব্দ উচ্চারণ হতে থাকল। মক্কাবাসীগণ শত হিংসা সত্ত্বেও মনে মনে মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল। এবং মুসলমানগণ ছিলেন যেন সপ্ত আকাশে, এটি ছিল তাদের দিবা-মেবাজ। এইভাবে সকলেই হযরতেব স্বপ্ন অনুধাবন কবলেন। এবং তাঁরাও ছিলেন তাঁব স্বপ্নেব একটি অংশ।

"আল্লাহ্ তাঁব রসুলেব স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমবা অবশ্যই নিবাপদে মসজিদুল হাবামে প্রবেশ করবে, কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত কববে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না, আল্লাহ্ জানেন, তোমবা যা জান না।" কোরআন—৪৮ ঃ ২৭, ৯০ ঃ ১-২

আল্লাহব বিশ্বাসই তাঁদের সকল বিশ্বাসকে ছাপিয়ে তুলেছিল। এবং আল্লাহ্ ছিলেন এর সাক্ষী। তিনিই আল্লাহ্, যিনি হযরতকে মহাসত্য সহ পাঠিয়েছিলেন। তাঁর এই গগনভেদী "লাববায়েক" উচ্চারণে কোন কোন অবিশ্বাসী একটু বিরক্ত হলেও প্রায় সকলেই মহাখুশি হয়েছিল।

ইতিমধ্যে বিশ্বাসীগণ সকলেই মসজিদে প্রবেশ করেছেন এবং মক্কাবাসীগণ ওপর থেকে অবলোকন করেছিলেন। যদি মক্কাবাসীগণ বাড়িতে অবস্থান করতেন তাহলে হয়তো তাঁদের সহ্য কবা কঠিন হতো। হযরত তাঁর অনুগামী মুসলমানদের নিয়ে এহরামে (হজের রীতি পালন) থাকলেন।

হযবত এবার কাবার পূর্ব কোণ চুম্বন করলেন, এবং মৃদু ছুটলেন যতক্ষণ না দক্ষিণ কোণে পৌঁছালেন, যা রুকুনে ইয়ামানী নামে পরিচিত। দু'হাজার মুসলমান হযরতের সঙ্গে কাবা প্রদক্ষিণ করে ছুটলেন। তারপর তাঁরা নির্দেশমত দু'কোণের মধ্যে হাঁটলেন এবং কাবার একটি প্রদক্ষিণ শেষ করলেন। এইভাবে তিনবার প্রদক্ষিণ করা হলো।

কুরাইশগণ এই দৃশ্য পাহাড় থেকে অবলোকন করছিল। মুসলমানগণ এত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে ছিলেন যে ভুলেই গিয়েছিলেন তাঁদের মাথার ওপরে পাহাড়-পর্বতে কুরাইশগণ বসে আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী মহম্মদ (দঃ) তাঁদের আনন্দদান করছিলেন এবং বলেছিলেন—"আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্ এক। যিনি তাঁব দাসদের বিজয় দিয়েছিলেন এবং যিনি অবিশ্বাসীদের বিতাড়িত করেছিলেন।"

আবদুল্লাহ বিন রাহা অত্যন্ত জোর গলায় উপরোক্ত কথাগুলো বলতে থাকলেন, বাকি দু'হাজার মুসলমান পরস্পরে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এমন উচ্চরবে বলতে থাকলেন, মনে হয়েছিল যেন পাহাড় কেঁপে যাচ্ছিল। প্রতিটি কুরাইশের হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল।

যখন কাবা প্রদক্ষিণ শেষ হলো তখন হযরত তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সাতবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ধীরগতিতে দৌড়ালেন। পরে মস্তক মুণ্ডন করলেন এবং উমরা (ছোট হজ) পূর্ণ হলো।

হজের দ্বিতীয় দিন ঃ মুসলমানগণ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। পরদিন হযরত সকালে মসজিদের নিকট এলেন এবং যাঁরা নামায পড়েননি তাঁদের নিকট দাঁড়ালেন, পরে হযরত বেলাল কাবার ছাদে উঠে সকলকেই নামাযে আহ্বান জানালেন। দু'হাজার মুসলমান মহানবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা শেষ করলেন। আজ সাত বছর হযরত এখানে নামায পড়ার সুযোগ পাননি। কুরাইশগণ এ সমস্ত অবলোকন করে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। তারা ভাবছিল, "মুসলমানরা কিরূপ লোক, মদ ছাড়াই আনন্দ করে, সুরা ব্যতীত দিন কাটায়, এমনকি দু'-একটি সুন্দরী গায়িকা ও নর্তকীও সঙ্গে নেই, যারা ওদের কোন আনন্দ দান করতে পারে।" মুসলমানদের একমাত্র ধ্বনি ছিল—'আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।' কিন্তু একথাও নিশ্চিত যে তখনও কাবাতে বহু দেবদেবী বিরাজ করছে। কুরাইশগণ ভাবছে—"তারা কি ঘুমাচ্ছে? তারা কি হযরতের ওপর এর কোন প্রতিশোধ নেবে না। অথবা তারা কি একেবারেই শক্তিহীন?" এভাবে আপনা থেকেই কুরাইশদের বিশ্বাসের মূল টলতে থাকল। এদিকে হযরতের হজ উদ্যাপন হলো ইসলামের সবচেয়ে বড় প্রচার।

কুরাইশদেরকে দলে আনার প্রচেষ্টা ঃ আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবের স্ত্রী উম্মুল ফজলের উম্মে ময়মুনা নামে ৪৬ বছরের একটি বোন ছিল। তিনি মুসলমানদের নামায পড়া দেখেই মুসলমান হন। আব্বাস হযরতকে অনুরোধ করলেন—তাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার জন্য, হযরত সম্মতি দিলেন এবং কুরাইশদের জন্য একটা বড় ভোজের আয়োজন করলেন। এই ময়মুনা ছিল খালেদ বিন ওয়ালিদের ফুফু।

অবিশ্বাসীই দুই প্রধান সোহাইল বিন আমর হোয়াই, তাব বিন আবদুল—ওজ্জা হযরতের নিকট এলেন এবং বললেন—

"তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, আপনি এবার আমাদের স্থান ছেড়ে দিন।" হযরত খুব শান্তভাবেই তাঁদের অনুমতি চাইলেন খানা (ভোজ) শেষ করার জন্য ও তাঁদেরকে নিমন্ত্রণ করার জন্য। কিন্তু তাঁরা হযরতের সঙ্গে একমত হলেন না। "আমরা আপনার খানা খেতে চাই না, আপনি এবার যান।" তখন হযরতের আর কিছুই করার ছিল না। তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। ময়মুনা তাঁকে অনুগমন করলেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর বিন আস এবং অন্যদের ইসলাম প্রচার ঃ হযরত মহম্মাদ (দঃ) আরবদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন সময়ই তার একমাত্র বিচারক। হযরতের মক্কা ত্যাগ করার সঙ্গে কুরাইশ বাহিনীর সেনাপতি, ওহোদ যুদ্ধের বীর সেনা খালেদ বিন ওয়ালিদ কুরাইশদের সভাকক্ষে বলে উঠলেন ঃ

"যাঁদের এতটুকু জ্ঞান, বিবেক বা বুদ্ধি বলে কিছু আছে তাঁদের নিকট এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মহম্মদ (দঃ) কবিও নয়, জাদুকরও নয় এবং তিনি যা কিছু বলেন, তা বিশ্ব-প্রতিপালকের কথা, সুতরাং প্রতিটি জ্ঞানী ব্যক্তিরই উচিত তাঁকে অনুসরণ করা।" তখনই তাঁর যুদ্ধকালীন সঙ্গী ইকরামা বললেন—"তুমি একটি শিশুতে পরিণত হয়েছ।" খালেদ—"আমি একটি শিশু হতে পারি কিন্তু মুসলমান হয়েছি।"

ইকরামা ঃ আল্লাহর শপথ, তুমিই একমাত্র কুরাইশদের শেষ ব্যক্তি যে ওইরূপ বলতে পারে।

খালেদ ঃ কেন?

ইকরামা ঃ কারণ—হযরত তোমার পিতাকে আঘাত করেছেন এবং তোমার চাচাকে হত্যা করেছেন এবং তোমার চাচাত ভাইকে হত্যা করেছেন বদর যুদ্ধে। সুতরাং আল্লাহর শপথ, আমি কখনুও একজন মুসলমান হতে পারি না এবং তুমি যা বলছো, তাও বলতে পারি না। কুরাইশদের হযরতের সঙ্গে কিছুই করার নেই, তাঁকে হত্যা করা ব্যতীত।

খালেদ ঃ এ সমস্ত অজ্ঞতার যুগের কথা ও কাহিনী। কিন্তু "আল্লাহর শপথ, আমি একজন মুসলমান হয়েছি। কেননা সত্য আমার নিকট প্রকাশ পেয়েছে।" এবং তখন খালেদ তাঁর অশ্বারোহীকে তাঁর স্বীকারোক্তি সহ হযরতের নিকট পাঠালেন।

যখন আবু সুফিয়ান খালেদের এই ইসলাম গ্রহণের কথা শুনলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটি কি সত্য যা আমি শুনেছি।

খালেদ ঃ হ্যাঁ।

আবু সুফিয়ান অতি রাগান্বিতভাবে বললেন—"শপথ আল লাত ও আল উজ্জার, হযরত মহম্মদ (দঃ) যা বলেছেন ওগুলো যদি সত্য হতো তাহলে আমি তোমার পূর্বেই মুসলমান হতাম।"

খালেদ ঃ "আপনি যাই বলুন—সত্য সত্যই।" তখন আবু সুফিয়ান রাগে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ইকরামা বাধা দিয়ে বললেন—আপনি কি খালেদকে তাঁর ওই মতামতের জন্য বধ করবেন? বাকি সকল কুরাইশরা তো আজ তাঁর মতই পোষণ করছে। আল্লাহর শপথ, আমার ভয় হয়। আপনি যদি ওইরূপ করেন, তাহলে সকল কুরাইশ মদিনায় চলে যাবেন।"

এদিকে খালেদ নিজেকে মক্কায় থাকা ভাল না মনে করে আবার মদিনায় গমন করে মুসলমানদের সঙ্গে যোগদান করলেন।

এইভাবে সপ্তম হিজরী অত্যন্ত গৌরব ও আনন্দের সঙ্গে মুসলমানদের সমাপ্ত হলো। এখন ইসলামের বীজ আজ বৃক্ষে পরিণত। তার শিকড় আজ বহু দূরে বিস্তৃত, বহু তলদেশে স্থাপিত। কিন্তু তখনও ওই বৃক্ষের প্রয়োজন ছিল—মহান আল্লাহর অদৃশ্য-লালন-পালনের এবং মুসলমানদের জল সেচনের।

উনবিংশ অধ্যায়

মক্কা বিজয়

অষ্টম হিজরী

১ আগস্ট, ৬২৯ খ্রীঃ—১৬ ফেব্রুয়ারি, ৬৩০ খ্রীঃ

নিশ্চয় যিনি তোমার জন্য কোরআনকে ফরজ করেছেন, তিনি তোমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন স্থলে (স্বদেশ মক্কাতে) পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন। কোরআন—২৮ ঃ ৮৫। আল্লাহ্ তাঁর রসুলের স্বপ্ন (মক্কা বিজয়) বাস্তবায়িত করেছেন। ৪৮ ঃ ২৭। সারা বিশ্বের সর্বকালের সকল জয়ের ইতিহাসে মহানবীজীব মক্কা বিজয় একটি নজিরবিহীন বিজয়। এই বিজয়কে বিগত ও আগত দিনের বিশ্ব মানুষ কোন্ বিজয় ও কিসের বিজয় বলবে ঃ

ঃ মক্কা বিজয় ঃ

আচরণে ছিল তব এমনি বিনয়—
তোমার নীতির জয় মক্কা বিজয়।
পেয়েছিলে মহা মন মহান হৃদয়—
তোমার স্নেহের জয় মক্কা বিজয়।
আরব আজম জুড়ে শত্রুকুলও কয়—
তোমার প্রেমের জয় মক্কা বিজয়।
কালের অমর স্মৃতি রহিবে নিশ্চয়—
তোমার প্রীতির জয় মক্কা বিজয়।
আকাশে বাতাসে জানি বহিবে নিশ্চয়—
তোমার সহ্যের জয় মক্কা বিজয়।
যে-কথা জগতে জানি রহিবে নিশ্চয—
তোমার ধৈর্যের জয় মক্কা বিজয়।
দেহ মনে প্রাণে ছিলে কত দয়াময়—
তোমার দয়ার জয় মক্কা বিজয়।
গোপনে প্রকাশ্যে ছিলেন কত মায়াময়—
তোমার মায়ার জয় মক্কা বিজয়।
বৃক্ষলতা পশু-পক্ষী সকলেতে কয়—
তোমার ক্ষমার জয় মক্কা বিজয়। —কাব্যকানন।

কোরআন—২ ঃ ১৭৮, ১৯৪, ৫ ঃ ৪৫, ১২ ঃ ৯২, ১৭ ঃ ৩৩, ২১ ঃ ১০৭, ৪২ ঃ ৩৭ ৪৩।

হোদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ ঃ মুসলমানদের মুতা যুদ্ধের প্রস্তুতি বিষয়ে গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়ায় বহু ক্ষতি হয়েছে। তাই হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর গোপনীয়তার কথা সাধারণত প্রকাশ করতেন না। এই গোপনীয়তা প্রকাশ পাওয়াতেই রোমানগণ বিরাট প্রস্তুতির সুযোগ পেল। আবার তার ফলে দক্ষিণ আরব অবিশ্বাসীগণও মাথাচাড়া দেওয়ার সাহস পেল। যার ফলে তারা হোদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করল।

এইভাবে মক্কার কুরাইশগণ হযরতের মিত্রদল বানু খোজার বিরুদ্ধে বানু বকরকে উত্তেজিত করল। কুরাইশ দলের ইকরামা ও অন্যান্য দলনেতা নানা দিক দিয়ে বানু বকরকে সাহায্য করল। একদা রাত্রিতে বানু খোজাগণ যখন ওয়াতির নামক স্থানে নিদ্রামগ্ন তখন হঠাৎ বানু বকর গোত্র তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁদের বহু লোককে হত্যা করে তাঁদের ধন-সম্পদ লুট করল। বানু খোজা কোন রকমে মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করে কুরাইশদেব নিকট নালিশ জানালেন। কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় আমর বিন সালিম হযরতের নিকট নালিশ জানালেন। চল্লিশ জন অশ্বারোহী সহ তাবা মদিনায় হযরতের মসজিদ প্রাঙ্গণে হাজির হলেন। এবং বললেন, "হে আল্লাহ্, আমরা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট এসেছি—স্মরণ করিয়ে দিতে আমাদের প্রীতির বন্ধন বা প্রতিজ্ঞাপত্রের কথা। হে আল্লাহ্‌র নবী, আমরা আপনার সাহায্য কামনা কবি' আপনি আল্লাহ্‌র দাসদের প্রতি আপনাব দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।"

হযরত মহম্মদ (দঃ) এই কথা শুনে তাঁদের সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। সন্ধি অনুযায়ী হযরত কুবাইশদের নিকট পত্র পাঠালেন—

১। যাদের অন্যাযভাবে হত্যা কবা হয়েছে তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বললেন।

২। সন্ধি অনুযায়ী বানু বকবকে সাহায্য করতে নিষেধ করলেন।

৩। সন্ধি ভঙ্গ করা হয়েছে তা ঘোষণা করতে।

মক্কার কুরাইশগণ শেষেরটিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাও সরাসবি না। কেননা এতে তারা দোষী প্রমাণিত হচ্ছিল। তাই তাবা ওই সন্ধিকে আবাব চালু করার জন্য আবু সুফিয়ানকে মদিনায় পাঠালেন।

আবু সুফিয়ান চতুর মানুষ। তিনি তাঁর মেয়ে হযরতের স্ত্রী উম্মে হাবিবার কাছে প্রথম গেলেন। যাতে আপন কন্যার কাছ থেকে সহজে কাজটা উদ্ধার কবতে পাবেন। কিন্তু মোটেই তা হলো না। তিনি আপন কন্যাব নিকট গিয়ে একটি স্থানে বসলেন। কিন্তু তাঁর কন্যা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ওই স্থান বা আসন পরিত্যাগ করতে বললেন। তখন আবু সুফিয়ান বললেন— "এইভাবে পিতার সঙ্গে ব্যবহার করা ঠিক নয়।" তখন কন্যা বললেন—"আল্লাহ্‌র নবীর জন্য নির্দিষ্ট যে আসন সেখানে কোন অবিশ্বাসীর বসা উচিত নয়।" আবু সুফিয়ান হতাশ হলেন। এখানে হযরতের সঙ্গে কথা হওয়া দূরের কথা সাক্ষাৎও হলো না।

তখন তিনি হতাশ হয়ে আবুবকবের নিকট গেলেন। তিনিও প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন ওমরের নিকট গেলেন। তিনি আরও কড়া কথা বলে বিদায় দিলেন। তখন তিনি আলি ও বিবি ফাতেমার নিকট গেলেন। আলি তাঁকে পরামর্শ দিলেন--"আপনি তো মক্কাবাসীদের প্রধান, সুতরাং আপনি নিজ দায়িত্বে মসজিদে যান, এবং সেখানে প্রচার করুন—আমি জনগণের সাহায্য চাই সন্ধি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে।" আবু সুফিযান ওইরূপ করে মক্কায় ফিরে গেলেন। এতে মক্কাবাসীর নিকট তাঁর ব্যক্তিত্বের অনেক হানি হয়।

হোদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গের ফলশ্রুতি

মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি ঃ হযরত তাঁর সকল অনুগামীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। সকল মিত্রদলকে ডাকলেন। সকলকে অতি গোপনে প্রস্তুত হতে বললেন। তিনি কাউকেই বললেন না—কোথায় যুদ্ধ করতে যাবেন। সকলেই ধারণা করল—রোমের দিকে। মাত্র কয়েকজন বিশেষ অনুচর কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন মাত্র।

হাতিব বিন আবিবাল্‌তার বোকামি সংবাদ প্রেরণে ঃ হাতিব বিন আবিবাল্‌তা যিনি বদর যুদ্ধে হযরতের সঙ্গে ছিলেন এবং মুসলমানদের একজন সেনা রূপেও পরিচিত। তিনি তাঁর মক্কায় এক আত্মীয়কে হযরতের উদ্দেশ্য জানানোর জন্য একজন চাকরানীর (উম্মে সারা) দ্বারা একটি পত্র পাঠান। কিন্তু আল্লাহ্ হযরতকে একথা জানিয়ে দেন। তখনই হযরত সঙ্গে সঙ্গে আলি বিন আবুতালিব ও জুবাইর বিন আওয়াম এবং মেকদাদকে পাঠালেন ওই পত্র উদ্ধার করতে। তাঁরা তাকে পথিমধ্যেই খাক নামক বাগিচায় বিশ্রামরত অবস্থায় ধরে ফেললেন। দাসী কিছুতেই পত্র দেবে না। কিন্তু আলিও নাছোড়বান্দা। তিনি তার চুলের ভেতর থেকে পত্র উদ্ধার করলেন। পত্র এনে তাঁরা হাজির করলেন সরাসরি হযরতের নিকট। হযরত হাতিবকে ডাকলেন। তিনি তাঁর দোষ স্বীকার করলেন। কারণ দেখালেন, তাঁর একমাত্র পুত্রকে মক্কায় ফেলে এসেছেন, তাব মৃত্যুর জন্য খুবই ভয় হয়েছিল, শুধু এই কারণেই তিনি পত্র দিয়েছিলেন। যাই হোক, দয়ার নবী মহম্মদ (দঃ) তাঁকে এবারের মতো ক্ষমা করে দিলেন। যেহেতু তিনি নিজেই বদর যুদ্ধের যোদ্ধা। তবু আল্লাহ্ হযরতকে সতর্ক করলেন এহেন পাপে যেন কাউকে আর ক্ষমা করা না হয়। এখানে মহানবী দয়ার সাগর, ক্ষমার দরিয়া। যেখানে আল্লাহও ক্ষমা করছেন না, সেখানেও তাঁর রসুল ক্ষমা করছেন। কত বড় দয়ার বসুল। কোরআন—৯ ঃ ১২৮, ২১ ঃ ১০৭

যে কাজ করিল হাতিব অবুঝ মনে
তুমি তারে ক্ষমা কর আপন গুণে।

বিস্মিত কুরাইশগণ ঃ আজকের অভিযান ছিল একেবারেই অদ্ভুত। সমগ্র আরব অবাক। একবার দীনের নবী কিছুটা আঘাত পেয়েছিলেন মুতা যুদ্ধের কথা পূর্বেই ফাঁস হয়ে যাওয়াতে, আজ তিনি সম্পূর্ণ সতর্ক, তাই আজ সমগ্র আরব দুনিয়াও অবাক।

ইতিহাসের চাকা এইভাবেই ঘোরে। একদিন মক্কার কুরাইশকুল দশ হাজার সৈন্যসহ মদিনা জয় করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যর্থতার চরম গ্লানি কাঁধে নিয়ে ফিরতে হয়েছিল। আব আজ সেই মদিনাবাসীগণ ঠিক ওই দশ হাজার সৈন্যসহ মক্কা জয়ের জন্য অগ্রসর। এরই নাম ইতিহাসের চাকা। যা কোনদিনই একদিকে ঘোরে না। আজ ইতিহাসের চাকা মদিনার মুসলমানদের দিকে। সমগ্র আরব দুনিয়ার কেউ জানে না কোথায় কি হচ্ছে। মক্কাবাসী টেরও পেল না—যতক্ষণ না হযরত মহম্মদ (দঃ) মাররাজ্জাহরানে পৌঁছালেন, যে স্থানটি মক্কা থেকে মাত্র অর্ধদিনের রাস্তা। বিরাট বাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। প্রত্যেক গোত্রের আপন আপন নেতা ছিলেন এবং আপন আপন তাঁবু ছিল। হযবত মহম্মদ (দঃ) তাঁদের বিশাল মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন প্রস্তুত থাকতে।

মক্কাবাসীগণ এখন নানা চিন্তায় মগ্ন, যখন আব্বাস (হযরতের চাচা) এবং বানু হাশিম কুরাইশদের ত্যাগ করে হযরতের সঙ্গে যোগদান করতে উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু প্রথম অবস্থাতে হযরত তাদের গ্রহণ করেননি, ববং মক্কা ত্যাগের পরও তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে যে ব্যবহার পেয়েছিলেন তাতে বড়ই ক্ষুণ্ণ ছিলেন। আব্বাস আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আবদুল মোত্তালিবের (আবু সুফিয়ান বিন হারব নয়) সঙ্গে হযরতের নিকট হাজির হলো—হযরত যখন তাদের প্রত্যাখ্যান করলেন তখন তারা বলে—"আপনি যদি আমাদের গ্রহণ না করেন তাহলে আমরা অত্যাচারিত হবো, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা যাবো।" তখন দয়ার নবী মহম্মদ (দঃ)-এর হৃদয় বিগলিত হওয়ায় তিনি তাদের গ্রহণ করলেন।

যখন হযরত আব্বাস লক্ষ্য করলেন হযরতের বিশাল প্রস্তুতি তখন মক্কাবাসীদের জন্য তাঁর হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হলো। তিনি ভাবলেন যদি হযরত দয়ার সঙ্গে গ্রহণ না করেন, মক্কা শহব এবার বধ্যভূমিতে পরিণত হবে।

হযরত আব্বাসের কৌশল ঃ হযরত আব্বাস ছিলেন চিরশান্ত, ধীর, বিচক্ষণ ব্যক্তি। এই অধ্যায়ে একমাত্র আবুতালিবের সঙ্গে তাঁর কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। কেননা আবুতালিবও আজীবন হযরতের একান্ত অনুবাগী ছিলেন, হিতার্থী ছিলেন। আব্বাসও ঠিক তাই ছিলেন। বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় হযরত আব্বাসেরই রণকৌশল।

একদিন আবুতালিবের মতো আব্বাসও মক্কার কুরাইশদের কবল থেকে, ষড়যন্ত্র থেকে বারবার হযরতকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। আজ সেই একই ইতিহাসের চাকা অন্যদিকে ঘুরল। আজ সেই একই আব্বাসকে চেষ্টা করতে হলো হযরতের বিশাল সেনাবাহিনীর কবল থেকে কুরাইশদের রক্ষা করার জন্য বারবার উপদেশ দিয়ে, সতর্কতা দিয়ে। তিনি নীরবে নিভৃতে হযরতের সঙ্গে নিবিড় আলোচনায় ব্যস্ত থাকলেন, কি করে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করা যায়। হযরত. নিজেও আকুলভাবেই আল্লাহ্‌র দরবারে মোনাজাত করতে থাকলেন যাতে আব্বাসের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়।

সুতবাং শেষ পর্যন্ত আব্বাস শান্তিযাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন হযরতের ওই ইতিহাস-বিখ্যাত ঘোড়াকে (দুলদুল)। যাকে উপহার স্বরূপ পেয়েছিলেন মিশব-রাজ থেকে। দুলদুল মক্কার পথে এগিয়ে চলল। উদ্দেশ্য ছিল—মক্কাবাসীকে জানানো হযরতকে বাধা দিতে যাওয়া একান্ত নির্বোধের কাজ হবে। কেননা তাঁর সঙ্গে যে বিশাল বাহিনী আছে, তাকে বাধা দেওয়াব মতো শক্তি কুরাইশদের নেই, বরং সবচেয়ে বুদ্ধির পরিচয় হবে হযরতের নিকট গিয়ে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা।

আবু সুফিয়ান ধৃত ঃ সৌভাগ্যবশত আব্বাস, আবু সুফিযান বিন হারব এবং বুদাইল বিন ওরাকা দেখতে বেরিয়েছিলেন—সত্যিকারেব ঘটনা কি? এটা বটনা না ঘটনা?

আবু সুফিয়ান ঃ আমি কখনও এরূপ সেনাবাহিনী দেখিনি।

বুদাইল ঃ আল্লাহর শপথ, এরা সব খোজা সম্প্রদায়। তখন আব্বাস আবু সুফিয়ানের স্বর বুঝতে পেরে বলে উঠলেন—"দুঃখ তোমার জন্য—আবুহানজালা (আবু সুফিয়ানের অন্য নাম)।

আবু সুফিয়ান ঃ কে আবুল ফজল (আব্বাসের অন্য নাম)?

আব্বাস ঃ "দুঃখ তোমার জন্য—আবু সুফিয়ান! এখানে হযরত মহম্মদ (দঃ) তিনি জোর করে মক্কায় প্রবেশ করবেনই। দুঃখ কুরাইশদের ওপব, যখন তিনি তা করবেন।"

মক্কাবাসীগণ দেখার সঙ্গে সঙ্গে হযরতের দুলদুলকে চিনতে পারল। তখন আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন—কি করা যায়? পরিশেষে তিনজনেই মিলিতভাবে পরামর্শ করলেন। মক্কাবাসীদের বুঝিয়ে বললেন হযরতকে বরণ করতে। যখন তাঁরা তিনজনে ওমর বিন খাত্তাবের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেল। এবং আবু সুফিয়ান গ্রেপ্তার হলেন। আব্বাস চেষ্টা করেছিলেন তাঁর জীবন রক্ষা করতে, কিন্তু ওমর তাড়াতাড়ি হযরতের তাঁবুর দিকে ছুটে গেলেন আবু সুফিয়ানের মাথা কাটার নিমিত্ত তাঁর অনুমতির জন্য। আব্বাসও ছুটলেন তাঁবুর দিকে। এবং জানালেন, আবু সুফিয়ান এখন তাঁর আশ্রয়ে আছেন। আব্বাস ও ওমবের মধ্যে একটা উত্তপ্ত আলোচনা চলতে থাকল। অবশেষে হযরত মহম্মদ (দঃ) আব্বাসকে নির্দেশ দিলেন আগামী সকালে আবু সুফিযানকে তাঁর নিকটে হাজির করার জন্য।

পরদিন সকালে হযবত মহম্মদ (দঃ) তাঁর তাঁবুতে দরবার বসালেন। যখন আবু সুফিয়ানকে আনা হলো, তিনি বললেন—"আবু সুফিয়ান! দুঃখ তোমার জন্য! তোমার এখনও কি সময় হয়নি জানার—'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'—আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই।"

আবু সুফিয়ান ঃ "আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন।"

হযবত ঃ "হে আবু সুফিয়ান! তোমার দুঃখ। তোমার এখনও কি সময হয়নি জানার জন্য—আমি আল্লাহর দূত।"

আবু সুফিয়ান ঃ আল্লাহর শপথ! আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক। আমি ওই রূপই চিন্তা করছি।

আবু সুফিয়ান ঃ কোরআন শরীফ শুনেছিলাম। লক্ষ্য করেছিলাম হযরতের অনুসারীদের উৎসাহ। শুনেছিলাম হেরাক্লিয়াস হযরত সম্পর্কে কি বলেছিলেন। লক্ষ্য করেছিলাম আল্লাহব অপূর্ব নিশানাগুলো, এইসব নানা কারণে পুতুলগুলোর প্রতি তাঁর বিশ্বাসে চিড ধরেছিল। কিন্তু ভাবনা ছিল—সমাজে তাঁর মান-সম্মান কি হবে। লোকে তাঁকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। তিনি ইসলামে বিশ্বাস আনলেন।

তবে সরাসরি নয়, সরলভাবেও নয়। তাই আব্বাসের ভয় গেল না। কারণ আবু সুফিয়ান ছিলেন ইসলামের জাতশত্রু। এদিকে হযরতেব প্রতি ওমরের প্রভাবও কম নয়। কোন দিন আবু সুফিয়ানের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়ে যায়। সুতরাং তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গেই আবু সুফিয়ানকে বললেন—"আপনি আপনার বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিয়ে বলুন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এবং মহম্মদ (দঃ) আল্লাহব দূত। নতুবা আপনার মাথা শরীর থেকে পৃথক হয়ে যাবে।" আবু সুফিয়ান তাই করলেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় আবু সুফিয়ান তাঁর দেহ, ধড ও মাথাকে একত্রে এক রাখার জন্যই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

তখন আব্বাস মহম্মদ (দঃ)-কে জানালেন—হে আল্লাহর নবী। আবু সুফিয়ান ইসলামের গর্ব, আপনি তাঁকে অনুগ্রহ করুন। তখন নবী বললেন—"ঠিক আছে, যে আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবে সে রক্ষিত। যে নিজেকে নিজের ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ রাখবে এবং তাঁর দরজা বন্ধ রাখবে সেও রক্ষিত থাকবে এবং যে মক্কার মসজিদে গমন করবে সেও রক্ষিত।"

কুরাইশদের সঙ্গে শান্তি ও বন্ধুত্বের জন্য হযরতের আগ্রহ ঃ হযরতের কতিপয় অনুগামী যা চেয়েছিলেন—হযরত তাতে সম্মত হলেন—মক্কা হয়তো বধ্যভূমি বা শ্মশানে পরিণত হত ; কিন্তু হযরত তা হতে দেননি। বরং তিনি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছিলেন রক্তহীন বিজয়ের জন্য। আল্লাহ্ তাই মঞ্জুর করে তার মধ্যবর্তিতার জন্য পাঠালেন আব্বাসকে।

কেউ কেউ বলেন, আবু সুফিয়ান ছদ্মবেশে ছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে আমার ধারণা—আবু সুফিয়ান অন্তরের সঙ্গেই মুসলমান হয়েছিলেন। কেননা তিনি মদিনা থেকে পরিখার যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। শেষে হযরতের দলের সঙ্গে হোদাইবিয়ার সন্ধি করেন। কিছুকাল পরে সন্ধি ভঙ্গ হয়। ফলে আবার মদিনা যান সন্ধি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। সেখানে তিনি ধৃত হন এবং হযরতের সমীপে আনা হয়। এরপর তাঁর ইসলাম গ্রহণ মেকি ছিল বলে মনে হয় না। মেকি থাকলে তিনি অবিশ্বাসী অবস্থাতেই প্রাণ দিতেন। সেটুকু অধিকার তাঁর ছিল। বাকি আল্লাহ্ জানেন। তবে এঁর সম্পর্কে নানা কথা চলতেই থাকবে। ওটা তাঁর প্রাপ্য।

মক্কা প্রবেশে হযরতের সতর্কতা ঃ হযরতের নির্দেশে মক্কা প্রবেশ। তাঁদের অবস্থানরত স্থান মাররাজ জাহ্রান মক্কা থেকে সামান্য পথ। তিনি আদেশ দিলেন কোনক্রমেই রক্তপাত চলবে না বিশেষ কারণ ব্যতীত। আবু সুফিয়ানকে আটক রাখা হবে, যতক্ষণ না মুসলমানগণ মক্কায় প্রবেশ করেন, সুতরাং যে কোন কারণেই হোক তাঁকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। কে জানে তিনি প্রতারণা করবেন কিনা; কে জানে তিনি ক্ষতিকর কিছু করবেন কিনা। মুসলিম সেনাবাহিনী হযরতের সবুজ পতাকা সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললেন। হযরত ধীর ও স্থিরভাবে সুদক্ষ সেনাপতিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে সকলকে নেতৃত্ব দিতে থাকলেন। প্রত্যেক গোষ্ঠীর আপন আপন নেতা ছিল, সকলেরই নিকট আপন আপন পতাকাও ছিল। অশ্ব ও উটগুলোও তৃপ্তি সহকারে আহারের পর আনন্দ সহকারে এগিয়ে যাচ্ছিল।

যখন তাঁরা আবু সুফিয়ানকে অতিক্রম করেছিলেন তখন ওই বৃদ্ধের মনে একদিকে হযরতের বিরুদ্ধে গর্বহিংসা ও অন্যদিকে বিশ্বাসের নতুন প্রেরণা যেন দ্বন্দ্ব করছিল। যে স্থান, যে সম্মান তিনি সমাজে পেয়েছিলেন আজ তা হযরতের নিকট আগত-প্রায়। তখন তাঁর মনে বিশ্বাস দৃঢ় রূপ নেয়নি। তাই ভাগ্যের মানসম্মানের দোলা তাঁর মনকে দোলা তো দেবেই। তিনি আব্বাসকে বললেন-

"হে আব্বাস, কেউই এই বাহিনীকে বাধা দেবে না। কেননা কারও শক্তি নেই এই বাহিনীকে বাধা দেওয়ার। আল্লাহ্র শপথ, হে আবুল ফজল, আগামীকাল তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র বিরাট রাজাতে পরিণত হবেন।"

তারপর তিনি তাঁর আপন লোকদের কাছে গেলেন—যেখানে তাঁরা একত্রিত হয়েছিলেন এই দৃশ্য দেখার জন্য। তাঁদের উচ্চস্বরে বললেন—

"হে কুরাইশগণ! মহম্মদ (দঃ) আজ এখানে হাজির এমন শক্তি নিয়ে যাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। যে কেউ আবু সুফিয়ানের ঘরে আসবে সে নিরাপদ, যে কেউ নিজের ঘরে বন্ধ থাকবে ও তালা বন্ধ রাখবে, সেও নিরাপদ। এবং যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।"

হযরত মহম্মদ (দঃ) এগিয়ে চললেন—যতক্ষণ না তিনি জাতত্বা নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেইখানে তিনি দেখতে পেলেন—মক্কা তাঁর সামনে অবস্থিত। এবং তাঁর পতাকা বাতাসে আন্দোলিত। তাঁর সেনাবাহিনী আল্লাহর পথে অগ্রসর এবং আল্লাহর তেজে তেজোদীপ্ত। তিনি উট থেকে অবতরণ করলেন—এবং আল্লাহ্কে নিবিড়ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন—আজ নির্বিবাদে বিনা রক্তপাতে সৈন্য-সামন্তসহ শান্তির সঙ্গে মক্কায় প্রবেশের জন্য মক্কার সিংহদ্বার তাঁর নিকট আকাশের মত উন্মুক্ত।

মুসলমান সেনাবাহিনীকে মক্কা প্রবেশের নির্দেশ ঃ যদিও হযরত মহম্মদ (দঃ) আল্লাহর প্রতি অশেষ ভরসা রাখতেন ও কৃতজ্ঞ থাকতেন, তবুও মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে কোনদিনই ভুল করতেন না। তিনি তাঁর সমগ্র সেনাবাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করলেন। তাঁদের সকলকে কঠোর নির্দেশ দিলেন কোন রূপই রক্তপাত করা চলবে না, যতক্ষণ না তাঁরা বাধ্য হন ওইরূপ করতে।

সেনাপতি জুবাইর বিন আওয়ামকে বাম শাখার ভার দেওয়া হলো। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হলো উত্তর দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করতে।

সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদকে দক্ষিণ শাখার ভার দেওয়া হলো। এবং তাঁকে দক্ষিণ দিক থেকে মক্কায় প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হলো।

মদিনাবাসীদের নেতা সাদ বিন উবাইদাকে পশ্চিম দিক থেকে মক্কায় প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হলো।

মোহাজেরিনদের নেতা আবু উবাইদা বিন জাররাহ স্বয়ং হযরতের সঙ্গেই জাবালহিন্দের ওপর থেকে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

অশান্তি ও রক্তপাত সম্পর্কে মহম্মদ (দঃ) খুবই সতর্ক ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কানে পৌঁছাল আবু উবাইদা নাকি বলেছিলেন—"আজকের দিন হবে যুদ্ধের দিন, মক্কাতে তাঁদের স্বাধীনতা থাকবে, যেমন অন্যান্য সকল দেশের বিজয়ী সেনাদের থাকে। তাঁরা বিজিত দেশে যা খুশি তাই করতে পারেন। কিন্তু হযরতের বিজয় ছিল বর্বরতার বিরুদ্ধে, বর্বরতার বিজয় নয়। তাঁর বিজয় ছিল—বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার জয়। অপবিত্রতার বিরুদ্ধে পবিত্রতার বিজয়। অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের বিজয়। হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার বিজয়। অশান্তির বিরুদ্ধে শান্তির বিজয়। অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের বিজয়। অমনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের বিজয়, মানবতার বিজয়। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের পতাকা উবাইদার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার ছেলে কায়েসের হাতে দিলেন। তিনি যুদ্ধের জন্য যে কোন কথাকেই প্রশ্রয় দেননি।

ইকরামা কর্তৃক খালেদ আক্রান্ত ঃ সকল সেনাপতিই শান্তির সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু খালেদ আক্রান্ত হলেন মুসলমানদের চিরশত্রু সাফওয়ান, সুহাইল ও ইকরামার দ্বারা। এই খণ্ডযুদ্ধে মুসলমানদের দু'জন নিহত হলো। হযরত মহম্মদ (সাঃ) জবল হিন্দের ওপর উঠলেন এবং দক্ষিণ দিক থেকে লক্ষ্য করলেন তরবারির তীব্র রূপ। এতে তিনি খুবই বিরক্ত হলেন। তখন তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো পরিস্থিতি।

হযরত মহম্মদ (দঃ) মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রভু ঃ হযরতের তাঁবু ফেলা হয়েছিল আবু তালিব ও বিবি খাদিজার সমাধির নিকট, জাবাল হিন্দের ওপর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো—আপনি কি আপনার গৃহে বিশ্রাম নেবেন না? তিনি বললেন, কখনও না। তারা তাঁর মক্কাতে আসার জন্য কোন ঘর রাখেনি। তিনি তাঁর তাঁবুতেই বিশ্রাম নেবেন। ওই সময় তাঁর জীবন-গোধূলি লগ্নের স্মৃতির কাঁটাগুলি তাঁকে দংশন করতে থাকল। সেই বাল্যকালের স্মৃতি, সেই যৌবনের উদ্দীপনাময় সাধনা, বিবি খাদিজার সঙ্গে পবিত্র বিবাহ। কিভাবে চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহর প্রথম ডাক তাঁর নিকট পৌঁছাল। কিভাবে বিবি খাদিজা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। কিভাবে জিবরাইল তাঁর কাছে শুভ সংবাদ আনলেন। নিশ্চয়ই তোমার ভবিষ্যৎ বর্তমান (বা অতীত) অপেক্ষা উত্তম। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে এরূপ দান করবেন, তুমি সন্তুষ্ট হবে।" কোরআন—২৮ ঃ ৮৫, ৯৩ ঃ ৪-৫

এই জগতেই আল্লাহর বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করল। পরকাল তো আছেই। এর জন্য তিনি যেভাবে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, তা অন্য কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তিনি এক মুহূর্তে সবকিছু ভুলে গেলেন—যত অত্যাচার, যত অবিচার, যত নির্যাতন, যত নিপীড়ন, যত অপমান, এক কথায় করলেন—'ক্ষমা'। "লা-তাছরিবা আলায়কুমুল ইয়াওমা।"—আজ তোমাদের প্রতি কোন প্রতিশোধ নাই।—হাদিস। আল্লাহ্‌র গভীর কৃতজ্ঞতায় দু'চোখ তাঁর অশ্রুতে ভরে উঠল। তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে পড়লেন, চাপলেন উটের ওপর। আল্লাহর ঘরকে সাতবার প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করলেন।

বংশগত গর্ব হযরত রহিত করলেন ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর তওয়াফ শেষ করলেন, ওসমান বিন তালহকে ডাকলেন কাবার দরজা খোলার জন্য এবং সেখানে দাঁড়াতে বললেন। মসজিদের চারদিকে মানুষ তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন এবং একটা ভাষণ দিলেন।

"এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরিক নেই। তিনি দাসদের প্রতি তাঁর কথা পূর্ণ করেছেন ও সাহায্য করেছেন। তিনি একাই সকল শক্তিসংঘকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছেন। সমস্ত গর্ব, প্রতিহিংসার সকল রীতিনীতি, রক্তপাত, গৃহযুদ্ধ, গোত্রযুদ্ধ, সকল কিছুই আজ থেকে বিলুপ্ত হলো। কিছুই থাকল না একমাত্র কাবার সংরক্ষণ ব্যতীত এবং হজযাত্রীদের পানি বিতরণের রীতি বর্তমান থাকল।"

"হে কুরাইশগণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হতে বিলুপ্ত করলেন—অন্ধকার যুগের সকল গর্ব, বংশানুক্রমিক সকল গর্ব। কারণ সকল মানুষই আদমজাত, এবং আদম ধূলিজাত।"

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি—এক পুরুষ এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে

পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানীয় যে অধিক সংযমী। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" কোরআন—৪৯ ঃ ১৩

ভুবন বিখ্যাত কি কালজয়ী ভাষণ! যে কোন ব্যক্তি এই সহজ সরল ভাষণটিকে সামান্য একটু অনুধাবন করলেই অতি সহজেই অনুমান করতে পারেন হযরত মহম্মদ (দঃ) কি মানুষ ছিলেন এবং তিনি কি কামনা করেছিলেন। আজকের দিনে তিনি শুধু মদিনার মালিক নন, মক্কার মালিক নন, বরং সমস্ত আরব দুনিয়ার মালিক। আজ তাঁর হাতে যে সেনাবাহিনী আছে, তা তাঁর যে কোন ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে সক্ষম; কিন্তু এই বিরাট শক্তি হাতে পেয়েও তিনি কি কামনা, কি ইচ্ছা পোষণ করলেন! এখানেই তিনি মহৎ, এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

সমগ্র আরব তো দূরের কথা, তিনি একটি প্রাণীকেও বললেন না তাঁর কাছে নত হতে, বাধ্য হতে। তাঁকে যে কোন রকমের কর বা খাজনা দিতে এবং কোন প্রকারের ভয়ও দেখালেন না যে, তাঁর অবাধ্য হলে শাস্তি দেওয়া হবে, কোন রকমের মার্শাল ল-ও জারি করলেন না। যেমন তাঁর আশ্চর্যজনক বিজয় তেমনি তাঁর অনাড়ম্বর বিধান।

বরং পক্ষান্তরে বারবার ঘোষণা করলেন বংশের বা গোত্রের কোন গর্ব থাকবে না, ধনের কোন গর্ব থাকবে না, সমস্ত মানুষই সমান, সকল মানুষই আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি একমাত্র আল্লাহর দূত, তিনি একমাত্র বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি আল্লাহর নিকট। আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে হযরত মহম্মদ (দঃ) যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা অতিক্রম করার শক্তি আজ কারও নেই। এখানেই হযরত মহম্মদ (দঃ) মানবতার পূর্ণরূপ। মনুষত্বের বিশুদ্ধতম বিকাশ।

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ঐতিহাসিক নজিরবিহীন ক্ষমা ঃ এই ভাষণ দেওয়ার পর তিনি কুরাইশদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন—"হে কুরাইশগণ, তোমরা কি চিন্তা করছ, আমি তোমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করব?" তাঁরা বললেন—হে মহান ভ্রাতা, হে মহান ভ্রাতার পুত্র। তিনি বললেন—"আজকের দিনে তোমাদের কোন দোষ নেই, তোমরা যাও, তোমরা মুক্ত, আজাদ।"

আজ হযরত মহম্মদ (দঃ) দাঁড়িয়ে আছেন তাদেরই মাঝে, যারা ছিলো তাঁর চিরশত্রু, যারা তাঁকে একদিন গালাগালি করেছে, পাথর নিক্ষেপ করেছে, বিতাড়িত করেছে, মৃত্যু কামনা করেছে, যুদ্ধ করেছে বহুবার। এমনকি বহু সাহাবার স্থাবর-অস্থাবর থেকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেও কেড়ে নিয়েছে। এহেন শত্রুকেও ক্ষমা করলেন। এমনকি আপন সম্পদগুলোও আর ফিরে নিলেন না। সেই নির্যাতিত নবী (দঃ) আজ তাঁদের জীবন-মৃত্যুর মালিক। কিন্তু কোন প্রতিশোধ নেই, একটি কথা ভিতর দিয়ে সবকিছুর অবসান করে দিলেন। "আজ তোমাদের উপর কোন প্রতিশোধ নেই, তোমরা আজ মুক্ত।" এই একটি কথাতেই ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল। এমনি মহাজীবন, যাদের মঙ্গল করেছেন, তাদের নিকট থেকে নেননি কোন প্রতিদান। আবার যারা তাঁর অমঙ্গল করেছে, সেখানেও তিনি কোন প্রতিশোধ নেননি। তাই প্রতিদান ও প্রতিশোধহীন অমূল্য জীবন এই হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর।

ক্ষমার অযোগ্য পাপীদেরও ক্ষমা ঃ বিশ্ব যখন (রোম ও ইরান) শক্তির পরিমাপের জন্য হিমালয় প্রস্তুত করছে, তখনই মহানবী (দঃ) তাঁর জীবনের ক্ষমাহীন পাপীদের জন্য ক্ষমার ও দয়ার দরিয়া তৈরি করলেন।

১। মহানবীর কন্যা সন্তানসম্ভবা বিবি যয়নাবের খুনী হিবার বিন আস ওয়াদ ও তার অন্যান্য সঙ্গীদের ক্ষমা।

২। মহানবীর শ্রদ্ধেয় চাচা মহাবীর হামজার খুনী ওয়াহ্সী বিন হারবকে ক্ষমা।

৩। হযরত হামজার কলিজা ভক্ষণকারিণী আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ও আমির মুয়াবিয়ার মা হিন্দাকে ক্ষমা।

৪। মহাশত্রু আবু জাহেলের পুত্র ইকরামা ও সাফ্‌ওয়ানকে ক্ষমা।

৫। রক্তপিপাসু শত্রু আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ্, মারওয়ান ও কাব বিন জুহায়েরকে ক্ষমা।

৬। একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য আবু সুফিয়ানকেও ক্ষমা। ক্ষমা শব্দটি যেন এখানে চরম পূর্ণতালাভ করল।

৭। আবু সুফিয়ানের পুত্র আমির মুয়াবিয়াকেও ক্ষমা।

॥ বিশ্ব জয় ॥

প্রাপ্য যাব প্রাণদণ্ড সেই পাপীজন
ক্ষমাই পায়নি শুধু, পেল তব মন।
আজীবন শত্রু জেনেও জব্দ কর নাই
সুযোগে দুর্যোগে দিলে অন্তরেতে ঠাঁই।
যখনই যেথায় গেছো করিয়াছ জয়
খোদার আরশ্‌ভূমি মানব-হৃদয়।
হীনতম দুশমনেরে করিয়া আপন
মানবে ভ্রাতৃত্ববোধ করেছ স্থাপন।
বাঁধিলে স্নেহের ডোরে আরব জাহান
দেখিল জগৎবাসী এ কোন্ মহান।
শিখুক জগৎ-বীর জয় কারে বলে—
অস্ত্র নয়, শস্ত্র নয়, নয় পশু বলে।
শিখালে মানবকুলে তরবারি নয়
প্রেম-প্রীতি ভালবাসায় প্রকৃত বিজয়।
স্নেহ মায়া মমতায় করেছিলে জয়
তোমার প্রেমের জয়, বিশ্ব-বিজয়। —কাব্যকানন

কাবার পবিত্রকরণ ঃ সমগ্র আরববাসীকে নিঃশর্ত ক্ষমা করার পর হযরত কাবাতে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন—কাবা ছবি ও পুতুলে পরিপূর্ণ। দেবতার ছবি, মেয়েদের উলঙ্গ ছবি, নবীদেব ছবি ইত্যাদি। মূল্যবান পাথরের দেব-দেবী, নেতাদের মূর্তি প্রভৃতি। হযরত সমস্ত কিছু একেবারেই সরিয়ে দিলেন। কাবাকে করলেন পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। এরপর তিনি কোরআন থেকে কিছু আবৃত্তি করলেন।

"সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে এবং নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হয়।"

কোরআন—১৫ ঃ ৮১

প্রকৃতপক্ষে মক্কার বিজয় ছিল মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয় এবং এই বিজয়ে সকল সেনার উর্ধ্বে সেনাপতি ছিল—আল্লাহ্‌র মহান ইচ্ছা।

যারা আল্লাহর ইচ্ছাকে অনুধাবন করতে পারে না, বিশ্বাস করতে পারে না, প্রশংসা করতে পারে না, তারা কখনও ইসলামকে, কোরআনকে, মহম্মদ (দঃ)-কে বুঝতে পারবে না। কারণ ইসলামের সমগ্র দর্শন বোঝা নির্ভর করছে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর। কেননা আল্লাহর ইচ্ছা ইসলামের সমগ্র দর্শন পরিব্যাপ্ত করে আছে। কিন্তু আমরা করি উল্টোটা—। আমরা সাত সংসারকে জড়ো করে আল্লাহর ইচ্ছাকে বোঝাতে চাই। যার ফলে সাত সংসারও বোঝা হয় না, আল্লাহর ইচ্ছাকেও বোঝা হয় না। ঠিক অনুরূপভাবে আমরা ইসলামের সাতকাণ্ড সংগ্রহ করে কোরআনকে বুঝতে চাই। যার ফলে কোনদিনই ঠিক কোবআন বোঝা হয় না। উচিত কোরআনের মাধ্যমে সকল কিছুকে, ইসলামকে, ইতিহাসকে নির্ণয় করা ও বোঝা।

আনসারগণের ভয় ঃ মক্কার কুরাইশদের প্রতি হযরতের এরূপ সহৃদয় ব্যবহার দেখে মদিনার আনসারগণ ভয় পেয়েছিলেন, হয়তো তিনি এখানেই চিরদিনের জন্য থেকে যাবেন। যখন হযরত জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌ই আমার রক্ষক। আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে।" আকাবাতে তিনি যে কথা উচ্চারণ করলেন, সমগ্র জীবনে তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

প্রথম আযান কাবাতে ঃ কাবা পরিচ্ছন্ন করার পর হযরত বেলালকে নির্দেশ দিলেন, কাবার ছাদে উঠে নামাযের জন্য আহ্বান করতে। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত দিনে পাঁচবার সমস্বরে আযানের আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে, দুনিয়ার শেষদিন পর্যন্ত হবে। পৃথিবীর কোথাও কোন ধর্মে এরূপ আহ্বান নেই। ইসলামের অন্যান্য সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে একা এই আযানই (আহ্বান) হযরতকে অমর করার জন্য যথেষ্ট নয় কি? এরপর তিনি হাজার প্রার্থনাকারীকে নিয়ে নামায সমাধা করলেন।

দশজনকে হযরত মহম্মদ (দঃ) দোষী বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবুও তাদের মধ্যে থেকে চারজনকে তিনি ক্ষমা করেছিলেন—হিন্দা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, যে মহাবীর হামজার কাঁচা কলিজাটা চিবিয়ে খেয়েছিল, ইকরামা, সাফওয়ান প্রমুখ।

হযরতের ঘোষণা—মক্কা পবিত্র ঃ এ সমস্ত কিছু করার পর তিনি ওই দিন মক্কায় অবস্থান করলেন। পরের দিন তিনি শুনতে পেলেন খোজা গোত্র হুদাইল গোত্রেব একজনকে ওই পবিত্র সীমানার মধ্যে বধ করেছে। তখন তিনি বললেন—

"হে মানবগণ, যেদিন আল্লাহ্ জগৎ সৃষ্টি করেছেন, ওই দিন থেকেই মক্কাকে পবিত্র স্থান করেছেন। সুতরাং আবার একে পবিত্র ঘোষণা করা হলো। যে কোন বিশ্বাসীর জন্যই হত্যা ও বৃক্ষচ্ছেদন নিষিদ্ধ করা হলো। এ যেমন পূর্বে পবিত্র ছিল এখন থেকে তেমনি পবিত্র থাকবে। আমার কথা, যারা এখানে হাজির নেই তাদের কাছে, যারা হাজির আছে তারা যেন পৌঁছিয়ে দেয়। যদি কেউ বলে, আল্লাহর দূত এর মধ্যে রক্তপাত করেছেন, তখন বলবে—আল্লাহ্‌র নির্দেশে, কিন্তু তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছিল না বা নেই। খোজা সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের হাত রক্ত থেকে মুক্ত কর। আমি নিজে হত্যার মুক্তিপণ দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এরপর যদি কেউ কোনরূপ হত্যা করে তাহলে সে ও তার পরিবার সেই অপরাধের জন্য দায়ী থাকবে। তারা তখন হত্যাকারীকে হত্যা করতে পারে।"

হযরতের এই অপূর্ব ব্যবহার দেখে কেউই আর স্থির থাকতে পারল না। সকলেই একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করল। এমনকি হিন্দাও। আল্লাহর বাণী কি অদ্ভুতভাবে হযরতের চরিত্রে কাজ করেছে। তাই হযরত মহম্মদ (দঃ) জীবন্ত কোরআন।

"ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর ভালোর দ্বারা, ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।"

কোরআন—৪১ ঃ ৩৪

মক্কাতে হযরতের পনেরো দিন ঃ খালেদের অনুপ্রেরণায় ও অনুরোধে হযরত মক্কাতে ১৫ দিন অতিবাহিত করেছিলেন বাকি কাজগুলো সমাধা করার জন্য। তিনি নির্দেশ দিলেন কোন বিশ্বাসীর ঘরে কোন পুতুল বা মূর্তি থাকবে না বা তারা রাখবে না। তখন কতকগুলো লোককে পাঠালেন ওইগুলিকে দূর করতে বিনা রক্তপাতে।

খালেদ বানু সাইবান গোত্রে গেলেন ওইগুলো নষ্ট করতে। সেখানে পুতুলদের প্রধান উজ্জা ছিল। তখন সেখানকার লোকগুলো খালেদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। খালেদও তাদের কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন—তারা তাঁর অবাধ্যতা করার জন্য, যখন হযরত তা শুনলেন তখন তিনি বললেন—"হে আল্লাহ্, খালেদ যা করেছে তার জন্য আমি তোমার নিকট ঘৃণা প্রকাশ করছি।" তারপর তিনি আলিকে টাকাসহ জুমাইমিয়াতে পাঠালেন। আলি সকলকে হত্যা পণ দিলেন, বাকি উদ্বৃত্ত টাকা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিলেন তখন বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকল মানুষই হযরতের বিচারে মোহিত হয়ে উঠল। ফলে ১৫ দিনের মধ্যেই দু'হাজার বছরের সকল কুসংস্কারকে দূর করে দিলেন।

এরপর তিনি ওসমান বিন তালহা ও তাঁর পুত্রগণকে কাবার অভিভাবক করে দিলেন এবং আব্বাস ও তাঁর পুত্রগণকে হজযাত্রীদের পানি দেওয়ার ব্যবস্থাপনার ভার দিলেন।

বিংশ অধ্যায়

হুনাইনের যুদ্ধ ও তায়েফ অবরোধ

অষ্টম হিজরী

৬২৯ খ্রীস্টাব্দ—৬৩০ খ্রীস্টাব্দ

আমরা কেউ কেউ চিন্তা করতে পারি—হযরতের শান্তির সঙ্গে মক্কা বিজয় হয়তো সমস্ত আরব দুনিয়াকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল—আর যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা নয়। আরব দুনিয়ার জন্মই হয়েছিল রাজা-বাদশা হওয়ার জন্য। যুদ্ধ তাদের রক্তের সঙ্গে মিশেছিল। সহজে একদিনে তাকে ত্যাগ করা যায় না। তাদের মনে যে কয়েকটা জিনিস প্রচণ্ড আঘাত করেছিল, তা হল—মহম্মদ (দঃ) কর্তৃক তাদের পুতুলগুলোর ধ্বংস সাধন। তারা ছিল বড়ই উচ্ছৃঙ্খল। হযরত সেখানে এনেছিলেন দারুণ শৃঙ্খলাবোধ। তারা ছিল নিদারুণ অসৎ কর্মী, হযরত যেখানে বলেছিলেন—নামায পড়, রোযা রাখ, যাকাত দান কর। এ সমস্তই ছিল আরব চরিত্রের কাছে বড়ই অসহনীয় ব্যাপার। সমগ্র আরব ছিল বহু গোত্রে, বহু বংশে, বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাদের মধ্যে কোন একতার বালাই ছিল না। একতাই ছিল ইসলামের বিজয়ের মূলে অন্যতম বড় কারণ। যার ফলে তারা অতি সহজে হলেও ধীরে ধীরে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করল—তাঁর দূত দ্বারা।

হাওয়াজিন ও সাকিফ ঃ হয়তো বা পাঠকের মনে থাকতে পারে তায়েফের শাসক ছিল সাকিফ। যখন হযরত তায়েফে ইসলাম প্রচার করতে গিয়েছিলেন তখন তারা হযরতকে কি নিষ্ঠুরভাবে পাথর নিক্ষেপ করেছিল—যার ফলে তাঁর পাদুকা পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল এবং তিনি অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই তায়েফে ছিল পুতুলদের দেবতা—আল্‌লাতের মন্দির। এই তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে হাওয়াজিন নামে আর একটি সম্প্রদায় ছিল, তারাও ছিল খুবই দুর্ধর্ষ। কোনদিনই মক্কাকে তারা মেনে নেয়নি। এটাও হতে পারে, যদি তারা কোন রকমে জানতে পারত হযরত মক্কা আক্রমণ করবেন, তাহলে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করত হযরতকে বাধা দিতে। কিন্তু হযরতের অভিপ্রায়ের সন্ধান পায়নি।

যখন হযরত মক্কাতে ইসলাম প্রচার করেছিলেন তখন এই হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্র হযরতকে আক্রমণ করবার প্রস্তুতি নিয়েছিল। নাছর ও জুসম নামক দুটো গোত্রও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু কাব ও কিলাব গোত্র তাদের সঙ্গে যোগদান করেনি।

দুরাইদ বিন সুম্মা নামে জুসম গোত্রের একজন নেতা ছিলেন। তিনি যত বৃদ্ধ ছিলেন তাঁর জ্ঞানও তত পাকা পোক্ত ছিলো। হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রের প্রকৃত নেতা ছিলেন মালিক বিন আওফ। এ দুটো সম্প্রদায় এক নতুন পদ্ধতিতে আক্রমণ করার চেষ্টা করছিল। তারা চিন্তা করে দেখল বারবার আরববাসীরা হযরতের নিকট কেন পরাজিত হয়। কারণ স্বরূপ তারা মনে করল—যখন কোন নেতার পতন হয়েছে তৎক্ষণাৎ তারা পালিয়ে এসেছে।

সুতরাং মালিক বিন আউফ পরামর্শ দিল—তাদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। যাতে তারা শীঘ্র পালিয়ে আসতে না পারে। তারা মক্কার পূর্ব-দক্ষিণ অতাস পর্বতমালার দিকে যাত্রা আরম্ভ করল। মক্কা থেকে তা প্রায় একদিনের পথ। যখন দুবাইদ বিন সুম্মা ঘোড়ার হ্রেষা রব, ভেঁড়ার চেঁচামেচি, উটের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, তিনি মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার? মালিক বললেন, বিরোধী পক্ষ অন্যপক্ষকে বাধা দিতে এগিয়ে আসছে। মালিকের এমন কৌশল ছিল যা কোনদিনই ব্যর্থ হতো না। এবারও তিনি অতি সুন্দর কৌশল অবলম্বন করলেন।

হাওয়াজিন ও সাকিফ হুনাইন উপত্যকায় তাদের তাঁবু ফেললেন এবং তাঁদের তীরন্দাজদের উপত্যকার পথের মধ্যে বসিয়ে দিলেন। যে পথ দিয়ে মহম্মদ (দঃ) তাঁর সৈন্যবাহিনী-সহ অতিক্রম করবেন।

তারা ঠিক করল—তাদের তীরন্দাজগণ প্রচণ্ড বেগে তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করলে, হযরতের সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্যান্য সৈন্যগণ পাহাড় থেকে তাদের ওপর ভীষণভাবে আক্রমণ করবে। তাহলে একদিনেই মক্কা জয় হয়ে যাবে। এই তীরন্দাজগুলোকেও খুব গোপনে গোপন স্থানে বসানো হয়েছিল। মুসলমানগণ হুনাইন পৌঁছানোর পূর্বেই।

হাওয়াজিন ও সাকিফের পথে হযরত ঃ মক্কাতে দু'সপ্তাহ ইসলাম প্রচারের পরই হযরত শুনতে পেলেন—হাওয়াজিন সাকিফের ষড়যন্ত্রের কথা। যখনই তিনি শুনতে পেলেন, তিনি এতটুকু সময় নষ্ট করলেন না। প্রস্তুত হলেন মোকাবিলা করার জন্য। যাত্রা করলেন—১২,০০০ সৈন্য, ১০,০০০ সঙ্গী যাঁরা মদিনা থেকে এসেছিলেন এবং ২০০০ নতুন মুসলমানসহ।

মুসলমানগণ এই বিশাল বাহিনী নিয়ে মনের আনন্দেই যাত্রা করলেন। স্বয়ং হযরত আবুবকরের মতো মানুষও বলে উঠলেন—"এবার আমাদের সংখ্যা শত্রু অপেক্ষা অনেক বেশি।" সুতরাং সকলেরই ধারণা হল—জয় সুনিশ্চিত কিন্তু কেউ কি জানতো ভাগ্যে কি আছে।

স্বয়ং আবুবকর, আবু সুফিয়ান আব্বাস ও অন্যান্য আরব নেতা যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন আপন পতাকাসহ যাত্রা করছেন। সন্ধ্যা আগত-প্রায়। মুসলমানগণ হুনাইনের প্রান্তে হাজির। মুসলমানগণ হুনাইনের প্রবেশপথে তাঁবু খাটালেন। আশা থাকল আগামী সকালেই বিজয়।

হুনাইন যুদ্ধ ঃ প্রভাতে হযরতের সৈন্যগণ যাত্রা করল। হযরত স্বয়ং তাঁর সাদা দুলদুলে চেপে সৈন্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় যাত্রা করলেন। খালেদ বিন ওয়ালিদ নেতৃত্ব দিলেন। সৈন্যগণ গিরিপথে প্রবেশ করল, যেন দু'দিকেই দেওয়াল। তখনও ঠিক সকালের আলো ফুটে ওঠেনি। ঝাপসা ঝাপসা ভাব। মুসলমানগণ কোন শত্রুকেই দেখতে পেলেন না কিন্তু শত্রুগণ ঠিক দেখল। এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচণ্ডভাবে মুসলমানদের উপর বর্ষাকালের বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষণ করতে থাকল। মুসলমান সৈন্য একেবারেই অবাক হতভম্ব। কিন্তু তখন তাদের আর কিছুই করার নেই। মক্কার নতুন মুসলমানগণও এই প্রথম

পদক্ষেপেই পশ্চাদপসরণ করল। বাকি মুসলমানগণও কিছুই জানল না। ইসলামের সমগ্র ইতিহাসে হযরতের জীবনে এরূপ ঘটেনি।

সকলেই তীব্রবেগে ছুটে চলে যাচ্ছেন, কেউই তাঁর চিৎকারের প্রতি লক্ষ্য করার মতো মানসিকতাও যেন পাচ্ছেন না। অথচ তিনি শত্রুর সম্মুখে। আল্লাহই তাঁর দূতগণকে যথাসময়ে সাহায্য করেছেন এবং তাঁরা কখনও অকৃতকার্য হননি। যখন মিশরের রাজা ফেরাউন হযরত মুসার প্রতি আক্রমণ চালিয়ে ধাবমান হয়েছিলেন, হযরত মুসা পালিয়ে যাচ্ছিলেন।

"ওরা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল, তখন মুসার সঙ্গীরা বলল—আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মুসা বলল—কিছুতেই নয়, আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক, তিনি আমাকে পথনির্দেশ দেবেন।"

কোরআন—২৬ ঃ ৬০-৬২

আল্লাহ্ সবসময় তাঁর দূতদেব সঙ্গে। তিনি ছিলেন হযরত মুসার সঙ্গে, নূহের সঙ্গে, ইব্রাহিমের সঙ্গে, ঈসার সঙ্গে মহাবিপদেও। তিনি আজও হযরত মহম্মদের সঙ্গে। যদিও সৈন্যগণ বিভ্রান্ত হয়ে চলে গেলেন কিন্তু হযরত এক পা-ও নড়েননি। কারণ তিনি জানেন—আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে আছেন। এটাই প্রমাণ করল—তিনি আল্লাহর দূত, আল্লাহর নিকট থেকে এসেছেন। তাই তিনি ছিলেন—পর্বতসম অটল। এখানেই হযরত হযরতই।

কিন্তু মক্কার নব মুসলমানদের সন্দেহ তখনও দূর হয়নি। আবু সুফিয়ান বিন হাবব বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে বললেন—"যে মানুষগুলো গতকাল কুরাইশদের জয় করেছেন, তাঁরা সমুদ্র না দেখা পর্যন্ত থামবে না।" সাইবা বিন ওসমান বিন আবিতালহা বলেন—"আজ মহম্মদের উপর প্রতিশোধ নেবই।" তার পিতা ওহোদের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এবং খালদা বিন হাম্বল বলে, "মোহগ্রস্তকাল আজ শেষ।" আজ হযরতের ২০ বছরের মহানব্রত যেন দোদুল্যমান অবস্থায়। অনেকের মনে হলো, তাঁর আল্লাহ্ কি তাঁকে ত্যাগ করলেন। যদি তাই হয়, তবে তাঁর সাহায্য কোথায়, কেন এই আতঙ্ক।

প্রায় সকলেই প্রাণভয়ে পলায়িত। কিন্তু হযরত মহম্মদ (দঃ) অনড়, কিছু আনসার অনড়, কিছু আবু হাশিম গোত্রের লোক অনড়।

হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্র দেখল—মুসলমানগণ বিক্ষিপ্ত, নিজেদের স্থানও ত্যাগ করেছে এবং তারা হযরতের অতি নিকটবর্তী। তারা প্রস্তুত তাঁকে আক্রমণ করার জন্য। তখন আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আবদুল মোত্তালিব হযরতের ঘোড়ার রশি ধারণ করলেন এবং আব্বাস উচ্চস্বরে চিৎকার করলেন—

"হে আনসাবগণ, যারা একদিন মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, হে মহাজেরিনগণ, যাঁরা একদিন বৃক্ষতলে শপথ গ্রহণ করেছেন, হযরত মহম্মদ (দঃ) জীবিত এবং এখানেই। এইদিকে সকলে আসুন।" তিনি এত জোরে চিৎকার করলেন—যেন পাহাড় কেঁপে গেল। এবার হযরত নিজেও বললেন—

"আমি আল্লাহর নবী, আমার সম্পর্কে কোন মিথ্যা নেই। আমি আবদুল মোত্তালিবের বংশধর।"

হযরতের এই কথা সকলের কানে পৌঁছানো মাত্র বিদ্যুতের মতো সকলের মনে এক অভিনব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তাঁরা যেন সকলেই হৃত শক্তি ফিরে পেলেন।

মোকাবিলা ঃ এতক্ষণে ভোরের অন্ধকার ঝাপসা ভাব কেটে গেছে। দিনের আলো ফুটে উঠেছে। মুসলমানদের মন থেকেও দুর্বলতা ও সন্দেহ কেটে গেছে। এখন তাঁরা তাঁদের গোপন শত্রুকে দেখতে পেলেন। হযরত এক মুষ্টি ধূলি নিয়ে শত্রুর দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বললেন—"মুখ বিকৃত হয়ে যাক।" (৮ ঃ ১৭)। এরপরই মুসলমানগণ সহস্রগুণ শক্তি ও সাহস নিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করলেন। তখন শত্রুকুল তাদের শত রণকৌশল, শত শক্তি সমস্ত কিছু ভুলে প্রাণভয়ে এমনভাবে পলায়ন করল, তাদের মনেও থাকল না—তাদের পশ্চাতে থেকে গেল তাদের প্রচুর ধন-সম্পদ, শুধু তাই নয়, তাদের মা-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমস্ত পরিজনবর্গই। তখন মুসলমানদের হাতে যে সমস্ত সম্পদ এসে পৌঁছাল তার পরিমাণ—

১। ২৮,০০০ উট, ২। ৪০,০০০ ভেড়া, ৩। ৪,০০০ রৌপ্যখণ্ড, ৪। ৬,০০০ বন্দী।

বন্দী সকলকে ওয়াদি আল জিরানা নামক স্থানে নিয়ে আসা হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। মুসলমানগণ অতাস নামক স্থানে হাওযাজিনদের ধরে ফেললেন। সেখানে দু'পক্ষের প্রবল যুদ্ধ হলো। শত্রুপক্ষ একেবারেই পর্যুদস্ত হয়ে গেল। কতকগুলো মালিক বিন আউফের নেতৃত্বে তায়েফের পথে পলায়ন করল। মালিক বিন আউফ নিজে তায়েফের সাকিফ গোত্রের নিকট আশ্রয় নিল।

হুনাইন ও ওহোদ যুদ্ধ ঃ আমরা মুসলমানদের যুদ্ধে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি—যুদ্ধে জোয়ার ও ভাটা। এই জোয়ার-ভাটা থেকে কেউ নিষ্কৃতি লাভ করেনি। মুসলমানদের মাঝে মাঝে সামনে ভাটাতে পড়তে হয়েছে। এখানেই প্রমাণ হয় হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মনুষ্যজাত প্রচেষ্টার। তাঁর হাতে কেউ কোন রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেননি। যখন হযরত আপ্রাণ চেষ্টা করেও হয়বান হয়ে উঠলেন, তখনই আল্লাহ্ তাঁর দূতকে সাহায্য করেছেন। নচেৎ নয়। হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সমগ্র জীবনে এটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। এখানেই তাঁর মানবতার জয়, শ্রমের জয়, সাধনার জয়।

আমরা হুনাইন যুদ্ধকে কিছুটা ওহোদ যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। তবে সবটা নয়। কেননা মুসলমানগণ হুনাইন যুদ্ধে সামগ্রিকভাবে বিজয়ী। সমস্ত কিছু নিয়ে ঘরে এসেছেন। কিন্তু ওহোদ যুদ্ধে কুরাইশগণ মোটেই সে রকম কিছু পারেননি, তবে গতানুগতিক মিল আছে মাত্র।

গতানুগতিক মিল ঃ ওহোদের যুদ্ধে হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর সেনাবাহিনীকে গোপন পাহাড়ী পথে তীরন্দাজ নিযুক্ত করেছিলেন। হুনাইন যুদ্ধে ঠিক মালিক বিন আউফ ওই ভাবেই তীরন্দাজ রেখেছিলেন। ওহোদের যুদ্ধে কুরাইশগণ প্রথম যেমন সরে পড়েছিল, ঠিক হুনাইন যুদ্ধে মুসলমাণগণও সরে পড়লেন। ওহোদ যুদ্ধে কুরাইশগণ সুযোগ বুঝে আবার ফিরে এসেছিল। হুনাইন যুদ্ধে মুসলমানগণও ঠিক অনুরূপভাবে ফিরে এলেন। উভয়পক্ষ থেকেই প্রমাণ হলো—তীরন্দাজরা অপর পক্ষকে পরাস্ত করল। ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের

জয় হলো. কিন্তু জয় স্থায়ী হলো না। হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াজিনদের জয় হলো, কিন্তু তাও স্থায়ী হল না। কিন্তু মিল এইখানেই শেষ।

গরমিল ঃ হুনাইন যুদ্ধে হযরত যে পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ ধন লাভ করেন, আজ পর্যন্ত তা কেউ পাননি। কেননা ওহোদ যুদ্ধে কুরাইশগণ খালি হাতেই ফিরে গেল। এই দুই মারাত্মক যুদ্ধপ্রাঙ্গণে মুসলমানরা কিভাবে রক্ষা পেলেন, অবিশ্বাসীরা বলবে মহম্মদ (দঃ)-এর রণকৌশল, কিন্তু তা ঠিক নয়। কিন্তু হযবতেব চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না. অসাধ্য সাধন করেছেন। পরে আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন।

যাই হোক, আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত শক্তির বিকাশ করেছিলেন—তাঁর দূতের মাধ্যমে এবং দূত তাঁর প্রকাশ করেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের মাধ্যমে। আল্লাহ্ দু'দিক দিয়েই মুসলমানদের পরীক্ষা করলেন। একবার প্রথমে যুদ্ধ জয় দিয়েই, অন্যবার শেষ জয় দিয়ে।

কোরআন শরীফে হুনাইন যুদ্ধের কথা ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের বহু স্থলে এবং হুনাইন দিবসে সাহায্য করেছেন। যখন তোমাদেব সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিশাল হওযা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। অনন্তব আল্লাহ্ স্বীয় রসুলের প্রতি ও বিশ্বাসীদের প্রতি সান্ত্বনা অবতীর্ণ করেছিলেন এবং এমন এক অদৃশ্য সেনাবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাদের তোমরা দেখতেও পাওনি। তিনি অবিশ্বাসীদের শাস্তি দান করেছিলেন যেটা অবিশ্বাসীদেব প্রাপ্য প্রতিফল ছিল।" কোরআন—৯ ঃ ২৫-২৬

তায়েফ অবরোধ ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) তায়েফের শত্রু মালিক বিন আউফকে একটুও সময় দেননি। তিনি তায়েফ অবরোধ করলেন। কিন্তু অবরুদ্ধ লোক কেউ বাইরে আসেনি, প্রায় একমাস গত হলো। ববং এর মধ্যে কিছু মুসলমান শহীদ হলেন তীরন্দাজদের তীরে। পরে পবিত্র মাস সন্নিকটবর্তী হওয়ায় (যে সময়ে হত্যা, রক্তপাত নিষিদ্ধ) হযরত অবরোধ তুলে নিলেন। কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, তারা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তিনি তাদের রেহাই দেবেন না।

হযরতের তায়েফ থেকে জিরানায় প্রত্যাবর্তন—যুদ্ধলব্ধ ধন বিতরণ ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) মক্কা ফেরার পথে জিরানায় অপেক্ষা করলেন। সেখানে যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধলব্ধ ধনগুলো গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। তিনি সম্পদসমূহ কোরআনের নির্দেশমত বিতরণ করে দিলেন। পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্ ও তাঁর দূতের, বাকি মুসলমান যোদ্ধাদের মধ্যে।

এই বিতরণের পর হাওয়াজিনগণ সেখানে হাজির হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করল। এই সমস্ত বন্দীদের মধ্যে ছিলেন তাঁর দুধ-বোন—মা হালিমার কন্যা সায়মা। তিনি সায়মাকে ছেড়ে দিলেন, সঙ্গে দিলেন কিছু উপহার।

হযরত চিরদিনই ছিলেন দয়ার নবী। ক্ষমা তাঁর চরিত্রের ছিল অন্যতম ভূষণ। যখন হাওয়াজিনগণ ক্ষমাভিক্ষা করে তাদের বন্দীদের মুক্তিপ্রার্থনা করল, "আমি আমার অংশ এবং বানু আবদুল মোত্তালিবের অংশের কথা বলতে পারি কিন্তু তবুও তাদের জোহর

নামাযের পর মুসলমানদের নিকট এসে বলতে হবে—আমরা আমাদের স্ত্রীলোক ও ছেলে-মেয়েদেব জন্য আল্লাহর নবীকে আমাদের ও মুসলমানদেব মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য অনুবোধ কবছি এবং আল্লাহর নবীব সঙ্গে আমাদেব মধ্যস্থতা করে দেওয়ার জন্য।"

তাবা ওইভাবে প্রস্তাব রাখল—মাত্র কয়েকজন ব্যতীত সকলেই তাদের বন্দীদের মুক্তি দিলেন। তখন হাওয়াজিনগণ এতই মুগ্ধ হল, যা তারা কোনদিনই কল্পনা করতে পারেনি। অতীতে কোনদিনই আরব ইতিহাসে এরূপ ঘটেনি।

মালেক বিন আওফের ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) মালেক আওফের সম্পর্কে হাওযাজিনদেব সঙ্গে কথা বললেন। তিনি কথা দিলেন—"যদি আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে তাঁর সম্পদ তাঁকে ফিরিয়ে দেওযা হবে এবং তার সঙ্গে একশ উট দেওয়া হবে।" মালেক তাড়াতাড়ি মুসলমান হয়েছিলেন।

হযরতের বদান্যতা ঃ যা কিছু ছিল সমস্তেব ১/ হযবতেব আপন হিসাবে থাকল। কিন্তু তিনি কোনদিনই কিছু রাখেননি। কিন্তু এবাবে তিনি যা পেয়েছিলেন—তাঁর অধিকাংশই তাঁব পূর্ব শত্রু কুরাইশদের মধ্যে বিতবণ করে দিলেন। যাতে তিনি সম্ভব তাঁদের হৃদয জয করতে পারেন। তাঁব বিতবণেব কিছু নমুনা নিচে দেওযা হল ঃ

	নাম		পেলেন
১।	আবু সুফিয়ান (তাঁর অতীতের চিরশত্রু)	—	৩০০ উট, ১০০ রৌপ্যখণ্ড
২।	হাকিম বিন হাজাম	—	২০০ উট
৩।	নাজির বিন হারিস	—	১০০ উট
৪।	সাফওয়ান বিন ওমাইয়া (হুদাইবিয়া সন্ধি ভঙ্গকারী তিনজনের একজন)	—	১০০ উট
৫।	কয়সি বিন আদি	—	১০০ উট
৬।	সুহাইল বিন আমর	—	১০০ উট
৭।	হাওয়াইতিব আবদুল উজ্জা	—	১০০ উট
৮।	ইকরা বিন হারিস	—	১০০ উট
৯।	উনাইনিয়া বিন হিসন (মদিনার উট লুটকারী)	—	১০০ উট
১০।	মালেক বিন আউফ (হুনাইন যুদ্ধের নেতা)	—	১০০ উট

বাকি লোকেরা প্রত্যেকে ৫০টি করে উট পেলেন। এ সবই ছিল অংশের বাইরে। ওই অংশ থেকে হযরত মক্কাবাসীদের তাঁদের প্রাপ্য অপেক্ষাও বেশি দিলেন।

আনসারগণ অসন্তুষ্ট ঃ যখন আনসারগণ লক্ষ্য করলেন মক্কাবাসীদের প্রতি হযরতের বদান্যতা, তখন তাঁরা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেন। এবং বলাবলি করতে থাকলেন—তাঁদের প্রতি কিছুটা অবিচার করা হল। সাদ বিন ওবাইদা এই কথা হযরতের কর্ণগোচর করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লোকদের একত্রিত হতে বললেন। যখন তাঁরা একত্রিত হলেন, মহানবী বললেন—

"হে আনসারগণ, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে কি কথা শুনলাম। যখন আমি তোমাদের মধ্যে এসেছিলাম, তখন কি তোমরা ভ্রান্তিতে ছিলে না এবং আল্লাহ্ কি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেননি, তোমরা কি গরিব ছিলে না, তারপর আল্লাহ্ কি তোমাদের ধনী করেননি। তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ্ কি তোমাদের পরস্পর পরস্পরকে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দেননি।"

আনসারগণ ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ্ ও আল্লাহর দূত কতই না বদান্য ও উদার।

হযরত ঃ হে আনসারগণ, তোমরা কি আমাকে উত্তর দেবে না।

আনরাসগণ ঃ হে আল্লাহর নবী, কি উত্তরে আমরা আপনাকে দেব। সমস্ত বদান্য ও অনুগ্রহ আল্লাহর ও তাঁর নবীর জন্য।

হযরত ঃ কিন্তু আল্লাহর শপথ যদি তোমরা কিছু বলতে চাও নিশ্চয়ই বলতে পার।

আনসারগণ ঃ যখন আপনি আমাদের নিকট এলেন, সকলেই মিথ্যা বলছে, আমরা সর্বপ্রথম আপনার সত্যকে মেনে নিলাম। আপনাকে যখন সকলেই পরিত্যাগ করেছে তখন আমরা আপনাকে সাহায্য করলাম। আপনাকে যখন সকলেই বিতাড়িত করল, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিলাম, আপনি যখন গরিব আমরা আপনাকে সান্ত্বনা দিলাম।

হযরত ঃ "হে আনসারগণ, আমি ওই সমস্ত যা কিছু করেছি, এর একমাত্র কারণ তাদের ভালবাসা অর্জন করতে, তাদের মুসলমান করতে, তাদের তোমাদের ইসলামে আনয়ন করতে। যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলতে পারি—হিযরতের দ্বারা আমি কি মদিনাবাসী হয়ে যাইনি। সমগ্র মানুষ যদি একটি পথ পছন্দ করে এবং আনসারগণ যদি অন্য পথ পছন্দ করে তাহলে আমি আনসারদের দলে।'

"হে আনসারগণ, কেউবা কতকগুলো টাকা নিয়ে ঘরে ফিরছে, কেউবা কতকগুলো উট নিয়ে ঘরে ফিরছে, কেউবা কতকগুলো ভেড়া নিয়ে ঘরে ফিরছে। আর আনসারগণ আল্লাহর নবীকে নিয়ে ঘরে ফিরছে। কারা বেশি খুশি হবে? তোমরা কি খুশি নও।" এ হেন কথার পর আনসারগণ একেবারেই নীরব। এবং আপন আত্মশ্লাঘার গর্ব বোধ করলেন। "হে আল্লাহ্—তোমার রহমত আনসারদের উপর, তাঁদের ছেলেমেয়েদের উপর, অর্থাৎ বংশানুক্রমে বর্ষিত হোক।"

এতে আনসারগণ এতই মুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন সকলেই ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন—"আর বলার কিছু নেই, আমরা সবচেয়ে বেশি খুশি, বেশি সুখী আল্লাহর নবীর সঙ্গে, ও আল্লাহর নবীকে পেয়ে।"

মহম্মদ (দঃ)-এর কথার অন্তর্নিহিত ভাব ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর ভাষণের অন্তর্নিহিত অর্থ জীবনের মূল্য ধনে নয়, ভালবাসায়। ধন কেনাবেচা করা যায়, ভালবাসা কেনাবেচা করা যায় না। হযরত শুধু আল্লাহর দূত ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক, জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিলেন শত্রুকে ভালবাসার দ্বারা মিত্র করতে।

এ সমস্ত আলোচনা হয়েছিল—জিরানা নামক স্থানে, সেখানে প্রত্যেকেই খুশি হল। এরপর মহম্মদ (দঃ) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। 'ওমরা' ছোট হজ সমাধা করেন। অতঃপর আত্তাব বিন উসাইদকে মক্কার উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। মাজবিন জবলকে মক্কাবাসীদের জন্য ধর্মীয় গুরু নিযুক্ত করেন। এবং নিজে আনসার ও মোহাজিরদের সঙ্গে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এইভাবে আববের এই যুদ্ধ মহম্মদ (দঃ)-এর বিরুদ্ধে সমাপ্ত হয়। হুনাইনের যুদ্ধ মুসলমানদের জীবনের এক দারুণ কৃতকার্যময় ঘটনা। এক ভ্রমণেই তিনি তিনটি প্রধান শত্রুকেই বধ করে গেলেন। কিন্তু যাদের যা প্রাপ্য তাদেরকে তা ফেরত দিয়ে নিজে গরিব বেশে ফিরলেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন ধন-রত্নের পাহাড় সংগ্রহ করতে, তিনি তা পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মনুষ্যজগতের প্রতি দয়ার সাগর, জগতের তহশীলদার ছিলেন না। মদিনাতে তাঁর স্ত্রীদের কোন অলঙ্কার ছিল না। তাঁর ঘরে এমন জিনিস ছিল না, যে কোন লোক তার কোঁন তালিকা তৈরি করতে পারেন। এক কথায় একটি ভাল বিছানা পর্যন্ত তাঁর ছিল না। একবার তিনি একটি বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ বেশি নিদ্রা গিয়েছিলেন, ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বললেন—"এ বিছানাটি অধিক নরম বলে মনে হচ্ছে। এটা বাদ দাও।" এরূপই ছিল তাঁর জীবনযাত্রা, জীবনধারা। অসংখ্য জীবনের জন্য যেটা ঘটে থাকে, জগৎ কামনা, বাসনা ইত্যাদি মানুষের জীবনকে ভোগ করে। কিন্তু মহাপুরুষদের জীবনে জীবন জগৎকে ভোগ করে। হযরত মহম্মদ (দঃ) ওই জীবনের শ্রেষ্ঠতম জীবন, শীর্ষতম মানব। জীবন সকলেই পায় কিন্তু খুব কম ব্যক্তিই ওই জীবনকে ভোগ করার সৌভাগ্য পায়। প্রায় সকল ব্যক্তিই জীবনকে ভোগ করার নামে বিভ্রান্তিতে পড়ে জগৎকে ভোগ করে। অর্থাৎ যে ভোগটা অতি স্থূল ও পশুভোগের সমতুল্য।

মক্কা জয় ও হুনাইনের বিজয়ের ফল ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ) চরম কৃতকার্যতার সঙ্গেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। আজ আরব দুনিয়া যেন একবার ভাববার অবকাশ পেল—আর হযরতের সঙ্গে যুদ্ধের কোন অবকাশ নেই। এবারে হযরতের অভিযান সিরিয়া থেকে ইয়ামেনের দিকে।

আজ সবকিছু বিপরীত দিকে মোড় নিল। এর পূর্বে হযরত বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচারক পাঠাতেন, কোথাও বা দূত পাঠাতেন—মিত্রতার জন্য। আজ চারদিক থেকে লোক আসছে ইসলাম সম্পর্কে জানতে। আজ মানুষ আসছেন মিত্রতাস্থাপন করতে। ৫৩ বছর বয়সে হযরত মদিনায় গমন করে দীর্ঘ ৭ বছর বিরামহীন অভিযান চালিয়ে গেলেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধ। আক্রমণের পর আক্রমণ। যার ফলে আজ সমগ্র দুনিয়া বুঝল—শান্তির সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে যে কোন কিছুর মোকাবিলায় হযরত দুর্বল নন। যার ফলে তাঁর শত্রু চিরতরে নির্মূল হলো আরবে।

মক্কা বিজয়ের ফল সম্পর্কে পণ্ডিতগণ ঃ ইমামবোখারী—"আরবগণ কুরাইশদের জন্য অপেক্ষা করছিল—মুসলমান হওয়ার জন্য। তারা বলত—তাঁকে [মহম্মদ (দঃ)] ও তাঁর দল কুরাইশকে একঘরে থাকতে দাও। যদি তিনি মক্কা জয় করতে পারেন, তিনি

প্রকৃত নবী। সুতরাং যখনই মক্কা জয় হল সকলেই তাড়াতাড়ি মুসলমান হয়ে গেলেন।"
ইবনে হিশাম—সমগ্র আরব লক্ষ্য করছিল ইসলাম গ্রহণ করা ও না করার ব্যাপারে—হযরত ও কুরাইশদের মধ্যে কি সিদ্ধান্ত হয়। কেননা কুরাইশগণ ছিল আরবের নেতা, পথপ্রদর্শক ও কাবার অভিভাবক। তাঁরা হযরত ইব্রাহিমেরও বংশধর ছিলেন। সুতরাং তাঁদেরকে সকলেই নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। এই কুরাইশগণ সর্বপ্রথম হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে বাধা দেয়। যখন মক্কা জয় হল, ইসলামের জয়ধ্বনি বেজে উঠল সর্বত্র, তখন আরবরা বুঝতে পারল আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। সকলেই দলে দলে মুসলমান হয়ে গেলেন।

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর শরণাপন্ন হতে দেখবে।" কোরআন—১১০ ঃ ১-২

কোন জীবনেই সুখ ও শান্তি কোনদিন অবিমিশ্র থাকে না। হযরত মহম্মদ (দঃ) মক্কা বিজয়ের পর মনের এক অনাবিল শান্তি সহ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন বটে তবু দুটি চরম আঘাত পেলেন। তাঁর কন্যা যয়নাব অসুস্থ ছিলেন। যখন যয়নাব মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করছিলেন সেই সময় কয়েকজন কুরাইশ তাঁকে পথিমধ্যে ভীষণভাবে অত্যাচার করে। ওই অত্যাচারের ফলশ্রুতি হিসেবেই যয়নাব রোগে পড়েন। ওই রোগমুক্তি তাঁর জীবনে আর কোনদিন ঘটেনি। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই সময় হযরত ওসমানের দ্বিতীয়া স্ত্রী হযরতের কন্যা উম্মে কুলসুমও পরলোকগমন করেন। তাই একই সময়ে হযরতকে দুটি চরম আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। যদিও ইসলাম গ্রহণের পর যয়নাব তাঁর অবিশ্বাসী স্বামীর কাছ থেকে চলে এসেছিলেন, তবুও স্বামীর প্রতি তাঁর ভালবাসার কোন কার্পণ্য ছিল না। বদর যুদ্ধে তাঁর পূর্ব-স্বামী বন্দী হলে যয়নাব তাঁর মায়ের (বিবি খাদিজা) দেওয়া হারটা স্বামীর মুক্তিপণ হিসাবে পিতা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হযরত সেটা পরে মেয়েকে ফেরত দিয়ে দেন।

ইব্রাহিমের জন্ম ঃ যখন হযরতের বয়স ৬০ বছর, তখনও তাঁর কোন পুত্রসন্তান নেই। তিনি বিবি মরিয়মের গর্ভে একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন। এই মহিলাকে মিশরের রাজা তাঁকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। নবজাত পুত্রের নাম রাখলেন ইব্রাহিম। ইব্রাহিমের জন্মে হযরত অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। বিবি মরিয়মও পুত্রের জননী হয়ে গর্ব বোধ করলেন। হযরত তাঁকে প্রথম একটি বাড়িও দিলেন এবং প্রত্যহ নিয়মিত দেখাশোনা করতেন। যিনি সারা জগৎকে ভালবেসেছিলেন—তিনি আপনার একমাত্র পুত্রকে ভাল না বেসে থাকতে পারেন না।

এই ঘটনা হযরতের অন্যান্য স্ত্রীগণকে বেশ একটু ঈর্ষাকাতর করে তুলেছিল। কেননা তাঁদের কোন সন্তানাদি ছিল না। হযরত তাঁর পুত্র ইব্রাহিমের জন্মে বেশ কিছু পয়সাকড়ি দান করেন। ছেলের যত্নের জন্য একটি নার্সও নিযুক্ত করেন। তিনি তাকে দেখাশোনা করতেন। এ সমস্ত ঘটনাই হযরতের জীবনকে একটু ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। এখানেই হযরত "মানুষ"। এই অশান্তিকে কেন্দ্র করেই সূরা তহরীমা অবতীর্ণ।

কোরআন—৬৬ ঃ ১-৫

যে সমস্ত বিশেষ যুদ্ধে মহানবী নিজে ছিলেন ঃ

১। দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত মহম্মদ (দঃ) মাত্র ৩০৫ বা ৩১৩ জন অনুগামী নিয়ে বদর যুদ্ধে মিলিত হন।

২। তৃতীয় হিজরীতে হযরত ৭০০ জন মুসলমান নিয়ে ওহোদ যুদ্ধে ৩০০০ কুরাইশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

৩। পঞ্চম হিজরীতে হযরত ৩০০০ মদিনাবাসীকে নিয়ে ১০,০০০ জন কুরাইশের বিরুদ্ধে পরিখা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

৪। ষষ্ঠ হিজরীতে হযরত ১৪০০ জন হজযাত্রী নিয়ে হোদাইবিয়াতে মিলিত হন।

৫। ষষ্ঠ হিজরীতে ১৫০০ জন যোদ্ধা নিয়ে খাইবার যুদ্ধে ইহুদীদের বিরুদ্ধে মিলিত হন।

৬। সপ্তম হিজরীতে ২০০০ অনুগত সহচর সহ হজ সমাপন।

৭। অষ্টম হিজরীতে ১০,০০০ জন সৈন্য নিয়ে মক্কা জয় করেন।

৮। অষ্টম হিজরীতে ১২,০০০ সৈন্য সহ হুনাইন যুদ্ধের মোকাবিলা করেন।

৯। নবম হিজরীতে হযরত ৩০,০০০ সৈন্য সহ রোমানদের সঙ্গে মিলিত হন।

১০। দশম হিজরীতে ১,০০,০০০ হজযাত্রী-সহ মক্কায় হজ সমাপন করেন।

তাঁর ওফাত (মৃত্যু) কালে সিরিয়া থেকে এডেন এবং জেদ্দা থেকে ইরাক পর্যন্ত সমগ্র আরব মুসলিম দেশে পর্যবসিত হয়। যে কোন একজন মুসলমাননের পক্ষে ওই বিশাল এলাকায় একাকী ঘুরে বেড়ানো মোটেই বিপজ্জনক ছিল না।

একবিংশ অধ্যায়

তাবুক অভিযান

নবম হিজরী

৯, ১০ ও ১১ হিজরী = ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২ খ্রীস্টাব্দ

মহানবীর পারিবারিক জীবন

মরিয়মের প্রতি হযরতের অন্যান্য স্ত্রীদের ঈর্ষা ঃ হযরতের ভালবাসা শিশুপুত্র ইব্রাহিমেব প্রতি দিন দিন বেড়েই যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের জননী বিবি মরিয়মের কদরও বাড়তে লাগল। কিন্তু ওই সঙ্গে অন্যান্য স্ত্রীদের কোন সন্তানাদি ছিল না বলে মরিয়মের প্রতি ঈর্ষা তাদের ক্রমেই বাড়তে লাগল। একদিন মনের খুশিতে হযরত পুত্র ইব্রাহিমকে বিবি আয়েশা ও অন্যান্য স্ত্রীদেব ঘবে নিযে গেলেন তাদের দেখাতে। সকলেই দেখল, পুত্র দেখতে একেবারেই পিতার ন্যায় হয়েছে। কিন্তু দিন দিন হযরতের ভালবাসা যতই বাড়তে থাকল—ততই অন্যান্য স্ত্রীদের ঈর্ষাও বাড়তে থাকল। এটাই বোধহয় নারী জীবনেব সহজাত প্রবৃত্তি।

ওমর বিন খাত্তাব বলেন, অজ্ঞতার যুগে আমবা কোনদিন স্ত্রী জাতিদের প্রতি কোন কর্ণপাত করিনি, যতক্ষণ না কোরআনে তাঁদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হলো। একদিন আমি আমার স্ত্রীব সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন আমার স্ত্রী আমাকে প্রশ্ন কবল—'তুমি কেন এটা করলে, ওটা করলে।' তখন আমি তাকে বললাম—'আমি যাই করি, তোমাকে প্রশ্ন করার অধিকাব কে দিল।' তখন আমার স্ত্রী বলল—'হে খাত্তাবেব পুত্র, তুমি কি আশ্চর্য লোক, তুমি কি চাও না আমি তোমাকে প্রশ্ন করি? যখন তোমার আপন মেয়ে (হাফ্সা) তার স্বামী হযরতকে প্রশ্ন করে।' ওমর বললে—"আমি বুঝে নিলাম এবং হাফ্সাব নিকট গমন কবলাম। তাকে জিজ্ঞাসা কবলাম, তুমি কি হযবতের সঙ্গে ঝগড়া কর, প্রশ্ন কব। হাফ্সা বললেন—'হ্যাঁ, তখন আমি তাঁকে বললাম, আমার তোমার জন্য ভয় হয়, আল্লাহর প্রতিশোধ ও হযবতের অসন্তুষ্টির জন্য। হে আমার কন্যা বাড়াবাড়ি করো না।' তারপর আমি আমার এক আত্মীয়া হযরতের অন্য স্ত্রী উম্মে সালেমার নিকট গেলাম—তাঁকে একই কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন—"হে খাত্তাবের পুত্র, আপনি সত্যিই আশ্চর্য মানুষ। আপনি কি আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ঘটনাব মধ্যেও নাক গলাতে চান। আমি লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলাম।"

আসল কথা ছিল, ইব্রাহিমের জন্মের পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই হযরতকে বিবি মরিয়মের জন্য কিছু বেশি টাকা দিতে হতো। এটাকেই কেন্দ্র করে অন্যান্য স্ত্রীগণও বেশি দাবি করে বসলেন। হযরত তাঁদের সে দাবি পূরণ করতে পাবেননি। কেননা তিনি তো একদিনের খাবারও জমা রাখতেন না, যদিও প্রচুর ধন-রত্নের মালিক ছিলেন। এ সময়ে হযরতের মানসিক অবস্থা এতই খারাপ হয় যে তিনি তখন সকল লোকদের সঙ্গেই সাক্ষাৎ একদম

বন্ধ করে দেন। হযরত ওমর ও আবুবকর তাঁদের কন্যাদের বাড়তি দাবি প্রত্যাহার করিয়ে নিলেন। এবং জিনিসটা অনেকটা মিটে গেল।

কিন্তু কয়লার ময়লা তুলতে পারে এমন সাবান বোধহয় আজও পৃথিবীতে আবিষ্কার হয়নি। সমুদ্রগর্ভে পাথর ও লোহার মধ্যে যে আগুন নিহিত আছে, তাকে নিভিয়ে দেয় এমন জলাশয় ও জল-সমুদ্র পৃথিবীর কোথাও নেই। ঠিক তেমনিভাবে একই স্বামীর অধীনে বহু স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ইত্যাদি মুছে দেয় এমন ওষুধ পৃথিবীতে আজও আবিষ্কার হয়নি। তাই ওই দুরারোগ্য ব্যাধি চলতেই থাকল, তবে অন্যদিকে প্রবাহিত হল।

হযরত সুগন্ধ যেমন ভালবাসতেন, দুর্গন্ধ তেমনি ঘৃণা করতেন। তাই তিনি মধু খেতে ভালবাসতেন। এই মধু তিনি বিবি যয়নাব ও মরিয়মের ঘরে গ্রহণ করতেন। এর জন্যও তাঁকে অন্যান্য স্ত্রীগণ বিরক্ত করে তোলেন। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, আগামী মাসে তিনি আর মধু খাবেন না, স্ত্রীদের সঙ্গেও দেখা করবেন না। এই পবিবাবিক ব্যাপারে তিনি আর সময় নষ্ট কবতে পছন্দ কবলেন না। তিনি কোন ভাল খাবার বা আবাম-আযাস এ সময়ে গ্রহণ করেননি।

সকলেই ধারণা করেছিলেন হযবত তাঁব স্ত্রীদেব ত্যাগ কবেছেন। কিন্তু তিনি তা কবেননি। এবং তিনি তাদের কিছু সময় দিয়েছিলেন বোঝার জন্যে যাতে তাদের হিংসা-দ্বেষ কিছুটা কমে। তবে কোন ব্যক্তিকেই এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করাব অনুমতি দেননি। এ অবস্থায় সকল মুসলমানই ভীষণভাবে অস্বস্তি বোধ করেন। যখন হযরত ওমর জানতে পারলেন হযরত তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেননি, তখন তিনি মসজিদে গিয়ে সে কথা প্রচার করলেন। কিছু পরে আল্লাহর ওহী—

"হে নবী! আল্লাহ্ তোমাব জন্য যা কিছু বৈধ করেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য তা অবৈধ করছ কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।" কোবআন—৬৬ : ১

এগুলো অবতীর্ণ হয় তাঁর মধু খাওয়ার প্রসঙ্গে। বিবি আয়েশা ও বিবি হাফ্সা এ ব্যাপাবের জন্য মূলত দায়ী ছিলেন।

"আল্লাহ্ তোমাদের শপথ থেকে মুক্তিলাভেব ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের সহায়, তিনি সর্বজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।" কোবআন—৬৬ : ২

হযরত যে শপথ নিয়েছিলেন ওই মাসে স্ত্রীদেব সঙ্গে কথা না বলার জন্য ওই শপথকে অন্যভাবে পালনের জন্য কোবআন শরীফের পঞ্চম সূরা আল মায়েদার ৮৯ নং আয়াতে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হযরত এক মাস তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে কথা না বলে তাঁব শপথ পালন করেছিলেন!

যখন হযরত তাঁর স্ত্রীদের একজনকে একটি গোপন কথা বললেন—অন্য কাউকে না বলার জন্য কিন্তু তিনি অন্যদের সে কথা বলে দেন। তখন আল্লাহ্ একথা হযরতকে জানিয়ে দেন তাঁব স্ত্রী গোপনীয়তা রক্ষা করেনি। স্ত্রী যখন হযরতকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে কে বলেছেন। তখন হযরত বললেন—"আমাকে জানিয়েছেন যিনি তিনি সর্বজ্ঞানী, সবই অবগত।" কোরআন—৬৬ : ৩

এই গোপন বিষয় কি ছিল, কেউ জানেন না। তবে অনেকেই ধারণা করেন একদিন হযরত বিবি হাফসার গৃহে গেলেন, বিবি হাফসা তখন গৃহে ছিলেন না। ইতিমধ্যে বিবি মরিয়ম হাফসার ঘরে এসে হযরতকে দেখাশোনা করেন। হঠাৎ মরিয়ম গৃহমধ্যে থাকাকালীন অবস্থাতেই হাফসা হাজির হয়ে গেলেন। বিবি হাফসা গৃহে প্রবেশ করলেন না, যতক্ষণ বিবি মরিয়ম তাঁর গৃহ ত্যাগ না করলেন। এই ঘটনা নাকি বিবি হাফসাকে অত্যন্ত রাগান্বিত করে। তিনি নাকি হযরতকে বলেন বেশ কিছুকালের জন্য তিনি বিবি মরিয়মের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবেন না, হযরত তাঁকে কথা দিলেন। তবে সমস্ত কথা গোপন রাখতে বললেন। কিন্তু হাফসা বিবি আয়েশার নিকট সেইসব কথা ফাঁস করে দেন। তখন এই দু'জন সম্পর্কে কোরআন—

"তোমাদের দু'জনের হৃদয় অন্যায়প্রবণ হয়েছে, এখন যদি তোমরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও জিবরাইল এবং সৎকর্মশীল বিশ্বাসীগণ তাঁর বন্ধু, উপরন্তু ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী হবে।"

কোরআন— ৬৬ ঃ ৪

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ হযরতকে স্ত্রী ত্যাগেও কোন বাধা দেননি। এবং নতুন বিবাহে অধিকতর ভাল স্ত্রীদের কথাই বলেছেন। কোরআন— ৬৬ ঃ ৫

যাই হোক ব্যাপারটা এভাবেই মিটে যায়। অনেক বিদেশী ভণ্ড জীবনীকার এটাকে রং লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। আমি খোলা মনে খোলা ভাষায় ওই সমস্ত বিদ্বেষী, পরশ্রীকাতর, হীনমনা জ্ঞানপাপী জীবনীকারদের জানাতে চাই যে, যদি মহানবী (দঃ) আপন স্ত্রী বিবি মরিয়মকে স্ত্রীরূপে স্নেহ-সোহাগ বা আদর করে থাকেন, বা তাঁকে স্ত্রীরূপে ব্যবহারও করে থাকেন, তাহলে ওখানে বা ওই কাজে অন্যায় বা অশ্লীলতা কোথায়? বরং আপন স্ত্রীর সঙ্গে ওইরূপ ব্যবহার না করাটাই অপরাধ। বিবাহিত জীবনে ওইরূপ মধুর সম্পর্ক না থাকাটাই অবাঞ্ছনীয়। বরং বিবাহিত জীবনে এটাই একান্ত কাম্য বস্তু। অনেকে আপন স্ত্রীকে ওইভাবে না দেখে পরকীয়া প্রেমে হাবুডুবু খান, যা একদিন বিবাহিত জীবন ও সংসারকে নরকে পরিণত করে। মহানবী (দঃ) ওই সমস্ত দুর্বলতা থেকে ছিলেন চির মাসুম, চির নিষ্পাপ। তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্ব মানুষের চির আদর্শ।

আদর্শে পেয়েছে আলো জগৎ ভূমি
মানব সমাজে নবী সূর্য তুমি।

কোরআন—৩ ঃ ১৫৯, ৪ ঃ ৭৯, ১৬৫, ৯ ঃ ১২৮, ১৫ ঃ ১০, ১৬ ঃ ৩৬, ২১ ঃ ১০৭, ৩১ ঃ ২১, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৫৬, ৩৭ ঃ ১৮১, ৪৮ ঃ ৮, ৬৮ ঃ ৩-৪।

তাঁরা ভুলে যান—হযরত সবসময় নিজেকে একজন মানুষরূপে পরিচয় দিয়ে গেছেন। এমনকি, জীবনের সর্বস্তরেই সে পরিচয়ের তাৎপর্য রক্ষা করে গেছেন। কে জানে এটা সে তাৎপর্যের একটা নয়? তিনি কোন সময়ই একটি ব্যতিক্রম জীবন পছন্দ করেননি। ধর্মকে তিনি কোন সময়ই জগৎ ছাড়া শুধু পারলৌকিক ও অলৌকিক ব্যাপার করে তোলেননি। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কথা—তিনি সকল মানুষের আদর্শ মানুষ, তবে সকল মানুষের

সমস্যা বিহীন আদর্শ নন। মানুষ মাত্রেরই সকল সমস্যা-সহই তিনি সকল মানুষেরই আদর্শ মানুষ। এখানেই তাঁর আদর্শের মহত্ত্ব। এখানেই তিনি এই সংসারের সমস্যা জর্জরিত মানুষের আদর্শ মানুষ।

আর একটি ছোট্ট কথা—তিনি নবী ছিলেন রসুল ছিলেন, দূত ছিলেন, আল-আমিন ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীগণ নবীও ছিলেন না, রসুলও ছিলেন না, ছিলেন তাঁর স্ত্রী মাত্র। তবে এই স্ত্রীগণ যে অতীব পুণ্যশীলা, পুণ্যবতী, গুণবতী, সতী ও সাধ্বী, এবং কল্যাণময়ী জননী ছিলেন এতে তিলার্ধও সন্দেহের অবকাশ নেই। যাঁদের গৌরবে জগৎ চির গৌরবান্বিত, মহিমান্বিত।

কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম কোন কল্পনাভিত্তিক বা কল্পনা বাজ্যের কল্পিত বাস্তব-বিরোধী ধর্ম নয়। বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের ন্যায় সেখানে কোন পুরুষ বিয়ে না করেই 'স্বামী' হওয়ার ও জন্ম না দিয়েই 'ফাদার' হওয়ার সুযোগ পায় না। ইসলাম মানুষের বাস্তবধর্মী জীবন ব্যবস্থা। যে জীবন-ব্যবস্থার স্তরে স্তরে প্রতিটি সংসারে সাজানো আছে শ্রেণীবদ্ধভাবে—সুখ ও দুঃখ, স্বস্তি ও অস্বস্তি, শান্তি ও অশান্তি, মঙ্গল ও অমঙ্গল, রোগ ও নিরাময়, বিরহ ও মিলন, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, উন্নতি ও অবনতি, আশা ও নিরাশা, এক কথায় সমস্যা ও সমাধান।

সংসারের সমূহ সমস্যার সার্বিক ঘূর্ণিপাকে রসূলে আকরম্ হযরত মহম্মাদ (দঃ) কেও বারবার পড়তে হয়েছে। এমনকি তাঁর পূত পবিত্রা স্ত্রীদের নিয়েও – কখনও মধু খাওয়া, কখনও বিবি আয়েশার সতীত্ব, কখনও পুত্র ইব্রাহিমের জন্ম, কখন বিবি হাফ্‌সার গৃহে বিবি মরিয়মের অবস্থান, কখনও এক বিবির অন্য বিবিকে বারবার ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে সম্বোধন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে স্বয়ং দ্বীনের নবী কখনও বিব্রত, কখনও বিচলিত, কখনও বিমর্ষ, কখনও বিষণ্ণ, কখনও বিরক্ত হয়েছেন, তবুও নিরাশ হননি। হযরত খাদিজার চরিত্র বিরল ব্যতিক্রম—সার্থক জীবন সঙ্গিনী, সার্থক জননী, সার্থক গৃহিণী, সার্থক রমণী। তাঁর জীবিতকালে হযরত অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেননি। চরম সৌভাগ্যবশত এ সংসারের সুখের সাগর ও দুঃখের দরিয়াকে এক সঙ্গে আত্মস্থ করে নবী-শ্রেষ্ঠ মহম্মদ (দঃ) মহাশক্তি অর্জন করেছিলেন। এ সংসারের মাটিতে বিব্রত-বিচলিত বিষণ্ণ-বিমর্ষ ও বিরক্তির বারবার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু কখনও অধৈর্য ও বিচলিত হননি। এমনি ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ মানসিক বল। তবুও আল্লাহ্ তার নবীকে সাহায্য করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত সাংসারিক ব্যাপারেও, কখনও বা গোপন পারিবারিক ঘটনাতেও তাঁর স্ত্রীদের কড়া সাবধানবাণী শুনিয়ে, কখনও বা সতর্ক করে। সংসারের এই বাস্তব পটভূমিতে মহানবীর পূত পবিত্রা স্ত্রীগণও ছিলেন – চির চঞ্চলা রমণী হৃদয়ের সহজাত প্রবৃত্তি সহ মানবীয় নিরিখে রক্ত-মাংসে গড়া আশা আকাঙ্ক্ষার সাধ ও আহ্লাদে ভরা জগতের আদর্শ রমণী, গুণবতী গৃহিণী, সার্থক জীবন-সঙ্গিনী, কিন্তু বাস্তব-বিরোধী সংসার-বিরাগিনী সন্ন্যাসিনী বা নির্ভেজাল পুণ্যের প্রাণহীন পাথর বা পুতুল মাত্রও ছিলেন না। ২৪ ঃ ২-২৯, ৩৩ ঃ ২৮-৩২, ৬৬ ঃ ১ ৫।

খাঁটি সোনা যখনই অলংকারে পরিণত হয়, তখনই তার গঠন প্রণালীতে কিছু না কিছু খাদ নিয়েই আসে। এ সংসারের সাধারণ নরনারীও তাই। যখনই সংসারে প্রবেশ করে,

কিছু না কিছু খাদ এসেই যায়! স্বয়ং মহানবী বলেন—শয়তান তোমাদের ওসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা দেওয়ার জন্য শিরা-উপশিরায় রক্তের মধ্যে বিচরণ করে থাকে। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার মধ্যেও? তিনি বললেন—আমার মধ্যেও চলাফেরা করে। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তাঁর উপর বিজয়ী করেছেন এবং সে আমার বাধ্য হয়েছে।" বর্ণনা ঃ হযরত জাবের ও আব্দুল্লাহ, হাদিস ঃ মোসলেম, তিরমিজি।

"নবী-জায়াগনের মধ্যেও অন্যান্য মানুষের ন্যায় মানুষ হিসাবে প্রবৃত্তি বিদ্যমান ছিল। সেহেতু তাঁদের অন্তরেও জাঁকজমক ও জৌলুসপূর্ণ জীবন যাপনের স্পৃহা জাগত।"[১] "নবী জায়াগন (রাঃ) কর্তৃক (মধু খাওয়া সম্পর্কে) এরূপ ছলনামূলক কর্ম অবশ্যই আপত্তিকর। কিন্তু নবী পত্নীগণ যে নিষ্পাপ ছিলেন না, তা সর্ববাদীসম্মত।"[২]

হাফেস ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্জনবাসের কতিপয় কারণ বর্ণনা করার পর লিখেছেন—

"হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্মল চরিত্র, আর মন ও ক্ষমাসুন্দর মানসিকতার এটাই স্বাভাবিক গতি যে তিনি তাঁর পত্নীগণ কর্তৃক বারবার এ ধরনের আচরণ প্রকাশ না করা পর্যন্ত এ (নির্জনবাসের) ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।"[৩]

"হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর রহস্য প্রসঙ্গে যে আয়াত নাজেল হয়েছে, বাহ্যত তার দ্বারা বোঝা যায় যে সেটি কোন বড় রকমের ষড়যন্ত্র ছিল, যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। আলোচ্য আয়াত নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

"আর যদি তোমরা উভয়েই (বিবি আয়েশা ও বিবি হাফ্সা) রসুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, তবে আল্লাহ্ ও জিবরাইল এবং নেক মুসলমানগণ রসুলের সহায়, আর তাছাড়া ফেরেশ্তাগণও তাঁর সাহায্যকারী।"[৪] (৬৬ ঃ ৪)

"উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে যদি তাঁদের উভয়ের ঐক্যজোট ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকত, তবে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহায্যার্থে আল্লাহ্, জিবরাইল, (আঃ) ও নেক মুসলমানগণ বর্তমান রয়েছেন। শুধু তাই শেষ নয়, বরং ফেরেশতাগণও সাহায্যার্থে প্রস্তুত।"[৫]

"হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ)-এর ষড়যন্ত্র এমনকি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, যা প্রতিরোধের জন্য ঊর্ধ্বাকাশের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই অনুমান করেছেন যে, এ প্রচেষ্টা কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। মদিনা মনওয়ারায় মুনাফেকদের বিরাট একদল বাস করত। তাদের সংখ্যা চারশো পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়। এ দুরাত্মারা যে কোন উপায়ে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিবার ও বিশিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট থাকত। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি 'এসাবা' নামক গ্রন্থে উম্মে জালদাহ নামক মহিলার পরিচিতি পূর্বে লিখেছেন।"[৬]

"এ আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হযরত আয়েশা ও হাফসা (রাঃ)। তাই তারা (মুনাফেকরা) হয়তো মনে করেছিল যে, এতদুভয়ের দ্বারা তাঁদের পিতৃদ্বয় আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে এ ষড়যন্ত্রে শরীক করে নেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু তারা জানত না যে, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ)-কে হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র চরণের ধূলিকণার পরিবর্তেও উৎসর্গ করতে পারতেন।"

(১) আল্লামা শিবলী নোমানী (রাহঃ) ও আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (রাহঃ) ঃ সীরাতুন্‌ নবী, অনুবাদক—মুহিউদ্দিন খান ঃ প্রকাশক—মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা। পৃঃ ৩৩৬। (২) ঐ পৃঃ ৩৩৮। (৩) ঐ পৃঃ ৩৪২। (৪) ঐ পৃঃ ৩৪২। (৫) ঐ পৃঃ ৩৪২। (৬) ঐ পৃঃ ৩৪২-৩৪৩। (৭) ঐ পৃঃ ৩৪৩।

নবীর পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্ত্রী, সঙ্গী বা আত্মীয় হলেই যে নির্ভেজাল বা পাকা ঈমানদার হবেন, এর কোন কারণ নেই। যেহেতু তাঁরা নবী নন, তাঁরা সাধারণ মানুষ। অনেক সময় বিপরীতটাই দেখা যায়। যেমন—হযরত ইব্রাহিমের পিতা বিপথগামী ছিলেন। হযবত নূহ-এর স্ত্রী ও পুত্রও তাই। হযরত লুতেব স্ত্রীও তাই। ৬ ঃ ৮৭, ৭ ঃ ৮০, ১১ ঃ ৭৭, ১৫ ঃ ৫৯-৬২, ২১ ঃ ৭১, ২২ ঃ ৪৩।

এই গোলযোগের মূলে একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করি। মূলত মক্কা ও মদিনার সামাজিক পরিবেশ। মক্কার পুরুষকুল মক্কার রমণীকুলকে পুরাদমে শাসন কবত, এবং মদিনার বমণীকুল মদিনার পুরুষকুলকে পুরামাত্রায় শাসন কবত। মদিনাব নাবী-শাসিত এই পরিবেশ ও প্রভাব থেকে ও রমণীজাত প্রতিপত্তি থেকেও নবী-পরিবাবও নিষ্কৃতিলাভ করেনি। এরই নাম দেশের প্রচলিত হাওয়া এবং প্রভাব।

মক্কা এবং মদিনা উভয় শহরেই মহানবীর শত্রু ছিল। তবে মক্কার শত্রু ছিল প্রকাশ্য এবং মদিনার ছিল গোপন। গোপন শত্রু প্রকাশ শত্রু অপেক্ষা চিরদিনই ভযাবহ। মদিনার গোপন শত্রু ইহুদীগণ সিঁধেল চোরের মতো যে ভাবে অতীব ধীরে ধীবে মহানবীজীর পবিবারের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল, তা বর্ণনাতীত। এবং তাদের এই গোপন যড়যন্ত্র এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিল যে, তা যে কোন ভয়াবহ রূপ নিতে পারত। পরিস্থিতি এতই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে, স্বযং আল্লাহকেই নবী-পত্নীগণের উপর হস্তক্ষেপ করে কোরআনের কিছু অংশ অবতীর্ণ করতে হলো। এ থেকেই পরিস্থিতির গুরুত্ব কত ভয়াবহ ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। পবিত্র কোবআনই তার চির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ২৪ ঃ ২-২৯, ৩৩ ঃ ২৮-৩২, ৬৬ ঃ ১-১২।

নিছক বিবি হাফ্‌সার ঘবে বিবি মরিয়মের অবস্থানগত ক্রিয়াকলাপ, নিছক বিবি যয়নাবের ঘবে মহানবীজীর মধু-মিশ্রিত কিছুটা শরবত খাওয়াকে কেন্দ্র করেই কি পর্বততুল্য ব্যক্তিত্ব সাগরসম হৃদয়বান মহানবীজী একমাস কাল কোন স্ত্রীর নিকটই না যাওয়াব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? এটা মনে হয় না। যেটা মনে হয়—কোথাও কোন গোপন চক্রান্তের ঘৃণ্য গুপ্তচক্রের ঘৃণ্যময় মরু-বালুরাশিতে মরু-ঝড় দানা বাঁধছিল। এবং হয়তো খরস্রোত জীবন-নদের কোথাও কোন চোরা বালুরাশিতে আল্লাহ্‌র রসুলের পবিত্র পদযুগলের স্পর্শও ঘটেছিল। তাই স্বয়ং আল্লাহকেই হস্তক্ষেপ করতে হলো। নচেৎ পবিস্থিতি যে কি দাঁড়াত, তা আল্লাহই ভাল জানেন।

পাপ ও পুণ্যের বীজ মানব-মনে,
জীবিত সদাই রয় মনেব বনে।
আপন স্বভাব গুণে প্রসূন টুটে
দু'কূলেরই দুটি ফুল উঠিবে ফুটে।

এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের সমাজ জীবনেও লক্ষ্য করি, যখন কোন শিক্ষক তাঁর ছাত্র-ছাত্রীকে বলেন—'মনে রেখো, তুমি কোন পিতার সন্তান।' তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই সাড়া জাগে প্রাণে—ছাত্র-ছাত্রীর কোন না কোন কাজ শিক্ষককে অসন্তুষ্ট করেছে। যদিও এটা অমার্জনীয় কিছু নয়। তবুও আচরণে সতর্কবাণী। কোরআনেও আমরা নবী-পত্নীদের সম্পর্কেও ওইরূপ ঘটনা বারবার লক্ষ্য করি। "হে নবী পত্নীগণ, (মনে রেখো) তোমরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের মতো নও। তোমাদের জন্য নির্ধারিত আছে দ্বিগুণ শাস্তি ও দ্বিগুণ পুরস্কার।" ৩৩ ঃ ৩০-৩২। এইভাবে আমরা মহানবীর পারিবারিক জীবনেও লক্ষ্য করছি—নানা দ্বন্দ্ব-অন্তর্দ্বন্দ্ব। অশান্তি ও সমস্যার অভাব ছিল না। তিনিও কোন সমস্যাবিহীন জীবনও পছন্দ করেননি। কেননা এ সংসারের সমস্যাহীন জীবন সাধারণত বৈরাগ্যের জীবন। কিন্তু মহানবী বলেন—"ইসলামে বৈরাগ্য নেই।" তাঁর আগমনের মূলত উদ্দেশ্যই ছিল বিশ্ব সমস্যার সমাধান, মানবতার উত্থান, আল্লাহর জয়গান।

তিনি চেয়েছিলেন সংসারের দায়-দায়িত্ব সহ কোটি কোটি মানুষের সমস্যা জর্জরিত 'আদর্শ জীবন'। এবং ঐ জীবনই তিনি লাভও করেছিলেন। "আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ, তবে আমার প্রতি আল্লাহর (ওহী) বাণী এসেছে।" ১৮ ঃ ১০৯, ১১০, ৪১ ঃ ৬। তাই মহানবী তাঁর পারিবারিক জীবনেও ছিলেন—সকল সংসারী মানুষেরই সুন্দরতম আদর্শ প্রতিটি মানুষের জন্য, প্রতিটি পরিবারের জন্য যিনি প্রাতঃস্মরণীয় পরম পুণ্যময় পুরুষ।

কোরআন—৩ ঃ ১৫৯, ৪ ঃ ১৬৫, ১৭০, ৭ ঃ ১৫৮, ৯ ঃ ১২৮, ১২৯, ১০ ঃ ৪৭, ১৮ ঃ ১১০, ২৬ ঃ ১৪৩, ৩৩ ঃ ২১, ৫৬, ৩৪ ঃ ২৮, ৩৭ ঃ ১৮১, ৪১ ঃ ৬, ৪৮ ঃ ৮

নিশ্চয় তোমার জন্য নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার আছে।
নিশ্চয় তুমি সুমহান চরিত্রের উচ্চতম শিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কোরআন— ৬৮ ঃ ৩-৪

তাবুক অভিযান (নবম হিজরী, ৬৩১ খ্রীঃ) ঃ যদিও হযরত আরব জয় করেছিলেন তবুও তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ জানতেন—উত্তর হতে বিরাট বিপদ আসতে পারে। কেননা মুতা যুদ্ধ অমীমাংসিত অবস্থায় রয়ে গেছে।

যাকাত ও অন্যান্য কর ঃ কিন্তু উত্তরের যে কোন অভিযানের পূর্বে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল, সেনাবাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্য হযরত যাকাত ও অন্যান্য করের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে সন্ধিতে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন তাঁদের উৎপন্ন শস্যের $^{১}/_{৫}$ অংশের জন্য নির্দেশ দিলেন।

বনু তামিম ও বনু মুসতালিক এতে আপত্তি জানিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হযরতের নির্দেশ মানতে বাধ্য হলো।

ইতিমধ্যে সংসারে হযরতের স্ত্রীদের যে অসন্তোষ ভাব তা একবারেই প্রশমিত। তিনি একমনে যুদ্ধের জন্য কর সংগ্রহে ব্যস্ত। এদিকে সারা দেশে গুজব ছড়িয়ে পড়ল—রোমানগণ আরব আক্রমণ করতে আসছে বিপুল সৈন্যবাহিনী সহ। হযরত এ সংবাদ

পাবার পর আর ঝুঁকি নিয়ে দেরি করতে রাজী হলেন না, পাছে তাঁরা এসে আক্রমণ করে বসে। তখন ছিল ৬৩০ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। শস্য তখনও ওঠেনি অথচ গতবারেও ভাল ফসল হয়নি। কিন্তু শস্য, টাকা সংগ্রহ করতেই হবে। হযরত তাঁর অনুচরদের নিকট দূত পাঠালেন, মিত্র শক্তিগুলোকে সংবাদ দিলেন যাতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রোমানদের সঠিক মোকাবিলা করা যায়।

দুর্ভিক্ষ বছরে গ্রীষ্মকালে সিরিয়া যাত্রা বড়ই কষ্টকর ঃ একে শস্যশূন্য বছর, তার উপর গ্রীষ্মকাল। এ সময় বিরাট বাহিনী নিয়ে সিরিয়া যাত্রা অত্যন্ত কঠিন ছিল। হযবতকে পানীয় জল, খাদ্য সমস্ত কিছুর ব্যবস্থাপনা করার পর সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে হলো। কি করে হবে, কারও কোন প্রশ্ন নেই, সকলেরই এক কথা—'আমরা হযরতের একান্ত অনুগামী'।

হযবত আবুবকর তাঁর সমস্ত কিছু সম্পদ মাল নিয়ে হযরতের নিকট হাজির হলেন। হযবত ওমর তাঁর অর্ধেক সম্পদ দান কবলেন। হযরত ওসমান দশ হাজার উট দান করলেন এবং ঐ সঙ্গে দিলেন দশ হাজার সৈনিক ও দশ হাজাব উটের খাদ্যসামগ্রী। বাকি মুসলমানগণ যে যা এনেছিলেন সবই হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে দান কবলেন।

মোনাফেকগণ মুসলমানদের নিরুৎসাহিত করল ঃ যখন সকলেই প্রস্তুত, তখন প্রতারকগণ বলল—গরমের মধ্যে বের হযো না। তখন আল্লাহ্ জানালেন—

"যাঁরা পেছনে রয়ে গেল, তাঁরা রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতেই আনন্দ পেল এবং তাদের ধন-সম্পদ জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করল না। তারা বলল—গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। তুমি বল, জাহান্নামের আগুন অধিক উত্তপ্ত। যদি তারা বুঝত।" কোরআন—৯ ঃ ৮১

মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করে মুক্তি প্রার্থনার জন্য এলো এবং যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে মিথ্যা কথা বলেছিল তারা বসে থাকল। ওদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি হবে। কোরআন—৯ ঃ ৯০

যারা পেছনে রযে গেল, তাদের বাজে কথা না শোনাব জন্য হযরতকে সতর্ক করা হলো। তাদের মধ্যে তিনজনকে তাদের আন্তরিক অসুস্থতার জন্য ক্ষমা করা হয়েছিল। বাকি সকলকেই প্রতারকরূপে চিহ্নিত করা হলো।

হযরত দীর্ঘদিনের জন্য মদিনা ত্যাগ করেছেন, তাই মদিনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি একটি অস্থায়ী সরকারও গঠন করেছিলেন। মহম্মদ বিন মাসালামাকে শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং আলি বিন আবু তালিবকে মুসলিম পরিবার, তাঁদের ধনসম্পদ ও বিশেষ করে ঐ সমস্ত পরিবারগুলোর দেখাশোনার ভার দেন, যেগুলো হযরতের আত্মীয়। হযরতের অবর্তমানে আবুবক্করকে নামাযে ইমামতির ভার দেওয়া হয়। এক কথায় তিনি তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন।

হযরত মদিনার বাইরে এসে নিজেই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বের প্রতি নজর দিলেন। আবদুল্লাহ বিন উবাই হযরতের সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে হযরত তার পূর্ব কার্যকলাপের জন্য তাকে মদিনাতেই রেখে যান।

সর্বাপেক্ষা বড় সৈন্যবাহিনী ঃ দশ হাজার অশ্বারোহী, কুড়ি হাজার উট আরোহী ও পদাতিক সৈন্য। এই বিশাল বাহিনীকে দেখার জন্য মেয়েরা পর্যন্ত ছাদে উঠেছিলেন। আল্লাহর কাজে বিশাল বাহিনীর যাত্রা আরম্ভ হল। তাঁরা হিজর নামক এক জেলাতে পৌছালেন। যেখানে একদিন নবীবর সালেহ (আঃ) তাঁর জাতির প্রতি এসেছিলেন কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

অলৌকিকতা নয়, ওটা মেঘখণ্ড ঃ সৈন্যবাহিনী চেয়েছিলেন এই হিজরে তাঁরা স্নান ও পান করবেন। কিন্তু হযরত নিষেধ করায় তাঁরা বিরত ছিলেন। সৈনিকগণ যখন তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছিল হঠাৎ একখণ্ড মেঘ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ হল। সকলেই তৃপ্তি সহকারে সেই পানি পান করেন। সকলেই বললেন, এটা হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর একটা অলৌকিক শক্তি। শুনে হযরত উত্তর দিলেন—'না'। "এটা মেঘখণ্ড যে বৃষ্টি দান করল"। এইভাবে তিনি অলৌকিকতাকে কোনদিনই প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু আজকালকার পীর-ফকিরগণ এখানে অলৌকিকতার ভেল্‌কি না দেখিয়ে ছাড়তেন কি! কিন্তু দ্বীনের নবী চিরদিনই ভেল্‌কিকে ঘৃণা করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ তার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাক, অলৌককতার নয়। কেননা লৌকিকতার ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে অলৌকিকতা আসে না।

মুসলিম সৈন্য তাবুক পৌছাল এবং রোমানগণ সিরিয়া ত্যাগ করল ঃ মুসলমানগণ তৃপ্তি সহকারে পানীয় পান, স্নানাদি সেরে তাবুকে পৌছালেন, যা সিরিয়া থেকে বেশি দূরে নয়, রোমানগণ সর্বত্র তাঁদের গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলেন—হযরত বিশাল বাহিনী নিয়ে হাজির। তখন রোমানগণ তাড়াতাড়ি সিরিয়া অঞ্চল ছেড়ে নিজেদের এলাকায় হাজির হল। কিন্তু হযরত এসেছিলেন রোমানদের হাত থেকে আরবকে রক্ষা করতে, সিরিয়া আক্রমণ করতে নয়। রোমানদের পশ্চাদ্ধাবন করতেও নয়। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক স্থানে আল্লাহর বাণী পৌছে দেওয়া এবং শান্তি আনয়ন করা।

সীমান্তের প্রধানদের মধ্যে জোহন বিন রুবা নামক এক ব্যক্তি হযরতের নিকট আত্মসমর্পণ করে কর দিতে সম্মত হন।

"পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে,

এটা আল্লাহ, এবং মহম্মদ (দঃ), নবী এবং আল্লাহর দূত এবং আইলা গোত্রের জোহন বিন রুবার কাছ থেকে নিরাপত্তার দলিল। জল ও স্থলের উপর তাঁদের নৌকো ও অন্যান্য যানবাহনগুলো আল্লাহ্ ও মহম্মদ (দঃ) ও আল্লাহর দূতের সংরক্ষণে থাকল এবং সিরিয়া, ইয়ামেন ও সমুদ্রের লোকগুলো যাঁরা তাদের সঙ্গে থাকবেন তারাও সংরক্ষণে এদের প্রতি যদি কোন কিছু ঘটে তাহলে হযরত মহম্মদ (দঃ) তাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন। তবে কেউ যদি স্থল বা জলপথে পথ অতিক্রম করতে আসে তাদের বাধা দেওয়ার জন্যে নয়।"

হযরত মহম্মদ (দঃ) বন্ধুত্বের প্রতীক স্বরূপ জোহানাকে তাঁর বস্ত্র উপহার দেন। জোহানাও হযরতকে তাঁর আনুগত্যের প্রতীক স্বরূপ স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্য উপহার দেন। আরও কয়েকজন খ্রীস্টান নেতাও হযরতের আনুগত্য গ্রহণ করেন জিবরা, আধরা প্রমুখ। হযরতের নির্দেশমত কালেদ বিন ওয়ালিদ ৫০০ অশ্বারোহী সহ জুমাতুল জানদলের

শাসক উবাইদার বিন আবদুল মালেক আলেকেন্দির নিকট গমন করেন, তাঁকে ও তাঁর ভাই হাসানকে বন্দী করে মদিনায় নিয়ে আসেন। পরে তাঁরা হযরতের আনুগত্য স্বীকার করেন।

হযরত মহম্মদ (দঃ) ২০ দিন তাবুকে অবস্থান করে খালেদের পূর্বেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। যখন হযরত খালি হাতে মদিনায় ফিরলেন তখন মোনাফেকগণ বলতে আরম্ভ করল—এইজন্য যে হযরতের সঙ্গীদের খুব কষ্ট হয়েছে, তারা বুঝে উঠতে পারল না এই ২০ দিন তাদের জন্য যা কিছুই ব্যয় করা হল, এতে লাভ কি হল। কিছুই না, মাত্র তুচ্ছ দুটো সন্ধি। তখন তারা হযরতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকল। কিন্তু পরে যখন খালিদ বিন ওয়ালিদ বিরাট বুটি ও বাঁদী সহ ফিরলেন তখন মোনাফেকগণ অবাক। তখন তারা মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য চরম আগ্রহ দেখাতে থাকল। কিন্তু তাদের ক্ষমা করা হলো না।

মাত্র তিনজনকে ক্ষমা করা হলো—কাব বিন মালেক, মুরারা বিন বারি এবং হেলাল বিন ওমাইয়া। কেননা এঁরা অনুশোচনায় মৃতবৎ হয়ে পড়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করলেন।

"অবশ্য আল্লাহর নবী মোহাজের এবং আনসারদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যারা সঙ্কটকালে তাঁব অনুসবণ কবেছে। পরে তাদের একদলের চিত্ত বৈকল্যের উপক্রম হযেছিল। পরে আল্লাহ্ ওদের ক্ষমা করলেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র দযামব এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর জনকেও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল যে পর্যন্ত পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য উহা সঙ্কুচিত হয়েছিল। তাদের জীবন তাদেরই জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি অবশ্য তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন—যেন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াময়।" কোরআন—৯ ঃ ১১৭-১১৮

তাবুক যাত্রার পূর্বে প্রতারকগণ নানা দিক থেকে হযরতকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। তারা একবার একটি মসজিদ নির্মাণ করল। তারা হযরতকে অনুরোধ করল তাদের মসজিদটির উদ্বোধন করার জন্য। হযরত সরল বিশ্বাসে তাদের কথাও দিলেন। পরে দেখা গেল তাদের উদ্দেশ্য মোটেই ভাল ছিল না। ওটা আসলে মসজিদই ছিল না। ওটা ছিল গোপন পরামর্শের ঘাঁটি। তাই আল্লাহ পূর্বেই হযরতকে সতর্ক করে দিলেন।

"যাঁবা ক্ষতিসাধন, সত্য প্রত্যাখ্যান বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং ইতিপূর্বে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তাদের গোপন ঘাঁটি স্বরূপ মসজিদ নির্মাণ করেছে তারা অবশ্য শপথ করবে—আমরা উত্তম কামনা ব্যতীত ওটা করিনি। এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন তারা তো মিথ্যাবাদী। তোমরা তো কখনও ওতে (মসজিদে নামাযের জন্য) দণ্ডায়মান হবে না। যে মসজিদের ভিত্তি সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে দাঁড়ানো সমুচিত। ওতে পবিত্র হতে চায় এমন লোক আছে, এবং যারা পবিত্র হয়, আল্লাহ্ তাদের পছন্দ করেন।" কোরআন—৯ ঃ ১০৭-১০৮

সুতরাং হযরত এই মসজিদকে অচিরেই ধ্বংস করে দিলেন যাতে আল্লাহর নামে এর ভিতরে কেউ কোনরূপ অন্যায় কাজ করতে না পারে। ইতিমধ্যে প্রতারকদের নেতা ইবনে উবাই পরলোকগমন করেন। তখন ওই গোত্র চিরতরে মুছে যায়।

হযরতের পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যু ঃ তাবুক ছিল হযরত মহম্মদের জীবনে শেষ সৈন্যবাহিনী পরিচালনা। এরপর থেকেই তিনি নিজকেই সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেন ইসলাম প্রচারের কাজে। কিন্তু ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস, আল্লাহ্ যেন নিজ হাতেই ঠিক করে দিয়েছিলেন হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পারিবারিক জীবনে একটার পর একটা মৃত্যু-যন্ত্রণার সম্মুখীন হওয়া। তিনি তাঁর জীবনে যেসব দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন নিম্নে তাঁর তালিকা থেকেই আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারব।

যেমন—

১। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতৃবিয়োগ।

২। মরুভূমিতে মাতৃবিয়োগ যখন তাঁর বয়স মাত্র ৬ বছর। মায়ের নিকট কেবল কয়েক মাস ছিলেন।

৩। ৮ বছর বয়সে অভিভাবক আবদুল মোত্তালিবের মৃত্যু।

৪। প্রিয়তমা পত্নী বিবি খাদিজার ও আবু তালিবের মৃত্যু। যে বছরকে হযরতের জীবনে দুঃখের বছর বলা হয়।

৫। তিন কন্যার উম্মে কুলসুম, রোকাইয়া, যয়নাব-এর মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

৬। তাঁর প্রথম শিশু পুত্র কাসেম ও আবদুল্লার মৃত্যু।

৭। প্রাণাধিক পুত্র ইব্রাহিমের মাত্র ১৬ মাস বয়সে মৃত্যু।

এই প্রাণাধিক পুত্র ইব্রাহিমকে কেন্দ্র করে তাঁকে পারিবারিক জীবনে কিছুটা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। এখন হযরতের বয়স ৬১ বছর। কয়েক মাস ধরেই তিনি বুঝতেই পারছিলেন তাঁর জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে, তাঁর পুত্র যে বিদায়ের পথে তা তিনি নিজেও মনে-প্রাণে উপলব্ধি করে আবদুল রহমান বিন আউফের কাঁধে ভর করে তাঁর প্রাণাধিক অসুস্থ পুত্রকে দেখতে গেলেন।

ইব্রাহিম তখন তার মায়ের কোলে মৃত্যু-যন্ত্রণায় অধীর। হযরত খুব আস্তে তাঁর পুত্রকে নিজ কোলে নিলেন, তখন তাঁর হাত-পা দু'ই কাঁপছে। অন্তর দুঃখ-শোকে জর্জরিত মুখ বিবর্ণ। এক কথায় তিনিই যেন মৃত্যুর দুয়ারে হাজির। তিনি বললেন—"হে ইব্রাহিম, তোমাকে আমরা আল্লাহর ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে রক্ষা করতে পারব না।" এরপর আর তিনি কোন কথা বলতে পারেননি। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। ইব্রাহিম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। মা আত্মীয়-স্বজন সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

অবশেষে হযরত মহম্মদ (দঃ) নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললেন—"হে ইব্রাহিম, আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমাদের অন্তর দুঃখে ভরা, কিন্তু আমাদের মুখ দিয়ে এমন কিছু বলা উচিত নয়, যা আল্লাহ্কে খুশি না করে এবং তোমাকে দুঃখ দেয়।" যারা তাদের উপর বিপদ পতিত হলে বলে—আমরা তো আল্লাহরই এবং আমরা নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" কোরআন—২ ঃ ১৫৬

হযরতের অত্যন্ত দুঃখ দেখে মানুষ অবাক হয়ে এর কারণ জানতে চাইল। তিনি বললেন—

"আমি তোমাদের দুঃখ করতে নিষেধ করছি না, তবে উচ্চৈঃস্বরে নয়। তোমরা কিছুতেই তোমাদের অন্তরকে দুঃখ-যন্ত্রণা, শোক-তাপ, ভালবাসা, মায়া-মমতা ইত্যাদি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। যে ব্যক্তি ভালবাসা, দয়া, মায়া, মমতা দেখায় না সে তা পেতেও পারে না।"

অলৌকিকতা নয়, সূর্যগ্রহণ ঃ যেদিন ইব্রাহিম মারা যায় সেদিন সূর্যগ্রহণ হওয়াতে বহুলোকের ধারণা হলো—এটা ইব্রাহিমের মৃত্যুর দুঃখ প্রকাশ হলো। হযরতকেও একথা বলা হল। তিনি বললেন, কারও জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র বা সূর্যের গ্রহণ হয় না—ওরা আল্লাহর নির্দেশাবলীর অন্তর্গত দুটো নিদর্শন। যখন ঐরূপ দেখবে তখন একমাত্র আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, প্রার্থনা করবে তাঁর। হযরত মহম্মদ (দঃ) এখানেও নিজেকে মানুষরূপেই দেখালেন। এটা তাঁর তুলনাহীন বৈশিষ্ট্য ছিল।

তাবুকের অভিযান সমগ্র আরব মনে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করল। হযরত মহম্মদ (দঃ) সক্ষম হলেন বিবাট রোমানদের আহ্বান জানাতে। তাঁরাও ভয় করল, হযরতের আহ্বানে সাড়া দিতে। সুতরাং তাদের মনে হযরতের শক্তি সম্পর্কে ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহই থাকল না। এবপব থেকে তাদের মধ্যে যার ইচ্ছা স্বাধীন মনে ইসলাম গ্রহণ কবতে থাকল। হযরতের তাবুক অভিযান ইসলামের সেই সিংহদ্বার খুলে দিল। এটাই ছিল তাবুক অভিযানের মূল রহস্য।

হযরতের প্রতিনিধিরূপে আবুবকর (৯ম হিজরীর শেষ, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি, ৬৩১ খ্রীস্টাব্দ) ঃ হযরত মক্কা ত্যাগের পর আর বড় হজ করেননি। সেখানকার লোক আপন প্রাচীন প্রথামত মুসলমান ছাড়াই হজ পালন করত।

হযরত আবুবকরকে পাঠালেন সকলকে হজের নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আবুবকর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত আল্লাহর নির্দেশ পেলেন—অমুসলমানগণ যেন কাবাতে প্রবেশ না করে। এই ঐশী আসার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলিকে, আবুবকরের সঙ্গে যুক্ত হতে বললেন। এভাবেই সমস্ত অপবিত্রতাকে কাবা থেকে দূরে রাখা হলো। কাবার পূর্ণ দায়িত্ব পড়ল মুসলমানদের উপর। তবে যদি তাবা ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরও প্রবেশের সম অধিকার থাকবে।

"অতঃপর যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারাও তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে ভাই।" কোরআন—৯ ঃ ১১

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! অংশীবাদীরা অপবিত্র ব্যতীত নয়, অতএব এই বছরের পরে তারা পবিত্র মসজিদের নিকটবর্তী হতে পারবে না। যদি তোমরা অভাবের আশঙ্কা কর, তবে আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তোমাদের ধনশালী করে দেবেন।"

কোরআন—৯ ঃ ২৮

হযবত আলি ও আবু হোরাইরা হযরতের প্রতিনিধি আবুবকরের পাশে দাঁড়ালেন। আবুবকর তাঁদের কোরআন থেকে ৯নং তওবা সূরার প্রথম ৩৭ আয়াত পর্যন্ত পড়ে সকলকে শুনিয়ে দিলেন কাবা সম্পর্কে মুসলমান ও অমুসলমানদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ কি।

এ দিন থেকে ইসলামের এক নতুন যুগের সৃষ্টি হলো। সবাইকে কেন্দ্র করেই ইসলাম যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পৃথকভাবে দানা বাঁধল। এটা ছিল নবম হিজরীর শেষ ফেব্রুয়ারি—৬৩১ খ্রীস্টাব্দ।

পরবর্তী বছর প্রথম মহরম ১০ম হিজরী যেদিন থেকে মুসলমানগণ নিজেরাই নিজেদের প্রভু। এদিন পর্যন্তও তাঁরা পুতুল উপাসকদের নিকট থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আজ সে সময় তাঁদের নিকট হাজির, এখন তাঁরা কাবাতে, মক্কাতে ইসলামকে একটি স্বাধীন ধর্মরূপে প্রকাশ করতে পারলেন।

যখন হযরত আলি মিনাতে কোরআন পাঠ শেষ করে সকলকে বললেন—

"হে মনুষ্যগণ! কোন অবিশ্বাসী স্বর্গে প্রবেশ করবে না। কোন অমুসলমান এ বছরের পর হজে যোগ দেবে না, উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ প্রদক্ষিণ করবে না এবং যারই হযরতের সঙ্গে কোন সন্ধি বা চুক্তিপত্র আছে তা উল্লেখিত দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।"

হযরত আলি শুধু মিনাতেই কোরআন পাঠ করে লোকদের শোনাননি, তিনি শুনিয়েছেন নানা স্থানেও। যার ফলে তায়েফ, হিজাজ, তিহামা, নজদ ও অন্যান্য বহু স্থানের লোক দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন।

আবুবকর, আলি, আবু হোরাইবা এবং আবুবকরের ৩০০ জন সঙ্গী আরও বহুলোক সহ মদিনা প্রত্যাবর্তন করলেন। আজ থেকে মদিনা শুধু পূর্বেকার মতো মদিনাতুল নবী (নবীর মদিনা) ছিল না, তা ছিল ইসলামের প্রথম রাজধানী। শ্রাবণের বারিধারার মতো আরবের চারদিক থেকে প্রতিনিধি দল মদিনাতে আসতে আরম্ভ করল।

নিম্নলিখিত স্থান ও গোত্র থেকে আসতে আরম্ভ করল ঃ ১। মুজাইনা ২। আসাদ ৩। তামিম ৪। আবস্ ৫। ফাজারা ৬। মুররা ৭। সালবা ৮। মুহারার ৯। সাদ বিন বকর ১০। কিলাব ১১। রুয়াস বিন কিলাব ১২। উকাইলবিন কার্ব ১৩। জাভা ১৪। কুশাইর বিন কাব ১৫। বাণী আল বাক্কা ১৬। কিনানা ১৭। আসজা ১৮। বাহিলা ১৯। সুলাইম ২০। হিলাল বিন আমির ২১। আমির বিন সামা ২২। সাকিফ ২৩। আবদ-উল-ফারিস ২৪। বকর বিন ওয়াইল ২৫। তাগালিব ২৬। হানিফা ২৭। সাইবান ২৮। ইয়ামেন ২৯। তাই ৩০। তুজিব ৩১। খাওউলান ৩২। জফি ৩৩। সুদ ৩৪। মুরাদ ৩৫। জুবাইদ ৩৬। কিনদা ৩৭। সাদিক ৩৮। খুশাইন ৩৯। হুজাইমের সাদ ৪০। আজদ্ ৪১। গাসান ৪২। হারিস বিন কাব ৪৩। হামাদান ৪৪। সাদ আল আশির ৪৫। আনস্ ৪৬। দাবিয়িন ৪৭। রাহাধীন হাই ৪৮। গামদি ৪৯। নাখা ৫০। বাহিলা ৫১। খাশাম ৫২। আশারিন ৫৩। হাজবা মাউত ৫৪। আজদ উমান ৫৫। গাফিক ৫৬। বারিক ৫৭। দাউস ৫৮। সামালা ৫৯। হুজুন ৬০। আসলাম ৬১। জধম ৬২। মাহরা ৬৩। হামির ৬৪। নজরান ৬৫। জাইশাপন, অর্থাৎ আরবের সকল প্রান্ত থেকে।

এই যে বর্ষার বারিধারার মতো প্রতিনিধিদল সকল প্রান্ত থেকে আসতে থাকল—এর মূলে দুটো জিনিস সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়েছিল। ১। মক্কা বিজয় ২। তাবুক অভিযান। মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকল। সেখানে কোনরূপ

জবরদস্তি নেই, এমনকি আর আহ্বান পর্যন্ত নেই। তবুও মানুষ স্রোতের ন্যায় ইসলামের পতাকা তলে এসে হাজির হতে লাগল। তারা শুধু হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মধুমাখা কথা—তাঁর উপদেশবাণী শোনার জন্য। অধীর হয়ে উঠেছিল।

এভাবেই জগতের একটি অসভ্য, বর্বর, অন্ধকারাচ্ছন্ন উচ্ছৃঙ্খল অনুন্নত ছিন্ন-ভিন্ন জাতি এক আল্লাহর ভালবাসায় বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে একত্রিত হয়ে উঠল যে মানুষের দ্বারা, তিনিই দ্বীনের নবী হযরত মহম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)।

হযরতের চরিত্র সম্বন্ধে যদি কারও কিছু নিবিড় চিত্তে চিন্তা-ভাবনা করার থাকে, ভাবনার কিছু অবকাশ থাকে তবে তিনি শুধু একটি কথাই ভাবুন—কি করে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই অসামান্য কাজ সাধিত হল। যাঁর দ্বারা হল, তিনি কে? কোন মহান!

হযরতের সাহাবায়ে কেরাম হযরতের জন্য ধন দিয়েছিলেন, জীবন দিয়েছিলেন। কেননা তাঁকে তারা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন সত্যবাদী আল-আমিন। তিনি শুধু জগদ্বাসীর কাছে একটি কথাই এনেছিলেন, একটি কথাই রেখেছিলেন—লা ইলাহা-ইল্-লাল্ লাহ্—এক আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

তায়েফ জয়

দশম হিজরী

প্রতিনিধি যুগ—৬৩১ খ্রীঃ

দশম হিযরীকে সাধারণত প্রতিনিধি হিজরী বলা হয়। যদিও অষ্টম হিজরীর শেষের দিক থেকে দশম হিজরীর শেষের দিক পর্যন্ত এই কাজ চলতে থাকে। এ সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ দিতে গেলে পৃথক একটি পুস্তকের প্রয়োজন। আমরা এখানে বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু কিছু বর্ণনা দিয়ে যাবো, যা থেকে মূল ঘটনা বোঝার কোন অসুবিধা হবে না। হযরত মহম্মদ (দঃ) যে সমস্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ ছিল এ সমস্ত প্রতিনিধিত্ব।

(১) উরা বিন মাসুদের ইসলাম গ্রহণ ও শাহাদত বরণ ঃ

হযরত মহম্মদ (দঃ) তায়েফ অবরোধ করেছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ জয় করতে পারেননি। তায়েফবাসীগণ প্রথমে যতটা ইসলাম-বিরোধী ছিলেন ঠিক ততটা হযরতের শত্রুও ছিলেন।

উরা বিন মাসুদ সাকিফ গোত্রের নেতা ছিলেন। যখন হযরত তায়েফ অবরোধ করেন, তখন তিনি ইয়ামেনে ছিলেন। যখন তায়েফ ফিরলেন সমস্ত কাহিনী শুনলেন—তখন তিনি কালবিলম্ব না করেই মদিনায় গমন করে হযরতের নিকট মুসলমান হলেন। তিনি শুধু মুসলমানই হলেন না, তিনি হযরতের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—তাঁর আপন গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য। হযরত মহম্মদ (দঃ) উরাকে চিনতেন, তাঁর দেশবাসীকেও চিনতেন। তাই তিনি বারবার নিষেধ করলেন—উরা যেন এ কাজে না নামেন, কিন্তু উরা কিছুতেই বুঝলেন না, তিনি শেষাবধি হযরতের অনুমতি নিলেন। এদিকে বানু সাকিফ গোত্র ইসলাম প্রচারে বের হলেন। তিনি সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। পরিশেষে তিনি একটি উঁচু স্থানে উঠলেন ও নামাযের জন্য সকলকে আহ্বান জানালেন। তখন সেখানকার মানুষ আর তাদের ক্রোধ সংবরণ করতে পারল না। তারা সকলেই তাঁকে ঘিরে ফেলে তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করল। অবশেষে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠলেন। হযরতের কথা সত্যে পরিণত হলো।

যখন উরা মরণাপন্ন তখন তিনি বললেন—"শাহাদত এক সম্মান, আল্লাহ্ আমাকে সেই সম্মানে সম্মানিত করলেন। আমার ঘটনা তাঁদেরই মত যাঁরা হযরতের সঙ্গে এখানে এসে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেছেন।" আবার তাঁরই অনুরোধে তাঁকে ঐ সমস্ত শহীদের পাশেই সমাধিস্থ করা হলো। তায়েফের ইসলাম উরারই জীবন দান।

উরা বিন মাসুদের জীবন দান ইসলামের ইতিহাসে ব্যর্থ হয়নি। যখনই তায়েফের পার্শ্ববর্তী লোক সকল শুনল নিরপরাধ নেতা উরাকে হত্যা করা হয়েছে তখন সকলেই মদিনা গিয়ে হযরতের নিকট নিজেদের মুসলমান বলে ঘোষণা করল। এদিকে তায়েফের লোকগণ বিবেকের দংশন বোধ করতে থাকল। তারা ভাবল তারা এমন একজন নিরপরাধ

বিশিষ্ট ব্যক্তি হত্যা করেছে যার ফলে হযরত তার প্রতিশোধ নেবেনই। ঠিক ঐ সময়ে বোমানগণও হযরতকে ভয় করতেন। সুতরাং তাঁরা তাঁদের নেতা আবদ জালিলের নিকট গিয়ে তাঁকে মদিনা যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তিনি একাকী যেতে রাজি হলেন না। কারণ তিনি তাঁদের তিন ভাইয়ের মধ্যে থেকে তায়েফে এক সময় হযরতকে পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সমগ্র শহরকে হযরতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। তার একা না যাওয়ার এটাই ছিল মূল কারণ।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচজন নেতা যাবেন। যখন তাঁরা মদিনার নিকট পৌঁছালেন তখন হযরত আবুবকর এ সুসংবাদ মহানবীর কানে তুললেন।

তায়েফের ইসলাম গ্রহণ ঃ এই প্রতিনিধি দলের সদা-সর্বদা ভয় ছিল পাছে মুসলমানগণ তাঁদের হত্যা করে ফেলেন যেমন তাঁবা পূর্বে করেছেন। নানাদিক ভেবে তাঁরা একটি মজবুত তাঁবু তৈরি করলেন যাতে তাঁরা নিজেরা সুরক্ষিত থাকতে পারেন। সেই সঙ্গে খালিদ বিন সায়িদ বিন আসকে মধ্যবর্তী মানুষ হিসেবে নিযুক্ত করা হলো। তাঁরা এতই ভীত ছিলেন যে কোন খাবার পর্যন্ত তাঁবা স্পর্শ করতেন না যতক্ষণ না মধ্যবর্তী লোক খালিদ প্রথম না খেতেন, পরে আলোচনা আরম্ভ হলো। তাঁরা প্রথম শর্ত দিলেন—প্রথম তিন বছর তাঁদেব দেবতা 'আললাতের' গায়ে কেউ হাত দেবেন না। একথা শুনে হযরত বললেন, "তিন বছর তো দূরের কথা একদিনের জন্য হলেও এ শর্ত মেনে নেওয়া যাবে না। কেননা বিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের কোন সন্ধি হতে পারে না।" তখন তাঁরা দ্বিতীয় শর্ত দিল—তাঁদের "নামায থেকে মুক্তি দিতে হবে।" শুনে হযরত বললেন—"নামায ব্যতীত ইসলামের (বিশ্বাসের) কোন মূল্যই নেই।" তৃতীয় শর্তে হযরতকে বললেন—"তাঁরা নিজ হাতে তাদের পুতুলগুলিকে ভেঙে দেবেন।" এ শর্ত হযরত মেনে নিলেন।

এরপর হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত দায়িত্ব নিলেন। ওসমান বিন আবু আসকে তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। এই প্রতিনিধি দল সমস্ত রমজান মাস মদিনায় হযরতের অতিথিরূপে থাকলেন। হযরত মহম্মদ (দঃ)-ও সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—"নামায ছোট করতে যাতে বৃদ্ধ, দুর্বল ও ব্যস্ত মানুষদের কোন অসুবিধা না হয়।"

প্রতিনিধি দল বাড়ি ফিরলেন—হযবত তাঁদের সঙ্গে পাঠালেন আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং মুগিরা বিন শুবাকে। আবু সুফিয়ান ও মুগিরা তাদের সমস্ত পুতুলগুলোকে ভেঙে ফেলল। ভেঙে ফেলার ঐ দৃশ্য তাদের স্ত্রীলোকগণ সহ্য করতে না পেরে কেঁদে উঠেছিল। এভাবেই সমস্ত হেজাজ ইসলামের পতাকাতলে এসে সমবেত হল। জীবন্ত উরা বিন মাসুদ যা পারেন নি, শহীদ উরা তাই করলেন।

(২) মাজিনা প্রতিনিধি (৫ম হিজরী) ঃ

মাজিনা ছিল খুব বড় সম্প্রদায়। তারা ৪র্থ হিজরীতে ৪০০ জনের এক প্রতিনিধি দল মদিনাতে পাঠিয়ে ইসলামের প্রতি তাঁদের আনুগত্য জানায়। ইস্‌ফাহানের বিজয়ী সেনা ইতিহাস বিখ্যাত নুমান এই গোত্রের মানুষ ছিলেন।

(৩) বানু তামিম প্রতিনিধি (৫ম হিজরী) ঃ

বানু তামিম আরবের মধ্যে নিজেকে সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে গর্ব বোধ করতেন। তাঁরা তাদের নেতৃবৃন্দ সহ মদিনায় গমন করলেন। এ দলের মধ্যে ছিল—মদিনার উট লুটকারী

উয়াইনা বিন হিসন। তাঁরা প্রকাশ্যে হযরতকে আহ্বান জানালেন—পাণ্ডিত্য বা বাক্‌যুদ্ধের জন্যে। তাঁদের প্রতিনিধি ছিলেন আতারাত বিন হাজিব। তিনি বললেন—

"আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা মুকুট ও সিংহাসনের মালিক, ধন-সম্পদের মালিক, সম্মানের মালিক। কে আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার সাহস রাখে। যদি কেউ থাকে তবে বাইরে আসুক।"

তখন হযরত মহম্মদ (দঃ) সাবিত বিন কায়িসকে উত্তর দিতে বললেন। তখন তিনি উত্তর দিলেন ঃ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের রাজ্য দান করেছেন। তিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন হযরত মহম্মদ (দঃ) যিনি মহৎ, মহান সম্ভ্রান্তবংশীয়, চির সত্যবাদী চরিত্র চির কলঙ্কহীন। যাঁর জন্যই আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনকে তাঁর প্রতি নাজেল করেছেন। তিনি সকল মানুষকেই ইসলামের (শান্তির) প্রতি আহ্বান জানান। মহাজিরগণ প্রথম, অতঃপর আমরা আনসার তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমরা তাঁর সাহায্যকারী তাঁর সভার পরিষদ।" এই তর্কযুদ্ধের পর তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

(৪) আশরাইন প্রতিনিধি (৭ম হিজরী) ঃ

ইয়ামেনের মধ্যে আশারাইনগণ ছিলেন এক মহৎ সম্প্রদায়। আবু মুসা আশারি ছিলেন তাঁদের নেতা। তিনি ৫৩ জন লোক সহ ৭ম হিজরীতে মদিনা যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সমুদ্রের ধারে তাঁরা কুরাইশগণ কর্তৃক বাধা পান, কেননা তখনও কুরাইশগণ হযরতের বিরোধী পক্ষ। এই প্রতিকূল অবস্থায় আবু মুসা আবিসিনিয়ার পথে যাত্রা করে সেখানে জাফর বিন আবু তালিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখান থেকে তাঁরা জাফর সহ মদিনায় গমন করেন এবং মুসলমান হন।

(৫) দায়ুস প্রতিনিধি ঃ

আবুহুরাইরা (রাঃ) দায়ুস গোত্রের নেতা তুফাইল বিন আমর হযরতের ব্রতের ৭ম বর্ষে মক্কা গিয়ে হযরতের নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম প্রচার করেন। আপন গোত্রের লোক সকলকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। ৭ম হিজরীতে তিনি চারটি পরিবার-সহ মদিনায় গমন করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরতের অন্যতম সাহাবী (সঙ্গী) ও প্রখ্যাত হাদিস বর্ণনাকারী আবু হুরাইয়া (রাঃ)।

(৬) কাবা গোত্রর প্রতিনিধি (৯ম হিজরী) ঃ

বানু হারিস বিন কাব ছিলেন নাজরান গোত্রের লোক। আরবদের জয় করার জন্য তাঁরা ছিলেন স্বনামধন্য গোত্র। হযরত মহম্মদ (দঃ) খালিদকে তাঁদের নিকট ইসলাম প্রচারে পাঠান। পরে তাঁদের নেতৃবৃন্দ বহু লোকসহ মদিনায় হযরতের নিকট গমন করেন। হযরত তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন—"তাঁদের জয়ের পেছনে কি গোপন সত্য আছে।" তাঁরা বলেন—"আমরা যুদ্ধ করি একত্রে, এক সঙ্গে, এক মনে। কারও সঙ্গে কোনরূপ বিবাদ বা কোনরূপ অত্যাচার করি না।" হযরত অতঃপর কায়িস বিন হিসনকে তাদের নেতা নিযুক্ত করেন।

(৭) তাই ও আদির প্রতিনিধি (৯ম হিজরী) ঃ

আদি ছিলেন জগদ্বিখ্যাত দাতা হাতেম তাইয়ের পুত্র। তিনি ছিলেন খ্রীস্টান ও আপন গোত্রের নেতা। যখন হযরত ইয়ামেনে সৈন্য প্রেরণ করেন তখন আদি সিরিয়ায় পালিয়ে যান। তাঁব বোন বন্দিনী অবস্থায় মদিনায় হযরতের নিকট আনীত হন। হযরত তাঁকে শুধু মুক্তিই দিলেন না, সসম্মানে বহু উপহার সহ আপন সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বোন ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে হযরত সম্পর্কে যা বললেন—তাতে তাঁর ভাই ও আপন গোত্রের সমস্ত মানুষই হযরতের প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়লেন। এর ফলে আদি ও তাঁর গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক যায়েদ উল খায়েল-সহ মদিনায় গমন করে হযরতের নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত যায়েদুল খায়েলের নাম পরিবর্তন করে যায়েদুল খায়ের রাখলেন। পূর্ব নামের অর্থ ছিল 'ঘোড়ার যায়েদ', বর্তমানে অর্থ দাঁড়াল 'মঙ্গলের যায়েদ'।

(৮) নাজরান থেকে প্রতিনিধি(৯ম হিজরী) ঃ

নাজরান মক্কা ও ইয়ামেনের মধ্যবর্তী প্রশস্ত ভূমি। হযরতের সময়ে সেখানকার অধিবাসীবা সকলেই ছিল খ্রীস্টান। ওই সময় ওই স্থানে তাঁদেব একটি বড় গির্জা ছিল, যাকে তাঁবা কাবাব সমতুল্য গণ্য কবতেন। যখন হযরত তাঁদেব নিকট ইসলামের দাওযাত পাঠালেন তখন সেখান থেকে তাদের নেতা ধর্মযাজক সর্বমোট ৬০ জনের মতো লোক মদিনায় হযরতের কাছে গমন করলেন। হযবত তাঁদের আপন মসজিদে সাদরে স্থান দিলেন ও তাঁদের নিজ ধর্মমতে প্রার্থনাও করতে দিলেন। তাঁদের যিনি ধর্মযাজক ছিলেন তাঁর নাম ছিল আবু হারিস। হযরত ও আবু হারিসের মধ্যে খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হলো। যখন তাঁরা যুক্তিতর্কে সম্মত হলেন না, তখন হযরত তাঁদের সত্যের সততা নিরূপণের জন্য মোবাহিলার আহ্বান জানালেন—অর্থাৎ যে মিথ্যাবাদী হবে, সে অভিশপ্ত হবে, ধ্বংস হবে। প্রথম দিকে খ্রীস্টানগণ মোবাহিলায় রাজি হলেন। যখন হযরত তাঁর পরিবারবর্গের সকলকেই মোবাহিলার জন্য হাজির করলেন কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরা তাঁদের দুর্বলতার জন্য মত পরিবর্তন করলেন—এবং জিজিয়া কর দিতে সম্মত হলেন, তখন হযরত তাদের সসম্মানে আপন দেশে ফেরত পাঠালেন। এই সম্পর্কে কোরআন ঃ

"আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ, তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তাকে বলেছিলেন 'হও', ফলে হয়ে গেল। সত্য তোমার প্রতিপালক থেকে। অতএব তুমি সংশয়ীগণের অন্তর্গত হয়ো না। অনন্তর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপর ওই নিয়ে যে তোমার সঙ্গে কলহ করে, তবে তুমি বল—এস আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমরা তোমাদের সন্তানগণ এবং আমরা আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণ এবং আমাদেব জীবন সমূহ ও তোমাদের জীবন সমূহ আহ্বান করি। তারপর প্রার্থনা কবি যে, অসত্যবাদীগণের উপর আল্লাহব অভিসম্পাত।"

কোরআন—৩ ঃ ৫৯-৬১

মোবাহিলা সম্পর্কে কোরআনের আরও উক্তি—"তুমি বল- -হে আহলে কেতাবীগণ, আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে মিল আছে, তার দিকে এস, যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও উপাসনা না করি ও তাঁর সঙ্গে কোন অংশী স্থির না করি, এবং

আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কাউকে প্রভুরূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা ফিরে যায়, তবে বল সাক্ষী থাক যে, আমরাই মুসলমান।

কোরআন—৩ ঃ ৬৪

(৯) বানু আসাদ গোত্রের প্রতিনিধি (৯ম হিজরী) ঃ

পূর্বে বানু আসাদ গোত্র হযরতের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে হযরতের নিকট প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইসলামের প্রতি আনুগত্য আনে। এবং তারা মনে মনে ধারণা করল—মুসলমান হয়ে হযরতকে ধন্য করল। তাই কোরআন—

"ওরা মুসলমান হয়ে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে। না, আল্লাহ্‌ই বিশ্বাসীদের দিকে পরিচালিত করে তোমাদের ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

কোরআন—৪৯ ঃ ১৭

(১০) বানু ফাজারা গোত্রের প্রতিনিধি (৯ম হিজরী) ঃ

এই প্রতিনিধি দল ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়েছে এই জন্য যে, যে ব্যক্তি এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন—কুখ্যাত উনাইয়া বিন হিনস, যিনি হযরতের উট লুট করেছিলেন। ৫ম হিজরীর যুদ্ধে হযরতেব বিরুদ্ধে বহুলোক লস্কর দিয়ে সাহায্যও করেছিলেন।

(১১) কিন্দার প্রতিনিধি (১০ম হিজরী) ঃ

আরবের দক্ষিণে হাজরামাউত নামক স্থানে কিন্দাগণ বসবাস করতেন। তাঁদের শাসক আশাস ১০ম হিজরীতে ৮০ জন অশ্বারোহী-সহ মদিনা গমন করে মুসলমান হন। তিনি পরবর্তীকালে কাদেসিয়া ও ইয়ারমুক যুদ্ধেও যোগদান কবেন। তারও পরে হযরত আলির সঙ্গে মাবিয়ার বিরুদ্ধে সিফ্‌যানের যুদ্ধেও যোগদান করেন।

(১২) বাহরাইন থেকে আবদুল কায়িসের প্রতিনিধিত্ব (৫-১০ হিজরী) ঃ

পঞ্চম হিজরীতেই বাহরাইনে ইসলাম প্রবেশ করে। আবদুল কায়িসের নেতৃত্বে ১১ জন বাহরাইনবাসী হযরতের নিকট আসেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা সে যুগে অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিলেন। যে সমস্ত পাত্রে মদ্য পান করতেন, সেগুলোকে ওব্বা হানতাম, নাকির ও মাজাফফাত্ প্রভৃতি বলা হত। হযরত তাদের এ সমস্ত পরিত্যাগ করতে বললেন, পরিবর্তে নামায পড়তে, রোযা রাখতে, যাকাত দিতে উপদেশ দিলেন। তারা তাঁর উপদেশ মেনে নিল।

(১৩) প্রতারক বানু আমির প্রতিনিধি (৯ম হিজরী) ঃ

বানু আমির বিন সাসা গোত্রের তিনজন প্রতিনিধি প্রধান আমির বিন তুফাইল, আরবাদ বিন কায়িস এবং জব্বার বিন সালমা। তারা এই তিন নেতা সহ কুমতলব নিয়ে হযরতের নিকট গমন করল। আমির আরবাদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করল, আমির যখন হযরতের অহেতুক প্রশংসায় মোহিত করে রাখবে তখন আরবাদ হযরতকে অকস্মাৎ হত্যা করবে। গোপন পরামর্শমত কাজ আরম্ভ হল। আমির হযরতের তোষামদজনিত প্রশংসা আরম্ভ করলে হযরত যখন তাকে সোজাসুজি উত্তর দিলেন—"আমি ভয় করি তোমার তোষামোদজনিত কথাবার্তা তোমাকে বিপদগামী করবে।" তখন আরবাদ হযরতকে হত্যার চাল ভুলে গেলেন। এদিকে আমিরও তার ছদ্মরূপ ছেড়ে দিয়ে সোজা পথে এলো। মনের সব কথা খুলে বলল আমি আপনাকে তিনটি শর্ত দেব—

১। আপনি মরুভূমির শাসক হবেন, আমি শহরের মালিক থাকব।

২। অথবা আমাকে আপনি আপনার উত্তরাধিকার করবেন।

৩। অথবা আমি আপনাকে আমার গাতফান গোত্রের অশ্বারোহী দ্বারা পরাস্ত করব।

এ কথা বলে তারা বিদায় নিল। হযরত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন— "হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে আমিরের ক্ষতি থেকে রক্ষা কর।" আমির বাড়ি ফেরার পরেই বসন্ত রোগে মারা যায়। পরে বাকি সকলেই মুসলমান হয়ে যায়।

(১৪) হামির থেকে প্রতিনিধি ঃ

হামির আরবের একটি ছোট্ট প্রদেশ। তাঁদের প্রতিনিধি দল সহজেই সরলভাবেই হযরতের নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

আরবের শাসক হযরত মহম্মদ (দঃ) ঃ ৯ম ও ১০ম হিজরী এই দু'বছরের মধ্যে হযরত মহম্মদ (দঃ) যেভাবে দেশের সমস্ত মানুষের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে শাসকরূপে নির্বাচিত হলেন সারা পৃথিবীর ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। এক কথায় স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁকে নির্বাচিত করায় সমস্ত মানুষ সে নির্বাচনকে মেনে নিয়েছিল। বিশাল আরবের অধিকারী হয়েও হযরত যেভাবে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপন করতেন তাও নজিরবিহীন। কি চমৎকার জীবনধারা, সারাদিন মানুষের কল্যাণে যে জীবন ব্যস্ত, আবার সারারাত্রি আল্লাহর আরাধনায় সেই জীবনই ব্যাকুল।

দারিদ্র্য ছিল তাঁর জীবনের ভূষণ। নিজে না খেয়ে, না পরে অপরকে খাওয়াতেন, পরাতেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত তিনি যে কি অপরিসীম মানসিক চিন্তায় কাটাতেন, তা অনুভব করাও বড়ই শক্ত। সকলেই জানতেন—তিনি ছিলেন আল্লাহর রসুল কিন্তু সংসার-বিরাগী ছিলেন না, সম্পদ বিরাগী ছিলেন না, বরং তাঁর ধর্ম ছিল জীবন ব্যবস্থাপনার ধর্ম। ইসলাম শুধু পারলৌকিক পথের পাথেয় বহনকারী একটি ধর্মীয় জাহাজ মাত্র নয়। এটা হচ্ছে জীবনেরই জাহাজ। তাই হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন জীবন-জাহাজের মহান কাণ্ডারী। সমাজ-জাহাজের মহান মাল্লা। তাই তাঁর চিন্তা-ভাবনায় কোন জটিলতা ছিল না। নানা দুঃখকষ্ট ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে দিয়েই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তবে তাঁর একান্ত সান্ত্বনা ছিল তিনি যে মহান ব্রত নিয়েছিলেন সেখানে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য। সেখানে স্বয়ং আল্লাহ্ই তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বলেছিলেন— তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলামই আল্লাহর ধর্ম। কোরআন—৩ ঃ ১৯

নিশ্চয়ই ইসলামই (শান্তি) আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম। এবং তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য ও সুবিচারে পূর্ণ। কেহই তাঁর বাক্যের পরিবর্তনকারী নেই।

কোরআন—৬ ঃ ১১৫

সর্বশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ ঃ সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে কঠোর সাধনায় এই জগতের মুকুটবিহীন সম্রাট মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর একাগ্র সাধনা চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভের স্বীকৃতি পেল—স্বয়ং স্রষ্টার দ্বারা।

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে (দ্বীন) পূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্ম মনোনীত করলাম।"

কোরআন—৫ ঃ ৩

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিদায় হজ

দশম হিজরী

ফেব্রুয়ারি ৬৩১ খ্রীঃ—ফেব্রুয়ারি ৬৩২ খ্রীঃ

দশম হিজরী পর্যন্ত আরবের প্রায়ই সকল লোকই ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে ফেলেন। সামান্য সংখ্যক যাঁরা বাকি ছিলেন—তাঁরাও হযরতের রক্ষণাবেক্ষণেই থেকে গেলেন। কিন্তু যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সকলকেই তখনও ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়নি। তাই হযরত দ্রুত সকল স্থানে শিক্ষক প্রেরণে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর নির্দেশ ছিল—"ইসলামের বিষয়বস্তুকে যেন মানুষের সামনে কঠিনভাবে তুলে ধরা না হয়, যেন সহজভাবে তুলে ধরা হয়। মানুষকে যেন কোনরূপ ভীতি প্রদর্শন করা না হয়, যেন তাঁদের শুভ সংবাদ দেওয়া হয়। যদি মানুষ তাঁদের জিজ্ঞাসা করে স্বর্গের চাবি কি, তারা যেন উত্তর দেয়, আমরা আপনাদের নিকট সাক্ষ্য বহন করে এনেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, এমনকি তাঁর কোন অংশীদার নেই।"

নজরানে খালিদ ও ইয়ামেনে আলি ঃ সামান্য কয়েকজন ব্যতীত প্রায় সকল খ্রীস্টানই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওই বাকি লোকেদের ইসলামে আনার জন্যে খালিদকে পাঠালেন। খালিদ ছিলেন হযরত ওমরের মতো অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির। তিনি ততক্ষণ নজরানে রয়ে গেলেন যতক্ষণ না তাঁরা মদিনাতে প্রতিনিধি দল পাঠালেন। হযরত ওই প্রতিনিধি দলকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের বন্ধুতে পরিণত করলেন।

ইয়ামেনের ঘটনাও ঠিক নজরানের মতোই ছিল, বরং আরও কিছুটা শক্ত ছিল। হযরত আলি ৩০০ জন অশ্বারোহী সহ সেখানে গমন করেন এবং যুদ্ধও করেন। যুদ্ধে তাঁরা হেরে যান। তাঁরা তাঁদের পরাজয়ের পর মদিনাতে প্রতিনিধি দল পাঠান। এই প্রতিনিধি দল হযরতের ওফাতের মাত্র কিছুদিন পূর্বে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। দশম হিজরীর একাদশ মাস পর্যন্ত আলি সেখানে ছিলেন।

বিদায় হজ (১০ম হিজরী জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ৬৩১ খ্রীস্টাব্দ) ঃ তাবুক যুদ্ধের পর কোনও যুদ্ধ ছিল না। কোন সৈন্য পরিচালনার ব্যাপার ছিল না। তখন আরবের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শুধু শান্তি বিরাজ করছিল। আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তখন জনসমুদ্রের সমাবেশ ঘটেছিল মদিনাতে। হযরত অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে।

কিন্তু তিনি তখন পর্যন্ত নিজেই একবারও বড় হজ পালন করেননি। দু'বার ছোট হজ (উমরা) পালন করেছিলেন। সুতরাং সকলের সম্মুখে একবার বড় হজ পালন করে হজের নিয়মকানুনগুলো সকলকে দেখিয়ে দেওয়া তাঁর একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়েছিল।

কেননা হযরত সমগ্র জীবনে এমন একটি কাজও রেখে যাননি যা নিজে না করে অন্যাকে শুধু উপদেশ দিয়ে গেছেন। কেননা আল্লাহর কাজ ছিল নির্দেশ দেওয়া এবং তাঁর রসুলের কাজ ছিল করে দেখিয়ে দেওয়া।

তিনি আরবের বিভিন্ন স্থানে দূত পাঠালেন, তাঁর সঙ্গে বড় হজে যোগদান করার জন্যে। যে হজের নির্দেশ ২৫০০/৩৫০০ বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহিমের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। "(স্মরণ কর) যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য কাবা গৃহের স্থান স্থির করে দিয়েছিলাম (তখন বলেছিলাম) আমার সঙ্গে কোন শরিক করো না, আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে (প্রদক্ষিণ) এবং রুকু ও সেজদাকারীদের জন্য। মানুষের মধ্যে হজ সম্পর্কে ঘোষণা করে দাও—ওরা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উষ্ট্রের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে। যেন তারা নিজেদের উপকারের জন্য উপস্থিত হয় এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে স্মরণ করে আল্লাহর নাম। তিনি ওদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন গৃহপালিত পশুসমূহ থেকে—তার জবেহ কালে তোমরা তা থেকে আহাব কর, দুঃস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে। এবং তওয়াফ করে সেই প্রাচীনতম গৃহ (কাবা)।" কোরআন—হজ ঃ ২২ ঃ ২৬-২৯

আজ হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর কর্ম জীবনের ভিতর দিয়ে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ২৫০০/৩৫০০ বছর পূর্বের প্রার্থনা পূর্ণতা লাভ করল।

"হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য থেকে তাদেব নিকট একজন রসুল পাঠিও যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করবে। তাদের কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দিয়ে তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।" কোরআন—২ ঃ ১২৯

হযরত পবিত্র কোরআন পাঠ করতেন, শিক্ষা দিতেন, ব্যাখ্যা করতেন তার গূঢ় রহস্য। পবিত্র করতেন সমগ্র মনুষ্যজগতের আত্মাকে, একমাত্র হযরত মহম্মদ (দঃ) ব্যতীত এতখানি গৌরবোজ্জ্বল বিশ্বজোড়া গুরুদায়িত্ব পৃথিবীর কোন মানুষেরই উপর আসেনি, এবং যার এতখানি সম্মানজনক সমাধানও কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

এক থেকে দেড় লক্ষ মানুষ এই হজে সমাবেশ হলো। সর্ব দিক থেকে বন্যার জলের মতো মানুষের স্রোত আসতে থাকল। মানুষ দেখল ইসলামের ভ্রাতৃত্ব কি!

হযরতকে দেখতে গেলে দেখতে হয় ও বুঝতে গেলে বুঝতে হয়—আরবের পূর্ব সামাজিক রূপ ও আজকের রূপ, তাহলে এক কথাতেই বোঝা যাবে, হযরতের চরিত্র, হযরতের কাজ ও কৃতকার্যতা। তিনি কেমন মানুষ ছিলেন সেটা বোঝা যাবে দীর্ঘদিন যাঁরা ছিলেন তাঁর একান্ত শত্রু, আজ তিনি সমস্ত কিছুর মালিক হয়েও এক কথায় সকলকেই ক্ষমা করেছিলেন। আজ সকলেই বুঝল হযরত কে, ও কি তিনি চেয়েছিলেন।

আজকাল যে কোন স্থানে এক থেকে দেড় লক্ষ লোক জমায়েত করা এমন কোন কঠিন বা বড় কাজ নয়। কিন্তু হযরতের সময়ে আরবে এতগুলো মানুষকে হজ উদ্‌যাপনের জন্য মক্কায় একত্রিত করা সত্যিই কঠিন ছিল। এই মানুষগুলো তাদের আপন আপন খাদ্যদ্রব্য সবকিছুই সঙ্গে এনেছিলেন। হযরত তাঁর স্ত্রীদেরকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাছে

নারীগণ হজ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। আজ পর্যন্ত জগতে যত লোক এসেছেন তার মধ্যে হযরত ছিলেন সর্বাপেক্ষা বাস্তববাদী। তাঁর সমস্ত কথার প্রথম প্রয়োগভূমি ছিলেন তিনি নিজেই। এমনি ছিল তাঁর জীবনধারা। তিনি একদিনও সহজে বাজিমাৎ করতে চাননি। আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ দিতেন তিনি সেই নির্দেশমত কঠোর সংগ্রামের সঙ্গেই এগিয়ে যেতেন। তিনি আল্লাহরই নির্দেশমত কোরবানি করার জন্য একশো উট সঙ্গে নিলেন।

যখন তিনি জুল হুলাইফাতে পৌঁছালেন, সেখানে তাঁবু খাটালেন রাত্রি কাটাবেন বলে। পরদিন সকালে তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ প্রত্যেকে দু'খণ্ড সাদা কাপড় পরিধান করলেন—এক খণ্ড পরনে, অন্য খণ্ড শরীরে। এখানে রাজা ও ভিখারির মধ্যে পার্থক্য রইল না, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল না। সাম্য ও সমতার আদর্শ এতে ফুটে উঠল—জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে, শুধু কেতাবের পাতাতে নয়, বক্তৃতায় নয়, চিন্তায় নয়, কথায় নয়, একেবারে নির্জলা কাজে।

সকলেই শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে মনকে পবিত্র করলেন। তখন হযরত বলতে আরম্ভ করলেন, "লাববায়েক, লাববায়েক"—হে আল্লাহ্, আমি আজ তোমার সেবায়, প্রার্থনায় নিজেকে এখানে প্রস্তুত করেছি। এখানে যা কিছু দেখছ তার সমস্ত কিছু প্রশংসা পাওয়ার মালিক তুমি। তোমার কোন শরিক নেই। আমি এখানে তোমার সেবায় হাজির।

এখানে মানুষ যেন আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথা বলছে এবং আল্লাহ্ও তাদের সরাসরি উত্তর দিচ্ছেন। এ ভাবেই ইসলাম মানুষকে আল্লাহর অতি নিকটে নিয়ে গেছে।

এ সমস্ত শব্দগুলো যখন হযরত মহম্মদ (দঃ) উচ্চারণ করতে থাকেন তখন সমস্ত মানুষ তাঁকে অনুসরণ করতে থাকেন। হজ একটি ত্যাগেব প্রতীক। প্রতিটি মানুষ সেখানে যায় তার জাগতিক সমস্ত সুখ ও সম্ভোগকে ত্যাগ করেই। সে যেন সমস্ত দেহ-মন-প্রাণকে তাঁর আল্লাহর ভালবাসায় অবগাহন করায়। তবে যদি কেউ সম্মান পাওয়ার জন্য কিংবা শুধু হাজি হওয়ার জন্য যায় তবে তার সবই ব্যর্থ।

মদিনা থেকে যাত্রার ১৯ দিন পরে হযরত ৪ জুলহজ তারিখে মক্কায় পৌঁছালেন। সাধারণত মক্কা থেকে মদিনা আসতে সময় লাগে ১২ দিন, কিন্তু এক্ষেত্রে সময় লেগে গেল ১৯ দিন। তার কারণ বিরাট হজযাত্রী দল সকলকে একত্রিত করে নেবার জন্য এ সময় লাগারই কথা, তাছাড়া সঙ্গে মেয়েছেলে, বৃদ্ধ, আহত অনেকেই ছিলেন। সকলের কথা চিন্তা করেই হযরত তাঁর যাত্রাকে বিলম্বিত করেছিলেন। এই দিক থেকে তিনি সকল সময় অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। এমনকি বিরাট জমায়েতে যখন তিনি নামায পড়তেন, তখন ছোট সূরা পড়তেন. যাতে কোন মানুষেব কোন অসুবিধা না হয়। আবার যখন একাকী বাড়িতে পড়তেন তখন তিনি তাঁর নামায এত দীর্ঘ করতেন—রাত্রি শেষ হয়ে যেত।

এভাবেই হযরত মক্কাতে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই কাবাতে হাজির হলেন। সেখানে আল্লাহর ঘরকে সাতবার তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করলেন। অতঃপর হযরত ইব্রাহিমের স্থানে নামায সমাধা করলেন। এরপব তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে সাতবার মৃদু দৌড়াদৌড়ি করলেন।

হযরতের নির্দেশমত যাঁদের উৎসর্গ করাব মতো কিছু ছিল না, তাঁরা মস্তক মুণ্ডন করলেন এবং এহবাম থেকে আপাত মুক্ত হলেন।

হযরত আলি হযরতের সঙ্গে যোগদান করে এহরামে থাকার জন্যে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু হযরত আলির সঙ্গে কোন কিছু না থাকায় তিনি হযরতের উৎসর্গীকৃত বস্তুর সঙ্গে যোগ দিলেন।

৮ জুলহজ্জ তাবিখে হযরত মক্কা ত্যাগ করলেন মিনার পথে। সেখানে বাত্রি যাপন করলেন। ৯ জুলহজ সকালে ফজরের নামাযের পর তিনি তাঁর উট কাসওয়াতে আরোহণ করলেন আরাফতের পথে। অন্যান্য সকলেই তাঁকে অনুসরণ করলেন।

মহানবীর ঐতিহাসিক বিদায় ভাষণ ঃ আরাফতের পূর্বদিকে নামিরা নামক স্থানে হযরতের তাঁবু খাটানো হলো। ঠিক দুপুরের পরই হযরত তাঁর উটে চেপে উপত্যকার মাঝামাঝি স্থানে এসে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর প্রতিটি বাক্যই রাবিয়া বিন উমাইয়া বিন খালাফ কর্তৃক পুনবাবৃত্ত হয়েছিল। নামায পড়ে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বললেন—

পরকাল সম্পর্কে ঃ

১। "হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলো মন দিয়ে শ্রবণ কর, কেননা আমি এ বছরের পব এ স্থানে তোমাদের সঙ্গে পুনরায় নাও মিলতে পারি।"

২। "হে মানবমণ্ডলী, (আগত ও অনাগতকালের) যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত না হচ্ছো, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধন-সম্পদ এইদিন ও এই মাসের মতোই পবিত্র।"[২]

৩। "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবে, যখন তোমাদের প্রভু তোমাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং আমি তোমাদের তাঁর সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়েছি।"

সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে ঃ

৪। "যে ব্যক্তি অন্যের ধন-সম্পদের অভিভাবক বা আমানতদার তার উচিত মালিককে তার মালপত্তর ফিরিয়ে দেওয়া।"

৫। "সুদের ওপব নেওয়া-দেওয়া হারাম, বাতিল, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। কাবও প্রতি অত্যাচার করো না ও অত্যাচারিত হয়ো না।"

৬। "আল্লাহব সিদ্ধান্ত, সুদ বাতিল এবং আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবের জন্য যে সমস্ত সুদ পাওনা আছে সবই বাতিল।"

৭। অজ্ঞাত যুগের খুনের ক্ষতিপূরণ সবই বাতিল হলো।

৮। "এবপব হে মানবমণ্ডলী, শয়তান এদেশে পূজিত হওয়ার আশা ত্যাগ করেছে। সে অন্য দেশে মান্য হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের বিশ্বাস (ঈমান) সম্পর্কে সতর্ক থাকবে, যেন তোমাদের ভাল কাজ অন্য লোকের দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায়।

৯। হে মানবমণ্ডলী, পবিত্র মাসের রদবদলকরণ অন্ধকার যুগেরই ধারা। যারা অবিশ্বাস্য পছন্দ করে তারা বিভ্রান্ত। তারা বলে—এক বছর পবিত্র মাস, পরের বছর

অপবিত্র, তারা আল্লাহ্ কর্তৃক পবিত্র মাসের সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য পবিত্র মাসকে অপবিত্র বলে। সময় ঘুরছে, যে দিন থেকে আসমান ও জমিন সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ কর্তৃক মাসের সংখ্যা ১২, তাদের মধ্যে ৪টা পবিত্র, ৩টা পরপর এবং জামাদি ও সাবানের মধ্যবর্তী বছর।

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে ঃ

১০। "এরপর, হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের অধিকার আছে, তাদেরও তোমাদের প্রতি অধিকার আছে। ঐ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট শ্রেষ্ঠ। এটা তাদের অবশ্য কর্তব্য, তাদের সতীত্ব রক্ষা করা এবং অশ্লীলতা ত্যাগ করা। যদি তারা দোষী হয় তবে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস (সঙ্গম) করো না। তোমরা তাদের শোধনার্থে প্রহার কর—কিন্তু যেন ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়। যদি তারা অনুতপ্ত হয় তবে তাদের খেতে দাও, পরতে দাও, তাদের সঙ্গে তখন ভাল ব্যবহার কর। তোমরা একে অন্যকে উপদেশ দিও—তোমাদের স্ত্রী-জাতির প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্যে। কেননা তারা তোমাদেরই অংশ বা অন্তর্ভুক্ত ও তাদের আল্লাহর আমানত রূপে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বাক্য দ্বারাই তাদের তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।"

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঃ

১১। "সুতরাং হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলো ভালভাবে অনুধাবন কর, যার জন্য আমি আমার কথাগুলো তোমাদের নিকট রেখে গেলাম। যদি তোমরা এটা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর তাহলে তোমরা কোনদিনই বিপথগামী হবে না। বিশেষ করে আল্লাহর কোরআন ও হাদিস (তাঁর দূতের ধর্মীয় নীতি ও জীবন ধারা)।"

১২। "হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলো অনুধাবন কর, নিশ্চিত কর বুঝতে। তোমরা শিক্ষা পেয়েছ প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানদের ভাই, সকল মুসলমানই এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। এটা কোন মানুষের জন্যই অবৈধ নয়, অনুমতি ব্যতীত অন্যের জিনিস গ্রহণ করবে না। সুতরাং কেউ কারও প্রতি অবিচার করো না।"

দণ্ডবিধি সম্পর্কে ঃ

১৩। একজনের অপরাধে অন্যকে দণ্ড দেওয়া যায় না। অতঃপর পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলবে না।

১৪। যদি কোন নাক কাটা কাফ্রি ক্রীতদাসকেও তার যোগ্যতার জন্য তোমাদের আমির করে দেওয়া হয়, তোমরা সর্বতোভাবে তার অনুগত হয়ে থাকবে। তার আদেশ মান্য করবে।

ধর্ম ঃ

১৫। সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। এই অতিরিক্ততার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহুজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৬। তোমরা ধর্মভ্রষ্ট হয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়াতে ও রক্তপাতে লিপ্ত হয়ো না। পরস্পর পরস্পরের তোমরা ভাই ভাই।

মানুষ ও জাতি ঃ

১৭। এক দেশের মানুষের ওপর অন্য দেশের মানুষের প্রাধান্যের কোন কারণই নেই। সমস্ত মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে উৎপন্ন। মানুষের প্রাধান্য মানুষের যোগ্যতার জন্য।

১৮। জেনে রেখো। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, তাই সমগ্র বিশ্ব মুসলমানদের এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ।

শেষ নবী ঃ

১৯। হে লোকসকল! শ্রবণ কর, আমার পব কোন নবী নেই। তোমাদের পর আর কোন উম্মত (জাতি) নেই। এ বছরের পর তোমরা হয়তো আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। এল্‌ম ওহী (ঐশীজ্ঞান) উঠে যাওয়ার পূর্বে আমার নিকট থেকে শিখে নাও।

২০। চারটি কথা স্মরণ রেখো: শেরক্ (আল্লাহর অংশী) করো না। অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না। চুরি করো না। ব্যভিচার করো না।

দাস-দাসী ঃ

২১। হে মানববৃন্দ! কোন দুর্বল মানুষের ওপর অত্যাচার করো না, গরিবের ওপর অত্যাচার করো না, সাবধান, কারও অসম্মতিতে কোন জিনিস গ্রহণ কবো না। সাবধান, মজুরের শরীরেব ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরি মিটিয়ে দিও। তোমরা যা খাবে ও পরবে, তা তোমাদের দাস-দাসীদের খেতে ও পরতে দিও। যে মানুষ দাস-দাসীদের ক্ষমা করে ও ভালবাসে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন ও ভালবাসেন।

২২। যে ব্যক্তি নিজ বংশের পরিবর্তে নিজেকে অন্য বংশের বলে প্রচার করে। তার ওপর আল্লাহর, ফেরেশ্‌তাগণের ও মানব জাতির অভিসম্পাত।

প্রকৃত মুসলমান ঃ

২৩। মহানবী বলেন—মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্যান্যরা নিরাপদ থাকে, ঈমানদার বিশ্বাসী ওই ব্যক্তি, যার হাতে সকল মানুষের ধন ও প্রাণ নিরাপদ থাকে। ওই ব্যক্তি পূর্ণ মোমেন হতে পারে না—যে দু'বেলা উদর পূর্ণ করে আহার করে, আর তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে। ওই ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না—যখন সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা অন্যের জন্যও পছন্দ করে না।

২৪। **একতা সম্পর্কে ঃ** আমার উম্মতের মধ্যে যে ঝগড়া ও বিসংবাদ করতে বের হয, তার বুকে আঘাত কর। একত্রে খাওয়া-দাওয়া কর। আলাদা আলাদাভাবে আহার করো না। কেননা একত্রে খাওয়াতে বরকত আছে। যে বিভেদ সৃষ্টি করে, তার স্থান জাহান্নামে। আমি তোমাদের পাঁচটি আদেশ করছি—একতা রক্ষা কর। জনতার অনুগত থাক। প্রয়োজনে হিজরত কর, উপদেশ শ্রবণ কর। আল্লাহর পথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ কর।

২৫। **ঘুষ ঃ** যাকে আমরা শাসনকার্যে নিযুক্ত করি। আমরা তার ভরণপোষণ করি। এরপরও যদি সে কিছু গ্রহণ করে, তা বিশ্বাসভঙ্গ বা ঘুষ বলে গণ্য হবে। এবং ঘুষ গ্রহণ মহাপাপ।

২৬। **হিংসা ঃ** তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ কর। কেননা আগুন যেমন জ্বালানি কাঠকে ভস্মীভূত করে, হিংসা তেমনি মানুষের সৎগুণকে ধ্বংস করে।

২৭। **পরিশ্রমী ও ভিক্ষুক ঃ** যে ব্যক্তি নিজ হাতের কাজ দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করে, তা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আর নেই। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, সে যদি এক গাছি দড়ি নিয়ে পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে বিক্রি কবে আল্লাহ্ তার মুখ রক্ষা করেন। এটাই তার জন্য উত্তম।

২৮। **আমলনামা ঃ** তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং আপন আপন ভাল-মন্দের হিসাব-নিকাশ (আমলনামা) পাঠ করতে হবে। তোমরা সাবধান। তখন কেউ কাকেও সাহায্য করতে পারবে না।

২৯। **জ্ঞান সম্পর্কে মহাবাণী ঃ** তোমরা জেনে রেখো—বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্ত অপেক্ষা মূল্যবান। যে জ্ঞানেব পথে পরিভ্রমণ কবে, আল্লাহ্ তাকে স্বর্গের পথে পথ দেখান। জ্ঞান অনুসন্ধান কর (যদিও তা চীন দেশেও হয়)। জ্ঞানার্জন (বিদ্যাশিক্ষা) প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য ফরজ, অর্থাৎ অবশ্যই কর্তব্য।

৩০। **ব্যবহার সম্পর্কে ঃ** সমাজে তোমাব আচরণ ঐ রূপ হবে, যেমন আচরণ তুমি অন্য থেকে কামনা কর। সমাজে তোমার ব্যবহাব ঐরূপ হবে, যেরূপ ব্যবহার তুমি নিজে পেলে খুশি হও।

৩১। **পিতামাতা সম্পর্কে ঃ** হে মানববৃন্দ! তোমরা জেনে রেখো। তোমাদের মাতা-পিতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি। মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিই আল্লাহর অসন্তুষ্টি। তোমাদের স্বর্গ তোমাদের মায়ের পায়ের তলে অবস্থিত।

৩২। **শ্রেষ্ঠ মানুষ সম্পর্কে ঃ** হে মানব সন্তান! তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যে মানুষের উপকার করে।

৩৩। যারা উপস্থিত আছো, তারা অনুপস্থিতদের নিকটে আমার এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবে। হয়তো উপস্থিতদের কিছু লোক অপেক্ষা অনুপস্থিতদের কিছু লোক বেশি উপকৃত হবে।

জগতের শ্রেষ্ঠতম মানবের শ্রেষ্ঠতম সাধকের শ্রেষ্ঠতম রসুলের ভাষণ যথাযথভাবে অনুবাদ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আমরা শুধু তাঁর অমূল্য সংবাদটি দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

হযরতের বলার সঙ্গে সঙ্গে রাবেয়া বিশাল জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কি জানেন এটা কোন্ দিন? তারা উত্তর দিলেন, এটা পবিত্র হজের দিন। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি জানেন আল্লাহ্ আপনাদের জীবন-মাল সকল কিছু পবিত্র করেছেন, যতক্ষণ আপনারা তাঁর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন? তারা উত্তর দিলেন—হ্যাঁ। এইভাবে তিনি বাক্যের পর বাক্যগুলো বলতে থাকলেন। অতঃপর হযরত মহম্মদ (দঃ) যেন স্বর্গের সপ্তদ্বার খোলা আকাশের দিকে মুখমণ্ডল উত্তোলন করে বলে উঠলেন—"হে আল্লাহ্, আমি কি তোমার রেসালতের গুরুভার ও নবুয়তের গুরুদায়িত্ব

বহন করতে পেরেছি? হে আল্লাহ্, আমি কি আমার কর্তব্য পালন করেছি?" সঙ্গে সঙ্গে বিশাল জনতা উচ্চস্বরে বলে উঠলেন—হ্যাঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়।

তখন হযরত বলে উঠলেন—"হে আল্লাহ্, তুমি আমার সাক্ষী থাক।"

ইসলামের পূর্ণতা লাভ ঃ এরপর হযরত মহম্মদ (সাঃ) তাঁব ভাষণ শেষ করলেন। তারপর উট থেকে নেমে 'জোহর' ও 'আসর' নামায পড়লেন। তিনি যে সমাপ্তি ভাষণ দিলেন--আল্লাহ্ তা সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদন করলেন।

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ কবলাম, তোমাদের জন্য ইসলাম (শান্তি) ধর্ম মনোনীত করে দিলাম।"

কোরআন—৫ ঃ ৩

হযরত সঙ্গে সঙ্গে সকলকে এই আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যার দিকে হযরত আরাফাত ত্যাগ করলেন। মুজদালাফাতে রাত্রি যাপন করলেন। সকলেব সঙ্গেই মগরেব (সন্ধ্যা) ও এশাব (রাত্রির) নামায সমাপন করলেন।

সকালে হযরত মাশাবিল হারামে অবতরণ করলেন এবং মিনার দিকে যাত্রা কবলেন। পথে জামারাত (পাথর নিক্ষিপ্ত স্থান) অতিক্রম করলেন। এরপর হযরত তাঁব ৬৩ বছব বয়সেব জন্য ৬৩টা উট কোরবানি দিলেন। আলি বাকি ১০০টা উট কোরবানি দিলেন। এরপর হযরত তাঁর মস্তক মুণ্ডন করলেন। এই ভাবেই পবিত্র হজ সমাপন হলো।

এই হজকে **বিদায় হজ** বলা হয়। কেননা হযরতের জীবনে এটাই ছিল শেষ হজ। এই হজকে **ভাষণ হজ**-ও বলা হয়। কেননা হযরত এই হজে মানবমণ্ডলীর প্রতি সাধারণ ব্যাপক ভাষণ দান করেছিলেন। সকলকে নির্দেশও দিয়েছিলেন—যাতে তাঁরা তাঁর কথাগুলোকে যারা উপস্থিত থাকতে পারেনি, যারা আসার চেষ্টা করেও আসতে পারেনি এমনকি যারা আজ এখনও পর্যন্ত জন্মায়নি তাদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়। যাতে করে তাঁর বাণী কালস্রোতে সদাই বয়ে চলে। একে **ইসলামের হজ** বলা হয়, কেননা এই হজের দিনে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে চিরদিনের জন্য ও চিরন্তন ভাবেই।

"তিনি নিরক্ষরদের একজনকে রসুল রূপে পাঠিয়েছেন, যে তাদের নিকট তাঁর আয়াত আবৃত্তি করে তাদের পবিত্র করে এবং কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয়। ইতিপূর্বে এরাই তো ঘোব বিভ্রান্তিতে ছিল। যারা এখনও তাদের দলভুক্ত হয়নি। তাদের জন্যও সে প্রেরিত হয়েছে, আল্লাহ্ বিজ্ঞানময়।" কোরআন—৬২ ঃ ২-৩

"বল---আল্লাহ্, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী, এই কোরআন আমার নিকট পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদের ও যার নিকট পৌঁছাবে তাদের সতর্ক করি।"

কোরআন—৬ ঃ ১৯

ধীর-স্থির বিচক্ষণ হযরত আবুবকর যখন এই আয়াত শরীফ শুনলেন যে, ইসলাম পূর্ণতা লাভ করল, তখন তিনি আনন্দের পরিবর্তে কেঁদে ফেললেন। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি যে মহান গৌরবজনক গুরুদায়িত্ব এসেছিল আজ তার সম্মানজনক সমাধানের স্বীকৃতিও এসে গেল। সুতরাং মহামানব আর হয়তো

বেশিদিন আমাদের মধ্যে থাকবেন না। তিনি অচিরেই আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবেন। সে কথার ইঙ্গিত হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর ভাষণের প্রথমেই দিয়েছিলেন।

কিন্তু যখনই সকল মানুষ তাঁর এই কথার মর্ম অনুধাবন করলেন, তখন তাদের মর্মবেদনার কোন সীমা-পরিসীমা রইল না। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার শুধুমাত্র সান্ত্বনা ছিল।

"আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল, বিধান তাঁরই। তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" কোরআন—২৮ ঃ ৮৮

যা কিছু জগতে আছে সে ধ্বংসময়
তুমি শুধু বাকি রবে সর্ব সারময়
মহত্ত্বে গৌরবে তুমি এত সুমহান
জগৎ জুড়িয়া দান নাহি প্রতিদান।

কোরআন—৫৫ ঃ ২৬-২৭

মহানবীর বিদায় ভাষণের সামাজিক মূল্যায়ন ঃ মহানবীর এই বিদায়ী ভাষণের সামাজিক মূল্যায়ন যে কতখানি, তা একসঙ্গে নির্ণয় কবা বড়ই কঠিন। কেননা তিনি ছিলেন স্রষ্টার শেষ দূত। স্রষ্টা স্বয়ং তাঁর দূতের মুখ দিয়েই তাঁর কথা বলেছেন। সুতরাং তাঁর ভাষণ ছিল প্রকারান্তরে স্রষ্টারই ভাষণ। অতএব যতদিন সৃষ্টি আছে ততদিন থাকবে স্রষ্টাব অভিপ্রেত ভাষণের তাৎপর্য। সুতরাং যতদিন মানুষ আছে, ততদিন এর চরম মূল্যায়ন হতেই থাকবে।

যতদিন গরিব ও ধনী আছে, যতদিন ন্যায় ও অন্যায় আছে, যতদিন সবল ও দুর্বল আছে, যতদিন নেতা ও নেতৃত্ব আছে, যতদিন নীতি ও রাজনীতি আছে, যতদিন ধর্ম ও অধর্ম আছে, যতদিন আস্তিক ও নাস্তিক আছে, যতদিন মানুষের অন্ধ আভিজাত্য ও বংশের কৌলিন্য আছে, যতদিন ইষ্ট ও অনিষ্ট আছে, যতদিন একতা ও বিচ্ছেদ আছে, যতদিন সরকারি অফিস ও ঘুষ আছে, যতদিন হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা আছে, যতদিন দাতা ও ভিক্ষুক আছে, যতদিন শ্রমিক ও মালিক আছে, যতদিন অজ্ঞতা ও জ্ঞান আছে, যতদিন পিতামাতা ও সন্তান আছে, যতদিন পুরুষ ও রমণী আছে, যতদিন যৌবন ও বার্ধক্য আছে, যতদিন বিয়ে ও ব্যভিচার আছে, যতদিন মানুষের সাবালকত্ব ও ষড়রিপু আছে. এক কথায় যতদিন মানুষের সামাজিক ব্যবহার বলে কোন কিছু আছে ততদিন আগত হতে অনাগত কালে মহানবীর শ্রেষ্ঠতম শেষ ভাষণের চরম মূল্যায়ন হতেই থাকবে। এ ভাষণ চিরদিনের জন্য চির সবুজ চির নবীন।

সুতরাং মানব কল্যাণে, বিশ্বকল্যাণে, বিশ্ব-শান্তিতে ও শ্রীবৃদ্ধিতে মহানবীর বিদায়ী ভাষণের সামাজিক গুরুত্ব অসামানা, অসীম, অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অপূর্ব ও অনবদ্য। এই ভাষণের গুরুত্ব ও গরিমা, মহত্ত্ব ও মহিমা জগতের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণ স্বীকাব করে গেছেন ও করছেন।

আসিবে না এ জগতে হেন পরিবেশ
যে বিশ্বে তোমার বাণীর প্রয়োজন শেষ।

মহানবীর আগমন ও অন্তর্ধান রহস্য

আগমন রহস্য ঃ

অপূর্ব এক সৃষ্টিযোগে বিশ্ব সৃষ্টি পূর্ণ হয়
মানবাকাশে তোমার উদয় চন্দ্রও যেথা মলিন রয়।
জীবনসূচীর সূচনা থেকে তোমার শুভ সকল কাজ
শুচীর বাগে সুন্দরেতে গোলাপে যেন দিতেছে লাজ।
জ্ঞানের আলোয় জ্ঞানজগতে বিশ্বাকাশে সূর্যোদয়
শান্তিদানে সংসারেতে মানবাকাশে চন্দ্রোদয়।
বিশ্বস্রষ্টা পথ দিয়েছেন বিশ্ববাসীর জন্য
সব সমস্যাব শেষ সমাধান পথ নাই তুমি ভিন্ন।
'শেয নবীজী' আল্লাহর দূত আসিবে না আব অন্য
জন্ম তোমার এই জগতে জগৎ মুক্তির জন্য।

কোরআন--৩ ঃ ১৪৪, ৪ ঃ ১৬৫, ১৭ ঃ ১০৫, ৪৮ ঃ ২৯, ৬১ ঃ ৬, ৬৮ ঃ ৪

অন্তর্ধান রহস্য ঃ

বিরাম বিহীন চলেছে জেহাদ—
গ্রীষ্ম বর্ষা শবৎ শীতে—
বাদ রাখ নাই কোথাও কিছু
অজ্ঞতারে মিলিয়ে দিতে।
বিদায় বেলায় জগৎ হতে—
শেষ করে দিয়ে দূতের কাজ
বিদায় ভাষণ দান করলে—
বিশ্বমানব গডতে সমাজ।
যতই কঠিন কাঠিন্য হোক—
আপন হাতে তুলে নিতে—
বাদ রাখ নাই কোথাও কিছু—
আপন হাতে সাজিয়ে দিতে
নিখিল-ধরা—ঐশী বাণী
আর পাবে না মানব সমাজ
তোমার ভাষণ জগৎ ভূষণ—
সন্তোষ যেথা রাজাধিরাজ।
বিদায় নিলে বিদায় হজে
বুঝিয়ে দিয়ে দূতের কাজ।
থাকল ধরা চির ঋণী—
চিরদিনের মানব সমাজ। —কাব্যকানন

কোরআন—৫ ঃ ৩, ১১০ ঃ ১-৩

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার, মহানবীর জীবনসন্ধ্যা ও ওফাৎ

একাদশ হিজরী, ৬৩২ খ্রীঃ

ভবিষ্যতের চিন্তায় হযরত মহম্মদ (দঃ), নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার ঃ বিদায় হজের পর সমগ্র আরববাসী তাঁদের পবিত্র হজব্রত পালন করার পর হযরতেব অমিয় বাণী ও অমব কালজয়ী ভাযণের মধুর স্মৃতি বুকে নিয়ে আপন আপন স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁরা আজ সকলেই এক বাক্যে বুঝতে পারলেন হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মহান ব্রত আজ সম্পূর্ণ সফল। এটাও বুঝলেন, হযরত এসেছিলেন এই ব্রতের জন্যে, আজ সে ব্রত সম্পূর্ণ সমাপ্ত, তাই তাঁর দাযিত্ব শেষ, তিনি আজ মুক্ত। সুতবাং এ সংসারে তাঁর আর থাকার প্রয়োজন নেই। তিনি এসেছিলেন ত্যাগের জন্যে, ভোগের জন্যে নয, তাই আজ তিনি বিদায়ের পথে। কিন্তু তিনি এমন একটি মানুয, একদিনও জীবনে বিশ্রামেব কথা চিন্তা কবেননি। আজ তিনি কৃতকার্য। কাজ তাঁব সম্পূর্ণ তবুও তাঁব বিশ্রাম নেই। তিনি মানব কল্যাণের বিভিন্ন চিন্তায় নিমগ্ন। এই মানবকল্যাণই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ও সাধনা। শান্তি ছিল তাঁর জীবনের অমোঘ বাসনা। সমগ্র আরব মুসলমান হলো, সভ্য সমাজব্যবস্থায় নিজেদের স্বীকৃতি দিল। কিন্তু তখনও বাকি— সিরিয়া, মিশর, আবিসিনিয়া প্রভৃতি। এই সমস্ত দেশেও আল্লাহর বাণী পৌঁছান একান্ত প্রয়োজন।

পারস্যরাজ হযরতের প্রস্তাবপত্র ছিন্নভিন্ন করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল। সিবিয়ার গভর্নর তাঁর দূতকে ঘৃণাভরে উত্তর দিয়েছিল ও আক্রমণের হুমকি দিয়েছিল। মুতা যুদ্ধে তিনজন সেনাপতি শহীদ হন। এই শাহাদৎ বরণও ছিল ইসলামের চোখে রোমানদের পক্ষ থেকে ভয়াবহ চিহ্ন। তাই হযরত তাঁর দৃষ্টি ওই রোমানদের প্রতি নিবদ্ধ করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এ-কাজ করার পূর্বেই নতুন উপসর্গ দেখা দিল। যখন আরবগণ দেখল—হযরতকে ঠেকানো গেল না তখন তারা ভাবল—এবার নবী হতে পারলে একটা বড় সুযোগ মিলতে পারে এবং হযরতের ব্রতকে নষ্ট করা যেতে পারে। তাই রাতারাতি অনেকেই নবী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ল। এদের মধ্যে নাজদের তুলাইহা জায়িম বিন আসাদ একজন। তিনি নিজেকে নবী ও আল্লাহর দূত বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু হযরতের জীবিতকালে ঘোষণা করাটা বিপজ্জনক ভেবে পরবর্তী সময়ে ঘোষণা করা স্থির করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে খালেদ বিন ওয়ালিদের দ্বারা পরাজিত হয়ে মুসলমান হন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন- -মুসাইলামা। তিনি আরও সাহসী ও চতুর ছিলেন। তিনি সরাসরি হযরতের নিকট নবুয়তের দাবি নিয়ে পত্র লিখলেন—তিনি সমগ্র দেশের অর্ধেকের মালিক এবং বাকি অর্ধেক কুরাইশদের। হযরত উত্তর দিলেন—

"আল্লাহর নবী মহম্মদ (দঃ) হতে মিথ্যাবাদী মুসাইলামার প্রতি—পৃথিবী একমাত্র আল্লাহরই, তাঁর অনুগত দাসদের মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন এবং শান্তি তারই প্রতি যিনি অনুসরণ করেন তাঁকে।"

নবয়ুতের তৃতীয় দাবিদার ছিলেন—ইয়ামেনের আসওয়াদ আনসি। তিনি নিজেকে একজন বড় যাদুকর বলে দাবি করেন এবং প্রকাশ্যে বের হননি যতক্ষণ না তাঁর একটা বড় দল গঠন হয়েছিল। তিনি ইয়ামেন থেকে হযরতের প্রতিনিধিকে বরখাস্ত করেন এবং তারপর নজরানে হাজির হন। ইয়ামেনের পরবর্তী শাসক ইবনে বাজানকে হত্যা করে তাঁর বিধবা পত্নীকে জোর পূর্বক বিয়ে করেন। পরে ইয়ামেনে হযরতের নতুন প্রতিনিধিকেও বন্দী ও হত্যা করেন। আল্লাহ্ এবার উত্তর দিলেন। তাঁর নতুন স্ত্রী (শহীদ বাজানের পত্নী) তাঁর স্বামী হত্যার প্রতিশোধার্থে আসওয়াদ আনসিকে হত্যা করলেন। ইয়ামেন এক দুরাচারের হাত থেকে রক্ষা পেল।

রোমানদের মোকাবিলার জন্য হযরতের প্রস্তুতি ঃ মুসলমান এবং রোমানগণ উভয়পক্ষই জানতেন দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। বহু পূর্বে রোমানগণ মুসলমানদের কিছু স্থান দখল করে নিয়েছিল। রোমানগণ খুব ভালভাবেই জানত মুসলমানগণ যুদ্ধ করে জয়ের জন্য শুধু নয়, শহীদ হওয়ার জন্যও। সুতরাং রোমানগণ অপেক্ষা করছিল সুযোগের। হযরত তাদের সে সুযোগ দিলেন না।

তিনি অতি সত্বর জায়েদ বিন হারিসের পুত্র উসামার নেতৃত্বে একদল সেনাকে সিরিয়ার পথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। যায়েদ ছিলেন হযরতের মুক্ত ক্রীতদাস। কিন্তু মুতার যুদ্ধে তিনি তাকে তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজন ও সকল সঙ্গীর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন।

হযরত স্বয়ং আবুবকর ও ওমরের মতো অসাধারণ মানুষকেও উসামার মতো যুবককে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিলেন। তারা দ্বিধাহীন চিত্তে হযরতের আদেশকে মেনে নিলেন। "আমরা শুনলাম ও মানলাম" এটাই ছিল তাদের চরিত্রের মহত্ত্ব। যে কারণেই তারা একদিন মহান হয়েছিলেন। আজও মুসলমানগণ ওইরূপ মহান হবেন যদি ওইরূপ চরিত্রের পূর্ণ অধিকারী হন। কিন্তু নেতা ও অনুসারীদের সমান চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। মহামান্য যায়েদ ও উসামা একদিনও নেতৃত্বের আসনে বসেননি, শুধু তাদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্য। একমাত্র তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন। তাই যিনি সম্মান দিতে জানেন তিনি সম্মান পেতেও জানেন। ইসলামের মর্মবাণী—

যে-মানী সে একদিন মানিয়াছে বহুমানী
অপরে মানিয়া করি আপনারে সম্মানী।

হযরত মহম্মদ (দঃ) উসামাকে নির্দেশ দিলেন বালকা সীমান্তের পাশ দিয়ে পেলেস্তাইনের ভিতর দিয়ে মুতার কাছাকাছি স্থানে শত্রু সীমান্তে প্রবেশ করার জন্যে। যেখানে তাঁর পিতা শহীদ হয়েছিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন—প্রভাতে শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য এবং ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁদের বিজয়ী করেন। কিন্তু জয়ের পরই যেন দেশে ফেরে।

আরবদের নীতি অনুযায়ী উসামা মদিনা থেকে কিছু দূরে জুরক নামক স্থানে তার প্রস্তুতি পর্ব সমাধা করার জন্য স্থির করলেন।

অন্তিম শয্যায় হযরত মহম্মদ (দঃ) ঃ যখন যুদ্ধ প্রস্তুতি সমানে চলছে, সেনাবাহিনী একের পর এক জুরকে হাজির হচ্ছে, ঠিক ঐ সময় ১১ হিজরীর দ্বিতীয় মাস সফরে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর অসুখের মূল কারণ ছিল অতীতের বিষক্রিয়ার ফল। খাইবারে তাঁকে এক ইহুদিনী নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর সময় খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেন। খাদ্যবস্তু মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা বুঝে ফেলে দিয়েছিলেন তবুও সামান্য জের তঁার শরীরে থেকে গিয়েছিল। প্রথমে জ্বর ও মাথাব্যথা আরম্ভ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কাজ ঠিক নিয়মমাফিক করে যেতে থাকেন। তিনি আজ নিজেও অনুমান করে নিয়েছেন—তাঁর শেষ সময় আগত-প্রায়।

এই বিষক্রিয়ার ফল তাঁকে শেষ পর্যন্ত এমনভাবে জর্জরিত কবে তুলেছিল যার ফলে তিনি ঠিকমত ঘুমাতে পর্যন্ত পারতেন না। অসুখের চতুর্থ দিনে তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মুসলিম গোরস্থানে শেষবারের মতো কবর জিয়ারৎ করার মনস্থ করলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন—"আমাকে আদেশ করা হয়েছে যারা মারা গেছে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করতে।" সঙ্গীরা সকলে তাঁর সঙ্গে গেলেন, তিনি সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। হযরত জীবনে তাঁর কোন সঙ্গীকে ভোলেননি, এমনকি যাঁবা মারা গেছেন তাঁদেরও। যে সমস্ত সঙ্গী বেঁচেছিলেন শুধু তাদের প্রতিই নয়, যাঁরা মারা গিয়েছিলেন তাঁদের প্রতিও তাঁর কর্তব্য জীবনের শেষ মুহূর্তেও ভুলে যাননি। তাই মনুষ্যসমাজ, সমগ্র মানবমণ্ডলী আজও এমন একটি 'মানব বন্ধু' পাননি।

হযরত কবর জিয়ারৎ শেষ করে সঙ্গীদের বললেন—"আমাকে বিশ্ব ধনভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হয়েছে, তা ভোগ করার পূর্ণ অধিকারও দেওয়া হয়েছে, পরিশেষে জান্নাত বাস। কিন্তু আমি তা অপছন্দ করেছি, শুধু গ্রহণ করেছি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ ও স্বর্গ।"

পরদিন হযরত বিবি আয়েশার ঘরে গেলেন। বড্ড মাথার যন্ত্রণার কথা তাঁকে বললেন। এছাড়া প্রায়ই বলছিলেন—"উঃ আমার মাথা, আমার মাথা"। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তিনি একেবারেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েননি। একের পর এক বিবির ঘরে যাচ্ছেন যাতে কারও মনে কোন দুঃখ না লাগে, তাছাড়া কারও কিছু বলার না থাকে। এভাবে পাঁচদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি তাঁর স্ত্রী মইমুনার ঘরে গেলেন। সেখানে তিনি নিজেকে এত বেশি দুর্বল বোধ করলেন—যেন ওঠার শক্তি নেই। তখন তিনি তাঁর সকল স্ত্রীকে ডাকলেন এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি তাঁর এই অসুস্থতার সময় কার ঘরে থাকবেন। সকলেই একমত হয়ে বললেন বিবি আয়েশার ঘরেতে। হযরত আলি ও চাচা আব্বাসও তাই মেনে নিলেন। তখন বহুকষ্টে তাঁকে আয়েশার ঘরে নেওয়া হলো।

তাঁর অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যেতে থাকল, কিন্তু তখনও তিনি মসজিদে যেতেন নামায পড়তে। যত দিন যেতে লাগল—তিনি জনরবে শুনতে পেলেন—তিনি একজন যুবককে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আনসার ও মহাজেরদের নেতা নিযুক্ত করেছেন। ঠিক এ সময়ে তাঁর নড়াচড়া করার বিশেষ শক্তি ছিল না। তবুও তিনি জনগণকে এই সন্দেহের মধ্যে রাখতে চাইলেন না। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীদের আদেশ দিলেন তাঁর মাথাতে সাত মসক পানি ঢালার জন্য। তাঁরা তাই করলেন। তখন তিনি বললেন—"যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট

হয়েছে।" তিনি শরীরে কাপড় জড়ালেন, মাথাতে কাপড় বাঁধলেন এরপর মসজিদে গেলেন এবং নিজস্থানে বসে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, শহীদদের জন্য প্রার্থনা করলেন, তারপর বললেন—

"হে মানববৃন্দ! তোমরা উসামার অভিযানকে সফল কর। আমার জীবনের শপথ, যদি তোমরা তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কিছু বল, এই একই কথা তোমরা বলেছিলে তাঁর পিতার বিরুদ্ধেও। আজকের এই নেতৃত্বের জন্য উসামা অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তি, যেমন তার পিতাও ছিল।"

এরপর তিনি কিছু সময়ের জন্য চুপ থাকলেন। তারপর পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন—"এখানে একজন আল্লাহর দাস আছে, যাকে আল্লাহ্ দুটো জিনিসের যে কোন একটি পছন্দ করার অধিকার দিয়েছেন। একটি ইহজীবন ও অন্যটি পরজীবন বা আল্লাহর সঙ্গলাভ। দাস দ্বিতীয়টি পছন্দ করেছে।" তিনি আবার নীরব হয়ে গেলেন। তখন সকলেই বিভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বিচক্ষণ হযরত আবুবকর বুঝতে পারলেন এ দাস আর অন্য কেউ নয়, হযরত মহম্মদ (দঃ) স্বয়ং। আবুবকর তখন নিজেকে বেশিক্ষণ স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। "না, আমরা আমাদের জীবন ও সন্তানদের তোমার জন্য দান করব"। হযরত মহম্মদ (দঃ) আবুবকরের মধ্যে বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন, এবং বললেন—মসজিদের সকল দরজা বন্ধ করে দাও একমাত্র আবুবকরের দরজা ছাড়া। "আমি জানি না, সে (আবুবকর) অপেক্ষা আরও উত্তম সঙ্গী আমার আছে কিনা। আমি যদি জীবনে কোন মানুষকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবুবকরকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌কেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছি।"

এবার হযরত আয়েশার গৃহে প্রত্যাবর্তন করার মনস্থ করে বলতে থাকলেন—"হে মহাজেরিনগণ, আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি সকল ভাল কাজে আনসারদের সাহায্য করার জন্য। কেননা সময়ের সঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে কিন্তু আনসারের সংখ্যা কমতে থাকবে। তারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, সুতরাং তাদের ভাল কাজের প্রতিদান ভাল কাজ দ্বারা করে যাবে। তাদের ভুল-ভ্রান্তি লক্ষ্য করো না।"

এরপর স্থান ত্যাগ করে বিবি আয়েশার ঘরে এলেন। এ বক্তৃতাও তাঁর শরীরকে যথেষ্ট আলোড়িত করেছিল। যার ফলে তাঁর অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। তবুও তিনি মসজিদে যেতে চাচ্ছিলেন—শুধুমাত্র সকলকে বলার জন্য—তারা যেন একত্রিত থাকে, ছত্রভঙ্গ না হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মসজিদে যাওয়ার শক্তি একেবারেই রহিত হয়ে গেল। তখন তিনি আদেশ দিলেন আবুবকর তাঁর পরিবর্তে মসজিদে নামায পড়াবেন।

একবার তিনি বলেছেন—জীবনে কোন মানুষকে বন্ধু করলে আবুবকরকেই গ্রহণ করতেন, আবার আজ আদেশ দিলেন আবুবকর আজ তাঁর পরিবর্তে নামায পড়াবেন। এ সমস্ত থেকেই বোঝা গেল হযরতের পর আবুবকরই মুসলিমদের নেতা।

আবুবকরের কন্যা হযরতের স্ত্রী বিবি আয়েশা বারবার হযরতকে নিষেধ করলেন তাঁর পিতা আবুবকরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত না করতে। কেননা তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়। কোরআন শরীফ পাঠকালে প্রায়ই কেঁদে ফেলতেন। বিবি আয়েশা তিনবার অনুরোধ

করলেন, কিন্তু হযরত তিনবারই তাঁর নির্দেশ বলবৎ রাখলেন। একদিন আবুবকর হাজির না থাকায় ওমর নামায পড়াচ্ছিলেন। হযরত তাঁর হুজরা থেকে গলার স্বরে বুঝতে পারলেন আবুবকর সেখানে নেই। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "আবুবকর কোথায়?" তখন জনগণ বুঝতে পারলেন—হযরত মহম্মদ (দঃ) আবুবকরকেই তাঁর পরবর্তী খলিফারূপে চান।

প্রায় দু'সপ্তাহের ওপর কেটে গেল, হযরতের অবস্থা ক্রমে অবনতির দিকে এগিয়ে গেল। তাঁর কন্যা ফাতেমা প্রত্যহ পিতাকে দেখতে আসতেন। পিতা অপত্য স্নেহে কন্যাকে চুম্বন করতেন। যখন তিনি একদিন ভীষণ পীড়িত তখন ফাতেমা এলে হযরত তাকে চুম্বন দিলেন এবং কানে কানে কিছু বললে ফাতেমা কেঁদে উঠলেন। আবার হযরত কানে কানে কথা বললেন। তখন তিনি হেসে উঠলেন।

হযরতের জীবনাবসানের পর বিবি আয়েশা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ওই কান্না ও হাসির পিছনে কি লুকিয়ে আছে? ফাতেমা উত্তর দিলেন—"প্রথম বার তিনি আমাকে বলেছিলেন এ অসুখ থেকে তিনি আর কোনদিন আরোগ্য লাভ করবেন না। তাই আমি কেঁদেছিলাম। দ্বিতীয় বার তিনি আমাকে বলেছিলেন—আমিই আমার বংশের মধ্যে তাঁর সঙ্গে সর্বপ্রথম মিলিত হবো। এই কথা শুনেই আমি হেসেছিলাম।" সুতরাং ইসলামের চোখে মৃত্যু শুধু কান্নার বস্তু নয়, হাসিরও বস্তু। সেই বিষক্রিয়ার ফলে দাহ ও জ্বর ভীষণভাবে ভোগ করেছিলেন। নিজের হাতকে তিনি ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে রেখে বারবার তা আপন মুখমণ্ডলে বোলাতে লাগলেন যাতে উত্তাপ কমে যায়।

একদিন যখন তিনি এই অবস্থায় তখন তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন—"এখানে এসো আমি তোমাদের কিছু লিখতে বলবো—যাতে তোমরা বিভ্রান্তিতে না পড়।" উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ বলেন তাঁর উক্তি ছিল—"আল্লাহর নবী যন্ত্রণায় ভুগছেন এবং তোমাদের নিকট আছে কোরআন, আল্লাহর কেতাবই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। অন্যান্যরা আরও কিছু লিখতে চাচ্ছিলেন তখন তিনি দেখলেন তারা এ নিয়ে মতবিরোধ বা কলহ করছে তখন তিনি বললেন—তোমরা যাও, আমাকে একাকী একটু থাকতে দাও।"

এর মধ্যে উসামা ও তাঁর সৈন্যবাহিনী মদিনায় ফিরে এসেছেন কিন্তু তখন হযরতের অবস্থা অত্যন্ত জটিল। উসামা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। হযরত তাঁর হস্ত উসামার মাথার ওপরে রেখে তাকে আশীর্বাদ অনুমোদন করলেন নেতৃত্বের জন্য।

হযরতের পরিবারের সকলের ধারণা হয়েছিল তিনি নিউমোনিয়া রোগে ভুগছেন, তাই তারা তাঁর জন্য কিছু ওষুধ তৈরি করলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। যখন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন তখন তারা ওই ওষুধ তাঁর গলায় ঢেলে দেন। কিন্তু যখন তিনি চেতনায় ফিরে এলেন তখন তিনি সকলকে ওই ওষুধ গ্রহণ করতে বললেন তাদের অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ।

জীবনের এই অন্তিম লগ্নে হযরতের নিকট মাত্র ৭ দেরহাম ছিল তাও তিনি গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। তিনি জাগতিক কোন সম্পদ পেছনে রেখে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে চান না।

সামান্য আরোগ্য লাভ ঃ ১১ হিযরীর ১১ রবিউল আউওয়াল, রবিবার, রাতটি ছিল হযরতের জীবনের শেষ রজনী। জ্বর কিছুটা কমে এল। সকালে তিনি তাঁর মাথাকে বাঁধলেন

এবং আব্বাসের সাহায্যে আয়েশার ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে গেলেন। আসলে বিবি আয়েশার ঘর ও মসজিদের মধ্যে তেমন একটা ব্যবধান ছিল না। মাঝে ছিল একটি কাদার দেওয়াল মাত্র। আবুবকর তখন নামায পড়াচ্ছিলেন।

মুসলমানগণ সকলেই তখন নামাযে। যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন—হযরত বাইরে এসেছেন, তখন তাদের আনন্দের কোন সীমা ছিল না। তারা নামায প্রায় ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম করেছিলেন। আবুবকর বুঝতে পেরেছিলেন কোথায় যেন কি হচ্ছে, তাই তিনিও ইমামতি ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম করেন। তখন হযরত তাঁর শরীর স্পর্শ করে তাঁকে নামায চালিয়ে যেতে ইঙ্গিত করেন। হযরত আবুবকরের পাশে বসে নামায সমাধা করেন। এরপর সজোরে কিছু বক্তব্য রাখেন—

"হে মানবমণ্ডলী! দোজখের আগুন দাউ দাউ করছে, তোমাদের ঈমানের মধ্যে নানা বাধা-বিঘ্ন রাতের অন্ধকারের মতো আসছে, আল্লাহর শপথ আমি তোমাদের বলছি—তোমরা কখনও আমাকে ওই রূপ জিনিসে ভূষিত করো না, যার আমি যোগ্য নই। আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই আমি এমন কোন জিনিসকে বৈধ বলে বর্ণনা করিনি, যাকে কোরআন অবৈধ বলেছে। এমন কোন জিনিসকে অবৈধ বলিনি যাকে কোরআন বৈধ বলেছে। আল্লাহর অভিসম্পাত তাঁদের ওপর যারা গোরকে মসজিদরূপে গ্রহণ করে।" আজকের অধিকাংশ পীরগণ এ কথার তাৎপর্য অনুধাবন করবেন কি?

মুসলমানদের আনন্দ অনুভব ঃ মুসলমানদের ধারণা হলো এবারের মতো হযরতের বিপদ হয়তো কেটে গেল। উসামা এলেন এবং হযরতের অনুমতি চাইলেন সিরিয়া অভিযানের জন্য। আবুবকর হযরতকে অভিনন্দন জানালেন এই বলে যে, "হে আল্লাহর নবী, আমরা যেমন আশা করি আল্লাহর রহমতে সেইরূপই আপনাকে আজ ভালরূপে দেখছি এবং আশা করি রহমতে খোদা আপনি সেরে উঠবেন।" এ অবস্থায় আবুবকর মহানবীর অনুমতি চাইলেন মদিনার বাইরে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে আনার জন্য। ওমর ও আলি তাঁদের আপন কাজে বেরিয়ে গেলেন। মুসলমানগণ সকলেই যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। হযরত আয়েশার ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

হযরতের মাথা তখন আয়েশা বিবির কোলে ছিল। দাঁতন হাতে যখন কোন ব্যক্তি এলেন তখন তিনি ইঙ্গিত করলেন দাঁতনের দিকে। আয়েশা দাঁতন নিয়ে তাঁর জন্য ওকে নরম করে দিলেন। হযরত তাঁর মুখ পরিষ্কার করে বললেন—"হে আল্লাহ্, মৃত্যু-যন্ত্রণায় আমাকে সাহায্য কর।" বিবি আয়েশা বলেন—"আমার মনে হতে থাকল, তিনি যেন আমার কোলে খুব ভারী হয়ে উঠলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম, যখন তাঁর চক্ষুযুগল ওপরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার কিছু পরে তিনি বললেন—

"না, (আমি পছন্দ করেছি) জান্নাতে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য ; তুমি বল আমি কি আমার পছন্দ ঠিক করেছি? হ্যাঁ, আপনি ঠিক করেছেন—আমি তাঁর নামে শপথ করে বলছি—যিনি আমাকে সত্য-সহ পাঠিয়েছেন।"

এ কথাগুলো ছিল হযরত মহম্মদ (দঃ) ও মৃত্যুদূত আজরাইলের মধ্যে কথোপকথন। হযরতকে দুটোর মধ্যে যে কোন একটি জিনিসকে পছন্দ করতে দেওয়া হয়েছিল—

রোগ থেকে আরোগ্য লাভ বা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ। হযরত পছন্দ করলেন—জান্নাতে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ।

আল্লাহ্ও হযরতের পছন্দ গ্রহণ করলেন, যিনি চির প্রশংসিত।

শেষদিন সোমবার ঃ দিনের তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়। মহানবী বারবার অচেতন হয়ে পড়তে থাকলেন। চেতনালাভের সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকলেন—"হে আমার পরমবন্ধু, হে আমার একান্ত সাহায্যকারী।"

হযরত আলিকে সম্বোধন করে সকলের প্রতি মহানবীর শেষ সতর্কবাণী ঃ

"সাবধান দাস-দাসীদের প্রতি নির্মম হবে না।"

হযরত আয়েশার কোলে মহানবীর শেষ বাণী ঃ সাবধান! নামায, নামায। সাবধান! তোমাদের দাস-দাসী, গরিব মানুষ।

শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঃ "হে আল্লাহ্, হে আমার পরম বন্ধু।" এই বলে ৬৩ বছর বয়সে মহানবী আল্লাহ্পাকের দীদার লাভের জন্য ৬৩২ খ্রীঃ ৭ জুন, ১২ রবিউল আওয়াল, সোমবার (এন্তেকাল) পরলোকগমন করলেন। 'ইন্না লিল্লাহে, ওয়া ইন্না ইলাই হে রাজেউন।" নিশ্চয়ই সমস্ত কিছুই আল্লাহর জন্য এবং সমস্ত কিছুই তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত।

সমগ্র জীবনকাল ২২, ৩৩০ দিন ৬ ঘণ্টার মতো। শেষ হলো সারা বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জীবন-কাল।

আজ মদিনাতুন্ নবী অর্থাৎ নবীর শহর (মদিনা) নবীবিহীন হলো।

মহানবীর জানাজা নামায ঃ মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যায় জানাজা নামায সম্পন্ন করে মহানবীকে সমাধিস্থ করা হলো—তাঁর প্রিয় শহর মদিনার বুকে। মুসলিম জাহানের এই একটিই জানাজা নামায, যে নামাযে কোন ইমাম ছিলেন না। মহানবী চির শান্তিতে চির নিদ্রায় আপন ঘরে শুয়ে থাকলেন। এবং মানুষ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তাঁর শয্যা-পাশে দোয়া-খায়ের করে বেরিয়ে আসছিলেন। এই ভাবেই মহানবী (সাঃ)-এর জানাজা নামায সম্পন্ন হয়।

দরুদ ঃ

মানব সমাজে এক ফুটেছিল ফুল
শেষনবী শ্রেষ্ঠ নবী মহম্মদ রসুল।
ধরণীতে এসেছিলে দূতরূপে যাঁর
ঝরুক তোমার উপর রহমত্ তাঁহার।

চতুর্থ পর্ব

পরিশিষ্ট

মহানবীর ওফাতে শোকবিহ্বল আরব

মদিনায় হাহাকার ঃ এই শহরের একদিন নাম ছিল—'ইয়াসরিব'। মহানবীর আগমনের পর মহানবীর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসেবে শহরবাসী শহরের নাম দিলেন—'মদিনাতুন নবী'। অর্থাৎ নবীর শহর। আজ সেই নবীর শহর নবীবিহীন। যে শহর একদিন নবীকে আশ্রয় দিয়েছিল, যে শহর একদিন সবকিছুকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করে ইসলামের চারাগাছটিকে লালন-পালন করেছিল—নবীরই সম্মানে, আজ সেই শহর নবীবিহীন। আজ সারা মদিনা মনের অব্যক্ত অপরিসীম যন্ত্রণায় হাহাকার করে উঠল। আবালবৃদ্ধ-বনিতা, জীবজন্তু-পশুপক্ষী-বৃক্ষ-লতাপাতা সকলের হাহাকার ধ্বনি আকাশে-বাতাসে প্রকৃতির মর্মে মর্মে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। আজ মহানবী নীরব। আজ মহান আল্লাহ্ও নীরব। তিনি আর কোনদিনই তাঁর সৃষ্টি নিখিল বিশ্বের প্রতি মুখ খুলবেন না। চিরদিনের জন্য আজ ওহীর (ঐশী বাণী) দরজা বন্ধ হলো। সমগ্র শোকবিহ্বল আরব যেন বলে উঠল—হে মহামানব, হে মহানবী! তোমার আগমন ও অন্তর্ধান—(রেসালতের নবুয়তের) গৌরবজনক গুরুদায়িত্বের সম্মানজনক সমাধান।

আয়েশার বিলাপ ঃ "হায়, যিনি ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক, যিনি মানুষের মঙ্গল-চিন্তায় পূর্ণ এক রাত্রিও বিছানায় শয়ন করেননি, তিনি চলে গেলেন। মানুষের জন্য যিনি সম্পদ ত্যাগ করে দৈন্যকে বরণ করেছিলেন, তিনি চলে গেলেন। হায়, সেই মহান নবী, যিনি ধর্মের জন্য সকলের সকল অসঙ্গত আঘাতকেও পরম ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করেছিলেন, তিনি চলে গেলেন। যিনি জীবনে একটি অন্যায়ও করেননি, শত অত্যাচারেও যাঁর হৃদয়কে কোন মলিনতাই স্পর্শ করতে পারেনি, যিনি কোন অভাবগ্রস্তকেই একবারও জীবনে না বলেননি, তিনি আজ চলে গেলেন। হায়, সেই দয়ার নবী, সত্য প্রচারের অপরাধে যাঁর দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। যাঁর সুন্দর পবিত্র ললাটকে রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছিল এবং সেই অবস্থাতেও যিনি মানুষকে অভিশাপ দেওয়া দূরের কথা, আশীর্বাদ করতে ভোলেননি, তিনি আজ চলে গেলেন। হায়, করুণার দূত, যিনি দু'বেলা শুকনো রুটিও খেতে পারেননি মানুষের চিন্তায়, তিনি আজ চলে গেলেন।" সমগ্র আরব যেন শোকের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

হযরত আবুবকরের শোকাবেগ ঃ মহানবীর আজন্ম সঙ্গী হযরত আবুবকর বিবি আয়েশার গৃহে ঢুকলেন। হযরতের মুখের চাদর তুলে হা-হা করে বলতে লাগলেন, প্রভু হে! আবুবকরের সবকিছু তোমার নামে উৎসর্গ হোক, এ মরণের পর আর মৃত্যু নেই। জীবনে যেমন মিষ্টি ছিলে, মরণেও তাই রয়ে গেলে। হায় ওহীর (ঐশী বাণী) দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর দু' গাল বয়ে অশ্রুধারা সমানে ঝরতে থাকল, তিনি মহানবীর ললাটদেশে চুম্বন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চারিদিকে অসংখ্য মানুষ শোকে বিহ্বল। কেউ বা বাক্যহারা, কেউ বা জ্ঞানহারা, কেউ বা পথহারা, মহানবীকে হারিয়ে সকলেই যেন সর্বহারা হয়ে গেছেন।

হযরত ওমর জ্ঞানহারা ঃ বহু লোকের মধ্যে হযরত ওমর উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে দণ্ডায়মান, এবং সতর্ক করছেন সকলকে—"মহানবী মরেণনি, যে বলবে তিনি মারা গেছেন, আমি তাকে মুণ্ডহীন করব।" ধীরমতি আবুবকর দেখলেন অবস্থা ভীষণ গুরুতর, তিনি সকলের মধ্যে দাঁড়ালেন, এবং হাম্‌দ—না' আতের (আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রশংসা) পর বললেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মহম্মদ (দঃ)-এর এবাদত করত, সে জানুক, মহম্মদ (দঃ) নিশ্চয়ই মারা গেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত করত সে জানুক, আল্লাহ্ জীবিত, তিনি মরেন না। স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন—'মহম্মদ (দঃ) একজন দূত ব্যতীত কিছু নন, তাঁর পূর্বেও বহু দূত অতীত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান, বা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা (আল্লাহর পথ হতে) বিমুখ হবে। হ্যাঁ, যারা বিমুখ হবে, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এবং আল্লাহ্ সত্বর কৃতজ্ঞ লোকদের প্রতিদান দেন। আল্লাহ্ আরও বলেন—হে মহম্মদ, তোমাকে ও তাদের সকলকেই মরতে হবে।"

এই কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই জ্ঞান ফিরে এল, বিশেষ করে হযরত ওমরের মতো মানুষও সম্বিৎ ফিরে পেলেন। স্বয়ং তিনি বলেন, আবুবকরের মুখে আল্লাহর এই পবিত্র আয়াতগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর অবশ হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। বসে পড়লাম। শোকবিহ্বল সমগ্র আরব যেন কথাগুলোকে নতুন ভাবে অনুধাবন করলেন। মানুষ-নবী এসেছিলেন মানুষের জন্য, এবং "প্রত্যেক মানুষই মরণশীল"। কোরআন—২১ ঃ ৩৫, ৫৫ ঃ ২৬-২৭

মহানবীর বিবাহ

হযরতের বিবাহ ঃ হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বিয়ে সম্পর্কে নানা জনের নানা কথা শোনা যায়। তবে সমস্ত বিতর্কের এককথায় উত্তর, হযরত তাঁর জীবনে যা কিছুই করেছেন শুধু বিবাহই নয়, সমস্ত কিছুই করেছেন এক ইসলামের সেবায়, মানবতার জন্য, মনুষ্যত্বের উন্নতির জন্য। এর বাইরে তিনি সমগ্র জীবনে এক পা-ও ফেলেননি। যারা হযরতের বিয়ে নিয়ে নানা কটাক্ষ করে, মাতামাতি করে তারা আর যাই করুক হযরতের জীবনকে একদিনের জন্যও মর্মে মর্মে অনুধাবন করেনি বা করতে সক্ষম হয়নি। যে বা যারাই হযরতের জীবনকে একবার অনুধাবন করতে পেরেছে, সে বা তারাই শতবার শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়েছে তাঁর জীবনেব প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি পদক্ষেপে।

হযরতেব প্রথম বিয়ে হলো তাঁর ২৫ বছর বয়সে, তাও একজন ৪০ বছরের বিধবাকে। এরপব তিনি যত বিয়েই করুন না, সব বিয়েই ৫০ বছরের পর ৬০ বছব পর্যন্ত। এ সময়কাব যে কোন বিয়েকেই খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে সবকটা বিয়েই করেছেন শুধু বিয়ের জন্য নয়, বরং পেছনে ছিল এর অন্য মহৎ কারণ। কোথাও শত্রুতা কমানো, কোথাও বা মিলন ঘটানো দু'দলেব মধ্যে, কোথাও বা বিধবাকে রক্ষা করা, কোথাও বা আদর্শ স্থাপন করা ইত্যাদি নানা কারণ। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় তাঁর যে চার খলিফা, তাদের দু'জনের কন্যা গ্রহণ করলেন, বাকি দু'জনকে কন্যা দান করলেন অর্থাৎ সকলকে নিয়ে যেন একটি পরিবার গঠন করলেন। এ ভাবেই তাঁর বিয়েগুলো এক-একটা কারণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছিল যে কারণের মূলেই ছিল একমাত্র ইসলাম প্রচার।

মহানবী যাঁদের বিবাহ করেছিলেন ঃ

স্ত্রীর নাম		বিধবা/কুমারী	স্ত্রীর বয়স	মহানবীর বয়স
১। বিবি খাদিজা	(রাঃ)	বিধবা	৪০ বছর	২৫ বছর
২। " সওদা	"	বিধবা	৭০ ,,	৫৩ ,,
৩। " আয়েশা	"	কুমারী (নাবালিকা)	৭ ,,	৫৪ ,,
৪। " হাফসা	"	বিধবা	৪০ ,,	৫৬ ,,
৫। " যযনাব	"	বিধবা	৪১ ,,	৫৫ ,,
৬। " উম্মে সালমা	"	বিধবা	৩৮ ,,	৫৭ ,,
৭। " যয়নাব	"	তালাকপ্রাপ্তা	৩৭ ,,	৫৮ ,,
৮। " জাবিয়া (ইহুদী)	"	বিধবা	৩৯ ,,	৫৮ ,,
৯। " উম্মে হাবিবাহ	"	বিধবা	৪০ ,,	৬০ ,,
১০। " ময়মুনা	"	বিধবা	৪৬ ,,	৫৯ ,,
১১। " সাফিয়া (ইহুদী)	"	বিধবা	৪২ ,,	৬০ ,,
১২। " মরিয়ম (খ্রীস্টান)	"	বিধবা	৪০ ,,	৬০ ,,
১৩। " রায়হানা (ইহুদী)	"	বিধবা	৪১ ,,	৬০ ,,

নিখিল জগতের দুর্গত রমণীকুলের অচিন্তনীয় ঐতিহাসিক ত্রাণকারী মানব, যিনি তাঁর সমস্ত শক্তির অর্ধেকটা নিযুক্ত করেছিলেন সারা সৃষ্টিজগতের কল্যাণের জন্য, দুর্গত মানুষের জন্য, বাকি অর্ধেকটাই নিয়োগ করেছিলেন শুধুমাত্র মায়ের জাতি অবহেলিত, নির্যাতিত নারী সম্প্রদায়ের জন্য, এখন আমরা লক্ষ্য করব—কি কারণে কোন মহান উদ্দেশ্য সাধনে এই মহামানব ওই অবহেলিত নিরুপায় বিধবাদের আপন স্ত্রীর সম্মান দান করে চির অমর করে গেছেন।

প্রথম বিবাহ খাদিজার সঙ্গে ঃ এই পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে এই বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তখন হযরতের বয়স মাত্র ২৫ বছর। অর্থাৎ পূর্ণ যুবক। খাদিজার বয়স তখন ছিল ৪০ অর্থাৎ বিগত যৌবনা। শুধু তাই নয়, এর পূর্বে তাঁর দু'বার বিয়েও হয়েছিল। এ বিয়ের ব্যাপারে বিবি খাদিজাই প্রথম প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। হযরত কম বয়স্ক অর্থহীন যুবক অন্যদিকে বিবি খাদিজা বেশি বয়স্কা ধনবতী মহিলা। দূরদর্শী হযরত এ প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করে খাদিজাকে বিয়ে করলেন। হযরতের ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁরা সুখেই সংসার করলেন। তখন বিবি খাদিজার বয়স ৬৫ বছর। অর্থাৎ ১৫ বছর পূর্বেই ৫০ বছর বয়সে বিবি খাদিজা সন্তান সম্ভবা হওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, তখন হযরতের বয়স ছিল মাত্র ৪০ বছর। এই ৪০ বছর বয়স থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত হযরত অন্য বিয়ের কথা একদিনও চিন্তা করেননি। এমনকি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিবি খাদিজাকে অতি শ্রদ্ধাভরেই স্মরণ করতেন।

একজন বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে জীবনের দীর্ঘ সময়কাল অতিবাহিত করলেন কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি অন্য মহিলাকে বরণ করার কথা চিন্তাও করেননি। অথচ আরবে তখন কোন বিধিবিধান ছিল না, যার যা খুশি সে তা-ই করতে পারত।

দ্বিতীয় বিবাহ সওদা বিনতে জামার সঙ্গে ঃ যখন বিবি খাদিজা মারা যান তখন হযরতের সঙ্গে তাঁর দুই অবিবাহিত কন্যা। তিনি তখন কোন কুমারীকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে বিয়ে করলেন বিধবা সওদাকে। যিনি ছিলেন বৃদ্ধা। স্বামী সাফরা বিন আমরের সঙ্গে আবিসিনিয়ায় এসেছিলেন। একটা পুত্রও ছিল। যার নাম ছিল আবদুর রহমান। তিনি এই বৃদ্ধা বিধবাকে বিয়ে করলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন অসহায়া মুসলমান রমণী। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর দাম্পত্য অধিকার (রাত্রির পালা) বিবি আয়েশাকে দান করেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহ আয়েশা ও হাফসার সঙ্গে ঃ আয়েশা ও হাফসাকে বিয়ে করার প্রধান কারণ ছিল সম্পর্কটাকে মজবুত করা, যাতে ইসলাম প্রচারে সুবিধা হয়। যার জন্য হযরত আপন কন্যা দান করলেন হযরত ওসমান ও হযরত আলিকে। আয়েশা কুমারী হলেও হাফসা ছিলেন বিধবা। তাঁর স্বামী খানায়িস বদব যুদ্ধে নিহত হন। তখন ওমর কন্যা হাফসাকে আবুবকর ও ওসমান দু'জনকেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিয়ে করার জন্যে, কিন্তু তারা এ প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় হযরত নিজে এঁকে বিয়ে করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

৭ বছর বয়সে আয়েশার বিয়ে হয়, ৯ বছরে হযরতের নিকট আসেন। তাঁর ১৮ বছর বয়সে হযরত মারা যান।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিবাহ যয়নাব বিনতে খোজাইমা ও উম্মে সালমা আবি উমাইয়ার সঙ্গে ঃ যয়নাবের স্বামী আব্দুল্লাহ বিন জাহাস ওহোদ যুদ্ধে নিহত হন। তখন হযরত বিধবা যয়নাবের ভার নিজে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি কিছুদিনের মধ্যেই মারা যান। উম্মে সালমাও ছিলেন আবু সালমার বিধবা পত্নী। তিনি ওহোদ যুদ্ধে ভীষণভাবে আঘাত পান ও চতুর্থ হিজরীতে মারা যান। তখন হযরতের বয়স ৫৭ বছর। এই সময় উম্মে সালমাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এই সময় ৭৭ জন ধর্মীয় শিক্ষক যখন একসঙ্গে শহীদ হলেন তখন ওই সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষকদের বিধবা পত্নীদের মধ্যে অনেককেই পত্নীতে বরণ করতে হয়েছিল। কেননা তাদেরকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হযরত কোন দিক দিয়েই মেনে নিতে পারেননি। এক তাদের ভরণপোষণ করা, অন্যদিকে তাঁদের যৌবনকে সুরক্ষিত করা। কেননা মুসলমান নর-নারী যে কেউ অবৈধভাবে মেলামেশা করলে তাদের শাস্তি ছিল একশ ঘা দোররার আঘাত অর্থাৎ প্রাণান্তকব অবস্থা। সুতরাং হযরত বহুদিক্ বিবেচনা করেই তবে এ সমস্ত বিয়ে করেছিলেন। একদিকে তাঁদের মর্যাদা দেওয়া, অন্যদিকে তাঁদের আজীবন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া। তখনকার দিনে নারীদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল পিতা বা স্বামী।

সপ্তম বিবাহ যয়নাব বিনতে জাহাসের সঙ্গে ঃ এই বিয়েটা নিয়ে অনেকে অনেক রকম কথা বলে থাকেন। তবে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁরা ঠিক মন্তব্যই করেন।

তখন আরবে প্রচলন ছিল উঁচু বংশ নীচু বংশকে বিয়ে করবে না। কিন্তু হযরত প্রচার করলেন সকল মুসলমানই সমান ভাই ভাই। এই দিক দিয়ে তিনি স্থির করলেন তাঁর অর্থাৎ আবদুল মোত্তালিব বংশের কন্যা যয়নাবের সঙ্গে হযরতের দাস (পরে পালিত পুত্র) যায়েদ বিন হারিসের বিয়ে দেবেন। হযরত তাঁর পালিত পুত্র যায়েদকে বললেন যয়নাবকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু যায়েদ ভয় করলেন। তবুও হযরতের ইচ্ছাকে যায়েদ ও যয়নাব উভয়ই অগ্রাহ্য করতে পারল না। বিবাহ হলো। কিন্তু পরিণতি ভালোর দিকে গেল না। যায়েদ যয়নাবের ব্যবহারে খুশি হতে পারলেন না। হযরতকে জানালেন, হযরত ধৈর্য ধরতে বললেন। কিন্তু কোন কাজ হল না। শেষ পর্যন্ত যয়নাবকে তালাক দিলেন। তখন স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা হযরতকে নির্দেশ দিলেন যয়নাবকে বিয়ে করার জন্য। কেননা যয়নাবের জীবন তখন মহাসমস্যায় পড়ল। যেহেতু তিনি ছিলেন খুব উঁচু বংশের মেয়ে, কিন্তু একজন ক্রীতদাসের পরিত্যক্ত পত্নী। সুতরাং কোন উচ্চ বংশজাত ছেলেও তাকে বিয়ে করল না। এদিক থেকেই চিন্তা করে হযরত যয়নাবকে রক্ষা করার জন্যই বিয়ে না করে কোন উপায় দেখলেন না। এর আরও একটি দিক ছিল, তখন আরবে প্রচলিত ছিল পালিত পুত্রের পরিত্যক্তা বা বিধবা পত্নীকে মালিক বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ্ বললেন পালিত পুত্র ও আপন পুত্র এক নয়। আপন পুত্রের স্ত্রী ও পালিত পুত্রের স্ত্রী এক নয়। তাকে তোমরা বিয়ে করতে পার। এই কুপ্রথাটিকে রদ করার জন্য আল্লাহ্ হযরতকে নির্দেশ দিলেন যয়নাবকে বিয়ে করার জন্য। "আল্লাহ্ কোন মানুষের দুটো হৃদয় সৃষ্টি করেননি। তোমরাও তোমাদের পত্নীগণের মধ্যে যাঁদের মাতৃ সম্বোধন করেছ, তাদেরকে (আল্লাহ্) তোমাদের মাতা করেননি এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এটা তোমাদের জন্য তোমাদের মৌখিক বাক্য মাত্র। আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন, তিনি সরলপথ প্রদর্শন

করেন। তোমরা ওদেরকে ওদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটাই ন্যায়সঙ্গত। যদি ওদের পরিচয় না জানো তবে ওদের তোমরা ধর্মীয় ভ্রাতা এবং বন্ধুরূপে গণ্য করবে। এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই কিন্তু এটা ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াময়।" কোরআন—৩৩ ঃ ৪-৫

এরপর থেকে যায়েদকে আর হযরতের নামের সঙ্গে ডাকা হতো না। তাঁকে যায়েদ বিন হারিস বলেই ডাকা হতো। আল্লাহ্ স্বয়ং হযরতের সঙ্গে যয়নাবের ফের বিয়ে দিলেন—

"স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ। তুমি তাকে বলেছিলে—তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিলেন। তুমি লোক ভয় করেছিলে অথচ আল্লাহ্‌কে ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নাবের সঙ্গে বিয়ে বিচ্ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে (যয়নাব) তোমার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে অবিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ-স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেইসব রমণীকে বিয়ে করার বিশ্বাসীদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়ে থাকে।"

কোরআন—৩৩ ঃ ৩৭

যয়নাবকে নিয়ে হযরত অত্যন্ত বিব্রত অবস্থায় পড়েছিলেন। একমাত্র সমাধানও বুঝতে পারছিলেন, যেহেতু ক্রীতদাস পরিত্যক্তা মেয়েকে কোন সম্ভ্রান্ত জনই বিয়ে করবে না, তবুও লোকভয় হচ্ছিল। আল্লাহ্ সমস্যার সমাধান করে দিলেন চিরতরে।

অষ্টম বিবাহ জারিয়ার সঙ্গে ঃ জারিয়া ছিলেন ইহুদী হারিস বিন দারাবের কন্যা। যিনি বানু মুস্তালিকের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। যখন হযরত মহম্মদ (দঃ) সকলকে মুক্তি দিলেন। হযরত তাঁদের প্রস্তাবমত উভয় গোত্রের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে জারিয়াকে পত্নীত্বে বরণ করে উভয় দলের মধ্যে এক আন্তরিক মধুর বন্ধনের সৃষ্টি করলেন। হযরত সবসময়ই যে কোন দিক দিয়েই বন্ধুত্ব পছন্দ করতেন। কখনও ঝগড়া বা যুদ্ধ বা শত্রুতাকে পছন্দ করা তো দূরের কথা, অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। মহামানব সমগ্র বিশ্বকে একটি পরিবারের মতো দেখতেন।

নবম স্ত্রী উম্মে হাবিবাহ্ ঃ উম্মে হাবিবাহ্ ছিলেন বিখ্যাত কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা এবং আবদুল্লাহ্ বিন জাহাসের স্ত্রী। আবদুল্লাহ সপরিবারে আবিসিনিয়াতে হিযরত করেন। সেইখানেই তিনি মারা যান। তখন আবু সুফিয়ান চরম নবী-বিদ্বেষী চূড়ান্ত শত্রু। সুতরাং মহিলার অন্য কোথাও যাওয়ার কোন পথ ছিল না। তাই মহানবীজী তাঁকে দাসী নয়, স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিবাহ দ্বারা হযরত মহম্মদ (দঃ) আবু সুফিয়ানের মতো দুর্ধর্ষ নেতার কূটনীতিকে মুসলমানের দিকে মোড় ফেরান। ইসলামের ইতিহাসে এর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। তখন উম্মে হাবিবাহ্ আবিসিনিয়াতে এবং হযরত মদীনাতে ; ইসলামে দূর ব্যবধান বিয়েতে বাধার সৃষ্টি করে না।

দশম বিবাহ ময়মুনার সঙ্গে ঃ ৪৬ বছরের ময়মুনা ছিলেন উম্মুল ফজলের বোন। উম্মুল ফজল ছিলেন—আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবের স্ত্রী। যখন মক্কা বিজয় হলো, তখন ময়মুনা মুসলমান হলেন। স্বয়ং আব্বাস হযরতকে অনুরোধ করলেন—হযরত ও কুরাইশদের মধ্যে প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় ও প্রবল করার জন্য ময়মুনাকে

বিবাহ করতে। হযরত অনুরোধ রক্ষা করলেন। ময়মুনা কুমারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন হাবিসের পরিত্যক্তো স্ত্রী এবং আবু রহমের বিধবা পত্নী। ময়মুনা ৫১ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ময়মুনা সম্পর্কে হযরতের চাচি ছিলেন।

একাদশ বিবাহ ইহুদিনী সাফিয়ার সঙ্গে ঃ সাফিয়া ছিলেন সম্ভ্রান্ত ইহুদী নেতা হুয়াই বিন আখতারের কন্যা এবং সম্ভ্রান্ত ইহুদী নেতা কেনানের পত্নী। কেনান খাইবারের যুদ্ধে নিহত হন। সাফিয়া বন্দিনী হিসেবে মুসলমানদের তাঁবুতে আসেন। তাকে মুক্তি দেওয়ার পর তিনি নিজে হযরতের পানিপ্রার্থিনী হলে হযরত উভয় গোত্রের মিলনহেতু তাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। কোন এক সময় হযরতের পত্নী হাফসা ও আয়েশা তাকে ইহুদী কন্যা বলে বিদ্রূপ করলে তিনি হযরতের নিকট অভিযোগ করেন। তখন হযরত তাঁদের ভর্ৎসনা করে বলেন—তাদের বলা উচিত, "আমরা সকলেই হারুণের বংশধর, হযরত মুসা আমাদের পিতৃব্য, হযরত মহম্মদ (দঃ) আমাদের স্বামী।" হযরত তাঁকে অন্যান্য স্ত্রীদের অপেক্ষা কম ভালবাসতেন না। মহানবী কোনদিনই এঁদেরকে ধর্মান্তরিতা হওয়ার জন্য কোন তাগিদ দেননি। পরে পরে তারা নিজেরাই হয়েছিলেন। কোরআন—৫ ঃ ৫

দ্বাদশ স্ত্রী বিধবা খ্রীস্টান মারিয়া, ত্রয়োদশ স্ত্রী ইহুদিনী রায়হানা ঃ আবিসিনিয়ার বাদশা খ্রীস্টান বিধবা মহিলা মরিয়মকে দাসীরূপে হযরতের নিকট উপহার স্বরূপ পাঠান। তখনকার দিনের নীতি অনুযায়ী কোন রাজা-বাদশার উপহার অন্যকে দেওয়া সেই বাদশার প্রতি অবমাননা দেখান। তাই হযরত মরিয়মকে নিজ পত্নীত্বে বরণ করে আবিসিনিয়ারাজের সঙ্গে এক অকৃত্রিম ভালবাসার বন্ধন স্থাপন করেন। এবং পরবর্তী সময়ে ইহুদিনী রায়হানাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এর গূঢ় তাৎপর্য ছিল, মহানবী (সাঃ) খ্রীস্টান ও ইহুদীদের সঙ্গে ভালবাসা ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য উদার প্রাণে, কত মুক্তমনে খ্রীস্টান ও ইহুদীদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই অসবর্ণ বিবাহগুলো ছিল তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাছাড়া ওই সময়ে ওই সমস্ত মহিলাদের বিবাহ করার অন্য কোন কারণ ছিল না। হিংসা-বিদ্বেষ জর্জরিত দুর্গত মানব-সমাজের মহাকাণ্ডারী মহানবী এই অসবর্ণ (Intercaste) বিবাহকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ রেখে ও উৎসাহিত করে বিশ্ব-সমাজের ভাবী মিলনকে ত্বরান্বিত করে গেছেন। কোরআন—৫ ঃ ৫

৫৩ বছর বয়স পর্যন্ত হযরতের মাত্র একজন স্ত্রী ছিলেন। পরবর্তী ৭ বছরে তিনি বাকি সকলকে বিবাহ করেন। এই বিবাহগুলি সম্পন্ন হয় শুধু ইসলাম প্রচারের সহায়ক হিসাবে। অষ্টম হিযরীতে যখন তাঁর বয়স ৬০ তখন বিবাহ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ ঃ

"এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, পিতৃহীনদের প্রতি তোমরা সুবিচার করতে পারবে না তবে নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দমত দুটো, তিনটে, চারটে বিয়ে কর। কিন্তু যদি আশঙ্কা কর যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে একটি মাত্র (বিয়ে করবে); অথবা (তাও যদি না পার তবে) তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী (অর্থাৎ অধিকারভুক্ত দাসীকে বিয়ে করবে); এতে অবিচার না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।" কোরআন—৪ ঃ ৩

তখনকার দিনে আরবে মানুষ কেনাবেচা হতো। আরব ধনীরা আরবের সুন্দরীদের প্রচুর টাকা দিয়ে কিনে নিত এবং তাদের স্ত্রীরূপে ব্যবহার করত। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কেউ

কেউ অসংখ্য মেয়েদাসী স্ত্রীরূপে রাখত। কিন্তু তাদের গৃহস্বামী জীবনে একবারও স্ত্রীরূপে ব্যবহার করত না, বা তাদের স্ত্রীর কোন মর্যাদাও দিত না। এ কারণে তখনকার দিনের মেয়েদের প্রতি যথেষ্ট অমানুষিক অত্যাচার করা হতো। গরিব যুবতী মেয়েরা কালা-বোবার মতো ওই অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হতো। নারীর প্রতি, নারীত্বের প্রতি এই অবমাননা ইসলাম আর সহ্য করল না। তাই কোরআন পরিষ্কার নির্দেশ দিল—তোমরা স্বাধীন নারীদের বিয়ে কর, কিন্তু কেউ চারটের বেশি বিয়ে করতে পারবে না। কেউ চারটের বেশি স্ত্রীও রাখতে পারবে না। তখন সকলেই বাধ্য হল চারটি স্ত্রী রেখে অন্যদের ছেড়ে দিতে, যাতে তারা স্ত্রী-জীবনের যথার্থ স্বাদ বা মর্যাদা পায়। কিন্তু হযরতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখা দিল। তিনি কোন স্ত্রীকেই ছাড়তে পারলেন না, কেননা—তাঁর বা নবীর পরিত্যক্ত স্ত্রীকে আর কারও পক্ষে বিবাহ করা সম্ভব ছিল না। তাঁর স্ত্রীদের ছেড়ে দেওয়ার অর্থই হলো ঐ স্ত্রীদের বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়া। সুতরাং তাঁর পক্ষে স্ত্রীদের ছাড়া সম্ভব হলো না। দ্বিতীয় কারণ, তিনি ছেড়ে দিলে বিবাদের সম্ভাবনাও ছিল। অথচ তাঁর প্রতিটি বিয়ের মূলে ছিল—মিলনের সেতু সৃষ্টি। তবে কোরআন তাঁকেও নির্দেশ দিয়ে দিল—তিনিও আর স্ত্রীদের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারবেন না। "এরপর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয়। এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়। যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মোহিত করে, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"

কোরআন—৩৩ ঃ ৫২

হযরত তাঁর জীবনের শেষদিনে নয়জন স্ত্রী তাঁর বিধবা পত্নী হিসাবে রেখে যান। এই নয়জনই তাঁদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চরম নীতির সঙ্গে একনিষ্ঠ আদর্শে জীবন যাপন করেন। এঁদের সকলকেই "উম্মুল মোমেনীন" বা বিশ্বাসীদের জননী বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি ও তাঁর রসুল হযরত মহম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর প্রতি চির শান্তি বর্ষণ করুন।

অনেকেই হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবন চরিত সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর না রেখেই বলে থাকেন—হযরত নিজে এতগুলো বিয়ে করলেন, অথচ অন্যান্যদের জন্য মাত্র চারটিতে সীমাবদ্ধ হলো কেন? ব্যাপারটা আলোচিত হয়েছে, তবু আরও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। হযরত যে সময় পর্যন্ত (৬০ বছর বয়স পর্যন্ত অষ্টম হিজরী) এতগুলো বিয়ে করেছিলেন, সে সময় পর্যন্ত বিবাহের সংখ্যা সম্পর্কে নীতি কোরআন কর্তৃক নির্ধারিত হয়নি। সুতরাং তখন পর্যন্ত সকলেই যা খুশি তাই করেছে। যখনই কোরআন বিবাহের সংখ্যা নির্ধারিত করে দিল তখন হতেই হযরত স্বয়ং ও তাঁর বিবাহ সম্পর্কে আর কোন পরিবর্ধন করা তো দূরের কথা, পরিবর্তনও করতে পারেননি। তবে হযরতের সঙ্গে অন্য লোকের এইটুকু তফাত থেকে গিয়েছিল—তিনি উল্লেখিত বা পূর্ব আলোচিত বিশেষ কারণে কোন স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে বা স্ত্রীর সংখ্যা কমিয়ে চার করতে পারেননি। কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় সেটা করা হয়েছিল। নচেৎ অসংখ্য যুবতী সারা জীবন অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করতেন। এইভাবে কোরআনই প্রথম বিশ্বনারীকে দিল মুক্তি ও মর্যাদার

আসন। যুবতীকে দিল যৌবনের স্বাদ, বিধবাকে ফিরিয়ে দিল সংসারের হারানো ছন্দপতন জীবনের ছন্দময়—সুখ ও শান্তি, স্বস্তি ও শ্রীবৃদ্ধি।

মহানবীজীর জীবনে জেহাদ সংখ্যা

জেহাদের নাম	হিজরী সন	মাস
১। ছীফুল বাহর	১ম হিজরী	রমজান
২। বতনে রাবেগ	”	শওয়াল
৩। হাজ্জার	”	জিলকদ
৪। আবওয়া	”	সফর
৫। বাওয়াত	২য় হিজরী	রবিউল আওয়াল
৬। ছাফওয়ান	”	”
৭। জুল আশারী	”	জমাদিল আখের
৮। নাখ্‌লা	”	রজব
৯। বদব	”	রমজান ও শওয়াল
১০। বনি ছলীস	”	শওয়াল
১১। আরিজ	”	জিলহজ
১২। নজদ্	৩য় হিজরী	সফর
১৩। নাজরান	”	রবিউল আখের
১৪। বনি কায়নুকা	”	”
১৫। ওহোদ	”	রমজান
১৬। বনি আসাদ	৪র্থ হিজরী	”
১৭। কাররা	”	সফর
১৮। বীব মাউনা	”	”
১৯। বনি নাজির	”	রবিউল আখের
২০। বদর-ছানী	”	”
২১। দুমাতুল জন্দল	৫ম হিজরী	রবিউল আউয়াল
২২। বনি মুস্তালেক	”	শাবান
২৩। খন্দক আহজাব	”	শওয়াল
২৪। কুরায়যা	”	”
২৫। বনি লেহয়ান	৬ষ্ঠ হিজরী	ববিউল আউয়াল
২৬। নজদ-যাতুররেকা	”	”
২৭। খেবত	”	”

জেহাদের নাম	হিজরী সন	মাস
২৮। হুদাইবিয়ার সন্ধি	৬ষ্ঠ হিজরী	জিলকদ
২৯। গাবা	”	”
৩০। খায়বার	৭ম হিজরী	মহররম
৩১। ওয়াদিলকোরা	”	”
৩২। উমরাতুল কাজিয়া	”	জিলকদ
৩৩। মুতা/মাউতা	৮ম হিজরী	জমাদিল আওয়াল
৩৪। যাতুচ্ছালাছেল	”	”
৩৫। মক্কা বিজয়	”	রমজান
৩৬। বনি খুযাইমা	”	”
৩৭। হুনায়েন/হাওয়াযেন	”	শওয়াল
৩৮। তায়েফ	৯ম হিজরী	”
৩৯। তাবুক অভিযান	”	”
৪০। বনি তমীম	”	”
৪১। খসম	”	”
৪২। বনি কেলাব	”	”
৪৩। তাই	”	”

নারী জাতির ঐতিহাসিক উত্থানে মহানবীর অবদান

পুরুষ রমণী সমাজ পাখি মহানবীর হুঁশিয়ার
একটি ডানায় নাহি থাকে বল আকাশেতে উড়িবার।
যুবক যুবতী ভেদাভেদ নাই উন্নত পরিবার
উভয়েরই শ্রম সাধনার দ্বারা গড়িবে এ সংসার।
এক যদি হয় গরীয়ান তবে অন্য সে গরীয়সী
এক যদি হয় মহীয়ান তবে অন্য সে মহিয়সী। —কাব্যকানন

ইসলাম ধর্মের সংজ্ঞা বলতে ইসলাম হচ্ছে জীবনব্যবস্থা ও সমাজ বিধান। তার এই জীবনব্যবস্থা—সত্য সুন্দরের পথে সমুন্নত জীবনযাপন, এবং তার এই সমাজব্যবস্থা—শাস্ত্রবিহিত শৃঙ্খলা বিধান। ইসলামের এই জীবন ব্যবস্থা ও সমাজ বিধানে নর-নারী নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেরই তিনটি জিনিস প্রথম প্রয়োজন—কিছু খাদ্য, কিছুটা বস্ত্র ও কিছুটা বাসস্থান। এই তিনটি বস্তুর সাক্ষাৎ মোকাবিলা করতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন অর্থের। তাই অর্থ ব্যবস্থায় ইসলাম নর-নারী উভয়কেই কোথাও সমান ও কোথাও সম্মানজনক স্থান দিয়েছে। কোথাও কোথাও প্রয়োজনে এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য এই ব্যবস্থার পরিমাণগত তারতম্য ঘটেছে। সেটা একে অন্যকে ছোট বা বড় করার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়নি। এক কথায় ইসলামই সর্বপ্রথম বিশ্ববুকে নারী-সমাজকে তার এই সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অধিকার দান করেছে।

ইসলামের তথা মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর এবং সৎ খলিফাগণের আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বজুড়ে গ্রীক ধর্ম, চীন ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, খ্রীস্ট ধর্ম ও হিন্দু ধর্মে নারী-সমাজের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়, এক কথায় যা অবর্ণনীয়। কোন ধর্মেই তাদের পুরুষের সম-মর্যাদা তো বহু দূরের কথা, কোনরূপ মর্যাদাই দেওয়া হয়নি। পিতা বা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকারই স্বীকৃতি পায়নি, ববং নারী-সমাজকে সকল মন্দের প্রতীক ও অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা হিসাবে দেখা হতো। সে যেন কারণে-অকারণে পরিবারের অশুভ সংকেত বয়ে আনত। সার্বজনীন ভাবে নারীকে তখন অস্থায়ী ও অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে ভাবা হতো। আপন ব্যক্তিগত ব্যাপারে ও তাদের মতামতের কোন মূল্যই ছিল না। মানুষের সমাজজীবনের উৎপত্তিতে বিবাহ বন্ধনে তারা যে একটি পূর্ণ পক্ষ, একথা সেদিন চিন্তাও করা হতো না। তারা ছিল শুধুমাত্র বিনোদন ও উপভোগের পাত্রী, পুরুষকুল আপন আপন খেয়ালবশত তাদের গ্রহণ করত, এক কথায় প্রাক্ ইসলামি যুগে মানুষ ও জানোয়ারের মাঝামাঝি পর্যায়ে ছিল নারীব অবস্থান। অনেক সময় অনেক মালিক একশোরও বেশি সংখ্যক যুবতীকে ক্রীতদাসীরূপে কিনে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখতেন। অনেক সময় অন্য পুরুষ বা অন্য দাস দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়ে বাচ্চাগুলোকে বাজারে বিক্রি করা হতো।

নারী জাতির উত্থানে ইসলামের অবদান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তদানীন্তন বিশ্বে অন্যান্য সকল ধর্মে নারীর অবস্থা কেমন ছিল তা এখানে একটু পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

তাহলে অতি সহজেই বোঝা যাবে আজকের দিনে নারী-জাতির উত্থানে ইসলামের মূল আবেদন কি ও মুখ্য অবদান কতখানি।

(১) **গ্রীক ধর্ম ঃ** প্রাচীন গ্রীক সমাজে নারী ছিল **অত্যন্ত ঘৃণিত, অবহেলিত** ও **অসামাজিক** বস্তু। তার **আত্মাই ছিল সেখানে অস্বীকৃত**। আর দিওয়ারানাত্ তাঁর 'হায়া তুব ইউনাস' গ্রন্থে লিখেছেন—"গ্রীসের বহু সংখ্যক চিন্তাবিদ্ ঘোষণা করেছেন—নারীর দেহকে যেরূপ গৃহে আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন, তেমনি তার নাম উচ্চারণও গৃহের মধ্যেই দরকার।" গ্রীসের শ্রেষ্ঠ লেখক দাইমস্তিন তৎকালীন সমাজে নারীদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেন—"আমরা নারীদের মধ্যে দেহ পসারিণীদের উপভোগের জন্য রাখি, এবং প্রেমিকাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাখি ও স্ত্রীদের সন্তান উৎপাদনের জন্য রাখি।" সেখানকার বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস বলেন—"**নারী হচ্ছে জগতের যাবতীয় অনর্থ ও সর্বনাশের মূল**, কারণ সে এমন একটি বিষাক্ত বৃক্ষ যার বাহিরটা সুন্দর মাকাল ফল স্বরূপ—পাখিরা (পুরুষ) খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়।" গ্রীক চিন্তানায়ক এন্জায়োস্কি বলেন—"অগ্নিদগ্ধ হলে কিংবা সাপে কাটলে নিরাময় সম্ভব, কিন্তু নারীর ধূর্ততা উপলব্ধি করা অসম্ভব।" অর্থাৎ আগুন বা সাপ থেকে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তা অপেক্ষা বেশি প্রয়োজন নারী থেকে।

(২) **চীন ধর্ম ঃ** প্রাচীন চীনা শিলালিপিতে **নারীকে দুঃখের পানি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।** যা সকল সৌভাগ্যকে একেবারেই ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। সেখানে নারীর সামাজিক পারিবারিক কোন অধিকারই ছিল না। তারা ছিল পুরুষকুলের পণ্যবস্তু মাত্র।

(৩) **বৌদ্ধ ধর্ম ঃ** বৌদ্ধ ধর্মের বিধান অনুযায়ী **নারী সঙ্গলাভে কোনদিন নির্বাণ লাভ করা যায় না।** কেননা নারীর সম্পর্ক যৌনতার দিকে টানে। তাই বৌদ্ধ ধর্মে নারী মাত্রেই মহাবিপজ্জনক।

(৪) **ইহুদী ধর্ম ঃ** প্রাচীন হিব্রু শিলালিপি মতে **ইহুদী ধর্মে নারী চিরন্তন অভিশপ্ত।** নারীর সঙ্গে পাপের সূত্রপাত, তাই তাদের মাধ্যমে মানুষ মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। পুরুষ যে অপকর্ম করে তার জন্য নারী দায়ী। তাই ইহুদী সমাজে সে ছিল অভিশপ্ত অসম্মানিত। তাদের বাজারে বেচা-কেনা করা হতো। তাদের সঙ্গে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট আচরণ করা হতো এবং বহু নিকৃষ্ট কাজে লাগান হতো। একজন ইহুদী সমাজবিজ্ঞানী তাঁর সফরুল জানেয়া গ্রন্থে বলেন—"আমি গভীর মনোনিবেশ সহকারে জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যালোচনা করে এবং কল্যাণকর ও অকল্যাণকর বস্তু সমূহের পরীক্ষা করে দেখলাম—নারী মৃত্যু অপেক্ষাও তিক্ত বস্তু। সে ছলনার ফাঁদ যন্ত্রবিশেষ, তার হস্তদ্বয় শৃঙ্খল সদৃশ, অসাধারণগণ রক্ষা পায়, কিন্তু সাধারণগণ বন্দী হয়ে যায়।"

(৫) **খ্রীস্ট ধর্ম ঃ** খ্রীস্ট ধর্মে **নারী পাপের উৎস।** প্রথম নারী ইভ প্রথম পাপ করে এবং স্বর্গ থেকে আদমের পতনের কারণ তাই। ফলে জগতের সকল পাপের জন্য নারীকেই দায়ী করা হয়। খ্রীস্ট সমাজে সর্বত্র নারীকে পুতুলের মতো মনে করা হতো। তাদেরকে পুরুষেরা যথেচ্ছ ব্যবহার করত। তাই তারা পাশবিক অত্যাচারের ভয়ে গৃহে আবদ্ধ থাকত। মার্টিন লুথার বলেন—"ঈশ্বর নারীদের দু' শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। এক শ্রেণীকে স্ত্রী

হিসাবে, অন্য শ্রেণীকে প্রেমিকা হিসাবে।" আবার কেউ কেউ বলেন—নারী শয়তানের ভাবমূর্তি। শয়তান নারীর মূর্তি ধারণ করে জগতে আত্মপ্রকাশ করে।

কেউ যদি কোন মেয়েকে বিয়ে না করল, তাহলেই সে কল্যাণ সাধন করল। সেন্ট তারতুলিয়ান বলেন—"তোমরা কি জান, তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন ইভ। তোমাদের সঙ্গে অপরাধ আছে, তোমরা শয়তানের দরজা।" সেন্ট জন বলেন—'নারী হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী রূপে অশুভ। আকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগ, মারাত্মক ভাবেই মোহময়। কোন কোন বিশপ অত্যন্ত জোরের সঙ্গে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, নারী-সমাজ মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়।"

(৬) হিন্দু ধর্ম ঃ প্রাচীন যুগ হতে মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থা ছিল লোমহর্ষক। দারুণ শোচনীয়। অবর্ণনীয় ও অকথ্য। তখনকার দিনে হিন্দু সমাজে ছিল নিয়োগ নামে এক জঘন্য মতবাদ। প্রকৃতপক্ষে নারীর সতীত্বের জন্য এ ছিল চরম অবমাননাকর। এই মতবাদ অনুযায়ী স্বামীর উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে স্ত্রী অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য হতো। প্রাচীন যুগে কোথাও কোথাও ভারতীয় যুবতীগণকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওযার পূর্বে পুরোহিতদের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা হতো। কোথাও বা বিবাহের প্রাক্কালে বা পরে প্রথম পুরোহিতদের ভোগের বস্তু হিসাবে স্ত্রীকে পবিত্র করানার্থে পাঠান হতো। **এক কথায় স্ত্রী জাতির কোন পৃথক সত্তাই ছিল না। তাই তারা পিতা বা স্বামীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির কোন অংশ পেত না**। স্বামীর মৃত্যুর পর বাল-বিধবারা ইচ্ছা থাকলেও দ্বিতীয় বিবাহের কথা চিন্তাই করতে পারত না। বরং তীব্র অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদেব সহমরণে যেতে বাধ্য করা হতো। এইভাবে নারীকেই কেন্দ্র করে জীবন্ত মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে অগ্নিদগ্ধ করার মতো নির্মম প্রথাও প্রচলিত ছিল। এক কথায় স্ত্রী জাতির বেঁচে থাকারও অধিকার ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতার লেখক মনু বলেন,—"**নারী জাতি অপবিত্র ও অমঙ্গল** ; কেননা নারী জাতিকে সৃষ্টি করাব সময় তাদের মধ্যে কতিপয় কু-স্বভাব ও কুপ্রবৃত্তি জন্মগতভাবেই দেওয়া হয়েছে, যেমন নিজ দেহের সৌন্দর্য বিকাশ, পুরুষের নিকট দেহ সমর্পণে পৈশাচিক কামনা করে, তাই তারা কামিণী, অভিমান অসদাচরণ রমণ ইচ্ছা, তাই তারা রমণী ইত্যাদি। সুতরাং নারী অপবিত্র ও কলুষিত বস্তু।" মনু আরও বলেন—**নারী কখনো স্বাধীন হতে পারে না**। কেননা সে শৈশবে পিতার, যৌবনে পতির ও বার্ধক্যে পুত্রের। সুতরাং তার কোন স্বাধীন সত্তার প্রয়োজন নেই। আবার অনেকে বলেন—ভগবতগীতা পাঠে একটা সাধারণ বিশ্বাস জন্মে যে পাপ-পূর্ণ আত্মাই নারী হিসাবে জন্মলাভ করে। হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু সমাজে এই ছিল নারীর অবস্থা। আজও হিন্দু বিধবাগণের বিবাহ বাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ।

পূর্বে প্রচুর ছিল। এখনও এই সমাজে রক্ষিতা প্রথা প্রচলিত আছে। বহু অসহায়া কুমারী ও বাল-বিধবাকে কেবলমাত্র সম্ভোগের জন্য রক্ষিতা রূপে রাখা হয়। বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে জননীর সম্মানে ভূষিতা করা হয় না। ইসলাম এই জঘন্য প্রথার ঘোর বিরোধী। বরং এই সমস্ত অসহায়া নারীকে সাহায্য করতেই বা যথাযথ মানবিক মর্যাদা দিতেই একদিন ইসলাম পুরুষকুলকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিল। ৪ ঃ ৩।

(৭) ইসলাম ধর্ম ঃ বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মে নারী-জাতির প্রতি যে অমানুষিক ব্যবহার করা হয়েছিল, তা অবহিত হওয়ার পর আমাদের পক্ষে সঠিকভাবে এখন অনুধাবন করা

সম্ভব হবে ইসলাম তথা মহানবী এবং সৎ খলিফাগণ নারী জাতির উত্থানে কি অবদান রেখে গেছেন। মহানবীজীর দু'চোখে প্রধানত দু'টো জিনিস বিধৃত হয়েছিল। এক চোখে সারা বিশ্বের দরিদ্র মনুষ্য সমাজ, অন্য চোখটিতে দেখি—একমাত্র অভাগা রমণীকুল।

ইসলামে বিবাহ ঃ ইসলামে বিবাহ একটিই মাত্র। পবিত্র কোরআন পুরুষদেব এক থেকে চারটি পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। এই অনুমতিটি কোন ক্রমেই পুরুষদের সম্ভোগের জন্য নয়ই। বরং এটি মায়ের জাতি, নারী জাতিকে সম্মান-শ্রদ্ধা ও মর্যাদা জানানোর জন্যই, তাদের সম্মানের সঙ্গে রক্ষা করার জন্যই।

প্রথম বিবাহটি পুরুষ মানুষ নিজ ইচ্ছামতো করতে পারে। কিন্তু বাকি তিনটি একেবারেই শর্তসাপেক্ষ বিবাহ। এই তিনটি বিবাহের প্রথমটির শর্ত—যে সমস্ত বিধবার বাচ্চা আছে, অথচ তাদের পালন করার কেউ নেই। ঐ সমস্ত অনাথ অসহায় শিশুর মুখ চেয়ে পুরুষকুল যেন তাদের মায়েদের স্ত্রীর সম্মান দান করে। দ্বিতীয়টির শর্ত—সমাজের অনাথ মেয়ে, যাদের কেউ নেই, বা থাকলেও তারা অসহায়, অতীব দরিদ্র, তাদের স্ত্রী রূপে বরণ করে নারীর মর্যাদাকে তুলে ধরো, রক্ষা করো। তৃতীয়টির শর্ত—যুদ্ধবন্দিনী, বা ওই রূপ মেয়েদের দাসী বা রক্ষিতা রূপে না রেখে, তাদের স্ত্রী রূপে বরণ করে নারীর নারীত্ব ও সতীত্বকে সম্মান দাও। এইপথে পুরুষকুল অতিরিক্ত তিনটে বিয়ে করতে পারে। নচেৎ না।

এখন আমরা বোঝাতে পারলাম—ইসলাম একের ঊর্ধ্বে আরও তিনটি বিবাহ করার কেবলমাত্র অনুমতিই দেয়নি, বরং অনুপ্রেরণা দানও করেছে। ইসলাম এই পথে অসহায় শিশু ও কতকগুলো অসহায়া নারীকে সম্মান দিয়েছে, না অসম্মানিত করেছে? অনিবার্য সত্য, ইসলাম এই তিনটি 'অতিরিক্ত বিবাহের অনুমতি দ্বারা অসহায়া নারী সমাজকে চিরন্তন মর্যাদা দান করেছে। মহানবীজী বৃদ্ধা ও বিধবাদের বিবাহ করেছিলেন। হে বিশ্ববাসী, তা কিসের জন্য? আজকের আধুনিক যুগেও ওই তিন শ্রেণীর নারীর অধিকাংশই কেউ বা পেটের দায়ে, কেউ বা যৌবনের তাড়নায় সমাজচ্যুত হতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ইসলাম এই তিন শ্রেণীর বিবাহ দ্বারা নারী সমাজকে রক্ষা করতে চেয়েছে। এক কথায় অসহায় বিপন্ন বিব্রত বিচলিত ও বিড়ম্বিত নারীকে সমাজে সাহায্য ও প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তই ইসলামের এই একাধিক বিবাহের অনুমতি। সঙ্গে সঙ্গে সাবধান বাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে, যেন কেউ সীমালঙ্ঘন না করে, তা হলে কঠোর শাস্তি। ২ ঃ ১৯০, ৫ ঃ ৮৭, ৭ ঃ ৫৫, ১১ ঃ ৪৪, ২৫ ঃ ১৯, ২৭ ঃ ৫২।

কোরআন বলে—"নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দমত দুটো, তিনটে, চারটে বিয়ে কর, কিন্তু যদি আশঙ্কা কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমান ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তাহলে একটি মাত্র বিয়ে করবে।" ৪ ঃ ৩। এখানে কোরআন স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে—সমান ব্যবহার করতে না পারলে, একের অধিক বিয়ে করার অধিকার কারোরই নেই। অন্যত্র কোরআন আবার স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে—"তোমরা যতই ইচ্ছে কর না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না, এবং অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না, যদি তোমরা নিজেদের

সংশোধন করো ও সংযমী হও তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" ৪ ঃ ১২৯। সুতরাং বোঝা গেল কোরআন পাক সাধারণত একটি মাত্র বিয়েকেই অগ্রাধিকার দান করেছে। তবে বিশেষ কারণবশত একের অধিক বিয়ের অধিকার আছে কিন্তু কোরআন পাকের উপরোক্ত মর্ম অনুসরণ করে চলতে হবে।

যে ব্যক্তি সেই বিশেষ কারণ ও বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে কেবল আপন কামনা ও রিপুর তাড়নায় কোরআনের মূল মর্মকে অনুধাবন না করে কেবলমাত্র অবলা রমণীর রক্ত-মাংসের লোভে পরপর একাধিক বিবাহ করেন, তিনি যিনিই হোন, তাঁর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ঃ

যে-জন রিপুর হাতে দাস রূপে রহে
রাত্রি দিন অর্থ আর রমণী মোহে,
কোরআন হাদিস মূলে একথা নিশ্চয়
সে জন যাহাই হোক মুসলমান নয়।

কোরআন—২ ঃ ১২৪, ১৩১, ২৭৯, ৩ ঃ ১৫৯, ৪ ঃ ৩, ৩৪, ১২৯, ৬ ঃ ১৬২, ৯ ঃ ৭০, ২৮ ঃ ৩৭।

ইসলাম ঘোষণা করেছে—কোরআনুল করীমে আল্লাহ্ বলেন—"তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তাঁর সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন। এবং এই দুটি থেকে সর্বত্র পুরুষ ও নারীর ব্যাপক বিস্তৃতি হয়েছে।" কোরআন আরও বলে—"নারী তোমাদের জন্য, তোমরা তাদের জন্য।" ৪ ঃ ১, ৩৪। নারীগণের ওপর তোমাদের যেরূপ অধিকার আছে, তোমাদের ওপর নারীগণেরও অনুরূপ অধিকার আছে।"

কোরআন—২ ঃ ২২৮, ৩৩ ঃ ৩৫

ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) বলেন—

ইসলামে বৈরাগ্য নাই বড় গুণ যার
সমাজ জীবন তার সব হতে সার।
সুষ্ঠু সংসার ধর্মে ফলিবে যে ফজিলত
তার বড় নাই আর উপাসনা এবাদত।

(১) নারী হচ্ছে পুরুষের অর্ধাংশ।

(২) সন্তানের স্বর্গ তার মায়ের পদতলে।

(৩) পিতা-মাতার মধ্যে কাকে প্রথম সম্মান প্রদর্শন করবে, এই প্রসঙ্গে কোন প্রশ্নের উত্তরে মহানবী বলেন—"প্রথমে তোমার মাকে। তারপর তোমার মাকে, তারপরও তোমার মাকে, অতঃপর তোমার পিতাকে।" এইভাবে মহানবী মাতাকে পিতা অপেক্ষা তিনগুণ সম্মান দান করে সমগ্র নারী-জাতির সম্মানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

(৪) স্ত্রীলোকেরা পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী বা পরিপূরক।

(৫) এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ (ধার্মিকা) নারী। মহানবী (ধার্মিক) নারীকে জগতের শ্রেষ্ঠ আসন দান করলেন।

(৬) আল্লাহর আদেশ—তোমরা নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করবে। কারণ তারা তোমাদের মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা।

(৭) নারীদের অধিকার পবিত্র, যাতে তাদের অধিকার খর্ব না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখো।

(৮) সেই উত্তম ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম ব্যবহার করে।

(৯) রমণী প্রতিটি গৃহের রাণী স্বরূপ।

(১০) হাতের লেখা যতই ভাল হোক, কাগজ ভাল না হলে লেখা ভাল দাঁড়াবে না। পিতা যতই ভাল হোক, মাতা পাশাপাশি ভাল না হলে, সন্তান আশানুরূপ হবে না। সুতরাং সমাজকে ভাল মা তৈরির জন্য সচেষ্ট হতেই হবে। কেননা সন্তানের জীবনে পিতা মাতা কালি ও কাগজ স্বরূপ। অধিকন্তু সন্তানের জন্য যে কোন জননীর আন্তরিক আকুলতা ও ব্যাকুলতা, অকৃত্রিম আবেদন ও নিবেদন, আশীর্বাদ ও শুভাশিস স্রষ্টার দরবারেও ব্যর্থ যায় না।

সাগর সমুদ্র হলেও সে জল শুকায়
জননীর ক্ষুদ্র দোয়াও ব্যর্থ নাহি যায়।

এইভাবে ইসলামে আল্লাহ্ ও তার বাণী কোরআন এবং মহানবী ও তাঁর বাণী হাদিস নারী-জাতিকে ইহজগৎ থেকে পরজগৎ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছে। তার শেষ কথা—

এক যদি হয় গরীয়ান তবে অন্য সে গরীয়সী
এক যদি হয় মহীয়ান তবে অন্য সে মহীয়সী।

এখন আমরা লক্ষ্য করব ইসলাম সমাজের কোন কোন বিশেষ স্তরে নারীর অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করল ঃ

(১) মানবিক অধিকার ঃ ইসলাম নারী-পুরুষের মাঝে মৌলিক মানবীয় অধিকার সমূহে সমতা বিধান করেছে। ইসলামের এই সমতাভিত্তিক ব্যবস্থায় নারীগণ পূর্ণ মানবীয় অধিকার ভোগ করতে পারে, যেমন, বাঁচার অধিকার, অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুতে তাকে বাধ্য করেনি—মৃত্যুবরণ করতে। বরং উৎসাহিত করেছে পুরুষের ন্যায় দ্বিতীয় বিবাহ করে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে, কাজকর্মের অধিকারে, শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারে, স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারে। মহানবী ঘোষণা করেছেন—"প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন অতি অবশ্যই কর্তব্য।" যে সমস্ত গুণের অধিকারী হলে নারী তার উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে, ইসলাম তার প্রতিটিই দান করেছে নারীকে।

(২) সামাজিক অধিকার ঃ যে ভাবে ইসলাম মানবীয় অধিকার সমূহে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান করেছে ঠিক তেমনিভাবে সামাজিক ব্যাপারেও উভয়কেই সমান অধিকার দিয়েছে। মানুষ তার জ্ঞান-গরিমার দ্বারাই সমাজে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করে সেই জ্ঞানার্জনের জন্য ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই সমভাবে তাগিদ দিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে—"বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী একে অপরের বন্ধু।" ইসলামই প্রথম নারীকে পিতা-মাতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার দিল। এ অধিকার বিশ্বে প্রথম।

ইসলাম ও ইসলামের মহানবী পুরুষদের জন্য একাধিক বিবাহ সমর্থন করলেন—কিন্তু কখন এবং কোন্ স্থানে ঃ

১। সমাজের অসহায়া যৌবন-প্রাপ্তা কুমারী মেয়ে কোথায় যাবে? তার গতি কি হবে? সমাজ বিকৃত মস্তিষ্ক।

২। অসহায়া বাল্য-বিধবা বা বিধবার সমাজে ভবিষ্যৎ কি হবে? কে তাকে দেখবে? সমাজ বিকারগ্রস্ত।

৩। বিবাহ-বিচ্ছেদে স্বামী-পরিত্যাক্তা অসহায়া স্বাস্থ্যবতী রমণী সমাজে কোথায় দাঁড়াবে? তার স্থান কোথায়? যখন তাকে ডাকে ঘরে নয়, অন্ধকারে।

এই তিনটি মৌলিক প্রশ্নকে নিয়ে বিশ্ব-সমাজ, বিশ্ব-সভা দিবা রাত্রি তোলপাড় হচ্ছে। কত সেমিনার হচ্ছে, কত কনফারেন্স বসছে, কত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা চলছে। সবশেষে কতকগুলো অন্তঃসার শূন্য অবান্তর অবাস্তব প্রাণহীন বুলি আওড়িয়ে পণ্ডিতরা বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু সমাজে অসহায়া অবলা নারীর স্থান যেখানে সেখানেই থাকল,—নরক যন্ত্রণা, পতিতালয়, বিষ খেয়ে মরা।

আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে নারী জাতির এই অবর্ণনীয় অসহায় অবস্থার ব্যবস্থা সম্পর্কে কোরআন ও মহানবী ঘোষণা করেছিলেন—এই অসহায়া নারীদের সমাজ-চ্যুত করো না। সমাজের বোঝা বানিয়ো না। এদেরকে সমাজে পতিতালয় গড়তে বাধ্য করো না। এরা তোমাদের মা-বোন, তোমাদের স্ত্রী-কন্যা। এদের স্থান দাও সম্মান দাও সমাজে ও তোমাদেব আপন ঘরে। এদের রক্ষা কর, কখনও 'রক্ষিতা' করো না। তাদের ভোগ কর, তবে ভোগের যন্ত্র বানিয়ে নয়, মানুষের সম্মান দিয়ে।

নারী জাতির, নারী জীবনের এই চরম বিপদে, জীবনের অসহনীয় বুক ফাটা যন্ত্রণায়, আত্ম-হত্যা ও আত্মহননের পথে, পদস্খলনের রাস্তায়, তিলে তিলে শেষ হওয়ার পথে, সমাজে মুখ লুকিয়ে রাখার পথে, নীরবে কাঁদার সাথে, নির্জনে অশ্রুসজল চোখে, তোমরা তোমাদের মা ও বোনের জাতি, স্ত্রী ও কন্যার জাতিকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করো, প্রয়োজনে বিয়ে করে সাহায্য করো, দরকার হলে একাধিক বিয়ে করেও সাহায্য করো। এইভাবেই, এইপথেই ইসলামেব 'বহু বিবাহ' প্রচলিত, বা নারীকে নির্যাতন করেনি, করেছে রক্ষা, দিয়েছে সম্মান। যারা ইসলামের 'বহু বিবাহ'-কে বুঝতে না পেরে, তার মূল উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে না পেরে কটাক্ষ করে থাকেন, তারা অজ্ঞাতবশত নারী জাতির ক্ষতিই করেন।

আজ বিশ্ব-দরবারে এমন কে আছেন, যিনি মহানবীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে একবার দ্বিধাহীন চিত্তে, সমস্ত দুর্বলতাকে পরিহার করে, সমস্ত কুসংস্কারকে পরিত্যাগ করে মুক্ত মনে বলতে পারেন—নারীরই প্রয়োজনে নারীরই কল্যাণে, নারীরই সম্মানে পুরুষের বহুবিবাহকে ক্ষেত্র বিশেষে কোথাও বাধ্যতামূলক কোথাও বর্জনমূলক করে বিশ্ব-দরবারে বিশ্ব-সভায় সারা বিশ্বের জন্য কঠোব হতে কঠোরতম আইন প্রণয়ন করা হোক, এবং তা কঠিন হতে কঠিনতম পথে প্রয়োগ করা হোক।

(৩) নারীত্বের প্রতি সম্মান প্রদান ঃ নারীত্বের প্রতি সম্মান প্রদান করতেই ইসলাম ও মহানবীজী পুরুষকুলকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে।

(১) সমাজের অসহায়া যুবতীগণ, (২) অসহায়া বাল-বিধবা বা বিধবাগণ, (৩) স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাগণ।

এই তিন শ্রেণীর নারীকে রক্ষা করার নিমিত্ত ইসলাম পুরুষকুলকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিল। এই অনুমতিটি কোন ক্রমেই সম্ভোগের জন্য নয়ই। বরং নারী জাতিকে রক্ষার জন্য। সুতরাং যাঁরা না বোঝে, ইসলামের এই বহু বিবাহকে নিন্দা করে থাকেন। তাঁরা প্রকারান্তে নারী জাতিরই ক্ষতি করে থাকেন। এই সমস্ত নারী যদি যথাযথভাবে স্থান না

পায়, তাহলে তারা একদিন হয়ত বাধ্য হয়ে অসামাজিক পথে চলবে। ইসলামের একাধিক বিবাহ নারীকে যথাযথ সম্মান দিয়ে তাদের ওই কুখ্যাত গলি পথ থেকে রক্ষা করতে চায়।

(৪) একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার ঃ ইসলাম ঘোষণা করেছে মানুষ হিসাবে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সকল পার্থক্য তাদের আপন আপন কাজের ওপর নির্ভর করবে। পুণ্য কাজের জন্যে পুরুষ যদি স্বর্গে যায়, নারীও তার পুণ্য কাজের জন্য স্বর্গে যাবে। অপকার্যের জন্য নারী যদি নরকে যায়, পুরুষও নরকে যাবে। এখানে পুরুষ বলে তার কোন বিশেষ মূল্য নেই। তাই কোরআন ঘোষণা করেছে—"পুরুষ ও নারী যে কেউ বিশ্বাস সহকারে সৎকাজ করে আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব। এবং তাঁর কাজের তুলনায় তাকে অধিকতর উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।" ১৬ ঃ ৯৭। কোরআন আবার বলে, "পুরুষ হোক বা নারী হোক আমি তোমাদের কারও সৎ কাজকে বৃথা যেতে দেব না।" ৩ ঃ ১৯৫। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের একে অপরের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব না থাকলেও পারিবারিক জীবনে সংসারে স্বামীর প্রাধান্য স্বীকৃত। কারণ পাবিবারিক ভরনপোষণের দায়-দায়িত্ব একমাত্র স্বামীর। তবে মানুষ হিসাবে তারা সমান।

(৫) স্বামী নির্বাচনে পারিবারিক অধিকার ঃ আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে যখন সারা পৃথিবীতেই নারীর অবস্থা অবর্ণনীয়, সেই সময় ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক হযরত মহম্মদ (দঃ) ঘোষণা করেন—"প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা হতে পরামর্শ গ্রহণ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা তরুণী হতে অনুমতি ব্যতীত তাদের বিয়ে দেওয়া যাবে না।" এখানে পরিবার গঠন ও দাম্পত্য জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সমতার ভিত্তিতে পুরুষের ন্যায় মহিলাদের স্বামী নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। ইসলামের এই ঘোষণার পর বিশ্ববুকে নারী প্রথম তার স্বামী নির্বাচনে আপন মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করল।

(৬) শাস্তি নির্ধারণে উভয়ই সমান ঃ যে কোন ভাল মন্দ কাজে উভয়ই যেমন পুরস্কৃত হবে তেমনি তিরস্কৃত হবে। সেখানে পুরুষ বলে কোন বিশেষ কিছু নেই। কোরআন বলে—'ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী এদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত কর। এবং সাবধান এ ব্যাপারে তোমাদের কারও মনে যেন তাদের প্রতি করুণার উদ্রেক না হয়। ২ ঃ ২। কোরআন আবার বলে—"চোর পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, তাদের কৃত অপরাধের জন্য উভয়েরই হাত কেটে দাও।" ৫ ঃ ৩৮। এখানে কি পুরস্কারে কি তিরস্কারে ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই একই পর্যায়ে এনেছে।

উপসংহার ঃ এইভাবে ইসলাম প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে শিশুকন্যাকে দিল বাঁচার অধিকার, যুবতীকে দিল স্বামী নির্বাচনের অধিকার। বিধবাকে দিল বাঁচার ও দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার। গৃহিণীকে দিল স্বামীর ও পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশের অধিকার। এক কথায় ইসলাম সর্বক্ষেত্রে নারীকে দিল পুরুষের সম অধিকার। এমনকি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর একটি কথার দ্বারা নারীকে মানবসমাজে সর্বোচ্চ আসন দান করলেন।

বলেন দ্বীনের নবী রসুল মোদের—
মায়ের পায়ের তলে জান্নাত তোদের।

মহানবীর অচিন্তনীয় কৃতকার্যতার অন্তরালে কি ছিল?

একটি কথায় সারা বিশ্ব একমত হতে পেরেছে, আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে স্রষ্টা প্রেরিত যত দূত এসেছেন, তাঁদের মধ্যে মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) সর্বাপেক্ষা কৃতকার্য, সর্বাপেক্ষা সফল। এরই সমর্থনে ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA says, "Of all the great religious personalities of the world the Prophet Muhammad was the most successful." Muhammad is the last and the greatest of the Prophets of God." The Reader's Digest, Great Encyclopaedic Dictionary. Vol. 3, Page 1360.

মহানবী কোন্ বলে এই অসাধারণ, অভাবনীয় এককথায় অচিন্তনীয় বা অলৌকিক কৃতকার্যতা লাভ করলেন, এরই ব্যাখ্যায় এরই বিশ্লেষণে বহু ব্যক্তি হতে অধিকাংশ মানুষই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে, সজ্ঞানে-অজ্ঞানে তাঁর মহান ব্রতের মূল লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে, এবং যাদের দ্বারা, যে উপায়ে তিনি এই অনন্যসাধারণ সফলতা লাভ করলেন, সেগুলো সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন।

মহানবীজীর জীবনে এই অভাবনীয় ও অবর্ণনীয় কৃতকার্যতার মূলে কোন্ অজানা রহস্য, অজানা শক্তি লুকিয়েছিল, এই বিষয়ে প্রায় আমরা সকলেই একমত হবো যে, মহামানবের এই তুলনাবিহীন বিরল-বিশ্ব-সফলতার অন্তরালে প্রধানত চারটি বস্তু লক্ষ্য করা যায় ঃ (১) মহান আল্লাহর অফুরন্ত করুণা ও দান ; (২) মহানবীজীর সুমহান চরিত্র, অভাবনীয় চরিত্র, অত্যুত্তম চরিত্র ; (৩) তদানীন্তন মুষ্টিমেয় কিছু মহান সাহাবা বা সঙ্গীদের জীবন-মরণ সহযোগিতা ও সমর্থন ; (৪) নবী-জীবনে আল্লাহর দেওয়া স্বাভাবিক 'মোজেজা' বা অলৌকিকতা।

মুসলিম জাহানের অগণিত সাধারণ মানুষ জ্ঞাতে হোক, অজ্ঞাতে হোক মহানবীজীর এই বিশ্বব্যাপী ত্রিকালজোড়া কৃতকার্যের কারণ নির্ণয়ে চতুর্থটিকে (মোজেজা) অতিরিক্ত গুরুত্ব ও সীমাহীন প্রাধান্য দিয়ে একে অপরের সঙ্গে, পরস্পর পরস্পরে যেন ওইটিকে বড় করে তুলে ধরতে প্রাণপণে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। একথা নিঃসন্দেহ যে, তাঁরা খুবই সরল ও সাধু ইচ্ছাতেই মহানবীকে সম্মান দিতে ও বড় করতেই ওটা করে থাকেন। কিন্তু এটা দোষের কিছু না হলেও মহানবীজীর চরিত্র বিশ্লেষণে, জাতীয় জীবনের চরিত্র গঠনে, অনাগতকালের অসংখ্য মানুষের মাঝে মহানবীর অত্যুত্তম চরিত্রটিকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরতে, আপামর জনসাধারণ ও যুবক-যুবতীদের অনুপ্রাণিত করতে ওটা একটি বড় মাপের ভুল পদক্ষেপ। কেননা এর ফলে সাধারণ যুবক-যুবতীগণ বুঝে থাকবে যে, তিনি বিধাতার দেওয়া অলৌকিকতা বলেই সবকিছুই করেছেন। এখানে উত্থানমুখী ছেলেমেয়েদের প্রচেষ্টার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু মানবতার উত্তরণে, মনুষ্যত্বের বিকাশে, সভ্যতার প্রকাশে মহানবীজীর মহান ব্রতের মূল লক্ষ্যগুলোর সফলতা ও সমাধান সম্পর্কে ওই চতুর্থটিকে কারণে-অকারণে অতিরিক্ত জোর দিয়ে কৃতকার্যতার মূল কারণ নির্ণয়ে, বিশেষ করে মহানবীজীর চরিত্র-চিত্রণে ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন। সমাজ গঠনে ও জাতির চরিত্র গঠনে ঐ ব্যাখ্যা বড়ই ক্ষতিকর। অথচ বিশ্বমানবের চরিত্র-গঠনই তাঁর মূল কাজ ছিল। তাই আক্ষেপভরে রাজা রামমোহন

রায় বলেন—মহম্মদের গোঁড়া ভক্ত ও বিরুদ্ধবাদী শত্রু ও সমালোচকগণ—কেহই এই মহাপুরুষের প্রতি সুবিচার করেননি।"

অধিকন্তু মহানবীজীর সমগ্র নবুয়ত জীবনে তিনি যে কাজটি করতে বা করে দেখাতে খুবই অনীহা প্রকাশ করতেন, বা অপছন্দ করতেন, সেটা ছিল 'মোজেজা' দর্শন। পরিস্থিতি ও পরিবেশের নেহাত কোন চাপ না পড়লে তিনি ওই পথে যেতেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন—"আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ।" কোরআন—৪১ ঃ ৬

সুতরাং আমরা যদি সত্যিই মহানবীজীকে ভালবাসতে চাই, বা তাঁর ভালবাসা পেতে চাই, তাহলে তিনি যে বস্তুটিকে ভালবাসতেন, সেই ভালবাসার বস্তুটিকে ভালবাসতে হবে। তিনি পছন্দ করতেন—মানুষ তার আপন আখ্‌লাক বা চরিত্রের উপর বড় হোক। তিনি বলতেন—"তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।" স্বয়ং আল্লাহ্‌ও বলেন—"আমি মানুষকে উত্তম চরিত্রে সৃষ্টি করেছি।" কোরআন—৯৫ ঃ ৪

উত্তম চরিত্র গঠন সাধ যদি মনে
অত্যুত্তম নবী চবিত্র রাখিও স্মরণে।
হেন শক্তি নাহি কোন কে তোমাকে রুখে
রাখ যদি নবীজীরে সদাই সম্মুখে।

বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেরই ধ্যান-ধারণা মহানবী এসেছিলেন জগতের সমস্ত ধর্মকে ধ্বংস করে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর ইসলাম ধর্ম নামে এক নব সৃষ্টি রচনা করতে, এটা ভুল দর্শন। তিনি এসেছিলেন সুন্দর ও সংস্কারময় সৃষ্টি করতে। যে সৃষ্টিতে থাকবে না কোন সৃষ্টির পার্থক্য, যা মানুষ মাত্রকেই এনে দেবে তার শাশ্বত ব্যক্তি অধিকার। তাঁরা বলেন—এই সৃষ্টিতে, এই সফলতায় তাঁকে যা সাহায্য করেছিল তা ছিল আল্লাহর দেওয়া অলৌকিকতা বা এই আল্লাহর দেওয়া অলৌকিকতা বলেই তিনি সমস্ত কাজ সমাধা করেছিলেন। কিন্তু জগৎ জানে মহানবীর মহৎ বেদনাজাত মহান কৃতকার্যতা অলৌকিকতা সর্বস্বই ছিল না। তাঁর ধৈর্য, সহ্য ও সংগ্রামের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। একটু ধীর ও স্থির ভাবে বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যাবে, যিনি বা যাঁরাই শুভমনে সরল বিশ্বাসে অন্তরের অটুট শ্রদ্ধাসহ কেবল মাত্র অলৌকিকতার বেড়াজালে মহানবীর গুরুত্ব বাড়াতে চেয়েছেন, তাঁরা তাঁকে না বাড়িয়ে ছোটই করেছেন। মহানবী এমন একটি বিরল ব্যক্তিত্ব যা পৃথিবী আজও জন্ম দিতে পারেনি, যাঁকে নিজের কথায় কষ্ট করে বাড়ানোর কোন দরকার নেই। তিনি যতটুকু বেড়েছেন, সেইটুকুরই যথার্থ পরিমাপ হলে পরিসংখ্যা হলে পর্যালোচনা হলে মানুষ ও পৃথিবী উভয়ই ধন্য হবে, জগৎ মুক্তি পাবে, মর্ত্যের মানুষ মর্ত্যে বসেই স্বর্গ পাবে, মহানবীর অমর আত্মা অফুরন্ত আনন্দ পাবে।

আমরা কেন সরল বিশ্বাসী মানুষের সহজ ও শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অন্ধ অলৌকিকতায় বিশ্বাস রাখি না, কেন আমরা অকপটমনে অকৃত্রিম প্রাণে আস্থা রাখতে পারছি না। এর উত্তরে আমরা কারও বিশ্বাসে কোন রূপ আঘাত না করেই তাঁদেরই কথায় চেষ্টা করবো উত্তর দিতে। এই অলৌকিকতায় বিশ্বাসী-গোষ্ঠী যেন এক অন্যে প্রতিযোগিতা করেছেন (মহানবীর) অলৌকিকতাগুলোকে গর্ব ও গৌরবের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে! আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অকপটমনে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেছেন আল্লাহ্‌ প্রেরিত সকল দূতই মোজেজা বা অলৌকিকতা পেয়েছিলেন।

তা হলে সরল উত্তর, অলৌকিকতা যখন সকল নবীই পেলেন, তখন অন্যান্য দূতগণ কেন তাঁদেব সফলতায় মহানবীজীর সফলতার ধারে-কাছেও আসতে পারলেন না! মহানবীজীর যে সফলতা, তা যেন সমুদ্র, সে তুলনায় অন্যান্যদের সফলতা নদী বা নালা স্বরূপ। তাহলে কি আমরা বলব—আল্লাহ্ অন্যান্য নবীদের তুলনায় মহানবীর প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিলেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে ইসলামের আল্লাহ্ নিরপেক্ষ বা ন্যায় বিচারক হন কেমন করে? কিন্তু আমরা জানি, তিনি ন্যায়বিচারক। সুতরাং মহানবীর জীবনে ওই কথা সত্য নয়।

আবার যদি আমরা অন্য দিক চিন্তা করি, অন্যান্য নবীদের তুলনায় মহানবীকে কি দেশবাসী অতি সহজেও মেনে নিয়েছিলেন, যাঁরাই মহানবীজীর জীবনী বৃত্তান্ত সামান্যও জানেন, তাঁরাও স্বীকার করবেন,—ওটাও মিথ্যা। বরং এই জগতে যত নবী এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহানবীজীকেই তিক্ততম পরিবেশের এবং তীব্রতম সামরিক বাহিনীর তিক্ততম স্বাদ আস্বাদন করতে হয়েছিল।

পরিস্থিতি ও পরিবেশের জন্য অনেক সময় অনেকেই অযোগ্য হয়েও বিজয়ীর গৌরব লাভ করে থাকেন। আবার ওই একই কারণেই অনেকেই হেরে যান। কিন্তু মানুষের সফলতা ও বিফলতা কেবলমাত্র যদি পরিস্থিতি ও পরিবেশ নির্ভরশীল হয়, তাহলে সেখানে সাধকের সাধনা বা চবিত্রের কোন মূল্য থাকে না। পরিস্থিতি ও পরিবেশেব উপরে ওটাই সাধকের কৃতিত্ব। মহানবীজী সারা জীবন মানব চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি সবসময়ই জোর দিয়েছেন—মানব-চরিত্রের শাশ্বত গুণাবলীর উপর। যা সকল মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি ও পরিবেশ পরিবর্তনশীল। কিন্তু মানব-চরিত্রের শাশ্বত গুণাবলী অপরিবর্তনশীল। যে গুণাবলীর জোরে মানুষ একদিন চরম পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। মহানবীজী তাঁর চরিত্রের ওই সমস্ত গুণাবলীকে আয়ত্ত করেই মহা প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশকে জয় করেছিলেন। আল্লাহর রহমত তাঁর অত্যুত্তম চরিত্র নামক ক্ষেতে শ্রাবণের বারিধারার মতো বর্ষিত হয়েছিল। ফলে একদিন তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছিল—নিখিল বিশ্বের নজিরবিহীন সফলতার সবুজ শালবন।

অতএব এখন আমরা অবলীলাক্রমে বুঝতে পারছি মহানবীর বিপুল বিজয়ে, চরম সফলতায়, কল্পনাতীত কৃতকার্যতায় তাঁকে যে বস্তুশক্তি যুগিয়েছিল, তা কোন আণবিক শক্তি নয়, কোন অলৌকিক শক্তি নয়, সেটা ছিল তাঁর মানবিক শক্তি, মানবিক মেধা। এককথায় এটা ছিল আঁধারে ঢাকা অলৌকিকতা নয়, বা অলৌকিকতার সুযোগ নিয়ে সংসারের স্নেহ-নিবিড় ছায়ায় সিক্ত হয়েও নয়, আবার তথাকথিত পীর-ফকিরদের ন্যায় অতীন্দ্রিয়বাদের শীতল সমীরণে গা ঢেলে দিয়েও নয়, বরং অতি আপন জন হতে অতি উচ্ছৃঙ্খল আরব বেদুইন কর্তৃক বিদ্রূপের শতবাণে বিদ্ধ হয়েও, জর্জরিত দেহ ও মনে অতি সাধারণ মানুষের মতোই দিবা ও রাত্রির সাধনার ঘর্মাক্ত শরীরে, জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে, আজীবন আমরণ স্বপ্নে সজাগে, কঠোর তপস্যায়, কঠোর সাধনায়, আড়ালে অন্তরালে, সংসারের কোলাহলে, প্রেয়সীর কোলে, অন্তরের আবাধনায়, প্রাণের প্রার্থনায়, সুখে ও দুঃখে, আহারে বিহারে, অর্ধাহারে অনাহারে, নিশীথ রাতেব নীরব অন্তরে, বিজন প্রান্তরে, শত্রু পরিবেষ্টিত পাহাড়ে-পর্বতে, গিরি ও গহ্বরে, আলোকে আঁধারে, স্থলে ও জলে একাকী অরণ্যে, গোপনে প্রকাশ্যে, বিশেষ করে—জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, সমরে সঙ্কটে, শত্রুর নিষ্কাশিত তরবারির সম্মুখে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও প্রাণেব বিনিময়েও তিনি ছিলেন—কঠোর সাধক।

এই কঠোর সাধকের কঠিন সাধনাকে আমরা কোন মতেই ভুলতে পারি না। এ ভুল মানবজীবনে অজ্ঞানে অভিশাপ, সজ্ঞানে মহাপাপ। যদিও আমরা আল্লাহ্ প্রেরিত কোন

দু'য়েরই মোজেজাকে (অলৌকিকতা) অস্বীকার করি না, অবজ্ঞা করি না, বরং অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, স্বীকার করি। এমনকি সূফী দরবেশ, ওলি আউলিয়া, গওস কুতুব সকলেরই মহান কেরামতে আছে আমাদের অকৃত্রিম পূর্ণ আস্থা। তবুও সঙ্গে সঙ্গে এই সতর্ক ও সাবধানবাণী উচ্চারণ করার দরকার আছে বলে মনে করি যে, কোন অলৌকিকতার ভাষ্যমেঘের জালে যেন রেসালতের গুরুদায়িত্ব নবুয়তের গুরুভার বহনকারী মহাকালের কালজয়ী কঠোর সাধক সিদ্ধপুরুষ মহানবীর জীবন-সাধনার সত্যসূর্য আচ্ছন্ন হয়ে না ওঠে। কেননা এই আচ্ছন্নতা মানবসমাজে, বিশেষ করে মহানবীর উম্মতের (শিষ্য—মুসলমান) মধ্যে সাধনা-বিমুখ মানসিকতা সৃষ্টি করে অজ্ঞানে হবে অভিশাপ, সজ্ঞানে হবে মহাভুল। অবলীলায় পাওয়া মানিক অবহেলায় হারিয়ে যাবে।

মহানবীর অকল্পনীয় কৃতকার্যতার মূলে কি ছিল, সেটা আমরা লক্ষ্য করলাম—কঠোর সাধনা। এখন একটু দেখতে চাই, এই অব্যক্ত সাধনাকে সঞ্জীবনী সুধা দান করল কে বা কারা। কঠোর সাধনা মহানবীকে কৃতকার্য করল, কিন্তু এই সাধনাকে শক্তি যুগিয়ে সফল করল কে, সাধনা তো সকলেই করতে চান, বড় তো অনেকেই হতে চান। কিন্তু সেটা তো বিরল ভাগ্য। তাই আমরা একটু দেখতে চাই—মহানবীর সাধনা রূপ সেনাপতিকে কোন্ সেনাবাহিনী সাহায্য করল, যাদের সাহায্যে সেনাপতির সাধনা বিশ্বব্যাপী ব্যতিক্রমবিহীন বিপুল বিজয়ের চির গৌরব লাভ করল।

মহানবীজী বলেন—"নাফ্‌সের (রিপুর) বিরুদ্ধে জেহাদই (যুদ্ধ) সর্বাপেক্ষা বড় জেহাদ।" জীবন সংগ্রামে মহানবীজী এই বড় যুদ্ধেই সকলের অগোচরেই প্রথম বিজয়ী হয়েছিলেন। জীবনের শিশু হতে কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর যে জয়, ঐ জয়ই ভাবীকালের বিশাল জয়ের পূর্বতন বীজ রূপে তাঁর রক্তের কণায় কণায় ও শরীরের শিরায় শিরায় রয়ে গিয়েছিল। আপন অন্তর জগতের বিজয়ী মহানবী একদিন নামলেন—বাহির জগতের যুদ্ধে। তিনি বলেন—"যে ব্যক্তি আপন নাফ্‌সের হাতে পরাজিত, তার দ্বারা জগতের কোন মহৎ কাজ হতে পারে না।" পৃথিবীর ইতিহাসে নৈতিকতাহীন ক্ষণিক তারকাগুলোর প্রতি (রাশিয়া ১৮০০-১৯০০) একবার লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, তাদের জয় কত ক্ষণস্থায়ী। বরং পরবর্তীকালে মানুষের সামনে মহাকাল তাদের কলঙ্কগুলোকেই কালি জুগিয়ে যায়। মহানবীজীর জীবন সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি ছিল তাঁরই উত্তম চরিত্র। এবং ওই সেনাপতির সেনাবাহিনী ছিল—তাঁরই চরিত্রের অসংখ্য মহান ও মহৎ গুণাবলী।

মহানবী বাল্যকালে ছিলেন সকলের প্রিয় অনাথ বালক, যৌবনে সকলের পথপ্রদর্শক স্বভাব সত্যবাদী ও সত্যান্বেষী যুবক। পরে জীবন সঙ্গিনীর প্রিয় স্বামী, তারপর পুত্র-কন্যার প্রিয় পিতা, প্রতিবেশীর অকৃত্রিম বন্ধু, রুজি-রোজগারে কৃতকার্য ব্যবসায়ী, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংস্কারক, একই পরিপ্রেক্ষিতে কোথাও সাহসী যোদ্ধা। কোথাও দূরদর্শী সেনাপতি। তারপর দেখি—শাসক, নিরপেক্ষ বিচারক, ধর্মীয় শিক্ষক, গণতন্ত্রের জনক ও জন্মদাতা, সফল রাজনীতিবিদ ইত্যাদি। তদানীন্তন সমাজে এমন একটি দিকও নেই, যাকে তিনি স্পর্শ করেননি। এবং যাকেই ধরেছেন, তারই আমূল পরিবর্তন করেছেন। অনেকে বিশেষ করে বহু মুসলমানদের ধারণা, তিনি এসেছিলেন নামায পড়াতে ও জান্নাত পাইয়ে দিতে মাত্র। ইসলাম মোটেই তা নয়। অন্যান্য ধর্মে জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ নয়; ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (A complete code of life) বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের যে

বিশেষ পার্থক্য, তা এখানেই। স্রষ্টার সৃষ্ট জগতের এমন কোন দিক নেই যে দিককে ইসলামে আবৃত করে না। সমাজ-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, অর্থাৎ মানবজীবনের যা কিছুই বলি, সবই মহানবী-প্রতিষ্ঠিত ইসলামের অঙ্গ বা অংশ। কেননা ইসলাম—সত্য ও সুন্দরের পথে সমুন্নত জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থায় তিনি সার্বিক ভাবেই কৃতকার্য।

এই সুন্দর ও সমুন্নত জীবন ব্যবস্থাপনার সাধনায় অন্যায়, অবিশ্বাস ও অসততার বিরুদ্ধে মহানবীকে যারা সাহায্য করল, শক্তি দিল; তারা আরামপ্রিয় সেনা নয় বরং তাঁরা নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত বিতাড়িত হয়ে তৌহিদের মহাবাণীতে দৃঢ় বিশ্বাসী ও ঈমানের জ্যোতিতে প্রজ্বলিত অনির্বাণ শিখা, যারা মহানবীকে সঙ্গ দিয়েছিলেন সবসময়। তারা মহানবীজীর প্রধান সেনাপতি রূপী চরিত্রের অসংখ্য সেনারূপী সৎ গুণাবলী ঃ

(১) সত্যবাদিতা ঃ সত্যবাদিতা ছিল মহানবীর জীবনের প্রথম ও প্রধান ভূষণ। তিনি জীবনে একদিনও একটিও মিথ্যা কথা বলেননি। তিনি এসেছিলেন সত্য বলতে ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে। মানব-সমাজে প্রচলিত তিনটি নীতি—উত্তম, মধ্যম ও অধম, যাদের মধ্যে সততা উত্তম নীতি। কিন্তু তাঁর নিকট সততাই ছিল একমাত্র নীতি।

(২) বিরল সাহসিকতা ঃ যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যার মোকাবিলা করার জন্য অসীম সাহস সর্বদাই তাঁর ছিল। নবুয়ত লাভের পর মক্কার তেরো বছর জীবনে তাঁর কোন রূপ আত্মরক্ষাকারী বা প্রতিরক্ষাকারী কোন শক্তিই ছিল না। একাই চরম সাহসিকতার সাহায্যে এগিয়েছিলেন। যখন অসভ্য আরব তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে, অত্যাচার করছে, পাথর নিক্ষেপ করছে, একঘরে করছে, এমনকি প্রাণে বধ করার ষড়যন্ত্র করছে, তখনও তিনি সাহস হারাননি। অদম্য মনোবল-সহ এগিয়ে গেছেন অত্যাচারের শিকার হয়ে, কোন অলৌকিকতার ভেল্‌কি দেখিয়ে নয়। শেষে মুক্তি পেয়েছেন এবং মুক্ত করেছেন দুর্গত মানবতাকে, বন্দী করেছেন আচারের নামে বিশ্বব্যাপী ব্যভিচারকে।

(৩) অসীম উদ্যম ঃ মহানবী জীবনে ক্লান্তিহীন উদ্যম (Tenacity) ও বিরল বিচক্ষণতা (Talent) লাভ করেছিলেন। যে বিরল সাহসিকতাকে বুকে ধারণ করেছিলেন, তাকে বহন করতে কোনদিনই উদ্যম হারাননি।

(৪) প্রতিশ্রুতি রক্ষা ঃ জীবনে যখনই কাউকে কোন কথা দিয়েছেন, তা কখনও ভঙ্গ করেননি। জীবনের যে কোন অবস্থাতেই তিনি তাঁর কথার মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

(৫) দূরদর্শিতা ঃ সুদূর অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি অতি সহজেই সমাজ সংস্কারের জন্য, মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিতে পারতেন।

(৬) সহ্য শক্তি ঃ যে কোন পরিকল্পনা তিনি নিতেন, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে, যত বাধাই আসুক, যত কষ্টই আসুক। সকল কিছুকেই অকাতরে অবলীলায় অম্লান বদনে সহ্য করতে পারতেন। এমনি ছিল তার চরিত্র বল।

(৭) ক্ষমা গুণ ঃ মহানবীজীর চরিত্রে ক্ষমা গুণ এতই প্রবল ও বেশি ছিল যে, সমগ্র জীবনে তাঁর ব্যক্তিগত কারণে, তাতে সে কারণ যত বড়ই হোক না কেন, পাপী যত বড়ই জঘন্যরূপী পাপী হোক না কেন, তাকে বা তাদের শাস্তি না দিয়ে হাসিমুখে ক্ষমা করেছেন। প্রতিশোধ না নিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। জীবনে কোন পাপীকেই তিনি ঘৃণা- করেননি, পাপকে ঘৃণা করেছিলেন। জঘন্যতম পাপীকেও শাস্তি না দিয়ে সংশোধন করেছিলেন।

(৮) দয়ার সাগর দরদীমন ঃ ছোট-বড়, শত্রু-মিত্র, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী সকলেরই জন্য মহানবী ছিলেন দয়ার-সাগর। জীবনে একটি বারও কোথাও প্রতিশোধ নেননি। মক্কার অত্যাচারে, ওহোদের মাঠে, তায়েফের প্রান্তরে যা কিছু ঘটল, এরপর মহানবী যে পরিচয় দিয়েছেন, সেখানে স্বয়ং বিশ্ব-স্রষ্টা বলে উঠলেন—"রাহ্‌মা-তাল্‌-লীল-'আলামীন"—তুমি বিশ্বের জন্য করুণা স্বরূপ। ২১ ঃ ১০৭, ৩৪ ঃ ২৮।

(৯) বিব্রতহীনতা ঃ মহানবী জীবনে কোনদিনই বিব্রত বা বিচলিত বোধ করতেন না। যত বিপদই ঘটুক, যত আনন্দই জুটুক, মহানবীর মানসিকতা থাকত—সাগরের ন্যায় প্রশস্ত। জাগতিক কোন জঞ্জাল তাঁকে কিছুতেই জড়িয়ে ফেলতে পারত না। আনন্দ নিরানন্দ দুটোকেই তিনি এক সঙ্গে হজম করতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে কোন কিছুই হজম করতে পারেনি। এক কথায় তিনি কোনদিনই মানসিক ভারসাম্য হারাতেন না।

(১০) নির্লোভ ঃ জীবনে লোভ-লালসা কাকে বলে তিনি মোটেই জানতেন না। নির্লোভ ও নির্ভীকতা তাঁর চরিত্রে সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হয়ে উঠেছে। যদিও তিনি একদিন আরবেব মুকুটবিহীন সম্রাট হয়েছিলেন। তবুও মৃত্যুকালে দেখা গেল বিশ্বের এক নিঃস্ব মানব, রিক্ত মানব।

(১১) ইচ্ছা ঃ তাঁর আপনার জন্য আপন-ইচ্ছা বলে কিছু ছিল না, বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তিনি ছিলেন বিশ্ব-স্রষ্টার দূত। তাই বিশ্বস্রষ্টাব কামনাকেই তিনি আপন কীর্তি রূপে রেখে গেছেন।

কর্মী তলিয়ে যায় অতল জলে
কীর্তি দাঁড়িয়ে রয় আপন বলে।

ইসলাম তাঁর সেই অমর কীর্তি। বিশ্বে এমন কোন দেশ, এমন কোন স্থান নেই, যেখানে তাঁর কীর্তি সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নেই। তিনি ছিলেন কর্মবহুল জীবনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, তাঁর জীবন সর্বমানবের নিকট অনুশীলনের জীবন, কি করে একটি সাধারণ মানুষ ও বিধাতার দেওয়া জন্মগত দান দ্বারা অসাধারণ হতে পারে, তাঁর মহাজীবন আমাদের ওই শিক্ষাই দেয়—সত্যবাদী হতে, সাহসী ও সাধক হতে, উদ্যমশীল হতে, দয়াবান হতে, জগৎপ্রেমিক হতে, লোভ ও প্রলোভনে সকল অবস্থাতেই কথা রাখতে।

সর্বশেষে আমরা সকল কিছু থেকে একেবারেই মুক্ত হয়ে একটি কথা বলতে পারি, যদি কেউ মহানবীর মহান চরিত্রের মহৎ গুণগুলোর প্রতি একবার আন্তরিকতার সঙ্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেন, তাহলে যে কোন সাধারণ জীবন অসাধারণ হতে বাধ্য। সুতরাং সহজে সাবলীলভাবে সাধারণকে অসাধারণ কবার, মানুষকে মানুষ করার যে চরিত্র বল, যে সাধনা, যে উপাদান, তাই ছিল মহানবীর অকল্পনীয় কৃতকার্যতার অন্তরালের আসল রূপ ও রহস্য।

মহানবীর মহাজীবন থেকে আমরা জীবন গঠনের যে অনুপ্রেরণার উপাদান লাভ করি—

কি দিয়ে জীবন গড়ে কেমন ক'রে
সাধনা সংযম রোদে শুকিয়ে ম'রে।
কে করে কেমন করে জীবন গঠন
জীবনেরই ভাঙা গড়া উত্থান পতন।
যে তিন পল্লবে ফুটে জীবন-বারতা—
সততা সাধনা আর তব সংযমতা।

কাব্যে মহানবী

দূত মহম্মদ (দঃ)

জন্ম নিয়ে সতী বালা আমিনা জঠরে
আসিয়াছে আল আমিন আবদুল্লাহর ঘরে।
সততায় সূর্য ম্লান করেছে আমিন
চরিত্রের শুভ্রতায় চন্দ্রও মলিন।

তোমার সংজ্ঞায় যেটি শ্রেষ্ঠ নিখুঁত
দয়ার ভাণ্ডার তুমি আল্লাহর দূত।
মহম্মদ মানুষ তবে হেন সে হৃদয়
আজীবন আমরণ ছিল সত্যময়।

বিশ্ব-করুণায় মহম্মদ (দঃ)

বলেন স্বয়ং আল্লাহ্ অন্য কেহ না—
'মহম্মদ আমার দূত বিশ্ব করুণা।' *
বিশ্বের করুণা তুমি করুণার ভরে
এসেছ আল্লাহর দূত সকলের তরে।
কোরআন স্বয়ং সাক্ষী অন্য কিছু না
'মহম্মদ আল্লাহর দূত বিশ্ব-করুণা।'
জীবনের উষা লগ্নে যে জন আমিন
অন্তঃ লগ্নে 'রাহ্মাতাল্লীল আ'লামীন'।

সকল সৃষ্টিতে তব দয়ার আস্বাদ
পড়েনি জগৎ-পশু জীব জন্তুবাদ।
বনের হরিণী হতে গৃহস্থের উট
করেছে প্রমাণ তার কভু নয় ঝুট।
মরুর মানুষ তবে এত দয়াময়
মেঘ যারে ছায়া করে ধূপের সময়।
তুমি যে অখণ্ড জনের অখণ্ডিত দূত
তোমারে খণ্ডিত করে কেটে করি খুঁত।

সীমিত সম্মানে বেঁধে আপন গোত্রের
অসম্মান করা হয় জগৎ দূতের।

বিশ্ব-বিজয়ী মহম্মদ (সাঃ)

বলেন মানব শ্রেষ্ঠ মহম্মদ ধরার—
এ সংসার বিধাতার একটি পরিবার.
উত্তম তিনিই এক বিধির দরবারে
যে-জন উত্তম এই বিশ্ব-পরিবারে।
তোমার জীবন ছিল এমনি পর্যায়
কোন দিন কোন জনে জব্দ কর নাই।
ফুটেছে মহান শিক্ষা তব আচরণে—
'জয় কর মানুষেরে ভালবেসে মনে।'
জয়ের উপরে জয় শ্রেষ্ঠ বিজয়—
আল্লাহর আরশ্ ভূমি মানব-হৃদয়।
আপন অন্তরে তুমি অনুভূতি নিয়ে
জয় কর মানুষেরে ভালবাসা দিয়ে।
দেশ নয়, রাজ্য নয়, কোন কিছু নয়
জয় কর রিক্ত মনে মানব-হৃদয়।

স্নেহ শ্রদ্ধা ভালবাসা দয়ামায়া দাও
প্রতিদানে কোন কিছু নাহি যেন চাও।
দিবেন মহান আল্লাহ্ যত কিছু দেওয়ার
পাওয়ার ঊর্ধ্বে পাবে যত কিছু পাওয়ার।
তুমি ছিলে নিঃসম্বল দেখালে বিস্ময়
তোমার প্রীতির জয় 'মদীনা-বিজয়'।
প্রাপ্য যার প্রাণদণ্ড সেই পাপী জনে
ক্ষমাই করোনি শুধু দিলে স্থান মনে।
আজীবন শত্রু জেনেও জব্দ কর নাই
সুদিনে দুর্দিনে দিলে অন্তরেতে ঠাঁই।
শত্রু মিত্র ভেদাভেদ ভুলিয়া আপন
মানবে ভ্রাতৃত্ববোধ করিলে স্থাপন।
করিয়াছ সর্বত্র সেই মহাজয়—
খোদার আরশ ভূমি মানব-হৃদয়।

প্রেম প্রীতি ভালবাসা, তরবারি নয়—
তোমার প্রেমের জয় 'মক্কা বিজয়'।
অসভ্য বর্বর আরব, সেদিন দানব
তারি মাঝে নিঃসম্বল নিরক্ষর মানব।
বাঁধিলে স্নেহের ডোরে আরব জাহান
দেখিল জগদ্বাসী—এ কোন্ মহান।
স্নেহ মায়া মমতার পূর্ণ পরিণয়—
তোমার স্নেহের জয় 'আরব বিজয়'।
শিখুক জগদ্বীর জয় কারে বলে
অস্ত্র নয়, শস্ত্র নয়, নয় পশু বলে।
প্রেম প্রীতি ভালবাসায় না হইলে জয়
সে জয় জয়ের নামে চির পরাজয়।
স্নেহ মায়া মমতায় না জাগিলে বোধ
জ্ঞানীরে বলেছো তুমি অজ্ঞানী নির্বোধ।
তোমার দরদী মন তরবারি নয়
আনিয়াছে তব লাগি মৃত্যুহীন জয়।
পেয়েছিলে প্রীতিভরা এমনি হৃদয়—
তোমার প্রেমের জয় বিশ্ব-বিজয়।

মানুষ মহম্মদ (দঃ)

'মানুষ ব্যতীত আমি অন্য কিছু নহি
এসেছে আমার প্রতি আল্লাহর ওহি।
তোমাদেরই মতো আমি মানুষ জানি
এসেছে আমার 'পরে আল্লাহর বাণী।'
বলেন মহম্মদ নবী শান্তিকামী—
মানুষেরে ভালবাসি মানুষ আমি।
মানবে বলোনি শুধু কর্তব্য স্মরি
তুমি সেই মানবতার শ্রেষ্ঠ দিশারি।
দেখিয়াছ ঘৃণা ভরে রাজ্য ভাঙা গড়া
দেখনি মানুষ তার মনুষ্যত্ব ছাড়া।
দাবিদারে নও শুধু মানব সন্তান
শক্ত হাতে করিয়াছ সুবিচার দান।
কুসুম ও কোমল নয় যে চিত্ত সম
বজ্রও কঠোর নয় কঠিনতম।
কোমলে কুসুম চিত্ত যেই মহাজন
কঠোরে বজ্র রূপ করেছে ধারণ।
বিনয়ে কুসুম হতেও নম্র নরম
বিবেকে বজ্র হতেও ভীষণ চরম।

নীতিতে মহম্মদ (দঃ)

তোমার নীতির ধারা কে করিবে বদ
তুমি যে সাগরগামী স্রোতবাহী নদ।
নিঃস্ব জীবনে শুধু নৈতিক বল
মানুষে পাহাড় হতেও করেছে সবল।
প্রলোভনে ভুলো নাই ভয়ে নও ভীতু
মানুষ—আল্লাহর মাঝে ছিলে মহাসেতু।
নিখিল পেয়েছে তোমায় নীতিতে বিন্দু
আপন গতিতে ছিলে অজেয় সিন্ধু।
রাখিয়া 'তওহিদ' 'রব' হৃদয়ে বন্দী
সেখানে মানোনি কোন শর্ত সন্ধি—
'দুই হাতে দাও যদি সূর্য আর চাঁদ
আমার আদর্শ আমি নাহি দিব বাদ।'

ক্ষান্ত হওনি কোথাও ছিল না ক্লান্তি
চেয়েছো জীবন জুড়ে জগৎ শান্তি।

আদর্শে মহম্মদ (দঃ)

কর্মহীন উপদেশ কাজহীন কথা
নিখিল মানব লাগি নির্মম ব্যথা।
কর্ম কর প্রাণপণে ধৈর্য ধর তবু
কর্মহীন প্রার্থনা করনাক কভু।
প্রাণহীন উপদেশ কথা নয়, কাজ
গড়িতে উদ্যত করে মানব সমাজ।
দাও মোরে সেই মন ধৈর্য ধরি কাজে
সাধনায় শক্তি দাও উপাসনা মাঝে।

জীবিকা জীবন লাগি করি বিশ্বাস
জীবনেরে কর নাই জীবিকার দাস।
আদেশ করার আগে নিজেরে তুমি
আপনাকে করিয়াছ আদিষ্ট ভূমি।
আদেশ করেছ যাহা উপমা ধরি
করিতে বলার আগে নিজ হাতে করি।
অন্তরে তারই কথা অন্তঃ করে জয়
যে জন করিয়া বলে আদর্শ নিশ্চয়।

তুমি নর নরোত্তম নরের প্রধান
দিয়েছ চলার পথে উত্তম বিধান।

প্রভু ভৃত্যে মহম্মদ (দঃ)

বলেন—দীনের নবী রসুল মোদের—
'মায়ের পায়ের তলে জান্নাত তোদের।'
প্রভু ভৃত্য সম্পর্কেও মানুষ সমান
মানুষ মহম্মদ তার করেছে প্রমাণ।
প্রয়োগ করেনি যেথা কথার প্রাকার
অত্যুচ্চ জীবনের ব্যক্তি-ব্যবহার
আজীবন ভৃত্য যায়েদ বলিয়াছে যা
'কখনও বলেনি মোরে উহ্ কিংবা আহ্'।
বিরক্তির বিন্দু সহ কখনও ফোটেনি

'এ কাজ করেছ কেন ও কাজ করোনি'?
জীবনের একটি দিনও নহে ব্যতিক্রম
রাখিয়াছ বজ্রকণ্ঠে মানব সম্ভ্রম।
বলেন দ্বীনের নবী মহম্মদ—'অচিরে
মিটাও শ্রমের দাম ঘর্মাক্ত শরীরে।'
'খেতে দাও ভৃত্যগণে যা ভোজন কর
পরতে দাও চাকরের যে কাপড় পর।'
যে কাজ আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়তর
তোমরা সকলে আজ দাসমুক্ত কর।

মহানে মহম্মদ (দঃ)

মানব জীবন যাতে শ্রেষ্ঠ সফল
মানুষের সেবা আর মানব মঙ্গল।
তোমাকে দেখিতে যদি না করেছি ভুল—
তুমি যে পবিত্র ফুল, একথা নির্ভুল।
কল্যাণই কামনা যার সঞ্জীবনীমূল
জীবন বীথিকা বনে তুমি সেই ফুল।
মানুষের মাঝে মোদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে

জিজ্ঞাসিতে বলিলেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে—
'যে করেছে তাতে তোরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বল
মানুষের সেবা আর মানব মঙ্গল।
যে জন করেন তিনিই মানব মহান
মানুষের সেবা আব মানব কল্যাণ।'
তিনিই মহান যিনি মানবের মনে
প্রশংসিত পরিবারে প্রতিবেশী জনে।

মনের ফসল নয় মানসিক ক্ষেত
দেখিবে মহান প্রভু তোমার নিয়েৎ।

আচার-ব্যবহারে মহম্মদ (দঃ)

তোমার মনুষ্য ব্যথা মানবতার দীপ
জ্বেলেছে জগৎ মাঝে কনক-প্রদীপ।
তোমার মনুষ্য শিখা না লভে নির্বাণ
দিশেহারা জগতেরে দিবে দিক দান।
তোমার থিওরি নয় তব কার্যধারা
জগতের মূল নীতি নিত্য করে খাড়া।
সমাজে নাহি কোন এমন সে দিক
যে দিকে পড়েনি তব দৃষ্টি অনিমিখ।
সমাজে এমন কোন দিক নাই যাতে
পড়েনি তোমার দৃষ্টি সূক্ষ্মভাবে তাতে।

'আপন আচারে তুমি হও হে তেমন
অন্য হতে পেতে চাও নিজেরে যেমন।'
'হোক তব ব্যবহার মানব সমাজে
যেরূপ পাইলে তুমি খুশি হও নিজে।'
সদাই প্রফুল্ল মন বিরাট অন্তরে
কখনও হওনি ভার কাহারো 'পরে।
জগতের সব গ্লানি করিতে নির্মূল
মানব সমাজে তুমি ফুটেছিলে ফুল।
দেখিয়া ফুটন্ত ফুল প্রফুল্ল হিয়া
হৃদয় ফুলেরই ন্যায় উঠে বিকশিয়া।

বলেন দ্বীনের নবী তব ইনসানিয়াত
গড়িবে জান্নাত জেন তব ইখওয়ানিয়াত।

মানব-সূর্য মহম্মদ (দঃ)

করোনি বিভেদ সৃষ্টি মানবে ভ্রান্তি
তোমার ধর্মই ছিল মূলত 'শান্তি'।
স্নেহেতে করেছ জয় জগৎ-সূত্র
শ্রদ্ধাতে বেঁধেছ তুমি চরম শত্রু।

বিবাদে ধরনি কভু ঢাল তলোয়ার
বিচারে দিয়েছ ক্ষমা প্রাণদণ্ড যার।
ভাই বলি ধরিয়াছ অরিকুল কাঁধ
স্নিগ্ধ করেছ ধরা তুমি হেন চাঁদ।

আচারে পেয়েছে আলো জগৎভূমি
মানব সমাজে নবী সূর্য তুমি।

গণতন্ত্রে মহম্মদ (দঃ)

এ ধরার মালিকানা জগৎ স্রষ্টার
সকল সম্পদ হতে সব কিছু তার।
তোমার আমার বলে কোন কিছু নাই
জগৎ-স্রষ্টার ধন আমরা সবাই।
শিখাইলে মানুষেরে স্রষ্টা সবাকার
সৃষ্টিকুলে সকলের সম অধিকার।
এ জগতে আছে যদি রাজ সিংহাসন
সর্বহারা মানুষের হৃদয় আসন।
রাজা যদি হতে চাও মুকুট বিহীন
দেখ তুমি দু' নয়নে কারা দীন-হীন।
দম্ভহীন রাজশক্তি করিতে বরণ
জয় কর মানুষের হৃদয় আসন।

চুরি আর জোয়াচ্চুরি নামে ভোট নয়
মানুষের খোলা মন করিবে নির্ণয়।
বলে নাই জোরে নাই জাতির জনক
মানুষই করিবে ঠিক মানব-সেবক।
শিখাইলে মানুষেরে—মান-মানবতার—
জগতের গণতন্ত্র সাম্য অধিকার।
দাও নাই রাজতন্ত্রে মানুষের রাজ
শিখাইয়েছ গণতন্ত্রে গড়িতে সমাজ।
সমস্ত সম্পদ 'পরে সেই এক প্রভু
অসাম্য অধিকার কারও নাই কভু।
সকল সম্পদে শুধু সেই এক দায়ী—
যে জন অপব্যয়ী অমিতব্যয়ী।

শিখাইয়েছ মানুষেরে আল্লাহ্ নিরাকার
দিয়েছিলেন সকলের সম অধিকার।
এ সব থিওরি নয় তোমার জীবন
ফেলেছে সমাজ মাঝে সূর্যের কিরণ।
অবাধে করিতে পার রুজি রোজগার
অফুরন্ত সঞ্চয়ের নাহি অধিকার।

বলেছে কঠোর কণ্ঠে হাদিস কোরআন
এ সব দোষেতে দোষী সবাই শয়তান।
মানুষ খলিফা শুধু খাদেম খোদার
এ কথা জানে না যেই নহে জনতাব।
গড় নাই রাজতন্ত্রে মানব-সমাজ
শিখাইলে গণতন্ত্রে সভ্য-সমাজ।

ঘৃণাভরে দেখিয়াছ রাজ্য ভাঙা-গড়া
মানুষেরে দেখ নাই মনুষ্যত্ব ছাড়া।

মুজাহিদ মহম্মদ (দঃ)

বলেন দ্বীনের নবী রসুল মোদের—
জেহাদ রিপুর সঙ্গে লড়াই তোদের।'
জালেমে ঠেকাতে জোর বাদ্-প্রতিবাদ
সশস্ত্র রূপ নিলে ইসলামে জেহাদ।
আপস করোনি যেথা আল্লাহর তওহিদ
জুলুম দেখিলে ছিলে শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ।
জেহাদ যাহার লাগি যুদ্ধ আমরণ—
অন্যায় অবিচার করিতে দমন।
দুই হাতে তুলে ধরে দিলে আমন্ত্রণ
শাশ্বত জীবনের স্বাদ বিতরণ

জেহাদ যাহার লাগি যুদ্ধ আমরণ—
সাম্য ভ্রাতৃত্ব 'পরে সমাজ গঠন।
জেহাদে ছিল না কোথাও রাজ্য ভাঙা-গড়া
জেহাদ করোনি কোথাও মনুষ্যত্ব ছাড়া।
বলেন মহম্মদ নবী শ্রেষ্ঠ জেহাদ—
আপন রিপুর সঙ্গে করিলে বিবাদ।
রাখিতে অন্তরে এক 'আল্লাহর তওহিদ'
লড়িলে মানব কুলের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ।
যে করেছে, সেই করে শ্রেষ্ঠ জেহাদ
আপন রিপুর সঙ্গে সদা প্রতিবাদ।

তুলিতে 'আল্লাহর তওহিদ' ধরেছিলে জিদ
মহম্মদ মানবকুলের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ।

কামনার মহম্মদ (দঃ)

তোমার কামনা যেটি বলেছে কোরআন—
ধন নয়, জন নয়, 'দাও মোরে জ্ঞান'।
বুকেতে বাসনা আর ধমনীতে ধ্যান—
'হে বিশ্বপালক মম বৃদ্ধি করো জ্ঞান'।
করেছ ধৈর্যের সঙ্গে অন্তহীন ধ্যান
পেয়েছ নিখিল জোড়া আদি অন্ত জ্ঞান।
সদাই জাগ্রত ছিলে সদা হাসি মুখে
বলিতে সত্য বাণী সব সুখে দুঃখে।

কামনার শীর্ষে কুলে তোমার কাম্য
মানবের মাঝে দিল মানুষে সাম্য।
জীবনের একদিনও ছিল না ক্লান্তি
আনিতে ধরার বুকে মানবে-শান্তি।
এই ধূলি ত্রিধরায় তোমার প্রার্থনা
জীবনেরে ধন্য করি দেয় উদ্দীপনা—
'সম্মানিত কর মোরে করো নাক হীন
মহান কর গো মোরে করো নাক দীন।'

মানুষ আবার

জগৎ জনেতে যিনি মহা প্রেমাস্পদ
করুণার দূতবাহী নবী মহম্মদ।
সার্থক তোমার লাগি নাম নির্বাচিত
'মহম্মদ' নামেরই অর্থ 'অতি প্রশংসিত'।
বলেছো বানিয়ে নয় বিনয়ের স্বরে
এসেছ মানব তুমি মানবের ঘরে।
তোমারে পেয়েও কেন পিপাসা পাবার
মানুষের মাঝে তুমি মানুষ আবার।
ধরার রসুল তুমি হাবিব খোদার
জগৎ সৃজিত হলো সৌজন্যে তোমার।
প্রাণ দিয়ে পেশ করি প্রাণের মিনতি
তোমাতে বর্ষিত হোক অপার শান্তি।

কোরআন—২ ঃ ৩১, ৩২, ৮৭, ৯১, ৩ ঃ ৩১, ১১৪, ১৫৯, ৪ ঃ ১৬৫, ১৭০, ৭ ঃ ১৫, ১৫৮, ৯ ঃ ১২৮, ১২৯, ১০ ঃ ৪৭, ১৩ ঃ ৭, ১৫ ঃ ১০, ১৬ ঃ ৩৬, ১৭ ঃ ১৫, ১৮ ঃ ১১০, ২১ ঃ ২৫, ১০৭, ২৪ ঃ ৫৪, ৫৬, ২৬ ঃ ১৪৩, ৩৩ ঃ ২১, ৫৬, ৩৪ ঃ ২৮, ৩৭ ঃ ১৮১, ৪১ ঃ ৬, ৪৮ ঃ ৮, ৬৮ ঃ ১-১০ গ্রন্থকারের কাব্যকানন গ্রন্থ থেকে।

❑ পঞ্চম পর্ব ❑

চরিত্রে মহানবী

কর্মে, ধর্মে, চরিত্রে, বৈচিত্র্যে, শাসনে, সংস্কারে ও সভ্যতায় হযরত মহম্মদ (সাঃ)

- মহানবীর নৈতিক চরিত্রই কোরআন
- মানবতার উত্থান-বীজ পবিত্র কোরআন
- মহানবীর চরিত্র-চিত্রণ মানবতার শেষ উত্তরণ

চরিত্রে মহানবী (দঃ)

ঘনঘোর অন্ধকারে পৃথিবী যখন
কু-আচারে ব্যভিচারে লিপ্ত প্রাণপণ।
সংসার সমুদ্রবুকে জেগেছিল দ্বীপ
দুর্গত মানবতার পূর্ণ প্রদীপ।
ধরার বুকেতে এল মানব-চরিত্র
আহম্মদ মহম্মদ নামে অতি পবিত্র।
বিধাতার দূত তুমি হে সম্রাট নবী
কোরআন তোমারই প্রাণের পূতপূর্ণ ছবি।
সমগ্র জীবন জোড়া এমনি সম্ভ্রম
জীবনের একটি দিনও নহে ব্যতিক্রম।
মস্তক বিহীন এক মানব যেমন
মহম্মদ বিহীন এই জগৎ তেমন।
হে বিশাল হে বিরাট হে মহান নবী
এঁকেছিলে জীবনের হেন এক ছবি,
চন্দ্রও মলিন যেথা তোমার চরিত্র
বাগানে পুষ্প নাই হেন পবিত্র।
মহানবীর মহাজীবন চরিত্র চিত্রণ—
মানুষের মানবতার শেষ উত্তরণ।

কোরআন—৩ ঃ ১৪৪, ৪ ঃ ১৬৫, ১৭ ঃ ১০৫, ২১ ঃ ১০৭, ২৫ ঃ ৫৬, ২৬ ঃ ৮, ৩৩ ঃ ৪০, ৩৪ ঃ ২৮, ৪১ ঃ ৬, ৪৮ ঃ ২৯, ৬০ ঃ ৬, ৬১ ঃ ৬, ৬৮ ঃ ৪

চরিত্রে মহানবী (সাঃ)

একটি মানুষের সমগ্র কর্মময় জীবনের ছবিটি ফুটে ওঠে তার আপন চরিত্রে। এই দিক দিয়ে আমরা অন্যের কথা না শুনে মহানবীর চরিত্রকে লক্ষ্য করতে পারি আপন জ্ঞানে, আপন বিবেকে, আপন নজরে। কেননা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন একজনও মহাপুরুষ, ধর্মাবতার বাঁ আল্লাহর দূত আসেননি, যাঁর জীবন-কথা বা সমগ্র জীবনের আদি-অন্ত মহানবীর মতো বিশ্বদুয়ারে এত খোলামেলা। কোথাও যেন এতটুকুও গোপনীয়তা নেই। তাই তাঁর চরিত্রকে সবদিক দিয়ে জানারও কোন অসুবিধা নেই। পূর্বাভাস তাঁর সেই অবর্ণনীয় চরিত্র-কথা।

চরিত্রে মহানবীতে আমরা দেখতে পাই—

• মা হালিমার কোলে দুগ্ধপোষ্য মহানবী থেকে বহু বালকের দলে চিরসত্যবাদী মহানবী, আবু তালিবের ঘরে মেষপালক বালক মহানবী থেকে সিরিয়ার বাণিজ্যপথে বণিকরূপে মহানবী, খাদিজার নিষ্ঠাবান কৃতকার্য কর্মচারী থেকে খাদিজার প্রাণপ্রিয় স্বামীরূপে মহানবী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে প্রকৃত সংসারী মহানবী থেকে হিরাগুহায় স্রষ্টার সঙ্গে স্বয়ং সাক্ষাৎকারী মোরাকাবায় মোশাহাদায় ধ্যানস্থ মহানবী, মক্কার অতি সাধারণ মানুষ থেকে মক্কার মাটিতে আল্লাহর নবীরূপে মহানবী সমাজচ্যুত মহানবী থেকে বিশ্বসমাজের ত্রাণকারী মহানবী, শত্রু পরিবেষ্টিত মহানবী থেকে লক্ষ লক্ষ মানবের হৃদয় দুর্গে মহানবী, মক্কার মাটিতে অত্যাচারিত বন্দী মহানবী থেকে মক্কার শাসনকর্তা মহানবী, মক্কার লাঞ্ছিত মহানবী থেকে মদিনার বাঞ্ছিত মহানবী, মদিনার পথে পলাতক মহানবী থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বদরের যুদ্ধে মহাসেনা মহানবী, বদরের যুদ্ধে বিজয়ী মহানবী থেকে ওহোদের যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষতবিক্ষত মহানবী, খন্দকের যুদ্ধে চিন্তিত মহানবী থেকে খাইবার যুদ্ধে বিজয়ী মহানবী, হুদাইবিয়ার প্রাঙ্গণে বাধাপ্রাপ্ত সন্ধিকারী মহানবী থেকে মক্কার বিপুল বিজয়ী মহানবী, আপন দেশ থেকে বিতাড়িত মহানবী থেকে বিদেশে অবস্থানরত বিজয়ী মহানবী, কোথাও বিচারাসনে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মহাবিচারক মহানবী, কোথাও দয়ার সাগর, বিশ্বকরুণা ক্ষমার মূর্ত প্রতীক মহানবী, কোথাও বা সবলের নিকট বীরবেশে মহানবী, কোথাও বা দুর্বলের নিকট স্নেহময়ী মায়ের বেশে মহানবী, আপন জাতি কুরাইশদের সঙ্গে মহানবী, আবার বিজাতীয় ইহুদী নাছারার সঙ্গে মহানবী, কোথাও বা আবু লাহাব, আবু জেহলের সঙ্গে মহানবী, কোথাও বা সিদ্দিকে আকবর আবুবকর, কোথাও বা ফারুকে আজম ওমর ফারুক, কোথাও বা জিন্নুরায়েন ওসমান গনী, কোথাও বা আসাদুল্লাহ আলি হায়দারের সঙ্গে মহানবী, মদিনার মাটিতে দেশ পরিচালক মহানবী থেকে মদিনার পরিখা খননে মেহনতী মানুষের সঙ্গে মজদুর-মেহনতী মানুষ মহানবী, বড়লোকের শাসনকারী মহানবী থেকে গরিবের রক্ষাকারী মহানবী, আল্লাহর একত্ব প্রচারে মহানবী থেকে মানুষের মহত্ত্ব প্রচারে মহানবী, মানুষের নিবিড় বন্ধন থেকে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে মহানবী, বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া থেকে গণতন্ত্রের জনক গগনচুম্বী চিন্তানায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা মহানবী, ধনীর পরলোক মুক্তির নির্দেশকারী মহানবী থেকে দাসপ্রথার অবলুপ্তকারী মানুষের মুক্তিতে মহানবী, ধনীর জন্য কর (যাকাৎ-ফেতরা-সাদ্‌কা-উস্‌র) প্রথার প্রবর্তনকারী মহানবী থেকে

গরিবের দু'মুঠো অন্নের অনুশীলনে মহানবী, দীন-দরিদ্র মহানবী থেকে আরবের মুকুট-বিহীন সম্রাট মহানবী, প্রকাশ্য দিবালোকে মহানবী থেকে রাত্রির নিঝুম প্রহরের মহানবী, পুরুষের পৌরুষে মহানবী থেকে নারীর মর্যাদায় মহানবী, আচারে মহানবী, বিচারে মহানবী, সমাজের সমস্ত সংস্কারে মহানবী, জড়জগৎ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের মহানবী, প্রাণিজগৎ থেকে মনুষ্য জগতের মহানবী, মনুষ্য জগৎ থেকে স্বর্গীয় জগতের মহানবী, ইহকাল থেকে পরকালের অনুশীলনে মহানবী, তায়েফের মরুপথে নিখিলের নির্যাতিত মহানবী থেকে আল্লাহর আরশে আরোহণকারী সপ্ত আকাশভেদী মেরাজে মহানবী, জীবনের প্রারম্ভে পশু সেবায় মহানবী থেকে জীবনের অন্তিম লগ্নে মানব সেবায় মানব কল্যাণী গরিবের চির-দরদী বন্ধু মহানবী, যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ থেকে জীবন সায়াহ্নে ও মহাজীবনের অন্তিম শয়নে সকলের প্রতি সাবধানবাণীতে মহানবী—"সাবধান গরিব মানুষ, সাবধান গরিব মানুষ, সাবধান তোমার নামায, সাবধান তোমার নামায।"

জীবনের এই বহু বিচিত্র বিশাল মুক্ত প্রাঙ্গণে একটি মানুষের চরিত্রকে জানার আর কোনই অসুবিধা নেই। যাঁর যেদিকে ইচ্ছে, তিনি সেই দিকেই জেনে নিতে পারেন। এই দিকে লক্ষ্য রেখে মহানবী (দঃ)-এর চরিত্রকে এক নিমেষে যা অবলোকন করা যায়, তা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ও অখণ্ড মানবতার এক চূড়ান্ত উত্তরণ।

মহম্মদ মানুষ তবে আল্লার রসুল
ধরণীতে মানবতার মনুষ্যত্বের ফুল।

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক

মানবতার ত্রাণকারী মহানবী

১। নিখুঁত জীবন ছবি মহানবী (দঃ) ঃ সৃষ্টিকে ভালবাসা, সৃষ্টির সেবা করা, সৃষ্টিকে সৎ পথে পরিচালিত করা তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ব্রত ছিল। এই ব্রতকে তিনি আজীবন অকৃত্রিমভাবে পালন করেছিলেন। সাধারণের মঙ্গল চিন্তায় সমগ্র জীবন প্রায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন, নিজের মুখের অন্নও পরকে দিতেন। শুধু তাই নয়, অন্যের ক্ষুধা মেটাতে সমগ্র পরিবারের আহারও বিলিয়ে দিতেন। এই ভাবে দু'-একদিন নয়, আজীবন ত্যাগ ও তিতিক্ষার তুলিকায় জীবনকে নিখুঁত ও ত্রুটিহীনভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁকে দু'রূপে দেখতে পাই, একদিকে তিনি মহানের মহানবী, অপরদিকে সমগ্র মনুষ্য সমাজের, অখণ্ড মানবের এক নিখুঁত তুলনাহীন মহান ছবি। যে ছবি সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে আর কোথাও মেলেনি ও মিলবে না।

২। শ্রেষ্ঠতম মোজাহিদ মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ঃ জীবনের প্রথম স্বরূপে জগতের শ্রেষ্ঠতম মোজাহিদ (অন্যায়ের প্রতিরোধকারী)। সমাজের সকল পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন আমরণ একনিষ্ঠ সংগ্রাম 'জিহাদ' এবং যিনি এটা অকুতোভয়ে আজীবন নিঃশর্তভাবে পবিত্র মনে পালন করেন, তিনিই একমাত্র 'মোজাহিদ'। এই দিক দিয়ে মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) প্রথম জীবনে নবী নন, রসুল নন বরং সমাজ-সংস্কারে মরুজগতের

এক অচিন্তনীয় 'মোজাহিদ'। জিহাদের যে পবিত্র উদ্দেশ্য, তা কোন রাজ্য বা রাজত্ব জয় নয়। বরং পাপ ও অন্যায়কে পরাস্ত করা। আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে আরবের মাটিতে আপসহীন আমরণ সংগ্রাম শুরু করেছিলেন হযরত মহম্মদ (দঃ)। এই সংগ্রাম কোন রাজ্য জয় বা রাজকুমারীকে লাভের জন্য ছিল না; ছিল সমাজ সংস্কারে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে। জীবন-সূচনার প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে মৃত্যুর মহামুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই সংগ্রামে একেবারেই অবিচল। তাই জীবনের প্রারম্ভ থেকে জীবন-সায়াহ্ন পর্যন্ত আমরা মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে যে রূপে দেখতে পাই, তা নিখিল বিশ্বের এক নজিরবিহীন শ্রেষ্ঠতম মোজাহিদ রূপে। এই দিক দিয়ে তাঁর প্রথম যে স্বরূপ, তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবী মহম্মদ (দঃ), অজ্ঞতার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী মহম্মদ (দঃ)। এর পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি নবী ও রসুল। তাই তাঁর প্রচারিত ধর্মের ধর্মাবলম্বীগণ একদিকে যেমন মুসলমান, অন্যদিকে ঠিক তেমনি (অন্যায়ের বিরুদ্ধে) মোজাহিদ। এর ব্যতিক্রম হলে কোন ক্রমেই মহানবীর খাঁটি উম্মত-শিষ্য বা ভক্ত হওয়া যায় না।

৩। মানবতার শেষ উত্তরণ মহানবী (দঃ) ঃ এক আল্লাহর একত্ব ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ব্রতে ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর চিন্তাজগৎকে তদানীন্তন বিশ্বসমাজের যে দুটো জিনিস সর্বাপেক্ষা বেশি আলোড়িত করেছিল, এবং যে দুটো জিনিসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি নিবদ্ধ হয়েছিল, তা হলো সমাজের দরিদ্র মানুষ ও অবহেলিত রমণীকুল। মহানবী ছিলেন অখণ্ড মানবসমাজের দরিদ্র মানুষ ও অভাগী রমণীকুলের দরদী বন্ধু এবং দুর্গত মানবতার চির মহান দূত, মরুর কল্যাণে মরুদুলাল, মানুষের চিন্তায় মহামানব, শান্তি ও সাম্যে মহাসেনা সমাজ-সংস্কারে সিদ্ধসাধক, প্রেম ও ভালোবাসায় পরমপুরুষ।

তাঁর জীবন-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল—সমগ্র বিশ্বে সকলের জন্য একটি পরিপূর্ণ আদর্শ জীবনধারার প্রয়োজন। যেখানে কোন কৃত্রিম ভেদাভেদ থাকবে না। ইসলামের আদর্শ হলো—সকল জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কৃত্রিম ব্যবধানগুলোর মূল উচ্ছেদ করা এবং বংশানুক্রমে বসে খাওয়ার মূলে কুঠারঘাত করা এবং সর্বজনগ্রাহ্য সকলেব জন্য গণতন্ত্র ভিত্তিক এক আদর্শ জীবনধারা স্থাপন করা। এটাই ছিল মহানবীর প্রধানতম ব্রত ও অন্তরের একান্ত কামনা এবং উদ্দেশ্য।

ইসলাম যেমন সকল ধর্মের শেষ ধর্ম, বিশ্বধর্মের শেষ সংস্করণ, হযরত মহম্মদ (দঃ) তেমনি সকল নবীর শেষ নবী। ইসলামে যেমন সকল ধর্মের সুন্দর গুণগুলোর পূর্ণ সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মধ্যেও তেমনি অসংখ্য নবীর অত্যুচ্চ গুণের অভূতপূর্ব সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। যেমন হযরত আদম (আঃ)-এর মহত্ত্ব, হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রচার প্রচেষ্টা, হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর বিনীত প্রার্থনা, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) একত্ববাদ। হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর আত্মত্যাগ, হযরত মুসা (আঃ)-এর পৌরুষ, হযরত হারুণ (আঃ)-এর কোমলতা, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য এবং সেনানায়কত্ব, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ধৈর্য, হযরত আইয়ুব (আঃ)-র সহ্য, হযরত দাউদ (আঃ)-এর সাহসিকতা, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বিচারজ্ঞান ও ঐশ্বর্য, হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর সরলতা, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর অনুশোচনা, হযরত ঈসা (আঃ)-এর অমায়িকতা ইত্যাদি সকল সুমহান গুণের পূর্ণ মিলন ঘটেছিল মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর

পূতপবিত্র চরিত্রে। সুতরাং ইসলাম যেমন বিশ্বধর্মের শেষ সংস্করণ, আর মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-ও তেমনি মানবতার শেষ উত্তরণ। তাই তিনি 'খাতামান্ নবীইন' বা শেষ নবী।

ইসলাম "ইন্সানিয়াৎ" বা মানবতার যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে তা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেমন নেই, তেমনি কোন কাজের মধ্যেও নেই। সেটি আছে মানব অন্তরে মানুষের গোপন ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে প্রবণতা, যে মানসিকতা, যে মননশীলতা, যে প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ করছে, সেখানে কর্মফল যাই হোক, কর্মীর সৎ উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করবে—তার মনুষ্যত্ব তার মানবতা। তাই মহানবী বলেন—"কার্যাবলী উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে।" কোরআনেও তাই—অদৃশ্যময় আল্লাহ্ মানুষের অদৃশ্যময় অন্তরকেই দেখেন। দেখেন তার সৎ-ইচ্ছা, সৎ-কামনা, সৎ-বাসনা ও সৎ-চিন্তা। ইসলামের মানবতা এই সু ও সৎ সূক্ষ্ম জগতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে লোকদেখানো—নামাজী, হাজী বা দাতা ইসলামের চোখে অভিশপ্ত ব্যতীত নয়।

কোরআন—২ ঃ ২৫, ১৮ ঃ ১০৭, ২৩ ঃ ১-৬, ৩৩ ঃ ৪০, ৮৭ ঃ ১৪, ১০৭ ঃ ১-৭

মহানবীর মানবতা

মানবতা মনুষ্যত্ব বলো হে মানব
স্নেহ নয় শ্রদ্ধা নয় দৈত্য-দানব।
জ্ঞান নয় গীতি নয় গজল গঠন
ঋক নয় বেদ নয় কোরআন পঠন।
বিদ্যা নয় বুদ্ধি নয় বিদগ্ধ প্রাণ
দয়া নয় দান নয় নিরস্ত্রে ত্রাণ।
ভয় নয় ভীতি নয় সাহস সুনাম
প্রেম নয় প্রীতি নয় প্রভুকে সালাম।

যে পর্যায়ে আন্দোলিত প্রাণ অহরহ
সুচিন্তা ধরিবারে সুন্দর মোহ।
করিতে যে দেয় প্রাণ মহৎ যাহা
তাহাই তো মানুষের মনুষ্যত্ব মহা।
সদিচ্ছার মূলে যাহা উৎসুকতা
বলো হে মানব ভাই তাই মানবতা। —কাব্যকানন

৪। **মানব-সূর্য মহানবী (দঃ) ঃ** ইসলামের শেষ নবী এই বিশ্ব-বন্দিত মনীষা হযরত মহম্মদ (দঃ) ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে ৮ জুন, ১২ রবিউল আউয়াল আমিনার গর্ভে আরবের মরু প্রান্তরে কুরাইশ বংশে মক্কার মাটিতে মানব-সূর্য রূপে উদিত হন। পিতা আবদুল্লাহ তাঁর জন্মের পূর্বেই সিরিয়া থেকে বাণিজ্য শেষে ফেরার পথে মদিনায় (ইয়াসরিবে) পরলোক গমন করেন। ফলে দাদা আবদুল মোত্তালিব শিশুটির লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন এবং নবজাতকের নাম রাখেন 'মহম্মদ' বা প্রশংসিত। মাতা স্নেহভরে পুত্রকে 'আহম্মদ' বা 'প্রশংসাকারী' বলে ডাকতেন। দুটো নামই কোরআন শরীফে উল্লেখিত আছে।

কোরআন—৩৩ ঃ ২৯, ৩৪ ঃ ২৮, ৪১ ঃ ৬, ৪৮ ঃ ২৯, ৬১ ঃ ৬

মরু জগতের শেষ ঐশী আল্লাহর বাণী কোরআন ফেরেশ্‌তা স্বর্গীয় দূত হযরত জিবরাইল (আঃ) কর্তৃক সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে 'আল্‌-আমিন', 'চির বিশ্বাসী', 'বিশ্ব করুণা', 'নিরক্ষর মানব', রসুলে আকরাম হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট তাঁর চল্লিশ বছর বয়স থেকে সুদীর্ঘ তেষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত প্রয়োজন মোতাবেক কখনও মক্কায় কখনও বা মদিনায় তাঁর মাতৃভাষা আরবীতে অবতীর্ণ হয়।

সমগ্র দেশজুড়ে অসভ্য আরব জাতির অকথ্য অত্যাচার অবলীলাক্রমে মাথায় নিয়ে তিনিই ছিলেন পবিত্র কোরআনের প্রথম প্রবক্তা ও প্রধান প্রচারক। তাঁর জীবনই ছিল কোরআন শরীফের প্রতিটি উক্তির প্রথম প্রয়োগভূমি। তাই তিনি ছিলেন জীবন্ত কোরআন। এইজন্য তাঁর পবিত্র জীবনই পবিত্র কোরআনের পূর্ণতম ব্যাখ্যা। কেননা, 'দাওনি কখনও কিছু না করে বিধান—তুমি তাই জগতের জীবন্ত-কোরআন।'

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন অসহায় মানুষের সহায়, মরুর প্রেমিক, দুর্গত মানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ, মানবতার দুর্জয় সাধক, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন একনিষ্ঠ সৈনিক। কোনরূপ লোভ বা প্রলোভন, দুর্দিনের দুঃসহ বেদনা, ভয় ও ভীতি তাঁর দুর্বার গতিকে কোনদিন পরাস্ত করতে পারেনি। তাঁর প্রাণ ছিল সংসারধর্মী। অথচ সংসার-বিজয়ী সত্য ও ন্যায়ের চির নির্ভীক লৌহ মানব। এক কথায় সমগ্র মরু ও মানুষের কল্যাণে তিনি ছিলেন অখণ্ড মানবতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নির্ভেজাল আদর্শ প্রেমিক ও দিশারী।

কিন্তু তা কোন অলৌকিকতার সুযোগ নিয়ে নয়, বা অতীন্দ্রিয়বাদের শীতল সমীরণে গা তুলে দিয়ে ফুঁক্ ফাঁক্ দিয়েও নয়। বরং দিবা ও রাত্রির সাধনার ঘর্মাক্ত শরীরে, কঠিন তপস্যায়, কঠোর সাধনায়, অর্ধাহারে, অনাহারে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আচারে-বিচারে মানবতার উৎকর্ষ সাধনে প্রাণের বিনিময়েও তিনি ছিলেন দুঃস্থ মানুষের দুর্গত মানবতার দরদী বন্ধু। এক কথায় সমগ্র মানবসমাজের এমন একটি দিকও নেই, যে দিকটির সময়োপযোগী সুদূর সংস্করণেও এই মহামানবটির দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এইভাবে সমগ্র মনুষ্য সমাজে মানব-সূর্য হযরত মহম্মদ (দঃ) সারা জীবন সূর্যের মতো আলো বিকিরণ করে ৬৩ বছর বয়সে গ্লানিময় সংসারের শ্রেষ্ঠতম সমাজ-সংস্কারকরূপে চির গৌরবরবি চির নিদ্রায় অস্তমিত হন।

আঁধারে পেয়েছে আলো জগৎভূমি
মানব-সমাজ নবী সূর্য তুমি।

হে মহানবী (দঃ), হে মোজাহিদ, হে মহাত্মন, হে বিশ্বসমাজ সংস্কারক, বিশ্বসমাজের ঘনঘোর অন্ধকারে তোমার পূত জীবন-প্রদীপ যে-দীপ জ্বালিয়ে গেল, তার অনির্বাণ শিখা কোনদিনই নির্বাণ লাভ করবে না। যতদিন মানুষ আছে, যতদিন মনুষ্য-সমাজ আছে, যতদিন গরিবের দুঃখ ও আহাজারি আছে, যতদিন অসহায় নর-নারীর অন্তরের আকুল আর্তনাদ আছে, যতদিন অত্যাচারী ও অত্যাচারিত আছে, যতদিন শোষণকারী ও শোষিত শ্রেণী আছে, ততদিন ওই সমস্ত নর-নারীর অন্তর-আত্মা থেকে, উত্তরোত্তর সমস্যা জর্জরিত সমাজ থেকে তোমার আবশ্যকতা ও তোমার অমরত্ব কেড়ে নেয়, মহাকাল আজও সে শক্তি অর্জন করেনি, এবং কোনদিনই করবে না।

৫। **আদর্শ মহানবী (দঃ) ঃ** যে মানুষটি তাঁর সমগ্র জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলেননি, জীবনে একদিনও কারও সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি, এরূপ একটি মানুষ, তিনি

মানই হোন, সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীর আদর্শ না হয়ে পারেন না। আমরা হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের প্রথম যে গুণটির কথা জানতে পারি, সেটা তাঁর সত্যবাদিতা। তিনি ছিলেন চির সত্যবাদী, চির বিশ্বাসী, তাই দুর্ধর্ষ আরব বেদুইন পর্যন্ত তাঁকে এক বাক্যে আল্-আমিন, চির বিশ্বাসী আখ্যা দান করেছিলেন। যখন তিনি এই উপাধি লাভ করেন তখন তিনি নবী নন, রসুল নন, একটি সাধারণ মানুষ মাত্র। তবুও সমগ্র আরব তাঁকে একমাত্র আদর্শ ব্যক্তি রূপে গ্রহণ করেন। কেননা শত পাপে জর্জরিত আরব সমাজ লক্ষ্য করেছিল—কি অনাবিল পবিত্র জীবন মহম্মদ (দঃ)-এর।

অনেক সময় একটি মানুষ অনাবিল পবিত্র হলেও সকলের জন্য আদর্শ স্থানীয় হতে পারেন না। কেননা মানবসমাজ বহুমুখী। আবার সেই সমাজের জীবনধারাও বহুমুখী। সুতরাং যে কোন একটি জীবন বহুমুখী না হওয়া পর্যন্ত বহু মানবের আদর্শ হতে পারেন না। এই দিক দিয়ে মহানবী মহম্মদ (দঃ)-এর জীবন ছিল বহুমুখী বা সর্বমুখী। তাই সমাজের এমন কোন অধ্যায় নেই যে অধ্যায়টাকে মহানবী স্পর্শ করেননি। এবং যাকেই তিনি স্পর্শ করেছেন, তারই তিনি আমূল পরিবর্তনও করেছেন। এই দিক দিয়েই সমাজের সকল অধ্যায়েরই তিনি ছিলেন আদর্শ মানব।

শিশুকালে তিনি অনাথ দরিদ্র, বাল্যকালে তিনি মেষপালক বালক, যৌবনে তিনি রুজির সন্ধানে ব্যবসায়ী। বিবাহিত জীবনে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে তিনি পূর্ণ সংসারী, হিরা গুহার নির্জনবাসে তিনি ধরণীর অসাধারণ ধ্যানস্থ তাপস। আল্লাহর দূত রূপে নির্বাচিত রসুল, মক্কার পথে পথে সমাজ-সংস্কারক, আপনজন দ্বারা নির্যাতিত ও সমাজচ্যুত মানুষ। বর্বর কুরাইশদের মাঝে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ, বিপন্ন জীবনের অন্ধকার রাতের মাঝে স্থির-লক্ষ্য মানুষ। সওর গুহায় গুপ্তমানুষ, গভীর রাতে মদিনার পথে দেশত্যাগী নবী। মদিনার মাটিতে উদ্বাস্তু মানুষ। বদর, ওহোদ, খন্দকের যুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বীরবেশে মহম্মদ (দঃ)। মদিনার মাটিতে জগতের প্রথম গণতন্ত্রের (Republic) জনক মহম্মদ (দঃ)। ইহুদী, নাসারা ও বহু বিজাতির সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মহম্মদ (দঃ), ধর্মের নানা বিধিবিধান দানে মহানবী। এছাড়াও আরও অসংখ্য দিক আছে। যেগুলোতে তাঁর পূর্ণ দৃষ্টি পড়েছে এবং যেগুলোকে তিনি পূর্ণভাবেই বিন্যস্ত করেছেন।

একটি চরিত্রের এই অসংখ্য গুণের সমাবেশই হচ্ছে মহানবীর চরিত্রের এক তুলনাহীন প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি মানবমণ্ডলীকে নিছক আত্মার পারলৌকিক মুক্তির পথ দেখাননি, তিনি সকল মানুষেরই ইহজগৎ থেকে পরজগৎ পর্যন্ত অখণ্ড সুন্দর জীবনের সন্ধান ও পূর্ণ স্বাদ পাওয়ার পথ দেখিয়ে গেছেন। তাই তিনি সর্ব কালের, সর্ব মানবের ও সর্ব দেশের আদর্শ।

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ।"

কোরআন—৩৩ : ২১

॥ মানবতার ফুল ॥

শেষ নাই সুগন্ধের কোন মহাফুল
কোন বাগে ফুটেছিলো মানব-মুকুল।
কার্ কোলে এসেছিল কোন্ মাতৃ দোলে
আরবের মা আমিনা মায়ের কোলে।

সে তো কোন ফুল নয় জবা ও পারুল
গোলাপ শেফালি নয় বেলী ও বকুল।
রসূলের শ্রেষ্ঠ জন আল্লাহর মকবুল
মহম্মদ মানুষ তবে মানবতার ফুল।
যাঁহার স্পর্শেতে ধন্য আ'বে জমজম
সৃষ্টি ফুলের সকলের সৌভাগ্য পরম।
সেদিনের দ্বি-শক্তি শক্তির চরম
ইরানের মহাদর্প, রোমের গরম,
সম্মুখ সমরে যারা পেয়েছে শরম
কঠিন পাহাড় কত হয়েছে নরম।
নিখিলের নিরামিশ মনুষ্যত্ব ছাড়া
নিয়েতে ছিল না কোন রাজ্য ভাঙ্গা গড়া।
মহম্মদ মানুষ তবে আল্লাহর রসুল
মানুষের মনুষ্যত্বের মানবতার ফুল। —কাব্যকানন

৬। মহান ব্রতে মহানবী (সাঃ) ঃ অধিকাংশ মুসলমান হতে অমুসলমানদের ধারণা মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) জগতের বুকে এসেছিলেন—জগতের মানুষকে জান্নাত বা স্বর্গ পাইয়ে দেওয়ার জন্য। এবং তার জন্য তিনি মানুষকে সবসময় নামায পড়তে, রোযা রাখতে খুবই কড়াকড়ি করে গেছেন। কথাটি একদিকে সত্য, বা আংশিক সত্য। কিন্তু মৌলিক বা সর্বসত্য নয়। কেননা এর অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে—তা ধর্ম প্রথম সংসারের জন্য ও শরীরের জন্য, পরে স্বর্গের জন্য, আত্মার জন্য। এবার আমরা একবার লক্ষ্য করব—তাঁর জীবনের প্রস্তুতি পর্ব। তাহলে সবকিছু পরিষ্কার হবে।

হযরত মহম্মদ (সাঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ৎ বা আল্লাহর মহান দূতের দায়িত্ব পেলেন। এই চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কি করেছিলেন, বা কি করতেন, যে সময়টা ছিল তাঁর মহান জীবনের পটভূমিকা স্বরূপ, পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি পর্ব স্বরূপ, যেমন ছাত্র-জীবনে ছাত্র-ছাত্রীগণ যে বীজ জীবনে বপন করে পরবর্তী জীবনে সেই ফল আহরণ করে, তাই ছাত্র-জীবনকে সমগ্র জীবনের প্রস্তুতি পর্ব বলা হয়। যে যেমন প্রস্তুতি নিতে পারে বা নেয়, পরবর্তী জীবনে সে সেইরূপ ফল লাভ করে। মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এরও এই সময়টা ছিল তাঁর আকাশ-ছোঁয়া মহান জীবনের ভিত্তিভূমি, পরবর্তীকালে যে ভিতের ওপর গড়ে উঠেছিল বা দাঁড়িয়েছিল—মহান নবুয়ৎ-জীবন। এই চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন—সত্যের একটা মূর্ত প্রতীক, সর্ব দিক দিয়ে সবার চোখে একটা আদর্শ মানব। যে আদর্শবাদের ওপর গড়ে উঠেছিল তাঁর মহান জীবনধারা, যে আদর্শবাদের ওপর তিনি লাভ করেছিলেন "নবুয়ৎ বা PROPHETHOOD"। এখানে নীরস বা নিছক ধর্মের কোন কচকচানি ছিল না। ছিল না কোন স্বর্গে যাওয়ার সস্তা চাবিকাঠির সুযোগ-সন্ধান। ছিল সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন নির্দেশাবলী, যা মানুষ মাত্রকেই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে, পুরুষ-মহিলা-নির্বিশেষে সাহায্য করে মনুষ্যত্বের উত্তরণে, মানবতার জয়গানে। যেমন ঃ

(১) আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করো না। তাঁকে স্মরণ করো।

(২) পিতামাতার অবাধ্য হয়ো না, তাঁদের সম্মান করো।

(৩) যেটা যার প্রাপ্য, পরিশোধ করো।
(৪) অমিতব্যয়ী হয়ো না, কৃপণও হয়ো না, মধ্যপথ ধরো।
(৫) কন্যাদের হত্যা করো না, পালন করো।
(৬) ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। প্রয়োজন হলে বিয়ে করো।
(৭) কাউকে হত্যা করো না, রক্ষা করো, ক্ষমা করো।
(৮) অনাথের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।
(৯) চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালন করো।
(১০) পৃথিবীতে গর্বভরে চলো না। অহঙ্কার আত্মশ্লাঘা, গর্ব ও অকৃজ্ঞতা অতীব মন্দ জিনিস।
(১১) সুদ খাবে না, গরিব কষ্ট পাবে।
(১২) দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করো না।
(১৩) গরিবকে দান, দাসকে মুক্ত করো।
(১৪) অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, এক হও।
(১৫) কোন মানুষকেই ঘৃণা করো না, এমনকি পাপীকেও না, তাকে সংশোধন করো। পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।
(১৬) নারীকে মর্যাদা দান করো, নিছক ভোগের বস্তু ভেবো না। (সমগ্র মানবমণ্ডলী একটি পাখি স্বরূপ, পুরুষ ও রমণী তার দুটো পাখা, একটি পাখাতে ওই পাখি ঊর্ধ্ব আকাশে কোনদিনই উড়তে পারে না।)
(১৭) সদা সত্য কথা বলো, মিথ্যা বলো না।
(১৮) জাত, বংশ বা কুলের গর্ব করো না, নিজ কর্মে দাঁড়াও।
(১৯) আপন কর্মের ওপর ভিত্তি করো। কর্মই আসল।
(২০) শ্রমের ও শ্রমিকের মর্যাদা দাও।
(২১) মানুষের চেষ্টা ব্যতীত মানুষের জন্য কিছুই নেই।
(২২) কোন জাতিরই আল্লাহ্ অবস্থান পরিবর্তন করে দেন না, যতক্ষণ তারা নিজের অবস্থার পরিবর্তন নিজে না করে। সেই পরিবর্তন তারা উন্নতির দিকেও করতে পারে, অবনতির দিকেও করতে পারে।

এবার আমরা আসি তাঁর প্রথম "নবুয়ৎ জীবনে"। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে (৬১০ খ্রীঃ) নবুয়ৎ লাভ করলেন। এরপর প্রায় তেরো বছর পর্যন্ত (৬২২ খ্রীঃ) মক্কার মাটিতে কাটালেন। পরবর্তী প্রায় দশ বছর মদিনার বুকে কাটালেন। এবং সর্বমোট (৪০ + ১৩ + ১০) তেষট্টি বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। এখন আমরা একবার লক্ষ্য করবো মহানবী (দঃ) কি নিয়ে মক্কার মাটিতে তাঁর নবুয়ৎ জীবনের বেশির ভাগ সময়—তেরো বছর কাটালেন। সেখানে দেখতে পাই গতানুগতিক প্রাণহীন ধর্মের কোন বালাই নেই। আছে শুধু নিরলস সমাজ সংস্কার। মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করার অনুরোধ, উপরোধ, কাকুতি-মিনতি, সেখানে কেউ কোন বাধা দিতে এলে, তখন তিনি ছিলেন—আপসহীন সংগ্রামী মানুষ। যখন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে মদিনার বুকে দশ বছর কাটালেন, সেখানে দেখি—কিছু সময় ধর্মের নানা বিধিবিধান দান করেন। তাও ছিল এক

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার বিবিধ পথ ও পন্থা মাত্র। কিন্তু সেখানেও দেখি অধিকাংশ সময় ব্যস্ত আছেন—নানা যুদ্ধ-বিগ্রহে, নানা সন্ধি সম্পাদনায়, নানা দেশে দূত প্রেরণে—এক আল্লাহর স্মরণে ও সভ্য জীবনের আহ্বানে, দুর্গত মানবতার সেবায়, নিপীড়িত মানুষের সেবায়, অবহেলিত নারী-সমাজের মর্যাদা দানে। সুতরাং অধিকাংশ মানুষের মহানবীর ব্রতের প্রতি যে ধারণা, তা মিথ্যা না হলেও অমূলক বা বড়ই হতাশাব্যঞ্জক, প্রাণহীন ও মহানবীর মূল উদ্দেশ্য থেকে বহু দূরে।

ধর্মের ব্যাপারে মহানবীর ব্রতকে আমরা পাঁচটি ভাগে দেখি—(১) কালেমা অর্থাৎ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন। (২) নামায—আল্লাহর স্মরণ বা প্রার্থনা (৩) রোযা—একমাস উপবাসব্রত পালন। (৪) হজ—কাবা জিয়ারৎ বা দর্শন, (৫) যাকাৎ—দান (গরিবের জন্য)। এগুলো ছিল তাঁর আসল ব্রতের পরিপূরক মাত্র। কেননা এগুলোর প্রধান লক্ষ্য—মানুষকে কদর্যতা ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখা এবং গরিবকে সাহায্য করা। ২৯ ঃ ৪৫। অর্থাৎ এককথায় দাঁড়ায় মানবতা ও গরিবের উত্থান। কেননা মহানবীর মতে ধর্মের উদ্দেশ্য শুধু মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান নয়, অপরের কষ্টকে আপন করে উপলব্ধি করা।

মানবতা ও গরিবের উত্থানকল্পে তাঁর এই আসল ব্রতকে আমরা মূলত পাঁচটি ভাগে দেখতে পাই—(১) সকল মানুষের মাঝে এক আল্লাহর একত্ব ও মহত্ত্ব প্রচার। (২) সমগ্র মানবসমাজে সাম্যবাদ স্থাপন করা। (৩) বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলা। (৪) গরিবের উন্নতি করা ও গরিবী দূর করা। (৫) অবহেলিত রমণীকুলকে যথার্থ মর্যাদা দান করা।

সুতরাং তিনি চেয়েছিলেন—সকলের জন্য প্রযোজ্য একটি সুন্দর শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলতে। তাই ছিল মহানবীর জীবনের মহান ব্রত। যে সমাজে নাস্তিকতা থাকবে না, অসাম্যবাদ মাথা চাড়া দিতে পারবে না, মানুষ মানুষ মাত্রকেই ভাই বলে চিনবে, গরিব না খেয়ে মরবে না। নারী শুধু ভোগের পণ্য হয়ে থাকবে না। অর্থাৎ এককথায় মানুষে মানুষে কোন ব্যবধান থাকবে না। এইরূপ একটি সাম্য-ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমুন্নত শ্রেণীহীন সুন্দর সমাজই ছিল মহানবীর মনের মানস-সমাজ, তাই ছিল তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, মনের স্থির লক্ষ্য, জীবনের মহান ব্রত।

॥ মহানবীর ব্রত ॥

মহানবীর ব্রত ছিল—প্রভুর স্মরণ
শ্রেণীহীন সমুন্নত সমাজ গঠন।
আপন ব্রতেরে তুমি আপনি বুঝি
আপস করনি যেথা আমরণ যুঝি
এক স্রষ্টা এক সৃষ্টি একটি দর্শন—
শ্রেণীহীন সমুন্নত সমাজ গঠন।
সমগ্র কুরাইশকুল আরব বেদুইন
তোমার ব্রতের নিকট হয়েছে বিলীন।
জেহাদ যাহার লাগি যুদ্ধ আমরণ—
সাম্য ভ্রাতৃত্ব, 'পরে সমাজ গঠন।

মহান ব্রতের সেবী সবার কাণ্ডারী
হৃদয় ঢালিয়া দিয়ে স্নেহ সুধা বারি
করেছিলে করিবারে যেই মহাপণ—
সাম্য ভ্রাতৃত্ব 'পরে সমাজ গঠন।
জ্বালাইলে যত দীপে বিশ্বের প্রাণ
লভিবে না কোনদিন সে দীপ নির্বাণ।
মহানবীর ব্রত ছিল—বিশ্ব জাগরণ
শোষণ শাসিতহীন সমাজ গঠন।
তোমার সাধনা যেটি মানব-সমাজ—
জ্ঞানের আলোক মাঝে করুক বিরাজ।
গড়িতে ধরার বুকে করেছিলে পণ—
সাম্য ভ্রাতৃত্ব 'পরে সমাজ গঠন।
তোমার জীবন-ব্রতে তব পরিচিতি—
মানুষের মানবতার পূর্ণ পরিণতি।

কোরআন—৪ ঃ ১৬৫, ৩৩ ঃ ২১, ৬০ ঃ ৬, ৬১ ঃ ৬

৭। **মানব মহানবী (সাঃ) ঃ** "আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ্।" কোরআন—১৮ ঃ ১১০

একটি কথা খুবই পরিষ্কার যে, যে কোন জিনিসের আদর্শ হলো তাকে তাদেরই অন্তর্গত হতে হবে। যেমন, প্রাণীর আদর্শ প্রাণী হবে, জীবের আদর্শ জীবই হবে, মানুষের আদর্শ মানুষই হবে, দেবের আদর্শ দেবই হবে। এই যুক্তি-তর্কের দিক থেকেই হযরত মহম্মদ (সাঃ) একজন মানুষ এবং সকল মানুষেরই আদর্শ মানুষ।

তিনি যদি দেবতা হতেন, তাহলে ষড়রিপু থেকে বঞ্চিত হতেন। সে ক্ষেত্রে ষড়রিপু-যুক্ত মানুষের আর্দশ হতে পারতেন না। দেবতা হলে মরণশীল হতেন না, মানুষের দৃষ্টিগোচর হতেন না। খাদ্যাদি গ্রহণ করতেন না। তাহলে তিনি কি করে ক্ষুধার্ত মরণশীল মানুষের আদর্শ হতেন। সুতরাং মানুষের আদর্শ মানুষই হওয়া একান্ত যুক্তিসঙ্গত, তিনি তাই আমাদের মতো একজন মানুষ।

ঈসায়ী মতে, যীশু আল্লাহর পুত্র, একথা যেমন অযৌক্তিক তেমনি বিভ্রান্তিকর। তাঁদেরই মতে, তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হলেন, নিহত হলেন। দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্‌র পুত্র নিজেকেই রক্ষা করতে পারলেন না। এখানে সামান্য কয়েকটি মানুষের সম্মুখে 'পিতা পুত্র' কত অসহায়। সুতরাং এটা অবাস্তব কথা। হিন্দুগণ শ্রীকৃষ্ণকে, পারস্যবাসীগণ মিথরাকে, ব্যাবিলন-বাসীগণ বাল্‌কে, গ্রীসবাসীগণ বেকাসকে আল্লাহর অবতার বা দেবতা বলে গণ্য করেছেন। তাই যদি হয়, তাহলে তাঁরা কেউই মানুষের আদর্শ হতে পারেন না। এখানে হযরত মহম্মদ (সাঃ) সর্বক্ষেত্রে নিজেকে পরিচয় দিয়ে গেছেন মানুষ রূপে। তাই তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের সর্ব অবস্থার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, ইসলাম ধর্ম সকল ধর্মের শেষ সংস্করণ, তাই তার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে সকল ধর্মের বিশেষ গুণাবলী। ঠিক তেমনভাবেই হযরত মহম্মদ (দঃ) সকল দূতের শেষ দূত, তাই তাঁরও মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে সকল দূতের বিশেষ গুণাবলী, সুতরাং তিনিও তাই সকল দূতের শ্রেষ্ঠদূত, মানুষের জন্য মানুষ-দূত।

মানুষ হিসাবে হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের অন্য একটি জিনিস বিশেষ লক্ষণীয়। তাঁর জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কথা-কাহিনী বা কাজ সকলের নিকট অতি সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। কোথাও অস্পষ্টতা নেই। যিনি সবার আদর্শ হবেন, তাঁর জীবন এমনি হওয়া উচিত। নচেৎ আদর্শকে অনুসরণ করবে কি করে।

অনেক সময় অধিকাংশ মানুষই একটু ওপরে উঠলে নিজেকে একটু স্বতন্ত্র করে ফেলেন, এই দিক দিয়ে মহানবী ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। তিনি সকল অবস্থায় সকল মানুষের নিকট এমনভাবে নিজেকে তুলে ধরতেন, যাতে কোন মানুষই বুঝতে পারত না, তিনি একজন নবী। নিজেকে অতি সাধারণভাবে রাখার জন্য তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ। সাধারণ মানুষ নিজেকে অসাধারণ দেখানোর জন্য যেমন আপ্রাণ চেষ্টা করে, অসাধারণ মানুষ মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) তেমনি নিজেকে সাধারণ রূপে দেখানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অসীম শক্তিকে আত্মস্থ করেছেন, হজম করেছেন, বদ্‌হজমের বহিঃপ্রকাশ হতে দেননি। তাই জীবনের সর্বাবস্থায় তিনি একজন মানুষ। এবং সকলকে অনুপ্রাণিত করেছেন মানুষ হতে।

॥ মানুষ মহানবী ॥

জীবন নদীতে পড়ে জোয়ার ভাঁটা
দুয়েরই দু'কূল তটে দেখি ঘনঘটা।
মোদের প্রাণের মাঝে রবে সখী সই
আমরা মানব বটে দেবতা তো নই।
পাপ ও পুণ্যের বীজ মানব মনে
জীবিত সদাই রয় মনের বনে।
আপন স্বভাব গুণ প্রসূন টুটে
দু'কূলেরই দুটি ফুল উঠিবে ফুটে।
দাবিদারে নও শুধু মানব সন্তান
শক্ত হাতে করিয়াছ সুবিচার দান।
মানুষ বলোনি শুধু কর্তব্য স্মরি
তুমি সেই মানবতার শ্রেষ্ঠ দিশারী।
যে তিন পল্লবে ফুটে জীবন বারতা
সততা সাধনা আর ধ্যান সংযমতা।
মানবের মাঝে যেটি আছে মানবতা
মলিন সেথায় দূত সব ফেরেশ্‌তা।
দেবতা মানুষে তাই এত ব্যবধান
রহিয়া স্বর্গের মাঝেও হয়নি সমান।
মানবেরই মাঝে মোরা মহান তুলি
অফুরন্ত মান তাঁর মানব বলি।
তোমারে পেয়েও কেন পিপাসা পাবার
মানুষের মাঝে তুমি মানুষ আবার। —কাব্যকানন

কোরআন—৪ ঃ ৭৯, ১৬৫, ৭ ঃ ১৫৮, ৩৪ ঃ ২৮

৮। মহাপুরুষ মহানবী (দঃ) ঃ পবিত্র কোরআন মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছে—সকল দেশে সকল জাতির জন্য নবী প্রেরিত হয়েছে। সেই সঙ্গে এও ঘোষণা করেছে, হযরত মহম্মদ (দঃ) সকল দেশের সকল মানবের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।—২৫ ঃ ১। ধর্মগ্রন্থ বেদ যেখানে ভারতবাসীদের জন্য, জিন্দাবেস্তা পারস্যবাসীদের জন্য, তওরাত ইহুদীগণের জন্য, ইঞ্জিল খ্রীস্টানদের জন্য, হুদ ও ছালেহ (আঃ) আদ ও সামুদ জাতির জন্য, সেখানে কোরআন শরীফ মনুয্যমণ্ডলীর জন্য এবং হযরত মুহম্মদ (দঃ) মানবজাতির জন্য। কোরআন—৭ ঃ ১৫৮, ২১ ঃ ১০৭, ৩৪ ঃ ২৮

সুতরাং হযরত মহম্মদ (দঃ) সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একজন মহাপুরুষ এতে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

সকল জাতির মধ্যে প্রেরিত পুরুষ এসেছেন। আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন। মহানবী সকল প্রেরিত পুরুষদের শেষ। শুধু শেষই নন, বিশ্বনবী ও বিশ্বধর্মের শেষ সংস্কারক। এই দিক দিয়ে সকল মহাপুরুষদের মহাপুরুষ, সকল নবীর মহানবী।
কোরআন—৩৩ ঃ ৪০

বিশ্বের কোন ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মপ্রচারক অন্য ধর্মকে বা ধর্মপ্রচারকে লিখিত স্বীকৃতি দেননি, যা দিয়েছেন মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ও পবিত্র কোরআনকে—২ ঃ ১৩৬, ১৩ ঃ ৩৮, ৫৭ ঃ ২৫। এই দিক দিয়ে তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বের উদ্বোধক ও আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনকারী।

মহানবী শুধু মানুষের নবী নন। সমগ্র সৃষ্ট-জগতের নবী, কেননা তিনি শিখিয়েছেন—মানুষ ও স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক, মানবে মানবে সম্পর্ক, মানব পশুতে সম্পর্ক, মানবে জড়জগতে সম্পর্ক ইত্যাদি। সকল নবীর দীক্ষান্ত ভাষণ দিয়ে গেছেন।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, গোত্র, দেশ ও কাল কৌলিন্য নির্বিশেষে মহানবী সৎ মানুষের মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশি দিয়েছেন। যে মানুষ সৎ, যে মানুষ পরোপকারী, সে মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ একথা তিনি মুক্ত কণ্ঠে সারা জীবন ঘোষণা করেছেন। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়—তিনি এসেছিলেন সমগ্র মানুষকে সৎ করতে ও ভেদাভেদ তুলে দিতে। তিনি চেয়েছিলেন—সকল মানুষই পরিচিত হবে তার আপন মনুষ্যত্বের মানদণ্ডে। এই সকল দিক দিয়ে হযরত (দঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ মহামানব। পবিত্র কোরআনে এর বহু দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়।
কোরআন—১৩ ঃ ৭, ৩৩ ঃ ২১, ৩৬, ৪০, ৭৮, ৮১ ঃ ১৯

৯। সাধক মহানবী ঃ মুসলমান অমুসলমান অনেকেরই ধারণা—মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর 'নবুয়ত' বোধহয় রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়ার মতো বিনা আয়াসেই হঠাৎ পেয়ে গেলেন। কিন্তু এ ধারণা যিনি বা যারাই করুক, একেবারেই ভুল। তবে সাধনা করলেও নবী হওয়া যায় না। তবুও মহানবীর নবী হওয়ার পূর্বে যে সাধনা, তা একান্তই বিরল বা নজিরবিহীন। কোরআন—২ ঃ ১২৪

সাধনার প্রথম সূচনায় আমরা লক্ষ্য করি মহানবী তাঁর জীবনের প্রথম থেকে বারো বছরের মধ্যে একটিবারও মিথ্যা কথা মুখে উচ্চারণ না করে দুর্ধর্ষ আরব বেদুইনের নিকট থেকে "আল-আমিন" বা চির-বিশ্বাসী উপাধি লাভ করে সাধনার যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তা বিশ্বের ইতিহাসে চির দুর্লভ। উপদেশ দিয়ে নয়, আপন সাধনার ভিত্তিতে মানব চরিত্রের মহারূপ তুলে ধরেছিলেন।

তিনি অধিকাংশ সময় আরব দুনিয়া থেকে সমগ্র বিশ্বসমাজের নৈতিক অধঃপতনের কথা চিন্তা করে চরমভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে পড়তেন। চিন্তা করতেন নিবিড় মনে, গভীর ধ্যানে কি করে মানবমণ্ডলীর এই অধঃপতনকে রোখা যায়। চিন্তা করতেন কিভাবে মানুষের মহাশক্তি মহৎ পথে পরিচালিত হয়। এই পথ ও পন্থা আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তিনি মহাধ্যানে ধ্যানস্থ থাকতেন। আবার ধ্যানমুক্ত অবস্থায় মানুষের মুক্তির জন্য সমাজ-সংস্কারে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতেন। তাঁর দিবা-রাত্রির সাধনায় এইভাবে চলতে থাকল মানুষের মুক্তিচিন্তা, প্রাণিজগতের প্রাণরক্ষা, জড়জগতের সদ্ব্যবহার।

৩৫ বছর বয়সে তাঁর এই নিরবচ্ছিন্ন সাধনা গভীর থেকে গভীরতর দিকে এগোতে থাকল। এই সময় তাঁর হিরা গুহায় গমন। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে। জনমানবশূন্য নিস্তব্ধ প্রান্ত, নীরব গুহা। সাধক একাকী সাধনা-মগ্ন দিনের পর দিন। অবশেষে সাধনার সিদ্ধিলাভ। ৪০ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। সাধকের মহৎ বেদনা মহৎ সার্থকতা লাভ করল। সসম্মানে মহানবীর পদ লাভ করলেন। শেষ নবীর গৌরব অর্জন করলেন। মাতৃজঠোর রূপে হিরাগুহা চিরদিনের জন্য ধন্য হলো মহানবীকে ধারণ করে।

নবয়ুতপ্রাপ্তির পর ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কার মাটিতে সমাজ-সংস্কারের জন্য অমানুষিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়। তবুও মহানবী তাঁর সাধনায় ছিলেন অবিচল। এরপর মদিনায় দশ বছর ধরে অক্লান্ত সাধনায় মানবসমাজের সমস্ত দিক সম্বন্ধে পথনির্দেশ করে গিয়েছেন। তাই একদিকে তিনি মহানবী, অন্যদিকে তিনি তুলনাহীন মহাসাধক। "আ'সি মিন্নি, ওয়াতম্মাম্ মিনাল্লাহ"—হাদিস।

চেষ্টা আমার নিকট থেকে এবং পূর্ণতা (ফল) আল্লাহর নিকট থেকে। ১৩ : ১০, ৬৭ : ১-২, ৯৪ : ৭, ৩

জীবন উদ্যানে আমি জল দিয়ে যাই
কভু না চেষ্টায় রই কুসুম ফুটাই

১০। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহানবী : জীবনের শুভলগ্নে সমাজ-সংস্কারের জন্য যে চিন্তা তিনি করেছিলেন, হিরা গুহায় তারই সাধনা। হিরা গুহায় এক নীরব সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। মক্কার মাটিতে তারই সরব রূপ। এই রূপায়ণের জন্য জীবনের সর্ব অবস্থায় ছিলেন একেবারেই আপসহীন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কুরাইশ প্রধানদের সঙ্গে পিতৃব্য আবু তালেবের পর পর তিনবার যে বৈঠক হলো, প্রথম বৈঠকে মৃদু ধমক, দ্বিতীয় বৈঠকে প্রলোভন অর্থাৎ সমগ্র আরবের সম্রাট করার প্রস্তাব, আরব দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরীকে তার হাতে তুলে দেওয়া এবং তৃতীয় বৈঠকে প্রাণদণ্ডের হুমকি। এখানেও তিনি আপন ব্রতে অটল, অবিচল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

"দুই হাতে দাও যদি সূর্য আর চাঁদ,
আমার আদর্শ আমি নাহি দিব বাদ।"—হাদিস

পরবর্তী অধ্যায়ে ১৪টি সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ১৪ জন সাহসী বীর যুবক যখন তরবারি হস্তে রাত্রির অন্ধকারে বাড়ি ঘেরাও করে তাঁর প্রাণনাশের জন্য প্রস্তুত তখনও তিনি পর্বতের ন্যায় অবিচল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জন্মভূমি মাতৃভূমি ছেড়ে যখন পলাতক নবী সওর পাহাড়ের গুহায় গোপন আশ্রয় নিয়েছেন আবুবকরের সঙ্গে। শত্রু যখন শাণিত তরবারি নিয়ে কয়েক হাত মাত্র দূরে।

আবুবকর (রাঃ) যখন বিচলিত, মহানবী তখনও অবিচল, ধীর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মদিনার পথে পলাতক নবীর পেছনে শত্রু যখন প্রবল বেগে বিরাট পুরস্কারের লোভে ধাবিত, তখনও মহানবী নীরব শান্ত। আপন উদ্দেশ্য সাধনে অনন্যসাধারণ।

মহানবী মদিনায় পদার্পণ করে ভাবলেন নিশ্চিন্ত মনে আপন কাজ করবেন। কিন্তু নানা দিক থেকে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। কিন্তু কোন যুদ্ধই মহানবীকে আপন ব্রতে নিরস্ত করতে পারেনি।

ব্রতের ৭ম বছর থেকে ১০ম বছর (৬১৬-৬১৯ খ্রীঃ) পর্যন্ত সমাজচ্যুত নবী আপন কর্তব্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই সমস্তের মূলে ছিল—তাঁর অসাধারণ মনোবল, আল্লাহ্‌তে অসীম বিশ্বাস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পৃথিবীতে একজনকেও সাহায্যকারী বা বন্ধুরূপে জীবনে গ্রহণ করেননি। আল্লাহ্‌ই ছিলেন তাঁর একমাত্র সাহায্যকারী ও একমাত্র বন্ধু।

১১। মক্কার মাটিতে সমাজ-সংস্কারক সিদ্ধপুরুষ ও জাতির জনক মহানবী ঃ মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) সম্পর্কে সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণ প্রায় একটি কথা বলে থাকেন, যদি হযরত মহম্মদ (দঃ) এই বিশ্ববুকে নবী নাও হতেন, তাহলেও সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সমাজ-সংস্কারক রূপে পরিগণিত থাকতেন। একথা তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ৪০ বছর বয়সের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নবী নন, কিন্তু একজন শ্রেষ্ঠতম সমাজ-সংস্কারক। ৪০ বছর বয়স থেকে ৫৩ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মক্কার মাটিতে নবী রূপে থাকলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ ১৩ বছরে ধর্মীয় তেমন কোন বিধান দিতে দেখলাম না। একটানা সমাজ-সংস্কারের কাজ করে গেলেন যে সংস্কারগুলোর কথা আমরা তাঁর ব্রতের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

আরবের তদানীন্তন অবস্থা ছিল ভয়ঙ্কর—পৃথিবীর এমন কোন জঘন্যতম পাপ ছিল না যে পাপে তাঁরা ডুবে ছিলেন না। এই ডুবন্ত জাতিকে তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম গৌরবের আসনে বসিয়ে দিলেন। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা, ইতিহাসে যা দেখা যায়নি। পঙ্কিল জলধিরাশি থেকে আপন দেশকে, আপন জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে তুলে দিলেন। তিনি সমাজের এমন কোন দিক নেই, যাকে তিনি স্পর্শ করেননি। এবং যাকেই তিনি স্পর্শ করেছেন, তার আমূল পরিবর্তন করেছেন। এহেন সমাজ-সংস্কারক মানবসমাজ আজও জন্ম দিতে পারেনি। এই শুভ সংস্কারের ভেতর দিয়ে তিনি একদিকে জাতির প্রতিষ্ঠাতা, অন্যদিকে রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, আবার ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। এহেন কৃতকার্যতা সত্যিই কল্পনাতীত। তাই তিনি কল্পনাতীত সমাজ-সংস্কারক। ৫৩ বছর বয়স থেকে ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত মদিনার বুকে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার যে শান্তি বৃক্ষ তিনি রোপণ করে গেলেন, বিশ্বের প্রলয় দিন পর্যন্তও সে বৃক্ষ তার সময়োচিত ফল দান করবে।

এত বড় সংস্কারে তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তাই বিরাট সফলতা যেমন তাঁকে গর্বিত করতে পারেনি, তেমনি যে কোন সামরিক বিফলতাও তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। জয়ের আনন্দ যেমন তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি, পরাজয়ের গ্লানিও তেমনি তাঁকে নিরাশায় হতোদ্যম করতে পারেনি। বাল্যকালে জীবন সূচনায় মেষপালক হয়েও জীবন সংগ্রামে দেশের নরপতি, জড়জগতের নির্দেশক। আবার আধ্যাত্মিক জগতের পথপ্রদর্শক।

কেন মহানবী শ্রেষ্ঠতম সমাজ সংস্কারক? ঃ বিশ্ব-সভ্যতার দরবারে আরবের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয় ইসলামের সঙ্গে। এর পূর্বে আরবের যা ইতিহাস ছিল, তা একটি উচ্ছৃঙ্খল জাতির ইতিহাস। যাকে মহানবী জগতের একটি শক্তিশালী সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেন। তাঁর পূর্বে আরবে এমন কোন বিধিবিধান ছিল না, যা মানুষকে মানুষের পথে সংযত রাখে। যার ফলে সেদিনের আরব একেবারেই ডুবে গিয়েছিল চরম বর্বরতায়। তাদের পাপ যে কোন পশুত্বকেও অনায়াসে হার মানিয়েছে, অথচ তারা দিনের পর দিন অবলীলায় সেগুলোকে করে যেত। যেমন—ধনী ও দরিদ্রের সামাজিক চরম অসমতা। আজকের দিনে আমরা যেমন যে কোন পশুকে কিনে এনে প্রয়োজনমত ব্যবহারে নিযুক্ত করতে পারি। প্রয়োজন মন করলে বলিদান বা জবেহ করতে পারি, অর্থাৎ যা ইচ্ছে তাই করতে পারি সেদিনের আরবে দরিদ্র মানুষ ধনীর নিকট ঠিক ঐ রূপেই ছিল। কি নিদারুণ পরিবেশ চিন্তা করাও যায় না। আপন ঔরসজাত পাঁচ বছরের নিষ্পাপ শিশুকন্যাকে পিতা স্বহস্তে হত্যা করে কতই গর্ব বোধ করতেন। এ ঘটনা পশুত্বকেও হার মানিয়েছে। ব্যভিচার, বহুবিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি এমন কোন জঘন্যতম পাপ ছিল না, যা বিশ্বের যে কোন বর্বর জাতিকে সহজেই টেক্কা দিতে পারেনি। মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর অসাধারণ শক্তি দ্বারা এই অভাগা জাতির সমস্ত গ্লানিকে একের পর এক আপন হাতে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেন। এবং জগতের শ্রেষ্ঠতম সমাজ সংস্কারকের আসন লাভ করেন।

বিরাম বিহীন চলেছে জেহাদ—
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ শীতে
বাদ রাখ নাই কোথাও কিছু—
অজ্ঞতারে মিলিয়ে দিতে।

রাজনীতি ঃ রাজনীতিতে আরবে কোন রাজা-বাদশাহ ছিল না, কোন শাসক ছিল না। ঠিক একটি বনের মধ্যে জীব-জন্তুরা যেভাবে আপন খেয়াল-খুশিমত ঘুরে বেড়ায়, সেদিন আরব ঠিক অনুরূপ একটি অরণ্য ছিল। মারামারি, খুনোখুনি, হানাহানি নদী স্রোতের মতো চলছেই, উৎস যার বর্বরতা, অজ্ঞতা, মহানবী এই উচ্ছৃঙ্খল আরব অসভ্য জাতিকে একটি সুশৃঙ্খল সরকারের অধীনে নিয়ে এলেন। যে সরকার রচনা করল—সুসভ্য জীবনের জয়গান, যে সরকার একদিন সারা বিশ্বের অর্ধেকটাই জয় করে প্রমাণ করল—মহানবী কত বড় রাজনীতিবিদ ছিলেন।

ধর্ম ঃ ধর্মক্ষেত্রে আরবরা যে পরিচয় দিয়েছিলেন, তা বর্ণনারও অতীত। মহানবী ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিলেন তা ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য আপনার আত্মশুদ্ধি ও অপরকে সাহায্য করা। কিন্তু সেদিনের আরবে ঠিক এর বিপরীত ছিল। তারা ধর্মকে নিছক ব্যবসায় পরিণত করেছিল। হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইলের নির্মিত কাবাগৃহকে ৩৬০টি পুতুলের বা মূর্তির আখড়ায় পরিণত করে। মহানবীর জন্মের প্রায় চারশো বছর পূর্বে কাহতান বংশের হিজাজের রাজা বাবালুন বিন সাবা হোবাল নামক একটি মূর্তিকে কাবার ছাদে স্থাপন করেন। এইটাই ছিল কুরাইশদের প্রধান দেবতা। পরবর্তীকালে মহানবী এদের সমস্তকে দূরীভূত করে সমগ্র আরব জনগণকে এক আল্লাহর স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় উদ্ভাসিত করে তোলেন।

ইসলামি অর্থনীতি ঃ তখনকার দিনে সুদের ব্যবসায় খুবই সিদ্ধহস্ত ছিল। এতে গরিব একেবারেই নিধন হচ্ছিল। মহানবীর মহান ব্রতের এক হাতে ছিল আল্লাহর আরাধনা ও অন্য হাতে ছিল গরিবের সংরক্ষণ। তাই তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোলে—

ধ্বনিত যদি পার্শ্ব ঘর
যাতনায় জ্বলে প্রাণ জঠর
উপবাসীর ওই আর্তনাদে—
দুই বেলা খেয়ে কিঞ্চিৎ কর
মুসলিম নয় কভু সে নর।

তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুদকে অবৈধ ঘোষণা করলেন। এবং যাকাত, ফেতরা, উষর, সাদকা ইত্যাদি নানা দানের প্রচলন করে জাতীয় অর্থনীতির একটি কাঠামো খাড়া করলেন, যাতে গরিব রক্ষা পায়। আবার ধনীদের ব্যবসায় ও চাষে অনুপ্রাণিত করে প্রভূত পয়সা উপার্জনের পথও দেখিয়ে দিলেন।

কমিউনিজমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিসত্তার কোন স্থান নেই। সেখানে রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী রাক্ষস। মানুষের ব্যক্তিসত্তাই একদিন মানুষকে স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার অধিকারী করে। কিন্তু সত্তাই যেখানে চিরবন্দী, সে কি করে স্বাধীন চিন্তার জন্ম দেবে। এবং যার জন্মই নেই, তার মুক্তি আসবে কি করে। কিন্তু মনুষ্য সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য চিন্তার মুক্তির একান্ত প্রয়োজন। অথচ কমিউনিজমের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই গুরুতর প্রয়োজন পূরণের লঘুতরও সাড়া নাই। তাই ওইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মনুষ্য সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এরূপ ব্যবস্থায় সাধাবণ মানুষের ভবিষ্যৎও অন্ধকারময়।

পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিসত্তার বাড়ারও কোন শেষ নেই। সেখানে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। সারা শরীরের রক্ত গিয়ে মাথায় জমা হয়। ব্যক্তি সেখানে সর্বগ্রাসী। সেখানে এক একটি অর্থলোলুপ ব্যক্তি এক একটি পাহাড় ও পর্বতে (টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কা) পরিণত হয়। এ ব্যবস্থাও খুবই মারাত্মক ও ভয়াবহ। এই ব্যবস্থাপনা সমাজে সৃষ্টি করে—অতি ধনী ও অতি গরিব।

ইসলাম রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়কেই স্বাধীন সত্তা দিয়েছে। কিন্তু কোনটাকেই লাগাম ছাড়া হতে দেয়নি। মানুষকে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী করেছে, কিন্তু কোনক্রমেই স্বেচ্ছাচারী হতে দেয় না চিন্তাতে ও কাজে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রকেও যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখে। ইসলাম রাষ্ট্র বা ব্যক্তি উভয়কেই আপন আপন সত্তার সীমালঙঘন করতে দেয় না। ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোনক্রমেই অতি ধনী ও অতি দরিদ্র থাকবে না। সে একটা সুন্দব ভারসাম্য রক্ষা করে। এইটাই ইসলামি অর্থনীতির মূল কথা। যা মানুয ও মনুষ্য সমাজের জন্য খুবই কল্যাণকর। আল্লাহ্ কোন ব্যাপারেই সীমালঙঘন করাটাকে পছন্দ করেন না। ইসলামে সীমালঙঘন মহাপাপ। কোরআন—২ ঃ ১৭৭, ১৯০, ২১৫, ২৭৪-২৭৬, ৪ ঃ ৩৬, ৬ ঃ ১৬৫, ৭ ঃ ১২৮-১২৯, ১৩ ঃ ২৫, ১৬ ঃ ৯০, ১৭ ঃ ২৩-২৭, ২৯-৩০, ২৪ ঃ ২২, ৫৭ ঃ ৫, ৭, ১০, ৩৩ ঃ ১-৬, ৫৫ ঃ ৭-৯, ১০৭ ঃ ১-৭।

সামাজিক অসমতা দূরীকরণ ঃ মহানবী সমাজ-সংস্কারের যে ধারা এই পৃথিবীকে দান করে গেছেন, তার মধ্যে সামাজিক অসমতা দূরীকরণ শ্রেষ্ঠতম। তিনি কঠোরভাবে ঘোষণা করেছিলেন—মানুষে মানুষে কোন ব্যবধান নেই, বংশের কোন গর্ব নেই, কৌলিন্যের কোন মূল্য নেই, দেশ-পাত্র-কালের কোন ভেদাভেদ নেই। তিনি যেন এক নিমিষেই সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধানগুলো দূর করে দিলেন। প্রচার করলেন আল্লাহর নিকট সকল মানুষই সমান, তাঁর কাছে সেই মানুষই উত্তম, যিনি মানুষের নিকট উত্তম, যিনি মানুষের উপকার করেন। তিনি এমন এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তুললেন—যা ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাদা-কালো, উচ্চ-নীচ সকলকে এক ডোরে বেঁধেছিল। মহানবীর সুদূরপ্রসারী যে চিন্তাধারা ছিল, তা এক স্রষ্টা, এক সৃষ্টি, এক বিশ্ব, এক জাতি। অর্থাৎ মানবজাতি।

মানবসমাজ লাগি বড় পরিতাপ
বংশ কুলের দাবি জাতের প্রলাপ।
কর্ম যার নাহি জ্বালে জীবন বাতি
শুধাবে না কেহ তারে সে কোন জাতি।
জিজ্ঞাসা করে না প্রভু কোন দিনে রোযে
কোন্ বংশে জন্ম নিলে কাহার ঔরসে।
মানুষ যেথায় থাক যে সমাজ মাঝে।
আপনাকে গড়ে তোলে আপনার কাজে।

মহানবী তাঁর জীবনের যে কোন অবস্থাতেই মানুষে মানুষে কোন ব্যবধানই মেনে নেননি। বহুবার বহু স্থানে আমরা বলেছি—মহানবীর ব্রত ছিল প্রধানত দুটো। একটি সকল মানুষের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার বন্দনা, অন্যটি সেই এক বিশ্বস্রষ্টার অধীনে সকল মানুষের মধ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলা। এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়তে গিয়ে তাঁর এক চোখে পড়ল—সমগ্র মনুষ্য সমাজের অর্ধেক অর্থাৎ অবহেলিত রমণীকুল, অন্য চোখে পড়ল—নির্যাতিত গরিব মানুষ।

সুতরাং এই যাঁর ব্রত, সাম্য যাঁর জীবনের মূল আকাঙ্ক্ষা, শান্তি যাঁর জীবনের মূল কামনা, ভ্রাতৃত্ব যাঁর জীবনের মূল বাসনা, তাঁর কাছে অসাম্য জিনিসটাই ছিল যুক্তিহীন, মানবতার প্রধান শত্রু, সভ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ। মহানবী এই শত্রুকে পরাজিত করে সভ্যতার বড় বিপদকে রুখে দিয়েছিলেন।

বিশ্ব জোড়া মানবতার রুখে দিয়ে মৃত্যুবাণ
মরণমুখী মনুষ্যত্বে সঞ্চারিলে বীরের প্রাণ।

কেন মহানবী মানুষের মুক্তিদাতা সিদ্ধপুরুষ?

যে কাজ আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়তর
তোমরা সকলে আজ দাস মুক্ত কর।

দাসত্ব মোচন ঃ ঠিক পশুপক্ষী জীবজন্তুর ন্যায় সারা পৃথিবী জুড়ে যখন মানুষকে নিয়ে বেচা-কেনা হচ্ছে তখন মহানবী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—মানুষ তোমার ভাই। তিনি তাঁর উম্মত (শিষ্য)-দের উদ্বুদ্ধ করলেন—"দাসমুক্তি অপেক্ষা আজ আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়, বেশি গ্রহণীয় বস্তু আর নেই।" তখন মহানবীর শিষ্যগণ দলে দলে দাস মুক্ত করতে আরম্ভ করলেন। যার কাছে যে দাসটি ছিল—তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুক্তি দিয়ে আজাদ করলেন। যারা ধর্মের নিছক প্রাণহীন নীরস আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপকেই শুধু প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তারা একবার চিন্তা করুন—মহানবী ধর্মকে কোন্ পথে পরিচালিত করতেন এবং কেন করতেন। মহানবীর মুখ থেকে এই সাবধানবাণী উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহানবীর অতীব নিকটতম উম্মত হযরত আবুবকর (রাঃ) পাষণ্ড উমাইয়া বিন খালাফের কবল থেকে জগদ্বিখ্যাত মোয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রাঃ) কে নিজ অর্থে ক্রয় করে মুক্তি দেন। মহানবীর সম্মুখে সাক্ষাত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আজও ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন। এইভাবে মহানবী জগদ্বাসীকে জান্নাৎ দিলেন, মানুষকে স্বর্গ দিলেন, মুসলমানকে বেহেশ্ত দিলেন—দানের দ্বারা দাসত্ব মোচনে, মানুষের মুক্তিতে মানুষের কল্যাণে। কোথাও বা স্বর্গ দিলেন—দানের দ্বারা গরিবের রোগমুক্তিতে। ধনবান রোগীকে বললেন—"দান কর গরিবকে, আল্লাহ্ তোমাকে রোগমুক্তি দেবেন।"

এরপরও স্থান-পাত্র-কাল ভেদে পৃথিবীর যে কোন মানুষের পক্ষে মহানবীর ধর্মের মূল বক্তব্যকে বোঝা এতটুকুও কঠিন হবে বলে মনে করি না।

অবৈধ অর্থগুলো করিও না জমা
গরিবেরে দান করো আল্লাহ্ দিবে ক্ষমা।

নারী জাতির অবস্থার উন্নতিকরণ ঃ ইসলামের পূর্বে শুধু আরব নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে নারীর কি অবস্থা ছিল, তা সত্যিই অবর্ণনীয়। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে নারী শুধু ভোগের বস্তু। শুধু ভোগই নয়, নির্যাতনের চরম দৃষ্টান্ত দেখা গেল। কোথাও স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনরা শুষে নিচ্ছে—পশুর ক্ষুধায়, কোথাও বা মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত নারীকে জোর করে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। কোথাও বা দলে দলে পতিতালয়ে স্থান পাচ্ছে, কোথাও বা বস্তু আকারে বিক্রি হচ্ছে। না আছে কোন বিবাহের যোগ্য বিধি। না আছে কোন বিচ্ছেদের সঠিক কানুন। অবলা নারীকে নিয়ে যার যা খুশি সে তাই করছে।

হেন কালে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করল—"স্ত্রীলোকদের আছে সম অধিকার তোমাদের ওপর যেমন তোমাদের আছে তাদের ওপর।" পবিত্র কোরআনের ঘোষণায় তারা পিতার বাড়িতে, স্বামীর বাড়িতে আর আগাছা থাকল না। তাদের যথাযোগ্য অংশ ঘোষিত হলো। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির অংশ থেকে তারা যেন সমগ্র পৃথিবীর বুকে সঠিক মর্যাদা পেল। এককথায় কোরআন তাদের সমাজিক মর্যাদায় পুরুষের ঠিক পাশাপাশি মর্যাদা দান করল। বিশ্বের যে কোন ধর্মে নারীকে এই সম-সম্মান দান করা হয়নি, ইসলাম যা করেছে।

সমগ্র মনুষ্যজাতির অর্ধেক যে রমণীকুল, তাদের এহেন দুরবস্থা দেখে মহানবী বড়ই বিচলিত বোধ করেছিলেন। তাই ঘোষণা করলেন—হে পুরুষকুল, যদি তোমাদের স্বর্গ বলে কোথাও কিছু থেকে থাকে, সে আছে তোমার মায়ের পায়ের তলে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ধর্মের যে মূল লক্ষ্য—স্বর্গ বা জান্নাত তাকে তিনি নিয়ে এলেন সমাজজীবনে নারীর পায়ের তলে। এইভাবে তিনি নারী জাতিকে যে অমূল্য সামাজিক মর্যাদা দান করেছেন, ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। মহানবী বলেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, নারী তার স্বামীর সংসারে হবে একমাত্র কর্ত্রী। তিনি স্ত্রী-জাতিকে এতখানি স্বাধীন মর্যাদা দান করলেন যে, তার বিনা পছন্দে কেউ তার বিয়ে দিতে পারবে না। স্বামী নির্বাচনে তিনি তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে পুরুষের সম মর্যাদা দান করেন। এককথায় তিনি যেন ব্যাখ্যা করলেন—সমাজ একটি পাখি, পুরুষ ও রমণী তার দুটো ডানা, একটিকে বাদ দিয়ে ওই সমাজ-পাখি কোনদিনই উন্নতির আকাশে আরোহণ করতে পারে না। এইভাবে নারী জাতিকে তিনি যে সম্মান দান করে গেছেন, কোন ধর্মও তা দিতে পারেনি। কোন ধর্মদূতও দিতে পারেননি।

এক যদি হয় মহীয়ান তবে,
অন্য সে মহীয়সী
এক যদি হয় গরীয়ান তবে,
অন্য সে গরীয়সী।
বলেন দীনের নবী রসুল মোদের—
মায়ের পায়ের তলে জান্নাত তোদের।
বড় নয় ছোট নয় কেহ কারও চেয়ে
উভয়ই হয়েছে বড় অপরে পেয়ে।
তোমার পৌরুষ প্রাণে না করিয়া দ্বিধা
তার মান তারে দিও তাহার মর্যাদা।

সুতরাং মহানবীর মহান জীবনকে একবার লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন এ বিশ্বসমাজের শ্রেষ্ঠতম সমাজ-সংস্কারক।

তোমার কাজের শ্রেষ্ঠ যে কাজ সমাজ-সংস্কার
তোমার কাছে সবাই ঋণী এ বিশ্ব-সংসার।

জাতিসংঘ ও বিশ্ব-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক মহানবী ঃ মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) শুধু একজন শ্রেষ্ঠতম সমাজ-সংস্কারকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক অপ্রতিহত জাতির জনক ও প্রতিষ্ঠাতা, যে জাতি সারা বিশ্বের জনসাধারণের অর্ধেকটাই আপন পতাকাতলে আনতে সক্ষম হয়েছিল। মহানবী মদিনার মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার সমস্ত গোত্রের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুললেন, যে সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কোন রকমের বাধা ও বিপত্তি ছিল না। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সকলের শুভেচ্ছা ব্যতীত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। তাই তিনি মদিনার বুকে প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন রিপাবলিকান (Republican) অর্থাৎ এমন একটা সরকার, যে

সরকার পরিচালিত হবে কোন রাজা বা রাণী ব্যতীত জনগণেরই প্রতিনিধি দ্বারা। মহানবীর দ্বারা জগতের বুকে প্রথম এই নিরঙ্কুশ গণতন্ত্র রূপী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন—জাতি সংঘ বা U. N. O. বা Common Wealth। দেড় হাজার বছর পর মানুষ যা চিন্তা করছে আজ। তার জনক ছিলেন তিনিই। এবং তিনি রচনা করেছিলেন আইনের কতকগুলো বিধিবিধান, যার দ্বারা সরকার পরিচালিত হতো যে কোন প্রকারের পার্থক্য বা ব্যবধান ব্যতীত। ওই আইনের বিধিবিধানে সকলেই ছিল সমান। কোরআন—৩ ঃ ১৫৯, ৪২ ঃ ৩৮

শিখাইলে মানুষেরে মান মানবতার
জগতের গণতন্ত্র সাম্য অধিকার।
দাও নাই রাজতন্ত্রে মানুষের রাজ
শিখাইয়েছ গণতন্ত্রে গড়িতে সমাজ।

মহানবী মদিনাতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান-অমুসলমান সকলকেই একটি সনদ দান করেন। যাতে সকলেরই ধন-মান-ধর্ম সকল কিছুর রক্ষণাবেক্ষণের কথা স্পষ্ট করে ঘোষিত ছিল। মানুষ যে সম্প্রদায়েরই হোক, আইনের চোখে সামাজিক মর্যাদার কোন রূপ ব্যবধান সৃষ্টি করতে দেননি। তিনি মদিনার বিশ্বাসঘাতক ইহুদী ও প্রতারক খ্রীস্টানদেরকে যে সুযোগ-সুবিধা দান করেছিলেন, তা মানুষের রাজনীতির ইতিহাসে শুধু দুর্লভই নয়, অভাবনীয়, অচিন্তনীয়। তবুও মহানবী সবার শুভেচ্ছা কামনা করেছিলেন।

আরবদের একত্রকারী মহানবী ঃ যখন আরবের মাটিতে ইসলাম প্রবেশ করল তখন আরব নানা দলে বিভক্ত, নানা গোত্রে বিভক্ত, নানা গোষ্ঠী-কলহে জর্জরিত। এরূপ একটি কলহপ্রিয়, দ্বন্দ্বপ্রিয়, ঝগড়াটে, অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্বর জাতির মধ্যে মহানবী এলেন। দিবা-রাত্রি চিন্তা করতে থাকলেন কি করে এই অধঃপতিত জাতিকে রক্ষা করা যায়, কি করে এদের উন্নতিবিধান করা যায়। এক নিমিষে তাঁর চোখে ধরা পড়ল—আরবের অবনতির ও অধঃপতনের একমাত্র কারণ—তাদের বিভেদপন্থী মনোভাব। অর্থাৎ একতার অভাবই তাদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। তাই তিনি প্রথম নজর দিলেন তাদের একত্রীকরণে—তাদের এক করতে।

অসাধারণ দূরদর্শী মহানবী যখন মক্কা হতে মদিনার মাটিতে পা দিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন মক্কার কিছু নব মুসলমান। এবং মদিনায় যাঁদের নিকট এলেন, তাঁরাও সংখ্যায় বেশ কিছু ছিলেন। মক্কার মুসলমানদের যেমন ছিল নানা উপাধি, নানা খেতাব, মদিনার মুসলমানদেরও তাই ছিল। মহানবী মক্কার মুসলমানদের সমস্ত খেতাব ও উপাধি রহিত করে দিয়ে একটি বাঁধনে বেঁধে দিলেন, যার নাম 'মোহাজের' অর্থাৎ 'হাজির ব্যক্তি'। ঠিক অনুরূপভাবে মদিনার মুসলমানদেরও সমস্ত খেতাব বাতিল করে দিয়ে একটি উপাধি দিলেন—"আনসার" অর্থাৎ 'সাহায্যকারী'। এইভাবে তিনি সকল মুসলমানদের এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বেঁধে মুসলিম সমাজকে একটি দুর্গে পরিণত করলেন। অতঃপর মহানবী নজর দিলেন—ইহুদী, খ্রীস্টান, আস্ খাজরাজ প্রভৃতি নানা গোষ্ঠীর প্রতি। এবং তাদের

সঙ্গেও একটি সুন্দর সম্পর্ক বা সন্ধি গড়ে তুললেন, যাতে মদিনার বুকে কোন রকমের ভুল বোঝাবুঝি না থাকে। যাতে সকলেই নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করতে পাবে। এইভাবে মহানবী একদিন সকলেরই আস্থাভাজন হয়ে পড়লেন। এই কাজ সমাধানের পর তাঁর দৃষ্টি গেল অন্য পর্যায়ে।

বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী ঃ এইবার মহানবী আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। আন্তর্জাতিক ভালবাসা, মৈত্রী ও শান্তি কিভাবে স্থাপন হতে পারে। মহানবী সেই দিকে পরিচালিত করলেন তাঁর শিষ্যদের ও সকলকে। কেননা তাঁর যে অমোঘ ইচ্ছা, যে মহান ব্রত, তা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলা। তাই তিনি তাঁর সকল শিষ্য ও অন্যান্যদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন—জগতের সকল আল্লাহ্-প্রেরিত দূতদের মেনে নেওয়ার জন্য, বিশ্বাস করার জন্য, সম্মান দেওয়ার জন্য, যাতে বিশ্বের সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যাতে কেউ কাউকে ভুল না বোঝে, সকলেই যেন জানতে পারে, সকলেই যেন বুঝতে পারে—তারা একই মহান স্রষ্টাব সৃষ্টি, একই বিশ্ব-নিয়ন্তার অধীনে নিয়ন্ত্রিত তাদের জীবন ও মৃত্যু, এক প্রতিপালক তাদের পালনকর্তা, একই স্রষ্টা তাদের সংহারকর্তা ও রক্ষাকর্তা।

ইসলামেব মহান শিক্ষা—এ জগতেব উত্তম কাজ মানুষকে ভাই বলা। এই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনের জন্য মহানবী ইসলামেব আদর্শ ও মহান কোরআনের বাণী ঘোষণা করলেন—অখণ্ড মানবজাতি সম্পর্কে কোরআন—"মানব জাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তিনি তাঁদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন।"

কোরআন—২ ঃ ২১৩, ১০ ঃ ১৯, ১১ ঃ ১১৮, ২১ ঃ ৯২

ইসলামেব মূল মন্ত্র করিলে মন্থন
এক-ই পিতার পুণ্যে মোরা ভাই বোন।
সৃষ্টির আদিতে মোরা শিক্ষা যেটি পাই
এক-ই মায়ের কোলে মোরা ভাই ভাই।

কোরআন—৪ ঃ ১, ৭ ঃ ১৮৯

আল্লাহ্-প্রেরিত অন্যান্য দূত্ব সম্পর্কে কোরআন ঃ "এমন কোন জাতি নেই, যাদেব মাঝে কোন দূতের আগমন হয়নি। প্রত্যেক জাতির জন্য একজন দূত প্রেরিত হয়েছিলেন। নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির জন্য রসুল প্রেরণ করেছি।"

কোরআন—১০ ঃ ৪৭, ১৬ ঃ ৩৬, ৩৫ ঃ ২৫

অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআন ঃ "বিশ্বাসীগণ, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস বিদ্রূপ করো না। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মপদ্ধতি নির্ধারিত করেছি, যা তারা পালন করতেন।"

কোরআন—২ ঃ ১৫৬, ১৩ ঃ ২২, ৪৯ ঃ ১১

জগতের অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে কোরআন ঃ "কোন রসুলকে তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষা ব্যতীত প্রেরণ করিনি। তিনি তোমাদের বিভিন্ন ভাষা ও তোমাদের বর্ণসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যাতে জ্ঞানিগণের জন্য নিদর্শনাবলী আছে।"

এইভাবে আল্লাহর মহান দূত., ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলার জন্য বিশ্বজোড়া মানবমণ্ডলী সম্পর্কে, বিশ্ব-প্রেরিত সকল দূত সম্পর্কে, বিশ্বের সকল জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে ও বিশ্বের সকলকে শুধু স্বীকারই করেননি, দিয়েছেন সম্ভ্রম, দিয়েছেন সম্মান। এ সমস্তের মূলে একটিই শুধু উদ্দেশ্য বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলা। তাই মহানবী ছিলেন—সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রথম ও প্রধান চিন্তানায়ক। এবং এইটাই ছিল তার প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব। তাই পবিত্র কোরআন বলে—"নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ও সতর্ককারী।"

কোরআন—১৩ ঃ ৭

সর্বশেষে একথাও আমরা বলতে পারি—মহানবী এই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে মানুষকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন জাতি বা গোত্রের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনে তিনি একটি উপদেশও দেননি, যে কাজ নিজে করেননি। সুতরাং এইরূপ করেই তবে তিনি উপদেশ দিয়েছেন , যেমন—মিশররাজ কর্তৃক প্রেরিতা খ্রীস্টান মহিলা বিবি মারিয়াকে পত্নীত্বে বরণ। তখনও তিনি খ্রীস্টান। বিবি সাফিয়া ও রায়হানা তখনও ইহুদী। মহানবী ঘোষণা করেছিলেন---যদি কোন বিধর্মী মহিলা কোন মুসলমানকে বিয়ে করে সে তার নিজ ধর্ম পরিবর্তন নাও করতে পারে। ৫ ঃ ৫। এই ভাবে মহানবী ছিলেন বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আদি চিন্তানায়ক, প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান প্রচারক ও পৃষ্ঠপোষক।

১২। মক্কার মাটিতে নবীরূপী মহানবী মহম্মদ (দঃ) আজ মদিনার মাটিতে রাজনীতিবিদ মহানবী মহম্মদ (দঃ) ঃ মহানবী (দঃ) মদিনার মাটিতে (৬২২) পদার্পণ করে জাতিসংঘ বা একটি আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপন করলেন। নানা গোষ্ঠী, নানা শ্রেণীর মানুষকে এক করলেন, একত্রিত করলেন। সকলেই তখন এক বাক্যে তাঁর মহান জীবন চরিত্র লক্ষ্য করে তাঁকেই প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করলেন। জগতে প্রথম এই গণতন্ত্রভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ স্থাপন করলেন নিরক্ষর মক্কাবাসী মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)। স্থাপিত হলো প্রথম জাতিসংঘ U N O

খ্রীস্টান, ইহুদী ও অন্যান্যদের সঙ্গে শান্তি ও সন্ধি চুক্তি ঃ এই রাষ্ট্রের শর্ত ছিল—(১) মুসলমান-অমুসলমান সকলেই এক Nation বা জাতি হিসাবে বসবাস করবে। (২) প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্ম পালন করবে, কেউ কারও ধর্মে আঘাত করতে পারবে না। (৩) যে কোন পক্ষ আক্রান্ত হলে সকল পক্ষ মিলিতভাবে শত্রু পক্ষকে বাধা দেবে। (৪) অন্য কারও সঙ্গে সন্ধি করতে হলে সকল পক্ষ মিলিতভাবে পরামর্শ করে সন্ধি করবে। (৫) মদিনায় নরহত্যা বা রক্তপাত অবৈধ বলে ঘোষিত হলো। (৬) কোন পক্ষই মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হবে না, সন্ধি করবে না, আশ্রয় দেবে না, সাহায্য করবে না। (৭) হযরত এই সাধারণতন্ত্রের সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হলেন। (৮) যে পক্ষ যে কোন একটি শর্ত ভঙ্গ করবে, তার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

হিজরীর ষষ্ঠ বছরে মহানবী সমস্ত খ্রীস্টানদেব নির্ভয়ে বসবাস করার জন্য একটি সনদ দান করলেন যখন মদিনা ইহুদী মুক্ত হলো ঃ

(১) তাঁদের ওপর অন্যায়ভাবে কোন কর বসানো হবে না।

(২) খ্রীস্টান ধর্মযাজকগণ তাঁদের পদ থেকে বরখাস্ত হবেন না।

(৩) কোন খ্রীস্টানকেই তাঁর ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে না।

(৪) কোন সন্ন্যাসীকে তাঁর প্রার্থনাগার হতে বহিষ্কার করা হবে না।

(৫) কোন তীর্থযাত্রীকে তার তীর্থগমনে বাধা দেওয়া হবে না।

(৬) কোন গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত বা নষ্ট করা হবে না।

(৭) কোন খ্রীস্টান ইহুদী বা কেতাবী মহিলা কোন মুসলমানকে বিয়ে করলেও সে তার আপন ধর্ম পালন করতে পারবে। কোরআন—৫ ঃ ৫

(৮) খ্রীস্টানগণ তাঁদের গির্জা মেরামতের জন্য সাহায্য চাইলে মুসলমানগণ সাহায্য দান করবে।

এই দু'দফা রাষ্ট্রনীতি থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি, মহানবী কত বড় রাজনীতিবিদ ছিলেন। এমনকি মানুষের শুভ বিবাহবন্ধনের দ্বারা আন্তর্জাতিক একটি জাতি গঠনের মহাসুযোগ করে দিয়ে গেছেন। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু জীবনের অন্তিম শয়নে কাউকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যাননি। অবাধ নির্বাচনের পথ রেখে গেলেন, যার ফল হলো - পরবর্তী চারটি সৎ খলিফার যুগ। সৎ খলিফার যুগ শেষ হলে গণতন্ত্রও অস্তমিত হলো, ইসলামও তার আসল রূপ হারাল। কেননা মহানবী বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর আসল ইসলাম ৩০-৩৭ বছরের বেশি থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে তাই ই দেখা গেল। ইসলামের শেষ সৎ খলিফা হযরত আলি (কঃ) ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে শাহাদত বরণ করলেন। এবং মহানবীর ইন্তেকাল ৬৩২ খ্রীস্টাব্দ। এর দ্বারা রাজনীতিবিদ মহানবী এইটুকুই বোঝাতে চেয়েছিলেন--যতদিন গণতন্ত্র আছে, ততদিনই আসল ইসলাম আছে। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের উজ্জ্বলতম আদি আদর্শ, সেই আদর্শ যদি সারা বিশ্বে আজও ঠিকমতো প্রতিপালিত হয়, তাহলে বিশ্ব-শান্তি কিছুতেই বিঘ্নিত হতে পারে না।

কি করে মহানবী রাজনীতি ক্ষেত্রে এত অভূতপূর্ব কৃতকার্যতা লাভ করেছিলেন। কি করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সামান্য রাজ্য পরবর্তীকালে দক্ষিণে কেপ ক্যামারিন হতে উত্তরে ফ্রান্সের পিরেনিজ পর্যন্ত, আবার আটলান্টিক হতে ভারতের কাবুল, কাশ্মীর পর্যন্ত, কনস্টান্টিনোপল হতে লঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, কি করে মুসলমানগণ সারা দুনিয়ায় সহস্র বছর ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক ছিলেন। মহানবী কি মহামন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন—কোন শক্তিতে তিনি এতবড় হয়েছিলেন। আমরা তো জানি তাঁর কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না, কোন রণসম্ভার ছিল না, কোন দুর্গ ছিল না। এমনকি কোন ক্ষুদে পুলিসবাহিনীও ছিল না। কিন্তু তার তিনটি জিনিস ছিল—সত্য, শ্রম ও ন্যায়বিচার। এই তিনটি অস্ত্র নিয়ে তিনি ত্রিকাল জয় করে গেছেন। অস্ত্রহীন, সৈন্যহীন, রাজপ্রাসাদহীন, দেহরক্ষীহীন, তবুও মহানবী আজও সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম তুলনাবিহীন সফল রাজনীতিবিদ। সেদিনের বহু কামান ও গোলার মুখে, সেদিনের বহু ঘোড়া-হাতির সম্মুখে, মুক্ত তরবারির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্য, ন্যায় ও প্রেমের সৈনিক মহানবী রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রমাণ করে গেছেন —তিনি কত বড় দেশশাসক, কত বড় বিচক্ষণ বিরল রাজনীতিবিদ।

১৩। রাজ্য শাসনে মহানবী ঃ ইসলাম শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র স্বীকার করে না। কেননা কোরআন বলে—"পরস্পর পরামর্শ দ্বারা তাদের সরকার পরিচালিত হয়।" "যারা নির্যাতিত ও অত্যাচারিত জনগণের ডাকে সাড়া দেয়, তাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করে, তারা শাসন ক্ষমতা লাভ করবে।" মহানবী বলেন—"যে লোক মানুষের দ্বারা আল্লাহ্ কর্তৃক তার প্রজাদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত হয়, সে যদি তাদের মঙ্গলের জন্য তাদের নিকট না যায়, সে ব্যক্তি জান্নাতে (স্বর্গে) স্থান পাবে না।" তিনি আরও বলেন—"অত্যাচারী শাসনকর্তার সম্মুখে সত্য কথা বলাই সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ।"

১৪। গণতন্ত্রের মহানবী ঃ

এ মরুর মালিকানা জগৎ-স্রষ্টার
সকল সম্পদ হতে সবকিছু তার।
দাও নাই রাজতন্ত্রে মানুষের রাজ
শিখাইয়েছ গণতন্ত্রে গড়িতে সমাজ।
শিখাইলে মানুষের স্রষ্টা সবাকার
সৃষ্টি কুলে মানুষের সম অধিকার।
এ জগতে আছে যদি রাজ-সিংহাসন
সর্বহারা মানুষের হৃদয় আসন।
চুরি আর জোয়াচ্চুরি নামে ভোট নয়
মানুষের খোলামন করিবে নির্ণয়।
রাজ্যহীন রাজশক্তি করিতে বরণ
জয় কর মানুষের হৃদয় আসন।
বলে নাই জোরে নাই জাতির জনক
মানুষই করিবে ঠিক মানব সেবক।

শিখাইলে মানুষেরে মান-মানবতার
জগতের গণতন্ত্র সাম্য অধিকার।
সমস্ত সম্পদ 'পরে সেই এক প্রভু
অসাম্য অধিকার কারও নাই কভু।
শিখাইয়াছ মানুষেরে আল্লাহ্ সবাকার
দিয়েছেন সকলের সম অধিকার।
অবাধে করিতে পার রুজি রোজগার
অফুরন্ত সঞ্চয়ের নাহি অধিকার।
বলেছে কঠোর কণ্ঠে হাদিস কোরআন
এ সব দোষেতে দোষী সবাই শয়তান।
মানুষ খলিফা শুধু খাদেম খোদার
এ কথা জানে না যেই নহে জনতার
গড় নাই রাজতন্ত্রে মানবের রাজ
শিখাইলে গণতন্ত্রে সভ্য-সমাজ।
কোরআন—২ ঃ ২৮৪, ৩ ঃ ১৪৪

১৫। বিচারক মহানবী (দঃ) ঃ বিশ্বের কোন মানুষের গড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজ হতে পড়াশোনা করে মহানবী বিচারপতির আসন লাভ করেননি। অসভ্য আরব জাতির মনের আদালতে মহানবী প্রথম 'আমিন' (চিরবিশ্বাসী) উপাধিটি লাভ করেন। তখন তিনি নবী হননি। অতি সাধারণ মানুষ বেশেই সকল সাধারণ মানুষের অন্তরে ন্যায় বিচারকের আসন লাভ করেন। বাল্যকালের এই ন্যায় বিচারকই একদিন বিশ্বের দরবারে মহান বিচারকের আসন লাভ করেন। শুধু মানবমণ্ডলী নয়, সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য যে অসংখ্য নীতি তিনি ঘোষণা করে গেছেন তা স্থান-কাল-পাত্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই বিবেকে ও বিচারাসনে বিচারের দিক নির্ণয়ে আলো দান করবে।

মহানবী বলেন—'৬৫ বছরের নফল এবাদত (অতিরিক্ত আরাধনা) অপেক্ষা একটি ন্যায় বিচার শ্রেষ্ঠ'। এই সামান্য কথাটি বিশ্বের যে কোন বিচারাগারের ওপর ঝুলিয়ে দিলে ওই বিচারাসন ধন্য হবে। তিনি বলেন—'বিচারে কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো

না। বিচারে উচ্চ-নীচ, আত্মীয়-স্বজন নেই। প্রমাণ অভাবে দোষী মুক্তি পাক, কিন্তু নির্দোষ যেন শাস্তি না পায়। প্রমাণের ভার অভিযোগকারীর ওপর। উভয় পক্ষের কথা না শোনা পর্যন্ত রায় দিও না, রাগান্বিত অবস্থায় রায় প্রদান করো না।' এইভাবে ন্যায়বিচারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত তিনি জীবনে রেখে গেছেন। অতি সূক্ষ্মতম বিচারেও তিনি নিখুঁত রায় দিয়ে জগতের বুকে অসাধারণ অভাবনীয় ন্যায় বিচারকের আদর্শ রেখে গেছেন।

১৬। আইনদাতা মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আইনদাতা বলার কারণ—তিনি শুধু পরলোকের সুখ-শান্তির কথা বা নীতি নির্ধারণ করে যাননি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহলোকে মানুষ কি করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে, তার চরম নির্দেশ বা নীতি নির্ধারণ করে গেছেন। ওই নীতিগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করলে পৃথিবীতে বা মানবসমাজে কোনদিনই অশান্তি আসতে পারে না। ব্যক্তিজীবন থেকে পারিবারিক জীবন, পারিবারিক জীবন থেকে সমাজজীবন, সমাজজীবন থেকে জাতীয় জীবন ও জাতীয় জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবনের নীতি নির্ধারণ করে গেছেন।

দেওয়ানি আইনের ধারায় ইসলাম দান, দেবত্ব (ওয়াকফ) জীবনস্বত্ব অছিয়ত, (উইল), উত্তরাধিকার আইন, সম্পত্তি ভাগ, সামাজিক আইন, প্রতিবেশী আইন, নারীরক্ষণ আইন, নৈতিক আইন, দেশ পরিচালনার গণতন্ত্রের আইন, আবার দণ্ডবিধি আইনের সকল ধারাই সমানভাবে স্থান পেয়েছে তাঁর দৃষ্টিতে। আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রেও তিনি সকল সুন্দর নীতি ধারাবাহিকভাবে দান করে গেছেন। সমাজ ও সভ্যতার রাজনীতিতেও তিনি যে কি অবর্ণনীয় ও অপরিসীম দান দিয়ে গেছেন, তা চিন্তা ব্যতীত বর্ণনা করা যায় না। এদেশের ক্ষণজন্মা পুরুষ রাজা রামমোহন রায় থেকে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ সংস্কারের পদক্ষেপগুলো একটু লক্ষ্য করলেও বোঝা যাবে, মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) সমাজ ও সভ্যতার কি বীজ বপন করে গেছেন। তাই তাঁর দেওয়া আইন ও আদর্শের অম্লান জ্যোতিতে জগৎ আজও উদ্ভাসিত হতে পারে। কিন্তু কে এই উপদেশ গ্রহণ করবে? কোরআন—৫৪ ঃ ২২, ৩৩, ৫০, ৬৮ ঃ ৫২

১৭। মুকুটবিহীন সম্রাট মহানবী (সাঃ) ঃ শূন্য হতে সম্রাট, সম্রাট হতে শূন্য। এ এক অপূর্ব ইতিহাস মানবসমাজে, এর কোন নজির নেই। নিঃস্ব মানব মহানবী। নিরক্ষর মানব মহানবী। এই নিঃস্ব মানুষটি তদানীন্তন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিধর পুরুষে পরিণত হলেন। এই নিরক্ষর মানুষটি সেদিনের বিশ্ব-সমাজের শ্রেষ্ঠতম শিখরে আসন লাভ করলেন। কি অভূতপূর্ব ঘটনা একটি মানুষ শূন্য হাতে আরম্ভ করলেন তাঁর সাধনা। হলেন সম্রাট আবার সম্রাটের আসন লাভ করে নিঃস্ব ফকিরের বেশে দিন কাটালেন। এ দৃষ্টান্ত তামাম দুনিয়া কোনদিনই দেখেনি, আর কোনদিনও দেখবে না।

বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠতম নরপতির যে কোন সৎ গুণ যদি আমরা দেখতে চাই মহানবীর চরিত্রে, দেখতে পাই সেগুলো ছিল নক্ষত্ররূপে তাঁর চরিত্রাকাশে সদাই উদ্ভাসিত। যে কোন যুদ্ধের পূর্বে তার দূরদর্শিতার সহিষ্ণুতা ফুটে উঠেছে, সমভাবে ফুটে উঠেছে সম্মুখ সমরে তাঁর অতুলনীয় শৌর্য ও বীর্য, আবার যে কোন সন্ধিক্ষেত্রে দেখতে পাই নিষ্ঠার অবিচল অনুশীলন। বিশ্বের যে কোন আদর্শ নরপতির জন্য তিনটি গুণ একান্ত অপরিহার্য। অধিকন্তু

আবার আমরা লক্ষ্য করি—যে কোন যুদ্ধে মহাজয়ের মহানন্দ যেমন তাঁকে জয় করতে পারেনি, উন্মত্ত করতে পারেনি। ঠিক তেমনি যে কোন কার্যে পরাজয়ও তাঁর মানসিকতাকে এতটুকুও বিচলিত বা বিব্রত করতে পারেনি, এমনি ছিল তাঁর মানবিক ক্ষমতা, এককথায় সমস্ত কিছুকে তিনি সহজেই আত্মস্থ করতে পারতেন।

কি করে জাতি গঠন করতে হয়, কি করে দেশ গঠন করতে হয়, কি করে দেশের মঙ্গল সাধন করতে হয়, কি করে রাজকার্য পরিচালনা করতে হয়, কি করে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া করতে হয়। নজিরবিহীনভাবে সমস্ত কিছুর নির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন। তাঁরই আদর্শকে অনুসরণ করে একদিন মুসলিম খলিফা, সুলতান ও নরপতিগণ সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করে তুলেছিল। তাই মহানবী সকল নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল নরপতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরপতি। আজও তাঁর নীতির পূর্ণ অনুসরণ হলে জগৎ কোনদিনই অশান্তিতে পড়তে পারে না।

১৮। শান্তিপ্রবর্তক মহানবী (দঃ) ঃ আল্লাহ্ কর্তৃক মহানবীর যে প্রধান খেতাব তা শান্তিদূত, তিনি যে ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক তা শান্তির ধর্ম, তার নামই "শান্তি"। তিনি যে শুধু পরলোকের শান্তি কামনা বা ব্যবস্থা করে গেছেন তা নয়, অখণ্ড মানবজীবনের ও অখণ্ড মরুজগতের শান্তিপূর্ণ বিধান দিয়ে গেছেন। তিনি ইহলোক থেকে পরলোকের শান্তির বিধান দিয়েছেন, তিনি দৈহিক থেকে মানসিক শান্তির বিধান দিয়েছেন, আবার ব্যক্তি-জীবন থেকে পারিবারিক জীবনের বিধান দিয়েছেন, আবার পারিবারিক থেকে সামাজিক শান্তি বিধান দিয়েছেন, আবার সামাজিক থেকে সমগ্র জাতীয় জীবনের শান্তি বিধান দিয়েছেন। আবার জাতীয় জীবন থেকে আন্তর্জাতিক শান্তির বিধান দিয়েছেন।

এই বিধিবিধানগুলো দিতে গিয়ে তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গেই সমস্ত দিক আলোচনা করে গেছেন। কি করে মানুষ তার স্রষ্টার সঙ্গে শান্তি রক্ষা করে চলতে পারবে। কি করে মানুষে মানুষে শান্তি রক্ষা করে চলবে, কি করে এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে শান্তিরক্ষা করে চলবে, কি করে ধনী গরিবদের সঙ্গে, শ্রমিক মালিকদের সঙ্গে, প্রভু দাসের সঙ্গে, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে, দাতা গ্রহীতার সঙ্গে, সবল দুর্বলের সঙ্গে, আত্মীয় আত্মীয়ের সঙ্গে, বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে, রাজা রাজার সঙ্গে, প্রজা প্রজার সঙ্গে, ভুক্ত অভুক্তের সঙ্গে শান্তি রক্ষা করবে, তার বর্ণনা দিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, মানুষ কি করে প্রাণিজগতের সঙ্গে ও জড়জগতের সঙ্গে শান্তি রক্ষা করবে, তারও তিনি যথাযথ বর্ণনা দিয়ে গেছেন। জগতের যে কোন ব্যক্তি মহানবীর মতো শান্তি স্থাপনের এত সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তিনি ইহকাল থেকে পরকালকে জড়িয়ে নিয়ে অখণ্ড মানবসমাজের অটুট শান্তির পথ ও পন্থা দিয়ে গেছেন। সমগ্র কোরআন ও হাদিস শরীফে এর অসংখ্য উপমা ছড়িয়ে আছে। এই জন্যই স্বয়ং বিশ্বপ্রভু তাঁকে "করুণার দূত" বলে ঘোষণা করেছেন —"বিশ্বজগতের করুণা ব্যতীত তোমাকে আমি প্রেরণ করি না।" কোরআন—২১ : ১০৭

১৯। অসাম্প্রদায়িক ও জগৎপ্রেমিক মহানবী ঃ মহানবীর যতগুলো বড় উপাধি আছে, তার মধ্যে একটি তিনি বিশ্বের জন্য করুণা স্বরূপ। এই উপাধিটি কোন মানুষ তাঁকে দেননি। দিয়েছেন স্বয়ং স্রষ্টা। মহানবী এই মহা উপাধি পেয়েছেন—কোন ফাঁকা

বুলির ওপর নয়, সমগ্র জীবনের তিক্ত সাধনার ওপর, কঠিন ব্রতের ওপর। তাঁর ব্রত ছিল জগৎ জুড়া সাম্য ও শান্তি। এইজন্য এই জগতের যত বর্ণ, যত জাতি, যত ভাষা, যত সম্প্রদায় যা কিছুই আছে, সকলকে তিনি করতে পেরেছিলেন আপন। অকৃত্রিম ভালবাসায় স্নেহ মায়া মমতায় তাঁর মনের কুটীরে সবাই স্নেহধন্য হয়ে উঠেছিল। ইসলামের যে মহান আল্লাহ্, তিনি তাঁর বাণী পবিত্র কোরআনে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন—জগতের যত জাতি, যত বর্ণ, যত ভাষা, যত সম্প্রদায় সবই তাঁর সৃষ্টি ও তাঁরই মহিমা। মহানবী ছিলেন এই কোরআনের আপসহীন প্রচারক। সুতরাং এদের কোন একটিকে ঘৃণা করা, অস্বীকার করা মহানবীকেই ঘৃণা করা ও অস্বীকার করা। ইসলামের আল্লাহ্‌কে অমর্যাদা করা। বিশ্বপ্রেমিক জগতপ্রেমিক মহানবী বিশ্বকে ভালবাসার একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন—"সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর পরিবার, যে এই পরিবারের প্রতি ভাল, সে আল্লাহর নিকট ভাল"। সুতরাং যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক, সে যেন আল্লাহ্‌কে অমর্যাদা করল, তাঁর বাণীকে অস্বীকার করল। এবং তাঁর দূত মহানবীকে অবমাননা করল। সুতরাং কোন মুসলমানেরই ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক হওয়া সম্ভব নয়। যদি তিনি মুসলমান হন। মহানবী তাঁর দু-বাহু দুটো মানুষের জন্য অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন, যাঁরা দু'জনেই ছিলেন অমুসলিম ; একজন চাচা আবু তালেব, অন্যজন ধাত্রী মা—হালিমা।

২০। **নেতা মহানবী (দঃ)** ঃ সমগ্র আরব জাহানে ইসলামের পূর্ব ইতিহাস যদি কেউ লক্ষ্য করেন, অতি সহজেই তিনি অনুমান করতে পারেন—আরবেরা কি অসভ্য, কি বর্বর! তাদের অসভ্যতা, তাদের বর্বরতা বর্ণনাতীত। মানুষের জীবনে এমন কোন হীন কাজ নেই, যা তারা করত না। সেই পৃথিবী-বিখ্যাত কুখ্যাত সমাজে জন্ম নিলেন মহানবী। নেতৃত্ব দিলেন জাতিকে। যে নেতৃত্বের গুণে অধঃপতিত জাতি একদিন আবার বিশ্বকে নেতৃত্ব দিল।

চিন্তা করলে শরীরে শিহরণ জাগে, যে জাতি একদিন সামান্য একটু ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুগ-যুগান্তর হতে শতাব্দীর ইতিহাস কলঙ্কিত করত—হানাহানি খুনোখুনিতে, সেই জাতিকে কোন মায়াবলে, কোন মন্ত্রবলে, কোন সম্মোহনী নেতৃত্বে মহানবী সকলকে এক ভাইয়ে ও এক বোনে পরিণত করলেন, এক সুতোতে বেঁধে দিলেন। তাঁর সেই নেতৃত্বকে সমান দেখাতে তাঁর অগণিত ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ যে নিদর্শন রেখে গেছেন, তা বিশ্বের ইতিহাসে শুধু বিরল নয়, একান্ত অভাবনীয়।

নেতার নেতৃত্ব কত নিখুঁত ছিল, কত পবিত্র ছিল, কত অন্তরজয়ী ছিল, তা অতি সহজেই বোঝা যায়, তাঁর ভক্তবৃন্দের অসাধারণ ভক্তি, ত্যাগ ও তিতিক্ষা থেকে। এমন কোন কঠিনতম হৃদয় নেই, যিনি ওই সমস্ত ঘটনাগুলো শোনামাত্র বিচলিত হয়ে উঠবেন না, করুণরসে ভরে উঠবেন না। কাবা প্রাঙ্গণে বেদুইন আরবের হাতে ইসলামের প্রথম শহীদ হারেসের প্রাণত্যাগ, আজও কাবার মাটি যেন ক্রন্দনরত। আবিসিনিয়ার ক্রীতদাস হযরত বেলালের ঘটনা বিশ্বইতিহাসে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। ইয়াসের ও সোমাইয়ার নির্মম বেত্রাঘাতে প্রাণদান, হযরত খাব্বারের পৃষ্ঠদেশে জ্বলন্ত অঙ্গারের মহাপরীক্ষা ও প্রাণনাশ, হযরত সাফওয়ানের হাতে-পায়ে চারদিকে চারটি বলিষ্ঠ উট বেঁধে তাদের বিপরীত দিকে ছুটিয়ে দিয়ে হতভাগ্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করার ইতিহাস বিশ্বের যে কোন নির্মম কাহিনীকে ম্লান করে

তোলে, নেতার প্রতি কি অচিন্তনীয় আস্থা। অনুরূপভাবে হযরত আফলাহার প্রাণত্যাগ, জেরিনা নাম্নী সাধ্বী মহিলার চক্ষুদান ও হযরত ওয়ায়েছ করণীর স্বেচ্ছায় সমস্ত দন্ত উৎপাটন সমগ্র মানব ইতিহাসে নেতার নেতৃত্বের প্রতি এক নজিরবিহীন নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এইভাবে আমরা অসংখ্য ভক্তজনের বিনিময়ে, মানের বিনিময়ে, দেহের বিনিময়ে, প্রাণের বিনিময়ে ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার বিনিময়ে সম্মান দিয়েছেন তাঁদের নেতার নেতৃত্বকে। কোন্ ধরনের নেতৃত্ব এরূপ আশা করতে পারে, যে নেতৃত্ব একমাত্র নিখিল বিশ্বের নিষ্কলঙ্ক নিরুপম নিখুঁত নেতৃত্ব। যে নেতৃত্ব পরবর্তীকালে জন্ম দিয়েছিল—অসংখ্য অভাবনীয় আদর্শ নেতার, যে সমস্ত নেতার নেতৃত্বের নিকট জগৎ আজও ঋণী, চিরঋণী। মহানবীর চিরশত্রু আবু সুফিয়ান মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন—"আল্লাহর কছম, মহম্মদ (দঃ)-এর ভক্তবৃন্দ তাঁর প্রতি যে কল্পনাতীত প্রেম ও ভালবাসা পোষণ করে থাকে, জগতের অন্য কোন জাতির ইতিহাসে তার তুলনা নেই।"

২১। সত্য সেবক মহানবী (দঃ) ঃ মহানবীর জীবন-সংগ্রাম ছিল মূলত সত্যের জন্য ও সত্যের সেবায়, আলোর পক্ষে, অজ্ঞতার বিপক্ষে। সত্যের সেবায় মহানবী তাঁর জীবনকে একটানা ২১ বছর চরম বিপদাপন্ন করে তুলেছিলেন। মহানবী ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রীস্টাব্দ নবুয়ত (ঐশী) লাভ করলেন। আরম্ভ করলেন সত্যের প্রচার, মিথ্যার খণ্ডন। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হলো তাঁর প্রতি অকথ্য অত্যাচার, অবিচার। ৬১০ থেকে ৬২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জন্মভূমি মক্কায় কাটালেন। দীর্ঘ এই ১৩ বছর তাঁর জীবনে কি ঘটনা ঘটল, তা একের পর এক লক্ষ্য না করলে বোঝা যাবে না। অত্যাচারের প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ, তৃতীয় ধাপ; প্রলোভনের প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ, তৃতীয় ধাপ, একের পর এক সবই পার হলো, আরম্ভ হলো নির্মম নিষ্ঠুর অমানুষিক অত্যাচার। কিন্তু সত্যের সকল পরীক্ষাতেই মহানবী চির অম্লান। সত্যের পরীক্ষায় ৬১৯ খ্রীস্টাব্দ হযরতের জীবনে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় বছর। তিনি নিজ মুখে একথা বলে গেছেন। এই বছরই আবু তালেব প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে মহানবী বলেছিলেন—জগতের যত বিপদ আপতিত হয়েছে তাঁর ওপর, তার মধ্যে এটা ছিল সবচেয়ে গুরুতর। এ বছরই তাঁর স্ত্রী বিবি খাদিজা ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহানবী ঘরে-বাইরে শূন্য দেখলেন। ঘরে ছিলেন—বিবি খাদিজা, বাইরে ছিলেন চাচা আবু তালেব।

মক্কাকে কেন্দ্র করে মধ্য আরবে যখন কোন আশা দেখলেন না, তবুও সত্যের পরীক্ষায় নিরাশ হলেন না। যাত্রা আরম্ভ করলেন দক্ষিণ আরব তায়েফের পথে। সেখানে যা ঘটেছিল, তিনি নিজ মুখে বলেছেন—তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিপদাপন্ন স্থান ছিল। সত্যের সেবায় দক্ষিণ আরবেও হতাশ হলেন। ফিরে এলেন মক্কায়, নির্যাতনের স্রোত বহু আকারে বেড়ে গেল। ওই অগ্নিগর্ভের ভিতর ৬২০ ও ৬২১ খ্রীস্টাব্দ কাটালেন। তখন মহানবী শুধু নির্যাতিত নন। সবদিক দিয়ে সমাজচ্যুত। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে অত্যাচারের প্রবল প্রতাপে মহানবী জন্মভূমি মক্কা ছাড়তে বাধ্য হলেন। ইয়াসরিবে (মদিনায়) গমন করলেন। মহানবী সবকিছুকে ত্যাগ করলেন, কিন্তু সত্যকে ত্যাগ করলেন না। সেখানেও শান্তি পেলেন না, যুদ্ধের পর যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হলো। অবশেষে সকল মিথ্যা এক সত্যের নিকট

পরাজিত হলো। মহানবী সত্যের পরীক্ষা ও সত্যের সেবায় জয়ী হলেন। ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে মক্কা বিজিত হলো। এইভাবে ৬১০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৬৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা ২১ বছর সত্যের সেবক মহানবী সত্যের পরীক্ষায় সকল কিছুর বিনিময়ে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে মিথ্যাকে নির্মমভাবে পরাজিত করে সত্যের পতাকাকে, ন্যায়ের পতাকাকে নিখিল বিশ্বে তুলে ধরলেন। তাই পবিত্র কোরআন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিল—"হে বিশ্বাসীগণ, ধৈর্য ও উপাসনার সঙ্গে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী।......এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের ভয়, ক্ষুধা ও ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল শস্যের ক্ষতির কোন একটি দ্বারা পরীক্ষা করব। তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।" কোরআন—২ ঃ ১১৪, ১৫৩-৫৫, ২৯ ঃ ২

২২। সেনাপতি মহানবী (দঃ) ও তাঁর সমরনীতি ঃ মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) কেন শ্রেষ্ঠতম সেনাপতি? তিনি যে সামরিক নীতির প্রবর্তন করে গেছেন, তা আজও বিশ্বের বুকে শান্তি ও জয়ের মহাবাহন। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি নাকিসুরে বক্তৃতা করে যাননি। যা কিছু বলেছেন, তা কর্মময় জীবনে করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এইখানেই তাঁর বীরত্বের মূল্যায়ন। সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর সামরিক নীতিগুলো ছিল—

(১) যুদ্ধক্ষেত্রকে তিনি আল্লাহর এবাদতখানায় ও বিচারাগারে পরিণত করেছিলেন। তাই সেখানে আল্লাহর উপাসনা ও ন্যায়বিচার অব্যাহত থাকত। তিনি ঘোষণা করেছিলেন—যুদ্ধের উদ্দেশ্য অত্যাচার নয়, অত্যাচারীকে দমন করা, ধ্বংস নয় সৃষ্টি; হিংসা নয় ভালবাসা; অশান্তি নয় শান্তি; সম্পদ লুণ্ঠন নয় সম্পদের সম বণ্টন; অবৈধ সঞ্চিত ধনকে সংগ্রহ করে অসহায় বঞ্চিত জনকে বাঁচানো।

(২) সৈন্যদের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকতা রক্ষার কঠোর নির্দেশ ছিল। মদ্যপান, ব্যভিচার ও লুণ্ঠতরাজ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।

(৩) যুদ্ধলব্ধ $^১/_৫$ অংশ আল্লাহ্ ও রসুলের অর্থাৎ রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদ বা গরিবদের জন্য, বাকি সব সৈন্যদের মধ্যে বণ্টিত হতো।

(৪) যুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম আক্রমণ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ অন্যায়কে প্রশমিত করা এবং আত্মরক্ষা ব্যতীত ইসলামে কোন যুদ্ধ ছিল না।

(৫) ইসলামের যুদ্ধ ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মাত্র, তাই যে কোন রণহুঙ্কার নিষেধ ছিল, তকবির ব্যতীত। এই সংগ্রামকেই জেহাদ বলা হয়।

(৬) যুদ্ধে স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, বালক, রুগ্ণ সকল অসহায় এবং সকল অসামরিক ব্যক্তিকে আঘাত করা একেবারেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

(৭) এতদ্ব্যতীত প্রাণিজগৎ, প্রকৃতিজগৎ, জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ, স্থাপত্যজগৎ শস্যক্ষেত্র, বাড়ি-ঘর ইত্যাদির ওপর ধ্বংসের হস্তক্ষেপকে পাপ বলে পরিগণিত করেছিলেন। নদীর জল, পুকুরের জল কিংবা যে কোন জলাশয়কেই বন্ধ ও বিষাক্ত করা চলবে না।

(৮) রাজদূতকে হত্যা মহা অন্যায় ও বিশ্ব-শান্তির পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেন।

(৯) নিহত শত্রু বা সৈনিকের নাক-কান কাটা বা যেকোন অঙ্গচ্ছেদ করাটাকে তিনি একেবারেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। অথচ সে যুগে পরাজিত বা নিহত শত্রুর নাক-

কান কেটে আনতে পারলে তাকে পুরস্কৃত করা হতো। আজ থেকে চারশো বছর পূর্বেও এ জঘন্য দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অথচ আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই মহানবীজী এটাকে একেবারেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

"২০ হাজার ছিন্ন রক্তাক্ত নাক। ৪০০ বছর আগে কোরিয়ায় জাপানের বর্বরতার চিহ্ন। আগ্রাসী জাপানি ফৌজ মৃত ও জীবিত কোরীয়দের নাক কেটে নিত আদিম যুদ্ধবিজয়ীর উন্মাদনায়। সংগৃহীত নাকের বদলে কর্তাদের থেকে মিলত নগদ পুরস্কার ও পদোন্নতি। ঐতিহাসিকদের হিসাবে ১৫৯৭ সালের ওই জাপানি হানায় কমপক্ষে ১ লক্ষ কোরীয় নিহত হন। প্রধান যুদ্ধটি হয়েছিল আজকের সিওল থেকে ২২০ কিমি দূরে পুয়ানে।

সেই ছিন্ন নাকের স্তূপের দগ্ধাবশেষের সঙ্গে আবিষ্কৃত কিছু নাকও স্বদেশে নিয়ে যায় বিজয়গর্বী জাপ ফৌজ। ১৯৮৩ সালে তার সন্ধান পান এক দক্ষিণ কোরীয় ঐতিহাসিক। জাপানের ওকাহামায় এক প্রাচীন সৌধে। রাসায়নিক ও লবণে জড়ানো ছিল সেগুলি। গতবছর সবটাই ফিরিয়ে আনা হয় দক্ষিণ কোরিয়ায়। আজ সেই ভস্মাবশেষ পুয়ানের রণক্ষেত্রের মাটির গভীরে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। এই অশ্রুসজল শেষকৃত্যে যোগ দিতে হাজির ছিলেন ১৫০০ মানুষ।"

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ২৭-১১-১৯৯৩। পৃঃ ৪। এবার লক্ষ্য করুন মহানবীজীব ইসলাম কত সামাজিক ও কত মানবিক।

(১০) শত্রু হোক, সৈন্য হোক আশ্রয় প্রার্থনা করলে, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় দেওয়ার বিধান দান করেন। নিহত সৈনিকের পশুকেও হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন।

(১১) যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় হোক, পূর্বে হোক, পরে হোক শত্রু শান্তি প্রস্তাব দিলে, সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণের নির্দেশ দেন। খাইবার বিজয়, হুনাইন যুদ্ধ, তায়েফ বিজয়, তাবুক অভিযান ও হোদাইবিয়ার সন্ধি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরবর্তীকালেও হযরত আলিও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে জয় অনিবার্য জেনেও কুচক্রী মুয়াবিয়ার (ছলে ভরা) শান্তি প্রস্তাব মেনে নেন। এটা ছিল হযরতের শিক্ষার চরম ফল এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(১২) যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য শুধুমাত্র তাঁর ঘোষণা নয়। যে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন, বদর যুদ্ধের বন্দীগণ তার চির জ্বলন্ত প্রমাণ।

(১৩) দেশ, জয় ও সম্পদ লাভের জন্য যুদ্ধ নয় ; এরূপ যুদ্ধকে তিনি একেবারেই হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যুদ্ধ সম্পর্কে সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘোষণা মহানবীই প্রথম করলেন।

এই কথাগুলো হযরতের শুধু মুখের কথা নয়। ইসলামের প্রথম জেহাদ বদরের যুদ্ধ থেকে—ওহোদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, খাইবারের যুদ্ধ, হোনাইনের যুদ্ধ, তাবুকের যুদ্ধ, মক্কা জয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি তাদের পূর্ণ প্রয়োগ করে গেছেন। তাই তিনি যখন মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের ন্যায় দাঁড়াতেন, তাঁর সম্মুখে অসত্যের এভারেস্ট তখন তুষারের ন্যায় গলিত হতো। এইজন্য মহানবী (দঃ) শূন্য হাতেই হতে পেরেছিলেন বিশ্বের আদর্শতম শ্রেষ্ঠতম সেনাপতি। শক্তি তাঁর শুধু শরীরে ছিল না, অসীম শক্তি ধারণ করেছিলেন আপন চরিত্র ও অন্তরে। তখন জগৎ শক্তি সেদিন তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়েছিল। তাই তিনি ছিলেন মহাসেনা মহানবী। কোরআন—৩ ঃ ১১০

দেখিতে উৎসুক আমি জয়ের কারণ
তোমার বীরত্ব নয় তব আচরণ।
সহিয়াছ শত ঘাত শত নিপীড়ন
অন্যায় অবিচার করিতে দমন।
জেহাদ যাহার লাগি যুদ্ধ আমরণ—
সাম্য ভ্রাতৃত্ব 'পরে সমাজ গঠন।

২৩। **যুদ্ধ-বিগ্রহে বাধ্য মহানবী (দঃ)** ঃ সমগ্র জীবনে মহানবীকে একটি যুদ্ধেও অগ্রণী ভূমিকায় আমরা দেখি না। কোথাও শত্রুপক্ষ মহানবীকে যুদ্ধে সরাসরি ডাক দিচ্ছে। কোথাও বা তিনি দিনের পর দিন অত্যাচারের জন্য বাধ্য হচ্ছেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে। কোথাও বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে সিংহ-বিক্রমে রুখে দাঁড়ান মহানবী। এক কথায় যখনই তিনি দেখেছেন—মানবতা লাঞ্ছিত, মনুষ্যত্ব বিকৃত, সেখানেই তিনি তাঁর চির স্বভাবজাত শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। সম্রাট হওয়ার জন্য তাঁর কোন যুদ্ধ ছিল না, সাম্রাজ্যলাভে তাঁর কোন পরিকল্পনা ছিল না। তাঁর যে উদ্দেশ্য ছিল, তা একমাত্র দুর্গত মানবতার সেবা ও বিশ্ব-স্রষ্টার বন্দনা। এই কাজটুকু করতে অনেক সময় তাঁকে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে বাধ্য হতে হয়েছে। যুদ্ধ তাঁর নেশাও ছিল না, পেশাও ছিল না। তাঁর নেশা ছিল—সমগ্র মানবজাতির উত্থান, তাঁর পেশা ছিল—জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত ও অর্থনৈতিক অবস্থার সকল কৃত্রিম ব্যবধানগুলোর মূলোচ্ছেদ করে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সমাজের পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় সমগ্র মানবমণ্ডলীকে দান করা এক অবিকৃত চিরবিধান, যার নাম পবিত্র কোরআন। এই মহান ব্রতের সাধনায় মাঝে মাঝে করুণার দূত বাধ্য হয়েছেন মরুর মাটি থেকে সপ্ত আকাশ কাঁপিয়ে দিতে, সেটা যুদ্ধই বলি আর জেহাদই বলি।

সুতরাং বদর থেকে তাবুক অভিযান পর্যন্ত পর পর ১০টি জেহাদ ও অভিযানে আমরা একের পর এক লক্ষ্য করি—মহানবী তাঁর একক ও অনন্যসাধারণ ব্রতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বহু বিপদ-সঙ্কুল সময়ে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এইখানেই তিনি ছিলেন আপসহীন আমরণ সংগ্রামী। যার সংগ্রাম ছিল শুধুমাত্র সমাজ সংস্কার। যাঁর সাধনা ছিল—মানবজাতির উত্থান, মরুর কল্যাণ।

২৪। **কর্মবীর পরিশ্রমী মহানবী (দঃ)** ঃ মহানবীর সমগ্র চরিত্রটাই পবিত্র কোরআন। সেই পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে—"মানুষের জন্য কিছুই নেই, তার চেষ্টা ব্যতীত।" ৫৩ ঃ ৩৯, ৯৪ ঃ ৭, ৮। মহানবী তাঁর সমগ্র জীবনে যা কিছু পেতে চেয়েছেন, তাঁর আপন চেষ্টায় ও কর্মের দ্বারাই পেতে চেয়েছেন। তাই তিনিও বারবার ঘোষণা করেছেন—"চেষ্টা আমার নিকট হতে, এবং ফল আল্লাহর নিকট হতে।" শুধু তাই নয়, পবিত্র কোরআন আরও ঘোষণা করে—"দুর্লভ মানবজীবন কার্যের পরীক্ষাক্ষেত্র মাত্র।" ৬৭ ঃ ২। কর্ম দ্বারাই শুধু মানবজীবনের মূল্যায়ন হবে। সেখানে অন্য কোন কিছুর মূল্য থাকবে না যদিও তিনি কোন নবীরও পিতা-মাতা বা পুত্র-কন্যাও হন। ২ ঃ ৪৮, ১২৩। এই নীতি বা আদর্শকেই কর্মবীর মহানবী তাঁর সমগ্র জীবনে কর্মের ভেতর দিয়েই তুলে ধরেছেন। পবিত্র কোরআন আরও

ঘোষণা করে—"তোমরা যে কাজ করো না, তা কেন বল?" ৬১ ঃ ২। মহানবীর জীবনই এর প্রত্যক্ষ দলিল। তিনি জীবনে একটিও কথা বলেননি বা উপদেশ দেননি, যে কাজ তিনি নিজে করেননি। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমগ্র কোরআন রূপ পেয়েছে—তার চরিত্র বা কর্মময় জীবনে। বা তিনি সমগ্র কোরআন শরীফকে রূপায়িত করেছেন আপন কাজে। বিধাতার অমোঘ বাণীকে বিপদে-আপদে, শত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যিনি পূর্ণ রূপ দান করেছেন, তিনিই তো এই বিশ্বের পূত-পূর্ণ মহান কর্মবীর। তাঁর ঘোষণা—"পরিশ্রমী আল্লাহ্‌র বন্ধু।" এইভাবে তিনি শ্রমকে ধর্মীয় কর্তব্যে স্থান দিয়েছেন।

তিনি এক হাতে সম্রাটের ন্যায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছেন আবার অন্য হাতে মজুরের ন্যায় কায়িক পরিশ্রম করেছেন। একদিকে দাতার নিকট দান গ্রহণ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তা অন্যদিকে গরিবের মধ্যে বিতরণ করেছেন। আবার ক্ষমার অযোগ্যকারীকে প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। যে হাত অসহায় দুর্বলকে রক্ষা করেছে, সেই হাতই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শাণিত কৃপাণ ধারণ করেছে। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—"ইসলামে সন্ন্যাস নেই। জেহাদকে কখনও ত্যাগ করো না, এটিই আমার উম্মতের (শিষ্য) সন্ন্যাস। ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিপক্ষে সংগ্রামই জেহাদ।"

॥ কর্মযোগী মহানবী (দঃ) ॥

নবী মহম্মদ সাবধান করেন
উম্মতে দুনিয়ার
কোন মানুষের কিছু নাই কারও
চেষ্টা ব্যতীত তাঁর।
চেষ্টা কর ধৈর্য ধর--
শত বিপদেও একলা
তোমার সঙ্গে সদাই আছেন
স্রষ্টা তোমার আল্লাহ্।
চেষ্টা আছে, চরিত্র আছে,
সাধনা আছে যার
ফল আছে তার প্রভুর হাতে
স্বর্গ ও সংসার।
শ্রমিক তুমি বন্ধু খোদার
সন্ধ্যা সকাল বেলা
শ্রমের মূল্য বুঝিয়ে দেবেন
শ্রমিক-বন্ধু আল্লাহ্। —কাব্যকানন

কোরআন—২ ঃ ১৫৩, ১৩ ঃ ১১, ৪৫ ঃ ২২, ৪৬ ঃ ১৯, ৫৩ ঃ ৩১, ৩৯, ৯৪ ঃ ৭, ৯৯ ঃ ৭-৮।

২৫। বিদ্যানুরাগী মহানবী (দঃ) ঃ মহানবীর জন্মের আজ ১৪০০ বছর পর আমরা ঘোষণা করছি—প্রাথমিক শিক্ষা প্রত্যেকেরই জন্য অবশ্যই পালনীয়। কিন্তু আজ থেকে

১৪০০ বছর পূর্বেই মহানবী তাঁর উম্মত বা শিষ্যদের জন্য জ্ঞান-অন্বেষণ বা জ্ঞানার্জন অতি অবশ্য করণীয় কর্তব্য বা ফরজ বলে ঘোষণা করে গেছেন। তিনি ছিলেন নিরক্ষর নবী। কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল অন্তহীন জ্ঞানের আলোকে চির উদ্ভাসিত। তাঁর অমোঘ শিক্ষা—আল্লাহ্ আলো স্বরূপ এবং জ্ঞানই আলো। সুতরাং যে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছে সে আলোর সন্ধান পেয়েছে, যে আলোর সন্ধান পেয়েছে সে যেন স্বয়ং আল্লাহ্‌কে লাভ করেছে। তিনি অহরহ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন—"হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি কর।" কোরআন্—২০ ঃ ১১৪। তিনি শুধু প্রাথমিক জ্ঞানের কথাই বলেননি। উচ্চতর জ্ঞান অন্বেষণে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তরে যাওয়ার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেছেন। "জ্ঞানের সন্ধান কর, যদি তা চীন দেশেও হয়।" এইভাবে তিনি উচ্চতর বৈষয়িক জ্ঞানের জন্যও উৎসাহিত করেছেন। যার ফলে পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই—তাঁরই ভক্তবৃন্দ কর্তৃক বিশ্ব জ্ঞানজগতের সকল শাখাই ধন্য হয়ে উঠেছে।

জ্ঞান দান, জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণের প্রতি তাঁর এমনি এক প্রবল আকর্ষণ ছিল—যে যুদ্ধবন্দীকে মোটেই মুক্তি দেওয়া যায় না, তিনি তাঁকেও মুক্তি দিতেন, কিছুদিন জ্ঞান বিতরণের বিনিময়ে। বদরের যুদ্ধবন্দী এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জ্ঞানার্জনকারীকে তিনি আরও উৎসাহিত করেছেন—স্বর্গলাভের আশায়। যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের পথে ভ্রমণ করে, আল্লাহ্ তাকে বেহেশ্‌তের পথে বিচরণ করাবেন। এইভাবে মহানবী জ্ঞানীকে স্বর্গ ও মর্ত্যের দাবিদার করে গেছেন।

মাগিছি কাতর প্রাণে করুণা তোমার
বৃদ্ধি কর বিদ্যাবল হে প্রভু আমার। কোরআন—২০ ঃ ১৪৪

২৬। আদর্শ ব্যবসায়ী মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) সত্যের যে মহাসাধক ছিলেন, সেটা তাঁর প্রথম জীবনের বিশেষ কয়েকটি কাজে দিবালোকের ন্যায় ফুটে ওঠে। যেমন তাঁর ব্যবসায়ী জীবন। চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়ায় বাণিজ্য গমন। পরবর্তীকালে তাঁর সততার সুখ্যাতি এতদূর ছড়িয়ে পড়ল, তখনকার আরবের একজন বিশিষ্টা ধনী মহিলা বিবি খাদিজা তাঁকে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

পরবর্তীকালে এই ব্যবসা সম্পর্কে আল্লাহ্ ও হযরতের বাণী ঃ পবিত্র কোরআন বলে—"আল্লাহ, ব্যবসাকে বৈধ বা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম বা অবৈধ করেছেন।" ২ ঃ ২৭৫। মহানবী বলেন—ব্যবসা কর, কেননা পৃথিবীর সমগ্র লভ্যাংশের অর্থাগমের দশ অংশের নয় অংশ ব্যবসায়ে নিহিত আছে। পবিত্র কোরআন আরও বলে—"আমি দিবাভাগকে উপজীবিকা অর্জনের উপায় নির্ধারণ করেছি।" ৭৮ ঃ ১১। "তোমাদের প্রভু হতে ধন-সম্পত্তি প্রার্থনা করাতে কোন পাপ নেই।" কোরআন—২ ঃ ১৯৮

ইসলামি মতে, ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও একটি উদ্দেশ্য—দেশ ভ্রমণ, এবং দেশ ভ্রমণে একটি দেশের সঙ্গে অন্য একটি দেশের সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে কোরআন বলে—"পৃথিবীতে ভ্রমণ কর।" ৬২ ঃ ১০, ১১। নিজের এবং নিজের পরিবারবর্গকে হালাল জীবিকা দেওয়ার জন্য মহানবী বলেন, হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা প্রধান কর্তব্যের একটি অন্যতম কর্তব্য। পবিত্র কোরআন বলে—"হে রসুল, হালাল দ্রব্য খাও, মঙ্গলজনক

কাজ কর।" মহানবী বলেন, "হালাল জীবিকার মতো এরূপ উত্তম খাদ্য নেই। যে ব্যক্তি হালাল জীবিকা অর্জন করতে কোন ছোট কাজ করতেও বাধ্য হয়, তার স্থান স্বর্গে।" কোরআন ঘোষণা করে, পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই নেই। মহানবী বলেন, উৎকৃষ্ট কাজ অধ্যবসায়ে নিহিত।

মহানবী ব্যবসাকে উদ্দেশ্য করে আরও বলেন—"যে প্রবঞ্চনা করে সে আমার নয়, সৎ ব্যবসায়ীকে আল্লাহ্ স্বর্গে প্রবেশ করাবেন।" মহানবী মানবমণ্ডলীকে সম্বোধন করে আরও বলেন—"ক্রয়-বিক্রয়ে অতিরিক্ত শপথ হতে সাবধান থেকো। নিক্তি ও ওজন ঠিক রাখবে।" কোরআন বলে—"অপূর্ণকারীদের জন্য পরিতাপ যারা অন্য লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং যখন তাদের জন্য মাপে বা ওজন করে তখন কম করে দেয়।" ৮৩ ঃ ১-৩। তাই কোরআনের সতর্কবাণী ঃ মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেবে, যারা মাপে কম দেয়, তাদের মতো হয়ো না। ২৬ ঃ ১৮১। মহানবী আরও বলেন, ক্রীত দ্রব্য ক্রেতার দখলে না আসা পর্যন্ত অন্যত্র বিক্রয় করা অবৈধ। কেননা তাতে অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

২৭। অন্যায় মজুতকারী সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ "অত্যধিক মুনাফা করার আশায় যারা খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখে তারা পাপী। যে ব্যক্তি অত্যধিক মূল্যের আশায় ৪০ দিন খাদ্যশস্য আবদ্ধ রাখে, সে মহাপাপী।" তিনি আরও বলেন—"এরূপ ব্যক্তির পাপ এত গুরুতর যে, তার সমস্ত শস্য গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দিলেও তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।" অর্থাৎ অন্যায়কারী মজুতদারের মজুত খাদ্যশস্য বিনামূল্যে ক্রোক করে গরিবের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে। এক ব্যক্তি হযরত আলির নিকট কোন একজনের অন্যায় রূপে শস্য গুদামজাত করার সংবাদ দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা বিলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মহানবী ফল ও শস্য না পাকা পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি ব্যবসায়ে সুদ অবৈধ ঘোষণা করেছেন, কেননা এতে অসহায় ও গরিবের কষ্ট বৃদ্ধি পায়। তিনি ঘোষণা করেছেন কয়েকটি বস্তুর ব্যবসা অবৈধ—পানি, ঘাস, মৃতদেহ, রক্ত, গভীর পানির মাছ, আকাশের পাখি, মদ, শূকর মাংস, স্ত্রীলোকের স্তনের দুগ্ধ ইত্যাদি। শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও তিনি উৎসাহ দান করে গেছেন। তিনি বলেন—হযরত দাউদ (আঃ) স্বহস্তে উপার্জিত বস্তু ভক্ষণ করতেন, হযরত নূহ ছিলেন সূত্রধর, হযরত ইদরিস দরজি, হযরত দাউদ কর্মকার, হযরত হুদ ও সালেহ ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত সোলায়মান থলি ও চাটাই প্রস্তুত করতেন। তাই মহানবী ঘোষণা করেছিলেন—"স্বহস্তে নির্মিত বস্তু সর্বোত্তম।" এই ঘোষণাই বিশ্ব-শিল্প ও বিশ্ব-বাণিজ্যকে চির উৎসাহ দান করেছে। তাই মহানবী ছিলেন জীবিকার সন্ধানে, মানবতার সম্পূর্ণতা সাধনে এক অতুলনীয় আদর্শ ব্যবসায়ী।

অবাধে করিতে পার রুজি রোজগার
অফুরন্ত সঞ্চয়ের নাহি অধিকার।

২৮। গরিবের বন্ধু মহানবী (দঃ) ঃ এই পৃথিবীতে আসার মূলে মহানবীর প্রধানত দুটি ব্রত ছিল। একটি সকল মানুষের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার বন্দনা ও অন্যটি সেই বিশ্বস্রষ্টার অধীনে সকল মানুষের মধ্যে খাওয়া-থাকা ও পরার ভিত্তিতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলা। এই যে বন্ধন, এটা একদিকে যেমন ছিল—সামাজিক বন্ধন অন্যদিকে ঠিক তেমনি ছিল গরিবকে রক্ষা করার বন্ধন। তিনি মহানবী হওয়ার পর দীর্ঘ তেরো বছর মক্কার মাটিতে যে অভিযান

চালিয়েছিলেন—তা ছিল গরিবের অভিযান, দরিদ্রের অভিযান, অসহায়ের অভিযান, আর্তের অভিযান। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা। এই সাম্যবাদের মুলে ছিল—গরিবকে রক্ষা করা। মর্ত্যের বুকে তাঁর যে জীবনব্যাপী সংগ্রাম লক্ষ্য করা যায়, তার মুলে দেখা যায়, অসহায় মানুষকে সাহায্যদান করা। সমাজের পাপগুলোকে দূর করা। এই কাজেই তিনি অবিরত রত ছিলেন। মৃত্যুর মহা মুহূর্তেও তিনি যে বাণী উচ্চারণ করে গেছেন, তারও মূলে আছে ওই দুটো, গরিব অসহায় মানুষ ও নামায অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টার বন্দনা। অর্থাৎ সকল পাপ থেকে দূরে থাকা।

তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ধনীর ওপর চাপিয়ে দিলেন কতকগুলো বিধিবিধান। যেমন—যাকাৎ, ফেৎরা, সদকা, উষর ইত্যাদি। এগুলো কাদের জন্য, দেখা যায় সবই গরিবের জন্য—ধনী ও মধ্যবিত্তের ওপর বাধ্যতামূলক দান। একমাস রোযা রাখার পর ঈদ উৎসবের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন—ফেৎরা, ঈদের পূর্বেই ফেৎরা দান করা ওয়াজেব অবশ্যই কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন কাদের জন্য? গরিবের জন্য। বিশ্বের কোন ধর্মে গরিবের জন্য দানে এই বাধ্যবাধকতা ও কোন জরুরী বিধান নেই। ধনী অসুস্থ হয়েছে মহানবী রোগমুক্তির পথনির্দেশ দিয়েছেন—"দায়ু মাবজাকুম বিস্ সাদাকাত—দান দ্বারা তুমি তোমার রোগের চিকিৎসা কব।" অর্থাৎ তুমি গরিবকে দান করো, আল্লাহ্ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। এইভাবে মহানবী ধর্মকে গরিবেব রক্ষাকবচ রূপে ব্যবহার করেছেন। মহানবী বলেন—"তুমি দরিদ্রকে ভালবাস, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন।" তিনি বলেন—আল্লাহ্ তোমার দ্বারে আসেন—গরিব বেশে, রোগী বেশে, ক্ষুধার্ত বেশে, বিবস্ত্র বেশে, পিপাসার্ত বেশে, অসহায় বেশে, কিন্তু ধনীর বেশে নয়। অর্থাৎ গরিবের মধ্যে আল্লাহ্কে দেখতে পাবে, এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ্কে পেতে পার, কিন্তু ধনীর মধ্যেও নয়, ধনীর দ্বারাও নয়। সেই আল্লাহ-প্রিয় নবী ভালবেসেছিলেন গরিবকে মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, অন্তর দিয়ে। চেয়েছিলেন তাদের উত্থান বিশ্বব্যাপী বিশ্বসমাজ ব্যবস্থায়।

মহানবী বলেন, ক্ষুধার্তকে অন্নদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান, গরিবকে ভালবাসাই স্বর্গের চাবি। তিনি নিঃশর্তভাবে ঘোষণা করেছিলেন—ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, পীড়িতের সেবা কর। বন্দীর মুক্তি, গোলামকে আজাদ কর। অসহায় নারীকে মর্যাদা দাও, আর্তের ডাকে সাড়া দাও। মহানবী তাঁর যুদ্ধলব্ধ ধন সবসময়ই গরিব ও যোদ্ধাদের মধ্যেই বিলিয়ে দিতেন। মৃত্যুর মহা মুহূর্তেও তাই তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠেছিল—"সাবধান অসহায় গরিব মানুষ, অসহায় গরিব মানুষ, বিশ্বস্রষ্টার বন্দনা।"

এইভাবে দেখা যায়, মহানবী ছিলেন নিখিল বিশ্বের নজিরবিহীন গরিবের বন্ধু। তিনি তাঁর ধর্মের মধ্যেও গরিবের জন্য যে বাধ্যতামূলক বিধিবিধান দিয়েছেন, তাও বিশ্বের অন্য ধর্মে বিরল। বিশ্ব স্রষ্টার সম্বোধন ষোলকলায় সার্থক হয়েছে তাঁর কর্মময় জীবনের জন্য "তুমি বিশ্বজগতের করুণা স্বরূপ।"

ছিলেন দ্বীনের নবী গরিবের প্রাণ—
তোমরা সকলে কর গরিবেরে দান।
গরিবেরে করো দান রোগ মুক্তি পাবে
সুস্থ শরীরে তুমি স্বর্গে হেঁটে যাবে।

২৯। আদর্শদাতা মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী বলেন—দাতার হস্ত গ্রহীতার হস্ত অপেক্ষা উত্তম। পবিত্র কোরআনের পূর্ণ জ্বলন্ত ব্যাখ্যা মহানবীর জীবন। সেই কোরআন ঘোষণা করে—"তোমার যা ভালবাসার বস্তু তা ধন দান না করা পর্যন্ত প্রকৃত ধার্মিক হতে পার না।" সুতরাং মহানবী জীবনে যা কিছুই ভালবেসেছিলেন—তাই তিনি দান করেছিলেন। পৃথিবীর ধন-সম্পদ সম্পর্কে তিনি বলেন—আল্লাহ্ একমাত্র মহান দাতা, মানুষ মাত্র তার বণ্টনকারী ও রক্ষাকারী। এ কথার তাৎপর্য এই যে তুমি আল্লাহ্র দেওয়া ধন গচ্ছিত রেখো না। গরিবকে দান করো, গরিবের দুঃখ মোচন কর। মহানবী বলেন—পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জিনিস—আদম সন্তানের ডান হাত যা দান করে, কিন্তু বাম হাত তা জানে না।" এই দানকে তিনি তাঁর ধর্মীয় বিধানে বাধ্যবাধকতার রূপ দান করেছেন। সমগ্র জীবনজুড়ে যা কিছুই তাঁর নিকট থাকত তিনি তা সদাই মুক্তহস্তে দান করতেন। এর অসংখ্য প্রমাণ তাঁর জীবনে রয়ে গেছে। তাঁর তিনটি মাত্র সম্পত্তি ছিল—"ফেদাকে একটি", "মদিনায় একটি" ও "খাইবারে একটি"। এই তিনটিই তিনি দান করে দিয়েছিলেন। মহানবীর তুলনাবিহীন দান সম্পর্কে বলতে গেলে এইটুকুই বলতে হয়—

সমস্ত আছে যাঁহার দ্বারে নাহিক শুধু দারোয়ান
সকলই দিয়ে শূন্য হাতে সব শেষে করে নিজেকে দান।

দান করা সম্পর্কে মহানবী যত উৎসাহ দান করেছেন, দান গ্রহণ সম্পর্কে তার বিপরীত করেছেন। অর্থাৎ সকলকেই স্বাবলম্বী হতে বলেছেন। একমাত্র নিরুপায় ব্যক্তি দান গ্রহণ করবে।

৩০। চিকিৎসক মহানবী (দঃ) ঃ চিকিৎসা-জগৎ সম্পর্কে মহানবীর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মূল নীতি—প্রত্যেক রোগের ওযুধ আছে। ছোঁয়াচে বলে কোন রোগ নেই। সুতরাং রোগের ভয়ে মানুষ যেন মানুষকে ঘৃণা না করে। চিকিৎসার প্রধানত চারটি প্রণালী—দূষিত রক্ত বের করা, মুখ দ্বারা ওযুধ খাওয়া, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নেওয়া, জোলাপ নেওয়া। মহানবী অস্ত্রোপচার সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন এবং তিনি নিজ হাতে অস্ত্রোপচার করেছেন। আল্লাহর নামে তাবিজ নেওয়া বা ফুঁ দেওয়াকে বৈধ ঘোষণা করে গেছেন। রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট কাতর প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন বলেছেন। অসুখ হলে ওযুধ ব্যবহার করা আল্লাহর অমোঘ বিধান বলে ঘোষণা করেছেন।

৩১। রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সেবা-শুশ্রূষায় মহানবী ঃ মহানবী যখনই কোন মানুষের অসুখের কথা শুনতেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে যেতেন, তিনি যে বর্ণেরই লোক হোন। মানুষের সেবায় তিনি এই মহান দৃষ্টান্ত জীবনে রেখে গেছেন। তাঁর বাণী ঃ (১) যখন তুমি রোগী দর্শন করতে যাও, তখন তুমি তার নিকট হতে দোওয়া প্রার্থনা করো, তা ফেরেশ্তাদের দোয়ার ন্যায়। (২) রোগীর নিকট স্বল্পক্ষণ থাক ও স্বল্প কথা বলো। (৩) রোগী যাতে শান্তি ও সাহস পায় এরূপ কথা বলো। (৪) রোগীর ইচ্ছানুয়ায়ী (ক্ষতিকর না হলে) খেতে দেবে। (৫) কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি রোগীর সেবার জন্য বাইরে হতে লোক আসা ঠিক না। এই সমস্ত রোগে কোন লোকের স্থান ত্যাগ করাও উচিত না। (৬) আল্লাহর নিকট রোগীর কুশল কামনা করো ঃ "হে শান্তিময়,

কষ্ট দূর কর, হে নিরাময়কারী নিরাময় কর, তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য দান করো যাতে কোন ব্যাধি না থাকে।"

৩২। মহানবী কর্তৃক কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ওষুধ ঃ (১) বাত, মাথা ধরা, রক্তচাপ, দূষিত রক্ত ও শরীরের বেদনার জন্য মহানবী শিঙ্গা নিতে উৎসাহ দান করেছেন। (২) কুদৃষ্টিজনিত ব্যাধির দোওয়া ও তাবিজ নিতেও উপদেশ দিয়েছেন। কোরআনের কয়েকটি সূরা এর জন্য বিশেষ প্রয়োজন—১০ ঃ ৫৭, ২৬ ঃ ৮০, ৩০ ঃ ১১৩, ১১৪, ৪১ ঃ ৪৪ ইত্যাদি। (৩) সর্প দংশনে লবণ ও গরম পানি দিয়ে কোরআনের শেষ দুটি সূরা পড়ে ফুঁ দিয়ে মালিশ করতে বলেছেন। (৪) মধু ঃ এটা শারীরিক, মানসিক, স্নায়বিক, ধাতুদুর্বলতা ও ধাতু দৌর্বল্যজনিত অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, কাজে অনিচ্ছা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, সর্দি-কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি সকল কিছুতে মহৌষধ। "যে ব্যক্তি মাসে তিনদিন প্রাতঃকালে মধু পান করে, তার কোন বড় ব্যাধি হতে পারে না। (৫) কালজিরা ঃ কালজিরাতে মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক ব্যাধির ওষুধ আছে, সর্দি-কাশি ও প্রসূতির জন্য বড়ই উপকারী। (৬) সামুদ্রিক ফেনা ঃ এটা সর্বরোগের মহৌষধ স্বরূপ। (৭) মেহদি ঃ ব্যথাবেদনায় অত্যন্ত উপকারী প্রলেপ। (৮) উত্তম খেজুর ঃ যে ব্যক্তি সকালে সাতটি খেজুর খায়, সেদিন অনিদ্রা ও বেদনা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। (৯) শামুক ঃ এর পানি চক্ষুর জন্য খুবই উপকারী। (১০) লবণ ঃ বেদনা দূর করে। (১১) সোরমা ঃ চক্ষু ও কানের জন্য তুলনাহীন ওষুধ। (১২) শীতল পানি ঃ জ্বর ও টাইফয়েডের জন্য খুবই উত্তম। (১৩) নিষিদ্ধ ওষুধ ঃ বমি, মল-মূত্র, শুক্র একেবারেই নিষিদ্ধ, ওষুধ রূপে ব্যবহার করা যাবে না বলে ঘোষণা করেছেন।

৩৩। দৈহিক গঠনে মহানবী ঃ সাধারণত আমরা যে কোন জগৎ-মনীষার জীবনী আলোচনাকালে তাঁদের অসাধারণ জ্ঞান গরিমার ওপর আলোকপাত করে থাকি, এমনকি অনেক সময় দেখেছি—তাঁদের দৈহিক বা শারীরিক আলোচনা এতটুকু স্থান পেল না। যদিও একথা ঠিক, মনীষার আলোচনা তাঁর মনীষা প্রতিভার ওপরই নির্ভর করে। তবে একথাও ঠিক নয়, দেহ তাঁর মনীষা-জীবনের বাহন। তাই জীবিত থাকলে সকলেরই ইচ্ছা জাগে—তাঁকে একবার দেখব, পালোয়ান বা কুস্তিগীর হিসাবে নয়, মনীষা হিসাবেই। তাতে তাঁর চেহারা যত কুৎসিতই হোক না কেন।

মহানবীর দেহগত আলোচনা করার পূর্বে আমরা যদি তাঁর পিতার দেহগত পরিচয়টা জানতে চেষ্টা করি, অসঙ্গত হবে না। মহানবীর পিতার নাম ছিল—আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দাস। তদানীন্তন আরবে এরকম সুপুরুষ আর কেউই ছিলেন না। তাই তাঁর পিতা আবদুল মোত্তালিব যখন তাঁকে আল্লাহর নামে কাবা প্রান্তরে কোরবানি (বলিদান) করতে প্রস্তুত হলেন, তখন সমগ্র মক্কাবাসীর ঘোর আপত্তি ও অনুরোধে সেটা বন্ধ হয়। এই অনুরোধের মূলে ছিল—আবদুল্লাহর চরিত্র যেমন উজ্জ্বল, দেহ ছিল তেমন অনুপম সুন্দর। কথিত আছে মা আমিনাকে বিবাহের পূর্বে কোন এক যুবতী মহিলা তাঁকে বিয়ে করার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। মা আমিনাকে বিয়ে করার কিছুদিন পরেই আবদুল্লাহর সঙ্গে ওই যুবতীর সাক্ষাৎ হয়। তখন ওই যুবতী আবদুল্লাহকে বিয়ে করতে অসম্মতি জ্ঞাপন

করলেন। আবদুল্লাহ কারণ জিজ্ঞাসা করায়, যুবতী বললেন—"এতদিন আপনার ললাট দেশে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি সর্বদাই যেন চমকাতো। আজ সেটা নেই। আমি ওই জ্যোতিটার প্রলোভনে আপনাকে স্বামী রূপে পেতে চেয়েছিলাম।" তখন আবদুল্লাহ বলেন—"জ্যোতিটা কোথায় গেল?" যুবতী বলেন—"নিশ্চয় আপনি কোন মেয়েকে বিয়ে করেছেন, জ্যোতিটা তাঁর গর্ভে সন্তানাকারে স্থান পেয়েছে। আমি চেয়েছিলাম, আমি ওই ক্ষণজন্মা শিশুর মা হই। নিশ্চয় প্রত্যেক মেয়ের কামনা থাকে, সে সৎ ও সুন্দর শিশুর মা হোক। প্রত্যেক মায়েরই বুকের বাসনা থাকে, তার সন্তান স্বনামধন্য হোক।

গাইবে যখন তোমার শিশু মানবতার উচ্চগান
ভাসবে উঠে সেই সাগরে পদ্মরাগে মাতার প্রাণ।

অতঃপর আবদুল্লাহ উত্তর দিলেন—"আমি কিছুদিন পূর্বে বিয়ে করেছি, আমার স্ত্রী এখন সন্তানসম্ভবা।"

ইসলামি ধর্মমতে আল্লাহর নূর বা আলো হতে মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জন্ম। এই নূর বা আলোর পিতা আব্দুল্লাহর ঔরসে মা আমিনার গর্ভে মানবাকারে 'মহম্মদ' (দঃ) রূপে জগতের বুকে আবির্ভাব। সুতরাং পূর্ব বা প্রাসঙ্গিক ইতিহাস লক্ষ্য করলে একথা সহজেই অনুমেয় যে, মহানবী দেহগতভাবেও হবেন অতুলনীয় সুপুরুষ। এবং ঠিক তাই-ই হয়েছিলেন। যে কোন পুরুষ কি রমণী তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালে বিমোহিত হয়ে উঠতেন—তাঁর রূপে ও গুণে।

মহানবী দেহগতভাবে খুব লম্বাও যেমন ছিলেন না, খর্বাকৃতিও ছিলেন না। ছিলেন মাঝারি মাপের। গায়ের রং ছিল অত্যন্ত শুভ্র, তবে ফ্যাকাশে সাদা নয়, রক্তিমাভ। মাথাটি ছিল দেহের তুলনায় কিঞ্চিৎ মোটা, গোলাকার। চুল ছিল কালো ও কোঁকড়ান, কখনও চুল বড় রাখতেন, কখনও মাঝারি করতেন, কখনও একেবারেই ছোট করতেন। চুলের যত্ন নিতেন এবং সকলকে যত্ন নিতেও বলতেন। তবে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলতেন, যত্ন যেন কোন বিলাসিতায় পরিণত না হয়। মহানবী চুলের সিঁথি কাটতেন মাঝখানে। আজও মুসলমানদের মধ্যে লম্বা চুলকে সুন্নতী চুল বলা হয়ে থাকে। তবে বর্তমানের ভংগী ফ্যাশন নয়। মহানবীর মুখভরা দাড়ি ছিল, মাঝে মাঝে দাড়ি ছাঁটতেন, তবে গোঁফ একেবারেই ছেঁটে ফেলতেন। বলতেন এতে অসুখের সম্ভাবনা আছে, দাড়ি রাখার জন্য নির্দেশ দিতেন, কেননা এতে দাঁত ভাল থাকবে ও অন্যান্য উপকার হবে। মহানবী শরীরের অনাবশ্যক চুল ও নখ ৪০ দিন পর পর কেটে ফেলতেন ও কেটে ফেলার নির্দেশ দিতেন। নখ কখনও বড় করতেন না। গণ্ডদেশদ্বয় ছিল অতীব আকর্ষণীয়, নাক ছিল উন্নত। মহানবীর চক্ষুযুগল ছিল টানা টানা, রং ছিল ঈষৎ নীলাভ, কেশভর্তি ভ্রূযুগল জোড়া ছিল। ললাট ছিল প্রশস্ত উন্নত। কর্ণদ্বয় ছিল শরীরের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। ঠোঁট ছিল পাতলা। তাঁর দাঁত ছিল অসাধারণ উজ্জ্বল ও সাদা। যে কোন সময় মুখ খুললেই দাঁতগুলো স্ফটিকের মতো ঝক্ ঝক্ করে উঠত। গর্দান-ঘাড় বা স্কন্ধ ছিল সুঠাম উচ্চ। বক্ষ ছিল প্রশস্ত। হাত ছিল প্রলম্বিত। হাতের পাঞ্জা ছিল মাংসবহুল শক্তিশালী। পদদ্বয় ছিল সুঠাম, সুন্দর, খুঁতবিহীন।

তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন। যে কোন কঠোর পরিশ্রমেও সহজে ক্লান্ত হতেন না। তিনি সমগ্র জীবনে খুব বেশি অসুস্থ হননি। মদিনাতে পরিখার যুদ্ধে খাল খননকালে একটি পাথর সম্মুখে পড়লে ওই পাথর সরাতে কেউই সমর্থ হলেন না বরং সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। মহানবীর কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অস্ত্র ধারণ করলেন, ৫৩ বছর বয়সের মহানবী ওই পাথরকে টুকরো টুকরো করে দিলেন। কোন একবার আরবের বিখ্যাত পালোয়ান রাকানা তাঁর সঙ্গে কুস্তি লড়তে চাইলে, তিনি রাকানার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। বিখ্যাত আরব বীর রাকানা তিনবার লড়েন, তিনবারই পরাজিত হন। এর থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি তিনি কতখানি দৈহিক শক্তি ধারণ করতেন।

তাঁর শরীরের সৌন্দর্যকে অনেকেই পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেউ বা বিকশিত গোলাপের সঙ্গে। তাঁর শরীর এতই নরম ছিল, আরব ঐতিহাসিকগণ মখমলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইসলাম-জগতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। মহানবীর দৈহিক সৌন্দর্য হযরত ইউসুফের সৌন্দর্যকে ম্লান করেছিল। মহানবীর শরীরে সবসময় এক সুগন্ধের রেশ ছড়িয়ে থাকত। তিনি যখনই যেখানে যেতেন, মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। তিনি হাঁটতেন অতি দ্রুত, তবে নম্রভাবে ঈষৎ ঝুঁকে।

সবের ঊর্ধ্বে তাঁর শরীর এতই সুশ্রী ও স্বচ্ছ ছিল, বাইরে যা কিছুই ঘটত, তাঁর শরীরে প্রতিফলিত হয়ে উঠত। বহু দূরের সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, শীত, তাপ, শব্দ প্রভৃতিকে তাঁর শরীর অতি সহজেই অনুমান করতে পারত। মহানবীর শরীরকে এককথায় বর্ণনা করা যেতে পারে—'যেমন পাখি তেমনি খাঁচা।'

৩৪। স্বাস্থ্যরক্ষায় মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী বলেন—"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তার যত ধন-সম্পত্তি আছে, সর্বাপেক্ষা মূল্যবান স্বাস্থ্য।" তিনি আরও বলেন—"হে আল্লাহ্, আমি তোমার নিকট স্বাস্থ্য ও শান্তি প্রার্থনা করি।" তিনি আরও বলেন—"তোমার দেহের প্রতি তোমার একটি কর্তব্য আছে, তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার একটি কর্তব্য আছে এবং তোমার প্রতিবেশীর প্রতি তোমার একটি কর্তব্য আছে।" এইরূপে তিনি প্রতিটি কর্তব্যের প্রতি নির্দেশ দিতে ভোলেননি।

এই স্বাস্থ্যহানির জন্য অনেক ধর্মীয় কাজকে তিনি কমিয়ে দিয়েছেন। অঙ্গশুদ্ধি ও দেহশুদ্ধির জন্য তিনি তায়াম্মুমের বিধান দিয়েছেন যাতে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না হয়। কেননা দৈহিক স্বাস্থ্য সুস্থ না হলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব হয় না। যেহেতু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে, মন ভাল থাকে না এবং মন ভাল না থাকলে আত্মা ক্লান্ত থাকে, এবং আত্মার ক্লান্তিতে কোন আত্মিক উন্নতি আসে না। এইভাবে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন স্বাস্থ্য সম্পর্কে। ব্যায়াম সম্পর্কেও তিনি উৎসাহ দান করেছেন। নির্দোষ খেলা, ঘোড়দৌড় এবং তীরন্দাজি ও ব্যায়াম সম্পর্কেও তিনি উৎসাহ দান করেছেন। এমনকি নামাযের বিধিবিধানগুলোকে এমনভাবে দান করেছেন—নামায একদিকে প্রার্থনা, অন্যদিকে স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যায়ামস্বরূপ। বিশ্বের কোন ধর্মেই এরূপ বিধান নেই।

৩৫। খাদ্য ভক্ষণে মহানবী (দঃ) ঃ স্বাস্থ্যের মূলে আছে খাদ্যদ্রব্য। তাই মহানবী খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কেও যথাযথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন। মাংস সম্পর্কে তিনি বলেন—এতে প্রচুর

পরিমাণে আমিষ আছে। ফল সম্পর্কে বলেন—এটা উত্তম খাদ্য। কোরআন বলে—"যাবতীয় ফল ভক্ষণ কর। পেঁয়াজ ও রসুন খুব উপকারী নয় তবুও হালাল করেছেন।"

লবণ ঃ সকল মসলার উত্তম মসলা। এর দ্বারা খাদ্য আরম্ভ করতে হয়। **দুধ ঃ** খাদ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মিষ্টি ও মিষ্টিজাতীয় খাদ্য রোগীকে শান্তি দান করে। **বিশুদ্ধ পানি ঃ** এটা বিশেষ আবশ্যক, পানি খাওয়ার সময় কেউ যেন পাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ না করে, কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে, কেননা এতে অসুখ হতে পারে। মহানবী ঠাণ্ডা পানি বড়ই পছন্দ করতেন। মদ্য পান হারাম করেছেন। কেননা এতে শরীরের ভাল অপেক্ষা মন্দ অনেক বেশি হয়। এটা মানুষের জ্ঞানশক্তিকে হরণ করে। এবং জ্ঞানই মানুষের প্রধান পরিচয়। কোন খাদ্যে মক্ষিকা পড়লে, তাকে যেন সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, কেননা তার একপক্ষে রোগের বীজ থাকে এবং অন্যপক্ষে ওষুধ থাকে। ভূতলমুখী শয়ন ও ছাদে শয়ন তিনি নিষেধ করেছেন, কেননা এটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। স্বাস্থ্যের জন্য তিনি দিবানিদ্রাও নিষেধ করেছেন, তবে স্বল্প-নিদ্রা নিষিদ্ধ নয়। এইভাবে আমরা দেখতে পাই মহানবী মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বড়ই সচেতন ছিলেন।

৩৬। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় মহানবী (দঃ) ঃ মানুষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং জ্ঞান ও বিবেক মানুষকে পশু হতে পৃথক করেছে। পবিত্র কোরআন বলে—"মহান আল্লাহ্ ধর্ম বিষয়ে তোমাদের ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তোমাদের পবিত্র করতে ইচ্ছা করেন।' ৫ ঃ ৬। তাই ধর্মের যে মূল রহস্য তা মানুষকে পবিত্র করা। পবিত্র হতে না পারলে ইসলামধর্ম মতে কেউই কৃতকার্য নয়। ৮৭ ঃ ১৪, ৯১ ঃ ৯। সুতরাং ইসলাম ধর্মে প্রধানতম ও মূল কথা—পবিত্রতা অর্জন করা। এই পবিত্রতাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও দ্বিতীয়ত, আত্মশুদ্ধি ও মনের পবিত্রতা। আত্মশুদ্ধির জন্য মহানবী ইঙ্গিত করেছেন—(১) শারীরিক পরিচ্ছন্নতা আনা, (২) ধর্মের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, (৩) মনকে কুচিন্তা হতে মুক্ত রাখা, (৪) আল্লাহ্কে স্মরণ রাখা।

৩৭। শারীরিক পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তাঁর নির্দেশাবলী ঃ (ক) প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধৌত করা বা অজু করা, (খ) গোসল করা, (গ) মল-মূত্রান্তে বা এস্‌তেনজার শেষে পরিষ্কার হওয়া, (ঘ) হায়েজ নেফাছ বা সন্তান প্রসবান্তে বা মাসিক ঋতুর পর পরিষ্কার হওয়া, (ঙ) দাঁত পরিষ্কার করা, (চ) মুষ্কচ্ছেদ বা খতনা করা, (ছ) কাপড়-জামা পরিষ্কার রাখা।

(ক) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—পবিত্র কোরআন ঘোষণা করে—"হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমরা নামায পড়বে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্ত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মস্তক মোসেহ কর, পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। ইসলামে এটাই অজু নামে অভিহিত। এই অজু ব্যতীত নামায হয় না। এবং ইসলামে দৈনিক পাঁচবার নামায পড়া কর্তব্য। সুতরাং ইসলাম মানবশরীরকে দৈনিক কম করে পাঁচবার শুদ্ধ করে। বিশুদ্ধতা তার প্রধান প্রিয় বস্তু। কোরআন ঘোষণা করে—"আল্লাহ্ পবিত্র ব্যক্তিকে ভালবাসেন।" কোরআন—২ ঃ ২২২

(খ) গোসল—প্রতি শুক্রবারে মহানবী গোসলকে তাঁর সুন্নত বা রীতি বলে ঘোষণা করেছেন। যাতে তাঁর উম্মতগণ গোসল করে। মহানবী ঘোষণা করেছেন—অপবিত্র অবস্থায় নামায সিদ্ধ নয়, কেননা শরীর পরিচ্ছন্ন না থাকলে আত্মার পবিত্রতা আসে না। ইসলামে

স্ত্রী-সঙ্গমের পর, হায়েজ নেফাছের পর, শুক্র নির্গতের পর গোসলকে বা স্নান করাকে ফরজ করা হয়েছে। দুই ঈদেও গোসলকে সুন্নত করা হয়েছে। সমগ্র শরীর যাতে পবিত্র থাকে, মহানবী সেই দিকেই মূলত লক্ষ্য রেখেছেন।

(গ) মল-মূত্র ত্যাগ—মল-মূত্র ত্যাগের পর মহানবী তিনটি ঢিল দ্বারা মলদ্বার বা মূত্রদ্বার প্রথমত পরিষ্কার করে পরে জল দ্বারা ধৌত করতেন। মহানবী বলেন—"কেউই দাঁড়িয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করো না, গোসলখানায় পুকুরের পানিতে, শক্ত মাটিতে, প্রস্তরে, পথে ও বৃক্ষতলে মল-মূত্র ত্যাগ তাঁর নীতি বিরুদ্ধ।" তিনি বলেন—"যখন কেউ মল-মূত্র ত্যাগ করে, তখন যেন ডান হাত দ্বারা গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ না করে।" আরও বলেন—"অপবিত্র বস্তু ও হাড় দ্বারা পবিত্র হতে ইচ্ছা করো না।"

(ঘ) ঋতু ও সন্তান প্রসব—স্ত্রীলোকগণ যখন ওই অবস্থায় থাকে তখন তাদের নিকটবর্তী (সহবাস) হয়ো না। যখন তারা পরিষ্কার হয়, তখন তাদের সঙ্গে সঙ্গম কর। ২ ঃ ২২২। ওই অবস্থায় তাদের সঙ্গে ওঠাবসা, পানাহার নিষিদ্ধ নয়। মহানবী বলেন—ঋতু শেষ হলে স্ত্রীলোকগণ গুপ্তস্থানে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পাবে।

(ঙ) দাঁত পরিষ্কার—দাঁত পরিষ্কার সম্পর্কে মহানবী অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। মহানবী বলেছেন—যদি আমি আমার জাতির জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে এশার নামায বিলম্ব করা ও প্রতি নামাযের পূর্বে দাঁতন ব্যবহারকে ফরজ করতাম। এর দ্বারা বোঝা যায় মহানবী দাঁত পরিষ্কার রাখার ওপর কতখানি গুরুত্ব দিতেন। তিনি মৃত্যুর মহামুহূর্তেও দাঁত পরিষ্কার করেছিলেন।

(চ) মুষ্ক ছেদন—পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ হতে ঝুলন্ত সামান্য চামড়া-ত্বক ছেদনকেই মুষ্ক ছেদন বা খত্‌না বলে। প্রচলিত ভাষায় একে মুসলমানী করা বলে। মহানবী বলেন—পুরুষের জন্য এটা সুন্নত। কেননা এর দ্বারা পুরুষগণ অনেক গুপ্তরোগ থেকে নিষ্কৃতি পায়। এবং বিবাহের পর স্ত্রীগণও এর জন্য নানাবিধ যৌন বা গুপ্তরোগ থেকে মুক্তি পায়। এটি স্ত্রী-পুরুষকে বহু দুরারোগ্য রোগ থেকে রক্ষা করে। নাবালক পুত্রের খত্‌না দেওয়া পিতা-মাতার অবশ্যই কর্তব্য। মেয়েদের খত্‌না নাই।

(ছ) পরনের কাপড়—মহানবী বলেন—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না। সাদা বর্ণের পোশাককে তিনি শ্রেষ্ঠ পোশাক বলে বর্ণনা করেছেন। পরনের পোশাক যেন পদগ্রন্থির নিম্নে না থাকে, কেননা তাতে ময়লা লাগবার সম্ভাবনা থাকে।

(জ) গোঁফ, দাড়ি ও নখ—গোঁফ খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে বিষ উৎপাদন করতে পারে বলে তিনি গোঁফকে সম্পূর্ণ কর্তন করা বা ছোট করার নির্দেশ দিয়েছেন। দাড়ি লম্বা ও এক মুঠা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে দাঁত ভাল থাকে। ৪০ দিন হলেই গুপ্তাঙ্গের কেশ ও নখ কর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন পরিচ্ছন্নতার জন্য। মহানবী বলেন—যার কেশ আছে, সে যেন তার যত্ন করে। আবার কেশ নিয়ে যেন অতিরিক্ত বাড়াবাড়িও না করে। এই ভাবে মহানবী সারা বিশ্বকে পরিচ্ছন্নতার বিশদ বর্ণনা দিয়ে গেছেন।

৩৮। পোশাক-পরিচ্ছদে মহানবী (দঃ) ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে কোরআন বলে—"হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের পরিজনের জন্য পরিচ্ছদ পাঠিয়েছি, তোমরা

লজ্জা স্থান আবৃত কর।" মহানবী বলেন—শীত ও তাপ থেকে শরীরকে রক্ষা করা ও লজ্জা আবৃত করাই পোশাকের কাজ। তিনি বলেন—পোশাক সম্পর্কে মধ্যপথ অবলম্বন করবে, অমিতব্যয়ী হয়ো না। স্ত্রীলোকদের জন্য রেশমী পোশাক ও স্বর্ণালঙ্কার বৈধ করেছেন, পুরুষের জন্য অবৈধ। লাল পোশাককে তিনি অপছন্দ করতেন, কেননা এটা সভ্যসমাজ বিরুদ্ধ। লম্বা পোশাক মহানবীর প্রিয় ছিল, কিন্তু পদগ্রন্থির নিচে নয়। সচ্ছল বা ধনী ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত কম দামী পোশাক ব্যবহার করতে তিনি নিষেধ করেছেন। কেননা এতে কৃপণতা প্রকাশ পায়। আবার অমিতব্যয়ী হতেও তিনি নিষেধ করেছেন। স্ত্রীলোকদের গাত্র আবৃত করার আদেশ দিয়েছেন। তারা যেন এমন পোশাক ব্যবহার না করে, যাতে শরীর দেখা যায়। তিনি স্ত্রীলোকদের স্ত্রী-পোশাক পরিধান করতে এবং পুরুষদের পুরুষ-পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যারা এর বিপরীত করে, তাদের প্রতি অভিসম্পাত। তিনি লোমবিহীন জুতো পরার নির্দেশ দিয়েছেন। পুরান পোশাক না ছেঁড়া পর্যন্ত নতুন পোশাক তৈরি করতে নিষেধ করেছেন, এতে বিলাসিতা বাড়ে। ইসলামে বিলাসিতার স্থান নেই।

একমাত্র রোপ্য নির্মিত আংটি ব্যতীত তিনি পুরুষের জন্য অন্য কোন অলঙ্কার অনুমোদন করেননি। তাঁর হাতে একটি রোপ্য নির্মিত আংটি ছিল, যার দ্বারা তিনি চিঠিপত্র সিল করতেন। স্ত্রীলোকদের জন্য শব্দকারী ও মূল্যবান স্বর্ণ নির্মিত অলঙ্কার অপ্রিয় বোধ করেছেন। ঘরের আসবাবপত্র সম্পর্কে তিনি বহু মূল্যবান বিধি দিয়ে গেছেন। তিনি সোনা ও রুপোর পাত্রে আহার ও পান অবৈধ ঘোষণা করেছেন। চিত্রাঙ্কন তিনি নিষিদ্ধ করেছেন, এতে পৌত্তলিকতা বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন—গৃহস্বামীর জন্য একটি বিছানা, স্ত্রীর জন্য একটি, অতিথির জন্য একটি এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্য। কারণ এর দ্বারা মানুষ অমিতব্যয়ী হয়ে ওঠে। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও আসবাবপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে একটি মূলনীতি ঘোষণা করেছেন—মানুষ এইগুলো সম্পর্কে যা ইচ্ছা তাই করুক—কিন্তু তাতে থাকতে হবে দুটি বস্তু—সরলতা ও সভ্যতা, অমিতব্যয়িতা, আড়ম্বরহীনতা।

৩৯। বেশভূষা ও সাজসজ্জায় মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী ঘোষণা করেছেন—"মানুষ তার পোশাকে, তার বেশভূষায় ও সাজসজ্জায় শোভন হোক।" মহানবী তাঁর কেশ কোন কোন সময় একেবারেই কেটে দিতেন, কোন সময় ছোট করতেন, কোন সময় বড় রাখতেন। সিঁথি মাঝখানে কাটতেন। তবে অতিরিক্ত কেশবিন্যাস করতে যেমন নিষেধ করেছেন, তেমনি অযত্ন করতেও মানা করেছেন।

গোঁফ একেবারেই কামানোর বিধান দিয়েছেন। দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ক কেশে কলপ লাগাতে তাঁর কোন বাধা ছিল না। সুরমা ও সুগন্ধি তাঁর জীবনের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ছিল, যাতে শরীরে কোনরকম গন্ধ না থাকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্কি বা দাগ কাটা নিষিদ্ধ করেছেন। দুর্গন্ধময় যে কোন জিনিস তিনি অপছন্দ করতেন। এইভাবে মহানবী বিশ্বমানবের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও মানবসমাজের বেশভূষা সম্পর্কে অসংখ্য মূল্যবান উপদেশ রেখে গেছেন।

৪০। পছন্দে মহানবী ঃ মহানবী তিনটি জিনিস জীবনে খুব পছন্দ করতেন। (১) নামায অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ, (২) নারী অর্থাৎ অবহেলিত রমণীকুল এবং (৩) সুগন্ধ।

তিনি খুশবু সুগন্ধ খুব ভালবাসতেন। তিনি বলতেন—"যদি একটা পয়সা জোটে, খাবার কিনে নিও, যদি দুটি পয়সা জোটে, দ্বিতীয় পয়সা দিয়ে ফুল কিনে নিও।" ফুল মানুষকে আনন্দ দেয়, মনকে প্রফুল্ল করে। আবার প্রফুল্ল হিয়া মানুষকে ফুলের মতো করে তোলে।

জগতের সব গ্লানি করিতে নির্মূল
মানব সমাজে তুমি ফুটেছিলে ফুল।
দেখিয়া ফুটন্ত ফুল প্রফুল্ল হিয়া
হৃদয় ফুলেরই ন্যায় উঠে বিকশিয়া।

৪১। আচারে ও আদব-কায়দায় মহানবী (দঃ)ঃ

(ক) সাক্ষাতের নিয়ম—পবিত্র কোরআন বলে—"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত তোমাদের স্বগৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না।" মহানবী বলেন—মাতার সহিত সাক্ষাৎ করারও অনুমতি চাইবে। যে কোন গৃহে অনুমতি না পেলে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

(খ) সালাম—অনুমতি পাওয়ার পর 'সালাম' দ্বারা অভিবাদন করতে হয়। ইসলামের মহান শিক্ষা—মানুষ মানুষকে সালাম দ্বারা সম্ভাষণ করবে। এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তরও দেবেন। "আসসালামো আলাইকুম"-এর অর্থ—তোমার বা তোমাদের ওপর (আল্লাহর) শান্তি বর্ষিত হোক। উত্তর—"অয়ালাইকুমুস্ সালাম।" তোমাদের ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

(গ) মোসাফাহ বা করমর্দন—সালামের পরই করমর্দন করতে হয়। তা যুবক-যুবতীর মধ্যে সিদ্ধ নয়।

(ঘ) আসন ও উপবেশন—মহানবী বলেন—কোন মানুষকে তুলে দিয়ে আসন গ্রহণ করা ঠিক নয়। শেষে এসে প্রথম সারিতে বসা ঠিক নয়। মহানবী বলেন—কোন মানী ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানো অবৈধ নয়। তবে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার সম্মানার্থে মানুষ দণ্ডায়মান হোক, সে ঘৃণিত ব্যক্তি।"

(ঙ) হাই ও হাঁচি—অলসতা থেকে হাইয়ের উৎপত্তি, মহানবীর জীবনে একে লক্ষ্য করা যায়নি। হাঁচির আগমন সুস্থতা থেকে। তাই সঙ্গে সঙ্গে "অলহামদু-লিল্লাহ" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) বলতে হয়।

(চ) হাসা-কাঁদা—অধিক হাসি নিষিদ্ধ। মহানবী বলেন—আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে অল্প হাসতে ও বেশি কাঁদতে। মহানবী জীবনে কখনও অট্টহাস্য করেননি। কেবল মৃদু হাসতেন।

(ছ) নামকরণ—শিশুজন্মের সপ্তম দিবসে নামকরণ করার জন্য মহানবী উপদেশ দিতেন। দাস-দাসীগণকে (আমার) চাকর বা চাকরানি বলে ডাকতে মহানবী কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ছেলেমেয়ে বা অন্য কোন সম্বোধনে ডাকতে আদেশ দিয়েছেন। যে কোন মানুষকে নাম করে ডাকতে নিষেধ করতেন। যে কোন সম্পর্ক অনুযায়ী সম্বোধন করে ডাকতে বলতেন। চাচা-মামু, খালা-খালু, নানা-নানি ইত্যাদি।

৪২। মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্যে মহানবী (দঃ)ঃ মহানবী প্রথমেই ঘোষণা করেন, "তাঁরা তোমাদের স্বর্গ ও নরক।" স্রষ্টার পরই তিনি মাতা-পিতা ও শিক্ষককে আসন দিয়েছেন। কোরআনের বাণী—"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন—পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, ওদের একজন অথবা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হলে, ওদের 'উফ' (বিরক্তিসূচক) শব্দ পর্যন্ত বলো না, এবং ভর্ৎসনা করো না। ওদের সঙ্গে সম্মানসূচক নম্রভাবে কথা বলো। তাদের উভয়ের জন্য সদয় বিনীতভাবে (সম্মানের) বাহু নত কর এবং বলো—হে আমার প্রতিপালক! তাঁরা শৈশবে আমাকে যে রূপভাবে প্রতিপালন করেছেন, তুমি তাঁদের অনুরূপ করুণা কর।" কোরআন—১৭ ঃ ২৩-২৪

মহানবী আরও বলেন—"তাঁরা গরিব হলে ভরণপোষণের ভার সন্তানদের। কেননা মাতা-পিতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মাতা-পিতার অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি।" মাতার জন্য বলেন—"স্বর্গ মাতার চরণ তলে।" তিনি বলেন—"মাতার আসন পিতারও ওপরে।" তিনি এককথায় বলেছেন—"মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের জন্য স্বর্গ অবৈধ।" তাই তিনি ঘোষণা করেছেন—তাঁরাই তোমাদের স্বর্গ ও নরক। তিনি বলেন—"মানব চরিত্রের মহান দিক, যা মৃত্যু যন্ত্রণাকেও সহজ করে তোলে, দুর্বলের প্রতি দয়া, মাতা-পিতার সেবা ও সম্মান প্রদর্শন ও দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার।"

যে সন্তান তার পিতা-মাতা ও শিক্ষককে শ্রদ্ধা জানাতে জানে না, তার স্বর্গ এখনও তৈরি হয়েছে কিনা জানি না।

এ জগতে জন্ম নিল যে কোন সন্তান
গরীয়ান মহীয়ান যতই মহান।
একদিনে যা করেছে সব কটি দিন
শোধিতে পারে না কোন পিতৃ-মাতৃ ঋণ।

৪৩। সন্তানগণের প্রতি মহানবী (দঃ)ঃ মাতা-পিতার প্রতি সন্তানদের যেমন কর্তব্য আছে, সন্তানদের প্রতি মাতা-পিতারও সমান দায়িত্ব আছে। এই সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশ দেন—

(ক) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই কানে আযানের শব্দ দেবে। (খ) সাত দিন হলে পুত্রের জন্য দুটো ও কন্যার জন্য একটি ছাগল অকিকা বা উৎসর্গ করে নাম রাখো, ছ' বছর হলেই শিক্ষাদান আরম্ভ কর, দশ বছর হলে ধর্মের জন্য আদেশ দাও। খত্‌নার সময় হলে, খত্‌না দাও। বিবাহযোগ্য হলে বিয়ে দাও। নচেৎ পিতা-মাতা পাপের জন্য দায়ী হবে। সন্তানদেব অভিশাপ দিও না। পুত্র-কন্যার মধ্যে যে কোন রকমের তারতম্য তিনি নিষেধ করেছেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য স্বর্গ নির্ধারিত। উত্থান দিবসে তারা তাদের পিতা-মাতাকেও স্বর্গেব জন্য সুপারিশ করবে। মহানবী ছোট বাচ্চাদের বড়ই স্নেহ করতেন এবং স্নেহ করতেও নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

৪৪। বিবাহে মহানবী ঃ পবিত্র কোরআন বলে—"যে সকল স্ত্রীলোক তোমাদের ভাল লাগে, তাদের বিয়ে কব।" বিয়ে করা নিজের জন্য কখনও ফরজ, কখনও ওয়াজেব, কখনও সুন্নত। মহানবী বলেন—"তোমাদের মধ্যে যার সঙ্গতি আছে, হে যুবকগণ, তারা

যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে দৃষ্টি বন্ধনকারী ও গুপ্তাঙ্গ রক্ষাকারী।" তিনি বলেন—"যে বিবাহে সর্বাপেক্ষা কম খরচ হয়, তাতে সর্বাপেক্ষা বেশি বরকত আছে।" তিনি আরও বলেন—"বিয়ের সময় স্ত্রীলোকের চারটি বিষয় দেখ—(১) তার সম্পদ, (২) তার শিক্ষা গুণ, (৩) তার সৌন্দর্য, (৪) তার ধর্মপ্রবণতা। মহানবী বলেন—"সম্মতি ব্যতীত কোন মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না, তাদের সম্মতি তাদের নীরবতা।" কোরআন বলে—"তোমাদের পুরুষ থেকে দু'জন সাক্ষী ডাক, যদি দু'জন পুরুষ না পাও, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী।" বিনা সাক্ষীতে বিয়ে অবৈধ। ইসলামে বিবাহ—প্রস্তাব ও সম্মতি-জ্ঞাপন সাক্ষীর সম্মুখে। দু'জন সাক্ষীর সামনে মেয়ে তিনবার প্রস্তাব দিলে এবং ছেলে তিনবার সম্মতিজ্ঞাপন করলে, বিবাহ হয়ে যাবে। মহানবী বলেন—"বিবাহ আমার (সুন্নত) জীবনধারা, যে ওটা ত্যাগ করে সে আমার নয়।" তিনি আরও বলেন—"ইসলামে বৈরাগ্য নেই।"

অসবর্ণ বিবাহ—মহানবী বিশ্বমানবকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বাঁধার জন্য অতীব আকুল ও ব্যাকুলভাবে মানবমণ্ডলীর নিকট আবেদন করেছেন। আপন চিন্তা কথা ও কাজে সকলকেই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন একাধিক বার। মানব-জাতি একই সম্প্রদায়। ২ ঃ ২১৩। পবিত্র কোরআনের এই এককে একত্রিত করার জন্য তিনি ঘোষণা করলেন—"এই বিশ্ব আল্লাহর পরিবার।" সুতরাং পরিবারের সব পরিজনই তাঁরই বান্দা। তিনি ঘোষণা করেছিলেন—"আহলে কেতাবধারী বা অন্য ধর্মাবলম্বী মহিলাকে যে কোন মুসলমান বিয়ে করতে পারে।" 'আহ্‌লে কেতাব' তাঁরাই, যাঁরা কেতাব পেয়েছেন, জগতে এমন কোন জাতি নেই, যাঁরা রসুল বা কেতাব পাননি।

কোরআন—৫ ঃ ৫. ৫ ঃ ১৩৬, ১৬৪, ১০ ঃ ৪৭, ১৩ ঃ ৭,
১৬ ঃ ৩৬, ১৭ ঃ ১৫, ২৮ ঃ ৪৭, ৩৫ ঃ ২৪, ২৫।

মহানবী নিজেই তিনজন ইহুদী মহিলা—বিধবা রায়হানা, জারিয়া ও সাফিয়া এবং একজন খ্রীস্টান মহিলা বিধবা মারিয়াকে (পবিত্র কোরআনের শিক্ষামতই) আপন পত্নীত্বে বরণ করেছিলেন। কোনদিনই তাঁদের ধর্মান্তরিত হতে চাপ দেননি। পরবর্তীকালে তাঁরা আপন খুশিমতই ইসলামকে বরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি অসবর্ণ বিবাহকে বারবার উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন, যাতে বিশ্বমানবের মধ্যে অচিরে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে ওঠে। যাতে মানুষ মানুষ মাত্রকেই ভাই বলতে শেখে। অপরকে আপন করতে শেখে। সুতরাং ইসলামে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ নয়।

কোরআন—২ ঃ ২১৩, ৪ ঃ ১, ৫ ঃ ৫, ৭ ঃ ১৮৯, ১০ ঃ ১৯, ১১ ঃ ১১৮, ১৬ ঃ ১৩

ত্যাগী হয়ে সংসারেতে তসবিতে তেলায়াত
বলে নাই নবী মোর এই ভাল আখেরাত।
ইসলামে বৈরাগ্য নাই বড় গুণ যার
সমাজ জীবন তার সব হতে সার।
সুষ্ঠু সংসার ধর্মে ফলিবে যে ফজিলত
তার বড় নাই আর উপাসনা এবাদত।

৪৫। পাত্রী দেখায় মহানবী ঃ মহানবী বলেন—"যখন তোমাদের কেউ কোন মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে, যদি দেখার সুযোগ থাকে, সে যেন তাকে দেখে। কেননা এতে ভালবাসা স্থায়ী হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।"

স্ত্রী-প্রেম সম্পর্কে মহানবী ঃ কোরআন বলে—"তোমাদের রমণীগণ তোমাদের ক্ষেত্র স্বরূপ, সুতরাং যে ভাবেই ইচ্ছা কর, সেই ভাবেই তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে গমন কর।" মহানবী বলেন—"কোন নারীকে দেখে যদি কারও লোভ হয়, সে যেন তার স্ত্রীর নিকট গমন করে। কেননা তার স্ত্রীর সঙ্গে (দেহে) যা আছে, তার সঙ্গেও তাই আছে। যখন তোমরা কেউ কোন মেয়েকে দেখে সুখানুভব কর। এবং তোমার অন্তরে সে পতিত হয়, তখন সে যেন তার স্ত্রীর দিকে মন আকৃষ্ট করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গম করে, কেননা তার অন্তরে যা আছে, তা সঙ্গম দ্বারা দূর হবে।" তিনি বলেন—সঙ্গমের তিনটি সময় নিষিদ্ধ—"সন্তান প্রসবের পর ৪০ দিন, ঋতুকাল, রোযা অবস্থা।"

পবিত্র কোরআন মানব সমাজকে শুদ্ধিপথে রাখার জন্য প্রার্থনা করতে বলেছে তাদের অসুন্দরী স্ত্রীও যেন তাদের চোখে সুন্দরী রূপে ধরা দেয়। তাদের মন যেন অন্যদিকে বিভ্রান্ত না হয়। "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের স্ত্রীদের আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কর। এবং আমাদেরকে সংযমীদের আদর্শ স্বরূপ কর।" কোরআন—২৫ ঃ ৭৪

৪৬। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মহানবী ঃ কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ইসলামে 'আজল' প্রথার মাধ্যমে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করার বিধান আছে। সঙ্গমকালে শুক্র নির্গত হওয়ার উপক্রম হলে তা স্ত্রীর গর্ভে নিক্ষেপ না করে বাইরে নিক্ষেপ করাকে আজল বলা হয়। এক ব্যক্তি মহানবীকে বললেন—আমার একটি তরুণী সুন্দরী দাসী আছে, আমি তার সঙ্গে সহবাস করছি। কিন্তু আমি পছন্দ করি না বা চাই না, তার গর্ভ হোক। তখন মহানবী বললেন—"ইচ্ছা করলে তার সঙ্গে 'আজল' (বীর্য বাইরে ফেলা) কর।" হযরত জাবের বলেন—"আমরা আজল করতাম, এই সংবাদ মহানবীর নিকট পৌছালে তিনি আমাদের নিষেধ করেননি।" তবে মহানবী স্ত্রীলোকদের বিনা অনুমতিতে আজল করতে নিষেধ করেছেন।

৪৭। আদর্শ স্বামীরূপে মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছরের এক বিধবা রমণী বিবি খাদিজাকে বিয়ে করে সমগ্র জীবন দাম্পত্যের যে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তার তুলনা নেই। স্বামী-স্ত্রীর এই মধুর সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা—"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ, তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ।" ২ ঃ ১৮৭। "তাদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের ওপর তাদেরও তেমনি অধিকার আছে।"

কোরআন—২ ঃ ২২৮

৪৮। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য ঃ যৌবনের উত্তাল তরঙ্গে, প্রবৃত্তির জোয়ার-ভাঁটাতে স্ত্রী পুরুষের নিকট দুর্গ স্বরূপ। তাই মহানবী ঘোষণা করেছেন—পৃথিবীতে পুরুষের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ—তার সতী স্ত্রী। এই স্ত্রীজাতির সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে মহানবীর নির্দেশ ঃ

(ক) তিনি বলেন—"যে তার স্ত্রীর প্রতি ভাল ব্যবহার করে, সে-ই উত্তম ব্যক্তি। (খ) স্ত্রীকে কোনদিনই ঘৃণার চোখে দেখবে না। (গ) স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক কঠোর হবে

না। (ঘ) স্ত্রীকে প্রহার করবে না। (ঙ) স্ত্রীর সঙ্গে নির্দোষ খেলাধুলা করবে। (চ) স্ত্রীর কোন গুপ্ত কথা প্রকাশ করবে না। (ছ) একের অধিক স্ত্রী থাকলে প্রত্যেকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে হবে। (জ) স্ত্রীর দাবি অনুসারে স্বামী মোহরানা দিতে বাধ্য। (ঝ) স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার হবে। (ঞ) স্ত্রীকে স্বামী প্রয়োজনমত ধর্মীয় শিক্ষাদান করবে। (ট) তাদের প্রতিপালন কর, পোশাক-পরিচ্ছদ দাও, এবং তাদের প্রতি নম্রভাব অবলম্বন কর। কোরআন—৪ ঃ ৫

৪৯। **স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ঃ** কোরআন বলে—"তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্র স্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো।" ২ ঃ ২২৬। তাই মহানবী বলেন—স্বামী সঙ্গমের ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্ত্রী যেন (বিনা কারণে) অসম্মতি না জানায়। তিনি আরও বলেন—উত্তম স্ত্রী ওই নারী, যে তার স্বামীকে আনন্দ দান করে। তিনি আরও বলেন—আল্লাহ্ ব্যতীত যদি অন্য কাউকে সেজদা করার অনুমতি থাকত, তাহলে আমি স্ত্রীদের তাদের স্বামীকে সেজদা করার আদেশ দিতাম।" এই কথার দ্বারা এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তিনি স্ত্রীদেরকে কতখানি স্বামীর বাধ্য হতে বলেছেন।

৫০। **আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মহানবী (দঃ) ঃ** আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্য মহানবী অসংখ্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি বলেন—"যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, সে স্বর্গে প্রবেশ করবে না। দরিদ্র আত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করে। দরিদ্রকে দান উত্তম, কিন্তু দরিদ্র আত্মীয়কে দান সর্বোত্তম।" তিনি বলেন—"ভাল লোক ওই ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর তা পুনরায় স্থাপন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচার ও সৎকর্ম করতে এবং আত্মীয়-স্বজনদের দান করতে নির্দেশ দেন।" ১৬ ঃ ৯০ "নিকট আত্মীয়দের যা প্রাপ্য, তা তাদের দাও।' কোরআন—১৭ ঃ ২৬

৫১। **ছোট ও বড়র প্রতি মহানবী (দঃ) ঃ** তিনি বলেন—"সে আমার দলভুক্ত নয়, যে ছোটর প্রতি স্নেহশীল ও বড়র প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়।" তিনি বলেন—"যে যুবক বৃদ্ধকে সম্মান দান করে, সে-ও বৃদ্ধ অবস্থায় শত যুবকের সম্মান লাভ করবে।" গুণীকে সম্মান করা, বয়স্ককে সম্মান করা, মানুষকে নয়, গুণ ও বয়সকে সম্মান করা হয়।" তিনি বলেন—"যে কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি এলে তাকে সম্মান কর।"

গরিব আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহার সন্তোষজনক না হলেও তাদের মঙ্গল করা কোরআনের নির্দেশ। ২ ঃ ১৭৭, ২১৫, ৪ ঃ ৩৬, ১৩ ঃ ২৫, ১৬ ঃ ৯০, ১৭ ঃ ২৩-২৬, ২৪ ঃ ২২।

৫২। **দাস-দাসীদের প্রতি মহানবী (দঃ) ঃ** মহানবী বলেন—"সমগ্র বিশ্ব বিশ্বপ্রভুর নিকট একটি পরিবার। সেই পরিবারে সকলেই সমান।" তাই তিনি ঘোষণা করেছেন—"ইসলামে কোন দাসপ্রথা নেই।" মহানবীর জীবনে যে মহান ব্রত, তা মূলত এই পৃথিবীর গরিব মানুষ, অসহায় মানুষ ও দরিদ্র মানুষ দাস-দাসীদের নিয়েই। তাই তিনি ঘোষণা করেছেন—"নিজে যা খাবে, দাস-দাসীকেও তাই খেতে দাও, নিজে যা পরবে, ওদেরও তাই পরতে দাও।" "শ্রমিকদের শরীরের ঘাম শুকাবার পূর্বেই ওদের মজুরি মিটিয়ে দাও।" "দাস-দাসীদের ভাই ও বোন বলে সম্বোধন কর।" আজ আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ দাস মুক্তি।" মৃত্যুর মহামুহূর্তেও তিনি এদের কথাই উচ্চারণ করে গেছেন।

তিনি আরও বলেন—"যে দাস-দাসীদের প্রহার করে, আল্লাহ্ তাকে কেয়ামতের দিন প্রহার করবেন।" তিনি কঠিনতম মহাপাপীকে ও দাস-দাসীকে আজাদ বা মুক্ত করে পাপ মোচনে উৎসাহিত করে গেছেন। তিনি বলেন—"দাস-দাসীদের প্রত্যহ ৭০ বার ক্ষমা কর।" মহানবীর আপন ভৃত্য যায়েদ বলেন—"মহানবী সমগ্র জীবনে তাকে একবারও 'উফ্' বলেননি।" শুধু তাই নয়, মহানবী বহু দাসকে বহু উচ্চ পদে আসীন করে গেছেন, যেমন—ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন—দাস বেলাল, ক্রীতদাস যায়েদ মুতা অভিযানের সেনানায়ক প্রভৃতি।

দাস দাসী সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ ছিল অতীব অপূর্ব। তিনি বলতেন, মালিক একমাত্র আল্লাহ, মহান স্রষ্টা। বাকি সকলেই তাঁর সৃষ্টিজগৎ বা দাস, তারা অন্য কারও দাস নয়, কেননা একজন মানুষ একসঙ্গে দু'জনের দাস হতে পারে না। মানুষকে আল্লাহর দাস বলা হয়েছে শুধু এই অর্থে যে, সে তার মালিক মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকুলের সেবা করবে। সুতরাং দাসের প্রথম ধর্ম তার মালিকের নির্দেশগুলোকে যথাযথভাবে পালন করা। এইজন্যই কোন মানুষই সৃষ্টির সেবা ব্যতীত স্রষ্টাকে বা আল্লাহ্কে পেতে বা লাভ করতে পারে না। মালিককে তুষ্ট করতে হলে দাসকে অকৃত্রিম প্রাণে প্রকৃত দাসের ধর্ম পালন করতেই হবে। ইহকালে ও ইহজগতে মহান স্রষ্টা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন—সে যেন তার সৃষ্টিজগতের সেবা করে। সৃষ্টির এই সেবাধর্মেই জগতের সমস্ত নরনারী একমাত্র আল্লাহর দাস, কোন মানুষই কোন মানুষের দাস নয়। মহানবী মানুষকে সদাই শিক্ষা দিতেন, উদ্বুদ্ধ করতেন মানুষ যেন তার এই দুর্লভ মানব-জীবনে সৃষ্টির সেবায় মহান দাসত্বের মর্যাদা রক্ষা করে প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসায়, সেবা ও শুশ্রূষায়।

৫৩। প্রতিবেশী সম্পর্কে মহানবী (দঃ)ঃ পবিত্র কোরআন ঘোষণা করে—"পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন দরিদ্র, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গীসাথী, পথচারী কি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।" ৪০ ঃ ৩৬। মহানবী বলেন—"কেউই পূর্ণ বিশ্বাসী হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ না থাকে।" তিনি আরও বলেন—"যে উদর পূর্ণ করে খায়, কিন্তু তার প্রতিবেশী তারই পাশে ক্ষুধার্ত থাকে, সে পূর্ণ ঈমানদার (বিশ্বাসী) নয়।" তিনি এককথায় বলেছেন—"যে ব্যক্তির অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে স্বর্গে যেতে পারে না।"

তিনি বলেন—"আল্লাহর দৃষ্টিতে ওই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে উত্তম, যে মানুষের দৃষ্টিতে উত্তম।" প্রতিবেশীদের প্রতি উত্তম।

প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নয় নিপীড়ন হতে যার
স্বর্গে যাওয়ার জেনে রেখো তার নাই কোন অধিকার।

প্রতিবেশীদের প্রতি কি কর্তব্য সে সম্পর্কে মহানবী বলেন—"যদি সে (প্রতিবেশী) তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে, তাকে সাহায্য কর, যদি সে তোমার অভয় চায়, তাকে অভয় দান কর, যদি সে ঋণ চায়, তাকে ঋণ দান কর, যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়, তার অভাব দূর কর, যদি সে পীড়িত হয়, তার সেবা কর, তার মৃত্যু হলে শেষকার্য সম্পাদন কর, যদি সে নিরানন্দে থাকে, তাকে আনন্দ দান কর, যদি সে বিপদে পড়ে, তাকে উদ্ধার কর, ঘর এত উঁচু করো না, যাতে তার কষ্ট হয়। যদি তুমি কোন ফল কেনো, তাকে কিছু দান কর,

যদি তা না পার, তাহলে গোপনে বাড়ি নিয়ে যাও, তোমার সন্তানদের ওটা বের করতে দিও না. কেননা প্রতিবেশীর সন্তানরা দেখতে পাবে এবং তাদের পিতা-মাতাকে বিরক্ত করবে। হয়তো তাদের পিতা-মাতা গরিব. কেনার শক্তি রাখে না।"

মহানবী প্রতিষ্ঠিত প্রতিবেশীর প্রতি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আজকের বিশ্বজোড়া হক্ শেফা বা ক্রয়ে অগ্রাধিকার আইন Law of Pre-emption চলছে। এই অধ্যায়ে আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে। যার ফলশ্রুতি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বোধ।

৫৪। সৎ স্বভাব সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ মানবতার পূর্ণতম বিকাশ যার মধ্যে হয়েছিল তিনিই মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)। সকল রকমের সৎ স্বভাব তাঁর চরিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁর স্বভাব সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন বলে—"এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার কর, যদি তুমি কর্কশ ও নিষ্ঠুর হতে, তারা নিশ্চয়ই তোমার নিকট হতে দূরে সরে যেত।" "অন্যত্র তোমাদের ভিতর থেকে তোমাদের জন্য এক রসুল আবির্ভাব হয়েছে, তোমাদের দুঃখকষ্ট তাঁর নিকট বড়ই কষ্টকর। তোমাদের মঙ্গলই তাঁর কাম্য এবং বিশ্বাসীদের প্রতি তিনি বড়ই নম্র ও দয়ালু।"

কোরআন— ৩ ঃ ১৫৯, ৯ ঃ ১২৮

মানুষ সৃষ্টির সেরা, স্রষ্টার প্রতিনিধি। তাই মহানবী বলেন—"হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও। তোমাদের মধ্যে যে স্বভাব-চরিত্রে উত্তম, সে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়।" "মহা বিচারের দিনও মানুষের স্বভাবই সর্বাপেক্ষা ওজনে ভারী হবে।" তিনি আরও বলেন—"সৎ স্বভাব নবীত্বের অংশবিশেষ।" এর দ্বারা বোঝা যায় ইসলাম-জগতে সৎ স্বভাব ব্যতীত কেউই রেহাই পেতে পারে না। তিনি যিনিই হোন।

৫৫। সৎ ব্যবহার সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী বলেন—"যে তার আপন ব্যবহার দ্বারা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।" "যার ব্যবহার কর্কশ ও স্বভাব মন্দ সে স্বর্গে প্রবেশ করবে না।" তিনি বলেন—"ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক।" ইয়ামেনের শাসনকর্তা মোয়াজকে নির্দেশ দিলেন—"মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।" তিনি অতিরিক্ত বিরক্ত হলেও ব্যবহারে তা প্রকাশ করতেন না। যয়নাবের বিবাহে ভোজসভার শেষে তাঁর গৃহে মানুষের দীর্ঘকাল অবস্থান তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ইহুদী ও খ্রীস্টানদের প্রতি মহানবী যে দারুণ ব্যবহার করেছিলেন, বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত অসংখ্য প্রমাণে সে অধ্যায় চির সমুজ্জ্বল। মহানবীর মুখে সদাই হাসির চিহ্ন বিরাজ করত। তিনি সকলকে প্রথম সালাম দ্বারা অভ্যর্থনা জানাতেন। করমর্দন করতেন প্রথম কিন্তু কখনও নিজ হাত প্রথমে সরিয়ে নিতেন না। এমনি ছিল তাঁর ব্যবহার।

৫৬। নম্রতায় মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী বলেন—"কর্কশ স্বভাব ত্যাগ কর এবং নম্রতা অবলম্বন কর। কেননা মহান আল্লাহ্ নম্রতা ভালবাসেন।" তিনি আরও বলেন—"প্রত্যেক নম্র ও বিনয়ী ব্যক্তি স্বর্গলাভ করবে।" তাঁকে কেউ সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বললে তিনি বলতেন, সেই ব্যক্তি হযরত ইব্রাহিম। তাঁকে প্রভু বলে সম্বোধন করলে তিনি বলতেন—"তোমাদের প্রভু এক আল্লাহ্।" তিনি সবসময় নিজেকে আল্লাহর দাস ও রসুল বলে অভিহিত করতেন। শুধু রসুল বলতেন না। কোন এক বিবাহে এক বালিকা গীত গেয়ে বলল, আগামীকাল কি হবে আমাদের নবী তা জানেন। শোনার সঙ্গে সঙ্গে মহানবী এরূপ গীত গাইতে নিষেধ

করলেন। মহানবীকে কেউ অতিরিক্ত সম্মানসূচক কথা বললে, তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে বিরক্ত হতেন। কেননা তিনি তোষামোদ মোটেই ভালবাসতেন না।

৫৭। দয়ার সাগর মহানবী (দঃ) ঃ মহানবীর দয়া সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন ঘোষণা করেছে—"তোমাকে বিশ্বের করুণাস্বরূপ ব্যতীত পাঠাইনি।" তাই তিনি ছিলেন দয়ার ভাণ্ডার। এই গুণে তাঁর কে'• পরিসীমার খোঁজ পাওয়া যায় না। তিনি বলেন—"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়ালু নয়, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়ালু নন।" "যে দয়া গুণে বঞ্চিত, সে যেন সকল গুণেই বঞ্চিত।" তিনি বলেন, "কঠিন হৃদয় আল্লাহ্ হতে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকে।" তাঁর দয়া শুধু মানবমণ্ডলীর জন্য সীমিত ছিল না। কেননা তিনি শুধু মানবমণ্ডলীর নবী ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বজগতের নবী। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত উট, গরু-বাছুর, পশুপক্ষী, জীবজন্তু সম্পর্কে তিনি বলেন—এই সকল প্রাণী সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তারা যখন সুস্থ থাকে তখন তাদের ব্যবহার কর। তারা অসুস্থ হলে তাদের বিশ্রাম দাও। যখন তোমরা কোন প্রাণীকে জবাই কর, তখন ধারালো অস্ত্র দ্বারা করো, দীর্ঘক্ষণ যেন সে কষ্ট না পায়। মহানবী বলেন—কোন এক স্ত্রীলোককে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু সে একটি বিড়ালকে ঘরে আবদ্ধ বেখে মেরে ফেলেছিল। আবার ঠিক বিপরীত ভাবে একটি বেশ্যা নারীর সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল, যখন সে একটি মৃতপ্রায় তৃষ্ণার্ত কুকুরকে অতি কষ্টে কূপ থেকে পানি তুলে তার প্রাণরক্ষা করেছিল। বহু বিপদে, বহু নির্যাতনে বহু শিষ্য তাঁকে বহুবার অনুরোধ করেছিলেন অভিশাপ দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি বলেছিলেন—আমি দয়ার দূত রূপে প্রেরিত হয়েছি, প্রেম ও ভালবাসার প্রতীক রূপে প্রেরিত হয়েছি।

৫৮। ক্ষমায় মহানবী (দঃ) ঃ মানব চবিত্রেব ক্ষমা একটি বিশেষ গুণ, মহানবীর চরিত্রে তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। মহানবী বলেন—"যে মানুষকে ক্ষমা করে, মহান আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন।" তিনি আরও বলেন—"আল্লাহর নিকট ওই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানী, যে শক্তিশালী হয়েও ক্ষমা করে।" মহানবী এতই ক্ষমাশীল ছিলেন—ব্যক্তিগত ব্যাপারে জীবনে একটি বারও প্রতিশোধ নেননি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আপনজন, এদের ক্ষমা করা তাঁর নিকট এমন কিছুই বড় কাজ ছিল না। আমরা লক্ষ্য করি, বদর যুদ্ধ হতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত তিনি যে ক্ষমার দৃষ্টান্ত চির-শত্রুদের সঙ্গেও রেখে গেছেন, তা একেবারেই অচিন্তনীয়। হাব্বার বিন আসওয়াদ মহানবীর প্রিয় দুহিতা যয়নাবকে মদিনার পথে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অত্যাচার করেছিল। যার ফলে তিনি মারা যান। মক্ক বিজয়ের পর এ হেন মহাপাপীকেও মহানবী ক্ষমা করলেন। এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।

প্রশান্ত হৃদয় মাঝে পাপীকে তুমি
শতবার ঘৃণা করো পাপকে তুমি।
পাপকে করিয়া ঘৃণা করিও মানা
কভু না করিও যেন পাপীরে ঘৃণা।
বিশাল বুকেতে টানি পাপীকে তুমি
শোধিতে সুযোগ দাও পাপীরে তুমি।
তুমি যে পবিত্র ফুল প্রশস্ত হৃদয়
পাপীর পার্শ্বেতে তার হোক পরিচয়।

৫৯। প্রতিশ্রুতি রক্ষা সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী বলেন—সত্য কথা বলা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সৎ মানুষের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। তিনি আরও বলেন—চারটি গুণ তোমার মধ্যে পাওয়া গেলে, পৃথিবীতে এমন কিছু নেই তোমার ক্ষতি করতে পারে—(ক) আমানত রক্ষা, (খ) সত্যবাদিতা, (গ) সদ্ব্যবহার, (ঘ) খাদ্যদ্রব্যে মিতাচারিতা। তিনি বলেন—বিশ্বাসঘাতকের তিনটি লক্ষণ—যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিজ্ঞা করে ভঙ্গ করে, যখন আমানত রাখে নষ্ট করে। এ সম্পর্কে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত—একবার মহানবী আবদুল্লাহ নামক ব্যক্তিকে কথা দিলেন কোন একস্থানে মিলিত হওয়ার জন্য। কথামত মহানবী সেখানে হাজির হলেন, এবং পর পর তিনদিন সেখানে ওই ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করলেন। পরে হঠাৎ ওই ব্যক্তি কোন কারণে ওই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তার মনে পড়ে গেল, কথা দেওয়ার কথা। মহানবী বললেন—"আমি তিনদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, যেহেতু কথা দিয়েছি। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় এমনি ছিলেন মহানবী। তিনি বলেন—"যার অঙ্গীকারের ঠিক নেই, তার ধর্ম নেই।"

৬০। সরল জীবনযাপনে মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী সরল জীবনযাপন অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর ভেতর ও বাহির সবসময় এক ছিল। তাঁর সমগ্র জীবনে এর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। গরিব মহানবী থেকে রাষ্ট্রপতি মহানবীতে একই ছিলেন। এই পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর বা তাঁকে পরিবর্তন করতে পারেনি। মহানবী বলেন—"কোন নবীর পক্ষে কোন অতি সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ সম্ভব নয়।" তিনি বলেন—'একটি শয্যা নিজের জন্য, একটি স্ত্রীর জন্য, একটি অতিথির জন্য, অপরটি শয়তানের জন্যে।' তাঁর সময়ে মহানবীর মসজিদ অতি সাধারণ ছিল। মাটির দেওয়াল, ছাদ খেজুর পাতার, স্তম্ভ খেজুর গাছের। সরল জীবনযাপনের জন্য যা কিছু করার দরকার, তিনি তা সবই করতেন। কখনও গরু চরাতেন, কখনও দুগ্ধ দোহন করতেন, কখনও কাপড় সেলাই করতেন, কখনও ঘর পরিষ্কার করতেন, কখনও জুতো সেলাই করতেন, কখনও রান্না করতেন, কখনও বা অতিথি অসুস্থ হলে তার মল-মূত্রও পরিষ্কার করতেন। এমনি ছিল তাঁর সরল জীবনযাপন।

৬১। অতিথিপরায়ণতায় মহানবী (দঃ) ঃ অসভ্য আরবদের বহু বদ্‌গুণের মধ্যে কিছু সৎ গুণও ছিল। এই সৎ গুণের মধ্যে তাদের অতিথিপরায়ণতা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং মহানবী এই গুণটিকে একদিকে বংশানুক্রমে পেয়েছিলেন, অপরদিকে মহানবী হিসাবে এই গুণটি তাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রূপ লাভ করেছিল। মহানবী বলেন—"যে পরলোককে বিশ্বাস করে, তাকে অতিথিকে সম্মান করতে বলো।" মহানবী জীবনে অতিথিগণ আহার শেষ না করা পর্যন্ত উঠতেন না, আবার তারা খাবার খাওয়া আরম্ভ না করা পর্যন্ত আরম্ভ করতেন না। তিনি বলেন—"দু'জনের খাদ্য তিনজনের জন্য যথেষ্ট।" তবুও অতিথি যেন ফিরে না যায়।

৬২। প্রতারণা সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ পবিত্র কোরআন বলে—"কপটগণ দোজখের নিম্নস্তরে অবস্থান করবে।" "কপটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।" ৯ ঃ ৭৬। "তাদের মহান আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করবেন না।" ৯ ঃ ৮০। "মহান আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দেন।" ৯ ঃ ৬৮। মহানবী বলেন—'মোনাফেকের ভেতর দুটি গুণ থাকতে পারে না, সৎ-স্বভাব

ও পর্যন্তান।' মহানবী বলেন—"মোনাফেককে চিনে নিও, যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিজ্ঞা করে ভঙ্গ করে, যখন বিশ্বাস দেয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে।"

৬৩। রিয়া বা লোকদেখানো কাজ সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী ভেতরে বাইরে সদাই ছিলেন অকৃত্রিম। সমগ্র জীবনে কৃত্রিমতার একটি কণাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। এই লোকদেখানো কৃত্রিমতাকে ইসলামের চোখে 'রিয়া' বলা হয়। মহানবী বলেন—এই রিয়া প্রকাশ পায় বিশেষ করে চার রকমের কাজে। (ক) চাল-চলনে অর্থাৎ—বেশভূষায়, দাড়ি-গোঁফে, (খ) ভাবভঙ্গিতে, (গ) বাক্যে ও (ঘ) কার্যে। মহানবী এই ধরনের সকল কৃত্রিম কার্যকলাপকে অন্তরের সঙ্গে চিরদিন ঘৃণা করে গেছেন। এই সম্পর্কে তাঁর বহু বাণী আছে। কোরআন—১০৭ ঃ ৪-৬

৬৪। সহিষ্ণুতা সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ পবিত্র কোরআন বলে—"আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথী।" ২ ঃ ৪৫। মহানবী ঘোর বিপদে বলে উঠেছেন—"আল্লাহ্ আমার সঙ্গে আছেন।" এর দ্বারাই প্রমাণ হয় মহানবী ছিলেন মহান ধৈর্যশীল ব্যক্তি। তাঁর ধৈর্যের পরিসীমা যে কতখানি, তা সহজেই বোঝা যায় তাঁর মক্কাতে নবী-জীবনের ১৩ বছরের ঘটনাগুলো পর পর একবার মনে হলে, মনে হবে যে কোন পাহাড়ও ধৈর্য রাখতে পারত না। কিন্তু মহানবী রেখেছিলেন। মহানবী বলেন—"এমন কোন সহিষ্ণু লোক নেই, যার ক্ষমতা নেই, এবং এমন কোন জ্ঞানী লোক নেই, যার অভিজ্ঞতা নেই।" তিনি আরও বলেন—"তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ দুটি গুণকে ভালোবাসেন—ধৈর্য ও সহ্য।"

৬৫। রসনা সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ রসনা দমন সম্পর্কে মহানবী বলেন—"যে মৌনব্রত অবলম্বন করে, সে নাজাত পাবে।" তিনি আরও বলেন—"যে আত্মসমর্পণে সন্তুষ্ট হতে চায়, তাকে মৌনব্রত অবলম্বন করতে বল। মহানবী এই সম্পর্কে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—"যে ব্যক্তি তার দুই পংক্তি দাঁতের মাঝে জিহ্বা এবং দুই পায়ের মাঝে যে গুপ্তাঙ্গ আছে, তার জন্য দায়িত্ব নিতে পারে, আমি তার স্বর্গের দায়িত্ব নিতে পারি।" এখানে বাক্, কাম ও সংযমের কথা বলা হয়েছে। মহানবী ছিলেন অত্যন্ত সংযমী ও স্বল্পভাষী।

৬৬। পরনিন্দা সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে সত্য হোক, মিথ্যা হোক, কারও পশ্চাতে অপবাদ করা হলে, তাই পরনিন্দা। এবং এই পরনিন্দাকে মহানবী অত্যন্ত ঘৃণা করেছেন। তিনি বলেন—কয়েকটি জিনিস পর-নিন্দায় পড়ে না—(ক) অত্যাচারীর কথা বলা, (খ) ঘুষখোরের কথা বলা, (গ) অধার্মিকের কথা বলা। কোরআন বলে—"একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভ্রাতার মাংস খেতে চায়।" ৪৯ ঃ ১২। মহানবী বলেন—"আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যারা একে অপরের চর্চা করে।" তিনি আরও বলেন—"পরনিন্দা বড় পাপ।" মহানবীর মতে নামায রোযা কোনটাই হবে না—পরচর্চার অভ্যাস থাকলে।

৬৭। অধ্যবসায় সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ পবিত্র কোরআন বারবার ঘোষণা করেছে—"মানুষের জন্য এছাড়া কিছুই নেই, যা সে চেষ্টা করে।" ৫৩ ঃ ৩৯। মহানবীও বারবার সতর্ক করেছেন—"চেষ্টা আমার নিকট হতে ফল আল্লাহর নিকট হতে।" অর্থাৎ একটি ছাত্র অধ্যয়ন করবে, ফল তার পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষকের নিকট পাবেই। মহানবী

বলেন—"আল্লাহর নিকট ওই কাজ প্রিয়তম, যা বারবার সম্পাদন করা হয়।" অর্থাৎ যে কাজকে সমগ্র জীবন পালন করা যায়। মহানবী আল্লাহর দূত হওয়ার পরও যে অধ্যবসায় দেখিয়ে গেছেন, তা কল্পনাতীত।

৬৮। মধ্যপন্থায় মহানবী (দঃ) ঃ মহান কোরআন মধ্যপথ সম্পর্কে বলে—"তুমি বদ্ধমুষ্টি (অতিকৃপণ) হয়ো না, এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না।" ১৭ ঃ ২৯। "যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করে।" ২৫ ঃ ৬৭। মহানবী নিজেও সবসময়ই মধ্যপন্থাকেই প্রিয় মনে করতেন। তিনি বলেন—"কাজের ভেতর মধ্যপন্থাই উত্তম।" ধর্ম বিষয়েও তিনি বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। মহানবী তাঁর জীবনে প্রতিটি কাজেই মধ্যপন্থার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

৬৯। ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী যদিও অত্যন্ত কোমলচিত্ত ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি ভিক্ষাবৃত্তিকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি বলতেন—"ঊর্ধ্ব হস্ত নিম্ন হস্ত হতে উত্তম।" যে কোন লোক মহানবীর নিকট আসতেন কিছু ভিক্ষা করতে, মহানবী সর্বপ্রথম চিন্তা করতেন, কি করে তাকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করা যায়। বহুজনাকে তিনি কিছু পয়সা দিয়ে জীবিকা অর্জনের পথ ধরিয়ে দিতেন। এবং সবসময় বলতেন—"পরিশ্রমী আল্লাহর বন্ধু।" এই ভিক্ষা না করার জন্য তার অসংখ্য উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আছে।

৭০। উপহার গ্রহণে মহানবী (দঃ) ঃ মানুষের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মহানবী সবসময় সকলকে উৎসাহিত করেছেন। এবং সেই উৎসাহ দানের পেছনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। যেমন উপহার দেওয়া ও নেওয়া। তিনি বড়ই পছন্দ করতেন উপহার দেওয়া নেওয়াকে। কারণ উপহার মানুষের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে, প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলে। মিশরের অধিপতি সুন্দরী মারিয়া কিবতিয়াকে মহানবীর দাসী রূপে উপহার পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীর মুক্তির জন্য যাঁর আগমন, তিনি কাউকে দাস-দাসীরূপে রাখতে পারেন না, তাই তিনি মারিয়াকে ভার্যা রূপে গ্রহণ করে স্ত্রীর সম্মান দান করলেন। এইভাবে অন্যান্য বহু রাজা-বাদশাহ তাঁকে বহু উপঢৌকন পাঠাতে থাকেন, এবং তিনিও তাঁদের প্রীতি উপহার দেন। শুধু এই সম্পর্ক রাজা-বাদশাহের মধ্যে সীমিত ছিল না, গরিব দীন-দরিদ্রের মধ্যেও তিনি উপহার দিতেন ও নিতেন। মহানবী বলেন—"উপহার গ্রহণ করলে তার প্রতিদান দেবে।" পরস্পর পরস্পরকে উপহার প্রেরণ কর, কেননা তাতে হিংসা বিদূরিত হয়। কোন নারী তার প্রতিবেশিনী নারীকে মাংসের অভাবে ছাগলের খুর হলেও উপহার দিতে যেন অবজ্ঞা না করে।"

৭১। তোষামোদ সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী জীবনে তোষামোদ পছন্দ করতেন না। যে প্রশংসার যে যোগ্য নয়, তাকে সেইরূপ প্রশংসা করাই তোষামোদ করা হয়। তাই মহানবী বলতেন হযরত ঈসা (আঃ)-কে অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইজন্য তিনি বলতেন—"আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রসুল। আমি তোমাদের মতো মরণশীল মানুষ।" তিনি আরও বলেন—"কখনোও তুমি তোষামদকারীকে সমর্থন করো না, বা উৎসাহ দিও না, তাকে উৎসাহ দেওয়ার অর্থই হলো মিথ্যাকে উৎসাহ দেওয়া।

৭২। ক্রোধ সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ ক্রোধ সম্পর্কে মহানবী বলেন—"তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম, যে বিলম্বে ক্রোধান্বিত হয়, কিন্তু দ্রুত ক্রোধকে দমন করে। এবং নিকৃষ্ট ওই ব্যক্তি, যে হঠাৎ ক্রোধান্বিত হয়, এবং বিলম্বে তার ক্রোধ উপশম হয়।" "যে ব্যক্তি ক্রোধ প্রকাশের শক্তি থাকা সত্ত্বেও দমন করে, আল্লাহ্ তাকে প্রতিদান দেন।" তিনি বলেন—শয়তান হতে ক্রোধের উৎপত্তি, শয়তান নরকাগ্নি হতে সৃষ্ট, অগ্নিকে জল দ্বারা নেভাতে হয়, সুতরাং রাগান্বিত ব্যক্তিকে ওজু করতে বল। "দণ্ডায়মান অবস্থায় যে রাগান্বিত হয়, তাকে বসতে বল, নচেৎ তাকে শয়ন করতে বল, ক্রোধের উপশম হবে।" যে ক্রোধকে দমন করে, আল্লাহ্ তাকে পুরস্কার দেবেন। একটি মাত্র হারামকে ইসলাম খেয়ে ফেলার জন্য বিশেষ তাগিদ দিয়েছে, সেটা 'ক্রোধ'।

৭৩। গর্ব, অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘা সম্বন্ধে মহানবী (দঃ) ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে অহংকার মহাপাপ। এই পাপে ফেরেশ্‌তা শয়তানে পরিণত হয়েছে, ফেরাউন, কারুন, শাদ্দাদ প্রমুখের পতন হয়েছে। পবিত্র কোরআন বলে—"ওদের বলা হবে জাহান্নামে প্রবেশ কর, ওতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট অহঙ্কারীদের আবাসস্থল।" ৩৯ ঃ ৭২। "নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিক অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না।" ৪ ঃ ৩৬। "তোমরা পৃথিবীতে গর্ব ভরে চলো না।" ১৭ ঃ ৩৭, ৩১ ঃ ১৮, ৩৯ ঃ ৭২, ৪০ ঃ ৭৬। সুতরাং কোরআন বারবার মনুষ্যমণ্ডলীকে সতর্ক করেছে, তারা যেন গর্বিত না হয়। মহানবী বলেন—"স্বর্গবাসী হবে বিনয়ী মানুষ এবং নরকবাসী হবে গর্বিত ও অহঙ্কারী মানুষ।" তিনি আরও বলেন—সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান যার অন্তরে আছে, সে দোজখে যাবে না, এবং সরিষার দানা পরিমাণ অহঙ্কার যার অন্তরে আছে, সে বেহেশ্‌তে যাবে না।" তিনি বলেন—"অহঙ্কার মানবের অবনতির মূল।" কোরআন—৭ ঃ ১৪৬, ২৮ ঃ ৭৬, ৫৭ ঃ ২৩

গর্ব, অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘা সম্পর্কে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর, সে পরিষ্কারভাবে বলতে চায়—মানুষ তার বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা, শক্তি-সাহস, বল-বিক্রম, মান- যশ, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সমস্ত কিছু তুলে ধরুক ব্যতিক্রমবিহীন বীরত্বে, কিন্তু বিনীত চিত্তে। এই সাবধানবাণী সে সবসময়ই উল্লেখ করেছে; এখানে কাউকেই ক্ষমা করা হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দেখতে পাই, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা অতি নগণ্য, কুরাইশকুলের বিশাল বাহিনী, তাদের গর্বেরও কোন সীমা ছিল না। তারা ভেবেছিল—বদর প্রান্তরে যাওয়া মাত্রই মুসলমানদের এক ফুঁকে উড়িয়ে দেবে। গর্বের পরিণতি হিসাবে দেখা গেল নিজেরাই উড়ে গেল। আবার ওহোদ প্রান্তরে দেখি মুসলমানদের মনে গর্বের কোন দানা না বাধলেও কোথাও যেন তিল পরিমাণ আত্মশ্লাঘা দানা বেধেছিল, কিন্তু মহান আল্লাহ্ "কেউ অণু-পরিমাণ সৎকাজ করলে, তা দেখেন, এবং কেউ অণু-পরিমাণ অসৎ কাজ করলে, তাও দেখেন।" ৯৯ ঃ ৭-৮। তাই মুসলমানরা তাঁদের নবীর উপস্থিতিতেও কড়া উত্তর পেয়ে গেল। ইসলামের আল্লাহ্ এমন ন্যায়পরায়ণ বিচারক, যিনি তিল পরিমাণ আত্মশ্লাঘাও পছন্দ করেন না। আবার আমরা লক্ষ্য করি মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানগণ সুবিশাল বাহিনী নিয়ে মহানন্দে তায়েফের পথে যাত্রা করলেন। স্বয়ং হযরত আবুবকরের মতো ধীরস্থির মানুষও আনন্দে বলে উঠলেন—"এবার আমাদের সংখ্যা শত্রু অপেক্ষা অনেক বেশি।" অর্থাৎ আমরা

জিতবই। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানগণ যে ভাবে বিশাল বাহিনী নিয়ে বিপর্যস্ত হলো তার কোন নজির নেই ইসলামের ইতিহাসে। এখানেও আমরা লক্ষ্য করি কোথাও যেন আত্মশ্লাঘা দানা বেধেছিল অজ্ঞাতে। ইসলাম-জগতের প্রবাদ বাক্য—নবীবর হযরত ইউসুফ (আঃ) আপন সৌন্দর্যের জন্য একবার মনে করেছিলেন, আমাকে বিক্রি করলে (তখন দাসপ্রথা ছিল) কত টাকাই না হবে। এই আত্মশ্লাঘার জন্য আল্লাহ্ তাঁকে অতীব স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেখিয়ে দিলেন—গর্ব-অহঙ্কার-আত্মশ্লাঘা মানুষকে কত দ্রুত কত গভীর পতনেব সম্মুখীন করে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোন উন্নতমনা নরনারী যেন সতর্ক থাকে, সজাগ থাকে এই কালসাপ হতে। তাই কোরআনের দৃষ্টিতে, মহানবীর দৃষ্টিতে গর্ব অহঙ্কার তো দূরের কথা, আত্মশ্লাঘাও যে কোন ব্যক্তির, যে কোন পরিবারের, যে কোন সমাজের, যে কোন জাতির আশুপতনের জন্য যথেষ্ট কার্যকরী উপাদান বহন করে।

৭৪। **বংশ, জাতি বা দেশ সম্পর্কে মহানবী (দঃ)** ঃ বংশ, জাতি বা দেশের গৌরব অহঙ্কারেব অন্তর্গত। সুতরাং মহানবী এগুলোকে একেবারেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন—স্রষ্টা এক, সৃষ্টি এক, মানুষ এক। এতে কোন রকমের তারতম্য নেই, তারতম্য যদি কোথাও থাকে, সেটা আছে—তার আপন কথায়, কাজে ও চিন্তায়। তিনি বলেন—"যে বংশ বা জাতিব গর্ব করে, সে নরকের অঙ্গার সদৃশ।" সমগ্র বিশ্ব-মানবকে তিনি আপন কর্মের ওপর দাঁড়াতে বারবার উপদেশ দিয়ে গেছেন। পবিত্র কোরআনও ওই একই কথা ঘোষণা করে। কোরআন—২ ঃ ৪৮

মানব সমাজ লাগি বড় পরিতাপ
বংশ জাতের দাবি অতি বড় পাপ।
কর্ম যার নাহি জ্বালে জীবনবাতি
শুধাবে না কেহ তারে সে কোন জাতি।
জিজ্ঞাসা করে না প্রভু কোন দিন রোষে
কোন্ বংশে জন্ম নিলে কাহার ঔরসে।

মানুষ যেথায় থাক্ যে সমাজ মাঝে
আপনাকে গড়ে তোলে আপনার কাজে।
তুমি এ সমাজ বুকে ফুল যদি হও
ছড়াবে সুবাস তব যেখানেই রও।
আমি এ সমাজ বুকে অমানুষ হলে
শ্রেষ্ঠ আমার জাতি কি ফল বলে।

তুমি এ জগৎ বুকে চন্দ্র যদি হও
ছড়াবে তোমার জ্যোতি যে জাতেই রও।

৭৫। **লজ্জা সম্বন্ধে মহানবী (দঃ)** ঃ মহানবী বলেন—"লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। লজ্জা ঈমান হতে আসে, ঈমান স্বর্গ হতে, নির্লজ্জতা আসে হৃদয়হীনতা হতে, হৃদয়হীনরা নরকে অবস্থান করে।" তিনি আরও বলেন—"লজ্জা মানুষকে সম্মানিত করে, নির্লজ্জা মানুষকে অপমানিত করে। লজ্জাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। লজ্জা মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল করে না।"

৭৬। **ভীরুতা সম্পর্কে মহানবী (দঃ)** ঃ মহানবী বলেন—"মানুষের ভেতর নিকৃষ্ট দোষ—অতিবিক্ত কৃপণতা ও অত্যধিক ভীরুতা।" তিনি বলেন—"হে আল্লাহ্ ভীরুতা হতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।" আল্লাহ্ যার রক্ষক তাকে কেউ সংহার করতে পারে না। আল্লাহ্ যার সংহারক, তাকে কেউ রক্ষা করতেও পারে না। সুতরাং মৃত্যুর সময় যখন অবধারিত, তখন মৃত্যুকে ভয় না করে আল্লাহ্কে স্মরণ কর। মহানবীর সমগ্র জীবনই এর প্রমাণ। কোরআন—৩ ঃ ১৪৫

৭৭। হিংসা সম্বন্ধে মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী বলেন—"হিংসা ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতি সকলকেই নষ্ট করে।" তাই উপদেশ দিয়েছেন—"হিংসা বিদ্বেষ হতে সতর্ক হও, কেননা এটা সদগুণকে ধ্বংস করে, যেমন অগ্নি কাঠকে ভস্মীভূত করে।"

৭৮। আশা সম্বন্ধে মহানবী (দঃ) ঃ মহান কোরআন বলে—"আল্লাহর দয়া হতে নিরাশ হয়ো না।" ৩৯ ঃ ৫৩। মহানবী বলেন—"আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়, কিন্তু তার দুটো স্বভাব বৃদ্ধ হয় না, তার অর্থের লালসা ও জীবনের আশা।"

৭৯। ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী বলেন—"আদম সন্তানের জন্য যদি দুটো স্বর্ণ-পর্বততুল্য ধন-সম্পত্তি থাকত, তবে নিশ্চয়ই সে তৃতীয়টির প্রার্থী হতো। মৃত্তিকা (কবর) ব্যতীত কোন কিছুই আদম সন্তানের উদর পূর্ণ করতে পারে না।"

৮০। কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী বলেন—"যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়।" মহানবী বড়ই কৃতজ্ঞচিত্ত ছিলেন। তিনি বলেন—"যাকে চারটি গুণ দেওয়া হয়েছে, তাকে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল প্রদান করা হয়েছে—কৃতজ্ঞচিত্ত, জেকেরকারী রসনা, বিপদে ধৈর্যশীল মন, বিশ্বাসী সতী স্ত্রী।"

৮১। উৎকোচ গ্রহণ সম্পর্কে মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী বলেন— "উৎকোচ গ্রহণ মহাপাপ।" তিনি উৎকোচ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন। সরকারি পদে থাকার সময় যে কোন রকমের বস্তু গ্রহণ করাকে তিনি উৎকোচ নেওয়া বলেছেন। তিনি বলেন—"সরকারি চাকরি করার সময় কেন ঘরে বসে উপঢৌকন বা উপহার নেওয়া হয়—এগুলো সবই উৎকোচ।" এবং এগুলোকে তিনি অবৈধ বা হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন—"আমরা যাকে যে পদে নিয়োগ করি, তার জন্য তাকে বেতন দেওয়া হয়, তদুপরি সে যা গ্রহণ করে তা ঘুষ বা বিশ্বাসঘাতকতা।" তিনি গভর্নর মোয়াজকে বলেন—"আমার অনুমতি ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করো না, কেননা তা বিশ্বাসঘাতকতা।" তিনি বলেন—"হে মানব, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোন পদে নিযুক্ত হয়, এরপর সে যদি একটি সূচও গ্রহণ করে, সে বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর।"

৮২। প্রতারণা সম্পর্কে মহানবী ঃ মহানবী বলেন—মানবজীবনে প্রতারণা মহাপাপ। তিনি বলেন—"যে প্রতারণাহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে স্বর্গে প্রবেশ করে।" "যে প্রতারণা করে, সে অভিশপ্ত।" কোরআন বলে—"আল্লাহ্, প্রতারকের প্রতারণা সফল করেন না।" ১২ ঃ ৫২। "প্রতারকগণ নরকের নিম্নস্তরে থাকবে।"কোরআন—৪ ঃ ১৫৫

৮৩। অভিসম্পাত সম্পর্কে মহানবী ঃ মহানবী বলেন—"কোন মোমিন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ অভিসম্পাতকারীও হতে পারে না।" তিনি বলেন—"একে অন্যকে অভিসম্পাত করো না।" তিনি বহু যন্ত্রণাতেও জীবনে কাউকে অভিসম্পাত করেননি। তিনি কোন অভিসম্পাতকারীর নিকট কোন সাক্ষীও গ্রহণ করতেন না।

৮৪। ব্যভিচার, কাম প্রবৃত্তি সম্বন্ধে মহানবী ঃ মহানবী বলেন—"আমি তার স্বর্গের দায়িত্ব নিতে পারি, যে তার জিহ্বা ও গুপ্ত অঙ্গের দায়িত্ব নিতে পারে। মুক্তির জন্য তিনটি গুণ ও ধ্বংসের জন্য তিনটি দোষ আছে। মুক্তির জন্য তিনটি—(১) প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্কে ভয় করা, (২) সন্তুষ্টিতে হোক আর অসন্তুষ্টিতে হোক সত্য কথা বলা।

(৩) সম্পদে হোক আর দারিদ্র্যে হোক মিতাচারিতা। এবং ধ্বংসের জন্য তিনটি—(১) কাম প্রবৃত্তির অনুগামী হওয়া, (২) অতিরিক্ত কৃপণতা, (৩) অহঙ্কার।" মহানবী বলেন,—"আমার কওমের জন্য সবচেয়ে বেশি ভয় করি—কাম প্রবৃত্তি ও দীর্ঘ আশার জন্য। সম্ভব হলে আপন স্ত্রী ও কন্যা ব্যতীত অন্য কারও চুল পর্যন্ত তোমার দৃষ্টিতে এনো না। তোমরা কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে একলা দেখা করতে যাবে না। যতক্ষণ তার কোন নিকট আত্মীয় সঙ্গে না থাকে। শেরেক এর পর ব্যভিচার অপেক্ষা বড় পাপ আর নেই। নর-নারীর অবৈধ মিলনই ব্যভিচার। একমাত্র ব্যভিচারই সত্তর বছরের এবাদত (উপাসনা) ধ্বংস করে। ব্যভিচার দারিদ্র্যতা সৃষ্টি করে, মুখের জ্যোতি হরণ করে এবং আয়ু হ্রাস করে। হে আলি! যদি দৈবাৎ কোন রমণীর প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ে, তবে দ্বিতীয় বার তার প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। কারণ প্রথম দৃষ্টি বৈধ হলেও দ্বিতীয় দৃষ্টি অবৈধ। পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে এতই কঠোর যে, ব্যভিচার করা তো দূরের কথা, ব্যভিচারের নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করেছে। তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।" ২৪ ঃ ২, ১৭ ঃ ৩২, ৪ ঃ ১৫। ব্যভিচারের নিকটবর্তী হলে সাধারণত মানুষের পদস্খলন ঘটে যায়। তাই কোরআনের মহা সতর্কতা।

৮৫। স্বপ্ন সম্পর্কে মহানবী ঃ মহানবী বলেন—"উত্তম স্বপ্ন বা সত্য স্বপ্ন নবুয়তে (ঐশীর) ১/৪০/১/৪৬ অংশ। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে সে যেন পার্শ্ব পরিবর্তন করে। আমাকে যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে, সে সত্যই আমাকে দেখে, কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। মন্দ স্বপ্ন কাউকে বলবে না।"

৮৬। সৎ চিন্তা সম্বন্ধে মহানবী ঃ সৎ চিন্তা সম্পর্কে মহানবী অসংখ্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর একটি সর্বসার বাণী ঃ "এক ঘণ্টার সৎচিন্তা এক বছরে এবাদৎ আরাধনা হতেও উত্তম।" তিনি বলেন—"আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করো, কিন্তু তাঁর জাত সম্পর্কে চিন্তা করো না। কেননা তা তোমার চিন্তা শক্তির বাইরে।"

৮৭। বিবাদ-বিসংবাদ সম্পর্কে মহানবী ঃ তিনি বলেন—"যে বিবাদ সৃষ্টি করে, সে স্বর্গে যাবে না।" তিনি বলেন—"রোযা হতেও অধিকতর উত্তম, বিবাদে শান্তি আনয়ন।" কোরআন শিক্ষা দেয়—"শান্তির পর পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করো না।" ৭ ঃ ৫৬। "তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুসরণ কর, বিবাদ-বিসংবাদ করো না।" ৮ ঃ ৪৬। মহানবী এককথায় ঘোষণা করেন—"মুসলমান ওই ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা হতে অন্যজন নিরাপদ থাকে।"

৮৮। কৃতকার্যতায় মহানবী ঃ যে গুণগুলো মোটামুটিভাবে তাঁর চরিত্রে বর্ণনা করা হলো, ওই গুলোই তাঁর শরীরে ছিল এক একটি সৈনিক স্বরূপ, যে সৈনিকগুলো তাঁকে জীবনের কৃতকার্যতার এক অভাবনীয় স্তরে নিয়ে গেছে। যে কোন মানুষ এই গুণগুলির কিছু অংশ অনুশীলন করলেই জীবনে বহুল অংশে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারে। তাই মহানবীর জীবন অনুসরণের জীবন, অনুধাবনের জীবন, নিছক শুধু আলোচনার জীবন নয়।

৮৯। শাস্ত্রীয় বিধিবিধানে মহানবী ঃ ইসলাম ধর্মের মূল লক্ষ্য—স্রষ্টার সঙ্গে জীবশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির (মানুষের) মিলন। আল্লাহর সঙ্গে মানবাত্মার দিদার বা মিলনের জন্য

প্রয়োজন পবিত্র বা শুদ্ধ আত্মার। এই পবিত্র বা শুদ্ধ আত্মা গঠনের জন্য প্রয়োজন ধর্মের কতকগুলো বিধিবিধান বা অনুশাসন ও অনুষ্ঠানের। এগুলো উপলক্ষ। যেমন—

(ক) কলমা—স্বীকৃতি বাক্য, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। এই স্বীকৃতি বাক্যে মহানবী ছিলেন আপসহীন।

রাখিয়া "তওহীদ্ রব্" হৃদয়ে বন্দী
সেখানে মানোনি কোন সর্ত সন্ধি।

(খ) নামায—মহানবীর প্রতি নামায প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার পর তিনি জীবনে একদিনও নামায ত্যাগ করেননি। নামায ফারসী শব্দ, আরবী 'সালাত'। এর আভিধানিক অর্থ দগ্ধ করা; পরিভাষাগত অর্থ এটা পাশবিক প্রবৃত্তিকে দগ্ধ করে। প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমান নরনারীর জন্য দিবারাত্রি পাঁচবার নামায পড়া ফরজ (অবশ্য করণীয়)। কোরআন বলে—তোমরা নামায কায়েম কর। ১১ ঃ ১১৪। এইভাবে কোরআন ৮২ স্থানে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছে। মহানবী বলেন—"নামায ধর্মের স্তম্ভ।" "যে নামায ত্যাগ করে, সে আমার নয়।" সুতরাং মহানবীর কথায় নামায ব্যতীত কেউই মুসলমান হতে পারেন না।

কোরআন—২০ ঃ ১৩০, ১৩২।

(গ) রোযা—রোযা ফারসী শব্দ, আরবীতে 'সওম্' বলা হয়। অর্থ সমস্ত কুচিন্তা ও কুকাজ থেকে বিরত থাকা। ইসলামি বিধানে রমজান মাসে উপবাস ব্রত পালন করতে হয়। কোরআন বলে—"হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের প্রতি রোযা বিধিবদ্ধ হলো।" ২ ঃ ১৮৩। মহানবী এই একমাস উপবাস ব্রত পালন করার পরও অন্য সময়ে আরও নফল রোযা রাখতেন। রমজান মাসে প্রত্যেক সুস্থ সবল মুসলমানদের জন্য রোযা রাখা ফরজ।

(ঘ) যাকাত—এর অর্থ শুদ্ধিকরণ। কারও নিকট পূর্ণ এক বছর কাল নেসাব পরিমাণ টাকা সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে গরিবকে দান করাকে যাকাত বলে। এটা ফরজ (অবশ্যই করণীয়)।

(ঙ) হজ—পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করার পর মক্কায় যাতায়াতের খরচ-খরচা করার মতো সক্ষম ব্যক্তির জন্য হজ করা ফরজ (কাবা দর্শন ও জিয়ারত)। এটা শুধু সচ্ছল ব্যক্তির জন্য। কেননা বহু ধর্মে বিশ্বাস আছে, প্রয়োগ নেই, অনুষ্ঠান আছে, আচরণ নেই (অর্থাৎ Preaching আছে Practice নেই।)

(চ) ধর্ম সম্পর্কে মহানবী—মহানবী সমগ্র বিশ্ব-সমাজ ও বিশ্ব-সৃষ্টিকে সৎপথে শান্তির সঙ্গে সুখ-সমৃদ্ধ সহ পরিচালিত করার যে পথ ও পন্থা বেছে নিলেন—তারই নাম ইসলাম। কঠোর সাধনা ও কঠিন কর্মের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর এই ব্রতকে রূপ দিয়ে গেছেন। এই রূপায়ণের সিংহ ভাগই ছিল—মানুষের কর্মময় জীবন। তাঁর চোখে জাগতিক কর্ম ও ধর্মের মধ্যে এতটাও পার্থক্য ছিল না। এই পার্থক্যটা অযৌক্তিক ও অবাস্তব। মূল উদ্দেশ্য ছিল কর্মের ভেতর দিয়ে জীবনকে সুন্দর রূপে দেখা। এই কর্মকে সুবিন্যস্ত করার যে ধারা অবলম্বন করলেন, তা-ই ইসলাম। এখানে মানবজীবনের কর্মকেই যদি ইসলাম থেকে কেটে বাদ দেওয়া যায় তাহলে ইসলামের বাকি থাকল কি। তাই ইসলাম ধর্মের কর্ম ও ধর্ম পৃথক সত্তাধারী বলে কিছু নেই। যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁরা বড় বড় দার্শনিক

হতে পারেন। তবে মহানবীর মূলচিন্তার সঙ্গে তাঁদের কোন যোগ নেই। মহানবী অতি সহজ ভাষায় এই কঠিন সত্যকে বুঝিয়ে গেছেন। তিনি বলেন—"সৎ কর্মমাত্রই ধর্ম বা এবাদত, চাষী আপন পরিবার প্রতিপালনের জন্য জমি চাষ করেন, স্বামী আপন স্ত্রীর সঙ্গে যে প্রেমালাপ করেন—এটাও এবাদত বা উপাসনা।"

মহানবী বলেন—"ইসলামের এবাদতের দশটি অংশ আছে, তার মধ্যে নয়টি কেবল হালাল রুজির মধ্যে পড়ে।" তাই ইসলাম ধর্মে সত্যকথা ও হালাল রুজি সূর্য ও চন্দ্রের মতো। তাহলে ইসলামের আল্লাহর নিকট মানুষের উপাসনা এবাদত কি। তা সহজেই বোঝা গেল, মানুষের সৎ কর্মবাদী হওয়া। মহানবী ছিলেন সেই মহান জীবনশিল্পী। মানবজীবনকে সমস্ত মানবিক গুণে রূপায়িত করার তিনি ছিলেন রূপকার। এই-ই ছিল তাঁর ধর্ম।

৯০। ওয়াকফ (মুসলিম দেবত্ব) সম্পর্কে মহানবী ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেন—আমার পিতা বিজিত খাইবার এলাকায় কিছু জমি লাভ করলেন, তিনি মহানবীকে বলেছিলেন—আমি খাইবার এলাকায় অতি উত্তম জমি লাভ করেছি। এটাই আমার সর্বোত্তম জমি। আমি একে আল্লাহর পথে দান করতে ইচ্ছা করি। এবং এ সম্পর্কে আল্লাহর আদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা করি। মহানবী বলেন—আপনি ইচ্ছা করলে মূল জমিটি ওয়াকফ করে ওর উৎপন্ন ফসল দান-খয়রাতে ব্যয় করতে পারেন। ওমর তাই করলেন। এবং ওয়াকফ-নামা দেখালেন এইভাবে—"আমার অমুক জমি ওয়াকফ (কিয়ামত পর্যন্ত)। মূল জমি বিক্রি করা যাবে না, হেবা করা যাবে না। ওর ওপর উত্তরাধিকারের স্বত্ব স্থাপন করা যাবে না। ওর উৎপন্ন ফসল গরিব-মিসকিন্, আত্মীয়-স্বজনকে দান করা হবে, ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ব্যয় করা হবে। আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য ব্যয় করা হবে, পথিক ও মুসাফিরের জন্য ব্যয় করা হবে। যে ব্যক্তি ওর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত হবে সেও ওই উৎপন্ন হতে আবশ্যকানুযায়ী ভোগ করতে পারবে। আবশ্যক বোধে স্বকীয় কোন বন্ধুকেও খাওয়াতে পাববে। কিন্তু সে ওকে নিজ সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করতে পারবে না।"

ওয়াকফ আরবী শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ—কোন জিনিসকে সে যে অবস্থাতে আছে তাকে ঠিক সেই অবস্থাতে আটকে দেওয়া, যাতে তাকে কেউ নষ্ট করতে না পারে। এর যিনি সেবাইত তাঁকে আরবী বা ইসলামে পরিভাষায় মাতুয়াল্লি বা অভিভাবক বলা হয়। বর্তমানে ওয়াকফকে দুই শ্রেণীতে দেখা যায়। একটি ওয়াকফ লিল্লাহ, অর্থাৎ যার সমস্তটাই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হবে, অন্যটি ওয়াকফ-আল্ আওলাদ, অর্থাৎ যার $^{১}/_{৫}$ আল্লাহর রাস্তায় ও বাকি বংশধরদের জন্য ব্যয় হবে কিন্তু বর্তমান মাতুয়াল্লিগণ ওয়াকফের মূল উদ্দেশ্য থেকে বহু দূরে বিক্ষিপ্ত।

৯১। তকদির (অদৃষ্ট) সম্পর্কে মহানবী ঃ মহানবী মক্কা থেকে মদিনা যাত্রাকাল পর্যন্ত তিনি কিভাবে তাঁর সাধনাকে চালিয়ে গেছেন, একটু লক্ষ্য করলেই অতি অনায়াসেই বোঝা যায়, মহানবীর তকদিরবাদ কি ছিল। কুরাইশদের শত অত্যাচারেও মহানবী আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন—তিনি যাকে ইচ্ছা পথ দেখাবেন, যাকে ইচ্ছা দেখাবেন না। মহানবী ইসলামের বা বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পরিষ্কার বলেছেন—"বিশ্বাস ও কর্ম" এই দুয়ের মিলনেই ঈমান। এই দুটো যার নেই, তার ঈমান নেই। এককথায় ইসলামের তকদির

যেমন গর্ব অহঙ্কারে মত্ত নাস্তিকের জড়বাদও নয়, তেমনি অলস কর্মবিমুখ কাপুরুষের অদৃষ্টবাদও নয়। এতএব ইসলামের 'তকদির বিশ্বাস ও কর্মের এবং নির্ভর ও সাধনার শুভ মিলন। এই মিলনেই ইসলাম নরনারীর কাছ থেকে পেতে চায় কর্মরূপী সুসন্তান।'

মহানবী সতর্ক করেছেন—"আমার উম্মতের মধ্যে দু'দলের জন্য ইসলামে কোন অংশ (স্থান) নেই। ওরা 'কাদরিয়া', যারা বলে কার্যের দ্বারাই অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত হয়। তকদির বলে কিছু নেই। এবং 'মরজিয়া', যারা বলে—ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, কাজ করে কি হবে। তিনি বলেন—কাজ আমার হাতে, ফলাফল আল্লাহর হাতে।

জীবন একটি বৃক্ষ। মালি তার সেই বৃক্ষধারী মানুষ। মালিক তার বিধাতা পুরুষ। মালির কাজ বৃক্ষটিকে দৈনিক সযত্নে জলসিঞ্চনে লালন পালন করা, ফুল ফুটবে কিনা, সেটা মালির হাতে নেই।

জীবন উদ্যানে আমি জল দিয়ে যাই
কভু না চেষ্টায় রই কুসুম ফুটাই।

৯২। মধ্যপন্থায় মহানবী ঃ মহানবী সবসময়ই মধ্যপন্থা ভালবাসতেন। তিনি বলতেন—ভীরু হয়ো না, অহঙ্কারীও হয়ো না, বিনীত হও। কৃপণ হয়ো না, অপব্যয়ীও হয়ো না। মিতব্যয়ী হও, চেষ্টা কর এবং আল্লাহব ওপর নির্ভর করো। আমরা অনেক সময় দেখি—অনেক মহাপুরুষ একবারেই অতি মাত্রায় এগিয়ে যান। মহানবীর জীবনে এটা ঘটেনি। তিনি এই জগতের মানবজীবনের উত্থানপথে সকল কিছুর সমন্বয় সাধন করেছেন। সংসারের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করেই বিরাগীর পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছেন। অন্যান্যদের মতো সন্তানের জন্ম না দিয়েই 'জনক' (ফাদার) হননি, বা বিয়ে না করেই স্বামী হননি। এই মধ্যপন্থাকে অনুসরণ করার জন্যই তিনি বারবার নির্দেশ দিয়েছেন—'আস্‌সোলহুন্‌ খাইরুন'—সন্ধি বা মীমাংসা ভাল জিনিস। অর্থাৎ এককথায় ইহকাল হতে পরকালের এবং পরকাল হতে ইহকালের ভারসাম্য রক্ষা করতে যেমন অসাধারণ কৃতকার্যতা লাভ করেছেন, তেমনি মানবসমাজের ও মানবজীবনের মধ্যে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে অফুরন্ত সফলতা অর্জন করেছেন। তাই মহানবী ছিলেন—সমগ্র মনুষ্যকুলের সর্বাপেক্ষা ভারসাম্য রক্ষাকারী মানব। কি চমৎকার জীবন—সকল সূফীর শ্রেষ্ঠ সূফী, আবার সকল সংসারীর শ্রেষ্ঠ সংসারী। সকল রাজার শ্রেষ্ঠ রাজা, আবার বিদায় বেলায় এ বিশ্বের নিঃস্ব মানব। তাই মহানবী মধ্যপন্থায় মানব-কুলের শ্রেষ্ঠতম মানব।

৯৩। পবিত্র কোরআনে মহানবী ঃ মহানবী বলেন—"আমি এমন কোন আদেশ দিইনি, যেটা কোরআন নিষেধ করেছে। এমন কোন নিষেধ করিনি, যেটা কোরআন আদেশ করেছে।" অর্থাৎ তিনি মানবমণ্ডলীকে একবাক্যে একমনে পবিত্র কোরআনকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও তারা আপাত মঙ্গল খুঁজে না পায়, কেননা কোরআন বলে—

ভাব যারে কালো তুমি সেই তব ভাল
ভাব যারে ভাল তুমি সেই তব কালো।
জানেন যা খোদাপাক তোমরা জান না
করেন মঙ্গলই শুধু কেন হে মান না। কোরআন—২ ঃ ২১৬

মহানবী ইহলোক ও পরলোকের জ্ঞানজগতের সম্রাট হয়েও নির্বিচারে, নিরাভরণ অবস্থায় চরম তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি সহকারে পবিত্র কোরআনকে শুধু মেনেই নেননি, মহাপরীক্ষায় প্রয়োগ করেছেন নিজের জীবনে। তিনি ছিলেন বিশ্বনিয়ন্তার বাণীর (কোরআনের) ব্যবহারিক বাস্তব রূপ।

৯৪। আল্লাহ্ বিশ্বাসে মহানবী : মহানবী জীবনের সর্বক্ষেত্রে আপস-মীমাংসা-সন্ধি ইত্যাদিকে অত্যন্ত ভালবেসেছেন। শুধু একটি স্থানে তিনি ছিলেন আপসহীন কঠোর মানুষ, যেখানে কোন শক্তিই কোন কিছুই তাঁকে এতটুকুও নত করতে পারেনি। বরং সকলেই তাঁর কাছে নত হয়েছে। সেই স্থানটিতে আছেন, বিশ্বজোড়া পরিব্যাপ্ত যাঁর আসন, নিত্য বিরাজিত যিনি চির বিদ্যমান, অর্থাৎ আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, নেই কোন উপাস্য তিনি ব্যতীত। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

৯৫। মৃত্যুর দুয়ারে মহানবী : শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে শেষ নবীর শেষ বাণী—"সাবধান আল্লাহর আরাধনা নামায, সাবধান গরিব মানুষ।"

৯৬। যোগসূত্রে মহানবী : ইসলাম বিশ্ব মুসলমানের ও বিশ্বমানবের যোগসূত্র। ইসলাম সর্ব মানবের মিলনায়তন এবং মহানবীজী যার পথপ্রদর্শক। কোরআন যার বাণী বাহক। হাদিস যার ব্যাখ্যাকারী। মদিনার বুকে মহানবীজী সর্বপ্রথম কিসের পরিচয় দিলেন। বিশ্ব একাত্মতার, বিশ্বমিলনের ও বিশ্ব যোগসূত্রের স্রষ্টা রূপে। তিনি বিশ্ব-মানব মিলনের মহাপরিচয় দিলেন পরকে ঘর করে, অপরকে আপন করে, এমনকি আপন ঘরকেও একান্ত ঘনীভূত করে। এককে একত্রিত করে। হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলি কেউ বা শ্বশুর কেউ বা জামাই।

তদানীন্তন মুসলমানদের সমস্ত উপাধি ও আখ্যাগুলোকে বিলোপ ও বাতিল করে বজ্রকণ্ঠে একটি নামে ঘোষণা করলেন—"তোমরা মুসলমান, তোমাদের ধর্ম ইসলাম। তোমাদের নবী মহম্মদ (দঃ), তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্।" এই ভাবে ইসলাম একদিন বিশ্ব-মুসলমানকে এক হতে একত্রিত করেছিল।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার পূর্বে মহানবী (দঃ) বিশ্ব মহামিলনের কি মহান স্বপ্নই দেখেছিলেন। তিনি তাঁর মহান স্বপ্নকে সংসারের কঠিন মাটিতে সমাজ জীবনের বাস্তব নিরিখে সত্যে রূপও দিয়েছিলেন। মদিনার বহু ধর্ম ও বর্ণকে সামঞ্জস্যময় সম্মানজনক শান্তি-সন্ধির মধ্যে টেনে এনে সকলকেই বুঝিয়ে দিলেন—ইসলামের মূল লক্ষ্য বিচ্ছেদ নয় মিলন, বিবাদ নয় বন্ধন, সংঘর্ষ নয় সংহতি, ধ্বংস নয় প্রগতি। এবং সকলকে নিয়েই সৃষ্টি করলেন—এ বিশ্বের প্রথম জাতি-সংঘ বা U. N. O ; যাকে বলা হয় Common Wealth. কি অপূর্ব বিশ্বমিলন, কি অপরূপ বিশ্বমিলনের দৃশ্য ও শুভ সূচনা।

সুতরাং মুসলমানদের একান্তভাবেই মনে রাখা প্রয়োজন—ইসলাম বিশ্ব মুসলমান হতে বিশ্ব-মানবের মহামিলনের মহান যোগসূত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইসলাম যেন আজ মুসলমানদের মধ্যেই মিলনের স্বর্গীয় 'সেতু' হতে অনেক স্থানেই বিচ্ছেদের শয়তানী 'হেতু' হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি দুর্ভাগ্য, কি পরিতাপ, কি ভাগ্য বিপর্যয়! মুসলমানগণ একবার বুকে হাত দিয়ে বলুন—দ্বীনের নবী, আল্লাহর রসুল। মহানবীজী কি এই চেয়েছিলেন!

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন কি বলে—"তোমরা স্বীয় ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। ৪ ঃ ১৭১। মহানবীজী বলেন—"তোমরা কি জান, কোন জিনিস ইসলামকে ধ্বংস করবে? আলেমদের ভুল ও জেদাজেদি এবং তর্কবিতর্ক," পবিত্র কোরআনের আদেশ বা নিষেধকে মুসলমানদের জন্য মানাটা ফরজ। এবং ফরজ ত্যাগ করলে সে ব্যক্তি আর মুসলমানই থাকে না। সুতরাং ধর্মের ব্যাপারে যারা বাড়াবাড়ি, জেদাজেদি ও তর্কবিতর্ক ত্যাগ করে না, তারা কোরআন অমান্যকারী। এবং যারা স্বেচ্ছায় কোরআন অমান্যকারী, তারা মুসলমান নয়। তারা মহানবীজীর কথায় ইসলামের ধ্বংসকারী। মহানবীজী আরও বলেন—"ভালোর ভাল, সবের ভাল আলেমগণ। খারাপের খারাপ, সবচেয়ে খারাপ ওই আলেমগণই।" আলেমগণের একদল ইসলামের দেহটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, আর একদল তার প্রাণটিকেই হত্যা করছেন।

একটি যুবক ও যুবতীকে এক করেছে তাদের বিবাহ। ঘর-সংসার করতে গেলে মাঝে মধ্যে মনোমালিন্য তো হবেই। তাই বলে পবিত্র বিবাহ বন্ধনটিকে বধ করা যাবে না কথায় কথায়। অনুরূপ ভাবেই ইসলাম মুসলমানদের করেছে একত্র ও ভাই-ভাই। তর্ক-বিতর্কে একে অপরের ইসলামকেই বধ করলে আর থাকল কি! যুবক-যুবতীর বিবাহের মতো ইসলামই তো মুসলমানদের মিলন সেতু।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, ইসলামের বা মহানবীজীর জীবনের কিছু কিছু ঘটনারাশি বা নীতিমালা (যেমন বক্ষ বিদারণ, মিলাদ, কিয়াম, কদম্বুসী, মেরাজ, বেশভূষা, অলি-আওলিয়া, পীর-ফকির বা ধর্মের বহু আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি প্রভৃতি)-কে কেন্দ্র করে তাঁর উম্মত বা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশকিছু মৃদু ও কঠোর মতপার্থক্য দেখা যায়। অনেক সময় তা সভ্যতা ও শান্তির সীমানাকেও ছাড়িয়ে যায়। এমনকি যা স্বধর্মী হতে বিধর্মীর চোখেও খুবই নিন্দনীয় বোধ হয়। ইসলামের বাহ্যিক জগৎকে নিয়ে তাঁরা তার অন্তর জগৎ প্রাণ-শক্তিকেই ক্ষতবিক্ষত করেন। প্রকৃত কোরআন চর্চায় মানুষ উদার হয়, এবং প্রকৃত হাদিস চর্চায় মানুষ মধ্যমপন্থী হয়।

যদি কেউ মনেপ্রাণে মহানবীজীকে ভক্তি করেন ও ভালবাসেন, অকৃত্রিম প্রাণে তাঁর মূল লক্ষ্যকে মনে রেখে তাঁর জীবনাদর্শকে মাথায় তুলে নেন, দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর ভালবাসার জন্য সব ভুলে যান, নির্দ্বিধায় সব বিতর্ককে ত্যাগ করেন; সবার উর্ধ্বে অন্ধের মতো কতকগুলো উপলক্ষকে নিয়ে নবীজীর সুমহান মূল লক্ষ্যকে বধ না করেন, তাহলে তাঁকে একটি কথা অতি অবশ্যই মনে রাখতেই হবে যে, মুসলমান হয়ে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মকে নিয়ে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে সংঘর্ষে না গিয়ে ইসলামকে ও ইসলামের মর্মবাণীকে মুসলমানদের মধ্যে মিলনের এক মহান যোগসূত্রের সক্ষম, সবল ও সুদূরপ্রসারী হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

মহানবীজী বলেন—"মানুষের কার্যাবলী তার মূল লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে"। এবং লক্ষ্য প্রাণ পায় বা প্রকাশিত হয় কাজের মাধ্যমে, কাজ পরবর্তীকালে অমরত্বে প্রাণ পায় ভাবীকালের অগণিত মানুষের আদর্শরূপে। যাঁরা মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের বড়দান যোগসূত্রের কথাই ভুলে যান, যেখানে ভুলে হোক, ভ্রান্তিতে হোক বড় রূপে দেখা দেয় জেদাজেদি, ফলত তখন তাঁরা আল্লাহ্ ও রসুল এবং কোরআন ও হাদিস এর মূল বক্তব্য

বা মহানবীজীর মূল লক্ষ্য বা আদর্শকেই ভুলে যান। তাঁরা তখন নবীজীর লক্ষ্যচ্যুত ও আদর্শচ্যুত উম্মত, তাঁরা যাঁরাই হোন, তাঁরা কি মুসলমান!

কোরআন---২ ঃ ১৯১, ২১৭, ৩ ঃ ১০৩, ১০৫, ৪ ঃ ৫৯, ৭ ঃ ৮৬, ১০৩, ৮ ঃ ৪৫-৪৬, ১০ ঃ ৮১, ২৮ ঃ ৭৭

৯৭। **সমগ্র মানবজাতির মহানবী ঃ** "আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।"

কোরআন—৩৪ ঃ ২৮

তুমি যে অখণ্ডময়ের অখণ্ডিত দূত
তোমারে খণ্ডিত করে কেটে করি খুঁত।
সীমিত সম্মানে বেঁধে আপন গোত্রের
অসম্মান করা হয় জগৎ দূতের।

•কোরআন—৪ ঃ ১৬৫, ১৭ ঃ ১০৫, ২৫ ঃ ৫৬

৯৮। প্রার্থনায় মহানবী (দঃ) ঃ

১। বিদ্যা ও জ্ঞান সম্পর্কে ঃ মাগিছি কাতর প্রাণে করুণা তোমার
বৃদ্ধি কর বিদ্যা বল হে খোদা আমার।
বুকেতে বাসনা আর ধমনীতে ধ্যান
হে বিশ্ব পালক মম বৃদ্ধি কর জ্ঞান।

২। সত্য বলা সম্পর্কে ঃ দাও আল্লাহ্ সেই প্রাণ যে প্রাণ পরে
ক্লেশ নাই কষ্ট নাই সত্য বলিবারে।

৩। হালাল রুজি সম্পর্কে ঃ দাও আল্লাহ্ সেই পথ যে পথ খুঁজি
যে-পথ সহজে আসে হালাল্ রুজি।

৪। স্বাস্থ্য সম্পর্কে ঃ দেহকে দৈন্যের হতে রাখিয়া সুস্থির
সকল কাজেতে আল্লাহ্ কর কর্মবীর।
দাও আল্লাহ্ রোগশূন্য দেহের ভূমি
করিতে কর্তব্য মোর করণ চুমি।

৫। কার্য সম্পর্কে ঃ প্রশস্ত পবিত্র কর হৃদয় আমার
সরল সহজ কর কার্য ধরার।

৬। গরিব সম্পর্কে ঃ দাও আল্লাহ্ সেই মন দিনে ও রাতে
সুখে দুঃখে মিশে থাকি গরিবের সাথে।

৭। শিশু সম্পর্কে ঃ দাও মোরে সেই শিশু যে শিশু পারে
দুর্গতি মানবেরে কোলে তুলিবারে।
দাও আল্লাহ্ শিশু সুচরিত্রবান
মুখেতে সত্য কথা মনেতে বিদ্বান।
দাও আল্লাহ্ সেই শিশু করিতে কল্যাণ
তুলিতে জগৎ জুড়ে তোমার নিশান।

৮। আল্লাহ্‌কে ধরা সম্পর্কে : দেখি না তোমাকে বিনা কোথাও ভূমি
আকাশ পাতাল মর্ত্য সবই যে তুমি।
ধরিব তোমাকে ছেড়ে কাহার দুয়ার
আকাশ পাতাল মর্ত্য সবই যে তোমার।
কোথাও কাহাকে যদি ধরিতেই হয়
ধরিব তোমাকে আল্লাহ্ এ মোর প্রত্যয়।

৯। আল্লাহকে পাওয়া সম্পর্কে : দাও আল্লাহ্ দেখিবারে দিব্য নয়ন
আসমান জমিন জুড়া তোমার আসন।
দাও হে প্রাণের পটে প্রভাত কিরণ
দিয়েছ অমূল্য যেই মানব জীবন।
তোমার কিরণ দানে কর হে প্রভাত
জীবন গড়িতে দাও তোমার সাক্ষাৎ।

১০। মান অপমান সম্পর্কে : নিখিলের স্রষ্টা তুমি সর্বশক্তিমান
তোমারই হাতের দান মান-অপমান।
সম্মানিত কর আল্লাহ্ করো নাকো হীন
মহান করো গো আল্লাহ্ করো নাকো দ্বীন।

১১। সমস্যা সম্পর্কে : যেখানে জটিল যাহা সমাধান করি
সহজে চুকাও আল্লাহ্ নিজ হাতে ধবি।
হাল্‌কা করিতে আল্লাহ্ হালটি ধরো
দায়মুক্তকারী তুমি ভারমুক্ত করো।
এমনি মনের বোঝা বুঝতে না পারি
জীবন-সংগ্রামে আল্লাহ্ নাহি যেন হারি।

১২। শেষ নিবেদন সম্পর্কে : যেদিকে মঙ্গল আছে নিখিলনিদান
করো হে বলার আগে তাহাই বিধান। —হাদিস

কোরআন ২ : ২৫৫, ২০ : ২৫, ২৬ : ১৪৪, ৯৪ : ১-৬

৯৯। বিশ্বকরুণা মহানবী :

সুখময় শান্তিময় করিতে সংসার
বিশ্বেরে বিধান দিলে বিশ্ববিধাতার।
দেখেছিলে দুর্নিবার জীবন স্বপন—
প্রভুর স্মরণসহ সমাজ গঠন।
প্রচার করিতে এক অভিন্ন কোরআন
প্রতিষ্ঠা করিতে এক বিধির বিধান।
তুলিতে মানবজাতি মনুষ্য-সম্মানে
এক সুরে ডাক দিলে মানব-সন্তানে।
দুই হাতে তুলে ধরে দিলে আমন্ত্রণ—
শাশ্বত জীবনের স্বাদ বিতরণ।
করিতে সৃষ্টির বুকে সুধা বরষণ
জগতের সব বিষ করিলে বরণ।
জেহাদ যাহার লাগি যুদ্ধ আমরণ
সাম্য ভ্রাতৃত্ব 'পরে সমাজ গঠন।
ডাকিলে নিবিড় ভাবে নিখিল নিদান—
দাও আল্লাহ্ অবুঝেরে বোধশক্তি জ্ঞান
যে কাজ করিল তারা অবুঝ মনে
তুমি তাদের ক্ষমা করো আপন গুণে।

সমগ্র জীবনে যার নাহি কোন ছল
সত্যের জীবন-দীপ সহজ সরল।
যার লাগি নির্যাতন যত নিপীড়ন—
অন্যায় অবিচার করিতে দমন।
সকল কাজেতে পেলে সহস্র ব্যাঘাত
অন্যায় ষড়যন্ত্র গোপন আঘাত।
তায়েফের মরুপথে নির্যাতিত নবী
ওহোদ প্রান্তরে তুমি নিপীড়িত ছবি।
জীবন হয়েছে যবে ওষ্ঠাগত
বাধার কণ্টকেতে ক্ষতবিক্ষত।
তখনও নিবিড় প্রাণে অবিরাম ধ্যান
দাও প্রভু অবোধেরে বোধশক্তি জ্ঞান।
যে কাজ করিছে তারা অবোধ মনে
তুমি তাদের ক্ষমা করো ক্ষমাশীল গুণে।
নিজেরে নিজেই করুক তিক্ত-তিরস্কার
এ হেন শাস্তি নাই শোধ তুলিবার।
করিলে প্রার্থনা তুমি ওগো নিরঞ্জন—
দাও প্রভু সকলেরে সত্যান্বেষী মন।
দেখিবারে দেখেছিলে জগৎ স্বপন—
সাম্য-ভ্রাতৃত্ব 'পরে সমাজ গঠন।
সদাই জাগ্রত ছিলে সব দুঃখে সুখে—
সহিতে সকল কিছু সদা হাসি মুখে।
পেয়েছিলে দেখিবারে হেন ক্ষমতা—
সহজে নিজের দোষ নিজ-দুর্বলতা।
বলেছ, বলোনি কভু "উহ কিংবা আহ"
'আমারই দুর্বলতা দোষ ত্রুটি যা'।
গ্লানিহীন করিবারে সমাজ গঠন
অকাতরে সবকিছু করিলে গ্রহণ।
দিন নাই রাত নাই অবিরাম ধ্যান—
দাও আল্লাহ্ অবুঝেরে বোধশক্তি জ্ঞান
অবোধ মানবকুলে যত দোষ পাও
তুমি তাদের ক্ষমা করে বোধোদয় দাও।
আকুতি কাকুতি মোর ভুলে ভরা ভূমি
ভূ-জনে বুঝিতে দাও মহাসত্য তুমি।
কোথাও কাহারো প্রতি অভিশাপ হানি
সমগ্র জীবনে তব নাই কোন বাণী।
'আমারই দুর্বলতা দোষ ত্রুটি নিয়ে
অবোধ মানবকুলে বোধোদয় দিয়ে—
করিলে প্রার্থনা তুমি নিত্য-নিবেদন—
'দাও তুমি সকলেরে **তোমা মুখী** মন।'
আকাশে বাতাসে তাই ডাকিছে নিনাদ—
আজিও অবনী 'পরে তুমি আশীর্বাদ।
বিশ্বের করুণা তুমি করুণার ভরে
এসেছ আল্লাহর দূত সকলের তরে।
জীবনের উষা লগ্নে যে জন 'আমিন'
অন্তলগ্নে 'রাহ্‌মা তাল্ লীল্ আলামীন।'
রেখে গেলে জীবনের যে ছবি নিখুঁত—
সকল কাজেতে ছিলে করুণার দূত।
বলেন স্বয়ং আল্লাহ্ অন্য কেহ না—
'মহম্মদ আমার দূত', 'বিশ্বকরুণা'।

—কাব্যকানন

কোরআন—৩ ঃ ১৫৯, ৪ ঃ ৭৯, ১৬৫, ৯ ঃ ১২৮, ১৫ ঃ ১০, ১৬ ঃ ৩৬, ২১ ঃ ১০৭, ৩৩ ঃ ২১, ৫৬, ৩৭ ঃ ১৮১, ৪৮ ঃ ৮

১০০। বিভিন্ন ধর্মমতে ইসলাম

হিন্দুধর্ম মতে—আমার অস্তিত্ব আছে। আমি মহা ইন্দ্রের ইন্দ্র। আমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, পরম পূর্ণ ব্রহ্মা। আমি আল্লাহ্; আল্লাহর রসুল মহম্মদের তুল্য আর কে আছে! মনু, আল্লোপনিষদ, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পারসী ধর্মমতে—আমি ঘোষণা করছি, হে স্পিতাম জরথুস্ত্র। পবিত্র আহম্মাদ নিশ্চয়ই আসবেন, যাঁর নিকট থেকে তোমরা সৎ-চিন্তা, সৎ-বাক্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে। —জিন্দাবেস্তা, ১ম পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ ধর্মমতে—"মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে, তখন আর একজন বুদ্ধ আসবেন, তাঁর নাম মৈত্রেয়, অর্থাৎ শান্তি বা করুণার বুদ্ধ।"

শিখ ধর্মমতে—"বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে, এখন পৃথিবীকে পরিচালিত করার জন্য কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ।"—গুরু নানক

খ্রীস্টান ধর্মমতে—"তোমাদের মধ্যে এমন একজন আসছেন, যাঁকে তোমরা জানো না। তিনি আমার পরে এসেও আমা অপেক্ষা সম্মানের অধিকারী হবেন। আমি যার জুতার ফিতা খুলবার যোগ্য নহি।"—বাইবেল, যোহন ১৩নং (২০)

১০১। জগৎ মনীষার চোখে বিশ্ব-মনীষা (মহম্মদ দঃ)ঃ "আমি বিশ্বাস করি, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই মহম্মদবাদ গ্রহণ করবে। আমি সবসময়ই মহম্মদের ধর্ম সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য জীবনী-শক্তির কারণে উচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করে চলেছি। এটা প্রত্যেক যুগের জন্য যুগপোযোগী ধর্ম।......মহম্মদের ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, আগামী দিনে তা গ্রহণীয় হবে, যেমন আজকের ইউরোপের নিকট তা গ্রহণীয় হতে আরম্ভ করেছে। মধ্যযুগীয় পাদ্রীগণ হয় অজ্ঞতা, নয় গোঁড়ামির মাধ্যমে মহম্মদকে কালো রঙে রঞ্জিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন মানুষ মহম্মদ ও তাঁর ধর্মকে ঘৃণা করার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁদের নিকট মহম্মদ ছিলেন খ্রীস্ট-বিরোধী। আমি তাঁকে, এই সুন্দর মানুষটিকে অধ্যয়ন করেছি। আমার মতে, তাঁকে খ্রীস্ট-বিরোধী বলা তো দূরের কথা। অবশ্যই মানবতার উদ্ধারকারী বলতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর মতো কোন ব্যক্তি যদি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি এমন এক অজ্ঞাত উপায়ে এর সমস্যা সমাধানে সফল হতেন, যা পৃথিবীতে আনতে পারত বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তি।"—জর্জ বার্নাড শ, গেটিং ম্যারেড, সং—১৯২৯

"মহম্মদ (দঃ)-এর যত সমালোচনাই করা যায়, সমস্ত সমালোচনাই প্রশংসায় পরিণত হয়।"—মনীষী লেনপুল।

"উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব, উপকরণের স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর সফলতা, যদি এই তিনটি বিষয়ই মানব প্রতিভার মানদণ্ড হয়, তাহলে ইতিহাসের অন্য কোন মহামানবকে এনে মহম্মদের সঙ্গে তুলনা করার এমন সাহস কার আছে!"

ফরাসি লেখক—আলফ্রেচ দেলা মার্টিন—দি হোলি প্রফেট।

একদিন সমগ্র ইউরোপ স্বীকার করেছিল—বিশ্বে আজ পর্যন্ত যত ধর্মীয় দূত এসেছেন তাঁদের মধ্যে মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) সর্বাপেক্ষা কৃতকার্য ব্যক্তি।

—"Of all the great religious personalities of the world, the prophet Muhammad was the most successful." আজ সমগ্র ইউরোপ আবার স্বীকৃতি দিচ্ছে, বিশ্বে যত ধর্মীয় দূত এসেছিলেন, মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

"Mohommad himself is not an object of worship, but is accounted the last and greatest of the prophets (which include Abraham and Jesus) of the one and only God, Allah."—The Reader's Digest, Gre it Encyclopaedic Dictionary, Vol-3, page-1360.

১০২। পূর্ণ মানব মহানবী ঃ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে মহানবী (দঃ) সম্পর্কে মানুষ রচিত যত বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তার মধ্যে মহাকবি সেখ সাদির (রাঃ) বাণী সর্বাধিক মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছে।

বালা গাল্ উলা বে কামালিহি
কাশাফাদ্ দোজা বে জামালিহি
হাসুনাৎ জামিও খেসালিহি
সাল্ লু আলাইহে ওয়া আ'লি'হি।

ভাবার্থ ঃ যিনি তাঁর আপন পূর্ণতা দ্বারা (উন্নতির শেষ শিখরে) সমুচ্চতায় আরোহণ করলেন, যাঁর সৌন্দর্য দ্বারা (জগৎ) অন্ধকার দূরীভূত হলো, যাঁর সহজাত চরিত্র বা প্রতিভা দ্বারা সমস্ত সুন্দর কাজ একত্রিত হলো। তাঁর ও তাঁর বংশধরের প্রতি (সালাম শান্তি) দরুদ পাঠ করুন।

১০৩। অসম্পূর্ণ বিশ্বে মহানবী (দঃ) ঃ বিখ্যাত মনীষী জোসেফ হেলের মতে—"মহম্মদ (দঃ) এমনই একজন মহান ব্যক্তি, যাঁকে না হলে বিশ্ব অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। তিনি নিজেই নিজের তুলনা। তাঁর কৃতিত্বময় ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে।" বর্তমান বিশ্বের অন্যতম চিন্তাবিদ কার্লাইল বলেন - "আরবজাতির জন্য এটা (ইসলাম) অন্ধকারে আলোর সমতুল্য এবং এর আলোকে দেশ উদ্ভাসিত হয়েছিল।" সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা স্মরণ করে মনীষী এডওয়ার্ড গিবন বলেন, "এটা এমন একটি স্মরণীয় বিপ্লব, যা পৃথিবীর সমস্ত জাতিসমূহে একটি নতুন ও চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে।" তিনি আরও বলেন, "মহানবী ধর্মনেতা, রাজনীতিজ্ঞ এবং প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেন। উপরন্তু খোদার ওপর প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ব্যতীত মানবজাতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অলিখিত থেকে যেত।" অধ্যাপক হিট্টি বলেন—"আবুবকরের আমলের বিশ্বজয়ে উদ্দীপ্ত প্রেরণা ওমরের খেলাফতে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। শূন্য হতে আরম্ভ করে আরবীয় মুসলিম খেলাফত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হলো।" ইসলামের প্রখ্যাত প্রবক্তা খোদাবক্স বলেন—"তাঁর (রাসূলুল্লার) শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য ছিল গোত্র প্রথার বিলুপ্তি।" মনীষী মন্টোগোমারি বলেন—"হযরত মহম্মদ (দঃ) তিনটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন, যা তখনকার দিনে ছিল না বললেই চলে। ধর্ম প্রবর্তক হিসাবে তাঁর অসামান্য মেধা, রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে তাঁর অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং প্রশাসক হিসাবে তাঁর অতুলনীয় দক্ষতা।" সৈয়দ আমীর আলি বলেন, "একটি মহান কার্য চমৎকার এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে সুসম্পন্ন করার শ্রেষ্ঠ প্রমাণই হচ্ছে তাঁর পূতপবিত্র জীবন।" এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে—"বিশ্বের সমস্ত ধর্মপ্রচারকের মধ্যে হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন সর্বাপেক্ষা কৃতকার্য।" বিখ্যাত চিন্তানায়ক ও সমাজবিদ মেজর এ. জি. লিয়োনার্ড বলেন—"মহম্মদ (দঃ) শুধু একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিই নন, বরং এমন একটি পূর্ণমানব, যা মনুষ্যসমাজ, সমগ্র মানবজাতি আজও জন্ম দিতে পারেনি।"

১০৪। আলোকের মহান বার্তাবহ মহানবী (দঃ) ঃ ভারত পথিক স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—"বড় লোকেদের চরিত্র রহস্যময়, তাঁদের পদ্ধতি আমাদের অনুসন্ধানের

অতীত। আমরা তাদের বিচার করতে পারব না। যীশুখ্রীস্ট, মহম্মদ (দঃ)-কে কেউ কি বিচার করতে পারে? তুমি, আমি কে? ক্ষুদ্র শক্তি। আমরা এসব মহান আত্মার কি বুঝি?......এই প্রাচীন ব্যক্তিত্বরা সবাই ঈশ্বরের দূত ছিলেন। আমি প্রণত হয়ে তাঁদের পূজা করি। তাঁদের পদধূলি গ্রহণ করি। এই মহৎ ব্যক্তিত্বরা পথের দিক্‌চিহ্ন। এইটাই তাঁদের উপযোগিতা।.....এঁরা হলেন আলোকের মহান বার্তাবহ।"

১০৫। আমাদের মহান শিক্ষক মহানবী (দঃ) ঃ মহানবী সম্পর্কে স্বামীজীর শেষ কথা—"এঁরা আমাদের মহান শিক্ষক, জ্যেষ্ঠ সহোদর।"

ষোলকলায় সার্থক হয়েছে কবির কথা নবীর জীবনে ঃ

"জীবন মন্থন বিষ নিজ করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছো দান।"
"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ ঃ ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৫২, সং ঃ ১৯৭৮

১০৬। রবীন্দ্রনাথ ও রাজা রামমোহন ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহানবীজী সম্পর্কে বলেন—এমন সময়ে মহম্মদের আবির্ভাব হইল, মর্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থূল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে সময়ে আরব সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল, তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহুবিবাহ, দাসী সংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রী পরিত্যাগের কোন বাধা ছিল না; তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়ে স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্য পদবীতে আরোপণ করিলেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন, স্ত্রী-বর্জন (তালাক) ঈশ্বরের চোখে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এইজন্য তিনি স্ত্রী-বর্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলি গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন।

—সমাজ, প্রবন্ধ—প্রাচ্য সমাজ

"মহম্মদের আবির্ভাবকালে পৌত্তলিক আরবীয়রা যে তাঁহার একেশ্বরবাদ সহজে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা নহে; তাই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন নাই, তোমাদের পক্ষে যাহা সহজ তাহাই তোমাদের ধর্ম, তোমরা বাপ-দাদা ধরিয়া যাহা মানিয়া আসিয়াছ, তাহাই তোমাদের সত্য। তিনি এমন অদ্ভুত অসত্য বলেন নাই যে, যাহাকে দশজনে মিলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহাই সত্য, যাহাকে দশজনে মিলিয়া পালন করা যায় তাহাই ধর্ম। একথা বলিলে আপদ মিটিত, কিন্তু চিরকালের বিপদ বাড়িয়া চলিত।" —সঞ্চয়, প্রবন্ধ—ধর্মের অধিকার।

"মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা—যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধ সকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা, তাহাতেই আমার বিশেষ মঙ্গল।"

"বস্তুত মূর্তিপূজা সেইরূপ কালেরই পূজা—যখন মানুষ পরম দেবতাকে একটি কোন বিশেষ রূপে কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই মহা পুণ্যফলের আকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, অথচ সেই মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে নাই।"

"মূর্তিপূজা সেই সময়েরই—যখন পাঁচ-সাত ক্রোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক ম্লেচ্ছ, পরসমাজের লোক অশুচি এবং নিজের দলের লোক ছাড়া আর সকলেই অনধিকারী,—এককথায় যখন ধর্ম আপন ঈশ্বরকে সংকুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সংকুচিত করিয়াছে এবং জগতে যাহা সকলের চেয়ে বিশ্বজনীন তাহাকে সকলের চেয়ে গ্রাম্য করিয়া ফেলিয়াছে।"

"কলিকাতা বসবাসকালে রামমোহন হযরত মহম্মদের এক জীবনী লিখিবার সংকল্প করিয়াছিলেন; দুর্ভাগ্যবশত ওই সংকল্প কাজে পরিণত করিতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে বন্ধু অ্যাডামকে তিনি বলিয়াছিলেন, মহম্মদের গোঁড়া ভক্ত ও বিরুদ্ধবাদী শত্রু এবং সমালোচকগণ কেউই এই মহাপুরুষের প্রতি সুবিচার করেননি। মহম্মদের প্রকৃত মাহাত্ম্য সম্পর্কে জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল জীবনী রচনার উদ্দেশ্য।"

—সঞ্চয় ঃ প্রবন্ধ—ধর্মের নব যুগ।

১০৭। ঝরণা নন্দী ও প্রতিমা মুখার্জী ঃ এম. এ. ক্লাসের প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম দিনের উদ্বোধনী ক্লাস আরম্ভ করেছি। আধ ঘণ্টা ক্লাস নেওয়া হয়েছে। মহানবীর উপর ক্লাস নিচ্ছি। এমন সময় নদীয়া জেলার রানাঘাট কলেজের ছাত্রী শ্রীমতি ঝরণা নন্দী ক্লাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠল। এবং আমাকে বললো—"স্যাব, আপনি কি সব বলছেন? আমরা যতদূর জানি ও শুনেছি, মহম্মদ ছিলেন একজন খুনী, ডাকাত, লম্পট, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ আপনি স্যার, সেই মহানবী মহম্মদের উপর যা বলছেন, তা আমার নিকট খুবই অসঙ্গত ও অসত্য মনে হওয়ায় উঠে দাঁড়িয়ে জোর আপত্তি জানালাম।" (নায়ূজুবিল্লাহ)।

এবার আমি বললাম—"তুমি আমার ছাত্রী, তোমার বক্তব্য আমাকে বলার অধিকার তোমার আছে। আমি অধ্যাপক, আমি তোমাদের দু'বছর ক্লাস নেব। আজ যেমন আমি প্রথম ক্লাস নিচ্ছি, দু'বছর পর একদিন শেষ ক্লাসও নেব। যেদিন শেষ ক্লাসটি নেব, সেইদিন আমি তোমার আজকের এই প্রশ্নের উত্তর দেব।" তখন ছাত্রীটি বলল—"স্যার, তাই হবে।" অতঃপর দু-বছর কেটে গেল। দেখতে দেখতে সেই শেষের দিনটিও এসে উপস্থিত। আমি কিন্তু বেমালুম অতীতের সব কথা ভুলে গেছি। এমনকি অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীও ভুলে গেছে। শেষের দিনে শেষ ক্লাস নিতে দাঁড়িয়েছি। ঠিক আগের মতো আধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। সেই সময় ওই ছাত্রী আবার উঠে দাঁড়াল। এবং আমাকে আগের ওই কথা স্মরণ করিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই আমার মনে ভেসে উঠল। আমি বললাম—'এবার আমি উত্তর দেব।' সঙ্গে সঙ্গে আমার ছাত্রী 'ঝরণা' আমাকে বলে উঠল—"না স্যার, আমার সেদিনের প্রশ্নের উত্তর আমিই আজ দেব, আপনি কেবলমাত্র আমাকে অনুমতি দিন।" তখন আমি বললাম—"আমি তোমাকে অবাধ অনুমতি দিলাম। তুমিই উত্তর দাও।"

ছাত্রী ঝরণার ঐতিহাসিক উত্তর—"স্যার, আপনার রচিত 'মহানবী' গ্রন্থটি আমি, আমার বাবা-মা, ভাই-বোন, কিছু আত্মীয়-স্বজন, কিছু পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই ভালভাবেই পড়েছি। তাতে হযরত মহম্মদের উপর আমার ও আমাদের একটি ধারণা জন্মেছে। ধারণাটি হলো—(১) এই বিশ্বে আজ পর্যন্ত যদি কোন একজন পূর্ণ মানব জন্মগ্রহণ করে থাকেন,

'১' মহানবী মহম্মদ। (২) এই বিশ্বে যদি কোনদিন কারোর নীতির দ্বারা বিশ্বশান্তি স্থাপন হতে পারে, তিনি হযরত মহম্মদ। (৩) এই বিশ্বের সকল মানুষেরই উচিত তাঁকেই অনুসরণ করা।"

ছাত্রী ঝরণার উত্তরের পর আমার মনে প্রথম জাগল—সমস্ত প্রশংসাই এক আল্লাহর। হে আল্লাহ্, তুমি তোমার এক অতীব ক্ষীণতম বান্দাকে এমনি শক্তিদান করেছিলে, যে তোমার প্রিয় রসুলের (দঃ) উপর দু'বছর ধরে এমনি বক্তব্য রাখল যে, তার উত্তর-মেরুর ছাত্রী একেবারেই দক্ষিণ-মেরুতে এসে হাজির হলো। আমার মনে হয়, এরই নাম প্রকৃত জয়। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম কলেজের ছাত্রী প্রতিমা মুখার্জীর ঘটনাও ওই একই রূপ ছিল। সমস্ত প্রশংসা, হে আল্লাহ্ তোমারই।

১০৮। দৈনন্দিন জীবনে মহানবীজী ঃ (১) অতি প্রভাতে ফজরের নামায পড়তেন। পরে মসজিদে জায়নামাযের পাটিতেই একটু ঘুরে বসতেন। সূর্য কিছুটা ওঠার পর অন্যান্য সাহাবীগণ আবার ফিরে আসতেন। তখন মহানবীজী তাঁদের নানারকম উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন। বিগত রাতের ঘটনা জিজ্ঞাসা করতেন। সাহাবীগণ অকপট চিত্তে সব কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তিনিও প্রাণ খুলে তাঁদের সব কথাই বলতেন। রাতে তিনি যা স্বপ্নে দেখতেন, তা তাঁদের বলতেন। এবং তাঁরা যা স্বপ্ন দেখতেন, তাও তাঁরা বলতেন। একবার মহানবীজী নিজের একটি স্বপ্নের কথা বললেন—তিনি একটি স্বপ্নে দেখলেন যে, দুটি তরবারি তৈরি করলেন, তার মধ্যে একটি ভেঙে গেল। এই স্বপ্নের তাবির বা রহস্য বলে দিলেন—'একটি ছিল বদর যুদ্ধ, অন্যটি ছিল ওহোদ যুদ্ধ'। একবার হযরত বেলাল (রাঃ) একটি স্বপ্নের কথা বললেন। তিনি (বেলাল) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি স্ত্রীলোকদের গুপ্তাঙ্গে সীলমোহর করছেন। মহানবীজী এর তাবির করে দিলেন—'তুমি অত্যন্ত ভোরে আযান দাও, যার ফলে স্ত্রীলোকগণ আর তাদের স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে না।' এই বৈঠক প্রত্যহ নিয়মিতভাবেই চলত। এখানে নানা রকমের খোলামেলা আলোচনা হতো। এই বৈঠকের পর একটু বেলা হলে মহানবীজী চার থেকে আট রাকাত পর্যন্ত 'চাশত'-এর নামায আদায় করে আপন ঘরে চলে যেতেন।

(২) অতঃপর দিনের বেলায় সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম (কাপড় সেলাই, জুতা সেলাই, ছাগ দোহন ইত্যাদি ইত্যাদি) নিজ হাতে করতেন। দুপুরে জোহর নামাযের পর কোন কোন দিন সামান্য একটু বিশ্রাম নিতেন।

(৩) আসরের নামাযের পর নবীজী অন্তঃপুরে যেতেন। সকল স্ত্রীগণের খোঁজখবর করতেন। প্রত্যেকেরই ঘরে যেতেন, প্রত্যেকের সুবিধা-অসুবিধা লক্ষ্য করতেন।

(৪) মাগরেব নামাযের পর ওই স্ত্রীর ঘরে যেতেন, যেখানে বা যে স্ত্রীর ঘরে তাঁর সেদিনের পালা থাকত। তখন অন্যান্য স্ত্রীগণও সেখানে একত্রিত হতেন। এমনকি পাড়ার অন্যান্য রমণীগণও সেখানে একত্রিত হতেন। এবং নানা কথা নবীজীকে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি নানা বিষয়ের উত্তর দিতেন। এ বৈঠক এশা পর্যন্ত চলত।

(৫) এশার বা রাত্রির নামাযের পর তিনি আর কারোর সঙ্গেই কথা বলতে ভালবাসতেন না। অতঃপর শুয়ে পড়তেন। সামান্য কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পরই আল্লাহর আরাধনাতে

মশগুল হয়ে যেতেন। সারা রাত্রি আল্লাহর এবাদতে এমনিভাবে মগ্ন থাকতেন যে, কখনো কখনো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়ার জন্য তাঁর দু'পা-ই ফুলে যেতো। কখনো বা পত্নীগণ তাঁদের দাম্পত্য-দাবি পূরণের জন্য নবীজীকে বিনীতভাবে স্মরণ করাতেন। এমনি ছিল তাঁর ধ্যানমগ্ন রাত্রির জীবন।

কোন্ নামাযে কোন্ সূরা পড়তেন ঃ

১। ফজর নামায ঃ সাধারণত সূরা কাফ্, মোমেনুন ইত্যাদি পড়তেন।

২। জোহর নামায ঃ সাধারণত আলিফলাম-তান্যীল আস্সাজদাহ, ও সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা ইত্যাদি পড়তেন।

৩। আসর নামায ঃ সাধারণত প্রতি রাকাতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ কেরয়াত পড়তেন।

৪। মাগরেব নামায ঃ সাধারণত "ওয়াল মুরসালাত" ও সূরা 'তুর' পড়তেন।

৫। এশার নামায ঃ সাধারণত 'ওয়াত্তীন' এবং ওই পরিমাণ সূরা পড়তেন।

৬। তাহাজ্জুদ নামায ঃ সাধারণত সূরা বাকারা, আল ইমরান, নিসা পাঠ করতেন। এই একাকী নামাযে নবীজী সর্বাপেক্ষা লম্বা সূরা পড়তেন।

৭। জুম্মার নামায ঃ সাধারণত সূরা জুমুয়া, মুনাফিকুন, আলা ও গাশিয়া পড়তেন। জুমআর খুতবাতে সূরা কাফ্ পড়তেন। তিনি খুতবা সংক্ষিপ্ত করতেন। মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করতেন। মিম্বর নির্মিত হওয়ার পূর্বে খুতবাতে হাতে লাঠি ব্যবহার করতেন। কখনোও তরবারি ব্যবহার করতেন না। মিম্বর হওয়ার পর লাঠিও ত্যাগ করেন। বয়সের ভারে কোন কোন সময় ব্যবহার করেছেন। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম রমণীগণও মসজিদে পুরুষদের পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। তখনও পর্দাপ্রথার প্রবর্তন হয়নি।

মহানবীজী কি পছন্দ করতেন ঃ

খাওয়া ঃ তিনি সাধারণত সিরকা, মধু, হালুয়া, যয়তুন তেল এবং কদুর তরকারি পছন্দ করতেন। তখনকার দিনে ঘি ও খেজুর মিশ্রিত করে হাইশ নামক একপ্রকার হালুয়া করা হতো। এটা নবীজী অত্যন্ত পছন্দ করতেন। যবের আটা ও যয়তুন তেল মিশ্রিত খাবারও ভালবাসতেন। গোশতের মধ্যে ছাগল-মুরগি, উট, দুম্বা, পাখি প্রভৃতি পছন্দ করতেন। খাবার খেতেন আপন হাত দিয়ে, ছুরি-চামচ নয়। টেবিল-চেয়ারে বসে খেতেন না। পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ঠাণ্ডা পানি পছন্দ করতেন। কখনো সখনো ফলের রসও খেতেন

পরা ঃ তিনি সাধারণত জাঁকজমক পোশাক পছন্দ করতেন না। বিশেষ কোন রাজদূত এলে ওরই মধ্যে কিছুটা ভাল পোশাক পরতেন। রংয়ের মধ্যে তিনি সাধারণত ধূসর রং বেশি পছন্দ করতেন। তবে সাদা রংকেও সর্বাপেক্ষা উত্তম রং বলে বর্ণনা করেছেন। পুরুষের

জন্য লাল রং মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি খুশবু বা সুগন্ধি বড়ই পছন্দ করতেন। বলতেন—"এক পয়সা থাকলে খাবার কিনো, আর এক পয়সা জুটলে ফুল কিনো, তৃতীয় পয়সা পেলে—গরিবকে দান করো।" কোন গন্ধযুক্ত খাবার খেতেন না, যেমন পেঁয়াজ, রসুন ও মূলো প্রভৃতি।

১০৯। চিরবন্দিত চিরনন্দিত মহানবী (দঃ) ঃ আজ পনেরোশো হিজরীর শুভ লগ্নে এভাবে আরও অসংখ্য জগৎ-মনীযা দ্বাবা বিশ্ব-মনীষা হযরত মহম্মদ (দঃ) অসম্পূর্ণ বিশ্বের সম্পূর্ণকারী হযরত মহম্মদ (দঃ), অভাবনীয় একনিষ্ঠ মোজাহিদ হযরত মহম্মদ (দঃ), মানবতার শেয উত্তবণ হযরত মহম্মদ (দঃ), মানব-সূর্য হযরত মহম্মদ (দঃ), আলোকের মহান বার্তাবহ হযরত মহম্মদ (দঃ), মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠতম ফসল হযরত মহম্মদ (দঃ), বিশ্ব-সমাজের বর্ণনাতীত বিপ্লবী বীর ও শ্রেষ্ঠতম সমাজ-সংস্কারক হযরত মহম্মদ (দঃ), আমাদের মহান শিক্ষক হযরত মহম্মদ (দঃ) নিখিল বিশ্বের হৃদয় দুর্গে চির-বন্দিত চির-নন্দিত।

দরুদ

শেয নাই যার সেটি শেষ করিলাম
এ কথা বলিতে কভু নাহি পারিতাম।
আসিবে না এ জগতে হেন পরিবেশ
যে বিশ্বে তোমার বাণীর প্রয়োজন শেষ।
কি দিয়ে তোমার কথা শেষ করিতাম।
সমগ্র জীবনে মোর নাহি জানিলাম।

দয়ার সাগর তুমি দ্বীন দুনিয়ার
বহন করিয়া তুমি বিশ্ব গুরুভার—
বেগবান নদী তুমি বিশ্ব দরিয়ার
ধূলি মাটি ময়লা যত টানিয়া ধরার
কঠোর সাধনা মাঝে স্বপ্নে ভরা
দেখিতে সুন্দর রূপ সাজান ত্রিধরা।
জীবন করিলে পাত দূত রূপে যাঁর
তোমাতে তোমার বংশে রহমত তাঁহার।

যতই গভীরে যাই অতল সমুদ্রে
যতই উচ্চেতে উঠি সাধনা সূত্রে—
তৃষ্ণা মোর বাড়ে শুধু পুরে মনস্কাম
তৃপ্তি আমি পাই শুধু করিয়া সালাম
লও তুমি আমাদের দরুদ ও সালাম।

কোরআন—৩ ঃ ১৫৯, ৪ ঃ ৭৯, ১৬৫, ৯ ঃ ১২৮, ১৫ ঃ ১০, ১৬ ঃ ৩৬, ২১ ঃ ১০৭, ৩৩ ঃ ২১, ৪৬, ৪৫ ঃ ২০, ৪৮ ঃ ৮, ৫৪ ঃ ২২, ৩২, ৪০, ৬৮ ঃ ৫২

দোয়া

হে ধরার শেষ দূত আল্লাহর মকবুল
কাতর প্রার্থনা মোর করিও কবুল--
চেষ্টা যদি করে থাকি আপনার কাজে
দিবারাত্রি নিত্য
সাধনার নিগূঢ় সত্য
লোকচক্ষে তুলিবারে সকলের মাঝে
তোমার মহান ব্রত—
'শান্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব';
বিনা ভাষায় বিনা কথায় বিনীত অন্তরে
একটু শুধু চাওয়া—
একটু শুধু পাওয়া--
সংসার সমুদ্র হতে ওপারের পারাবারে---
সব যাক খোয়া,
একটু তব দোয়া।

কোরআন-- ৯ ঃ ১২৮, ৬০ ঃ ১২

এই পুস্তকে ব্যবহৃত ইসলামি শব্দাবলী ও অর্থ

১।	আরাফাত	মক্কা শরীফের একটি ময়দান
২।	আয়াত	কোরআন শরীফের বাক্য
৩।	আল-আমিন	চির বিশ্বাসী (মহানবী দঃ)
৪।	আক্দ	বিবাহ স্থিরীকৃত
৫।	আনসার	সাহায্যকারী (মদিনার)
৬।	ঈমান	আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, (বিশ্ব-প্রকৃতির অনুধাবন)
৭।	এতিম	অনাথ
৮।	এবাদত	প্রার্থনা
৯।	এহরাম	হজের উদ্দেশ্যে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান
১০।	ওহী	ঐশী বাণী
১১।	ওফাত	মৃত্যু
১২।	ওহী নাজেল	ঐশী অবতীর্ণ
১৩।	ওকাজ মাজনার	একটি স্থান
১৪।	ওরাকা	একজন ভবিষ্যদ্বক্তা
১৫।	কওম	জাতি
১৬।	কুনুত	দোয়া বিশেষ

১৭। কিয়ামত	অন্তিম উত্থান দিবস
১৮। কাসওয়া	মহানবীর উট
১৯। সাহাবায়ে কেরাম	মহানবীর সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ
২০। কলমা	স্বীকৃতি বাক্য (বিশ্বাস)
২১। খোৎবা	বক্তৃতা (মসজিদে)
২২। জ্বেন ২৩। জ্বিন	দানব
২৪। জান্নাত	স্বর্গ
২৫। জুলহজ	আরবী মাস
২৬। জোহর ও আসর	দুপুর ও বিকালের নামাযের নাম
২৭। যিয়ারত	সমাধি-প্রার্থনা
২৮। জেহাদ	অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
২৯। যেকের	আল্লাহর স্মরণ
৩০। জবেহ	আল্লাহর নামে বলি
৩১। জাহান	জগৎ
৩২। তওয়াফ	হজের জন্য কাবা প্রদক্ষিণ
৩৩। তছবি	মালা জপা
৩৪। তেলাওয়াত	কোরআন পাঠ করা
৩৫। তওবা	ক্ষমা প্রার্থনা
৩৬। তওয়াফ	হজ বা উমরার উদ্দেশ্যে কাবা প্রদক্ষিণ—
৩৭। তকবির	দুনিয়ার চিন্তা বর্জন করে নামায শুরু করা
৩৮। দোমবায়	ছাগল জাতীয় পশুতে
৩৯। দুরাকাত	নামাযের দুই স্তর
৪০। দিনার	স্বর্ণ মুদ্রা
৪১। দোজখ	নরক
৪২। দোয়া	আশীর্বাদ
৪৩। দরুদ	প্রার্থনা (নবীদের জন্য)
৪৪। নবুয়ত	আল্লাহর দূতের দায়িত্ব
৪৫। নাযেল	অবতীর্ণ
৪৬। নূহের	নূহ নবীর
৪৭। নাজাত	মুক্তি
৪৮। ফানাফিল্লাহ	আল্লাহতে বিলীন
৪৯। ফরজ	অবশ্য করণীয়
৫০। ফুপু	পিসি (পিতার বোন)

৫১। ফজর	উষা
৫২। বুটি	যুদ্ধলব্ধ ধন
৫৩। বায়তুল মোকাররম	কাবা
৫৪। ফেরেশ্তা	স্বর্গীয় দূত
৫৫। মুয়াল্লাকাত	একটি বিখ্যাত আরবী গ্রন্থ
৫৬। মাছুম	নিষ্পাপ
৫৭। মোহাজির	মদিনাতে হাজির ব্যক্তি (উদ্বাস্তু)
৫৮। মহিলা মুহাজেরাত	ঐ মহিলা মদিনাতে হাজির
৫৯। মোদাচ্ছের	একটি সূরার নাম
৬০। মেরাজ	স্বর্গে আরোহণ
৬১। মোহাজেরিন	হাজির ব্যক্তিগণ (উদ্বাস্তু মদিনাতে)
৬২। মোবাহিলা	বিতর্কমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ ও আল্লাহর নামে শপথ
৬৩। মোসাফা	করমর্দন
৬৪ মসক্	জলের পাত্র
৬৫ রুকু	নামাযে অর্ধ অবনত হওয়া
৬৬। রহমত	আল্লাহর দয়া
৬৭। রুহানি	স্বর্গীয়
৬৮। রেসালত	নবীর প্রতি প্রেরিত তত্ত্ব
৬৯। লাব্বায়েক	আমি হাজির
৭০। শাহাদাত	মৃত্যুবরণ আল্লাহর পথে
৭১। সেজদা	প্রণত (নামাযে)
৭২। সুরুজ	সূর্য
৭৩। সাহাবা	মহানবীর সঙ্গী
৭৪। সিনাচাক	বক্ষ বিদারণ (চিত্তের শুদ্ধিকরণ)
৭৫। হালাল	বৈধ
৭৬। হুজরা	ছোট ঘর (সাধনার জন্য)
৭৭। হিযরত	স্থানান্তর বা দেশত্যাগ
৭৮। হাদি	পথপ্রদর্শক
৭৯। কোরআন	আল্লাহর বাণী, যা পঠিত হয়। শরীফ = পবিত্র, পারা = খণ্ড, সূরা = অধ্যায়, রুকু = অনুচ্ছেদ, আয়াত = বাক্য, লফজ = শব্দ, হরফ = অক্ষর।
৮০। হাদিস	হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বাণী

গ্রন্থে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলোর বিবরণ

দঃ	দরুদ বা শান্তি কামনা, দরুদ নানা প্রকারের হয় যেমন -
সঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, দরুদ বা শান্তি কামনা
সাঃ	দরুদ বা শান্তি কামনা, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম, দরুদ বা শান্তি কামনা
কঃ	কারামুল্লাহ ওয়াজহোহু,আল্লাহর মহান,
রাঃ	রাযিয়ালাল্লাহু আনহু,যাঁর উপর আল্লাহ্ খুশি,
রঃ	রহমাতুল্লাহ আলায়হে,যাঁর উপর আল্লাহর রহমত।

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

[বিঃ দ্রঃ—এই গ্রন্থের (নামোল্লেখ ব্যতীত) সমস্ত কবিতাই গ্রন্থকারের স্বরচিত এবং তাঁর 'কাব্যকানন' গ্রন্থের অন্তর্গত]